রাসূলে রহমত (সা)

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।" (২১ : ১০৭)

به مصطفی برساں خویش راکه دین همه اوست

اگر اونه رسیدی تمام بو لهبی است

"নিজকে মুস্তাফা (সা) পর্যন্ত পৌছাও, কারণ এটাই হলো দীন,
যদি সে পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে, তা হলে (পরিণাম) সবাই হবে আবূ লাহাবের মত।"

(আল্লামা ইকবাল)

রাসূলে রহমত (সা)

মূল : মাওলানা আবুল কালাম আযাদ
সংকলন : মাওলানা গোলাম রাসূল মিহর
অনুবাদ : আবদুল মতীন জালালাবাদী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

রাসূলে রহমত (সা)
মূল : মাওলানা আবুল কালাম আযাদ
সংকলন : গোলাম রাসূল মিহর
অনুবাদ : আবদুল মতীন জালালাবাদী
[ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

ইফা প্রকাশনা : ২০৩৮/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩
ISBN : 984-06-0648-5
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০২
তৃতীয় প্রকাশ (উন্নয়ন)
ডিসেম্বর ২০১৪
পৌষ ১৪২১
রবিউল আউয়াল ১৪৩৬
মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল
প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫
প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৫২০.০০ (পাঁচ শত বিশ) টাকা।

RASULE RAHMAT (S) : Written by Maulana Abul Kalam Azad and compiled by Gulam Rasul Mehr in Urdu, translated into Bangla by Abdul Matin Jalalabadi and Published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535. December-2014

Website : www islamicfoundation.org.bd
E-mail : islamicfoundationbd @yahoo.Com

Price: Tk.520.00; US Dollar : 21.00

মহাপরিচালকের কথা

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। তিনি মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলার নিরংকুশ আনুগত্য করানোর ক্ষেত্রে যেমন সফল, তেমনি মানুষের মধ্যে মানবীয় গুণাবলী উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রেও অসাধারণভাবে সফল।

ইতিহাসের এই মহান পয়গাম্বরের জীবন ও কর্মের উপর পৃথিবীর বহু ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকেও মহানবী (সা)-এর জীবনী বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিমান গ্রন্থকারের রচিত বহু মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

নৈতিক মূল্যবোধের প্রতীক ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সীরাত গ্রন্থ 'রাসূলে রহমত' একটি যুগান্তকাবী গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় রচিত এ গ্রন্থের লেখক উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও রাজনীতিক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। সাপ্তাহিক 'আল-হিলাল' পত্রিকায় প্রকাশিত মাওলানা আযাদের সীরাত বিষয়ক প্রবন্ধমালা সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন তাঁর একান্ত ভক্ত আলিম, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মাওলানা গোলাম রসূল মিহর। বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক ও লেখক মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী। কুরআন মজীদে মহানবী (সা)-কে 'রাহমাতুল লিল্ আলামীন' বলা হয়েছে। রাসূলে করীম (সা) যে সমগ্র বিশ্বের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বা আশিষরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক রাসূল (সা)-এর জীবনের সেসব দিক সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অধুনা গোটা বিশ্বে অশান্তি, অরাজকতা, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস আর বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। আজ সারা বিশ্ব যেন এক অগ্নিবলয়ে পরিণত হয়েছে। আর বিশ্ববাসী এই অগ্নিবলয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মুক্তির জন্য ছটফট করছে। মহানবী (সা)-এর আদর্শ গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বমানব সন্ত্রাস, অশান্তি, অরাজকতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে, গোটা বিশ্বকে পরিণত করতে পারে শান্তিধামে।

ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। অতি উচ্চমানের এই গ্রন্থটির অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশের সময় ভুল-ত্রুটি ছিল বর্তমান সংস্করণে তা সংশোধন করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকল শুভ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আকাইদ মনীষীদের জীবনী, রাসূলের সীরাত প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য পুস্তক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম সাহিত্যিক ও রাজনীতিক মওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রণীত 'রাসূলে রহমত' শীর্ষক সীরাত গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক ও লেখক মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী।

ইতোপূর্বে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে দেশী-বিদেশী মনীষীদের রচিত বহু সীরাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি সীরাত সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন। এতে মহানবী (সা) যে সারা বিশ্বের জন্য রহমতরূপে আবির্ভূত হয়েছেন তা বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে মাওলানা অত্যন্ত সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে তিনি রহমাতুল লিল্ আলামীন ও রাব্বুল আলামীন, দীনে রহমত ও রাসূলে রহমত প্রভৃতি প্রবন্ধে মহানবী (সা)-এর দয়া ও মহানুভবতা সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। এ ধরনের প্রামাণ্য ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা সহজে চোখে পড়ে না। এ গ্রন্থটি পাঠ করলে মহানবী (সা)-এর জীবন সম্পর্কে পাঠকের জানার দিগন্ত ব্যাপক প্রসারিত হবে। প্রকৃতপক্ষে রাসূল-প্রেমী প্রতিটি মানুষের জন্যই এটি এক আকর্ষণীয় গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সুধী পাঠকদের হাতে এ মূল্যবান গ্রন্থটি তুলে দিতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

আমরা গ্রন্থটির মূল রচয়িতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, সংকলক ও বিন্যাসকারী মাওলানা গোলাম রাসূল মিহর-এর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং এর অনুবাদক ও প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল। প্রথম প্রকাশের সময় যেসব ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়েছে, তা এবার সংশোধন করা হয়েছে। প্রুফ দেখাসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেছেন মাওলানা ফতেহ আলী আযাদ। তারপরও যদি কোনো ভুলত্রুটি কারো চোখে ধরা পড়ে তা জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এবারও গ্রন্থটি পূর্বের ন্যায় পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অনুবাদকের কথা

এ পুস্তকটি 'সীরাতুন্নবী '(সা) এর উপর লিখিত অতি উচ্চ মানের একটি প্রবন্ধ সংকলন। মূলত: প্রবন্ধগুলোর লেখক হচ্ছেন এ উপমহাদেশের বিখ্যাত মনীষী মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও বিখ্যাত সাংবাদিক, প্রবন্ধকার ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা গোলাম রাসূল মিহ্‌র।

এতে মরহুম মাওলানা আযাদের যে সব প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে, সেগুলোর বেশীর ভাগই প্রবন্ধাকারে লিখিত হয়নি। বরং এর কোন কোনটি সীরাত-সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার উত্তর, কোন কোনটি মাওলানা কর্তৃক লিখিত কুরআনের তাফসীরের উদ্ধৃতি-বিশেষ অথবা টীকা অথবা কোন সীরাত মজলিসে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ। আর মাওলানা মিহ্‌রের যেসব প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে, সেগুলো মূলত: এ সংকলনের জন্যই প্রবন্ধাকারে লিখা।

পুস্তকটি অনুবাদ করতে গিয়ে মাওলানা মিহরের সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধগুলোর সাথে যথাসম্ভব সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে এবং সর্বশ্রেণীর পাঠকবৃন্দের কাছে এ পুস্তকের বিষয়বস্তু যথাসম্ভব সহজবোধ্য করার মানসে ভাবার্থ সম্পূর্ণ ঠিক রেখে আমি মাওলানা আযাদের লেখাগুলোকে দু'একটি জায়গায় কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করেছি।

মাওলানা আযাদ তাঁর বক্তব্যকে অলংকৃত করার জন্য এমন কিছু ফারসী কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যার অর্থ হুবহু তার উর্দূ বক্তব্যেরই অনুরূপ। যেখানে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সেখানে যাতে একই কথার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য দু-একটি জায়গায় আমি কবিতার হুবহু অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ করেছি।

পাঠকবৃন্দ সূচীপত্র দেখেই যাতে পুস্তকের যাবতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারেন, সেজন্য প্রত্যেকটি প্রবন্ধের উপ-শিরোনামগুলোও আমি সূচীপত্রের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছি।

এটি একটি বিরাট অনুবাদ-কর্ম। অনুবাদ যাতে সুন্দর ও সহজবোধ্য হয় সে ব্যাপারে চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। আমার এ চেষ্টা কতটুকু সফল ও সার্থক হয়েছে তার বিচার-ভার রইলো সুধী পাঠকবৃন্দের উপর।

নিবেদক
আবদুল মতীন জালালাবাদী

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

করুণাময় পরম দুয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

প্রারম্ভিকা

এ গ্রন্থ সংকলন ও বিন্যাসের ইতিবৃত্ত

জনৈক ফার্সী কবি কী সুন্দরই না বলেছেন!

"তোমার সাথে সম্পৃক্ত হলাম, তুমি ছাড়া সবার কাছ থেকে
হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন করলাম
তোমার ভালবাসায় আপন-পরের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই।"

মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ২১ ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৫৮ সনে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রাথমিক খবরাদি থেকেই অনুমান করা গিয়েছিল, তাঁর রোগ খুবই মারাত্মক। আমি দিল্লী যাওয়ার কথাই চিন্তা করছিলাম। ২২শে ফেব্রুয়ারী এই হৃদয় বিদারক খবর এসে পৌছল যে, মাওলানা সেই জগতে পৌছে গেছেন যেখানে মৃত্যুর দ্বার অতিক্রম করা ছাড়া কারো পক্ষে পৌছানো সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। কলেজে অধ্যয়ন কালে তাঁর সাথে আমার যে নিকট সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল, তা চুয়াল্লিশ বছর পর বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে মাওলানার পার্থিব জীবনের শেষ সীমান্তে গিয়ে শেষ হয়। কে বলতে পারে যে, স্থায়ী জগতে যোগাযোগ ও সম্পর্কের ধরন কিরূপ হবে। তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক স্থাপিত হবে কি না?

মাওলানার জীবনের ভান্ডার ছিল ইল্‌ম্ ও আমল-এর বিচিত্র সব মণি-মুক্তায় ভরপুর। তাঁর এক জীবনের মধ্যে বহু জীবনের উত্তাপ ও কোলাহলের বজ্র ধ্বনি কর্মতৎপর ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলার অফুরন্ত অনুগ্রহে তাঁকে মর্যাদার যে সুউন্নত চূড়া শীর্ষে অধিষ্ঠিত করা হবে, সেখানে আমার মত অতি পাপীর পক্ষে-যার কাছে না ইলমের কোন উল্লেখযোগ্য পুঁজি আছে, আর না আমলের কোন সম্পদ অর্জিত হয়েছে- কি করে পৌছা সম্ভব হবে?

জনৈক ফার্সী কবি কী সুন্দরই না বলেছেন।

"সকল বীজ অংকুরিত হয় না, সকল উদ্দেশ্য সফল হয় না।
কিন্তু কী করব, গ্রামীণ চাষীদের জমি
যে আমার জমির পাশে।"

অর্থাৎ সকল মানুষ প্রকৃতি প্রদত্ত প্রতিভায় ফুটে উঠে না, সকলেই তার লক্ষ্যস্থলে পদার্পণ করতে পারে না। তা সত্ত্বেও পার্শ্ববর্তী লোকদের দেখাদেখি চেষ্টা-চরিত্র করতে হয়।

এই গ্রন্থ বিন্যাস এবং তাতে পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে আমার ভূমিকাও ঠিক তাই।

[দুই]

অবশ্যই একথা বলতে পারি যে, যখন থেকে জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হয়েছি তখন থেকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সত্তা এবং 'দ্বীনে হক' (সত্য ধর্ম)-এর জন্য একটি বিশেষ স্পন্দন আমার অন্তরের গভীরে আন্দোলিত হয়ে আসছে। এ তরঙ্গরাজি ঐ সময়েও বেশ তীব্র ছিল যখন আমি এর হাকীকত ও রহস্য সম্পর্কে প্রধানত: অপরিচিত ছিলাম। আজ তো তা বিশেষ ভাবেই তীব্র। কেননা, আমি এর রহস্য ও তত্ত্বাদি সম্পর্কে এখন একেবারে অনবহিত নই। এই স্পন্দনই আমার জীবনের অন্ধকার মন্যিলসমূহে সব সময় আশার আরো জ্বালিয়ে রেখেছে, প্রত্যেকটি কাজে আমার পথ প্রদর্শন করেছে এবং প্রত্যেকটি সফরে আমার জন্য পাথেয় হয়ে আছে। এটা এমন স্পন্দন যাতে ভাল কাজের বঞ্চনার মধ্যেও জীবনের সফলতা জানা যায়।

কবির ভাষায় বলতে গেলে,"এই আলোড়নের উন্মাদনায় আমি জীবন ধারণ করলাম এবং বাকি জীবন এর উপরই কাটিয়ে দেব।"

কবি মির্যা গালিব এ প্রসংগে যা কিছু বলেছেন, তা নিঃসন্দেহে আমার মত অগণিত পাপী-তাপীদেরও মনের কথা বটে। তিনি বলেন, আশায় বুক বেঁধে হা-হুতাশের মধ্য দিয়েই জীবন কাটালাম, অশ্রুপাত করতে করতে চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কিন্তু জেনে রাখবেন, এই পাপী ও মদ্যপায়ীর চিন্তার মধ্যে বক্রতা থাকলেও সে আপনার কুরআনের অনুসরণকারী, আপনার হাবীবের একজন সচেতন মংগলাকাংখী এবং আপনার দয়ার উপর আশাবাদী। অতএব আপনি তার (গালিবের) জন্য মুক্তি সনদ প্রদান করুন।

[তিন]

মাওলানা আযাদ ছিলেন জ্ঞান ও গুণের এক আশ্চর্য প্রতিচ্ছবি। তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আল্ হিলাল' ইং ১৯১৩ সনে বসন্তের মেঘপুঞ্জের মত কোলকাতার আকাশে প্রতিভাত হয়। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে তা ছিল দেশে প্রচারিত অন্যান্য পত্র-পত্রিকা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। প্রকাশিত হওয়ার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তা প্রচুর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ ধরনের জনপ্রিয়তা বা সুখ্যাতি অর্জন না ইতিপূর্বে কোন পত্র-পত্রিকার ভাগ্যে জুটেছে, আর না পরবর্তী কালে। তিনি এ পত্রিকায় কিতাব ও সুন্নাহ্‌র হাকীকত সমূহ যেরূপ আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন, তার কোন দৃষ্টান্ত এরপর আর দৃষ্টিগোচর হয়নি। জ্ঞান ও বিজ্ঞতার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ ছিল অতুলনীয়। তিনি যা কিছু লিখতেন তার মর্যাদা ছিল অনন্য। ইল্‌ম ও আমলের প্রতিটি চক্রে তাঁর এ অনন্যতা সর্বদা বিরাজমান ছিল। তাঁর ওফাত ছিল আমাদের জন্য এক অতি বেদনাদায়ক ঘটনা। আর এর চেয়েও বড় বেদনাদায়ক এই ছিল যে, তাঁর অসংখ্য ইলমী ও দ্বীনী অবদান ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়েছিল, যেগুলোকে সংকলিত ও বিন্যস্ত করার সুযোগ তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মব্যস্ততা ও তাঁর বন্দী জীবনের

অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন। বরং এই স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অনেক ইল্মী (জ্ঞানগত) সম্পদও বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর (ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে) তিনি প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকাশনা ও মুদ্রণ সংস্থাকে সম্ভব সব রকমের সহায়তা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের সম্পদরাজি বিন্যাস ও সংকলন করার জন্য কিছু করতে আসক্ত হননি।

অথচ এটা তাঁর নয়, বরং ইলম ও জ্ঞানের এমন বিরল সেবা ছিল যেগুলোকে আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য প্রত্যেক যুগে সীমাহীন প্রজ্ঞা ও পথ প্রদর্শনের পুঁজি মনে করা চাই।

[চার]

এমন বহু সংখ্যক প্রবন্ধ 'আল হিলাল'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে অথবা 'আল বালাগ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল, 'আল হিলাল' ও 'আল বালাগ'-এর প্রথম যুগ পর্যন্ত যেগুলো সাধারণ উৎসাহী পাঠকের নাগালের বাইরে ছিল। এমন কি শেষ যুগে সেই পত্রিকাগুলোর ফাইল খোদ মাওলানার কাছেও বিদ্যামান ছিল না। সর্বোপরি তাঁর লেখাগুলোকে যে ভংগিতে বিন্যস্ত করার প্রয়োজন, সে সম্পর্কে খুব কম লোকেরই ধারণা ছিল।

[পাঁচ]

মাওলানার ইন্‌তিকালের পর ভারত-সরকার এ কাজটি 'সাতহিয়া একাডেমীর' হাতে সমর্পণ করে। একাডেমী এখন পর্যন্ত বেশ যত্নের সাথে 'তায্‌কিরাহ' ও 'গুবারে খাতির' ছাড়া তিন খন্ডে তরজমানুল কুরআন প্রকাশ করেছে-যদিও 'তরজমান'এর বিন্যাসে এমন ধরনের পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, যা মাওলানার ভাব-প্রকাশের অনুকূল ছিল না এবং অনুরূপ করাটাকে কোন ভাবেই সমীচীন মনে করা যেতে পারে না। তাছাড়া এসব গ্রন্থাদি ইতিপূর্বেও বিন্যস্ত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। আসল এবং সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মরহুম মাওলানার ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত লেখা সমূহ সংগ্রহ, বিন্যাস ও প্রকাশের কাজটি। আমি ইং ১৯৫৯ সনে দিল্লী গিয়েছিলাম। তখন জানতে পারি যে, 'আল হিলাল,' 'আল বালাগ' এবং লিসানুস সিদ্‌ক্' এর প্রবন্ধ ছাড়া আরো কিছু প্রবন্ধ প্রকাশের পরিকল্পনা একাডেমীর রয়েছে। কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধকে সেগুলোর সারমর্মের আলোকে সুষ্ঠুভাবে বিন্যাস করা ছাড়া ছাপানোর মধ্যে খুব একটা সার্থকতা ছিল না। তাছাড়া যেসব প্রবন্ধ আজ থেকে কমবেশী পঞ্চাশ বছর আগে লেখা হয়েছিল এবং তাতে সময়, অবস্থা ও পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল-যদি কিছুটা বিশ্লেষণ ও টীকা টিপ্পনী ছাড়া সেগুলোকে ছাপিয়ে দেওয়া হত তাহলে তা বর্তমান অথবা অদূর ভবিষ্যতের উৎসাহী পাঠকের কাছে সহজবোধ্য থাকত না।

ভাবার্থের একান্নবর্তিতা অনুযায়ী যদি ঐ সব প্রবন্ধকে সুবিন্যস্ত করে ছাপান হত তাহলে সেগুলো এক একটি পৃথক গ্রন্থের আকার ধারণ করতে পারত, যা সর্বকালের জন্য সংরক্ষিত থাকত এবং বার বার বিনা দ্বিধায় ছাপানো যেত। কিন্তু ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলোকে এ ধরনের শ্রেণী বিন্যাস ছাড়া যদি ছাপিয়ে দেওয়া হত তাহলে না তা গ্রন্থের আকার ধারণ করত, না তার গুরুত্ব পুরাপুরি বুঝা যেত, আর না তাতে মাওলানার মুহাব্বত ও ভালবাসার ছাপ পরিদৃষ্ট হত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মূল কাজটি যথেষ্ট পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনা ছাড়া সম্পন্ন করা যেত না। তাছাড়া এজন্য অতীত অবস্থাদি-বিশেষ করে মাওলানার অবস্থাদি জানা ছিল অপরিহার্য। কেবল, সরকারের আনুকূল্যেই এ ধরণের বিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করা ছিল সম্ভব। ব্যক্তিগত উদ্যোগ যতই উত্তম হোক এধরণের একটি বিরাট পরিকল্পনার বাস্তবায়ন মোটেই সম্ভব ছিল না।

[ছয়]

আমি নিজে থেকেই এই সব বিন্যাস সম্পর্কে কিছু কিছু পরিল্পনা তৈরী করে নিয়েছিলাম। আমার মতে বেশীর ভাগ প্রবন্ধকে নীতিগতভাবে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারত। প্রথমত: ঐ সব প্রবন্ধ, যে গুলোর মর্ম একই, সেগুলোকে একই ক্রম ধারায় বিন্যস্ত করে তা পৃথক পৃথক গ্রন্থের আকারে ছাপানো যেত-যদিও তা গ্রন্থাকারে ছাপানোর উদ্দেশ্যে লিখিত বা প্রকাশিত হয়নি। দ্বিতীয়ত: ঐ সব প্রবন্ধ যেগুলোর মর্মের মধ্যে পরস্পর মিল ছিল খুবই কম, অন্য কথায় সাময়িক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যেগুলো লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছিল-যদিও 'আল হিলাল' ও 'আল বালাগ' এর মধ্যে এ ধরণের প্রবন্ধের পরিমাণ ছিল খুবই কম। এই সব প্রবন্ধের জ্ঞানগত মর্যাদা খুব একটা উঁচু স্তরের ছিল না অথবা এগুলোর সম্পর্ক ছিল সাময়িকভাবে কিছু আংশিক ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আমি সর্ব প্রথম ঐ সব প্রবন্ধ বিন্যস্ত করতে চাচ্ছিলাম যেগুলো গ্রন্থের আকার ধারণ করতে পারত। এ ধরনের বিন্যাসের চেষ্টা করা এজন্য জুরুরী ছিল যে, মাওলানার অবদানসমূহ দ্বীনের হাকীকতের দিক দিয়ে ছিল যারপর নেই গুরুত্বপূর্ণ। আর সত্যি কথা বলতে গেলে, 'আল হিলাল' ও 'আল বালাগ'-এর মধ্যে অত্যন্ত অভিনব ও বিস্ময়কর বিষয়াদি ছাপা হত, কিন্তু এই সব পত্রিকার মূল প্রাণ ছিল দাওয়াতে দ্বীন। এ কারণে আমি ব্যাকুল ছিলাম যে, এই সব প্রবন্ধ সংকলিত করে মাওলানার প্রতি আমার গভীর বিশ্বাস ও তাঁর সাহচর্য লাভের পর তাঁর অনুকম্পার যে চুয়াল্লিশ বছরের ঋণ আমার উপর রয়েছে তার অন্তত: কিছুটা পরিশোধ করব। এই ব্যাকুলতা কবি হাফিজের ভাষায় বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে, হে ভোরের পবন! প্রিয়জনের কাছ থেকে সুসংবাদ নিয়ে এসে আমার মনের চিন্তা দূর কর। কিন্তু আমার একার পক্ষে তো এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। কেননা, আমার এ ধরনের কোন সামর্থ্য ছিল না যে, ক্ষুদ্রাকারের হলেও একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সব প্রবন্ধকে একত্রে সংকলিত করার কাজ আনজাম দেব। তবে মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, যা কিছু সংকলিত ও বিন্যস্ত হয়ে যাবে প্রিয়বন্ধু শায়খ নিয়ায আহমদ (শায়খ গোলাম আলী এন্ড সন্স) সেগুলো প্রকাশের ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন।

[সাত]

নি'মাত-এর বর্ণনা হিসাবে এখানে এ কথা নিবেদন করা সম্ভবত: অসমীচীন হবে না যে, গত আঠারো-বিশ বছরের সংসার জীবনের বেদনাদায়ক অন্ধকারে যে কিরণ মালার বদৌলতে আমার চোখগুলো আলোকিত, আমার অন্তর উদ্ভাসিত এবং আমার কর্ম ক্ষমতা–যেমন ছিল, সর্বদা উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত ছিল– বস্তু জগতে এর উৎস প্রিয় শায়খ নিয়ায আহমদই ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান দিন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমার স্বভাব-প্রকৃতিকে এমন ভাবে গড়ে দিয়েছেন যে, জ্ঞানানুসন্ধান আমাকে সব সময় অস্থির করে রাখে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এ বিষয়টি আমাকে ছেড়ে যায় না। কিন্তু আমি যা চাই তা অর্জনের জন্য যে আনুকূল্যের দরকার, তা আমার ভাগ্যে জোটে নি। এর কারণ হয়ত এই যে, বর্তমান এই যুগ-আমার স্বভাব-প্রকৃতির অনুকূল ছিল না, কিংবা হয়ত এই যে, এই যুগের সাথে আমি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলাম না। এমনি অবস্থায়,বলতে গেলে ঘটনা চক্রেই আমার জীবনাকাশে শায়খ নিয়ায আহ্মদ উদিত হলেন। তিনি ছিলেন শায়খ মুবারক আলীর নিকটতম প্রিয়জন। যার সাথে গত আটান্ন বছর ধরে আমার গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং এই সম্পর্ক তখনি গড়ে উঠেছিল যখন আমি ইসলামিয়া কলেজে পড়তাম। আমি জানি না, আমার মত একজন অসহায় ব্যক্তি সম্পর্কে শায়খ নিয়ায আহ্মদের মনে কি অনুভূতির সৃষ্টি হল যে,তিনি গত আঠারো বিশ বছর ধরে শুধু আমার প্রয়োজনীয় বিষয়াদিই নয় বরং জীবনের ঐ সব ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, যা কোন মানুষের বিচলিত হওয়ার কারণ হতে পারে। মির্যা গালিব এক পত্রে লিখেছিলেন, "রিয্ক যে ভালভাবে পাচ্ছি তার শুকরিয়া আদায় করা চাই, কম পাচ্ছি সে অভিযোগ কেন?"

এই প্রেক্ষিতে বলতে পারি, আল্লাহ্ ত'আলা আমার ভালভাবে রিয্ক পাওয়ার এক মাধ্যম শায়খ নিয়ায আহমদের আকৃতিতে করেছেন। তাঁর যতই শুকরিয়া আদায় করব কমই হবে। কম পাওয়ার কথা এই জন্য কখনো চিন্তায় আসেনি যে, যখন প্রয়োজন দেখা দিত আল্লাহ্র মেহেরবানীতে পূর্ণ হয়ে যেত। এরপর কমের অভিযোগ কিম্বা বেশী লাভের চাহিদা সীমাহীন মূর্খতা ও অকৃতজ্ঞতা। আল্লাহ্র শুকরিয়া যে, জীবনে আমি এমন বন্ধুর মিনতি করেছি, যার প্রতিটি অনুগ্রহ ফুলকলির উপর ভোরের বাতাস প্রবাহের ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হয়েছে। শায়খ নিয়ায আহমদের সাথে আমার বন্ধু শায়খ বশীর আহ্মদ এবং আমার ভাই মুবারক আলীকেও যুক্ত করে নিন। এদের সাথে আমার কোন রক্ত সম্পর্ক ছিল না। আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁদের কোন খিদমত করতে পারি নি।

এতদ্সত্ত্বেও তাঁরা আমার প্রতি সর্বদা তাঁদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করে রেখেছেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি তাঁদের যে সাহায্য-সহানুভূতি পেয়ে আসছি, তা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। তাঁদের এ দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই।

আল্লাহ্ সাক্ষী, আমার প্রতি তাঁদের এই দান এতই অগণিত যে, শুধুমাত্র দু'আ করা ছাড়া তাঁদের কোন প্রতিদান দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একজন ফার্সী কবি কী সুন্দরই না বলেছেন!

আন্তরিকতার সাথে দু'আ করা ছাড়া
এই নিঃস্ব ফকিরের আর কী-ই বা করার আছে?

[আট]

যদিও সহায়ক উপাদান আমার প্রয়োজন অনুযায়ী ছিল না, তবু আমি আল্লাহ্র নাম নিয়ে এই নিয়্যতে কাজ শুরু করে দিই যে, যতটুকু সম্ভব অবশ্যই করব। আর যদি কিছুই না করতে পারি তাহলে অন্তত: মাওলানার প্রবন্ধাদি বিন্যাসের একটা নমুনা জনসমক্ষে পেশ করবো। আল্লাহ্ সহায়ক হলে ভবিষ্যতে উৎসাহী লেখকগণ একাজে আত্মনিয়োগ করে হয়ত আমার চাইতেও অধিকতর সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে তা সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন।

আমার স্মরণ ছিল যে, মাওলানা 'আল হিলাল' ও 'আল বালাগ'-এ বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছেন। তিনি রাবীউল আওয়াল উপলক্ষ্যে একটি বা দুটি কিম্বা ততোধিক প্রবন্ধ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের উপর অবশ্যই লিখতেন। এছাড়াও বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রায়ই যে সমস্ত প্রশ্ন করা হতো তিনি সেগুলোরও সন্তোষজনক জবাব দিতেন। এভাবে তিনি অনান্য নবীদের জীবন সম্পর্কেও অনেক কিছু লিখেছিলেন। বিশেষ করে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবনের উপর তিনি বিস্তৃত আলোচনা করে ছিলেন। যাহোক, আমি আমার এক বন্ধুকে ঐ সব প্রবন্ধ কপি করার কাজে লাগিয়ে দিলাম এবং কয়েক মাসের মধ্যেই কাজটি সম্পন হয়ে গেল।

আমি 'সীরাতে তাইয়্যিবা' সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলো বিন্যস্ত করে সেগুলোর একটি তালিকা তৈরী করলাম। আমি বিস্মিত হলাম এই দেখে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কল্যাণময় সত্তা সম্পর্কে লিখিত অতি মূল্যবান কিছু প্রবন্ধ ইতিমধ্যে সংগৃহীত ও বিন্যস্ত হয়ে গেছে। মাওলানার বর্ণনা-ভঙ্গি এমনি ছিল যে, যা কিছু তাঁর কলমের ডগায় আসত তা অন্তরকে বিশ্বাস ও স্বস্তির বিভিন্ন রংয়ে রঞ্জিত করে ছাড়ত এবং তাতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশই থাকত না। মূলত: মাওলানা প্রকৃতিগতভাবেই 'দায়ী'য়ে, হক' তথা সত্যের আহবানকারী ছিলেন। আর অন্তরের বিশ্বাস ও আস্থা বর্ধন একজন দায়ী'র লেখা ও বক্তৃতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। এ কারণেই মাওলানার কলম থেকে যা কিছু বের হয়েছে তার প্রত্যেকটি জিনিসই ছিল দাওয়াতের ঐ বিশেষ গুণে গুণান্বিত।

আমি এই সব প্রবন্ধের উপর প্রয়োজনীয় টীকা সংযুক্ত করেছি। যেখানে যেখানে ফাঁক রয়ে গিয়েছিল সংক্ষিপ্ত লেখার দ্বারা সে ফাঁক পূরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এভাবেই ইং ১৯৬৪ সনে মুদ্রণের জন্য পান্ডুলিপি তৈরীর কাজ হয়ে যায়।

কিন্তু আমি তাতে খুব একটা আশ্বস্ত হতে পারছিলাম না। অথচ এই গ্রন্থের ভূমিকা মাওলানার কলমেই লিখা ছিল। আমার যেন মনে হচ্ছিলো এ প্রবন্ধগুলোর উপর আরো কিছু চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। মাঝে মাঝে যে শূণ্যতা রয়ে গিয়েছিল তা পূরণ করার জন্য যে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ গুলো লিখেছিলাম তা মাওলানার বিস্তারিত প্রবন্ধগুলোর সাথে সংযোজিত হওয়ার পর মনে হচ্ছিলো যেন সেই শূণ্যতা এখানো শূণ্যতারূপেই বিরাজ করছে। কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিলাম না, কি পন্থা অবলম্বন করবো এবং কিভাবে এই শূণ্যতা পুরণ করব। একারণেই পান্ডুলিপিটি শেষ পর্যন্ত প্রেসে দেওয়া হয়নি।

পুনরায় চিন্তাভাবনা করার পর আমার ধারণা হয় যে, মাওলানার প্রবন্ধগুলোতে কিছু কিছু বিষয় অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাঁর লিখিত সীরাতের কিছু অংশ এমনও আছে, যেখানে আরো বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। এ ছাড়া আমাদের বেশীর ভাগ সীরাত লেখক তাঁদের গ্রন্থাদিতে ভৌগলিক আলোচনার দিকটি প্রায়ই এড়িয়ে গেছেন। গত বিশ পচিশ বছরে এক্ষেত্রে আমরা ভৌগলিক জ্ঞানের যে মূল্যবান উপাদানরাজির অধিকারী হয়েছি (এ ব্যাপারে ডঃ হামীদুল্লাহ্‌র দান সব চাইতে উল্লেখযোগ্য) অন্ততঃপক্ষে সেগুলোকেও এই গ্রন্থের অংশ বিশেষে পরিণত করা উচিত বলে আমি মনে করি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই চাহিদাগুলো কে পুরণ করে দেবে? সীরাত গ্রন্থাদিতে যে কমতি এখানে সেখানে অনুভূত হচ্ছে তা পূরণ করার দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করা হবে? তাছাড়া যে সব ভৌগলিক নক্‌শা ও মানচিত্র আমার অন্তরে গেঁথে আছে সেগুলো কে সরবরাহ করবে?

[নয়]

খোদ আমার জন্য এক্ষেত্রে ইতস্তত: করার দু'টি কারণ ছিল অত্যন্ত পরিস্কার। যেমন ঃ

১। মূল বিষয়ের অত্যধিক গুরুত্ব এবং এর অপরিসীম পবিত্রতার পটভূমিতে এ সম্পর্কে কিছু লিখতে যাওয়া ঐ ব্যক্তির পক্ষে ছিল দুঃসাহসিকতারই শামিল, যে ইল্‌ম ও আমল উভয় দিক দিয়ে ছিল একবারে রিক্ত হস্ত। বরং এ সম্পর্কে কিছু লেখার চিন্তা করাটাই ছিল তার অন্তরে কম্পন সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট।

২। মাওলানা যা কিছু লিখেছিলেন তা এই পরিমাণ পবিত্র, চিত্তাকর্ষক ও ঈমানবর্ধক ছিল যে, তা দেখার পর এর সাথে আরো কিছু জুড়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করতেই সম্পূর্ণ দেহ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠত।

নিজেও এরূপ লিখতে পারি না, লিখে দেবার মত লোকও পাই না। এমতাবস্থায় যদি অগ্রসর হই তাহলে হব কিভাবে?

কবি উরফী তাঁর এক কবিতায় এর একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর তা এই যে, মরু প্রান্তরের প্রশস্ততার মধ্যে মানুষ যেখানে ইচ্ছা তার পা রাখতে পারবে, এবং যেদিকে ইচ্ছা বেরিয়ে যেতে পারবে। সে তার সমগ্র জীবনকাল নতুন নতুন রাস্তা ধরার প্রচেষ্টায় কাটিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু মরু প্রান্তরের প্রশস্ততা যেমনটি ছিল তেমনটিই রয়ে যাবে।

তরবারির ধারের উপর দিয়ে কে হাঁটতে পারে ? কেননা, ধারের উপর পা রাখতেই তা দ্বিখন্ডিত হয়ে যাবে। এরপর পথিক অসহায় অবস্থায় বসে পড়বে। কবি উরফী এই হাকীকত সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। তাই রাস্তায় যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তিনি সেটাকে অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন।

[দশ]

বলা বাহুল্য, সারা জীবন লেখালেখির মধ্যেই কাটিয়ে দিয়েছি। জীবনের আটাশটি বছর যা ছিল মানসিক ও দৈহিক শক্তির শ্রেষ্ঠতম সময়কাল– সাংবাদিকতার মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছি–তাও আবার দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকতা। একদা আমার জীবনের প্রথম দিককার লেখাগুলোর একটা মোটামুটি হিসাব নিয়ে দেখেছি, যদি প্রত্যেক খন্ড মাঝারি সাইজের পাঁচশ পৃষ্ঠায় হয় তাহলে আমার লেখাগুলো গ্রন্থকারে ছাপাতে অনুরূপ আশিটি খন্ডের প্রয়োজন হবে। এতদ্ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পবিত্র জীবনের কোন একটি অংশের উপর কলম ধরাটা আমার জন্য ছিল দুঃসাহসেরই নামান্তর। তখন শায়খ সা'দীর নিম্নোক্ত কথাগুলো যেন আমার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছিলো।

"সব ক্ষেত্রে ঘোড়া দৌড়ানো যায় না,
অনেক সময় ঢালকে অবনমিত করতে হয়।"

[এগারো]

মোট কথা, মাওলানার প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কপি করিয়ে নিয়েছিলাম। ধারণা করেছিলাম শীঘ্রই তা ছাপা হয়ে যাবে। কিন্তু আমার বিন্যাসের চিন্তাধারা এমনভাবে আন্দোলিত হতে থাকল যে, তাতে প্রায় পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল এবং বাহ্যত: প্রবন্ধগুলো ছাপানোর কোন সুরাহা হলো না। শেষ পর্যন্ত চিন্তা করলাম এই শৈথিল্য আর কতদিন অব্যাহত থাকবে? আমি অত্যন্ত কষ্ট করে যে অতি মূল্যবান দ্বীনী ও ইলমী দওলত সংগ্রহ করেছি, তা এভাবে আর কতদিন অ-ব্যবহার্য অবস্থায় পড়ে থাকবে? আমি নিজেও তো এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারি। প্রথমে লিখে নিতে পারি ঐ সব অধ্যায় যা অপেক্ষাকৃত সহজ। এগুলোতে গভীর আলোচনার সম্মুখীন হতে হবে না, যাতে সামান্য বিচ্যুতিও মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নিক্ষেপ করে। যাহোক কাজ শুরু করে দিলাম এবং ধীরে ধীরে বেশ কিছু লেখা তৈরী হয়ে গেল। কোন কোন ব্যাপারে এমন কিছু প্রবন্ধও লিখে নিলাম যা আমার কাছেই কিছুটা অভিনব ঠেক্‌লো। কিন্তু আমি জুরুরী মনে করেই সেগুলো লিখি। আর যা কিছু লিখি তাতে মাওলানার সরবরাহকৃত আলোই আমাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যায়। কিংবা এতটুকু বলা যেতে পারে যে, ঐ সব লেখায় আমার ভাবব্যঞ্জনা অন্তত: মাওলানারই অনুরূপ ছিল।

[বারো]

এরপর আমি ঐ সব অধ্যায় রচনা করি, যা মাওলানার প্রবন্ধাদি অন্তর্ভুক্ত রাখে না। কেননা, মাওলানা তো আর সীরাতগ্রন্থ [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনী গ্রন্থ] লিখছিলেন না। সীরাতের যে অংশটি ঘটনাচক্রে তাঁর সামনে এসে পড়ত তিনি তার উপর প্রবন্ধ লিখতেন কিংবা এ সম্পর্কে কেউ ব্যাখ্যা চাইলে ব্যাখ্যা দিতেন। তিনি সীরাতের কোন দিকের উপর ভূমিকা বা পরিচিতি স্বরূপ কিছু লিখছেন,–এমনি সময় হয়ত তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। ফলে ঐ বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে লিখা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠল না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে, যাতে এর উপর ভিত্তি করে আমার চাইতে যোগ্য ব্যক্তিরা এ বিষয়ের উপর কিছু লিখেন। আমার লিখাগুলো তাঁদের চলার পথে পাথেয়ের কাজ দিলে তাতেই বা মন্দ কি?

[তেরো]

মাওলানার লেখার মধ্যে আমার লেখা মিশ্রিত করা, বিচিত্র রংয়ের রেশমী কাপড়ের সাথে চটের টুকরা মিশ্রিত করারই শামিল। কিন্তু এজন্য আমি বাধ্য ছিলাম। আমি এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম যে, সামনে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। তাই এক্ষেত্রে আমি ক্ষমার্হ। আমি একথাও নিবেদন করতে চাই যে, আমি আমার সবগুলো লেখার শেষে 'মুয়াল্লিফ' (সংকলক) এ শব্দটি জুড়ে দিয়েছি। যে যে প্রবন্ধে এই শব্দ জুড়ে দেওয়া হয় নি, ধরে নেবেন সে প্রবন্ধগুলো আমার নয়, বরং খোদ মাওলানার লেখা।

[চৌদ্দ]

ইল্‌ম্‌ ও আমলের এমন কোন সম্পদ আমার কাছে নেই যে, সে সম্পর্কে কোন দাবী উত্থাপন করতে পারব। রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর প্রেম ও ভালবাসায় আমার অন্তর না হয় পূর্ণ রয়েছে, কিন্তু নিজের আমলের উপর যখন একবার চোখ বুলাই তখন লজ্জায় মাথা আপনা আপনি নুয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত বিনীত নিবেদন, যদি আমার লেখার সামান্য একটি অংশও কারো অন্তরে রাসূল প্রেমের প্রদীপকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে দিতে পারে তাহলে তিনি যেন দু'আ করেন এই অধমের জন্য। আল্লাহ্‌ যেন এই অধমকে নিজগুণে মাফ করে দেন। যেখানে যেখানে ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হবে সেখানে একথা মনে রাখলে আমি চিরঋণী থাকবো যে, এসব ভুলত্রুটি মোটেই আমার ইচ্ছাকৃত নয়। আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

তিনিই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন এবং পরে তার পুনরাবর্তন ঘটান, তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশের অধিকারী ও সম্মানিত, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

ভূমিকা

সীরাতে নবভীর স্থান-১

শায়খ ইমাদুদ্দিন ওয়াস্তী

হাফিয ইবনে কাছীর তাঁর সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ায়,' শায়খ ইমাদুদ্দীন ওয়াস্তী সম্পর্কে লিখেছেন, প্রথমে তাঁর মাস্লাক (ধর্মীয় পথ)) ছিল অন্য। কিন্তু পরে তা বদলে যায়। তিনি 'ফুকাহা-ই-মুতাকাল্লিমীন' (যুক্তিবাদী ফকীহ্ বৃন্দ)-এর দলে এবং তাঁদের সংসর্গে বেড়ে উঠেছিলেন। তাই তাঁর মধ্যে তর্ক বিতর্ক ও যুক্তিবাদিতার দিকটি প্রাধান্য লাভ করেছিল। মিসর থেকে বাগদাদ যাওয়ার পর তাঁর ধ্যান ধারণার বিস্তৃতি ঘটে। যখন তিনি নিজেই নিজের হিসাব নেন তখন দেখতে পান যে, তাঁর অন্তর য়াকীন-বিশ্বাস ও শান্তি-স্বস্তি থেকে শূণ্য। এর ফলশ্রুতিতে তিনি ফুকাহা-ই- মুতাকাল্লিমীন-এর মাসলাক সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েন। এরপর ঝুকে পড়েন তাসাউ্উফের দিকে। কিন্তু সাধারণ সুফীদের সংসর্গে থেকে যে রং তামাশা প্রত্যক্ষ করেন তাতে তাঁর তবীয়ত ও মানসিকতা আরো ঘোলাটে হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত দামিশকে এসে তিনি ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংসর্গে অবস্থান গ্রহণ করেন।

ইবনে তাইমিয়ার নির্দেশ

খোদ শায়খ ইমাদুদ্দীন ওয়াস্তী বলেন, আমি দামিশকে পৌঁছে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করি। বলা হয়ে থাকে যে, যেদিন শায়খ ওয়াস্তী প্রথম বারের মত ইবনে তাইমিয়ার পাঠদান ক্লাশে হাযির হন সেদিন ঘটনাক্রমে তিনি (ইবনে তাইমিয়া) ইল্মে কালাম সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলছিলেন, এ বিশ্বে মুতাকাল্লিমীন ও দার্শনিকদের চাইতে অধিক বিচলিত, বঞ্চিত এবং হৃদয়ের স্বস্তি ও রূহের আনন্দের স্বাদ থেকে অজ্ঞ আর কোন দল নেই। এরপর তিনি প্রবীণ ও বিখ্যাত দার্শনিকদের কয়েকটি উক্তি সবার সামনে উপস্থাপিত করেন। সেগুলোতে স্বয়ং দার্শনিকরা নিজেদের অস্তিত্বের উপর অজ্ঞতা, বিফলতা ও অসহায়তার সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন।

শায়খ ওয়াস্তীর ভাষায়, ঐ একই সংসর্গে (সাক্ষ্যাতে) আমার যাবতীয় সন্দেহ -সংশয় ও অসহায়তা দূর হয়ে গেল এবং আমার অন্তর লাভ করল য়াকীন-বিশ্বাস ও শান্তি-স্বস্তির স্বাদ। অতএব যখন ইমাম ইবনে তাইমিয়া আমার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হলেন তখন তিনি ওসীয়ত করলেন, "সব কিছু ছেড়ে শুধুমাত্র 'সীরাতুন্নবী' অধ্যয়ন কর এবং এর উপর চিন্তা-গবেষণাকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নাও। ঈমান-বিশ্বাসের যাবতীয় ব্যাধি থেকে নিরাময় লাভের একটাই হচ্ছে মোক্ষম ব্যবস্থাপত্র।" এ বিষয়টিকে আমি আমার প্রাণের সংগী করে নিয়েছি। এরপর আমি যা কিছু পেয়েছি এর মাধ্যমেই পেয়েছি।

সন্দেহ-সংশয়ের একমাত্র চিকিৎসা

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার এই ওসীয়ত সম্পর্কে মাওলানা বলেন, 'মোটকথা, এই ঘটনার মধ্যে অনুধাবনযোগ্য বিষয় হলো ঐ প্রেম ও আসক্তি, যা বিশেষ করে 'সীরাতুন্নবী'-এর সাথে ইবনে তাইমিয়ার ছিল। যারা যে কোন

বিষয়কে হালকা নযরে দেখেন তারা তো এটাকে একটা সাধারণ ঘটনা বলেই মনে করবেন, কিন্তু যারা দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন তারা এই একটি কথা দ্বারাই বুঝে নিতে পারবেন ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ইল্‌ম ও আমল সমূহের কেন্দ্রভূমি কোথায়।

জ্ঞান ও দূরদর্শিতার মূল উৎস

ইমাম ইবনে তাইমিয়া একজন জ্ঞানী; অথচ সন্দেহ-সংশয়ে পতিত ব্যক্তিকে যিনি জ্ঞান-পাপীদের পাল্লায় পড়ে তার য়াকী- বিশ্বাস ও শান্তি-স্বস্তি খুইয়ে বসেছিলেন-এই ওসীয়ত করেন যে, তিনি যেন সব কিছু পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র নবী (স)-এর পবিত্র জীবন অধ্যয়ন এবং তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। অন্যকথায়, তিনি তাকে পরিস্কার ভাষায় বলে দিলেন, জ্ঞান ও দূরদর্শিতার মূল উৎস হচ্ছে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র জীবন, যেটাকে পবিত্র কুরআন 'আল হিকমত' আখ্যা দিয়েছে।

يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ ج وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

"তিনি যাকে ইচ্ছা 'হিকমত' (যাবতীয় বিষয় বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানা) প্রদান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়" (২ ঃ ২৬৯)

এই হিকমতকে বাদ দিলে দুনিয়ায় সত্যিকার হিকমতের আর কোন অস্তিত্বই থাকে না। 'হিকমত' হয় খোদ মিনহাজ ও সুন্নাতে নুবুওয়াতের নাম, নয়ত জ্ঞান ও বিজ্ঞতার এমন প্রত্যেকটি কথা,যা সুন্নাতে নুবুওয়াত থেকে নেওয়া। এই হিকমত হচ্ছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার মানুষের জন্য সর্ববিধ কল্যাণ এবং রোগ নিরাময়ের সেই ব্যবস্থাপত্র, যার মাধ্যমে যাবতীয় রোগ-ব্যাধি দূর হতে পারে– চাই সে রোগ সন্দেহ-সংশয়ের হোক, চাই চিন্তা ভাবনার হোক, চাই জানার বৈকল্য জনিত হোক, আর চাই না জানার আবরণ সম্বন্দীয় হোক।

ফার্সী কবি কী সুন্দরই না বলেছেন!

"যে কোন ব্যক্তি যে কোন ব্যাধির অভিযোগ করুক না কেন, তাকে শুধু শরাব (রাসূল প্রেমের সুধা)-ই পান করানো হবে।"

"রোগ যাই হোক না কেন, তার চিকিৎসালয় মাত্র একটি। আর তা হচ্ছে(রাসূল প্রেমের) শরাব খানা।"

শব্দ ভিন্ন, মর্মার্থ এক

নাম যতই বিভিন্ন হোক, নামধারী কিন্তু এক। যেমন 'সুন্নাহ ও সীরাত'-এর স্থলে যদি 'কুরআন ও কিতাব' বলা হয় তাহলে নাম দু'টা হল, কিন্তু নামধারী একই থেকে গেল। যেমন মধুকে 'শাহ্‌দ' বল অথবা 'আ'সল' বল, মধু তো মধুই থাকলো। আরবী কবির ভাষায়—

عباراتنا شتى وحسنك واحد!

"আমাদের বাক্য রংবেরংয়ের, কিন্তু তোমার সৌন্দর্য ঐ একই।"

অনুরূপ ভাবে রাসূল (সা)-এর বাণী–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ-

–তোমরা আমার সুন্নাত এবং 'খুলাফা-ই-রাশিদীন'এর সুন্নাতকে নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নাও।

আল্লাহ্‌র বাণী–

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ط

"(তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে ....) এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিথ হয়নি।" (৬২ ঃ ৩)

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا .

"কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে– সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ– যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন– তাদের সংগী হবে এবং তারা কত উত্তম সংগী।" (৪ ঃ ৬৯)

এবং রাসূল্ (সা)-এর বাণী–

مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ -

"যে রাস্তার উপর আমি আছি এবং আমার সাহাবীরা আছে।"

অর্থ ও নির্দেশের দিক থেকে একটি হচ্ছে সার্বিক ও অন্যটি আংশিক, একটি মুল এবং অপরটি শাখা–কিংবা একটি হচ্ছে সূর্য এবং অন্যটি তারকা। আলো একই যদিও তা চন্দ্র এবং একই থেকে আগত থেকেও পাওয়া যায় এবং ঝলমলে তারকা থেকেও পাওয়া যায়... যদি এই দুই অবস্থা না হয় তাহলে যা কিছু আছে তা জ্ঞানও নয়, নিরাময়ও নয়–বরং তা হচ্ছে মূর্খতা ও ব্যাধি– যদিও আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই দুনিয়ার বেশীর ভাগ অংশে ঐ জাতীয় রোগীরাই বাস করে, যারা ব্যাধির সন্ধানকে নিরাময়ের সন্ধান মনে করে এবং বিষকে মনে করে ওষুধ। এরপর স্মরণ রাখা চাই যে, এই একই অর্থ হচ্ছে পূর্বতবী বিজ্ঞজনদের ঐ কথার, যাতে বলা হয়েছে, যে ইল্‌মের মধ্যে -اَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا নেই – অর্থাৎ যে জ্ঞানে ইলমে হাদীসের চর্চা নেই সে জ্ঞান জ্ঞানই নয় বরং কুমন্ত্রণা ও পথভ্রষ্টতা.... আর এই একই অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঐ বাণীর, যাতে বলা হয়েছে, জ্ঞান শুধু তিনটি। এছাড়া যা আছে তা 'ফয্‌ল' (অতিরিক্ত)। আর এই তিনটি জ্ঞান হচ্ছে আয়াতে মুহকামা, সুন্নাতে কায়িমাহ এবং ফরিয়া-ই-আদিলাহ। এটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণীগুলোর অন্যতম। ইল্‌মের হাকীকত, সীমারেখা, লক্ষ্যাদি, স্তরসমূহ ও শাখা -প্রশাখা সম্পর্কে যা কিছু বলা যেতে পারে, তার সবকিছুই এই তিন কথার মধ্যে বলে দেওয়া হয়েছে....।

দু'টি মৌলিক ব্যাধি

কালব ও রূহের যত ধরনের ব্যাধি আছে, তার মূল উৎস হচ্ছে দু'টি। একটি হচ্ছে ইলহাদ (অস্বীকার)। আর অপরটি হচ্ছে তাওয়াহ্হুম (সন্দেহ-সংশয়)। বাকি যত ব্যাধি আছে তার সবগুলোই হচ্ছে এ দু'টির অধীনস্থ, পার্শ প্রতিক্রিয়া ও শাখা-প্রশাখা। আর এ দু'টির মধ্যে ব্যাধি প্রকাশের আলামত, ক্রিয়া ও পরিণতিতে মিল রয়েছে। অর্থাৎ উভয় প্রকার ব্যাধির ফলশ্রুতি হচ্ছে সন্দেহ -সংশয়, অজ্ঞতা, অন্তরের অশান্তি ও অস্বস্তির–যাকে কুরআনের ভাষায় বলা যেতে পারে 'নাফসে মুতমায়িন্নাহ্' (প্রশান্ত চিত্ত)-কে হারিয়ে ফেলা।

অতএব আল্লাহ্‌র ওহী, নবীর হুকুম এবং এতদ সংশ্লিষ্ট যা কিছু আছে তাই হচ্ছে য়াকীন (বিশ্বাস), বুরহান (দলীল) বাসীরত (সূক্ষ্মদর্শিতা) এবং ফুরকান (সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী)। এবং এগুলো ছাড়া যা কিছু আছে

তা সন্দেহ, সংশয়, অজ্ঞতা, অদূরদর্শিতা, কল্পনার অনুসরণ ও অনুমান ভিত্তিক কথা ছাড়া কিছু নয়। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَقَالُوْا مَا هِىَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ .

"ওরা বলে একমাত্র দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি (অর্থাৎ আমাদের জীবিত থাকা ও মৃত্যু বরণ করা ওটা তো এই পৃথিবীতেই। এ পৃথিবীতে মৃত্যু হলে সব শেষ; আবার জীবিত হওয়া অথবা পুনরুত্থান এসব কথা, অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য)। আর কাল-ই আমাদেরকে ধ্বংস করে। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নেই। ওরা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।"–(৪৫ ঃ ২৪)

بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ -

"বস্তুত: ওরা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাসিঠাট্টা করছে।" (৪৪-৯)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلاَ هُدًى وَّلاَ كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ . ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, তদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশক, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব। সে বিতন্ডা করে ঘাড় বাঁকিয়ে লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ হতে ভ্রষ্ট করার জন্যে"–(২২ঃ৮-৯)

فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ تَخْرُصُوْنَ .

"তোমাদের নিকট কোন যুক্তি আছে কি? থাকলে আমার আছে তা পেশ করো, তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু মিথ্যাই বলো।" (৬ ঃ ১৪৮)

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ .

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক-প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তার ন্যায়, যার কাছে নিজের মন্দ কর্মগুলো শোভন প্রতীয়মান হয়, এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?" –(৪৭ ঃ ১৪)

وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ط اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ ج وَاِنَّ الظَّنَّ لاَيُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا .

"এ বিষয়ে ওদের কোন জ্ঞান নেই, ওরা কেবল অমানুষের অনুসরণ করে; সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই।" –(৫৩ ঃ২৮)

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ -

"বলো, এটাই আমার পথ ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আমি আহবান করি সজ্ঞানে-আমি এবং আমার অনুসারীরাও।" -(১২ ঃ১০৮)

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهُ ـ

"পরন্তু ওরা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করেনি তা অস্বীকার করে এবং এখনো এর পরিনাম ওদের কাছে উপস্থিত হয়নি।"-(১০ ঃ৩৯)

مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلاَّ اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ ـ

"তাকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতকগুলো নামের ইবাদত করছ, যে নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নি। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই।" -(১২ ঃ৪০)

এ কারণেই শেষ দীন ও পরিপূর্ণ শরীয়ত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বেশীর ভাগ ভাষণে এই সাধারণ ঘোষণা পাওয়া যায় যে, জগতের চরম জেহালতের সময় তার আবির্ভাব এজন্য হয়েছে, যাতে তিনি দুনিয়াকে জ্ঞান ও আলো দ্বারা ভরে দেন। মদীনার প্রথম জুমুআর খুতবায় ইয়াকীন ও সন্দেহ-সংশয় দূর করার জন্য বিশেষভাবে বলেন-

ارسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس اخرجه الحاكم على شرط الصحيحين والطبرى فى تاريخه ـ

"তিনিই মুহাম্মদ (সা)-কে হেদায়াত, আলো ও উপদেশসহ পাঠিয়েছেন এমন এক যুগে, যখন দীর্ঘদিন থেকে দুনিয়ায় কোন রাসূলের আগমন হয়নি এবং যখন জ্ঞান লোপ পেয়েছিল ও পথভ্রষ্টতা বেড়ে গিয়েছিল(হাকেম, তাবারী)।"

অতএব একথা পরিস্কার যে, তথাকথিত যে জ্ঞানের সারাংশ ধ্যান-ধারণার অন্ধকার ও সন্দেহ-সংশয়ের চেয়ে বেশী কিছু নয়, সে জ্ঞান কি করে য়াকীন-বিশ্বাসের রোগীকে আরোগ্য করে তুলতে পারে ? অন্য কথায়, যে নিজেই পথভ্রষ্ট, সে অন্যান্য পথভ্রষ্টকে কী করে পথ দেখাতে পারে?

بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا قف بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُوْنَ .

"ওরা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ, বরং এ বিষয়ে ওরা অন্ধ।"-(২৭ ঃ৬৬)

রোগ নিরাময় পদ্ধতি

রোগের প্রার্দুভাব ঘটিয়ে নয়, বরং যথার্থ ওষুধ দিয়ে রোগ নিরাময় করা যেতে পারে। য়াকীন (বিশ্বাস) ও বাসীরত(জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি) থেকে বঞ্চিত হওয়া যদি দুনিয়ার মূল রোগ হয় তাহলে এর চিকিৎসা ঐ ব্যক্তি কী করে করতে পারে, যে নিজে ঘোষণা করে যে, আমাদের চিন্তা ও অনুভূতির দৌড় এর চাইতে বেশী নয় যে, لاَ اَدْرِىْ وَلاَ اَعْلَمُ (জানি না এবং বলতে পারি না এটা কি করে কিসের জন্য)? যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كَافِرِيْنَ -

"এবং তারা নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফির ছিল"-(৭ ঃ ৩৭।)

অর্থাৎ তারা নিজেরাই সাক্ষ্য দেবে যে,তাদের জ্ঞানের শেষ সীমা জেহেল ও অজ্ঞতার চাইতে বেশী কিছু ছিল না। পবিত্র কুরআনের ভাষায়-

اِنْ نَظُنُّ اِلاَّ ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ٠

"আমরা মনে করি এটি একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।"-৪৫ ঃ ৩২)

যদি রোগরে চিকিৎসা ও ব্যবস্থা পত্রের ফলশ্রুতি অন্তরের সুস্থতা হয়, তাহলে তো তা শুধুমাত্র সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও প্রাখ্যত বান্দার আরোগ্য নিকেতনে পাওয়া যেতে পারে, যিনি সন্দেহ-সংশয়ের স্থলে য়াকীনের, অন্ধকারের স্থলে আলোর, জ্ঞান শূন্যতার স্থলে জ্ঞান ও দূর দৃষ্টির, কিয়াস ও অনুমানের স্থলে দলীল, হুজ্জাত, বুরহান ও ফুরকান এবং উরওয়াতুল উছফা'(মজবুত হাতল)-এর সন্ধান দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ তাঁরই চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে, যিনি 'আমি জানি না ও বুঝি না' এর স্থলে 'আমি জানি' ও 'আমি আমার প্রভুর দলীলের উপর আছি' বলেন এবং দাবী করেন 'আমি দেখেছি এবং শুনেছি' আর সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেন,

هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ط

"এটাই আমার পথঃ আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে আমি আহবান করি সজ্ঞানে-আমি এবং আমার অনুসারীরাও।" (১২ ঃ ১০৮)

এবং সমগ্র অস্বীকারকারী (কাফির) কে বার বার চ্যালেঞ্জ দেন এই মর্মে যে,

هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا -

"তোমাদের কাছে কোন জ্ঞান আছে কি? থাকলে আমার কাছে তা পেশ কর।" -(৬ ঃ১৪৮)

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ইলম ও য়াকীনের দিকে এবং মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এরপর তোমাদের কাছে কি ইল্ম্ ও য়াকীনের এবং জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির এমন কোন পথ আছে, যা তোমরা বিশ্বের সামনে পেশ করতে পার?

জ্ঞান ও জ্ঞানহীনতা

هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ط

"অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? "-(৬ ঃ৫০)

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ -

"যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি সমান?" - (৩৯ ঃ ৯)

এবং একজন বলে, 'আমার কাছে আছে সন্দেহ-সংশয়; যদি তুমি আমার দিকে আস তাহলে সন্দেহ-সংশয় দিয়ে তোমার মন ভরে দেব।

অন্যজন বলে, আমার কাছে য়াকীন (বিশ্বাস) ও বুরহান (দলীল) ছাড়া অন্য কিছু নেই-

لَايَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ط تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۔

"কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না-সম্মুখ থেকেও নয়, পেছন থেকেও নয়। (কেননা) এটা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ন।" -(৪১ ঃ৪২)

بَلْ هُوَ آيٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِي صُدُوْرِ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ ۔

"বস্তুত: যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন।" -(২৯ ঃ ৪৯)

সে আরো বলছে, আমি সবচেয়ে মজবুত, সমচেয়ে পরিস্কার এবং সবচেয়ে সহজ-সরল রাস্তায় রয়েছি-

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ۔

"এবং এই পথই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না- করলে ওটা তোমাদেরকে তার পথ হতে বিছিন্ন করবে।"-(৬ ঃ ১৫৩)

এমতাবস্থায় বিশ্ববাসী, যারা শান্তির কাঙ্গাল, স্বস্তির পিয়াসী(তৃষ্ণার্ত), মনের সন্দেহ-সংশয়ের আঘাতে জর্জরিত তারা কার পক্ষ নেবে, কার অনুসরণ করবে? তারা কি ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করবে যে নিজেই সন্দেহ সংশয়ের অন্ধাকারে ঠোকর খাচ্ছে এবং অন্ধকার থেকে বের হতে গিয়ে অন্য অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, আর সে অন্ধকারের অবস্থা এই যে, তাতে সে নিজের হাতটি নিজেই দেখতে পাচ্ছে না-

أَوْ كَظُلُمٰتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌ م بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّوْرٍ ۔

"অথবা গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ, যাকে আচ্ছন্ন করে তরংগের উপর তরংগ,যার উর্ধে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকার পুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমন কি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোন জ্যোতিই নেই।"-(২৪ ঃ ৪০)

অর্থাৎ সে হাকীকত পর্যন্ত পৌছার জন্য এবং অস্তিত্বের আকীদাকে বুঝার জন্য যখন চেষ্টা করে তখন তার অবস্থা এই হয় যে, প্রত্যেকটি নতুন ধাপ তাকে এক নতুন পথ-ভ্রষ্টতার পয়গাম শুনায় এবং তার প্রত্যেকটি মনযিল হয় হতাশা ও নিরাশার। সে যে দর্শনে গিয়ে থামে, যে থিওরীকে মানে সেই য়াকীনের স্থলে তাকে নতুন আরেকটি সন্দেহ-সংশয়ের প্রতি আহবান জানায় এবং জিজ্ঞাসার উত্তর দেহওয়ার পরিবর্তে তার অন্তরে নতুন আরেকটি জিজ্ঞার সৃষ্টি করে। এভাবে তার সব আশা ও সব আনন্দ ঐ পিপাসার্ত ব্যক্তির আশায় পরিণত হয়, যে আফ্রিকার মরুভূমির মরীচিকাকে দজলা ও ফুরাত মনে করে সে দিকে উর্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়-

كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً ط حَتّٰى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ۔

"মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু নয়।"–(২৪ ঃ ৩৯)

কার আঁচল ধরা উচিত?

অতএব সে পথ হারিয়ে ফেলেছে যে পথ পাওয়ার জন্য কি তারই মত পথভোলাদের আঁচল ধরবে? অথচ

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ .

"অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই দুর্বল।"-(২২ঃ৭৩)

لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ .

"কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এই সহচর।"(২২ ঃ ১৩)

নাকি নির্দ্বিধায় তাকে অনুসরণ করবে, যার সব ডাক ও সব পয়গামের ভিত্তি এই যে, আমি অন্ধকার নই, বরং আপাদ মস্তক নূর ও আলো, যে অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ায় ও হাবুডুবু খায়, আমি সে নই, বরং আমি হচ্ছি মারিফাত ও শাহাদতের আলোয় আলোকিত। আমার দাওয়াত হচ্ছে দুপুরের উদ্ভাসিত আলোর মধ্যে প্রতিটি অনু দেখা ও পাওয়ার ন্যায় উজ্জ্বল। রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ ছিল এই–"হে আল্লাহ্! আমার অন্তরে নূর দাও, আমার জিহবায় নূর দাও, আমার কানে নূর দাও, আমার নীচে নূর দাও। হে আল্লাহ! আমাকে নূর দাও।"–আর আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে বলা হয়েছে–

مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى .

"তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।"-(৫৩ঃ১৭)

আমি শুধু তাঁর(মহান প্রভুর) সন্ধান রাখি না; বরং তিনি আমাকে দেখাশুনা করেন এবং আমার সামনে তিনি দৃশ্যমান।

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى .

"এরপর সে তাঁর নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী, ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম।"–(৫৩ঃ৮-৯)

ঈমান ও য়াকীন

তোমরা নিজেদের অসহায়তা ও অযোগ্যতার কারণে তার নাম রেখে দিয়েছ 'মা-ফাওকাল্ ইদরাক' (অনুভূতির বাইরের বস্তু) এবং 'গায়ব' (অদৃশ্য)। অথচ এখানে তার 'শুহূদ ও রুইয়াত'–এর অবস্থা এই যে, তার উল্লেখই 'শাহাদত' শব্দ দ্বারা করা হয়ে থাকে, যার অর্থ উপস্থিতি এবং দেখা।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ .

"আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, ফিরিশতারা এবং জ্ঞানীরাও, আল্লাহ্ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত।"–(৩ঃ১৮)

তোমরা তাকে তলব করাকে 'ধারণা ও অনুমান' দ্বারা ব্যাখ্যা কর। কেননা, এর আগে আর তোমরা অগ্রসর হতে পার না।

ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط

"যদিও কাফিরদের ধারণা তাই,"-(৩৮ঃ২৭)

এখানে ধারণা ও কল্পনা কেন? ধারণাকে তো এখানে জীবন (হিদায়াত)-এর গন্ডীর বাইরে এবং মৃত্যু (কুফর)-এর সমপর্যায়ের মনে করা হয়। এখানে তো তার সম্পর্কে যা কিছু বলা ও বোঝা যায়, তার নামই হচ্ছে ঈমান ও য়াকীন।

মোটকথা, ইবনে তাইমিয়া(র)-এমন একটি হাকীকত-সন্ধানী মনকে, যা সন্দেহ ও সংশয়কারীদের সংসর্গে থেকে সংশয় ও দুশ্চিন্তার প্রান্তরে লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছিল, তাকে ঐ সব কথার কিছুই বলেন নি, যা অন্য লোকেরা বলতে পারত, বরং শুধুমাত্র এই ওসীয়ত করেন যে, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন কর। এই ব্যবস্থাপত্রই হচ্ছে সন্দেহ -সংশয়ের যাবতীয় দুঃখ-ব্যথার একমাত্র চিকিৎসা। এরপর তিনি তার সমগ্র গ্রন্থাদিতেও এ জিনিসটিকে হরেক রকম জ্ঞান ও বিশ্বাসের ভিত্তি এবং উৎস বলে বর্ণনা করেছেন।

সীরাতে নবভীর স্থান-২

কুরআন ও সীরাত

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, শুধু এই যুগে নয়, বরং দুনিয়া যতদিন পর্যন্ত টিকে থাকবে, ততদিন 'সাহিবে কুরআন'[মুহাম্মদ(সা)]এর পবিত্র সীরাত ও জীবন-চরিত অধ্যয়নের চাইতে, মানব জাতির হৃদয় ও আত্মার যাবতীয় রোগব্যধির অন্য কোন চিকিৎসা নেই। ইসলামের চিরন্তন মু'জিযা এবং পরিত্র কুরআনের চিরকালের 'বলিষ্ঠ দলীলের পর যদি অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বস্তু থাকে তাহলে তা হচ্ছে 'সাহিবে কুরআন'তথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সীরাত। মুলত: কুরআন ও সীরাতুন্নবী, অর্থের দিক দিয়ে একই বস্তু। কুরআন হচ্ছে মতন (বচন) এবং সীরাত হচ্ছে তার আমল। কুরআন কাগজে লিখিত ও হাফিযগণের বক্ষে সংরক্ষিত। আর সীরাত হচ্ছে একটি জীবন্ত ও আকৃতিবিশিষ্ট কুরআন, যাকে ইয়াছরিবের পথে-প্রান্তরে চলাফেরা করতে দেখা যেত। যেমন হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা(রা) বলেছিলেন, তাঁর চরিত্র হচ্ছে আল কুরআন। একজন ফার্সী কবি কী সুন্দরই না বলেছেন!

"আমরা দুই প্রাণ এক দেহ এসেছি
আমি কে? লাইলা কে?-আমি।"

আম্বিয়া কিরামের জীবন কথার চাইতে য়াকীন ও ঈমানের আহবান আর কী হতে পারে? কোন সমর্থ ব্যক্তি যদি সীরাতে নবভীর একটি ক্ষুদ্রতর টুকরাও নিজের সামনে রাখে তাহলে সন্দেহ-সংশয় কখানো তার মন-প্রাণকে ধ্বংসের মুখোমুখি নিয়ে দাঁড় করাতে পারবে না। এ কারণেই পবিত্র কুরআনের সর্বত্র আম্বিয়া কিরামের জীবন ও অস্তিত্বকে একাট হুজ্জত, বুরহান বা দলীল হিসাবে পেশ করা হয়েছে- কেচ্ছাকাহিনী, অতীতের জ্ঞান কিংবা অদৃশ্যের খবর হিসাবে সেগুলোকে পেশ করা হয়নি, যেমন সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে।

আম্বিয়া (আ)-এর জীবন ও কুরআন

কুরআনের খোলাখুলি দাবী এই যে, প্রত্যেক নবীর জীবন যেভাবে শুরু হয়েছে, যেভাবে শেষ হয়েছে, যা কিছু তাঁদের উপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে, এবং মৌখিকভাবে বা কার্যত: যা কিছু তার সাথে সম্পর্ক রাখে, তার প্রত্যেকটি কথাই স্বয়ং এক একটি দলীল এবং ন্যায় ও সত্যের এক একটি সাক্ষী। এর চাইতে উৎকৃষ্ট ও অকাট্য কোন দলীল নেই এই হাকীকত প্রমাণের জন্য যে, আল্লাহ্ আছেন এবং যাবতীয় উৎকৃষ্ট ও সুন্দর গুণাবলীতে তিনি গুণান্বিত। তিনি যেভাবে অস্তিত্বের জগত এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তা বানিয়েছেন, সেভাবে এই জগতের জন্য আইন-কানূন এবং কাজকর্ম ও তার ফলশ্রুতির মাপকাঠিও তৈরী করেছেন এবং তিনি সর্বাবস্থায় অটল তথা চিরবিদ্যমান। দুনিয়ার মানুষ যে জিনিসের উপর অধিক থেকে অধিকতর এবং অকাট্য থেকে অকাট্যতর বিশ্বাস রাখে এবং যে সমস্ত মাধ্যম দ্বারা এগুলোকে নিশ্চিত বলে মানে, কুরআনের এই দলীল সেসবগুলোর চাইতে অধিকতর অকাট্য এবং সব চাইতে বেশী পরিস্কার ও মজবুত। যদি য়াকীন -বিশ্বাসের জন্য এই দলীল যথেষ্ট না হয় তাহলে তো এই দুনিয়ায় য়াকীন-বিশ্বাসের কোন অস্তিত্বই নেই, এমন কি ভরা দুপুরের উজ্জ্বল সূর্যেরও কোন অস্তিত্ব

নেই-অস্তিত্ব নেই সেই বাতাসেরও, যে দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর পরশ বুলিয়ে প্রবাহিত হয়। যদি তোমরা বল যে, দুনিয়ায় শুধু ঐ সব জিনিস মানতে হবে, যা নিশ্চিত ও ধরা-ছোঁয়ার দ্বারা প্রমাণিত–অন্য কথায়, যাবতীয় ই'তিকাদ ও বিশ্বাসের জন্য তোমরা যদি শুধু সম্ভাবনাকে যথেষ্ট মনে না কর এবং তা ধরা-ছোঁয়ার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এমনভাবে দেখতে চাও তাহলেও 'পবিত্র কালিমা' ও পুণ্য কর্মের চাইতে অধিক প্রমাণিত আর কী হাকীকত আছে বা থাকতে পারে? স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্ব এবং তোমাদের আমিত্ব এর চাইতে অধিক প্রমাণিত ও সাক্ষ্যদানকারী নয়।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে '"দাওয়াত ইলাল ওহী'(ওহীর প্রতি আহবান)কে 'আল কাউলুছ্ ছাবিত,'দ্বীনে কাইয়িম' 'আল ওয়াকি', 'আছ ছাবিত' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করার কারণ এটাই। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ অন্য পথে চলে গেছে।

হুজ্জাতে কায়িমাহ্ বা প্রতিষ্ঠিত দলীল

মোটকথা, নূহ(আ)-এর অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ইতিবাচক দলীল। হযরত ইবরাহীম (আ) আপন সত্তার মধ্যে স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠিত দলীল এবং একটি পরিপূর্ণ নিদর্শন। হযরত মূসা (আ)-এর সমগ্র জীবন শুধুমাত্র একটি কথায় বলে দেওয়া যেতে পারে। আর তা হলো বুরহানে মুহকাম (সুদৃঢ় দলীল)। অনুরূপভাবে সব নবী ও রাসূল এবং তাঁদের অনুসরণ ও সংসর্গের কারণে সমগ্র সত্যবাদী আত্মা, সমগ্র দিদ্দীক, শহীদ ও সালিহের জীবন এবং সে জীবনের মটনারাজি ও কর্মসমূহ স্বয়ং এক একটি পৃথক দলীল ও বুরহানে হক।

অনুরূপভাবে প্রত্যেক নবীর একক অস্তিত্ব শত শত দলীল ও হাজার হাজার সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত সার। এজন্য পবিত্র কুরআন সাক্ষী স্বরূপ ও দলীল স্বরূপ তাদের উল্লেখ করে এবং তাঁদেরকে আয়াত (নিদর্শন) ও বাইয়িনাহ্ (স্পষ্ট দলীল) হিসাবে চিহ্নিত করে। অনুরূপভাবে নবীদের জীবন এবং তাঁরা যে সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছেন তার প্রত্যেকটি উপদেশ ও কাহিনীর মধ্যে বিশ্ববাসীর জন্য হাজার হাজার দলীল ও উজ্জ্বল প্রমাণ রয়েছে। বিশেষ করে এ কারণেই পবিত্র কুরআন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর পবিত্র জীবনকে একটি পৃথক দলীল ও প্রতিষ্ঠিত সাক্ষী হিসাবে বিভিন্ন স্থানে উপস্থাপন করেছে এবং তাঁর জীবনের ঘটনারাজি ও দিনগুলোর প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, বিভিন্ন প্রেক্ষিত ও বিভিন্ন যোগসূত্র থেকে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং প্রায় জায়গাই যেন এরকমই রয়েছে–

"(নিজের) প্রেমের কাহিনী অন্যের গল্প ও কেচ্ছার মাধ্যমে ব্যক্ত করা।"

এরূপ ইঙ্গিতে বর্ণনা এমন এক বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করে, যা রহস্য অভিজ্ঞ, উৎসগী ও আনন্দপ্রিয় লোকের জন্য নয়ন তৃপ্তিকর ও মনে প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করে।

এ সম্পর্কে বিজ্ঞ ও রহস্যাবিদগণ বলেন, 'বিসমিল্লাহ' শব্দের 'বা' থেকে শুরু করে 'ওয়ান্নাস' শব্দের সীন পর্যন্ত যা কিছু আছে– চাই তা মূসা কালিমুল্লাহ্ (আ)-এর গল্প হোক অথবা সত্যবাদী ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী–এগুলোর উদ্দেশ্য একই। নাম অন্যান্যদের হলেও বাক্যের গতি তাঁরই [মুহাম্মদ (সা)-এর] দিকে। জনৈক কবি বলেছেন–

"চোখের দৃষ্টি আকাশ পানে
এবং কথার দৃষ্টি তোমার পানে।"

উর্দূ ভাষায় জনৈক কবি কত সুন্দর বলেছেন,

"কবির লেখায় তার নাম আসমান নির্ধারণ করেছেন।"

والكناية ابلغ والذ من التصريح .

অর্থাৎ বিশদভাবে বলার চেয়ে ইঙ্গিতে বলা অধিক বলিষ্ঠ ও স্বাদপূর্ণ।

একজন ফার্সী কবি বলেছেন–

'কালের সুন্দরীদের কেচ্ছকাহিনী চিত্তাকর্ষক।

তুমি তো ইউসুফ–

তোমার কাহিনী সব কাহিনীর সেরা।

পরিপূর্ণ মিল

যদি এ কথাকে ইঙ্গিতসূচক কথার বাইরেও রাখা যায় তবু এর সত্যতার ব্যাপারে কোন কথা উঠবে না। যখন সকল নবীদের অস্তিত্বের মূল এক, তাঁদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক, তাঁদের ঘটনারাজি আংশিক ও সর্বাঙ্গীনভাবে নুবুওয়াতের একই ধারার বিভিন্ন কড়ি এবং একই রং একই আকার বিশিষ্ট, তখন তাঁরা,একে অন্যের সদৃশ ও একই ধরনের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যদি শিকলের একটি কড়িকে সরিয়ে ফেলা হয় তাহলে অপর একটি কড়ি সে জায়গায় ঠিক খাপ খেয়ে যাবে। আর জানা কথা যে, এই শিকলের শেষ কড়ি হযরত মুহাম্মদ (সা) হচ্ছেন সব দীনের সমাপ্তকারী সব শরীয়তের পূর্ণতাদানকারী এবং সব অনুগ্রহের পরিপূর্ণকারী ও সকল কড়ির সমবেত রূপ। আর এজন্য তিনি বলেছেন– اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ –"আমি সমগ্র আদম সন্তানের নেতা"।

তিনি আরো বলেছেন–

لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَاوَسِعَهُ اِلَّا اتِّبَاعِىْ

"যদি মূসা (আ) জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরও গত্যন্তর থাকত না।"

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .

"তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে।"–(৩ ঃ ১১০)

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ .

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম।" –(৫ ঃ ৩)

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا

"যখন প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কী অবস্থা হবে?"–(৪ ঃ ৪১)

উল্লেখিত হাদীস ও কুরআনের আয়াত দ্বারা শেষ নবী (সা) বিশ্বের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চূড়ান্ত মর্যাদায় সমাসীন সকল রাসূল ও শরীয়তের কেন্দ্রবিন্দু এবং গোটা সৃষ্টির সেরারূপে অনন্য বৈষিষ্ট্যের অধিকারী।

তাই পবিত্র কুরাআন যত ফযীলত, যত শ্রেষ্ঠত্ব, যত কাহিনী এবং যত বরকত ও কল্যাণের বর্ণনা করেছে কিংবা এ ব্যাপারে যত সত্য ভাষণ ও যত গবেষণামূলক উক্তি করা হবে তা যদিও প্রত্যক্ষভাবে অন্যের কাহিনী হয়ে থাকে, কিন্তু পরোক্ষভাবে সেই সত্তারই কাহিনী, যিনি পরিপূর্ণ ও সবার সমষ্টি।

আর যখনই এই সামষ্টিক সত্তা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু বলা হবে তখন যদিও তাতে শাব্দিক ভাবে অন্যদের আলোচনা হয়নি কিন্তু অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, তাঁর আলোচনায় যেন সব নবী ও রাসূলগণ বরং মনুষ্য জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি, যাদের ওপর আল্লাহ্ নি'মাত বর্ষণ করেছেন–তাদের সবার আলোচনা হয়ে গেছে। তাঁদের সম্পর্কে যা কিছু বলা যেত, তা যেন তাঁর আলোচনায় এসে গেছে। যখন বাগান ও পজ্জিত ভূমির নাম নেওয়া হয় তখন যদিও আপনি ফূলের নাম নেননি, এগুলোর রং ও গন্ধের উল্লেখ করেননি এবং স্বচ্ছ ঝর্ণনা ও এর প্রবাহের কথা না বললেও বাগান নামের সাথে এইসব নামও নেওয়া হয়ে গেছে। আর যখন আপনি বলেন–ফুলের বিছানা সুগন্ধি বায়ু, প্রবাহিত ঝর্ণা, গাছের সারি, সুগন্ধিঘাম মল্লিকা ফুল? তখন আপনি বাগান ও পুজিভূমির নাম নেন, বা না নেন, কিন্তু এই প্রতিটি নামের সাথেই আপনি বাগানের নাম নিয়েছেন। যদিও বাহ্যতঃ সুগন্ধি ঘাস, গাছের সারি ও ঝর্ণা উল্লেখ ছিল, কিন্তু আসলে এ সবের উল্লেখ নয়; বরং কেবল একটি একীভূত মূলের অর্থাৎ বাগানের উল্লেখ ছিল। এ ক্ষেত্রে মাওলানা রূমীর ইঙ্গিত খুবই চমৎকার। তিনি বলেন–

“আহমদ নাম হচ্ছে সব নবীর নাম,
যখন একশত বলা হয়েছে তখন
তার মধ্যে নিরানব্বইও এসে গেছে।”

অর্থাৎ যখন একশ বলা হয়েছে তখন এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত যা কিছু আছে তা তার মধ্যে এসে গেছে। আর যখন এক, দু, দশ, পঞ্চাশ বলা হয় তখন প্রকৃত পক্ষে এর মধ্যে এক শ'য়েরও উল্লেখ রয়েছে।

কুরআন ও রাসূল (সা)-এর মধ্যে একাত্মতা

পবিত্র কুরআনের মধ্যে হয় আহকাম (নির্দেশাবলী) আছে কিংবা উপদেশ আছে কিংবা হিদায়াত ও গুমরাহীর কানূন সমূহের ব্যাখ্যা আছে কিংবা পূর্ববর্তী কাহিনী আছে। কুরআনের মধ্যে যদি আহকাম থাকে তাহলে সেই শরীয়তের আহকাম, যার বহনকারী সাইয়িদুল মুরসালীল (সা)। যদি উপদেশ থাকে তবে সেই উপদেশই রয়েছে যার বাস্তব ছবি ও পরিপূর্ণ নমুনা হচ্ছেন সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর অস্তিত্ব। যদি কাহিনী থাকে তাহলে সেই কাহিনী ঐ সব ফযীলত ও মর্যাদার-যার সবগুলোই মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে একত্রিত হয়েছে। এমতাবস্থায় সুফীগণ যদি বলেন, কুরআন হচ্ছে মুহাম্মদ (সা)-এরই সৌন্দর্যের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা, তাহলে তাতে সন্দেহ-সংশয় হবে কেন?

সত্যি কথা বলতে গেলে, পবিত্র কুরআন ও মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে যে একাত্বতা বিরাজ করছে তা শত মুখে বর্ণনা করা হলেও শেষ হবে না।

কিতাব ও কিতাব বাহকের একাত্মতার সম্বন্ধ

যদি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় তাহলে কিতাব ও কিতাব বাহকের একাত্নতার ব্যাপারটি কুরআন ও 'সাহিবে কুরাআন' তথা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে প্রতীয়মান হবে।

আজ ইসলাম ব্যতীত বিশ্বের ধর্মসমূহের মধ্যে কোন ধর্মই এরূপ নেই–যে ধর্মের আসমানী কিতাব ও কিতাব বাহকের পুরস্পর একত্মার সম্পর্কে এভাবে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত যে, একে অপরের সাক্ষী–কিতাব কিতাব বাহবেকর সত্যবাদীতার ওপর দলীল ও সাক্ষী আর কিতাব বাহক মুল কিতাবের সাক্ষী।

শরীয়তের ইতিহাসের সমগ্র মাধ্যম যদি ধ্বংস হয়ে যায় এবং রিওয়াত ও কাহিনী সম্বলিত গ্রন্থসমূহকেও উপেক্ষা করা হয় তবুও সাহিবে শরীয়ত তথা মুহাম্মদ (সা)-এর অস্তিত্ব সেরূপ উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল হয়ে টিকে থাকবে– যেরূপ আজ তা টিকে আছে ইতিহাস ও রিওয়ায়াত গ্রন্থাদির মাধ্যমে। যদি বিশ্ববাসী চায় তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমগ্র জীবনী ও সমগ্র ইতিহাস এই সুরক্ষিত কুরআন থেকেই হুবহু উদ্ধার করতে পারবে।

টীকা ঃ

১। মাওলানা এই আয়াতগুলোর উপর একটি টীকা লিখেছেন–যাতে তিনি সংক্ষেপে দেখিয়ে দিয়েছেন, অন্যান্য নবীর উপর কিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। যেমনঃ

ক) আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুসলিমাকে অন্য সব উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ, আর দ্বীনে ইসলামকে অন্যসব দ্বীনের পূর্ণাঙ্গকারী এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের পরিপূর্ণকারী আখ্যা দিয়েছেন। আর এটা তো পরিস্কার কথা যে, যার আনুগত্য করা হয়, সে আনুগত্য কারীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। আর যে অনুগ্রহ পূর্ববর্তী অনুগ্রহ সমূহকে পূর্ণ করে, তা পূর্ববর্তী অনুগ্রহ সমূহের চাইতে শ্রেষ্ঠ।

খ) যদি শেষ শরীয়ত পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহের একত্রকারী হয়, তাহলে পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহের চাইতে নিঃসন্দেহে তা শ্রেষ্ঠ। যদি শেষ উম্মত পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের যাবতীয় কল্যাণ ও বরকত লাভ করে থাকে তাহলে তারা পূর্ববর্তী উম্মত সমূহের চাইতে মর্যাদার দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

আর এটা তখনি সম্ভব হবে যখন শেষ উম্মতের রাসূল পূর্ববর্তী সব রাসূলের মর্যাদা ও মাকামের একত্রকারী হবেন। আর যখন তিনি তা-ই হবেন তখন তিনি যে সব নবী -রাসূলের চাইতে শ্রেষ্ঠ, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, এর সমর্থনে কিতাব ও সুন্নাতে অনেক প্রকাশ্য দলীল রয়েছে।

গ) পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে

"এই রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"–(২ ঃ ২৫৩)

এই আয়াতের তাফসীরের মধ্যে উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এবং রিসালাতে মুহাম্মদী, শরীয়তে ইসলামিয়া, উম্মতে মুসলিমা এবং এতদ্ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যে জামি'বা একত্রকারী তার উপর একটি বিশেষ ভঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে যে বলা হয়েছে–

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ

"আমরা তার সাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না।"-(২ঃ২৮৫)

–সেটা অন্য ব্যাপারে। এর সাথে আলোচ্য বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই।

ঘ) রাসূলদের মধ্যে তারতম্য করার সাথে 'প্রকৃষ্টতা প্রদান' বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একথার সাথেও প্রকৃষ্টতা প্রদান বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই– যাতে বলা হয়েছে, তোমরা আমাকে হযরত ইউনুস(আ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ অন্য অর্থে একথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্যত্র বলেছেন, "আমি আদম সন্তানের নেতা।" তিনি আরো বলেছেন,"আদম (আ) এবং অন্যান্য নবীরা আমার পতাকার নীচে থাকবেন।" এরপরও এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান বাহুল্য ছাড়া কিছু নয়।

ক্রোড়পত্র

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের প্রেক্ষিতে মানুষের মানসিক ও আত্মিক অবস্থা তিন প্রকারের মধ্য থেকে যে কোন এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফিত্‌রাতের (প্রকৃতির) আলো ঢাকা পড়ার কারণে তা একেবারে অদৃশ্য অথবা পরিবর্তিত হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যাবে–এমন কি তা থেকে অনুভূতি ও পার্থক্য নির্ণয়ের শক্তি পর্যন্ত লোপ পাবে। অর্থাৎ এমন অবস্থায় সে পৌঁছে যাবে যে, আলো ও অন্ধকারকে এবং আর্সেনিক ও দুধকে একই জিনিস ভাবতে শুরু করবে। সে না ভালোর উপর আনন্দিত হবে, আর না মন্দের উপর দুঃখিত হবে।

পবিত্র কুরআনে এই নাফ্‌স্‌কে নাফসে আম্মারা বলা হয়েছে। إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ –"মানুষের মন (নাফস্) অবশ্যই মন্দ-কর্ম-প্রবণ।"(১২:৫৩)

এরপর এই অন্ধকার থেকে বের হয়ে ফিতরাতের নিভু নিভু আলো পুনরায় মিট মিট করে জ্বলতে শুরু করে–এমন কি তার হারানো অনুভূতি ও পার্থক্য নিরূপণ শক্তি জেগে উঠে। তার মধ্যে আলোর আশা ও অন্ধকারের প্রতি অসন্তুষ্টি অনুভূত হতে শুরু করে। তখন তার মধ্যে মন্দ থেকে বাঁচার এবং কণ্টক থেকে বেরিয়ে আসার শক্তি অর্জিত হয় না বটে, তবে মূল ফিতরাতের অদৃশ্য কর্মতৎপরতা আপন কাজ শুরু করে দেয়। এটা হচ্ছে লাওয়ামার সুস্থতা অর্জিত হওয়ার পর্যায়।

এ কারণেই পবিত্র কুরআন আপন নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে এর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের উপর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেমন– لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ . وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ .

–"আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের, আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।"–(৭৫-১-২)

এটাই হচ্ছে সেই হাকীকত, যার দিকে হাদীসে ইবনে মা'বদে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং যা হচ্ছে মানুষের আসল ফিতরাতের ভালমন্দের হাকীকতের অধ্যায়ে কয়েকটি শব্দের মধ্যে ইল্‌মের একটি পুস্তিকা এবং হাকীকত পাঠের একটি বিরাট পুস্তক। অর্থাৎ –

البر ما اطمانت عليه النفس واطمان عليه القلب والاثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدور ان افتاك الناس افتون .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমরা কি পুণ্য লাভের হাকীকত ও পরিচয় জানতে চাও? অতএব তার পরিচয় এই যে, استفت قلبك –(তোমার অন্তরের কাছে ফতওয়া জিজ্ঞাসা কর।)

পুণ্য হচ্ছে সেই কাজ, যার উপর মন প্রশান্তি লাভ করে ও আনন্দিত হয় এবং তার উপর অন্তরের স্থিতি থাকে। গুনাহ্ হচ্ছে ঐ কাজ, যা তোমাদের অন্তরে প্রশান্তির জায়গায় অশান্তি ও দুঃখ সৃষ্টি করে এবং এর উপর অন্তর স্থিতি লাভ করতে পারে না।

স্মরণ থাকে যে, এই হাদীসের মধ্যে যে 'কালব' (অন্তঃকরণ) শব্দ এসেছে, তার অর্থ 'কালবে সালীম' বা সুস্থ অন্তঃকরণ– রুগ্ন অন্তকরণ নয়। কেননা, আস্বাদনের ক্ষেত্রে সুস্থ মানুষের আস্বাদন শক্তি নির্ভরগোগ্য হবে–রুগ্ন মানুষের নয়।

তৃতীয় প্রকার হচ্ছে আত্মিক সৌভাগ্য এবং মানসিক উন্নতির শেষ পর্যায়। এটাকে কুরআন প্রশান্ত চিত্ত বা নাফ্সে মুতামায়িন্নাহ্ আখ্যা দিয়েছে। যেমন–

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ . ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً .

"হে প্রশান্ত চিত্ত! তমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে; (৮৯ঃ২৭-২৮)

মোটকথা, পবিত্র কুরআন মানুষের নাফ্সকে তিন ভাগে ভাগ করেছে। যথাঃ নাফসে আম্মারাহ্, নাফসে লাওয়ামাহ্ এবং নাফসে মুত্মায়িন্নাহ্।

শেষ দিক থেকে মুতমায়িন্নাহ্-এর নিকটবর্তী হওয়ার দরুণ লাওয়ামাহ্-এর শেষ পর্যায় যদিও নাফ্সের সুস্থ্যতার পর্যায়, কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রথম দিক থেকে নাফ্সে আম্মারাহ্-এর নিকটবর্তী হওয়ার দরুণ সে অসুস্থ্যতা এবং ব্যাধির পর্যায়ও বটে।

এই যে বলা হয়েছে, তিন প্রকার-তা এই পটভূমিতে যে, এটা হচ্ছে তাকসীমাতে কুরআনিয়া বা কুরআনের বিভক্তি। যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অস্তিত্ব জগতকে অধ্যয়ন করা হয় তাহলে জানা যাবে, আল্লাহ্র কানূন অস্তিত্বের জগতে কিছুটা এভাবেই কার্যকর হয়েছে।

কুরআন ও সীরাতুন্নবী

শুধু কুরআন দিয়ে সীরাতের বিন্যাস

লোকেরা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সীরাত ও জীবন কথার উপর এই প্রেক্ষাপটে খুব কমই দৃষ্টিপাত করেছে যে, যদি রিওয়ায়াত ও ঐতিহাসিক প্রন্থাদিকে উপেক্ষা করা হয় এবং শুধুমাত্র কুরআন হাকীমকে সামনে রাখা হয় তাহলে তাঁর সীরাত ও জীবন কথা কিরূপ ও কতটুকু আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে?

আর কুরআন যেমন নিজের কোন কথায়, অন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়; তেমন আপন বাহক ও প্রচারকের অস্তিত্ব ও জীবনকথা বর্ণনার ব্যাপারেও বাইরের কোন কিছুর মুখাপেক্ষী কি না? সীরাত লেখক এবং মুহাদ্দিসগণ-পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে যে সমস্ত ফযীলত ও প্রকৃষ্টতা বর্ণিত হয়েছে, তা অধ্যায় আকারে একত্রিত করেছেন।

যেমন কাযী 'ইয়ায'–'শিফা' গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসা সম্পর্কিত আয়াত সমূহ একত্রিত করেছেন। কিন্তু আমার জানা মতে আজ পর্যন্ত এ চেষ্টা করা হয়নি যে, শুধুমাত্র কুরআন হাকীমকে সামনে রেখে সীরাতের কোন গ্রন্থ রচিত বা সংকলিত হবে।

মাওলানা শিবলীর কাছে নিবেদন

যে যুগে আমি মাওলানা শিবলী (র)-এর সাথে সীরাতে নবভী সম্পর্কে আলোচনা করতাম তখন আমার মনে এ এ সম্পর্কে একটি ধারণা আসে। আমি মাওলানা শিবলী (র)-কে বললাম,আপনি সীরাত তথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন কথায় এমন একটি বিশেষ অধ্যায় বা বিশেষ অংশ রচনা করুন, যার শিরোনাম হবে 'কুরআন ও সীরাতে মুহাম্মদিয়া'। আপনি এই অধ্যায়ে বা অংশে শুধুমাত্র কুরআনের আয়াত সমূহ সংকলিত ও বিন্যস্ত করে দেখিয়ে দিন খোদ কুরআন থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর জীবনের ঘটনাবলী কিভাবে জানা যেতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা মরহুম মাওলানাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে দাখিল করুন, তাঁর প্রকৃতির একটি বিশেষ দিক এই ছিল যে, যে কোন ব্যাপার সামনে আসুক, তিনি প্রথম প্রথম সেটাকে সন্দেহ-সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখতেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তা বিশ্বাস করার জন্য বাধ্য না-হতেন ততক্ষণ বিশ্বাস করতেন না। এই জিনিসটি তার আমালী তথা বাস্তব জীবনকেও অনেক ক্ষতির সম্মুখীন করেছিল। তিনি কোন কাজই দৃঢ়তার সাথে করতে পারতেন না। নাদ্ওয়ার ব্যাপারে লোকেরা যে ঝামেলা ও সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল, তা-ও ছিল মাওলানারই বিশ্বাসের দুর্বলতা ও দৃঢ় সংকল্পহীতার ফলশ্রুতি। অন্যকথায় তাঁর সাথে বিরোধিতা কারীদের মধ্যেও এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যে তাঁকে তাঁর স্থান থেকে হটিয়ে দিতে পারত। মোটকথা তিনি আমার ধারণাকে খুবই পসন্দ করেন। কিন্তু সেই প্রকৃতি অনুযায়ী সন্দেহ-সংশয়ের বশবর্তী হয়ে বলতে থাকেন, এই পরিমাণ উপাদন কি শুধু কুরআন থেকে বের হবে, যার দ্বারা সীরাতের একটি অধ্যায় বিন্যাসিত হতে পারে? কিন্তু আমি যখন বিষয়টির উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করলাম তখন তিনি বললেন, আচ্ছা তুমি যদি এই অংশ লিখে দাও তাহলে সেটাকে সীরাতের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। শেষ

বারের মত আমরা পুনরায় দিল্লীতে সমবেত হই। তখন তিনি বলেন, এখন আমারও এই ধারণা হচ্ছে যে, এটা সম্ভব। উপরন্তু এটা হবে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ধারণাতীত সাফল্য

দিল্লী থেকে ফিরে এসে আমি কিছু সময় একাজে ব্যয় করলাম এবং শুধুমাত্র কুরআনের দৃষ্টিতে সীরাতুন্নবী লিখতে শুরু করে দিলাম। এ ক্ষেত্রে আমি যতই এগোতে থাকলাম ততই আমার সামনে নতুন নতুন দরজা উন্মুক্ত হতে থাকল এবং আমি ধারণাতীত সাফল্য অর্জন করলাম। যেহেতু প্রথম থেকে বিষয়টি আমার নজরে ছিল, এমন কি এ সম্পর্কিত আয়াতসমুহের একটি বিরাট সংগ্রহ আমার অন্তরে বিরাজ করছিলো-কিন্তু একথা তো কখনো আমার চিন্তায় উদয় হয়নি যে, যে মহান গ্রন্থটি বাহ্যত: যিক্‌র, আহকাম্‌ মাসায়িল এবং অতীত যুগের লোকদের কেচ্ছা-কাহিনীতে পূর্ণ; সেখানে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জীবনের ঘটনাবলী কি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে? কিন্তু গ্রন্থটি লেখা শেষ হওয়ার পর এই দেখে আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সীরাত তথা জীবনকথার এমন কোন অপরিহার্য অংশ নেই, যে সম্পর্কে কুরআনের মধ্যে একাধিক আয়াত পাওয়া যায় না।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও সাহাবা কিরাম

এরপর শুধু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জীবন কথা নয়, বরং সাহাবা কিরাম (রা)-এর অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যাদির বর্ণনাও কুরআনে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেল। সাহাবীগণ তো নুবুওয়াতের পবিত্রকরণ ও শিক্ষাদানের পাঠশালা থেকে বের হয়েছিলেন এবং তাঁরাই ছিলেন প্রথম মুমিনের দল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁদেরকে পবিত্র করেছিলেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাই তাদের জীবন কথার মধ্যেও সীরাতুন্নবীর বিভিন্ন অংশ ছিল। আর সত্যি কথা বলতে গেলে, হিদায়াতে কুরআনী ও হিকমতে নববীর আমালী ও বাস্তব ফল হওয়ার দিক দিয়ে তাঁরা স্বয়ং নুবুওয়াতের নিদর্শন ও দলীলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যদি সাহাবীগণের অবস্থা কুরআনের মধ্যে বিস্তারিতভাবে পাওয়া না যেত তাহলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জীবনকথাও পরিপূর্ণতায় পৌছত না। এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে শেষ বারের মত আমার বিশ্বাস সুদৃঢ় হলো যে, যদি দুনিয়া থেকে ইসলামী ইতিহাসের সমস্ত বইপুস্তক বিলীন হয়ে যায়, আর দুনিয়া ইসায়ী ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি দাওয়াত সম্পর্কে যা শুনেছিল তার সব কিছু ভুলে বসে এবং শুধুমাত্র কুরআনই দুনিয়াতে বাকী থাকে তবু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পবিত্র ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর জীবন ও জীবনকথার দলীল ও সাক্ষ্য-প্রমাণাদি কখনো মিটে যাবে না।

শুধুমাত্র কুরআনই যথেষ্ট

শুধুমাত্র কুরআনই এই জন্য যথেষ্ট যে, সে সর্বদা দুনিয়াকে বলে দেবে-কে তাকে নিয়ে এসেছিলেন, কিরূপ সময়কালে তিনি এসেছিলেন, কোন্‌ দেশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাঁর আত্মীয়স্বজনরা কেমন ছিল, তাঁর জাতি ও জন্মভূমির কি অবস্থা ছিল, তিনি কিরূপ আচরণ করেছেন,তাঁর বাইরের জীবন কিরূপ ছিল, আপন পরিবার-পরিজনের সাথে তিনি কিরূপ সময় কাটাতেন, তাঁর দিনের ও রাতের প্রহরগুলো কিবাবে কাটত, তিনি কি পরিমাণ আয়ু পেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনে কি কি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে? এরপর যখন তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন তখন দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীকে কিরূপ অবস্থার মধ্যে রেখে গেলেন? তিনি যখন প্রথমবার দুনিয়ার উপর দৃষ্টিপাত করেন তখন দুনিয়ার অবস্থা কিরূপ ছিল? আর বিদায় বেলা যখন শেষ বারের মত দুনিয়ার উপর দৃষ্টিপাত করেন তখন দুনিয়ার অবস্থা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌছেছিল? মোটকথা, একটি পবিত্র সত্তার সত্য প্রচারের আন্দোলন এবং তার ফলাফল সম্পর্কে কুরআন যা কিছু ব্যক্ত করেছে, তা ইশারা-ইঙ্গিতে নয়; বরং অত্যন্ত

স্পষ্ট ভাষায়। আর যদি ইশারা-ইঙ্গিতের দিকটিও ধরা হয় তাহলে তো রাসূল (সা)-এর জীবন কথার জন্য কুরআনের বিশেষ বিশেষ আয়াত বাছাই বা সংকলনের কোন প্রয়োজনই নেই, বরং সমগ্র কুরআনই তো তাঁর জীবনকথা। কুরআনের সর্বত্র তাঁর কথা ছাড়া আর কোন কথা নেই।

কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক দিক

যদি চিন্তা করা যায় তাহলে এটিও প্রকৃত পক্ষে কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য তথা অলৌকিক দিক যে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোন পয়গামের সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে না, যতক্ষণ না তার পয়গাম বাহকের সত্যতা ও বিশ্বস্ততা যাচাই করা হয়। আর তা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না যতক্ষণ না তার (পয়গাম বাহক তথা রাসূলের) সম্পূর্ণ জীবন এবং জীবনের ঘটনারাজি ও অবস্থাদি দুনিয়াবাসীর সামনে আসবে। এই প্রেক্ষিতে আজ বিশ্বে যদি এমন কোন আসমানী কিতাব থেকে থাকে, যা আপন বহনকারীর জীবনের অবস্থা ও ঘটনারাজি প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেককালে নিজেরই যবানীতে বিশ্ববাসীকে শুনাতে পারে তাহলে সেটা পবিত্র ও সংরক্ষিত কুরআন ছাড়া আর কোন কিতাব নয়-যার সম্পর্কে খোদ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ .

"এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে সত্যভাবে।" -(৪৫:২৯)

কুরআন ছাড়া দুনিয়াতে আর যত আসমানী কিতাব আমাদের বিশ্বাস কিম্বা তাদের কল্পনা অনুযায়ী বিদ্যমান আছে, সেগুলো হয় নিজের সত্যতা ও অন্যান্য যাবতীয় কথার ন্যায় এ সম্পর্কেও সম্পূর্ণ নীরব রয়েছে, এমন কি আপন বহনকারীর অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের দিকটি উল্লেখ করলেও এমন গৌনভাবে করেছে যে, তাতে সে সম্পর্কিত সন্দেহ-সংশয় কাটেনি। যার কারণে তাতে ইতিবাচক দিকের পরিবর্তে নিতিবাচক দিকটিই ফুটে উঠেছে। কিন্তু কুরআনের ক্ষেত্রে এসব কথা প্রযোজ্য নয়। কুরআন যে বিশেষ পদ্ধতিতে এক বংশের কাছ থেকে অপর বংশের কাছে এবং এক যুগ থেকে অপর যুগে সংরক্ষিত, পঠিত ও অনুসৃত হয়ে আসছে, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এটাই একমাত্র কিতাব, যা অকাট্য, সুনিশ্চিত,সুসংরক্ষিত ও অপরিবর্তিত। আর এই পটভূমিতেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য ঘোষণা–

لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ .

"কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না–সম্মুখ থেকেও নয়, পিছন থেকেও নয়।"-(৪১:৪২)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ .

"আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।" -(১৫:৯)

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ . فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ .

"বস্তুত: এটা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।" -(৮৫: ২১-২২)

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ .

"বস্তুত: যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন।" -(২৯:৪৯)

এছাড়াও এ সম্পর্কে কুরআনের আরো অনেক বাণী রয়েছে।

অতএব যার অস্তিত্ব, ব্যক্তিত্ব, জীবনকথা ও কল্যাণরাজির বর্ণনা এই কিবে রয়েছে, তার অস্তিত্ব ও জীবন কথার চাইতে শ্রেষ্ঠ অস্তিত্ব, শ্রেষ্ঠ জীবনকথা তো আর কিছুই হতে পারে না এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার অস্তিত্বের চাইতে আর কোন অস্তিত্বই এরূপ নিখুঁত ও অম্লান থাকতে পারে না। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, বিশ্ববাসী তাদের হিদায়াতের জন্য যদি কোন ব্যক্তির সামনে মাথা ঝুকাতে পারে তাহলে তিনি তো এই মহান ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। অতঃপর যার অস্তিত্ব ও যার জীবনকথা এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত করা হয়েছে, তাঁর অবস্থান, তাঁর জীবন ও জীবনকথা কেন চিরদিনের জন্য বিশ্ববাসীর কাছে চিরস্মরণীয় ও চির অনুকরণীয় হয়ে থাকবে না?

খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দানের অর্থ

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ..

–"(হে নবী!) আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।"(৯৪:৪)

এই মর্যাদা দানের অর্থ এমন একটি স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া,যেখানে সমগ্র নবীদের নূর, মুহাম্মদ (সা)-এর নূরের সামনে একেবারে অনুজ্জ্বল ও ক্ষীণকায় হয়ে পড়ে। 'ইনসানে কামিল,' 'রূহে আযম' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে,তিনি এমন এক বন্দা ও রাসূল, যিনি সর্বদা আল্লাহ্ ও তার বান্দাদের মধ্যে হিদায়াতের মাধ্যম হিসাবে বিরাজ করবেন। আরিফ বূসীরীর ভাষায়–

منزه عن شريك فى محاسنه

فجوهر الحسن فيه غير منقسم .

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সত্তাগত ও গুণগত সৌন্দর্যাবলীর মধ্যে অংশীদার থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।" অর্থাৎ এই সৌন্দর্যাবলীর মধ্যে অন্য কেউ শরীক নেই। তাঁর সৌন্দর্যের যে উপাদান, তা কখনো বণ্টিত হয়নি যে, এর মধ্যে অন্য কেউ ভাগ বসাবে।

মুহাম্মদী হাকীকত

আর যেহেতু মানবজাতির সৌভাগ্য ও আলোক প্রাপ্তির কেন্দ্রভূমি হচ্ছেন আম্বিয়া কিরাম(আ), আর তাদের সবার শীর্ষে বিরাজ করছেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। এজন্য কায়িমী, দায়িমী ও চিরন্তন জীবনের 'নুরুল আনওয়ার' (আলো সমূহের আলো)এবং মিসবাহুল মাসাবিহ (প্রদীপ সমূহের প্রদীপ) কেবল তিনিই স্থির হয়েছেন। এ কারণেই শায়খ আকবর ওয়াজিলী তাঁকে 'হাকীকাতুল আসমাইয়া' ও 'লাওহে মাহফূয' আখ্যা দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ্। শেষোক্ত উপাধি বাস্তবতার ব্যাখ্যা এবং শরীয়ত ও বুদ্ধির সাথে কত সংগতিপূর্ণ। পৃথিবীতে যত হিদায়াত ও তা'লীমের 'লাওহ্' ছিল, সবগুলোর মধ্যেই পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়ে গেছে– এমনকি তাদের একটিও আজ সংরক্ষিত নেই, কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র জীবনের লাওহে মাহফূজের একটি অক্ষরও মিটে যেতে পারেনি।

এটা সর্ববাদি সম্মত যে, কুরআন আদি থেকে সংরক্ষিত ছিল এবং অনন্তকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। আর এই কুরআনের পর যদি বিশ্বে অন্য কিছু মাহফূয ও সংরক্ষিত থাকতে পারে তাহলে তা হচ্ছে 'রূহে আযম' হযরত

মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)। কেননা, স্বয়ং কুরআন তাঁকে এবং তাঁর জীবনকথাকে হিফাযত ও সংরক্ষণের জন্য আপন কোলে তুলে নিয়েছে। হযরত সাইয়্যিদুল আরিফীন শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রা)তাঁর এই মর্যাদার প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করেছেন, যা কোন কোন লোক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। তাই তাঁর এ কথাকে তারা টেনে অন্য দিকে নিয়ে গেছেন। শায়খ আবদুল কাদির (র) বলেন–

افلت شموس الاولين وشمسنا

ابدًا على افق البقا لاتغرب .

পূর্ববর্তীদের সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু আমাদের সূর্য [হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বদা ঊর্ধাকাশে প্রজ্বলিত থাকবেন] এবং কখনো অস্ত যাবেন না।

আমার মরহুম ওয়ালিদ (মরহুম মাওলানা খায়রুদ্দীন সাহেব) উপরোক্ত পংক্তির সাথে আর একটি পংক্তি যুক্ত করে এর অর্থকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। নিম্নোক্ত পংক্তিটি হচ্ছে তার একটি দীর্ঘ কাসীদার অংশ বিশেষ।

شمس تقادم قبل ادم طلعها

ابدا على افق البقاء لا تغرب

"ঐ সূর্য, যা উদয়নের ক্ষেত্রে আদম (আ)-এরও অগ্রবর্তী, সর্বদা ঊর্ধে জাজ্বল্যমান থাকবে এবং কখনো অস্ত যাবে না।"

পদযোগে ভ্রমণের শেষ সীমা

নাক্‌শ্‌বন্দিয়া তরীকার কোন কোন বিজ্ঞজন–বিশেষ করে হযরত মুজাদ্দিদে সিরহিন্দী (র) 'আপন উলূমে কাশফী'-এর মধ্যে একথা প্রকাশ করেছেন যে, হাকীকতে মুহাম্মদিয়ার দ্যায়রা (চক্ররেখা) হচ্ছে পদযোগে ভ্রমণের একেবারে শেষ সীমান্ত। এরপর শুধু অন্তরদৃষ্টির ভ্রমণের সুযোগ আছে। আর এটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। বস্তুত: সব 'আসহাবে আহওয়াল ও কুশূফ'ও এ ব্যাপারে একমত। তাই এই হাকীকত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, যেহেতু হাকীকতে মুহাম্মদিয়া রূহে হায়াতের শেষ বিন্দু ও উৎসমূল, তাই পদযোগে ভ্রমণের শেষ মনযিল তিনিই। এরপর যা কিছু আছে, তা ঊর্ধে এবং সৃষ্টির প্রতিনিধির গমনস্থল। তাই সেখানে না ভ্রমণের সুযোগ আছে, আর না অন্বেষণকারী কাফেলা ও কৌতুহলী দলের গমনের সুযোগ আছে। বরং কল্পনার পাখিও সেই অসীম দিগন্তে পরিশ্রান্ত ও দগ্ধ পালকে ফিরে আসবে। মাওলানা রুমী এ সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তার সারমর্ম হলো, ঐ সত্তা হচ্ছেন আমার ধারণা ও কথাবার্তার ঊর্ধে। এ ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্ণয়ের যে দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি তা মৃত্তিকা-দলিত হোক।

জনৈক আরবী কবির ভাষায়

يامن هو للقلوب مقناطيس

"হে ঐ সত্তা, যে অন্তরকে এমনভাবে আকর্ষণ করে, যেমন আকর্ষণ করে চুম্বক লোহাকে।"

অতএব এই দুনিয়াতে যদি কোন যিক্‌র থাকে তাহলে সেটা তারই যিকর এবং যদি কোন কথা থাকে তাহলে সেটা তারই কথা। তারই প্রেমাসক্ত হয়ে জনৈক ফার্সী কবি যা বলেছেন তার মর্মকথা হলো, "ঐ সময়টি মুবারক ও মংগলময়, যা প্রাণবন্ধুর সাথে কেটেছে। এছাড়া যত সময় আমার কেটেছে তা নিরর্থক, এমনকি নির্বুদ্ধিতামূলক।"

তাই এটা কি করে সম্ভব যে, অস্থিরতার কলম হাতে চালু হবে না আর চিন্তা ও ব্যস্ততার সম্পদ ধৈর্যের আঁচলের ন্যায় হাত থেকে ফসকে যাবে ?

কুরআন থেকে গৃহীত সীরাতের গুরুত্ব

এতক্ষণ আলোচনা ছিল কুরআন থেকে গৃহীত সীরাতুন্নবী সম্পর্কে। আলহামদু লিল্লাহ, সেই চিন্তা ও কল্পনা থেকেও এটা বেশী সংগৃহীত হয়েছে। আমি এর মধ্যে এমন কিছু দেখেছি, যা কোন চোখ দেখেনি এবং এমন কিছু শুনেছি যা কোন কান শুনে নি। রাসূলের জীবন-চরিত সম্পর্কে মানুষ আজ পর্যন্ত যা কিছু রচনা করেছে, তা যদি এক পাল্লায় রাখা যায়, আর অন্য পাল্লায় রাখা যায় আল্লাহ্‌র কালামের একটি মাত্র শব্দ, যা রাসূলের জীবন-চরিত সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাহলে শেষোক্ত পাল্লাই ভারী হবে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সীরাত-রচয়িতাগণ তা বিন্যাস করতে গিয়ে অনেক চিন্তা-গবেষণা ও চেষ্টা-চরিত্র সত্ত্বেও তারা এ বিষয়ে কেন দৃষ্টিদান করেননি ? যতক্ষণ পর্যন্ত এ জিনিসটি লিখিত হয়নি ততক্ষণ আমার অবস্থাও অন্য রকম ছিল। এখন যা দেখছি কারখানাই ভিন্ন রকম দেখা যাচ্ছে। এ সম্পর্কে কবি ওরফী যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো, পবিত্র কুরআনের প্রত্যেকটি অক্ষর স্বয়ং সম্পূর্ণ–যদিও আমি বা আমরা এ সম্পর্কে উদাসীন। পবিত্র কুরআনের কেচ্ছাকাহিনী ছাড়া লোকেরা অন্য যত কেচ্ছাকাহিনী বর্ণনা করে তা অসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ নীচু মানের।

এ সম্পর্কে শায়খ সাদী যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সৌন্দর্যের কোন পরিধি নেই, যেমন সা'দীর কথার কোন শেষ নেই। পিপাসার রোগী পানি না পেয়ে মৃত্যুবরণ করে, অথচ সমুদ্রের পানি যেভাবে ছিল সেভাবেই থেকে যায়।"

সীরাতে তাইয়িবার প্রচার

মরহুম মাওলানা নভেম্বর, ১৯১৩ সনে 'আল হিলাল' পত্রিকায় মীলাদের মজলিস সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন, সীরাতে নবভীর জন্য একটি সংস্থা গঠিত হওয়া উচিত, যার ব্যবস্থাপনাধীন জনসাধারণের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বই-পুস্তক রচিত হবে এবং সেগুলো মীলাদ মাহফিলসমূহে পঠিত হবে।

সীরাতে নবভীর গুরুত্ব

দীর্ঘদিন থেকে এই অধমের ধারণা এই যে, সীরাতে নবভীর উপর একটি পর্যালোচনামূলক ও বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা ছাড়াও (যেমন মাওলানা শিবলী নুমানী 'সীরাতে কবীর' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করছেন) রচনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে আরো অনেক পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, অত্যধিক প্রয়োজন এমন সব সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচনার, যেগুলোর মধ্যে সীরাত সম্পর্কে বাহাস তথা বিতর্কমূলক সব কিছুই উপেক্ষা করা হবে এবং শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের অবস্থাদি সঠিক ও শুদ্ধভাবে লিখা হবে। এসব কিছুই সংক্ষিপ্তভাবে লিখা হবে। শুধুমাত্র ঐ সব বিষয় বিস্তারিতভাবে লিখা হবে, যা আমাদের বর্তমান বাস্তব জীবনে 'উসওয়া-ই-হাসানাহ' তথা উত্তম আদর্শের দাওয়াত দেয়, যার সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাঁর চরিত্র তো কুরআন।

এই সব পুস্তিকা পাঠ করে সাধারণ মানুষ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জীবন সম্পর্কে অবহিত হবে এবং তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নিজেদেরকে সংস্কার ও সংশোধন করবে। শুধু তাই নয়– বিশেষভাবে সেগুলোর লক্ষ্য হবে মীলাদুন্নবীর মজলিসসমূহের সংস্কার ও সংশোধন করা, যাতে করে গতানুগতিকভাবে অনুষ্ঠিত এই সব জনসমাবেশের মাধ্যমে মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে নিজেদের উপকৃত করে তুলতে পারে।

আমি এ সম্পর্কে ইতপূর্বে একবার লিখেছি। আমার বিশ্বাস মতে, কুরআন করীম, যা..... (كِتَابٌ مَّسْطُوْرٍ فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ) –উন্মুক্তপত্রে লিখিত কিতাব, যার 'লাওহে মাহফূয ' ছিল তার বাহকেরই জীবন–আর

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ .

"আল্লাহ্র নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে (৫ঃ১৫)।" –এই আয়াতের নূর বা জ্যোতিকে আমি কিতাবের বিশেষণ মনে করি না, বরং ঐ পরিপূর্ণ মানুষের বিশেষণ মনে করি, যার সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে–

دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا .

"আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তার দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে" (৩৩ঃ৪৬)।

অতএব যদি মুসলমান হওয়ার জন্য, আমাদের কুরআন তিলাওয়াতের প্রয়োজন থাকে তাহলে বিশ্বাস করুন, এটিকে একটি বাস্তব জীবনরূপে দেখার জন্য আমাদের সেই উত্তম আদর্শ অধ্যয়নের প্রয়োজন, যার সম্পর্কে খোদ পবিত্র কুরআনই ঘোষণা করেছে–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

"তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (৩৩ ঃ ২১)

যিক্‌রে মীলাদের মজলিসসমূহ

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্মরণ করার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম হচ্ছে 'মীলাদুন্নবী' এর মজলিসসমূহ–তবে এই শর্তে যে, সেগুলোতে মীলাদের সাধারণ পুস্তকাদির স্থলে, যেগুলোতে সাধারণভাবে বানোয়াট কেচ্ছাকাহিনী ও বেহুদা কথাবার্তা রয়েছে– এমন সব পুস্তকাদি পাঠ করা বা এমন সব ঘটনার উল্লেখ করা, যেগুলোর মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জীবনের বাস্তব ও সত্যিকার রূপ প্রস্ফুটিত, বর্ণিত ও বিবৃত হয়েছে।

এ জাতীয় জিনিস মূলত: নিছক লেখার বা পাঠ করার জন্য নয়, বরং এজন্য এমন সব ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন, যারা সীরাতুন্নবীর প্রভাষক হবেন, যারা এ বিষয়টি এমন ভালভাবে আত্মস্থ করবেন যে, তাদেরকে এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বলা চলে এবং তারা প্রত্যেকটি মজলিস ও প্রত্যেকটি জনসমাবেশে সেখানকার অবস্থা, পরিবেশ, প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী 'সীরাতুন্নবী' এর উপর ভাষণ দিতে সক্ষম। কেননা প্রত্যেকটি জনসমাবেশ এবং প্রত্যেকটি মজলিসের প্রয়োজন ও চাহিদা এক নয়।

অবস্থা ও প্রয়োজনাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা

কোন দলের জন্য সীরাতুন্নবীর কোন বিশেষ অংশ বিস্তারিত বর্ণনা চায়, কোন দল বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ পরিবেশের প্রেক্ষিতে সীরাতুন্নবীর কোন বিশেষ দিক সম্পর্কে জানতে চায়, কাউকে বদরেরর বিজয় কাহিনী শুনানোর প্রয়োজন হয়, কাউকে আবার উহুদের পরাজয়ের[১] দিকটি বর্ণনার মাধ্যমে তাদের দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্য অসীয়ত করার প্রয়োজন হয়, কারো জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহের সংকল্পের কথা বলার প্রয়োজন হয়, আবার কারো কাছে মক্কা বিজয়কালীন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনের কথা বলতে হয়, অবস্থা ও পরিবেশের দিকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মহান চরিত্রের কোন বিশেষ দিক কোন এক জনসমাবেশের সামনে তুলে ধরতে হয়, আবার কোন জনসমাবেশের সামনে তুলে ধরতে হয় অন্য কোন দিক।

যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র জীবনের প্রত্যেকটি কাজই সর্বজন প্রিয় ও প্রশংসিত ছিল।

كل ما يفعله المحبوب مُحبوب .

"প্রিয়জন যা করে তা প্রিয়ই হয়।"

এ সম্পর্কে নাযীর নিশাপুরী যা বলেছেন, তার সারমর্ম হলো, "তাঁর মাথার তালু হতে পায়ের তলা পর্যন্ত যেদিকেই আমি তাকাই সেদিকই আমাকে গুতা মেরে যেন বলে, 'আমিই তোমার লক্ষ্যস্থল।'

এতদসত্ত্বেও তিনি হচ্ছেন মানব জীবনের প্রত্যেকটি শাখার এবং প্রত্যেকটি অংশের জন্য উত্তম আদর্শ। জীবন এবং জীবন - সম্পর্কিত বিষয়াদির আছে শতরূপ। এমন কে আছে, যে নুবুওয়াতের অধ্যায়টি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুংখানুপুংখরূপে অধ্যয়ন করবে? এছাড়া কোন গতি নেই যে, আপন আমলের চেহারার যে অংশটি সব চেয়ে বেশী বিগড়ে গেছে, সর্বপ্রথম সেটাকেই এই আয়নার মধ্যে দেখে শুধ্‌রে নিতে হবে।

সীরাতের ভাষণ সম্পর্কিত পুস্তকাদি

কিন্তু মুশকিলের কথা হলো, এমন লোক আসবে কোত্থেকে? নিজেদের মূর্খতা আর অজ্ঞতার উপর কে আর কতটুকু মাতম করবে? যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে তো অন্তত: এতটুকু হওয়া উচিত যে, সীরাতে নববীর উপর বিভিন্ন ভঙ্গিতে ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ছোট ছোট পুস্তকাদি লেখা হবে এবং লোকেরা মজলিস সমূহে সেগুলো পাঠ করবে কিংবা মুখস্থ করে খুতবার মত উপস্থিত লোকদের শুনিয়ে দেবে।

সীরাতের ভাষণসমূহের একটি সংকলন তৈরী করা হবে শুধুমাত্র শিক্ষিত লোকদের জন্য; একটি তৈরী করা হবে সাধারণ লোকদের জন্য এবং একটি আর তৈরী করা হবে শিশু ও মহিলাদের শিক্ষা দানের জন্য। সর্বপ্রথম অন্তত: এই তিন রকমের তিনটি সীরাত গ্রন্থ তৈরী করা হবে। তবে একটি বড় সীরাত গ্রন্থ তথা 'সীরাতে কবীর' অবশ্যই লিখতে হবে।

ভাষা ও লিখন ভঙ্গি

এখানে সব চাইতে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে এই সংকলনের ভাষা ও লিখন ভঙ্গি কিরূপ হবে? বিশেষ করে এমন এক যুগে, যখন অনেকেই কিছু না কিছু লেখার উৎসাহ-অনুপ্রেরণা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে নেয় বটে, কিন্তু তা কিভাবে কাজে লাগাবে এবং কি পন্থা অবলম্বন করলে তার বর্ণনা ভঙ্গি পাঠকের কাছে সুন্দর ও আকর্ষণীয় হবে সে সম্পর্কে কোন খোঁজখবর রাখে না?

ভাষণের যে সংকলনটি জ্ঞানী গুণীদের মজলিস ও মাহফিলের জন্য লিখা হবে, তার লিখনের ভঙ্গি হবে এক রকম, আর যা জন সাধারণের মজলিসের জন্য লিখা হবে তার ভাষা হবে অন্য রকম।

প্রথমোক্ত মজলিসে পঠিতব্য সংকলনটিতে ইতিহাস ও সীরাতের খুঁটিনাটি সহ যদি পরিমিত আকারে প্রবন্ধ রচনার উচ্চতর মাত্রাও যোগ করা হয় তবে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। কেননা বিষয়ের মাহাত্ম্য এ ধরনের উচ্চ মাত্রারই যোগ্য। কিন্তু শেষোক্তটিতে যেহেতু ইতিহাসের স্থলে সংস্কার ও দাওয়াতের উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এবং তাতে সম্বোধন করা হবে সাধারণ লোককে - তাই এর বর্ণনাভঙ্গি ইতিহাস ও দর্শন সুলভ হবে না, ভাবও উচ্চ মার্গ বা উচ্চ মাত্রার হবে না, বরং হবে সরল ও সহজবোধ্য, তাতে রচনাভঙ্গির কোন আকর্ষণ ও প্রভাব থাকবে যে, শ্রবণকারী তার প্রত্যেকটি শব্দ ও প্রত্যেকটি কথাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করবে। নিশ্চয় কোন কোন বর্ণনা এমন আছে, যা যাদুর মত কাজ করে।

মাত্র কয়েকটি লাইনে যে কথাটি আমি এখানে লিখলাম তা হচ্ছে, একটি অতি লাজুক ও সূক্ষ্ম বর্ণনা ভঙ্গির কথা। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বিষয়টির প্রতি এ যুগের লেখকদের মনোযোগ খুব কমই আকৃষ্ট হয়েছে।

একটি জরুরী কথা

অত্যন্ত মুশকিলের ব্যাপার এই যে, দীর্ঘ দিন থেকে সাধারণ লোকেরা মীলাদ মাহফিল সমূহে টুম্রী টপ্পা তথা গান বাজনার ব্যবস্থা করে থাকে। এমন অনেক মজলিসের কথা আমার স্মরণ আছে, যে গুলোর মধ্যে গীত গযলসমূহের আকর্ষণীয় সম্বোধন ও ভাবার্থের কথা বাদ দিলে একথা বলা শক্ত হয়ে পড়ে যে, আমি একটি পবিত্র যিকরের মজলিসে (মীলাদ মাহফিলে) বসে আছি, না কোন মধুর কণ্ঠী গায়িকার গানের আসরে? আমি একথা বলতে সংকোচ বোধ করি না যে, আমি সঙ্গীতকে অত্যন্ত ভালবাসি। আমারও তো একটি হৃদয় আছে। অতএব ঐ জিনিসটিকে আমি কী করে উপেক্ষা করতে পারি, যার সম্বন্ধ রয়েছে হৃদয় ও আত্মার সাথে। এতদ্সত্ত্বেও এটা তো কোন ব্যক্তি পছন্দ করতে পারে না যে, দীনের প্রতি দাওয়াত প্রদান ও দীনী যিক্র-আয্কারের উদ্দেশ্যে যে মজলিস অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে নিছক গান বাজনার ব্যাপারটিও ঢুকিয়ে দেওয়া হোক। আমার ধারণা, পবিত্র যিক্রের প্রতি নিঃসন্দেহে এটি একটি মারাত্মক অবিচার ছাড়া কিছু নয়।

বলা বাহুল্য, সীরাতের ভাষণসমূহের এই নুতন সংকলনের মধ্যে আকর্ষণীয়তা অবশ্যই থাকবে। তবে এর গঠনভঙ্গি সমাধিগীতির মত নয়, বরং একটি ওয়াযের (উপদেশের) মত অবশ্যই হবে। এটা হবে সংস্কারধর্মী। আর সংস্কারধর্মী যে কোন কাজের মধ্যে আকর্ষণীয়তা বিদ্যমান থাকা যে অপরিহার্য, সে কথা ভুলে গেলে চলবে না।

অন্যথায় মূল লক্ষ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। অতএব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও মৌলিক বিষয় হলো, এই সব পুস্তকের বর্ণনাভঙ্গি ও লিখনভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু কথা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যে গুলোর প্রভাব ও আকর্ষণ শ্রোতাদেরকে মাতিয়ে তোলে,অথচ তাতে ভাষণের আদাব এবং ওয়ায ও দাওয়াতের নিয়ম-কানূন পরিত্যজ্য হয় না।

সীরাতুন্নবী সংস্থা

উপরে যে সব ভাষণ লিখার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো মীলাদ মাহফিলে পাঠ করার জন্য। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন বর্ণনাভঙ্গি ও বিভিন্ন বিন্যাসের মাধ্যমে সীরাতুন্নবীর উপর বই-পুস্তক লেখার প্রয়োজন রয়েছে, যেগুলোর ভাষা সংক্ষিপ্ত হলেও ভাবার্থ হবে ব্যাপক এবং যেগুলোর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অনুপম আদর্শকে মুসলিম - অমুসলিম নির্বিশেষে সবার সামনে তুলে ধরা হবে।

এজন্য প্রয়োজন একটি বিশেষ সীরাতন্নবী সংস্থার, যার কাজ হবে ধারাবাহিক এবং স্থায়ী। এই সংস্থাটি সীরাতুন্নবী সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণায় ব্যস্ত থাকবে এবং তার উদ্ভাবনা ও ফলশ্রুতি বিভিন্ন ছোট-বড় বই পুস্তকের মাধ্যমে প্রকাশ করবে।

এটা একটা আনন্দের ব্যাপার হবে যদি বর্তমান সীরাত সংস্থা, যা শামসুল উলামা মাওলানা শিবলী নুমানীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা যদি 'সীরাতে কবীর' এর কাজ সম্পন্ন করার পরও আপন কর্মতৎপরতা বহাল রাখে এবং এর অধীনে একটি নিয়মিত জামাআত অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে সংস্কার, সংশোধন ও ইসলামী দাওয়াতের সেই সব দায়িত্ব সম্পাদন করে, যেগুলো হচ্ছে দ্বীন ইসলামের বুনিয়াদ ও ভিত্তিস্বরূপ।

মীলাদুন্নবী উপলক্ষে বিরাট মাহফিল

কয়েকবার আমি মনস্থ করেছি উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে 'সীরাতুন্নবী' - এর উপর দু'একটি পুস্তিকা লিখে রাখতো। আজ আমি এই আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করছি এজন্য যে, যাতে গবেষক ও সুবিজ্ঞ লেখকরা বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিদান করেন এবং একটি প্রাথমিক পরামর্শ তাঁদের সামনে এসে যায়। রাবীউল আউয়াল পর্যন্ত যদি কোন বিজ্ঞজনের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট না হয় তাহলে আমি নিজেই সীরাতের উপর কিছু ভাষণ রচনা করবো। কোন একটি বড় শহরে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে একটি বিরাট মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে এবং তাতে শুধুমাত্র সীরাতের উপর বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী ভাষণ প্রদান করবেন -এ ধরনের একটি ব্যবস্থাপনার কথাও দীর্ঘদিন থেকে আমার চিন্তা ভাবনায় আছে। যদি আল্লাহ্ তাওফীক দেন তাহলে এ বছর লাহোর কিংবা লক্ষ্ণৌতে রাবীউল আউয়াল মাসে একটি কেন্দ্রিয় মজলিস অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

[এ প্রবন্ধটি নভেম্বর, ১৯৯৩ সনে 'আল হিলাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী বছরের আগষ্ট মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং আল-হিলালের দু'হাজার টাকার যামানত বাজেয়াপ্ত করে অতিরিক্ত আরো দশ হাজার টাকার যামানত তলব করা হয়। এ কারণে পত্রিকাটি বন্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কেননা দশ হাজার টাকার যামানত দাখিল করা হলেও এই আশা ছিল না যে, পত্রিকাটির উপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত আর কোন বাধা আসবে না। যা থেকে শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা কার্যকর হল না এবং এর এক বছর পর মাওলানা 'আল হিলাল' এর স্থলে 'আল বালাগ' বের করেন। 'আল-বালাগ' এর মধ্যে প্রধানত: 'তরজমানুল কুরআন' তাফসীরের ভূমিকা' এবং স্বয়ং তাফসীর (আল বায়ান)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কয়েক মাস পর মাওলানাকে বেঙ্গল থেকে বহিষ্কারের নিদের্শ জারী করা হয়। ফলে কোলকাতা ছেড়ে তাঁকে রাঁচিতে চলে যেতে হলো। সেখানে তাঁকে নযরবন্দী করে রাখা হয়। এরপর ডিসেম্বর, ১৯১৯ ইং সনে তিনি মুক্তিলাভ করেন]।

টীকা ঃ

১। মরহুম মাওলানা শিবলীর মত মরহুম মাওলানা আযাদও উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়েছিল বলে মনে করতেন। কিন্তু এটাকে পরাজয় আখ্যা দেওয়া ঠিক বলে মনে হয় না। অবশ্য এই যুদ্ধে মুসলমানরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত কুরায়শরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানরা 'হামরাউল আসাদ' পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। হামরাউল আসাদ মদীনা থেকে আট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। যখন বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, কুরায়শরা মক্কার দিকে চলে গেছে তখন মুসলমানরা হামরাউল আসাদ থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মর্যাদা ও স্থান

[কুরআন ও হাদীসের আলোকে]

'আল হিলাল' - এর একটি প্রবন্ধের অংশে মাওলানা লিখেছিলেন, "মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ (সা) স্বীয় জীবনের তেষট্টি বছর চার মাস পর, আপন প্রভুর কোলে জীবন লাভ করলেন।" ..... -এর উপর আপত্তি উত্থাপন করা হয় এবং মাওলানা ঐ আপত্তিকারীর চিঠিটি আল-হিলালে ছাপিয়ে দিয়ে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অপর এক ব্যক্তি মাওলানার কাছে এই মর্মে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, খ্রীষ্টানরা হযরত মাসীহ (আ) কে বিনা দ্বিধায় 'মাসীহ' লিখেন এবং মুখেও তাই বলেন। আর কোন কোন স্থানে, যেখানে কথা সংক্ষিপ্ত করণের প্রয়োজন রয়েছে সেখানে এভাবে বলাটাই তো বাঞ্ছনীয়। এ প্রেক্ষিতে বলছি, এ সম্পর্কে কি এমন কোন ধর্মীয় নির্দেশ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নামের সাথে কোন সম্মানসূচক শব্দ অবশ্যই যোগ করতে হবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা বলেন, এখন শুধুমাত্র কোন বাক্যের খন্ডাংশের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে নি। বরং আপনি আপনার প্রশ্নের মাধ্যমে একটি মৌলিক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। আক্ষেপের বিষয় যে, এই অধম আপনার চিন্তাধারার সাথে কখনও একমত হতে পারে না।

সত্যিকার মর্যাদা ও তার স্থান

নিঃসন্দেহে সত্যিকার শিষ্টাচার ও মর্যাদা প্রদান সেটাকেই বলা হয়, যা মুখ থেকে নয়, বরং অন্তর থেকে আসে। মানুষের কোন বিশ্বাস বা চিন্তা এমন নয়, যার ঘর অন্তরে নয়, বরং গলায়। ই'তিকাদ বা বিশ্বাস জিনিসটিই এমন, যা অন্তর ও মস্তিষ্কের সাথে সম্পর্ক রাখে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط

"ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নি।"(৪৯ : ১৪)

এতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে ঈমানের ঘর অন্তর - যবান বা গলা নয়।

কিন্তু এই সাথে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, অন্তরের ই'তিকাদের (বিশ্বাসের) তরজমান (INTERPRETER) কে? কী করে জানা যাবে যে, এই অন্তর আবূ যর গিফারী (র) এর এবং এই অন্তর পাপাচারী আবূ জাহ্লের? এর পরিষ্কার উত্তর এই যে, এটা বুঝা যাবে শুধু মাত্র আমলে ও যবানের স্বীকৃতি দ্বারা। কেননা বাহ্যিক অবস্থা দ্বারাই আমরা যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। যদি এই নীতি না মানা যায় তাহলে তো দুনিয়াতে সাদা - কালোর মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না। কানূনের দিকে তাকান, দেখবেন, সে নিয়াত এবং সংকল্পকে যথার্থ মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে না। কিন্তু যদি আপনি কোর্টে গিয়ে বিচারককে 'ইউর অনার' (YOUR HONOUR) না বলে 'তুমি' সম্বোধন করেন তাহলে আপনি যতই বলুন সম্মান প্রদানের জায়গা হচ্ছে অন্তর যাবান নয়, তিনি আপনাকে ১৭৭ ধারার অভিযোগ থেকে মুক্ত করে দেবেন, এমন আশা করা যায় না।

ইক্‌রার (মুখে স্বীকার), তাস্‌দীক (অন্তরে বিশ্বাস)

ধর্মও একটি রূহানী কানুন। স্বয়ং ধর্মই এই নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে- إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ -"যাবতীয় কর্মের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।"

কিন্তু সাথে সাথে সে বাহ্যিক আমল ও মুখের কথাকেও গুরুত্ব প্রদান করে। এ কারণেই কুরআন করীমের বার বার এই ঘোষণা সত্ত্বেও যে, ঈমানের সম্পর্ক শুধুমাত্র অন্তর ও বিশ্বাসের সাথে - আমরা এই অত্যন্ত সত্য সংজ্ঞাটি ইসলামের আকায়িদের মধ্যে স্বীকার করে নিয়েছি যে;

اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْجَنَانِ وَعَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ ۔

(যবান দ্বারা স্বীকার করা, অন্তর দ্বারা সত্যায়ন করা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করা)। আপনি বলবেন, সম্মান প্রদানের আসল জায়গা হচ্ছে অন্তর। আমি বলি, যেহেতু আসল জায়গা অন্তর তাই বোধ হয় আজকালকার শিক্ষিত ব্যক্তিদের যবান ও আমল তাযীম ও শিষ্টতা থেকে সম্পূর্ণ খালি। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব যে, যে নাম অন্তরে প্রিয় ও পছন্দনীয়, সে নাম যখন যবানে উঠবে তখন তা ভালবাসা ও সম্মান থেকে মুক্ত থাকবে? যদি আপনি কাউকে মনে প্রাণে চেয়ে থাকেন তাহলে আমি কি বলেছি তা উপলব্ধি করতে পারবেন। এ সম্পর্কে জনৈক ফারসী কবি যে মন্তব্য করেছে, তার সারমর্ম হলো, "(হে প্রিয়), তোমার নাম নিয়ে শপথ করাটাও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধের পরিচায়ক নয়। তোমার পবিত্র ভূমিতে এটাও একটা ভীষণ অশিষ্টতা।"

একজন মুহাদ্দিসের ভাষ্য

আজকাল বেশীর ভাগ লেখক ও বক্তাদের দেখি যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র নামের শব্দ সমূহের আধিক্যের ভয়ে তাঁর জন্য ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা (بانی اسلام) - এই শব্দটি গড়ে নিয়েছেন। তারা তাদের লেখায় ও বক্তৃতায় , 'ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা' এই বলেছেন, 'ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা' এভাবে বলেছেন' প্রভৃতি বলেন এবং লিখেন। এভাবে তাদের যবান হুবহু তাদের অন্তরের 'ইলহাদ' (বেদ্বীনী) - কে প্রকাশ করে থাকে। যদি একথা সত্য.হয় যে, তাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি সম্মানবোধ রয়েছে তাহলে তো তারা বার বার তাদের মাহবূব তথা প্রিয়জনের নাম দরূদ ও সালামের সাথে উচ্চারণ করতেন। কেননা প্রেমিক তার মাহবূবকে স্মরণ করার যত সুযোগই পাবে ততই আগ্রহ সহকারে সে তার সদ্ব্যবহার করবে। কেননা এটাই তো তার অন্তরের চাহিদা তথা জীবনের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, ইলমে হাদীসের প্রতি আপনার আগ্রহের এই আতিশয্য কেন? তখন তিনি উত্তরে বলেন-এজন্য যে, আমাকে বার বার قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ...... صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۔ [রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন] এই বাক্য উচ্চারণ করতে হয় এবং এভাবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর পবিত্র নাম উল্লেখ করার এবং তাঁর উপর দরূদ ও সালাম নিবেদন করার সুযোগ পাই।

কুরআনের সমর্থন

শুধুমাত্র আন্তরিক বিশ্বাস এবং সম্মান প্রদর্শনের ইসলামী রেওয়াজই এর কারণ নয়; বরং এর সমর্থনে রয়েছে পবিত্র কুরআনের এমন সব অকাট্য আয়াত, যেগুলোকে কুরআনে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারবেন না।

যখন বনী তামীমের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় উপনীত হয় তখন রাসূলুল্লাহ(সা) আপন ঘরে অবস্থান করছিলেন। ঐ অগুরা দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে নাম ধরে উচ্চস্বরে ডাকতে শুরু করে। তারা বলতে থাকে-

يَامُحَمَّدُ (صلى الله عليه وسلم) اُخْرُجْ اِلَيْنَا .

"হে মুহাম্মদ, তুমি আমাদের দিকে বেরিয়ে এসো।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রতি তাদের এই অশিষ্টতা প্রদর্শন আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় ঠেকল এবং সঙ্গে সঙ্গে নাযিল হলো-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لاَيَعْقِلُوْنَ . وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط

"যারা ঘরের পেছন থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ, আপনি বের হয়ে ওদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি ওরা ধৈর্য ধারণ করত, তা-ই ওদের জন্য উত্তম হত।" (৪৯ঃ ৪-৫)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَبْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لاَتَشْعُرُوْنَ .

"হে মু'মিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না। কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।"(৪৯ ঃ২)

রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন

আল্লাহ তা'আলার কাছে এটাও পসন্দনীয় নয় যে, কেউ তার নবীর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলুক। সম্মান প্রদর্শন ছাড়া তাঁর নাম নেওয়া তো দূরের কথা। কুরআন অধ্যয়ন করলে আপনি জানতে পারবেন যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সর্বত্রই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের নমুনা প্রতিষ্ঠা করেছেন। পবিত্র কুরআনে যত নবীকে সম্বোধন করা হয়েছে, তা তাঁদের আসল নাম ধরেই করা হয়েছে।। যেমন -

يٰاٰدَمُ اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ . الْجَنَّةَ

"হে আদম, তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর।"(২ ঃ৩৫)

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى .

" হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি?" -(২০ ঃ ১৭)

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ .

"হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি।"(৩৮ ঃ ২৬)

يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ اِسْمُهُ يَحْيٰى .

"হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া"। -(১৯ ঃ৭)

সম্বোধনের উপরোক্ত ধারা অনুযায়ী এটাই সঙ্গত ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কেও 'হে মুহাম্মদ' অথবা 'হে আহ্মদ' নামে ডাকবেন; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি এমনি এক বিশেষ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করেন যে, কুরআন মজীদের কোথাও তাকে নাম ধরে সম্বোধন করেননি। বরং যেখানেই তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানেই তাঁর আসল নাম না ধরে এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যেমনঃ يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ .

" হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার করুন।" -(৫ ঃ ৬৭)

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ .

"হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন।" - (৯ ঃ ৭৩)

يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ . -"হে বস্ত্রাবৃত।" -(৭৩ ঃ ১)

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . -"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত।" -(৭৪ ঃ ১)

[-কথায় বলে প্রিয়জন যা করে তা-ই প্রিয়।]

আর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত কায়েম করবেন-ই না কেন? যে শহরে রাসূলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই শহর তো আল্লাহ তা'আলার কাছে এতই প্রিয় যে, তিনি স্বয়ং তার কসম খেয়েছেন। যেমন-

لاَ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ . وَاَنْتَ حِلٌّ م بِهٰذَا الْبَلَدِ .

" শপথ করছি এই নগরের। আর আপনি এই নগরের অধিবাসী।"-(৯০ ঃ ১-২)

ভালবাসা ও ঈমান

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, অন্তরের ই'তিকাদ বা বিশ্বাস হচ্ছে একটি বীজ, যা ভালবাসা ছাড়া অঙ্কুরিত হয় না। আর ভালবাসার জন্য সম্মান প্রদর্শন অপরিহার্য। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে-

وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ط

"রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর।" -(৪৮ ঃ ৯)

মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়ের উপর অনেক তর্ক বিতর্ক করেছেন। তাঁদের তর্কের বিষয়বস্তু হলো, মু'মিনের জন্য আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের মুহাব্বত- শরীয়তের হুকুম-আহকাম মান্য করার অনুরূপ বাধ্যতামূলক কি না। কেননা মুহাব্বত ইখতিয়ারী (ইচ্ছাধীন) বিষয় নয়, বরং আসল জিনিস হচ্ছে ইসলামের হুকুম-আহকামের অনুসরণ। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এখানে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার কোন সুযোগই নেই। মুহাব্বত ইচ্ছাধীন, না বাধ্যতামুলক-এই প্রশ্ন তখনই উত্থাপিত হবে, যখন মুহাব্বত ও ঈমান হবে দু'টি পৃথক পৃথক বস্তু।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলাম হচ্ছে আপাদমস্তক মুহাব্বত। এবং ঐ ঈমানকে ঈমান বলা যায় না, যা মুহব্বত শূন্য।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ‎.

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম। (২ ঃ ১৬৫)

এখানে মুমিনদের এই চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যস্থানে য়াহুদীদের একটি দাবীর প্রত্যুত্তরে (তাদের দাবী এই ছিল যে, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তার প্রিয়জন) বলা হয়েছে -

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ‎.

"বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"-(৩ ঃ ৩১)

যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অনুসরণ আল্লাহকে ভালবাসার শর্ত হিসাবে বিবেচিত হয় তাহলে তো তাঁকে ভালবাসা আরো বড় ধরনের শর্ত হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। কেননা তাঁর ভালবাসা যার অন্তরে নেই, সে তাঁর কী অনুসরণ করবে?

হাদীসের সাক্ষ্য

বুখারী-মুসলিমের নিম্নোক্ত বিখ্যাত হাদীসটির অর্থও তাই।

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ‎.

"তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতামাতা, তার সন্তানাদি এবং সব মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় হই।"

অপর একটি হাদীসে আছে, যখন হযরত উমর (রা) তাঁকে বললেন-

لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا نَفْسِىْ ‎.

" আপনি আমার কাছে সব জিনিসের চাইতে অধিক প্রিয়-তবে আমার প্রাণের চাইতে অধিক নয়।"- তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বললেন-

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ ‎.

"কসম ঐ সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রাণের চাইতে অধিক প্রিয় হই।"

এবার হযরত উমর বললেন- اَنْتَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى نَفْسِىْ ‎.

"আপনি আমার কাছে সকল জিনিসের চাইতে, এমন কি আমার প্রাণের চাইতেও অধিক প্রিয়।"

-তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, اَلْاٰنَ يَا عُمَرُ -"হে উমর, এবার তোমার ঈমান পূর্ণ হলো।"

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, এবার বিচার-বিবেচনা করে দেখুন, আমি কোথায় এবং এ যুগের মানুষেরা কোথায় ? মানুষেরা যে বস্তুকে ঈমানের 'ভূমন্ডল' বলে থাকে আমি তো সেটাকে ঐ প্রিয় সত্তার (রাসূলুল্লার) মুহাব্বতের

পরমাণুর মধ্যে নিরীক্ষণ করি। এবার আপনি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে, যা ইচ্ছা তাই আখ্যা দিতে পারেন। এ সম্পর্কে একজন ফারসী কবি যা বলেছেন, তার সারমর্ম হলো ঐ হাদীস, যাতে বলা হয়েছে-

اَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِىْ ٠

"আমি আমার প্রভুর সাথে রাত্রি যাপন করি। তিনি আমাকে যা খাইয়েছেন, আমি তা খেয়েছি এবং যা কিছু পান করিয়েছেন, তা পান করেছি।"

মাকবূল দ্বীন

কিন্তু আজ বিশ্বের অবস্থা অন্য রকম। আজকালকার আবহাওয়া এই সব কথার প্রতি আগ্রহ প্রদর্শনের অনুকূল নয়। কাকে বলা হবে এবং কাকে শুনানো হবে এই সব কথা। যে সব অন্তরে আল্লাহর বিশ্বাসই জায়গা পায় নি সেখানে রাসূল (সা) ও কুরআনের সম্মান আসবে কোত্থেকে? যে ব্যক্তি রিসালত—পদ এবং অহীর অস্তিত্বের উপর বিশ্বাসী নয়, তার কাছ থেকে রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আশা কোন্ অজ্ঞান করতে পারে ? আর রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অর্থ ইসলামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন তথা ইসলামের অনুসরণ। আর ইসলাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য হলো -

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ٠

"কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" (৩ঃ ৮৫)

পবিত্র সত্তার আবির্ভাব

পবিত্র সত্তার আবির্ভাব

জন্ম তারিখ

রাসূলুল্লাহ (সা) বসন্ত ঋতুতে, ৯ রাবীউল আউয়াল, 'আমুল ফীলে' (যে বছর আবরাহা হস্তিবাহিনী নিয়ে কা'বা আক্রমণ করতে এসেছিল), মুতাবিক ২২ এপ্রিল, ইং ৫৭১ সন, মুতাবিক ১লা জ্যৈষ্ঠ, ৬৮২ বিক্রমী সন মক্কা মুয়াযযামায় সুবহে সাদিকের পর এবং সূর্য উদয়ের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। এটা লেখক মরহুম কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান মানসূরপুরীর বর্ণনা। 'রাহ্‌মাতুল লিল আলামীন' গ্রন্থে কাযী সাহেব আরো বলেন, সোমবারের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পবিত্র জীবনের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। তাঁর জন্ম হয়েছে এই দিনে, হিজরত করেছেন এই দিনে, কুবায় প্রবেশ করেছেন এই দিনে এবং তাঁর ওফাতের ঘটনাও ঘটেছে এই দিনে। হিসাব অনুযায়ী তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ ৯ই রাবীউল আউয়াল প্রমাণিত হয়।

মরহুম মাওলানা শিবলী লিখেছেন, মিসরের বিখ্যাত জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ মাহমুদ পাশা ফালাকী, গাণিতিক দলীল-প্রমাণ দ্বারা এই তারিখই প্রমাণ করেছেন।

গ্রেগোরিয়ান হিসাব মতে সেদিন ছিল ২২ এপ্রিল। মরহুম কাযী সাহেবও বিস্তারিত হিসাব দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, ঐ দিন ছিল ২২ এপ্রিল। তিনি আরো বলেন, 'রৌদ্র কিরণ ঘড়ির ঘণ্টার হিসাবে ঐ দিন মক্কা মুকাররমায় সুবহে সাদিক হয় ৪টা ২০ মিনিটে। আর বিক্রমী সন অনুযায়ী তখন ১লা জ্যৈষ্ঠ্যের দিন শুরু হয়ে তের ঘণ্টা ষোল মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেছে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য রাহ্‌মাতুল লিল আলামীন ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা - ৪২ দ্রষ্টব্য)।

মাওযূ (বানোয়াট) রিওয়ায়াত

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জন্ম সম্পর্কে অনেক মাওযূ ও দুর্বল রিওয়াত চালু হয়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে মাওলানার কাছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি তা প্রদান করেন। উক্ত প্রশ্নোত্তর 'আল হিলাল'- এর ১৩ ফেব্রুয়ারী, সন ১৯১৩,সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রশ্নের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, যতক্ষণ এটা সামনে না থাকবে ততক্ষণ মাওলানার উত্তরের হাকীকত অনুধাবন করা যাবে না। অবশ্য বিভিন্ন রিওয়ায়াতের দীর্ঘ মতন (বচন) এ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেননা এগুলোর প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সংক্ষেপে মাওলানার উত্তরের মধ্যে এসে গেছে। এই সাথে মীলাদ উপলক্ষে প্রদত্ত মাওলানার একটি বক্তৃতাও উদ্ধৃত করা হয়েছে।

মীলাদুন্নবী ও মাওযূ' (বানোয়াট) রিওয়ায়াত—১

প্রশ্ন

কিছু দিন পরই পবিত্র রাবীউল আউয়াল মাস শুরু হবে। তখন বিভিন্নস্থানে মাওলূদ শরীফের মজলিস বসবে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে এই সব মজলিস বসে এবং যে অবস্থাদি ও ঘটনাবলী তাতে বর্ণনা করা হয়, জানি না এ সম্পর্কে আপনি কি ধারণা পোষণ করেন। আমি তো এই বিষয়টিকে অত্যন্ত আক্ষেপজনক মনে করি এবং বিশ্বাস করি যে, এই অবস্থাদি এবং ঘটনাবলীই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র জীবন সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে নানা সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি করে থাকে।

দীর্ঘ দিন থেক আমার এই ইচ্ছা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের অবস্থাদির উপর একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা প্রণয়ন করব, যা মাওলূদ শরীফের মসলিস সমূহে পঠিত হবে। কিন্তু যে ধরনের অবস্থাদি আমি অনুসন্ধান করছিলাম তা কোথাও পাচ্ছিলাম না। বেশ কিছুদিন পূর্বে আমীর আহমদ আমীর মিনায়ী এ বিষয়ের উপর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাতে উল্লেখ করেছিলেন যে, একজন বিরাট আলিমের সাহায্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের অবস্থাদি এতে লিখা হয়েছে। পুস্তিকা দেখলাম আগা-গোড়া ঐ সব কেচ্ছা কাহিনীতেই পূর্ণ।

ঐ বছরই আমি এর উপর একটি খসড়া তৈরী করি এবং তা সংশোধনের উদ্দেশ্যে কয়েকজন দ্বীনী আলিমের কাছে পেশ করি। কিন্তু তারা তা পড়ে আমার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এ কারণে যে, তাতে নাকি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মলগ্নের ঐ সব ঘটনার কোন উল্লেখ করা হয় নি, যা মাওলূদের যাবতীয় কিতাবে রয়েছে। আমি তখন তাদেরই মধ্য থেকে জনৈক গ্রন্থকার আলিমের কাছে নিবেদন করলাম, এই সব ঘটনা কি ইতিহাস ও হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহে রয়েছে? তিনি উত্তরে লিখলেন, "এই সব ঘটনা ও মু'জিয়া সঠিক এবং এগুলোকে সকল ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস হরহামেশা বর্ণনা করে আসছেন। উপরন্তু ইসলামের মহান ব্যক্তিরাও এগুলোকে সত্যায়িত করেছেন এবং মসলিসসমূহে পড়েছেন অথবা শুনেছেন। অবশ্য আজকালকার জড়বাদী ও বিধর্মী লোকেরা এগুলোকে মেনে নিতে ইতস্তত: করে এ জন্য যে, ইংরেজী বইপুস্তকে এগুলোর কোন উল্লেখ নেই।"

আপনি সর্বদা আমাদের ইংরেজী শিক্ষিতদেরকে ধর্মহীনতা ও ধর্মীয় অন্যমনস্কতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে থাকেন। কিন্তু যে ভঙ্গিতে ও যে পদ্ধতিতে আপনি তা করেন, তাতে আমরা আপনার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং এই প্রেক্ষিতে আমরা আপনাকে আমাদের শুভাকাংখী ও সংস্কারক বলে মনে করি। কিন্তু আল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে আপনি আমাকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করুন যে, উল্লেখিত ঘটনাসমূহ সত্যি সত্যি নির্ভরযোগ্য বই পুস্তকে লিখা রয়েছে কিনা? আর এগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা কি জড়বাদিতা বা ধর্মহীনতা? যদি প্রকৃত ব্যাপার তাই হয় তাহলে অনুগ্রহপূর্বক বিচার-বিবেচনা করে বলুন, এই সব ঘটনা কি বিবেক-সম্মত? আর এগুলোকে আজকাল কেউ সমর্থন করতে পারে কি-না। এতকথা বলার পরও যদি আপনারা আমাদের উপর ধর্মহীনতা বা ধর্মকে উপেক্ষা করার অভিযোগ উত্থাপন করেন তো করতে পারেন, কিন্তু আমাদের বুদ্ধিতে মোটেই আসছে না, এ ঘটনাগুলো আসলে কি? যেমন ঃ

১। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মলগ্ন যখন ঘনিয়ে এল তখন একটি সাদা মোরগ আবির্ভূত হল এবং হযরত আমিনার কাছে এল। তাছাড়া ঐ রাত্রে সব পশুপাখী কথা বলেছিল।

২। জন্মের পূর্বে হযরত মারয়াম (আ) ও হযরত আসিয়া (রা)-এর শুভাগমন এবং হযরত আমিনাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)- এর জন্মের সুসংবাদ প্রদান করেন।

৩। হযরত আবদুল্লাহ্‌র সাথে যখন হযরত আমিনার বিবাহ হয় তখন দু'শ স্ত্রীলোক ঈর্ষাবশত: প্রাণ ত্যাগ করেছিল।

৪। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মের দিন ইরানের অগ্নিকুন্ড নিভে গিয়েছিল, নওশেরওয়ানের প্রাসাদের চূড়া ভেংগে পড়েছিল এবং কা'বা ঘরের মূর্তিগুলোও মাথা নুইয়ে নিয়েছিল।

৫। জন্মের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছু সময়ের জন্য অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর কেউ জান্নাতী পরিচ্ছদে জড়িয়ে তাঁকে এনে রেখে গিয়েছিল।

৬। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মের সময় রং-বেরংয়ের আলো জ্বলে উঠেছিল এবং আজব ধরনের নানা আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আলোচনা মাহফিলের মর্যাদা

মাওলানা উক্ত প্রশ্নের উত্তরে লিখেন ঃ

আপনার ধর্মীয় আগ্রহ-উদ্দীপনা, ঈমানের প্রতি আসক্তি এবং মাওলূদ শরীফের মজলিস সমূহের সংশোধন-চিন্তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও ধন্যবাদার্হ। এজন্য আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আপনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় আলোচনার সুত্রপাত করেছেন। আমার মন চাচ্ছে, এর উপর কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে যেতে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, সেরূপ সময় ও সুযোগ আমার হাতে নেই। অতএব প্রয়োজনীয় কয়েকটি বাক্যের মাধ্যমেই আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করছি।

আজ মাওলূদের মজলিসসমূহের অবস্থা আজগুবীই বটে। লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বলতে হয় যে, এইসব মজলিসের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, অধিক উপকারী এবং মুসলিম মিল্লাতের পথ প্রদর্শনের জন্য অধিক গুরুত্ববহ আর কোন মজলিস বা বৈঠকই হতে পারে না। কিন্তু এগুলোর অনুষ্ঠান-পদ্ধতির প্রতি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন, মজলিশী তথা সমষ্টিগত শক্তিসমূহ অযথা নষ্ট করার, এর চাইতে অধিকতর আক্ষেপজনক আর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবেনা। ইসলাম ছিল একটি সামগ্রিক শিক্ষা আর এই শিক্ষার বাস্তব নমুনা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا .

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"—(৩৩ ঃ ২১)

হযরত আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এই 'মহান চরিত্রের অধিকারীর' চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তাঁর চরিত্র হচ্ছে এই কুরআন। যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চরিত্র দেখতে চাও তাহলে কুরআনকে দেখ। তিনি হচ্ছেন এই 'লিপিবদ্ধ কিতাবেরই' এক 'দেহধারী ছায়া,' এবং এর বাস্তব আদর্শের এক 'লাওহে মাহফূয।'

وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

"এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগীতা করুক।" —(৮৩ ঃ ২৬)

মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ?

অতএব মাওলূদের মজলিস্ সমূহের মূল উদ্দেশ্য এ হওয়া উচিত ছিল যে, এগুলো যেন 'জামালে ইলাহী' (আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যের) এর 'তাজাল্লীগাহ' (প্রতিফলন স্থল) হয়। এতে যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জীবনের সঠিক অবস্থা শুনানো হয়, তাঁর মহান চরিত্র ও ফাযায়িলের (প্রকৃষ্টতার) অনুসরণ ও অনুকরণের প্রতি মানুষকে দাওয়াত

দেওয়া হয় এবং তাঁর কাজকর্মকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। কেননা এগুলোই হচ্ছে একজন মুমিন-মুসলিমের আদর্শ চরিত্র গঠনের মূল উপাদান। এগুলোর অনুসরণেই সাহাবা কিরামের জীবনকে সেই পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসার এই ঘোষণা—

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ

"যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে"—(৫ঃ৫৪); দ্বারা তাদের প্রশংসা করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অনুসরণে তাঁরা নিজেরা আল্লাহ্র ভালবাসায় পরিণত হয়েছেন। যেমন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ·

"বলো, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"—(৩ঃ৩১)

যদি এরূপ হত তাহলে মুসলমানদের জন্য দুনিয়া আখিরাতে এই মজলিস সমূহের চাইতে অধিকতর সৌভাগ্য লাভের মাধ্যম আর কি হত? এই সব কনফারেন্স ও আনজুমান যেগুলোর চারদিকে হৈ চৈ লেগে আছে, এক দিকে আর সেই পবিত্র মজলিসের এক মুহূর্ত অন্যদিকে যে মজলিসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুপম আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অতএব আমাদের মজলিসসমূহে এই অনুপম আদর্শেরই আলোচনা হওয়া উচিত, যাতে এ থেকে শ্রোতারা শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে একজন আদর্শ মানুষের জীবন হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়াস পায়।

সূরত (আকৃতি) আছে হাকীকত (স্বরূপ) নেই

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের আমালের আকৃতি মুছে যায় নি, কিন্তু হাকীকত ধ্বংস হয়ে গেছে। জাতীয় অধঃপতনের অর্থই এই যে, সমগ্র জাতীয় ও ধর্মীয় তৎপরতা বাহ্যত: বহাল থাকে, কিন্তু সেগুলোর আত্মা হারিয়ে যায়। অবস্থা এই নয় যে, আমাদের মসজিদ সমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। বরং সেগুলোতে এতবেশী ঝাড়বাতি ও ফানূস রয়েছে, যেগুলোর দ্বারা মসজিদ সমূহকে এক একটি আলোর টুকরা বানান হয়ে থাকে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে অন্তর উজাড় হয়ে গেছে। আর অন্তর হচ্ছে এমন ঘর, যা একবার উজাড় হয়ে গেলে পুনরায় আবাদ হওয়াটা খুবই কঠিন। একজন উর্দূ কবি বলেছেন-

"আমার ভয় হয়, জীবন্ত অন্তরটি
না আবার মরে যায়,
হে অন্তর, তোমার জীবিত থাকার নামই তো জীবন।"

পবিত্র কুরআনের ভাষায় -

فَاِنَّهَا لَاتَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ·

"বস্তুত: চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।" —(২২ ঃ ৪৬)

কি বলতে গিয়ে আমি কি বলতে শুরু করেছি। যা হোক, মাওলূদের মজলিস সমূহ আপন লক্ষ্যের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ দ্বীনী আমল-ই ছিল, যার অবয়ব বহাল আছে বটে, কিন্তু হাকীকত লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন এটা অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির ন্যায় কেবল একটি গতানুগতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং এটাকে আমীর তথা বড়লোকেরা তাদের ঐশ্বর্য প্রদর্শনের একটি মাধ্যম হিসাবেই বেছে নিয়েছে।

দুর্বল রিওয়ায়াত ও জাল কাহিনী সমূহ

আক্ষেপের বিষয়, রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবনের সঠিক অবস্থাদি এবং তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের জায়গা আজ দখল করে নিয়েছে কেবল (তাঁর জন্মের ঘটনার) কয়েকটি দুর্বল রিওয়ায়াত ও বানোয়াট কেচ্ছা-কাহিনী। আজ

এগুলোর উপরই উৎসর্গ করা হচ্ছে জাতীয় ও ধর্মীয় আগ্রহ-উদ্দীপনা। আর এই অবস্থা যদি শুধু সাধারণ মানুষের হত তাহলে অভিযোগের কারণ ছিল না। কিন্তু শত বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটি ঘটে যাচ্ছে খোদ ঐ উলামা বৃন্দের উপর দিয়ে, যারা হাদীস ও সীরাতের উপর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখা সত্ত্বেও ঐসব মজলিসে হাযির হয়ে নীরবে উল্লেখিত বানোয়াট কেচ্ছাকাহিনী শ্রবণ করেন, নিজেরা সেগুলো পাঠ করেন বা অন্যদের দিয়ে পাঠ করান। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তাদের অন্তরে এগুলোর যাচাই বাছাইয়ের আগ্রহ জাগ্রত হয় না।

হায়! এ মজলিস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সুন্নাত, না বিদআত-এ ব্যাপারে যত তর্কবিতর্ক করা হয়েছে, তা যদি এই সব মজলিস সংস্কারের জন্য ব্যয় করা হত। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, কোন ব্যাপারে জাতির মধ্যে যে আগ্রহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তা একটি শক্তি বিশেষ। তাই সর্বপ্রথম এই চেষ্টা করা উচিত যে, শক্তিকে নষ্ট না করে কোন উপকারী কাজে নিয়োগ করা। অবশ্য আসল কাজই যদি শরীয়ত থেকে বাঁকা হয় এবং সংস্কার ও সংশোধনের উপায় না থাকে তাহলে এর মূলোৎপাটনের প্রচেষ্টা সৎকাজের মধ্যে গণ্য এবং তা অবশ্যই করতে হবে।

ধর্মের নির্বোধ সহায়তাকারী

হাজার বিস্ময় ঐ আলিম, লেখক ও সংকলকের জ্ঞান ও বিজ্ঞতার দাবীর উপর, যাদের উত্তরের বাক্য বিশেষ আপনি আপনার প্রশ্নের মধ্যে উদ্ধৃত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এরাই হচ্ছে ধর্মের নির্বোধ সহায়তাকারী, যাদের বন্ধুসুলভ সাহায্য-সহায়তা সর্বদা ধর্মের জন্য শত্রুদের বিরোধিতার চাইতেও অধিক ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। আপনি যে সব রিওয়ায়াত সম্পর্কে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন, সেগুলোকে অস্বীকার করা জড়বাদিতা নয়, ধর্মহীনতাও নয়, বরং ইসলাম ও ইসলামের একটি দাবী মাত্র। জ্ঞান ও বিজ্ঞতার অধিকারী যে কোন ব্যক্তি, যিনি হাদীস ও সীরাত বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান রাখেন, তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ঐ সব রিওয়াতকে সঠিক বলে মেনে নেবেন না- নিতে পারেন না।

আপনি, এ ক্ষেত্রে যে শ্রম স্বীকার করেছেন, সেজন্য নি:সন্দেহে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আক্ষেপের বিষয়, জ্ঞানের দাবীদার ঐ মূর্খ ব্যক্তিরা অযথা ধর্মীয় আবেগ-উদ্দীপনাকে ব্যবহার করেছেন, অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কোথায় কিভাবে এটাকে ব্যবহার করতে হবে সে খবর আমাদের উলামা রাখেন না।

বহু লোক এমন আছেন, যারা ধর্মীয় কঠোরতা ও দ্বীনী পক্ষপাতিত্বকে বর্তমান যুগের উলামা বৃন্দের প্রতি সম্পর্কিত করে থাকেন এবং বছরের পর বছর ধরে তারা এর সমালোচনাও করে আসছেন। কিন্তু আমি এটাকে সঠিক বলে মনে করি না। আমার তো অভিযোগ এই যে, যে ধরনের ধর্মীয় কঠোরতা উলামা বৃন্দের মধ্যে থাকা উচিত, আক্ষেপের বিষয়, তা তাঁদের মধ্যে নেই। শত শত বিষয় এমন আছে, যেগুলোতে পরিস্কার অর্থে তাঁদের মাত্রাতিরিক্ত উপেক্ষা লক্ষ্য করা যায় এবং দেখা যায় যে, তাঁরা ন্যায় ও সত্যের ঘোষণা থেকে একান্ত জ্ঞাত সারেই তাঁদের মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। অবশ্য কিছু ছোট খাটো ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু এটা সঠিক স্থলে হয় না তাই শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল, এমনকি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষতিকরও প্রমাণিত হয়।

একটি বড় মাপকাঠি

কর্ম সম্পাদনের একটি বড় মাপকাঠি এই যে, প্রত্যেকটি শক্তির ব্যবহার তার সঠিক স্থানে হওয়া উচিত। যে বাষ্পের দ্বারা জলে জাহাজ স্থলে রেলগাড়ী ও কারখানায় মেশিনসমূহ চলে, সেটাকে আপনি চটের বস্তায় ঢুকিয়ে কোন 'ফায়ার বেলুন' বানাবার চেষ্টা করবেন না। তাতে আপনার শক্তি ও প্রচেষ্টা উভয়ই বিফলে যাবে।

এই পরিসরে বেশী কথা বলার অবকাশ নেই। অন্যথায় এর প্রত্যেকটি কথাই এক একটি বিরাট কাহিনী। আমাদের দুরবস্থা এই যে, আমাদের আমলী চাদরের কোন প্রান্তই দাগমুক্ত নয়। আপনি কোন্ কোন্ বিষয় বর্ণনা করবেন? কার অবস্থার উপর রোদন করবেন? আর এজন্য আপনি এত দীর্ঘ সময় পাবেনই বা কোথায়? একজন ফারসী কবির ভাষায়-

> "তৃপ্তিকর রাত চাই, উজ্জ্বল সুন্দর চাঁদ চাই,
> তাহলে প্রত্যেকটি বিষয়েরই আলোচনা করবো।"

রিওয়ায়াত সঠিক হওয়ার মাপকাঠি

কিন্তু এই সব রিওয়ায়াতের সঠিক বা বেঠিক হওয়া সম্পর্কে পরোক্ষভাবে আপনি যে মত প্রকাশ করেছেন-আক্ষেপের বিষয়, আমি তাতে আপনার সাথে একমত হতে পারছি না। এটি একটি মারাত্মক নীতিগত ভ্রান্তি, যার মধ্যে বর্তমান যুগের তাহ্কীক ও ইজতিহাদের দাবীদার এবং আক্ল ও নক্লের মধ্যে সামঞ্জস্য

বিধানকারী বলে কথিত ব্যক্তিগণ বছরের পর বছর ধরে হাবুডুবু খাচ্ছেন। আপনি বার বার একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, যদি এই সব রিওয়ায়াত সঠিক হয় তাহলে বিবেক-বুদ্ধি কি তা সমর্থন করবে? এর উত্তরে আমার নিবেদন এই যে, এই সব রিওয়ায়াত তো মোটেই সঠিক নয়। কিন্তু এই নীতিও তো সঠিক নয় যে, যা আপনার বিবেক-বুদ্ধি সমর্থন করবে না তা একদম ভ্রান্ত ও বানোয়াট বলে পরিগণিত হবে।

আপনি নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করুন, এই সব ঘটনা রিওয়ায়াত বিষয়ক নীতির ভিত্তিতে কতটুকু সঠিক ও গ্রহণীয়? আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি যে, আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য এতটুকু জিজ্ঞাসাই যথেষ্ট। কিন্তু এটা তো তাহকীক ও পর্যালোচনা এবং সত্যমিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের কোন নীতি হতে পারে না যে, ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের প্রথম শর্ত বিবেকবুদ্ধির সমর্থনকে নির্ধারণ করা হবে। আপনারা আজকাল নির্দ্বিধায় এই কথাটি বলে ফেলেন, কিন্তু এটা যে কত ভয়ংকর কথা তা বুঝে উঠতে পারেন না। প্রত্যেকটি ঘটনার সঠিক অথবা বেঠিক হওয়ার প্রথম মাপকাঠি হচ্ছে, তা যেন রিওয়ায়াতের নীতি অনুযায়ী বর্ণিত হয়। যদি তাই হয় তাহলে কারো বিবেকবুদ্ধি এটাকে সমর্থন করুক অথবা না করুক তাতে কিছু যায় আসে না। মার্কনী-আবিষ্কৃতি বেতার যন্ত্রের ব্যাপারটি আপনার বিবেকবুদ্ধি সমর্থন করে কিনা তা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারছি না।[১] খুব সম্ভবত: এখন পর্যন্ত আপনি এটাকে চাক্ষুষ দেখেন নি। কিন্তু আপনি প্রথমবার যখন এটা আবিষ্কারের সংবাদ ইউরোপের কোন নির্ভরযোগ্য সংবাদপত্রে দেখেছিলেন এবং সব পত্র পত্রিকায়ও যখন এটার খ্যাতি প্রচারিত হচ্ছিল, বলুন আপনি কি এটা বিশ্বাস করেছিলেন, না কি অস্বীকার করেছিলেন?

সঠিক কর্মপদ্ধতি

আপনি জানেন না, এটাই হচ্ছে সেই সীমারেখা, যেখানে পৌঁছে (লক্ষ্য ও নীতির মধ্যে ঐক্য থাকা সত্ত্বেও) আমাকে আধুনিক কালের ধর্ম সংস্কারকদের দল থেকে পৃথক হয়ে যেতে হয়। এদের অবস্থা এই যে, যে হাদীস ও যে রিওয়ায়াতকে তারা তাদের নিজেদের তৈরি বুদ্ধিগত মাপকাঠি থেকে সামান্যমাত্র দূরে দেখেন সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করার জন্য একেবারে উদগ্রীব হয়ে উঠেন এবং আক্‌ল ও নক্‌লের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোনরূপ চেষ্টা না করে ঐ রিওয়ায়াত সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে থাকেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়—

وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ.

"তোমরা এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা এটাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে, যদিও আল্লাহর কাছে এটা ছিল গুরুতর বিষয়।" -(২৪ ঃ ১৫)

অথচ তারা যদি সত্যিকার অর্থে দ্বীনী ইল্‌ম হাসিল করার সুযোগ পেতেন এবং মূল বিষয়ের উপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত তাহলে তারা দেখতেন, রিওয়ায়াত বিষয়ের উসূল ও নীতি মেনেও এই লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে।

অস্বীকার করার পৃথক ভিত্তিসমূহ

জানি না, আপনি আমার এই বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করেছেন কিনা। আমি বলতে চাচ্ছি, অনেক কথা আছে, যেগুলোকে অস্বীকার করার মধ্যে সম্ভবত: আপনার ধর্মসংস্কারকগণ ও আমি একমত। এতদসত্ত্বেও আমার ও তাদের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব রয়েছে। তারা শুধু এ কারণে অস্বীকার করেন যে, তা তাদের বুদ্ধির গোচরে আসে না এবং আমি অস্বীকার করি এজন্য যে, উসূল ও নীতি অনুযায়ী তা গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত নয়।

فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

"যদি তোমরা জান তবে বলো, দু'দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী।"-(৬ ঃ ৮১)

আপনি বলবেন, ফলাফল তো উভয়ের একই। আমি বলবো, মনযিলে পৌঁছাটাই সফরের সফলতা নির্ভরশীল নয়, বরং সফরের পথ নির্ধারণ ও নির্বাচনের উপরও অনেক কিছু নির্ভর করে।

আজকালকার সংস্কারক ও হাক্কানী উলামা

আপনি জানেন, বহু কথা আজকালকার সংস্কারকরা বলেন, আর ঐ সব কথা ইমাম গাযালী এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) ও বলেছেন। কিন্তু উভয় কথার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এক পক্ষের কথা দ্বারা বেদ্বীনী প্রতিপালিত এবং অন্য পক্ষের কথা দ্বারা দ্বীন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অথচ প্রথম পক্ষের লক্ষ্যও হচ্ছে দ্বীনকে শক্তিশালী করা। অবস্থার এই পার্থক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই পথের পার্থক্যেরই ফলশ্রুতি। আপনারা অভিযোগ করে থাকেন যে, উলামা বৃন্দ আজকালকার (আধুনিক কালের) জিনিসের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করেন না। এটা সত্য। তবে এটাও সত্য যে, আপনারা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণের কি ব্যবস্থা করেছেন? মানুষ দেখচে যে, আপনারা যেটাকে আক্‌ল ও নক্‌লের সামঞ্জস্য বিধান বলে থাকেন, সেটি কেবল একটি তীক্ষ্ণ ধারালো কাঁচি; যা হাতে তুলে নিয়ে আপনারা বিনা দ্বিধায় কাটতে শুরু করেন। তখন আপনারা না ইলমের সাথে সম্পর্ক রাখেন, না উসূল ও কাওয়ায়িদের (নিয়মনীতির) পরওয়া করেন, না বই-পুস্তকের প্রতি দৃষ্টি দেন, আর না ঐ ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ, যে ভাষা থেকে কুরআন-হাদীসকে পৃথক করা যেতে পারে না। এরপর তারা আপনাদের সম্মান করলে কি করবো?

যদিও আমি আমার বিশ্বাস মতে ঐ উপেক্ষাকেও উলামাদের একটি বিরাট ভুল বলে মনে করি, যার কারণ বর্ণনার স্থান এটা নয়; তা সত্ত্বেও তারা যদি উল্লিখিত বিষয়গুলোকে তাঁদের উপেক্ষার কারণ আখ্যা দেন তাহলে আপনাদের কাছে কি এর কোন উত্তর আছে?

আমি যে সর্বদা শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু (র) এবং তাঁর পথের অনুসারী সাইয়িদ রশীদ রেয়ার প্রশংসা করি তারও কারণ এই যে, তাঁরা হিন্দুস্তানের আধুনিক সংস্কারকদের চাইতে এ বিষয়টির প্রতি অধিক লক্ষ্য রেখেছেন, অথচ প্রয়োজন তাঁদের সামনে সেটাই ছিল, যা আজ এখানে বিদ্যমান।

মুহাদ্দিসীন শ্রেণী ও কাহিনীকারগণ

এখন আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর নিন। এখানে বুদ্ধি বা দর্শনের আশ্রয় নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এই সব রিওয়ায়াত সামগ্রিকভাবে বানোয়াট কেচ্ছা-কাহিনী ছাড়া কিছু নয়। নির্ভরযোগ্য হাদীস সমূহে এগুলোর নাম নিশানা পর্যন্ত নেই।

এখানে বিস্তারিত বিশ্লেষণের কোন সুযোগ নেই। তবে কিছু কথা অবশ্যই বলবো। এটা কত দুর্ভাগ্যের কথা যে, আজ মুসলমানদের মধ্যে যে সব জিনিসের খুব খ্যাতি রয়েছে এবং সাধারণ-অসাধারণের মধ্যে যে সব বর্ণনা সব চাইতে বেশী মকবূল ও গ্রহণীয় সেগুলোই সব চাইতে বেশী অগ্রহণযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য। এই অবস্থা প্রত্যেকটি জ্ঞান প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। ইতিহাসের মধ্যে ঐ সব গ্রন্থ এবং গ্রন্থের কাহিনীগুলো বিখ্যাত ও গ্রহণীয় যে সব কাহিনীর পর আমাদের কাছে মিথ্যার আর কোন স্তর নেই। সীরাত ও ফাযায়িলের ক্ষেত্রেও ঐ সব গ্রন্থাদি সর্ব সাধারণের কাছে গ্রহণীয়, যেগুলোর গ্রন্থকার মুহাদ্দিস গণের পরিবর্তে ছিলেন কাহিনীকার ও ওয়ায়িরা। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপদ এই যে, এখন আর কেউ প্রথম যুগের উলামাবৃন্দের কিতাবসমূহের প্রতি তাকায় না; বরং তারা প্রত্যেকটি বিদ্যা ও প্রত্যেকটি বিষয়ে পরবর্তী উলামাবৃন্দের উপর নির্ভর করে। অথচ এরা ছিলেন কেবল গোলকধাঁধার শিকারী। কয়েকটি কিতাব থেকে রসালো কিছু রিওয়ায়াত সংগ্রহ করে সেগুলোকে নতুন আকারে বিন্যস্ত করে দেওয়াই ছিল তাদের গ্রন্থ প্রণয়নের সিদরাতুল মুনতাহা বা সর্বশেষ সীমানা।

আমি উপরে 'কাহিনীকার ও ওয়ায়িয' শব্দ ব্যবহার করেছি। এদের দ্বারা আমি ঐ সব লোককে বুঝাতে চাচ্ছি, যারা ধর্মীয় কেচ্ছাকাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে ওয়ায-নসীহত করে মজলিস ও মাহফিলকে সরগরম রাখে। প্রকৃত পক্ষে এই জাতীয় লোকেরা প্রথম থেকেই আমাদের মধ্যে নানা ধরণের মিথ্যা, বানোয়াট ও আজেবাজে কাহিনী প্রচার করে আসছে। তারা নিজেদের ভাষণ - বক্তৃতাকে জনসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের কেচ্ছা-কাহিনীর সন্ধানে থাকত এবং মনোমত কাহিনী কোথাও না পেলে নিজেরাই তা বানিয়ে নিত।

কুরআনের ভাষায়–

يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ٠

"তারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, এটা আল্লাহ্‌র নিকট হতে"- (২ : ৭৯)

ওয়াযকে একটি পৃথক বিষয় হিসাবে রূপদান করেন। যেহেতু তারা যোগ্য ও লেখক ছিলেন, তাই আপন আপন মজলিসকে সীরাত ও কেচ্ছাকাহিনীর কিতাব আকারে সুসজ্জিত করে তুলতেন।

اضلوا فاضلوا، فويل لهم ولاتباعهم ٠

"তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হলো এবং অন্যান্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করলো। আপেক্ষ তাদের জন্য ও তাদের অনুসারীদের জন্য"

এ প্রসংগে মুল্লা হুসায়ন ওয়ায়িয কাশিফী এবং মুল্লা মুয়ীনুদ্দীন হিরাভীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশেষ করে শেষোক্ত ব্যক্তি, যিনি প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধ ও কেচ্ছা কাহিনী রচনা, দুর্বল ও বানোয়াট রিওয়ায়াত সংগ্রহ, কুরআন - সুন্নাহর সূক্ষ্ম অথচ বানোয়াট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং ইসরাঈলী ও য়াহূদীদের গল্প-কাহিনী ও রিওয়ায়াত সংকলনে ছিলেন অদ্বিতীয়। এরপর তারা এ জাতীয় সব বর্ণনাকে কল্পনার কাব্যিক মিথ্যা জালে আবদ্ধ করে টীকা টিপ্পনীসহ নিজেদের মজলিসগুলোতে বর্ণনা করতেন। ক্রমে ক্রমে এ গুলো স্থায়ী রোগে রূপ নেয়। বিশেষ করে ইরানের পরবর্তী যুগের উলামাগণের কেউ কেউ।

মাওলূদের উর্দু গ্রন্থাদির উৎস

সম্ভবত: অনেকেই একথা জানেন না যে, আজ উর্দু ভাষার যে সব মাওলূদ গ্রন্থ লিখা হয়েছে এবং যেগুলো আজকাল প্রায় সর্বত্রই বহুলভাবে প্রচারিত ও প্রচলিত, তার সবগুলোর বিষয়বস্তুই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ঐ মুয়ীনুদ্দীন হিরাভীর কিতাবসমূহ- যেমন, 'মাআরিজুন্ নুবুওয়াত', 'নুকরাহ্‌কার নামে 'তাফসীরে সূরা ইউসুফ ', ই'জাযে মুসাভী' নামে মূসা (আ) এর কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে নেওয়া। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই সব কিতাবের কোন কোন অংশ অত্যন্ত চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয়। যেমন-সুফী ও আরিফদের চটকদার কেচ্ছাকাহিনী, সুফীদের উক্তি ও রিওয়ায়াত সমূহ থেকে গৃহীত কুরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীস সমূহের রহস্যকথা, যা সত্যিকার অর্থে সুফীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল অথবা তিনি নিজেই তা সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। তবে একথা সত্যি যে, এই সব চটকদার কাহিনী তো কৃত্রিম ও বানোয়াট কাহিনী ছাড়া কিছু ছিল না। আর যা বানোয়াট তা তো বানোয়াটই। এগুলোর উপর কোন ভরসা করা চলে না।

এই সব ব্যক্তি ছিলেন এ জাতীয় বেশীর ভাগ বিষয়ের উদ্ভাবক। তারা এই সব বিষয় ফারসীতে লিখে প্রচার করেন এবং তা প্রথমে সমগ্র ইরানে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে হিন্দু স্তান ও অন্যান্য দেশে। যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে ঐ সব খাদ্যের প্রতি জনসাধারণের ঝোঁক থাকে, তাই এগুলো তাদের কাছে গ্রহণীয় হতে বিলম্ব হয় নি।

টীকা :

১। এ প্রবন্ধটি ইং ১৯১৩ সালের লেখা। খুব বেশী দিন হয়নি, বেতার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। মার্কনী নামক ইটালীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী তা আবিষ্কার করেন। মরহুম মাওলানা এ থেকে তারই দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন।

মীলাদুন্নবী ও মাওযূ' (বানোয়াট) রেওয়ায়াত - ২

প্রথম উৎস

আপনি যেসমস্ত রিওয়ায়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন- শুনে বিস্মিত হবেন যে, এর মধ্যে একটি ঘটনাও এমন নয় যেটাকে হাদীস-বিষয়ের নীতি অনুযায়ী শুদ্ধ বলে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। যে সব সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ আছে, সেগুলোতে এসব কেচ্ছা-কাহিনীর কোন অস্তিত্ব নেই। হাফিয সাইয়ূতী তার 'জামূউল জাওয়ামি' গ্রন্থে সব রকম হাদীস সংকলনের ব্যবস্থা করেছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তাতেও এই সব রিওয়ায়াতের কোন অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না। এই সব রিওয়ায়াত 'কানযূল উম্মাল' এর 'মু'জিযাত মিন কিসমিল্ আকওয়াল' খন্ডের 'ই'লাম ও দালাইলুন নুবুওয়াত প্রভৃতি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত, কিন্তু আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, এর একটির অস্তিত্বও সেখানে নেই। 'কিসমুল আফআল' খন্ডে 'বিলাদত' বা জন্ম সম্পর্কে পৃথক অধ্যায় রয়েছে, কিন্তু তা খুবই সংক্ষিপ্ত। সেখানে হুযূর (সা) এর জন্মের তারিখ ও সময়কাল সম্পর্কে যে কয়েকটি রিওয়ায়াত পাওয়া যায় তাতে এই সব ঘটনার কোন উল্লেখ নেই। 'মুজিযাতে বিলাদত' অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মাখতূন (খতনা করা) অবস্থায় জন্মগ্রহণ সম্পর্কিত দু চারটি রিওয়ায়াত পাওয়া যায়, কিন্তু তার সব গুলোই ইবনে আসাকির বর্ণিত, যে সম্পর্কে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার অভিমত হলো, এর মধ্যে অনেক দুর্বল ও জাল হাদীস রয়েছে। উপরন্তু ঐ সব রিওয়ায়াতের প্রথম রাভী (বর্ণনাকারী) হচ্ছেন ইবনে আব্বাস। তাই বিলাদত সম্পর্কিত রিওয়ায়াত সমূহের মত এই সব রিওয়ায়াতও মুনকাতি'। অতএব তা গ্রহণযোগ্য নয়। 'কানযূল উম্মাল' এর 'আফআল' খন্ডে 'দালায়িল ও ই'লামে নুবুওয়াত' শিরোনামের অধীনে দু'তিনটি সুদীর্ঘ রিওয়ায়াত ইবনে আসাকির প্রমুখ থেকে নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে অতি বল্গাহারা কিছু কেচ্ছা কাহিনী রয়েছে,-যা নিশ্চিভাবেই জাল ও বানোয়াট। এতদসত্ত্বেও সেগুলোর কোথাও জন্ম সম্পর্কিত এই সব ঘটনার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

হাফিয আবূ নায়ীমের রিওয়ায়াত

মূলত: এই সব কেচ্ছা- কাহিনীর প্রথম ও একমাত্র উৎস হচ্ছে ঐ তিনটি দীর্ঘ হাদীস, যা দালায়িলের গ্রন্থকার আবূ নায়ীম আমর ইবন কুতাইবা, ইবনে আব্বাস এবং স্বয়ং হযরত আব্বাস (রা) এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। আর এগুলোই হচ্ছে সেই সব রিওয়ায়াত, যেগুলোকে পরবর্তী যুগের কাহিনীকার ওয়ায়িযরা তাদের ওয়াযের মজলিস চাংগা করার জন্য লুফে নেন। এরপর এসব কেচ্ছা-কাহিনী পরবতী যুগের সীরাত গ্রন্থাদিতে ঢুকে পড়ে।

শায়খ জালালুদ্দীন সাইয়ূতী 'খাসায়িসে কুবরা' এর প্রথম খন্ডে এই তিনটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে প্রত্যেকটি রিওয়ায়াতই এক এক পৃষ্ঠা সম্বলিত।

হাফিয আবূ নায়ীমের স্থান

কিন্তু এই তিনটি রিওয়ায়াত মূলত: একেবারেই ভিত্তিহীন। তার কারণগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১। হাফিয আবূ নায়ীম পঞ্চম শতাব্দীর 'হুফ্ফাযে-হাদীস' এর (হাদীস মুখস্তকারীদের) অন্যতম। যাহ্বী তাকে সনদের এয়োদশ স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' গ্রন্থে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তার

উচ্চ মর্যাদার কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে একথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, তিনি দুর্বল, জাল সব রকম হাদীসই 'হাদীসের ফাযায়িলে মু'জিযাত' অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন। এটা হয় তিনি সরল বিশ্বাসে করতেন, নয়ত মানুষের উপর এই আস্থা রেখে যে, এগুলো সহীহ্ না ভ্রান্ত, সবল না দুর্বল তা তারাই যাচাই করে নেবেন। এমনি কি আল্লামা ইবনে তাইমিয়াকেও আবুশ শায়খ ইসফাহানী প্রসঙ্গে লিখতে হয়েছিল-

وفيها احاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة واحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة .... وكذالك ما يرويه ابو نعيم فى فضائل الخلفاء فى كتاب مفرد فى اول حلية الاولياء (كتاب التوسل)

"এবং এর মধ্যে বহু হাদীস রয়েছে, যা কাভী সাহীহ্ হাসান এবং বহু হাদীস রয়েছে যা দুর্বল ও জাল .... এই অবস্থা ঐ সমস্ত হাদীসেরও যা আবূ নায়ীম 'হুলইয়াতুল আউলিয়া' এর প্রথম দিকে একটি পৃথক গ্রন্থের আকারে বর্ণ করেছেন এবং ঐ রিওয়াতগুলো হলো খলীফাদের প্রকৃষ্টতা সম্পর্কিত।

বেশীর ভাগ রিওয়ায়াতই মুনকাতি'

২। এবার ঐ সমস্ত রিওয়ায়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমি এখন এই আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই না যে, বিবেক বুদ্ধির কাছে এই সমস্ত রিওয়ায়াতের অর্থ কতটুকু গ্রহণীয় বা বর্জনীয়। কেননা আমি প্রথমেই বলে এসেছি যে, এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে রিওয়াতের সঠিকতা বা বেঠিকতা।

এই সমস্ত রিওয়ায়াতের প্রথমটি বর্ণিত হয়েছে আমর বিন কুতায়বা থেকে। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি এবং তিনি একজন বিরাট আলিম ছিলেন। তিনি (আমর) তো আপন পিতার জ্ঞানগত প্রকৃষ্টতার বর্ণনা দিলেন, কিন্তু এটা তো জানা গেল না যে, তিনি এই ঘটনার কথা কি করে জানলেন এবং কিসের উপর ভিত্তি করে তা বর্ণনা করছেন। রেওয়ায়াত সম্পর্কিত বেশীর ভাগ রেওয়ায়াতই মুনকাতি' (অর্থাৎ ঘটনা পর্যন্ত বর্ণনাকারীর বর্ণনাধারা পৌঁছে নি।), কিন্তু রিওয়ায়াতটি মুনকাতি' রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে জঘন্যতম। দ্বিতীয় রেওয়াতের প্রথম রাভী হচ্ছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা)। কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জন্মের পঞ্চাশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। জানা যাচ্ছে না, তিনি কার কাছ থেকে এটা শুনেছেন। আর বাকি রিওয়ায়াতটির তো কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না।

তৃতীয় রিওয়ায়াত

তৃতীয় রিওয়ায়াতের মধ্যে খোদ রাভীই পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, এ রিওয়ায়াতটি দুর্বল সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপার শুধু তাই নয়, বরং এর চাইতেও বাড়া। আসলে এই রিওয়ায়াতটি শুধু দুর্বল নয় বরং আগা গোড়া জাল এবং বানোয়াটও বটে। আর খোদ হযরত আব্বাস (রা) থেকে যে রিওয়ায়াতটি বর্ণিত হয়েছে তার সূচনায় একটি অতিরিক্ত বাক্যও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো-

ولد اخى عبد الله وهو اصغرنا .

"আমার ভাই আবদুল্লাহ্র জন্ম হয় এবং সে ছিল আমাদের ভাইদের মধ্যে কনিষ্ঠতম।"

এই রিওয়ায়াতটি যে জাল ও বানোয়াট, তার অতি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ সাক্ষী হলো এই অতিরিক্ত বাক্যটি। কেননা এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, হযরত আবদুল্লাহ্ হযরত আব্বাস (রা) এর চাইতে ছোট নন, বরং বড় ছিলেন।

হাফিয ইবনে আবদিল বার 'আল ইসতিআব' ফী মারিফাতিল আসহাব' গ্রন্থে লিখেছেন-

عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى ابا الفضل وكان عباس اسن من رسول الله بسنتين وقيل ثلاث سنين -

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব, যিনি তাঁর পুত্র ফযলের নামানুসারে আবুল ফযল ডাক নামে পরিচিত ছিলেন - তাঁর বয়স রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চাইতে মাত্র দু-তিন বছর বেশী ছিল। তখন তিনি কি করে তাঁর পিতার চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেন বা হতে পারেন।' মনে হচ্ছে, যে অধম এই কাহিনীটি তৈরী করে হযরত আব্বাস (রা) এর দিকে সম্পর্কিত করেছে, তার এ সম্পর্কে হয়ত কোন জ্ঞানই ছিল না; কিংবা জ্ঞান ছিল বটে, কিন্তু রিওয়ায়াতটিকে নির্ভরযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে সে অতিরিক্ত এই বাক্যটি জুড়ে দিয়েছিল। সে ভেবেছিল, এতে শুধু রিওয়ায়াতটি মুনকাতি' হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রক্ষা পায় নি,বরং এই বাক্যটি জুড়ে দেওয়ার কারণে রিওয়ায়াতটি যে মিথ্যা ও বানোয়াট তা পাকাপাকি ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِى النَّارِ

"যে জেনে শুনে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।"

হাফিয সাইয়ূতীর সাক্ষ্য

৩। এই সব বাজে রিওয়ায়াত যে মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, তার সবচেয়ে স্পষ্ট দলীল হলো, খোদ হাফিয আবু নায়ীম 'দালাইলুল নুবুওয়াত' শীর্ষক গ্রন্থে এই সমস্ত রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেননি, (২) অথচ সেখানে অবাধে অনেক দুর্বল ও জাল রিওয়ায়াত সংকলিত হয়েছে। এর দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং হাফিয সাইয়ূতীর মতেও এই রিওয়ায়াতগুলো এতই নিরেট জাল ও বানোয়াট যে, তিনি এগুলোকে দুর্বল ও মুনকার হাদীসের মধ্যেও স্থান দিতে পারেন নি।

৪। এগুলোর চাইতে অকাট্য দলীল ও স্পষ্ট সাক্ষ্য (যা প্রকৃত পক্ষে এই সব রিওয়ায়াতের জাল হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়) এই যে, হাফিয সাইয়ূতী 'খাসাইসে কুবরা' গ্রন্থে তৃতীয় রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন-

هوا الاثر والاثران قبله فيها نكارة شديدة ولم اورد فى كتابى هذا اشدنكارة منها ولم تكن نفسى تطيب بايرادها (فتامل) لكنى تبعت الحافظ ابا نعيم فى ذالك -

"এই রিওয়ায়াত এবং আনাস থেকে বর্ণিত এর পূর্ববর্তী দুটি রিওয়ায়াতের মধ্যে সাংঘাতিক ধরনের কদর্যতা রয়েছে। এতদসত্ত্বেও এগুলোকে আমি এই কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করেছি। আসলে আমার অন্তর এগলোকে পছন্দ করে নি - আমি শুধুমাত্র হাফিয আবূ নায়ীমকে অনুসরণ করতে গিয়েই অনুরূপ করেছি।

হাফিয সাইয়ূতী হরেক রকমের কাঁচাপাকা রিওয়ায়াত একত্রিত করণ এবং সেগুলোকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে যে বাড়াবাড়ি মূলক অসাবধানতা অবলম্বন করেন, তা গুণী জনের কাছে-মোটেই অবিদিত নয়। কিন্তু এই রিওয়ায়াতগুলোর অমূলকতার অবস্থা এই যে, তার মত লোকও এগুলোকে উপেক্ষা না করে পারেন নি এবং শেষ পর্যন্ত তাকে এই বলে ওযর পেশ করতে হয়েছে যে, আমি শুধুমাত্র হাফিয আবূ নায়ীমকে অনুসরণ করতে গিয়ে এই রিওয়ায়াতগুলো কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

তিনি লিখেছেন, এই রিওয়াতগুলো উদ্ধৃত করতে আমার মন চায় নি। এবার চিন্তা করে দেখুন, যে সব রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করতে হাফিয সাইয়ূতীর মত ব্যক্তির মনও সায় দেয় নি, সেগুলো কী পর্যায়ের অমূলক ও বেহুদা হতে পারে?

আজকাল মানাকিব, ফাযায়িল, ঘটনাপঞ্জি ও সীরাত বিষয়ের বিশেজ্ঞ হওয়ার দাবীদাররা হাফিয সাইয়ূতী সম্পর্কে যত উচ্চ ধারণাই পোষণ করুন, একথা তো সত্যি যে, তিনি একেবারে স্পষ্ট ভাষায় তার গ্রন্থে স্বীকার করে নিয়েছেন।

কিসরার প্রাসাদের শীর্ষচূড়া ভেংগে পড়া ইত্যাদি

আপনার বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর উপরোক্ত রিওয়ায়াতগুলোর আলোচনায় এসে গেছে। আপনি প্রশ্ন করেন নি এমন কিছু বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে একটি চতুর্থ রিওয়ায়াত বাকি রয়ে গেছে। তাতে রয়েছে ইরানের অগ্নিকুন্ড নিভে যাওয়া, নওশেরওয়ানের প্রাসাদের শীর্ষচূড়া ভেংগে পড়া, গণকদের রহস্যজনক ভবিষ্যৎবাণী ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যাদি।

এ রিওয়ায়াতটিও পুরো দু'পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত। সাইয়ূতী 'খাসায়িস' গ্রন্থে এবং হাফিয আবূ নায়ীম 'দালায়িল' গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। যদি এটিকে এখানে ('আল হিলাল' পত্রিকায়) উদ্ধৃত করি তাহলে পুরো দু'কলম লেগে যাবে। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার রাতে কিসরার (ইরানের শাহান শাহের) প্রাসাদে ভূমিকম্প অনুভূত হয় এবং তাতে প্রাসাদের চৌদ্দটি শীর্ষচূড়া ভেংগে পড়ে। প্রাসাদে সেই আগুন যা হাজার বছর পর্যন্ত নিভেনি, দপ্ করে নিভে যায়, পারস্য উপসাগর শুকিয়ে যায়। নওশেরওয়ান তার মন্ত্রী ও সভাসদদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তরে বলে, আমরাও স্বপ্নে দেখেছি, আরবে শীঘ্রই একটি বিপ্লব সাধিত হবে। তাদের একথার উপর নওশেরওয়ান, নু'মান বিন মুনযিরের নামে এই মর্মে একটি চিঠি লিখেন, "আরব থেকে এমন একজন লোককে পাঠাও, যে আমার প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।" নুমান, আবদুল মাসীহ নামীয় জনৈক 'কাহিন' (জ্যেতিষ)-কে প্রেরণ করে। কিন্তু আবদুল মাসীহ নওশেরওয়ানের কাছে গিয়ে তার চাইতেও অধিক জ্ঞানী ও অধিক বিজ্ঞ সাতীহ নামীয় একজন কাহিনের সন্ধান দেয়, যিনি সিরিয়ায় বসবাস করেন। এরপর নওশেরওয়ানের প্রশ্নগুলো নিয়ে সে নিজেই সেই কাহিনের কাছে যায়। সাতীহ ঐ সময় মৃত্যু ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলো! মাসীহ গণকসুলভ ভঙ্গিতে কয়েকটি পংক্তি আওড়ালো। এগুলো শুনে সাতীহ মাথা উঠালে সে তার কাছে অগ্নিকুন্ড নিভে যাওয়া, প্রাসাদের চূড়া ভেংগে পড়া এবং নওশেরওয়ানের আরো যেসব প্রশ্ন ছিল তা পেশ করে। কিন্তু এগুলোর উত্তর দেবার আগেই সাতীহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[৩]

কিন্তু এই রিওয়ায়াতও মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর প্রথম রাভী হচ্ছেন মাখযূম ইবন হানী, যিনি আপন পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। স্বয়ং হাফিয সাইয়ূতী এই রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন,

"ইবনে আসাকির বলেছেন, এই হাদীস গরীব। এটাকে ইবনে মাখযূম ছাড়া অন্য কেউ রিওয়ায়াত করে নি।"

শব্দ সমূহ বিভিন্নভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে এই রিওয়ায়াতের ঘটনাসমূহ 'ফাযায়িল ও হিকায়াত' এর কিতাব সমূহে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে বর্ণিত সব ঘটনারই মূল উৎস হচ্ছে ঐ রিওয়ায়াত। তবে মুহাদ্দিসবৃন্দ যা বর্ণনা করেছেন তা-ই আমাদের কাছে গ্রহণীয়। যারা মিথ্যা ও বানোয়াট কেচ্ছাকাহিনীর প্রণেতা তাদের প্রতি আমাদের কোন আস্থা নেই।

টীকা ঃ

১। মাওলানা এই সব রিওয়ায়াতের খন্ড - বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। আমি সমগ্র আরবী মতন (বচন) এখান থেকে বাদ দিয়েছি। এতে অবশ্য মূল প্রবন্ধের উপর কোন প্রভাব পড়বে না।

২। 'দালাইলুন্ নুবুওয়াত' হায়দরাবাদের (ভারত) 'দাইরাতুল মা'আরিফ' কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছে। এর প্রথম খন্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় 'তায্ভিজে আমিনা' (আমিনার বিবাহ) শীর্ষক পুরা অধ্যায়টি দেখা যেতে পারে। এতে অনেক দুর্বল ও জাল রেওয়ায়াত রয়েছে। এতদসত্ত্বেও এই রিওয়ায়াতগুলো কিন্তু সেখানে স্থান পায় নি।

৩। পুরো রিওয়ায়াতের জন্য দালায়িনুল নুবুওয়াতঃ ১ম খন্ডঃ পৃষ্ঠা - ৪১ এবং খাসায়িসঃ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা-৪৯ দ্রষ্টব্য।

রাবীউল আউয়ালের মীলাদ অনুষ্ঠান

বিশ্ব মানবতার জন্য সুসংবাদবাহী

মাওলানা লিখিত বক্তৃতা প্রদানে অভ্যস্থ ছিলেন না। তিনি একদা বলেছিলেন, যা বলার তা চিন্তায় রেখে দাঁড়িয়ে যাই। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা জিহ্বায় যা কিছু জারী করে দেন তাই বক্তৃতা হয়ে যায়। রাবীউল আউয়াল হিজরী ১৩৩৫ সনের (মুতাবিক জানুয়ারী, ইং ১৯১৬ সনের) কথা। কোলকাতার কোন এক সভায় মাওলানা সীরাতের উপর একটি ভাষণ দেন। ঐ সময়ে 'আল বালাগ' প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি এর একটি সংখ্যা (১৪,২১ ও ২৮ জানুয়ারী, ইং ১৯১৬ সন) শুধু 'বিলাদতে নবভী' এর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। খুব সম্ভবত: এই ভাষণটিও তিনি ঐ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এর দ্বারা সীরাতের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ দিক যে অত্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠে তা কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই ভাষণের মধ্যে সীরাতে তাইয়িবার মৌলিক দিকগুলো যে অপরূপ ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে, সেরূপ ভঙ্গিতে কেউ আজ পর্যন্ত পেশ করতে পারেন নি।

রাবীউল আউয়ালের বরকত ও কল্যাণ

স্বধর্মী বন্ধুরা! রাবীউল মাসের আগমন তোমাদের জন্য উৎসব ও খুশীর বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। কেননা তখন তোমাদের মনে পড়ে যায় যে, এই মাসেরই প্রাথমিক সপ্তাহগুলোতে 'আল্লাহর সর্বব্যাপী রহমত' দুনিয়ায় প্রকাশ লাভ করেছিল। আর ইসলামের সত্য আহবায়কের আবির্ভাবের কারণে দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ-ব্যথা ও জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটেছিল।

তোমরা আনন্দ ও খুশীতে আত্মহারা হয়ে উঠ। তোমাদের অন্তরে আল্লাহ্র সত্য নবীর প্রেম-ভালবাসা এক অভাবিত আগ্রহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তোমরা তোমাদের অধিক থেকে অধিকতর সময় তাঁকে স্মরণ করে এবং তাঁরই ভালবাসার খুশীতে কাটিয়ে দিতে চাও।

তোমরা তাঁর আলোচনা ও চিন্তার মজলিসসমূহের আয়োজন কর। ঐ মজলিসের সাজসজ্জার কাজে, আপন কায়িক শ্রমের বদলে প্রাপ্ত অর্থসম্পদ বিনা দ্বিধায় খরচ কর। সুগন্ধিযুক্ত তরতাজা ফুলের তোড়া তৈরী কর, কাফূর মিশ্রিত সুন্দর প্রদীপমালা এবং বিজলী বাতির আকর্ষণীয় ঝাড় প্রজ্বলিত কর। আতর ও গোলাপের মিষ্টি গন্ধে যখন তোমাদের মজলিস ভরপুর হয়ে উঠে তখন তোমরা আল্লাহ্র প্রশংসা-প্রশস্তি এবং দরূদ ও সালামের সুমধুর সুর ধ্বনির মধ্যে আপন মাহবূব ও একান্ত প্রিয় জনের (প্রিয় নবীর) সন্ধান কর। আর এই মুহূর্তগুলোতে তোমাদের চোখের অশ্রু ও তোমাদের প্রেমাসক্ত অন্তরের আকুতি তাঁর পবিত্র নাম, তাঁর অপরিসীম ভালবাসা থেকে রূহানী জীবন লাভ করে।

অতএব কত মহান ঐ সব ব্যক্তির অন্তর, যারা আপন প্রেম-ভালবাসার জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের মাহবূব (প্রিয়জন)-কে নির্বাচন করেছে এবং কত পাকপবিত্র ঐ জিহ্বা, যেগুলো রাসূলগণের সর্দার ও সমগ্র বিশ্বের রহমতের প্রশস্তিগীতিতে সুরে ভরে উঠে।

তারা তাদের প্রেম-ভালবাসার জন্য সেই সত্তাকেই বেছে নিয়েছে, খোদ আল্লাহ্ তা'আলা যার প্রশংসা করেছেন - আর তাঁর সুর সুরে মিলিয়েছে ফিরিশতারা, সৃষ্টিজগতের পবিত্র আত্মারা এবং পুণ্যবান বান্দারা।

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

"আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশতারাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।"-(৩৩ ঃ ৫৬)

সৃষ্টি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাহবূব

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নবীর প্রেম-ভালবাসার পবিত্র জোয়ার এবং এর পবিত্রতম আগ্রহ-উদ্দীপনা তোমাদের জীবনের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ। আর তোমরা নিজেদের এই পবিত্র প্রেরণার, যত বেশী হিফাযত করবে তা কম বলে মনে হবে। তোমাদের এই আল্লাহ্ প্রেম তোমাদের প্রভু পরওয়ারদিগারের ভালবাসায় প্রেম তোমাদের প্রভু পরওয়ারদিগারের ভালবাসার প্রতীক, তোমাদের এই প্রেমাসক্ততা তোমাদের মানবিক সৌভাগ্য ও সরল পথ অবলম্বনের উৎসমূল। তোমরা সেই পাক-পবিত্র সত্ত্বাকে ভালবাস, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানব সৃষ্টির মধ্য থেকে প্রিয়জন ও প্রশংসিতজন হিসাবে বেছে নিয়েছেন এবং বিশ্বের প্রিয়জনের পবিত্র পরিচ্ছদ তাঁরই পবিত্র দেহে এঁটে দিয়েছেন। ভূপৃষ্ঠে মানুষের জন্য বৃহৎ থেকে বৃহত্তর যে কথা লিখা যেতে পারে, মানুষের প্রতি যতটুকু অধিক থেকে অধিকতর ভালবাসা নিবেদন করা যেতে পারে, মানুষের জন্য সর্বাধিক প্রশংসা-প্রশস্তি, যা ভাষায় ব্যক্ত করা যেতে পারে- মোটকথা, মানুষের ভাষা মানুষের জন্য যা কিছু বলতে পারে এবং যা কিছু করতে পারে, তার সব কিছুই এই পরিপূর্ণ ও পরিপূর্ণতম মানুষের জন্য। আর এগুলো পাবার যোগ্য তিনি ছাড়া আর কেউ নন। একজন ফারসী কবি কী সুন্দর না বলেছেন!

"হারাম শরীফ আমার উপাসনাগার ....
আর দু'জাহানের হাবিব আমার লক্ষ্যবস্তু।"
আমি যেখানে সিজদা করি না কেন,
তা করি আল্লাহ্র দরবারের উদ্দেশ্যে।"

আরবী কবি কত সুন্দরই বলেছেন -

عبارتنا شتى وحسنك واحد- وكل الى ذالك الجمال يشير -

"আমাদের বাক্য বিভিন্ন; কিন্ত তোমার সৌন্দর্য এক, প্রত্যেকটি বস্তুই তোমার এই সৌন্দর্যের দিকে ইঙ্গিত করে।"

সর্বোৎকৃষ্ট বান্দা

ইলাহ্ ও রব হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন এক ও অংশহীন; অনুরূপভাবে পরিপূর্ণ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দেগীর গুণও এক ও অংশহীন। তাঁর মানবতা ও বন্দেগীতে কেউই তাঁর সমান নয়। আর তাঁর একক সৌন্দর্যেও কেউ শরীক নয়।

منزه عن شريك فى محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم -

"তিনি তার সৌন্দর্যাবলীর ক্ষেত্রে শরীক থেকে পবিত্র। অর্থাৎ তার এই সৌন্দর্যাবলীর মধ্যে কোন শরীক নেই। তার সৌন্দর্যগুণের মধ্যে কোন ভাগ-বাটোয়ারা হয় নি। তাই অন্য কেউ এ থেকে কোন অংশ পায় নি।"

এ কারণেই কুরআন মজীদে আমরা দেখি যে, সমগ্র আম্বিয়া কিরামের উল্লেখ যেখানে করা হয়েছে, সেখানে তাঁদেরকে তাঁদের নাম ধরে আহবান করা হয়েছে এবং যেখানে তাঁদের ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও তাঁদের নামসহ তা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই পরিপূর্ণ মানুষ, এই পরিপূর্ণ সত্ত্বা এবং বান্দা হিসাবে যাবতীয় গুণাবলীর ক্ষেত্রে শরীকহীন একক এর উল্লেখ বিভিন্ন জায়গায় এভাবে করা হয়েছে যে, না তাঁর নাম নেওয়া হয়েছে, আর না অন্য কোন গুণে তাঁর নামকরণ করা হয়েছে। বরং শুধু 'আবদ' (বান্দা) শব্দ দ্বারা তাঁর প্রভু তাঁকে স্মরণ করেছেন। যেমন-

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তার বান্দাকে রজনী যোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসায়।" (১৭ ঃ ১) সূরা জিনে আল্লাহ্ বলেন,

وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا .

"আর এই যে, যখন আল্লাহ্র বান্দা (মুহাম্মদ) তাঁকে ডাকার জন্য দন্ডায়মান হলেন তখন তারা তাঁর কাছে ভিড় জমাল।" -(৭২ ঃ ১৯)

এ আয়াত দ্বারা সূরা কাহ্ফ শুরু করা হয়েছে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا .

"প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে বক্রতা রাখেন নি।"-(১৮ঃ১)

সূরা ফুরকানের প্রথম আয়াত হচ্ছে-

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا .

"কত মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান নাযিল করেছেন, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সর্তকারী হতে পারে।" -(২৫ ঃ ১)

এভাবে সূরা নাজ্ম এ আল্লাহ বলেন, فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى .

"তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন।" -(৫৩ ঃ ১০)

সূরা হাদীদে বলা হয়েছে- هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ .

"তিনিই তার বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন।" -(৫৭ ঃ ৯)

উপরোক্ত স্থানগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নাম নেওয়া হয়নি; বরং নামের পরিবর্তে আবদ্ বা বান্দা বলা হয়েছে। অথচ অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রে আবদ্ শব্দ ব্যবহার করা হলেও সেই সাথে তাঁদের নামও পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা মারইয়ামে হযরত যাকারিয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে–

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا

"এই আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তার বান্দা যাকারিয়ার প্রতি।" -(১৯ ঃ ২)

সূরা সোয়াদে হযরত দাউদ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ .

–"এবং স্মরণ করুন আমার বান্দা দাউদের কথা।"-(৩৮ ঃ ১৭)

ঐ সূরাতেই হযরত আইয়ুব (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ .

"স্মরণ করুন, আমার বান্দা আইয়ুবকে।" -(৩৮ ঃ ৪১)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বৈশিষ্ট্য

এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা এ তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করা আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল যে, এই মহান সত্তার (রাসূলুল্লাহ্র) আব্দিয়াত ও বন্দেগী সেই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যা মনুষ্যত্বের একেবারে চূড়ান্ত পর্যায় এবং সে পর্যায় কোন বান্দাই এই কামিল বান্দার শরীক ও অংশীদার নয়। অতএব বান্দা হিসাবে তিনি হচ্ছেন পরিপূর্ণ সত্তা। সুতরাং কোনরূপ সম্বন্ধ-সম্পর্ক যুক্ত না করেই শুধুমাত্র 'আবদ্' বা বান্দা উপাধি দ্বারাই তাঁকে চেনা যায়। কেননা সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে তাঁর মত আবদ্ বা বান্দা দ্বিতীয় নেই।

বান্দা হিসাবে যেমন তিনি অতুলনীয়, তেমনি আল্লাহর মাহবুব হিসাবেও তিনি অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রহমতকে সমগ্র বিশ্বের উপর পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন নিজেকে 'আর রাহ্মান আর রাহীম' বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করেছেন, [তেমনি মুহাম্মদ (সা) কে] 'বিল মুমিনীনা রাউফুর রাহীম' বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করেছেন। কুরআন মজীদের কোথাও তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করেননি, বরং তাঁকে কখনো 'ইয়া আইয়ুহার রাসূল' কখনো 'ইয়া আইয়ুহাল মুয্যামমিল' কখনো 'ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাছছির' প্রভৃতি সম্মানিত উপাধিতে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনকে যেমন বান্দাদের উপর ফরয করেছেন তেমনি তাঁদের উপর ফরয করেছেন রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে। রাসূলের ভালবাসা প্রদর্শনের অবস্থা এই যে, তিনি যে লোকালয়ে বসবাস করেছেন, যে শহরের গলি দিয়ে চলাফেরা করেছেন, সে লোকালয় এবং সে শহরের সম্মানও আল্লাহতা'আলা সমগ্র বিশ্বের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন। যেমন–

لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ . وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ .

"শপথ করছি এই নগরের, আর আপনি এই নগরের অধিবাসী।" –(৯০ঃ১-২)

অতএব যার পবিত্রতা ও একক বৈশিষ্ট্যের এই অবস্থা, তাঁর স্মরণে যতগুলো মহূর্ত ব্যয় করা হোক, তাঁর প্রেমে যাত অশ্রু ভাসানো হোক, তাঁর ভালবাসায় যত দীর্ঘশ্বাস ফেলা হোক, তাঁর প্রশংসা-প্রশস্তিতে যবান যত আন্দোলিত হোক, ততই মনুষ্যত্বের মর্যাদা, আত্মার সৌভাগ্য ও অন্তরের পবিত্রতা লাভ করা যাবে। একজন ফারসী কবি কী সুন্দরই না বলেছেন।

"যে পদযুগল দ্বারা তোমার পথ অতিক্রম করি তা উত্তম,
যে উসীলা বা মাধ্যম দ্বারা তোমার মিলনের
সন্ধান করি তাও উত্তম,
যে চোখ দ্বারা তোমার চেহারা দেখি তাও উত্তম,

যে যবান দ্বারা তোমার নাম উচ্চারণ করি
তাও উত্তম।"

পাওয়ার উৎসব ও হারানোর শোক

কিন্তু যখন তোমরা এই পবিত্র মাসে এসব কিছু কর এবং এই মাসে জন্মের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে আনন্দ-উল্লাস কর তখন এই আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে তোমাদের কি ঐ মাতমের কথাও স্মরণ পড়ে, যা ছাড়া তোমাদের কোন খুশী হতে পারে না? কখনো তোমরা কি এই হাকীকতের প্রতি লক্ষ্য করেছ- এটা কার জন্মোৎসব, যার স্মরণে তোমরা নানা উদ্যোগ-আয়োজন কর? তিনি কে ছিলেন, যার জন্মের স্মরণে তোমরা এই আনন্দ-উৎসবের পয়গাম লাভ করেছ ?

এতে সন্দেহ নেই যে, এই মাসের আগমন তোমদের জন্য আনন্দের পয়গামবাহী। কেননা এই মাসে সেই সত্ত্বার আগমন হয়েছে, যিনি আমাদের সবকিছু দিয়েছেন। অতএব আমাদের জন্য এর চাইতে অধিক মাতম করার আর কোন মাস নেই। কেননা এই মাসে জন্মগ্রহণকারী সত্ত্বা আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছিলেন, তার সবকিছু আমরা হারিয়ে ফেলেছি। অতএব এই মাস একদিকে যেমন দাতার স্মরণকে সঞ্জীবিত করে, অন্যদিকে তেমনি যারা এই দাতার দানকে খুইয়ে বসেছে, তাদের ক্ষতস্থান পুনরায় দগ্‌দগে হয়ে উঠে।

মজলিসসমূহ আলোকিত, কিন্তু অন্তর অন্ধকার

তোমরা মজলিস অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে তোমাদের ঘরসমূহ আবাদ কর, কিন্তু তোমাদের অন্তরের উজাড় বসতির কোন খোঁজ কি তোমরা রাখ? তোমরা কাফূর মিশ্রিত প্রদীপে ঝাড়বাতি প্রজ্জ্বলিত কর, কিন্তু তোমাদের অন্তরের অন্ধকার দূর করার জন্য কি কোন প্রদীপের সন্ধান কর? তোমরা ফুলের তোড়া সাজাও, কিন্তু হায়! তোমাদের সুকর্মের ফুল যে শুকিয়ে ঝরে পড়েছে। তোমরা গোলাপ জল ছিটিয়ে তোমাদের রুমাল ও জামা সুগন্ধিযুক্ত কর, কিন্তু হায়! ইসলামের মাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য করার সুবাস থেকে সকাল-সন্ধ্যা তোমরা যে বঞ্চিত। হায়! তোমাদের এই সব মজলিস যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকত, তোমাদের ইট চুনের তৈরী ঘরগুলোতে সাজ সজ্জার একটুখানি পরশও না লাগত, তোমাদের চোখগুলি এই মজলিসে সারারাত জেগে না থাকত এবং তোমাদের যবানসমূহ থেকে রাবীউল আউয়াল মাসের জন্মোৎসব সম্পর্কে দুনিয়াবাসী কিছুই না শুনত- আর এগুলোর পরিবর্তে তোমাদের আত্মা আবাদ ও সঞ্জীবিত থাকত, তোমাদের যবানসমূহ থেকে নয়, বরং তোমাদের আমাল ও কাজকর্ম থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অনুপম চরিত্রের প্রশংসা ও প্রশস্তি গীতির সুরলহরী ভেসে উঠত তাহলে কতই না ভাল হত। পবিত্র কুরআনের ভাষায়-

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ .

"বস্তুত: চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং, অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।"-(২২:৪৬)

জনৈক কবির ভাষায়-

"আমার ভয়, জীবন্ত হৃদয় তুমি যেন মরে না যাও,
কেননা তোমার জীবিত থাকার নামই তো জীবন।"

অতএব আক্ষেপ, হাজার আক্ষেপ ঐ জাতির অন্যমনস্কতা ও অজ্ঞতার জন্য, যাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান ও প্রত্যেকটি মজলিস দুঃখের পয়গাম বয়ে নিয়ে আসে, কিন্তু না তারা তাদের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা থেকে কোন উপদেশ গ্রহণ করে, আর না ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের জীবন পথে কোন আলো প্রজ্জ্বলিত করে। তারা তাদের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ডুবে থাকে, এদিক-সেদিক তাকাবার অবসর মোটেই পায় না, অথচ তাদের

এই অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি দরূদে ও প্রত্যেকটি বাক্য মাতমের ও উপদেশ গ্রহণের একটি উদাত্ত পয়গাম ও শিক্ষা গ্রহণের একটি মরমী আকুতি নিহিত থাকে। কিন্তু এগুলো উপলব্ধি করার পূর্বশর্ত হলো, যেন চোখ খোলা থাকে, যেন কান শুনে এবং যেন অন্তর সতর্ক ও সাবধান হয়।

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰی لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَی السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیْدٌ .

"এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার আছে অন্তঃকরণ অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে।" -(৫০:৩৭)

আবির্ভাব ও আবির্ভাবের উদ্দেশ্য

রাবীউল আউয়াল মাসের স্মরণে আমাদের জন্য খুশীর পয়গাম ছিল এজন্য যে, এই মাসে আল্লাহ্ তা'আলার সেই রহমতের ফরমান দুনিয়ায় এসেছিল, যার আত্মপ্রকাশ দুনিয়ার দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনার ধারা বদলে দিয়েছিল। মিটে গিয়েছিল জুলুম, বাড়াবাড়ি, ফিত্না-ফাসাদ ও নাফরমানীর অন্ধকার। আল্লাহ্ এবং তার বান্দাদের বিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ জোড়া লেগেছিল, মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের আহবান শত্রুতা হিংসা-বিদ্বেষকে মুছে ফেলেছিল এবং কুফর ও পথভ্রষ্টতার স্থলে ন্যায় ও সত্যের বাদশাহীর সাধারণ ঘোষণা প্রদান করা হয়েছিল।

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِیْنٌ یَّهْدِیْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَیُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَیَهْدِیْهِمْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ .

"আল্লাহ্র নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং ওদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।" -(৫:১৫-১৬)

কিন্তু দুনিয়া দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনার ব্যথায় পুনরায় ব্যথিত হয়ে উঠেছে। মানুষের ফিত্না ফাসাদ, অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির অন্ধকার আল্লাহ্র আলোর উপর প্রাধান্য লাভের জন্য পুনরায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ন্যায় ও সত্যের খ্যাতি উজাড় হয়ে গেছে এবং বিক্ষিপ্ত মানবগোষ্ঠীকে রক্ষা করার মত কেউ নেই। আল্লাহ্র যমীন, যা শুধু আল্লাহ্র জন্যই ছিল, তা অপরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যারা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষপাতী, যমীনের উপর আজ তাদের কোন অস্তিত্ব নেই।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَیْدِی النَّاسِ .

"মানুষের কৃতকার্মের দরুণ সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে।"-(৩০:৪১)

দুঃখের বিষয়, তোমরা তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব কর, কিন্তু তাঁর আগমনের লক্ষ্যের কথা ভুলে যাও। যে উদ্দেশ্যে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, সেদিকে তোমাদের কোন দৃষ্টি নেই।

এই রাবীউল আউয়াল মাস যদি তোমাদের জন্য খুশীর মাস হয় তাহলে তা শুধু এজন্য যে, এই মাসে বিশ্বের পথভ্রষ্টতার অবসান হয়েছে এবং কালিমা-ই-হক প্রচারের সূচনা হয়েছে। অতএব আজ যদি বিশ্বের ন্যায়-সত্য পথ-ভ্রষ্টতার চাপে মৃতপ্রায় হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আলস্যের পূজারীরা, তোমাদের কি হয়ে গেল যে, তোমরা আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান পালন কর, কিন্তু যে ন্যায় ও সত্যের আবির্ভাবের জন্য এই আনন্দোৎসব, সে মৃতপ্রায় ন্যায় ও সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদের অন্তরে কোন উদ্যোগ নেই।

রাবীউল আউয়াল মাসের স্মৃতি

শরীয়তের অগ্নি প্রভা

এই মাসে আনন্দোৎসব এজন্য যে, এই সময়েই আল্লাহ্‌র দরবারের এ অগ্নিপ্রভা ফারান পাহাড়ে প্রতিভাত হয় যার সংবাদ তূর পাড়াহে হযরত মূসা (আ) কে দেওয়া হয়েছিল। এই অগ্নিপ্রভা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল মানুষকে পথভ্রষ্টতা ও গুমরাহী থেকে রক্ষা করে দুনিয়া-আখিরাতের সৌভাগ্য ও শান্তির দিকে পরিচালিত করতে এবং সমগ্র বিশ্বে আল্লাহ্‌র পরাক্রম ও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করতে। ঐ অগ্নি প্রভা ছিল আল্লাহরই হাতের প্রজ্জ্বলিত একটি তরবারি, যার পরাক্রম ও প্রবল প্রতাপ সমগ্র অন্যায় ও বাতিল শক্তিকে প্রকম্পিত করে তুলেছিল– শুনিয়েছিল সমগ্র বিশ্বকে আল্লাহর অসীম সাম্রাজ্য ও তার চিরন্তন বিজয়ের সুসংবাদ। —

هُوَ الَّذِى اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ..

"মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন।" -(৯ ঃ ৩৩)

সাফল্যের সুসংবাদ

ইসলাম অত্যাচারিতের কোন ছটফট ছিল না, বরং ছিল অত্যাচার প্রতিরোধের মোক্ষম হাতিয়ার। তা নিঃস্বতার কারণে অশান্ত ছিল না, বরং যারা দুনিয়ায় অশান্তির সৃষ্টি করেছিল তাদের প্রতিরোধের জন্য ছিল অস্থির। ইসলাম যা কিছু নিয়ে এসেছিল তাতে দুঃখের কোন হাহাকার ছিল না, কোন দুর্বলতা ও অসহায়তা ছিল না, নৈরাশ্যের কোন অশ্রুপাত ছিল; না বরং ছিল চিরন্তন সাফল্যের সুসংবাদ এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সহায়তা প্রাপ্তির প্রকাশ্য ঘোষণা।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَتَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ . نَحْنُ اَوْلِيَاؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ . وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ .

"যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, এরপর অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে, সেথায় তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেথায় তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর।" –(৪১ঃ৩০-৩১)

ভীত হয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না

তোমরা ভীত হয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। কেননা রাবীউল আউয়াল মাসে যার আগমন হয়েছে, তিনি বলেছেন, দুঃখ এবং চিন্তা তাদেরই জন্য, যাদের সাথে সাহায্য ও সাফল্য প্রদানকারীর কোন সংবাদ-সংযোগ ও সম্পর্ক নেই। যারা সমগ্র মানবিক ও পার্থিব শক্তিসমূহের পরওয়া না করে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র পবিত্র শক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে এবং তাঁকে আপন বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, তারা তো কখনো ভীতিগ্রস্ত ও চিন্তিত হতে পারে না। কেননা সুখ-সমৃদ্ধি ও আনন্দ দান তো আল্লাহ্‌রই হাতে। যাবতীয় সাফল্য তো তাঁর কাছ থেকেই আসে। তিনি হলেন সর্বশক্তিমান। অতএব কে আছে, যে তাঁর সাথে শত্রুতা করে টিকে থাকতে পারে?

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَامَوْلٰى لَهُمْ ٠

"এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ মুমিনদের অভিবাক এবং কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই।" -(৪৭ঃ১১)

যে সব পবিত্র আত্মা আল্লাহ্ ও তাঁর প্রদর্শিত ন্যায় ও সত্যপথে চলার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে দিয়েছে, তারা কাউকে ভয় পায়না, বরং বিশ্বের সবকিছু তাদের প্রবল প্রতাপের সামনে ভীতিগ্রস্ত থাকে।

فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ٠

"সুতরাং যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর।" -(৩ঃ১৭৫)

আল্লাহ্‌র উপর ঈমান ও মনুষ্য ভীতি

দুনিয়াতে বিরোধী পরস্পর বস্তুগুলো একত্রিত হতে পারে। আগুন ও পানি হয়ত একত্রিত হতে পারে, বাঘ বকরী হয়ত এক ঘাটে পানি পান করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও মানুষের প্রতি ভয় এ দুটি বস্তু পরস্পর এমন বিরোধী, যা কখনো একটি হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। যদি এক হতভাগা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার দাবী করে মানুষের ভয়েও কাঁপতে থাকে, তাকে তোমরা পথিমধ্যে পড়ে থাকা পাথরের মত তার জায়গা থেকে হটিয়ে দূরে নিক্ষেপ কর। যাতে এই পথ দিয়ে দ্রুত ধাবমান ব্যক্তিদের জন্য সে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। কেননা সে মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ঈমান ও য়াকীন থেকে বঞ্চিত।

وَلَاتَهِنُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ٠

"তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও।"- (৩ ঃ ১৩৯)

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

"জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" -(১০-৬২)

নি'মাতের পরিবর্তন

কিন্তু আজ তোমরা যখন ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করছ, তখন তোমাদের অবস্থা কি? কোথায় সেই সম্পদরাজি, যা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল? যে সাফল্যের নি'মাত তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল, তা গেল কোথায়? তোমাদের সেই জীবন্ত রূহ যা তোমাদের মধ্যে ফুঁকে দেওয়া হয়েছিল তা তোমাদের ছেড়ে কোথায় চলে গেল? হায়, তোমাদের আল্লাহ্ কেন তোমাদের উপর রুষ্ট হয়ে গেলেন? তোমাদের প্রভু কেন তোমাদেরকে শুধু তারই

দাসত্বে নিয়োজিত রাখলেন না? রাবীউল আউয়ালে আগমনকারী মহান ব্যক্তি সত্তা কি তোমাদের কাছে এই প্রতিশ্রুতির কথা পৌঁছিয়ে দেন নি যে, যাবতীয় শক্তির মালিক আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে শক্তি যোগাবেন এবং এখন পৃথিবীতে শক্তি ও ক্ষমতার উত্তরাধিকারী তোমাদের ছাড়া আর কেউ হবে না?

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ .

"কিন্তু শক্তি তো আল্লাহরই, আর তার রাসূল ও মুমিনদের। তবে মুনাফিকরা এটা জানে না।" -(৬৩ ঃ ৮)

এরপর এটা কোন্ বিপ্লব যে, তোমরা লাঞ্ছনার মধ্যে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছ এবং সম্মান তোমাদের ছেড়ে চলে গেছে? তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার নিশ্চিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি?

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ .

"মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।" - (৩০ ঃ ৪৭)

আলস্য ও কর্মহীনতা

এরপর এটা কেন হলো যে, তোমরা সাফল্যের নাগাল পেলে না। তাহলে কি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য ছিল না? তিনি কি আপন কথায় সঠিক নন? তোমরা মানুষের প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস রেখে তাদের নির্দেশের সামনে নত হতে জান, কিন্তু যে আল্লাহ কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না, তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে কি তোমাদের মধ্যে ঈমানের কোন আওয়াজ শুনতে পাওনা? আক্ষেপ ! তাঁর প্রতিশ্রুতি মিথ্যা ছিল না আর তিনি আপন সম্পর্কও ছিন্ন করেন নি। তোমরা নিজেরাই দায়ী। এটা তোমাদের অকৃজ্ঞতা ও ঈমানী মৃত্যু। নিজেদের আলস্য, দুষ্কর্ম ও অন্যকে পূজার কারণে আল্লাহ্র সাথে তোমাদের পবিত্র সম্পর্কের মর্যাদায় কলঙ্ক লেপন করেছ।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

"এটা এ জন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি ওদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন, তিনি তা পরিবর্তন করবেন। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"-(৮ ঃ ৫৩)

আল্লাহ্ এখনো অন্যদের জন্য নয় বরং তোমাদেরই জন্য। তবে এই শর্তে যে, তোমরাও অন্যদের জন্য নয়, বরং শুধু আল্লাহর জন্য হয়ে যাও।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ .

"হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন।" (৪৭ ঃ ৭)

শৃংখল-মুক্তি

তোমরা রাবীউল আউয়ালে আগমনকারীকে স্মরণ কর এবং তাঁর মুহাব্বতের দাবী কর। তোমরা এখানে সেখানে মজলিস অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে তাঁর প্রশংসা প্রশস্তিতে মেতে উঠ। কিন্তু তোমাদের এটা স্মরণ থাকে না যে, যাকে স্মরণ করার দাবী তোমরা কর, তাঁকে যে তোমরা বিস্মৃত হয়ে গেছ। আর এর স্পষ্ট সাক্ষী হচ্ছে তোমাদের

প্রত্যেকটি কাজকর্ম। তোমরা যার প্রশংসা প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ, তোমাদের কাজকর্ম দ্বারা তাঁর প্রতি যে অহরহ অসম্মান প্রদর্শন করছ, সেদিকে তোমাদের কোন লক্ষ্য নেই। তিনি দুনিয়ায় এসেছিলেন মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের সহজ-সরল পথে তাদেরকে পরিচালিত করতে এবং গোলামীর যাবতীয় শৃংখল থেকে তাদেরকে চিরদিনের জন্য মুক্ত করতে।

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۔

"যিনি মুক্ত করেন তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃঙ্খল হতে, যা তাদের উপর ছিল।" - (৭ ঃ ১৫৭)

শুধু আল্লাহরই আনুগত্য

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আনুগত্য শুধু আল্লাহরই জন্য এবং হুকুম ও নির্দেশ মানতে হবে শুধু আল্লাহ্‌রই।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ –"বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহরই।" - (১২ ঃ ৪০)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম মানুষকে তার হারানো স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, মুমিন না বাদশাহ্‌দের দাসত্বের জন্য , না কাহিনদের আনুগত্যের জন্য, আর না অন্য কোন মানুষের সামনে মাথা ঝুকাবার জন্য -বরং তার মাথা ঝুকাবার জন্য একটি মাত্র চৌকাঠ আছে, যার অন্তরের জন্য একটি মাত্র প্রেমের বস্তু আছে, তার পায়ে বেড়ি দেবার জন্য একটি মাত্র শিকল আছে এবং তার ঘাড়ে ফেলার জন্য একটি মাত্র আনুগত্যের রশি আছে- আর তা হচ্ছে যথাক্রমে আল্লাহ্‌র দরবার, তাঁরই প্রেম, তাঁরই ভালবাসার শিকল এবং তাঁরই আনুগত্যের রশি। বান্দা নত হয় তো তাঁরই সামনে, কাঁদে তো তাঁরই জন্য, ভরসা করে তো তাঁর সত্তার উপর, ভীতিগ্রস্ত হয় তো তাঁরই ভয়ে এবং আশা করে তো তাঁরই রহমতের। সে মুশরিক নয়, যে আল্লাহ্‌র ন্যায় মানুষকেও ভয় ও কঠোরতার গুণে গুণান্বিত করবে।

ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۔ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ط أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۔

"ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতকগুলো নামের ইবাদত্ করছ, যেই নাম তোমাদের পূর্বপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নি। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন - অন্য কারো ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত; এটাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।" - (১২ ঃ ৩৯-৪০)।

একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত

লক্ষ্য করো, কিভাবে তিনি মানুষের স্বাধীনতা ও প্রকৃত মুক্তিকে দৃষ্টান্ত সমূহের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّ جَهْرًا هَلْ يَسْتَوُنَ ۔

"আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির, যাকে তিনি নিজ হতে উত্তম রিযক্ দান করেছেন এবং সে তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, ওরা কি একে অপরের সমান?" - (১৬ ঃ ৭৫)

রাবীউল আউয়ালের প্রকৃত খুশী

রাবীউল আউয়ালের মাস যদি বিশ্ববাসীর জন্য আনন্দ ও খুশীর মাস হয়ে থাকে তাহলে শুধু এজন্য যে, এই মাসে বিশ্বের সেই সর্বাধিক মহান ব্যক্তির আর্বিভাব ঘটেছে, যিনি মুসলমানদেরকে তাদের সর্ববৃহৎ নি'মাত অর্থাৎ আল্লাহ্র দাসত্ব ও মানুষের কর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র খলীফা বলে আখ্যায়িত করেন। অতএব রাবীউল আউয়াল মানবীয় স্বাধীনতার জন্মের মাস। এটা হচ্ছে দাসত্বের মৃত্যু ও ধ্বংসের স্মৃতিচিহ্ন। এটা খিলাফতে এলাহী প্রাপ্তির প্রথম দিন। এটা হচ্ছে যমীনের উত্তরাধিকারিত্ব বন্টনের প্রথম ঘোষণা। এ মাসেই সত্যের কালিমা ও ন্যায়নিষ্ঠতার জন্ম হয়। এ মাসেই জুলুম- ফাসাদের কালিমা এবং কুফ্র ও পথভ্রষ্টতার অভিশাপ থেকে আল্লাহ্র যমীন পরিত্রাণ পায়।

তোমরা কি?

কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তোমরা এই স্বাধীনতা - মাসের আগমন উপলক্ষ্যে আনন্দ -স্ফূর্তি কর এবং এজন্য নানা ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। হাবভাব দেখে মনে হয় যেন এটা তোমাদেরই আনন্দোল্লাসের জন্য এসেছে। কিন্তু আল্লাহ্র দিকে চেয়ে আমাকে বলো, এ পবিত্র ও স্মরণীয় দিনে তোমাদের আনন্দোল্লাস করার কি কোন অধিকার আছে? মৃত্যু ও ধ্বংসের কি এই অধিকার রয়েছে যে, সে নিজের খেয়াল খুশীমত জীবন ও রূহকে নিজের সঙ্গী করে নেবে? এ মৃত লাশের উপর বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা কি হাসবে না, যে জীবিতদের ন্যায় নিজের জীবনকে স্মরণ করে? হ্যাঁ, এটা সত্য যে, সূর্যের আলোর মধ্যে বিশ্ববাসীর জন্য আনন্দবার্তা রয়েছে, কিন্তু একজন চক্ষুহীনের জন্য এটা কি শোভা পায় যে, সূর্য উদিত হওয়ার পর সে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের মত আনন্দোল্লাসে মেতে উঠবে?

অতঃপর বলো, তোমরা কে? - তোমরা হচ্ছ সেই গোলামের দল, যারা নিজেদের নাফ্সের গোলামী, নিজেদের কামনা-বাসনার গোলামী, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য বস্তু ও অন্যান্য শক্তির গোলমীর শিকলে নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছে। তোমরা হচ্ছ পাথরের একটা স্তুপ, যা না নিজে থেকে নড়াচড়া করতে পারে আর না তার মধ্যে প্রাণ ও আত্মা আছে। অবশ্য তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে পারে, এবং এর একটি টুকরাকে অন্য টুকরার উপর নিক্ষেপ করা যেতে পারে। তোমরা হচ্ছ পথের এক মুঠো ধূলা, যাকে বাতাস উড়িয়ে নিলে সে উড়ে যায়। কিন্তু যদি উড়িয়ে না নেয় তাহলে সে পথচারীদের পায়ের তলায় দলিত-মথিত হতে থাকে।

চূড়ান্ত অন্য মনস্কতা

অতঃপর হে অন্যমনস্ক লোক সকল, হে ঘুমন্ত আত্মারা, তোমরা কোন্ মুখে তার জন্ম উপলক্ষ্যে আনন্দ আহলাদ কর। তিনি তো এসেছিলেন মানবীয় স্বাধীনতা, আত্মিক যিন্দেগী, মানসিক সজীবতা এবং রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক সাফল্য ও কৃতকার্যতা প্রদান করতে - অথচ তোমরা বৈপ্লবিক মন- মানসিকতা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের গোলামীর শিকলে আবদ্ধ করে নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছ। আল্লাহ্র উপর দৃঢ় ঈমান রাখা থেকে তোমাদের অন্তর শূন্য এবং সত্য আমাল তথা সুকর্মের আলো থেকে তোমাদের আত্মা বঞ্চিত। আক্ষেপের বিষয়, এমতাবস্থায়ও তোমরা রাবীউল আউয়াল মাসে অত্যন্ত জাকঁজমকের সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করছ সেই পবিত্র সত্তার জন্মদিবস পালনের, যার আগমন হয়েছিল আল্লাহ্র ইবাদত প্রতিষ্ঠা, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্যদের ইবাদতের মূলোৎপাটন,

সত্যিকার স্বাধীনতার ঘোষণা, আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুসংবাদ প্রদান এবং একটি ন্যায়নিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ উম্মতের গোড়া পত্তন করতে–

فَمَالِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا .

"এই সম্প্রদায়ের কী হলো যে, এরা একেবারেই কোন কথা বুঝে না।" – (৪ : ৭৮)

অনুষ্ঠান পালনের অধিকার

অতএব হে গাফিল ও অন্যমনস্ক জাতি, তোমাদের এই গাফলতী ও অন্যমনস্কতার জন্য হাযার আক্ষেপ। তোমরা যদি এই পবিত্র মাসের মাহাত্ম্য ও হাকীকত সম্পর্কে বেখবর থাক এবং শুধুমাত্র মুখের প্রশস্তিগীতি, ঘরদুয়ার সজ্জিতকরণ এবং নানা ধরনের কিন্দীল ও ঝাড়বাতি প্রজ্জলিত করার মধ্যে এর আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য খুজেঁ বেড়াও তাহলে তোমাদের ভাগ্যে বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, এই পবিত্র মাস মুসলিম উম্মতের ভিত্তি স্থাপনের প্রথম মাস, এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাদশাহী প্রতিষ্ঠার প্রথম ঘোষণা এবং যমীনে আল্লাহ্‌র খিলাফত প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম মাস। অতএব এ মাসের আগমন উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব এবং তাকে স্মরণ করে অন্তরের তৃপ্তি ও স্বস্তি লাভ ঐ ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ, যার ঈমান ও আমালের মধ্যে আল্লাহ্‌র পয়গামের বাস্তবায়ন, আনুগত্য এবং আল্লাহর রাসূলের অনুপম চরিত্রের কোন নমুনা নেই।

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ط اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ .

"অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। ওদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বোধ শক্তি-সম্পন্ন।" –(৩৯ : ১৭-১৮)

বি'ছাত ও নুবুওয়াত

[আবির্ভাব ও নুবুওয়াত লাভ]

সংক্ষেপে রাসূল জীবন

প্রথম জীবনের অবস্থা

জন্মের পর স্তন্যপানের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) কে হযরত হালীমা সাদিয়া (রা) এর কাছে অর্পণ করা হয়। তিনি ছিলেন হাওয়াযিন গোত্রের একজন মহিলা। স্তন্যপানের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মক্কা মুকাররমার আবহাওয়া প্রতিকূল থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) মোটামুটি ছয় বছর তাঁর দুধমায়ের কাছেই থাকেন। এরপর আপন মায়ের সাথে ইয়াছরিবে চলে যান, যা পরবর্তীকালে মদীনা-মুনাওরা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ইসলামী বিশ্বের জন্য দ্বিতীয় হারামে পরিণত হয়। ঐ সফরে উম্মে আয়মান (যিনি দাসী ছিলেন) ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবও তাঁর সংগী ছিলেন। আবদুল মুত্তালিবের মাতামহের বাড়ী ইয়াছরিবে ছিল। মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মা পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আবওয়া নামক স্থানে ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।[১]

১। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছয় থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর পিতামহের অভিভাবকত্বে থাকেন।[২] আবদুল মুত্তালিব, তাঁর মৃত্যুর সময় এই প্রতিপালনের দায়িত্ব স্বীয় সন্তান আবূ তালিবের হাতে অর্পণ করেন, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) এর পিতা আবদুল্লাহর সহোদর ভাই।

২। রাসূলুল্লাহ (সা) এর কৈশোর কালেই 'হারবে ফুজ্জার' (অবৈধ যুদ্ধ) সংঘটিত হয়। আরবের পুরাতন দস্তুর অনুযায়ী যেসব মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ, সেই সব মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বিধায় এটাকে 'হারবে ফুজ্জার' বলা হয়। খুব সম্ভবত: হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক নির্ধারিত হজ্জ নীতির উপর ভিত্তি করে এই নিষিদ্ধতা আরোপ করা হয়েছিল। এই যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল কায়স গোত্র। আর হাওয়াযিন গোত্র ছিল তাদের মিত্র বা সাহায্যকারী। আর অপরপক্ষে ছিল কুরায়শ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁর গোত্রের সাথে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি কারো উপর অস্ত্রাঘাত করেননি।[৩]

হালফুল ফুযূল

অনবরত যুদ্ধ চলার দরুণ সারা দেশে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছিল। রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পথিকদের উপর অবাধে লুটপাট চালানো হত। ধনীরা গরীবদের উপর অনবরত জুলুম অত্যাচার চালাত। এগুলোর প্রতিরোধকল্পে কিছু সংখ্যক পুণ্যহৃদয় ব্যক্তি একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, যার সদস্যদেরকে প্রতিজ্ঞা করতে হত যে-

ক) আমরা দেশ থেকে অশান্তি ও অরাজকতা দূর করবো।

খ) পথিকদের হিফাযত করতে থাকবো।

গ) গরীবদেরকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য-সহায়তা করবো।

ঘ) দুর্বলের উপর সবলের জুলুম প্রতিরোধ করবো।

মূল অঙ্গীকারকে 'হালফুল ফুযূল' বলা হত। এই নামের দুটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্র যে বান্দারা সর্বপ্রথম এই অঙ্গীকারনামার কথা চিন্তা করেছিলেন, তাদের প্রত্যেকের নাম ছিল 'ফযীলত' ধাতু থেকে উৎপন্ন। যেমন, ফুযায়ল বিন হারছ, ফুযায়ল বিল ওয়াআ' এবং মুফয্যল। এরা সবাই ছিলেন জুরহুম কাতূরা গোত্রের লোক। দ্বিতীয়ত: আরবী ভাষায় 'হক' কে 'ফযল'ও বলা হয়। আর ফযলের বহুবচন হচ্ছে ফুযূল। এ কারণেই এই অঙ্গীকারনামা 'হালফুল ফুযূল' নামে খ্যাত, যার অর্থ হচ্ছে হুকূকের অঙ্গীকার তথা হুকূক সংরক্ষণের পারস্পরিক চুক্তি।

শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি কার্যকর হতে পারেনি। খুব সম্ভবত: হারবে ফুজ্জারের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চাচা যুবায়র বিন আবদুল মুত্তালিব এই হলফনামা পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেন। তাতে বনূ হাশিম, বনূ আবদুল মুত্তালিব, বনূ আসাদ, বনূ যুহ্রা এবং বনূ তামীমের লোকেরা শরীক ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও এর একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। নুবুওয়াত পাপ্তির পরও তিনি বলতেন, যদি এই অঙ্গীকারনামার মুকাবালায় আমাকে লাল উটও দেওয়া হত তাহলেও আমি কখনো এ থেকে সরে আসতাম না।

বাণিজ্য

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ভদ্রতা, পুণ্যকামিতা, বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার কারণে জীবনের সূচনাকাল থেকেই সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। সর্বসাধারণ 'আস সিদ্দীক' ও 'আল আমীন' উপাধিতে ডাকত। শৈশব থেকে যৌবনে পা দিতেই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের চিন্তা করেন। এটাই ছিল মক্কাবাসীদের সাধারণ পেশা। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁকে উল্লেখ্যযোগ্য সাহায্য করার মত আর্থিক অবস্থা আবু তালিবের ছিল না। আল্লাহ্ ত'আলা তাঁর পরম করুণা গুণে এর একটা সুরাহা করে দিলেন। মক্কা মুকাররমায় খাদীজা নাম্নী একজন ধনবতী বিধবা মহিলা ছিলেন। তিনি তাঁর ভদ্রতা ও আভিজাত্যের কারণে 'তাহিরা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। খাদীজা ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুণাবলী ও প্রকৃষ্টতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠান, যদি আপনি আমার মাল বাণিজ্য কাফেলার সাথে সিরিয়ায় নিয়ে যান তাহলে আমি অন্যান্যদেরকে যে পারিশ্রমিক দেই, তার দ্বিগুণ পারিশ্রমিক আপনাকে দেব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন চাচার সাথে পরামর্শ করার পর খাদীজার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঐ বাণিজ্য সফরে হযরত খাদীজা অত্যন্ত লাভবান হয়েছিলেন।

বিবাহ

হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুপম চরিত্র ও সুন্দর আচার-আচরণ সম্পর্কে লোক মুখে ইতিপূর্বে যেসব কথা শুনেছিলেন, এবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হন। উপরন্তু আপন ক্রীতদাস মায়সারার মাধ্যমে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সফরকালীন অবস্থাও বিস্তারিতভাবে জানতে পারেন তখন স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে স্বয়ং তাঁর কাছে আপন বিহাহের পয়গাম পাঠান এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে সম্মতি প্রকাশ করলে উভয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স ছিল পঁচিশ আর হযরত খাদীজার (রা) বয়স ছিল চল্লিশ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনেকগুলো বাণিজ্য সফর করেন।

কা'বা নির্মাণ

বন্যার কারণে কা'বা শরীফের দেয়ালগুলো ফেটে গিয়েছিল। কুরায়শরা তা নতুনভাবে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিরাট প্রচেষ্টার মাধ্যমে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। যেহেতু সমগ্র ছাদের জন্য কাঠ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, তাই ছাদের কিছু অংশ অসম্পূর্ণ রেখে দেওয়া হয়, যা আজকাল 'হাতীম' নামে পরিচিত। যখন 'হাজারে আসওয়াদ'

(কালো পাথর) দেয়ালে স্থাপন করার সময় এল তখন গোত্র সমূহের মধ্যে এ নিয়ে টানাটানি শুরু হল। প্রত্যেক গোত্রপতিই চাচ্ছিলো, 'হাজারে আসওয়াদ'-কে আসল জায়গায় স্থাপনের সম্মানজনক কাজটি যেন তার গোত্রই আন্জাম দেয়। বিরোধ চরম আকার ধারণ করছে দেখে আবু উমাইয়া বিন মুগীরা, যিনি ছিলেন কুরায়শ বংশের প্রবীণতম ব্যক্তি, এই প্রস্তাব দেন যে, যাকে সবার আগে হারাম শরীফে আসতে দেখা যাবে, তাকেই এ সব্যাপারে সালিস নিযুক্ত করা হবে। এই প্রস্তাবে উপস্থিত সবাই একমত হয়।

এরপর সবাই চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ই সবার আগে সেখানে এসে পৌঁছেছেন। লোকেরা তখন আনন্দে আপ্লুত হয়ে বলে উঠে 'আমীন এসেছেন,' 'আমীন এসেছেন।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) আদ্যোপান্ত ব্যাপারটি জানতে পেরে মাটির উপর আপন চাদরটি বিছিয়ে দেন এবং তার উপর 'হাজারে আসওয়াদ' রাখেন। তারপর সকল গোত্রের সরদারকে বলেন, তারা যেন চাদরের এক একটি প্রান্ত ধরে তা উপরে উঠায়।

এভাবে হাজারে আসওয়াদ যখন তার মূল জায়গার সামনে আসল তখন তিনি নিজ হাতে তা চাদর থেকে উঠিয়ে দেয়ালে স্থাপন করলেন। এভাবে সব গোত্রের সর্দারই উক্ত সম্মানজনক কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেল এবং তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে আর কোন মতবিরোধ বাকি থাকল না।

নুবুওয়াত লাভের নিকটবর্তী সময়কাল

মরহুম কাযী সুলায়মান মানসূরপুরী বলেন, নুবুওয়াত লাভের সাত বছর পূর্বে একটি আলো বা প্রভা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এই আলো দর্শনে আনন্দিত হতেন। সে আলোতে কোন আওয়াজ বা শব্দ থাকত না। নুবুওয়াত লাভের সময় যতই ঘনিয়ে আসতে থাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ততই নির্জন বাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। তিনি প্রায়ই পানি এবং ছাতু নিয়ে মক্কা নগরী থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে একটি জনমানবহীন জায়গা তথা হেরা পাহাড়ের[৫] একটি নির্জন গুহায় গিয়ে বসতেন এবং ধ্যান ও উপাসনায় মগ্ন থাকতেন। ঐ গুহাটির দৈর্ঘ্য ছিল চারগজ এবং প্রস্থ ছিল পৌনে দু'গজ। আল্লাহ্র প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। সেই সাথে তিনি আল্লাহ্র কুদরত ও মহিমা সম্পর্কে ধ্যান-ফিক্র করতেন। যতক্ষণ পানি ও ছাতু শেষ না হত ততক্ষণ তিনি শহরে ফিরে আসতেন না। রমযান মাস তিনি সাধারণত: ইবাদতের মধ্যেই কাটাতেন।[৬] কখনো কখনো হযরত খাদীজা (রা) ও তাঁর সংগে সেখানে যেতেন, তবে কিছুক্ষণ পরই তিনি ঘরে ফিরে আসতেন।

এরপর নানা ধরনের স্বপ্ন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। সে স্বপ্নগুলো এতই সত্য হত যে, তিনি রাতের বেলা যা দেখতেন, দিনের বেলা তা-ই প্রকাশ পেত।[৭] রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেরা গুহায় যে ইবাদত করতেন সেটাকে বিভিন্ন রিওয়ায়াতে 'তাহান্নুছ' বলা হয়েছে।

মরহুম মাওলানা শিবলী তার'সীরাতুন্নবী' গ্রন্থে তাহান্নুছ সম্পর্কে যা লিখেছেন তা হলো,

'তাহান্নুছ' হচ্ছে সেই ইবাদত, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পিতামহ (পূর্বপুরুষ) হযরত ইবরাহীম (আ) তার নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে করতেন। নক্ষত্ররাজির ঝলক দেখে ধোঁকায় পতিত হলেন। চাঁদ উদিত হলে আরো সংশয় হল। সূর্যের উপর ততোধিক সংশয়। কিন্তু সবগুলি যখন দৃষ্টির আড়াল হল তখন হঠাৎ বলে উঠলেন–

لَا أُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ۔

"যা অস্তমিত হয়, আমি তা পছন্দ করি না।"(৬ ঃ৭৬)

নুবুওয়াত

চান্দ্র বছরের হিসাব অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর একদিন, তখন ৯ রাবীউল আওয়াল,[৯] ৪১ মীলাদী সন (মুতাবিক ১২ই ফেব্রুয়ারী, ইং ৬১০ সন) রোজ সোমবার জিবরীল (আ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নুবুওয়াতের নির্দেশ নিয়ে আসলেন। তখন হুযূর (সা) হেরা গুহায় ছিলেন। জিবরীল (আ) বললেন, হে মুহাম্মদ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমি হচ্ছি জিবরীল। এই ঘটনার পর পরই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে ফিরে আসেন এবং সংগে সংগে শুয়ে পড়েন। স্ত্রী খাদীজা (রা) কে বলেনঃ আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। যখন মনে কিছুটা স্বস্তি আসে তখন বললেন, আমি এরূপ এরূপ ঘটনা দেখেছি এবং এতে আমার প্রাণের উপর আশংকা দেখা দিয়েছে। খাদীজা (রা) বললেন, না আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি দেখি, আপনি নিকটাত্মীয়দের স্নেহ করেন, সত্য কথা বলেন, বিধবা, য়াতীয় ও অসহায়দের সাহায্য করেন, অতিথি সেবা করেন–এবতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কখনো দৈহিক বা মানসিক ক্লেশ দেবেন না।[১০]

মরহুম কাযী সাহেব বলেন,"আমার প্রাণের আশংকা দেখা দিয়েছে,"-একথা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নুবুওয়াতের বিপদ-বাধাসমূহ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল। মাওলানা শিবলী লিখেছেন– এই দ্বিধাদ্বন্দ, এই আশংকা, আল্লাহ্‌র পরাক্রমের এই প্রভাব তাঁর নুবুওয়াতের ভারী বোঝার চিন্তাপ্রসূত ফলশ্রুতি ছাড়া কিছু ছিল না। তিনি (সা) কি দেখেছিলেন, জিবরীল (আ) কি বলেছিলেন, কি কি বিস্ময়কর বস্তু তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, এগুলো হচ্ছে ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম কথা, যা শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয় (সীরাতুন্নবীঃ প্রথম খন্ডঃ পৃষ্ঠা – ১৭৯) এতদ্‌সত্ত্বেও এর আসল হাকীকত পরবর্তিতে বর্ণিত মাওলানার বক্তব্য থেকে প্রকাশিত হবে।

নুযূলে কুরআন

কাযী সুলায়মান লিখেছেন, কিছু দিন পর পুনরায় জিবরীল (আ) এলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যিনি লেখাপড়া জানতেন না, তাকে আল্লাহ্ তা'আলার ঐ পাক নাম ও পাক কালিমা পড়ান, যা সমগ্র বিশ্বের চাবি এবং যাবতীয় হাকীকতের ভান্ডার। জিবরীল তাকে যে সমস্ত আয়াত পড়িয়েছিলেন, তা হলো–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ . الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

"পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' (রক্তপিন্ড) হতে। পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।" (৯৬ ঃ১-৫)

মরহুম কাযী সাহেবের বর্ণনা মতে নুবুওয়াতের সুসংবাদ এবং ওহী নাযিলের মধ্যবর্তী সময়কাল আনুমানিক ছয়মাস।[১১]

মাওলানা শিবলী বলেন, নুবুওয়াতের ভূমিকা এই ছিল যে, স্বপ্নের মধ্যে তাঁর সামনে অনেক রহস্যজনক বস্তু উদ্ভাসিত হত। যা কিছু তিনি স্বপ্নে দেখতেন, অবিকল ঐ জিনিস তাঁর সামনে বাস্তবে প্রকাশ পেত। একদিন যখন তিনি তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তখন ঐ অদৃশ্য ফিরিশতা দৃষ্টিগোচর হয়ে তাঁকে বলতে বলেন, اِقْرَاْ بِاسْمِ............الخ

সালাত ও তাবলীগ

কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ পড়ানোর পর হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে হেরা গুহা থেকে বাইরে সেই স্থানে নিয়ে এলেন, যেখানে হেরা পাহাড় বা জাবালে নূরের এক অংশ উপরের দিকে উত্থিত হয়ে আছে। তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে ওযূ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও অনুরূপভাবে ওযূ করলেন। এরপর উভয়ে মিলে নামায পড়েন। নামাযে জিবরীল (আ) ইমামত করেন।

সাথে সাথে 'পয়গামে হক' এর তাবলীগ শুরু হলো। তবে তিন বছর পর্যন্ত এই তাবলীগ গোপনে জারী থাকে। সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা, হযরত আলী (যার বয়স তখন ছিল মাত্র আট বছর), হযরত যায়দ বিন হারিছা এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) মুসলমান হন। কিছুদিন পর হযরত বিলাল, আমর ইবন আম্বাবছা এবং খলিদ বিন সায়ীদ বিন আস ইসলাম গ্রহণ করেন।

সেই প্রথম যুগের উল্লেখযোগ্য অতি সৌভাগ্যবান সাহাবী এবং সাহাবিয়াহ্ হচ্ছেন হযরত উছমান, হযরত যুবায়র, আবদুর রহমান বিন আউফ, তালহা, হযরত সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস, হযরত আবু উবায়দা বিন আল জাররাহ, হযরত আবু সালমা, আবদুল আসাদ বিন বিলাল, হযরত উছমান বিন মায্‌উন, হযরত আমির বিন ফুহায়রা আয্‌দী, হযরত সায়ীদ বিন যায়দ, হযরত আরকাম বিন আবিল আরকাম, হযরত আম্মার বিন ইয়াসির, হযরত আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফযল, হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর, হযরত আসমা বিনতে উমাইয়া, হযরত ফাতিমা বিনতে আল-খাত্তাব (হযরত উমরের সহোদরা) অর্থাৎ সায়ীদ বিন যায়দের স্ত্রী। এই অগ্রবর্তী পবিত্রচেতা মানব গোষ্ঠী কোন একটি ঘাঁটিতে গিয়ে একত্রে নামাযও আদায় করতেন।[১৩]

প্রকাশ্য তাবলীগের নির্দেশ

এরপর আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসল–

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَأَنْذِرْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ . وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ . وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ .
وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ . وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ .

"হে বস্ত্রচ্ছাদিত, উঠুন সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন, অপবিত্রতা (পৌত্তলিকতা, শিরক ইত্যাদি) হতে দূরে থাকুন, অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করবেন না এবং আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করুন।" –(৭৪ ঃ ১-৭)

মরহুম কাযী সুলায়মান এই সব আয়াত থেকে রিসালতের নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলো উদঘাটন করেছেন।

১। আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের ভয়ংকর অবস্থা সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া এবং তাদের পরিণাম সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা।

২। আল্লাহ্‌র প্রতিপালন গুণ ও আল্লাহ্‌র প্রবল পরাক্রমের দিকটি মানুষের সামনে তুলে ধরা।

৩। মানুষকে ই'তিকাদ, আমল ও আখলাকের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে পবিত্র থাকার শিক্ষা দেওয়া।

৪। মানুষকে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্র চিত্ততা শিক্ষা দেওয়া।

৫। বিনা পারিশ্রমিকে মানুষকে আল্লাহ্‌র কথা শিক্ষা দেওয়া এবং এজন্য তাদের কাছ থেকে কোন উপকার পাওয়ার আশা না রাখা। মানুষের প্রতি এহসান করলে তা না বলা।

৬। একাজ করতে গিয়ে যত বিপদ-আপদই আসুক না কেন, তা অকাতরে সহ্য করা।[১৪]

তাবলীগের পাঁচটি স্তর

তাবলীগের আওতা ক্রমশ: বৃদ্ধি পেতে থাকে। মরহুম কাযী সুলায়মান এই ক্রমবর্ধমান আওতাকে মোট পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যেমন–

১। নিকটাত্মীয় এবং বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব।

২। নিজ জাতি ও নিজ শহরের লোক।

৩। ঐ সমস্ত গোত্র ও জনগোষ্ঠী, যারা মক্কা মুকারমার আশেপাশে বসবাস করত।

৪। সমগ্র আরবের সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীসমূহ।

৫। সমগ্র বিশ্বের জাতি ও জনগোষ্ঠীসমূহ।[১৫]

উল্লেখিত ক্রমধারা অনুযায়ী তাবলীগের কাজ প্রসার লাভ করতে থাকে।

এই অধ্যায়টি এ উদ্দেশ্যে এখানে সংযোজন করা হয়েছে, যাতে পাঠকবৃন্দের মনে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী উদিত হয়। (সংকলক)

টীকা ঃ

১। আবওয়া মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী রাবিগ নামক স্থানের উত্তরে এবং মাসতূরার সন্নিকটে অবস্থিত তারীকে সূলতানী (রাজপথ) এর একটি প্রসিদ্ধ মনযিল।

২। মরহুম কাযী সুলায়মান মানুসূরপুরী এই সাথে দিনের হিসাবও যোগ করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আট বছর ১০ দিন বয়স পর্যন্ত আপন পিতামহের অভিভাবকত্বে ছিলেন।

৩। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা–১৬৯।

৪। রাহমাতুল লিল আলামীন ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা–৬৪, সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা– ১৭০।

৫। এখন ঐ পাহাড়কে 'জাবালে নূর' বলা হয়। এখানে একটি কথা জেনে রাখা ভাল যে, কোহে হেরা বা জাবালে নূর হচ্ছে মক্কা মুকাররমা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী একটি পৃথক পাহাড়ের নাম। এটি গোল গম্বুজের আকারে বেশ উঁচু। চক্কর কাটা পেঁচানো রাস্তা ধরে উপরে উঠতে হয় এবং এতে প্রায় পয়ত্রিশ মিনিট সময় লাগে। হেরা গুহায় যে পরিসর, তাতে সেখানে দাঁড়িয়ে নামায অনায়াসে পড়া যেত।

৬। সাহীহায়ন ঃ 'আঈশা (রা) থেকে বর্ণিত।

৭। ঐ

৮। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা– ১৮৭।

৯। রাহমাতুল লিল্ আলামীন গ্রন্থে মরহুম কাযী সাহেব লিখেছেন, 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে রাবীউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ লিখা হয়েছে। কিন্তু সোমবার দিন যে এই ঘটনা ঘটেছে, তাতে সবাই একমত। আর যেহেতু ঐ তারিখ ছিল সোমবার। অতএব এখানে ৯ তারিখই সঠিক।

১০। সাহীহায়নঃ আঈশা (রা) থেকে বর্ণিত।

১১। 'রাহমাতুল লিল্ আলামীন' গ্রন্থে কাযী সাহেব লিখেছেন, উলামাবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্ম রাবীউল আউয়াল মাসে হয়েছিল। এ ব্যাপারেও তারা একমত যে, ওহীর সূচনা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক চল্লিশ বছর বয়সে। এ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ওহীর সূচনাও হয়েছিল রাবীউল আউয়াল মাসে। কিন্তু কুরআন মজীদ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র রমযান মাসে কুরআন মজিদ নাযিল হয়েছিল। অতএব ওহীর সূচনা ও কুরআন নাযিলের মধ্যবর্তী সময়কাল হচ্ছে ছয় মাস। এই সময়ে সত্য স্বপ্ন তাঁর দৃষ্টিগোচর হত, যা হচ্ছে নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নুবুওয়াতের সময়কাল হচ্ছে তেইশ বছর। কাযী সাহেবের মতে ঐ ছয় মাস সময়কাল হচ্ছে তেইশ বছরেরই ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

১২। সীরাতুন্নবী ঃপৃষ্ঠা – ১৮৮।

১৩। রাহমাতুল লিল্ আলামীন ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা–৫৪।

১৪। ঐ

১৫। রাহমাতুল লিল্ আলামীন ঃ পৃষ্ঠা– ৫৬।
রাহমাতুল লিল আলামীন ঃ পৃষ্ঠা-৫৭।

কুরআনের বিন্যাস ও সূরা ফাতিহা–১

এটা হচ্ছে মরহুম মাওলানার মুকাদ্দামা-ই-কুরআন (কুরআনের ভূমিকা)এর দ্বাদশ অধ্যায়ের শুধুমাত্র একটি অংশ, যে অধ্যায়টি ইং ১৯১৬ সনে নিশ্চিতভাবে ছাপা হয়ে গিয়েছিল। তাফসীরে 'আল বায়ান ' ও ছিল যন্ত্রস্থ, যার মধ্যে মুকাদ্দামা-ই কুরআন ধারাবাহিকভাবে ছাপানোর পরিকল্পনা ছিল। হঠাৎ মাওলানাকে বেঙ্গল থেকে বহিস্কারের নির্দেশ জারী করা হয়। অতএব তিনি রাঁচী চলে যান এবং সেখানে তাঁকে নযরবন্দী করে রাখা হয়। কোলকাতার বাসা থেকে পুলিশ তাঁর যাবতীয় কাগজপত্র-যার মধ্যে বিভিন্ন প্রবন্ধের খসড়া, মুদ্রিত অনেক ফর্মা এবং মাওলানার লিখিত নোটসমূহ ছিল– বস্তাবন্দী করে নিয়ে যায়। মুকাদ্দামার শুধুমাত্র দ্বাদশ অধ্যায়ের একটি ফর্মা ঘটনাচক্রে পরিত্যাজ্য অবস্থায় কোথাও পাওয়া যায় এবং তা নতুন পর্যায়ে মুদ্রিত তরজমানের কোন একটি সংখ্যায় ছাপিয়ে দেওয়া হয়। আমি এখানে এর পুরোটাই উদ্ধৃত করছি- এজন্য যে, এর প্রাথমিক অংশ মূল বিষয়ের সাথে বাহ্যত: সম্পর্কহীন হলেও এটা বি'ছতে (নবুওয়াত লাভ) এর কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভূমিকা হিসাবে বিবেচিত হবে। আমি মনে করি, পাঠকবৃন্দ এটা ছাড়া মূল আলোচনার গুরুত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা করতে পারবেন না।

কুরআনের সাময়িক বিন্যাস ও স্থায়ী বিন্যাস

মুকাদ্দামার পঞ্চম অধ্যায়ে কুরআন করীমের অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি ও বিন্যাস সম্পর্কিত আলোচনা আপনারা পড়েছেন এবং এ তত্বটি আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কুরআন করীমের একটি বিন্যাস ছিল সাময়িক এবং একটি স্থায়ী। প্রয়োজন অনুযায়ী টুকরা টুকরা করে যা নাযিল হত তা একত্রে বিন্যাস করাকেই সাময়িক বিন্যাস বলা হত। আর একটি পরিপূর্ণ কিতাবের আকারে যা চূড়ান্তভাবে বিন্যাস করা হত, তাকে বলা হত স্থায়ী বিন্যাস। এটাই হচ্ছে 'আল কিতাব' যা এখন আমাদের কাছে আছে।

এটা সেরূপেই আমাদের কাছে আছে, যেরূপে তা বিন্যস্ত হয়েছিল ওহীয়ে ইলাহীর মাধ্যমে। অবশ্য সেই সাথে এর নাযিল হওয়ার ক্রমধারার তারিখও এমনভাবে সংরক্ষিত আছে যে, আমরা অনায়াসে তা জানতে পারি। কেননা, সাহাবা, তাবিয়ীগণ তাঁদের রিওয়ায়াত ও তা'লিমের মধ্যে আয়াতে কুরআনী অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ এবং সেগুলো নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিত তথা শানে নুযূল যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছেন।

দুটি বিন্যাসের উদ্দেশ্য

এ দুটি বিন্যাসের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিভিন্নতা ছিল। প্রথম বিন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল, একটি সীমিত ও সুনির্দিষ্ট জামাআতকে শিক্ষা দিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য তাদেরকে তৈরী করা। অতএব তাদের অবস্থা যেরূপ ছিল এবং যেভাবে পর্যায়ক্রমে তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি পেত সেভাবে একের পর এক তাদেরকে শিক্ষাও দেওয়া হত। কিন্তু দ্বিতীয় বিন্যাসের উদ্দেশ্য কোন সীমিত জামা'আত কিংবা সীমিত সময়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল না। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বকালের সমগ্র মানবজাতির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের একটি সর্বকাল-উপযোগী মহান গ্রন্থ সংকলন করা। তাই প্রথম বিন্যাস থেকে এর বিভিন্ন হওয়াটা ছিল জরুরী। একটি বিশেষ পর্যায়ের জ্ঞান দানের জন্য

মাদরাসাসমূহে যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়, তা যেমন সমগ্র মানুষের সামগ্রিক শিক্ষা দানকালে অপর একটি সামগ্রিক রূপ ধারণ করে, এখানে কুরআনের প্রথম ও দ্বিতীয় বিন্যাসের অবস্থাও ছিল ঠিক তাই।

কিতাবী বিন্যাস ও দারসী বিন্যাস

আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন মজীদের কিতাবী (গ্রন্থগত) বিন্যাস, দারসী তথা অবতরণগত বিন্যাসের চাইতে ভিন্ন। কেননা, কিতাবী বিন্যাসে যে সমস্ত সূরা প্রথমে নজরে পড়ে তা কিন্তু অবতীর্ণ হয়েছিল পরে। শেষ পারাসমূহের বেশীর ভাগ সূরা মক্কী অর্থাৎ সেগুলো নুবুওয়াতের প্রথম যুগে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু এখন এই সব সূরা দ্বারা কিতাবের পরিসমাপ্তি টানা হয়। সূরা বাকারা হিজরতের পরে নাযিল হয়েছিল, কিন্তু এখন সূরা ফাতিহার পরই এর দ্বারা কুরআন শুরু হয়।

ফাতিহা সবদিক দিয়ে প্রথম

কিন্তু এই দিক থেকে সূরা ফাতিহা হচ্ছে একটি আশ্চর্য সুরা, যা উভয় বিন্যাসের প্রেক্ষিতেই প্রথম। এর প্রথম হওয়ার বৈশিষ্ট্য একইরূপে নজরে পড়ে। এটাই প্রথম শিক্ষা, যা 'ইলাহী বিদ্যা নিকেতনে' অগ্রবর্তী মুমিনদেরকে দেওয়া হয়েছিল । আর এটাই পথম বর্ণনা, যা চিরদিনের জন্য 'আল্‌কিতাবেও' পথমে স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ অবতীর্ণ হওয়ার দিক দিয়ে যেমন এটা প্রথম সূরা, তেমনি আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পাওয়ার দিক দিয়েও আল্লাহ্‌র প্রথম বাণী। ওহীয়ে ইলাহীর লুক্কায়িত ও আচ্ছাদিত চেহারা যখন ফারান ভূখন্ডে তার মুখের আবরণ উন্মোচন করল তখন আল্লাহ্‌র হাকীকতের সৌন্দর্যের প্রথম দৃশ্যই ছিল সূরা ফাতিহা। এরপর এই সূরাই চিরদিনের জন্য সর্বাগ্রে স্থান করে নিল। আর তা এই জন্য যে, মানবজাতি যখন কখনো আল্লাহ্‌র হাকীকতের সন্ধানে পাগলপারা হয়ে উঠবে তখন যেন আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত এই দ্বীপশিখার আলোই তার সামনে প্রতিভাত হয়।

সা'আদাত (সৌভাগ্য) ও হিদায়াতের প্রথম প্রকাশ

এ বিষয়টি শুধুমাত্র দারস ও নুযূল এবং কিতাবী বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল নয়, সামনে আর একটু অগ্রসর হলে আপনারা জানতে পারবেন যে, মানুষের শিক্ষা ও সৌভাগ্যের জগতে যা কিছু আছে, তার মধ্যে সর্ব প্রথম হাকীকত হচ্ছে এই সূরা এবং তাতে সাতটি আয়াত রয়েছে। যদি মানুষের শিক্ষা ও সৌভাগ্যের জগতকে একটি সফর বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে তার প্রথম মানযিল হচ্ছে এই সূরা। যদি ঐ জগত একটি সৌন্দর্য হয় তাহলে এটা হচ্ছে তার প্রথম দৃশ্য। যদি তা একটি গান হয় তাহলে এ থেকেই উত্থিত হয় তার প্রথম সুর। যদি তা একটি গাছ হয় তাহলে তার সর্বপ্রথম বীজ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যদি তা একটি সৌভাগ্য চক্র হয় তাহলে তার কেন্দ্র বিন্দু এটা ছাড়া আর কিছুই নয়। মোটকথা, বিশ্বসৃষ্টির পথ প্রদর্শনের মধ্যে মানবজাতির সৌভাগ্যের যা কিছু আছে সেটাকে যেভাবে এবং যে আকারেই দেখুন, সব কিছুর আগে এবং সব দিক দিয়ে এই সূরাই আপনাদের সামনে উদ্ভাসিত হবে।

হাকীকতের দীপ্তির প্রথম দৃশ্য

এ কারণেই মু'মিনদের ঈমানী জীবনের প্রথম দিন এটাই। তার প্রকৃতিগত যন্ত্রের প্রথম সুর এর ভিতর থেকেই উত্থিত হয়। তার ইলম ও আমলের সৌভাগ্যের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এরই সাতটি আয়াত। সে যখন হাকীকতের সফর শুরু করে তখন এটাই হয় তার প্রথম পদক্ষেপ। সে যখন চলতে শুরু করে তখন প্রথম মানযিল এটাই সামনে আসে। সে যখন কথা বলে তখন প্রথম আওয়াজ এটাই নির্গত হয়। যখন সে চায়, তখন এটার মধ্যেই তার প্রথম চাওয়া হয়। সত্যের জন্য কাঁদলে চোখের প্রথম অশ্রু এটাই নির্গত হয়। অর্থাৎ মুমিনের জীবনের মধ্যে যা কিছু আছে তার মধ্যে প্রথম বস্তু এটাই। এছাড়া যা কিছু আছে সবই এর পরের, এ থেকে নির্গত এবং এরই জন্য।

অগ্রবর্তিতার প্রকৃতিগত পর্যায়

আপনারা সামনে অগ্রসর হলেই জানতে পারবেন যে, এর প্রথম হওয়ার সুদৃঢ় ও নিশ্চিত হাকীকত হচ্ছে একটি ফিত্‌রী (প্রকৃতিগত) কানূন ও ইলাহী নামূস(আল্লাহ্‌ প্রদত্ত মহত্ব), যা কখনো ভেংগে যেতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র ফিতরাতের কোন আমল ভাংগার জন্য নয়ও। এটা এজন্য প্রথম নয় যে, এটাকে প্রথম জিনিস সাব্যস্ত করতে হবে এবং বলতে হবে এটাই প্রথম জিনিস; বরং এজন্য যে, মানব জাতির সৎ ফিত্‌রাতের প্রথম আওয়াজ এটাই। আর যখন কখনো মানবীয় ফিত্‌রাত সব রকমের কৃত্রিম ও বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকে পবিত্র হয়ে আপন প্রকৃত হাকীকতের পথে প্রকাশ লাভ করবে তখন তার ভিতর থেকে প্রথম আওয়াজ উঠবে এটাই।

সত্যানুসন্ধানের মূল আওয়াজ

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে এজন্য বাধ্য যে, যখন কখনো সে অক্ষর ও আওয়াজ সমূহের মধ্যে হাকীকতের অর্থ এবং ফিত্‌রাতের সঠিক ধারণাসমূহ ব্যক্ত করবে এবং শব্দ ও আওয়াজ সমূহের সাথে যখন কখনো আপন আল্লাহ্‌কে ডাকবে তখন প্রথম এবং মূল আওয়াজ তাই হবে, যা সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াতের ভিতর থেকে বের হতে পারে। এছাড়া মানুষের ফিত্‌রাতে সালিহা আর কিছুই বলতে পারে না। আর যদি বলে তবে তা, তার সত্যিকার ও প্রকৃত আওয়াজ হবে না, বরং তা হবে পথভ্রষ্টতা ও ময়লা-আবর্জনার একটি অন্ধকার,যা ফিত্‌রাতে সালিহার শুদ্ধ ও অবিমিশ্রিত শব্দ সমূহের স্থলে বিভিন্ন ধরনের বানোয়াট শব্দের সুর ছড়াবে।

সৃষ্টিজগতের তাসবীহ্‌

এরপর মানব জাতির মূল ও প্রথম শব্দ কেন এটা হবে না, যখন মানব জগত এবং তাঁর সৃষ্টি ও অস্তিত্বের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুরই স্বভাবগত ও প্রথম আওয়াজ হচ্ছে এটাই। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ .

"এবং এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না, কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না"-(১৭ ঃ৪৪)

সূচনা, সমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা

বৃত্ত রেখা যে কেন্দ্রবিন্দু থেকে শুরু হয়, সেখানেই শেষ হয়। এর প্রথম ও শেষ উভয় মান্‌যিল একই। সামনে দেখা যাবে যে, যেভাবে সূরা ফাতিহা সর্বপ্রথম হাকীকত, অনুরূপভাবে সর্বশেষও এটাই। যেভাবে এটা প্রারম্ভিকা সেভাবে এটা ছাড়া শেষও অন্য কিছু নয়। যেভাবে এটা সূচনা, অনুরূপভাবে এর মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণতা। যেভাবে এটা একটা বীজ, যা সর্বপ্রথম গাছের আমালিয়াতের ধারায় প্রকাশ লাভ করেছে, সেভাবে এটা গাছের সর্বশেষ প্রকাশও বটে। কেননা, গাছ সর্বশেষ কাজ এই করেছে যে, আপন শাখা সমূহে বীজের ফল লাগিয়েছে। অতএব মানব জাতির সৌভাগ্য যেভাবে সূরা ফাতিহা দ্বারা শুরু হয় সেভাবে এর উপর শেষও হয়। মুমিনের হিদায়াতের সূচনাও এটাই এবং পরিপূর্ণতাও এটাই। এটা একটা বীজ। তাই গাছের সূচনা ও শেষ যা কিছু, তার সব কিছুই এর ভিতরে আছে। এজন্য একটি মুসলিম জীবন অর্থাৎ ফিতরাতে সালিহার (সুস্বভাবের) একটি অবিমিশ্রিত ও বিশুদ্ধ আত্মা সব কিছু ভুলে যায়, কিন্তু সূরা ফাতিহাকে ভুলতে পারে না। তার জীবন তন্ত্রী থেকে রাতদিন হাকীকতের এই সুরলহরী সেভাবে উত্থিত হতে থাকে- যেভাবে উত্থিত হয় এ থেকে প্রভাতের প্রথম সুর। অনুরূপভাবে এর রাতের শেষ গানও এটাই। ভোরের সূর্যের চেহারা দর্শন করা তার জন্য হারাম, যতক্ষণ না সে সূরা ফাতিহার ভিতর দিয়ে

আপন আল্লাহকে ডাকে। অনুরূপভাবে সে রাতের বেলা সুখ শয্যায় শান্তি ও স্বস্তি পেতে পারে না, যতক্ষণ না সূরা ফাতিহার আওয়াজের সাথে আপন সত্যিকার মাহবূব ও মাবূদ আল্লাহ্‌র সাথে প্রেম করে। সূর্য যখন উদিত হয় তখন মুমিনদের জন্য সূরা ফাতিহার পয়গাম নিয়ে আসে, আর যখন অস্ত যায় তখন তার জন্যই অন্তরে আগে উন্মাদনা অনুভব করে। পাখী সকাল বেলা কিচির মিচির করে এবং সন্ধ্যা বেলা আপন আলয় খুঁজে। হাকীকত-বিস্মৃত মানুষও এমনটিই করে। তবে সেই মুমিন ব্যক্তি, যে ভোরের আলো দেখতেই আল্লাহ্‌কে ডাকে এবং অস্তগামী সূর্য দেখতেই আল্লাহ্‌র প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠে, সূরা ফাহিতার সুর লহরীর পবিত্র তানে তার অন্তর থাকে ভরপুর।

মহিলা কবি খানসা আপন ভাই সাখ্‌রের শোক গাথায় বলেন –

يذكّرنى طلوع الشمس صخرا

واذكره لكل غروب شمس .

"সূর্যের উদয় আমার অন্তরে সাখরের স্মরণকে সজীব করে দেয় এবং তার অস্তও তাকেই স্মরণ করে।"

অতএব মুমিনের দিন শুরু হয় ফাতিহা দ্বারা এবং শেষও হয় ফাতিহার উপর।

ফাতিহাতুল কিতাব

অতএব এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নাম 'ফাতিহাতুল কিতাব' রেখেছেন। আর এভাবে এর প্রথম হওয়ার হাকীকতকে এর নাম দ্বারাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন–

لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

"ঐ ব্যক্তির নামাযই হয় নি, যে (নামাযের মধ্যে) ফাতিহাতুল কিতাব পড়ে নি।"

এভাবে দারাকুতনী ও তিরমিযীর ঐ সব হাদীসও পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে, যেগুলোর মধ্যে অন্যান্য গুণাবলী ছাড়াও একটি গুণ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা হচ্ছে ফাতিহাতুল কিতাব। অতএব এটাই এর সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রথম গুণ হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই নামেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবা কিরাম (রা) এই সূরার উল্লেখ করতেন।

'ফাত্‌হ্' শব্দের ব্যাখ্যা

আরবী ভাষায় 'ফাত্‌হ্' এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর হওয়া। যেমন ইমাম রাগিব লিখেছেন–

'ফাতহ্' হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা ও মুশকিলসমূহ দূর হওয়া। যেহেতু প্রতিবন্ধকতা ও মুশকিলসমূহ দূর হওয়ার মধ্যে খুলে যাওয়া বা উন্মুক্ত হওয়ার অর্থ নিহিত রয়েছে, তাই 'ফাত্‌হ' এর প্রয়োগ ঐ অবস্থার উপরও হতে থাকে, যা খুলে যাওয়ার পরই প্রকাশিত হয়। বন্ধ দরজা খুলে গেছে অর্থাৎ তা ফাত্‌হ্ হয়েছে। যুদ্ধের মধ্যে সাফল্য প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেছে – অতএব এটাকে বলা হবে যুদ্ধের ফাত্‌হ্। দুঃখ দূর হয়েছে ও সুখের সূচনা হয়েছে এমন অবস্থাকে বলা হবে দুঃখ-ব্যাথার ফাত্‌হ্। মোটকথা, 'ফাত্‌হ্' শব্দের অর্থের মধ্যে মূল আভিধানিক হাকীকত হচ্ছে খুলে যাওয়া বা উন্মুক্ত হওয়া। আর যেহেতু উন্মুক্ত হওয়ার পর তার পরবর্তী অবস্থার সর্বপ্রথম প্রকাশ ঘটেছে, তাই সূচনা ও সমাপ্তির অর্থও এর একটা অংশে পরিণত হয় এবং এর সর্বপ্রকার ব্যবহারেই তা দৃষ্টিগোচর হয়।

এই ফাত্হ্ থেকে ফাতিহার উদ্ভব – অর্থাৎ ঐ বস্তু যা থেকে কোন কিছু উন্মুক্ত হয়েছে এবং আরম্ভ হয়েছে। ইমাম রাগিবের ভাষায়–

فاتحة كل شئ بعده الا يفتح مما بعده (مفردات امام راغب)

"প্রত্যেক জিনিসের ফাতিহা, তার প্রারম্ভ। অর্থাৎ যা থেকে সে শুরু হয়েছে। আর এই জিনিসের পরবর্তী অবস্থা এই শুরু থেকেই উন্মুক্ত হয়।" (মুফ্রাদাত ইমাম রাগিব)

কুরআন মজীদের চাবি

পুনরায় চিন্তা করে দেখুন, এই সূরার নাম ফাতিহা অর্থাৎ ফাতিহাতুল কিতাব। ফাত্হ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া, উন্মুক্ত হওয়া এবং আরম্ভ হওয়া। আর শব্দের এই যাবতীয় ব্যবহারিক দিক দিয়ে এটাই হচ্ছে সূরায়ে ফাতিহা। যখন ওহী উন্মুক্ত হলো, এ পথের প্রতিবন্ধকতা দূর হলো তখন সর্বপ্রথম এই সূরা প্রকাশিত হলো এবং সমগ্র আল্লাহ্র কালাম হলো এর পরে। যখন 'ওহীয়ে ইলাহী'-এর শিক্ষালয় উম্মতে মুসলিমার প্রথম দলকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দানের জন্য তৈরী করতে চাইল তখন সর্বপ্রথম পাঠ এবং সর্বপ্রথম শিক্ষা এটাই ছিল, যার দ্বারা শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ হয়। এরপর 'আল্ কিতাব'-এর স্থায়ী বিন্যাসের মধ্যে কুরআন মজীদের সূচনা হচ্ছে এটাই। অর্থাৎ কুরআন খুলতেই সর্বপ্রথম এরই ইলম(জ্ঞান) এবং সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। তারপর প্রকাশিত হয় অন্য সব কিছু। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার যত কালাম দুনিয়ায় এসেছে এবং যা কিছু কুরআন মজীদের মধ্যে আছে তার সব কিছুই সূরা ফাতিহা থেকেই উন্মুক্ত হয়। অন্য কথায়, এই সূরাই সব কিছুর সূচনা ও প্রারম্ভের কেন্দ্রবিন্দু।

আমলের ক্ষেত্রে উন্মুক্তকারী ও প্রথম

এরপর শুরু হয়েছে আমলের ক্ষেত্রে, এর উন্মুক্তকারী ও প্রথম হওয়ার ধারা। ফিতরাতে সালিহা অর্থাৎ মুসলিম ও মুমিন মানুষের জীবনে আমরা দেখি যে, তার জন্য প্রত্যেক রকমের সূচনা ও আরম্ভ হওয়ার কেন্দ্রবিন্দু এটাই। সে যখন উন্মুক্ত হয় তখন তার মধ্যে সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহাই দৃষ্টিগোচর হয়। সে যা কিছু করে তাতে সর্বপ্রথম এই সূরার হাকীকতেরই প্রকাশ ঘটে থাকে। যদি আপনারা ধৈর্য ধারণ করেন তাহলে পরবর্তীতে অধিকতর ব্যাখ্যার সাথে এই হাকীকত সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। তবে মোটামুটিভাবে এটুকু বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট যে, মুমিনের দৈনন্দিন জীবনের সূচনা অর্থাৎ প্রত্যেকটি ভোর এই সূরা থেকে শুরু হয় এবং এর উপরই শেষ হয়।

একটি রিওয়ায়াত

উপরে যা কিছু বলা হয়েছে, তা শুধু অনুমানের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকেও জানা যায় যে, মুমিনের প্রত্যেক কাজের শুরু সূরা ফাতিহার হাকীকত থেকে হওয়া উচিত। নিম্নে বর্ণিত বিখ্যাত হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করুন, যা সিহাহ্ ও সুনান গ্রন্থাদিতে বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক ধারারই প্রথম বর্ণনাকারী হচ্ছেন আবূ হুরায়রা (রা)। হাদীসটি হলো –

كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَمْ يُبْدَءْ فِيْهِ بِالْحَمْدِ فَهُوَ اَبْتَرُ .

" যে কাজ আল্লাহ্র প্রশংসার সাথে শুরু করা হয় নি তাতে সাফল্য নেই।"

উল্লেখিত শব্দগুলো ইবনে মাজাহ ও আবূ দাউদের। কিন্তু ইবনে আরাবী, বাগাবী প্রমুখের রিওয়াতে আছে, বিল হামদি লিল্লাহ (بالحمد لله) অর্থাৎ সব কাজ আল্লাহ্‌র প্রশংসার সাথে শুরু করা উচিত। ইমাম নাসায়ীর রিওয়ায়াতে আছে –

كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَءُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ جَزْمٌ ۔

কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, আলহামদু (اَلْحَمْدُ) এর স্থলে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ)। অর্থাৎ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে যে কাজ শুরু করা হবে না, তাতে কোন সাফল্য আসবে না।

আল্‌হামদু লিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ

অতএব দেখুন, এই হাদীস থেকে কিভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুমিনের যাবতীয় কাজ এই সূরার হাকীকত থেকে শুরু হওয়া উচিত। এই সূরার প্রথম হাকীকত হচ্ছে– 'হামদে ইলাহী'। সুতরাং তিনি বলেছেন প্রত্যেকটি কাজের শুরু আল্‌হামদু লিল্লাহ্ থেকেই হওয়া চাই। এর প্রথম আয়াত হচ্ছে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ প্রত্যেক কাজ 'বিসমিল্লাহ' এর সাথে শুরু করতে হবে। উভয় রিওয়ায়াতের মধ্যে কাজের শুরু ফাতিহার হাকীকত থেকেই। প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের বৈশিষ্ট্যাদির মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, সে যা কিছু করে আল্লাহ্‌র নামে করে। সে এ থেকে জীবনের প্রত্যেকটি শাখার সূচনা করে নিজের দেহ শুধু আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য নিদিষ্ট করে দেয়।

এভাবে ঐ সব হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন, যাতে বিভিন্ন পবিত্র আমাল সম্পর্কে পরিষ্কার বলা হয়েছে, 'বিসমিল্লাহ্-এর সাথে শুরু কর।' আর বিসমিল্লাহ্ হচ্ছে সূরা ফাতিহারই প্রথম আয়াত। এমনকি হাদীস ও ফিক্‌হের কোন কোন ইমামের মতে ওযূ করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ্' বলা ওয়াজিব। হযরত ইমাম আহ্‌মদ মারফূ পদ্ধতিতে রিওয়ায়াত করেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে ওযূ শুরু করে না, তার ওযূই হয় না।" যে সব ইমাম নিয়্যতকে ওযূর শর্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন তাদের দৃষ্টি এই সূক্ষ্ম কথার দিকেই নিবন্ধ ছিল বলে মনে হয়।

কুরআনের বিন্যাস ও সূরা ফাতিহা-২

আম্বিয়া কিরামের আদর্শ

সূলা ফাতিহার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য এ থেকেও প্রকাশিত হয় যে, যখন আমরা কুরআন পড়ি তখন জানতে পারি যে, আম্বিয়া কিরাম (আ) ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সর্বদা সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত দিয়ে শুরু করতেন। হযরত নূহ (আ) যখন নৌকার উপর পা রাখেন তখন বলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسٰهَا

"আল্লাহ্র নামে এর গতি ও স্থিতি।" (১১ ঃ ৪১)

হযরত সুলায়মান (আ) যখন সাবার রাণীকে পত্র লিখেন তখন শুরু করেন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (পরম করুণাময় আল্লাহর নামে) দিয়ে।

অনেক হাদীস দ্বারা তো একথা পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর যাবতীয় কাজ সূরা ফাতিহার এই প্রথম আয়াত দিয়েই শুরু করতেন।

অতএব উপরোক্ত দলীলাদি দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এই সূরা সব দিক দিয়ে ফাতিহ্ বা উন্মুক্তকারী এবং উন্মুক্তকরণ বা শুরু করা সব দিক দিয়ে এরই জন্য নির্দিষ্ট। আর এ কারণেই এর নাম ফাতিহা রাখা হয়েছে।

মক্কী ও মাদানী সূরা সমূহ

এটা যেমন ঐতিহাসিক সত্য যে, 'আল কিতাব'-এর ক্রমানুসারে যেমন এই সূরা প্রথম – তেমনি তা প্রথম পাঠদান ও নাযিল হওয়ার ক্রমানুসারেও।

আপনারা জানেন যে, কুরআন মজীদ তেইশ বছর ধরে অল্প আল্প করে নাযিল হয়। নাযিল হওয়ার দিক দিয়ে কুরআনকে দুভাবে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ হলো প্রাথমিক যুগের, যা হিজরত পর্যন্ত নাযিল হয়েছে। এটাকে বলা হয় মক্কী। অপর ভাগ যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মদীনায় হিজরত থেকে আরম্ভ হয়ে তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নাযিল হয়েছে, সেটাকে বলা হয় মাদানী। অতএব কুরআন মজীদের যে সব মাদানী সূরা প্রথমে অর্থাৎ প্রথম যুগে নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে মক্কী সূরা নামে অভিহিত করা হয়। আর যে সব সূরা হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে সেগুলেঅকে মাদানী ;সূরা বলা হয়। অতএব সূরা সমূহের নামকরণ এই হিসাবে মক্কী বা মাদানী করা হয় নি যে, তা মক্কা বা মদীনায় নাযিল হয়েছে – বরং এই হিসাবে করা হয়েছে যে, তা হিজরতের পূর্বে অথবা পরে নাযিল হয়েছে, অর্থাৎ এই নামকরণ স্থানের উপর নয় বরং কালের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠতম বিভাগ

আম্বিয়া কিরাম (আ)-এর সামগ্রিক কর্ম সম্পাদনের সময়কাল মোট তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম হচ্ছে দাওয়াত ও তাবলীগের সময়কাল। দ্বিতীয় হচ্ছে হিজরতের সময়কাল। তৃতীয় হচ্ছে হক ও বাতিলের ফায়সালা 'আমরে ইলাহী' (আল্লাহ্‌র হুকুম)-এর প্রকাশকাল। অতএব যেহেতু 'হিজরতে নবভী'-এর উপর প্রথম সময়কাল শেষ হয়ে দ্বিতীয় সময়কাল শুরু হয়েছে, তাই অবতীর্ণ হওয়ার দিক দিয়ে অহীয়ে ইলাহীকেও মোট দু'টি বড় সময়কালের মধ্যে ভাগ করে তা বিন্যস্ত ও সংরক্ষিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এর চাইতে শ্রেষ্ঠতর বিভাগ আর কিছুই হতে পারে না। এ কারণেই এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ উলামা কিরাম এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, মাদানী সূরা বলতে ঐ সব সূরাকে বুঝায় না, যা মদীনায় নাযিল হয়েছিল। বরং হিজরতের পর যেসব সূরা নাযিল হয়েছে, তার সবগুলোই মাদানী। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেখানে অবস্থান কালে যদি কোন আয়াত নাযিল হয়ে থাকে তাও উল্লেখিত সময়কালের প্রেক্ষিতে মাদানী, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা মদীনায় নাযিল হয়নি।

সূরা ফাতিহা কি মক্কী, না মাদানী

সূরা ফাতিহা কি মক্কী, না মাদানী? অর্থাৎ তা হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছিল, না পরে? এর উত্তর খোদ কুরআন মজীদেই রয়েছে। সূরা হিজর, যা সর্বসম্মতিক্রমে একটি মক্কী সূরা, তাতে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফাতিহা সম্পর্কে বলে দিয়েছেন যে, তা (ইতি মধ্যে) নাযিল হয়ে গেছে। যেমন–

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ‎.

"আমি তো আপনাকে দিয়েছি সাত আয়াত, যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় এবং দিয়েছি মহা কুরআন।" (১৫:৮৭)

সহীহ্ হাদীস সমূহ এবং সাহাবা কিরামের উক্তি দ্বারা জানা যায় যে, এখানে সাত আয়াতের অর্থ সূরা ফাতিহার সাত আয়াত, যা প্রতিদিনের নামায সমূহে বার বার আবৃত্ত হয় এবং মুমিন এটা বার বার পড়েও ক্লান্তিবোধ করে না।

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সূরা ফাতিহা অবশ্যই মক্কী সূরা। কেননা, যদি তা সূরা হিজরের পূর্বে নাযিল না হত তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা হিজরের মধ্যে (যা সর্বসম্মতিক্রমে মক্কী সূরা) সেকথা উল্লেখ করতেন না।

সাহাবা, তাবিয়ীন ও মুফাস্‌সিরীন

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস, আবু মায়সারাহ্, হাসান, কাতাদা, আবুল আলিয়া প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবী ও তাবিয়ীগণ এই অভিমতই পোষণ করতেন। হযরত আলী (রা)-এরও পরিস্কার অভিমত এই যে, সূরা ফাতিহা মক্কায়ই নাযিল হয়েছিল (আসবাবুন নুযুল ঃ ওয়াহিদীঃ পৃষ্ঠা -১২)

সাধারণভাবে সকল উলামা, মুফাস্‌সিরীন ও মুহাক্কিকীনের অভিমতও তাই। হাফিয সাইয়ূতী 'আল ইতকান'-এ লিখেছেন–

الاكثرون على انها مكية بل ورد انها اول ما نزل .

"সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত এই যে, এই সূরা মক্কী-বরং এমন বর্ণনাও আছে যে, এটাই সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিল (ইত্কানঃ পৃষ্ঠা ২৪)।"

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমদের মধ্যে ইমাম ইবনে জারীর এবং হাফিয ইবনে কাছীরের মত তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণও এই একই অভিমত পোষণ করেন। এরপর এ সম্পর্কে আর আলোচনা-পর্যালোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

মাদানী হওয়ার দলীল সমূহ

এ বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য যারা সূরা ফাতিহাকে মাদানী বলে ধারণা করেছেন, তাঁদের দলীল সমূহের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া উচিত। তাঁদের দলীল এই যে, কোন কোন সাহাবী ও তাবিয়ী সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণ একথা পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, তাঁরা সূরা ফাতিহাকে মাদানী সূরা বলেই সাব্যস্ত করেছিলেন। যেমন হাফিয ইবনে কাছীর লিখেছেন–

وقيل مدنية قاله ابوهريرة رض ومجاهد و عطاء بن يسار رض والزهرى رض ٠

"বলা হয়েছে যে, এটা (সূরা ফাতিহা) মাদানী। এটা হচ্ছে আবু হুরায়রা, মুজাহিদ, আতা বিন ইয়াসার এবং যুহ্‌রী (রা)-এর উক্তি।"

সমন্বয় সাধনের চেষ্টা

আমাদের পরবর্তী যুগের মুফাস্‌সিরগণ এই মতবিরোধ দ্বারা এতই প্রভাবিত হয়েছেন যে, তারা এই দুই উক্তির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। আর তা করতে গিয়ে তারা এই অনুমান করে নিয়েছেন যে, সূরা ফাতিহা দু'বার নাযিল হয়ে থাকবে। প্রথমবার মক্কায়, যখন নামায ফরয হয় এবং দ্বিতীয়বার মদীনায়, যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা শরীফকে কিবলা ঘোষণা করা হয়। সন্দেহ নেই যে, এটি ছিল সমন্বয় সাধনের একটি যুতসই পন্থা। আর এটাও অসম্ভব কিছু নয় যে, সূরা ফাতিহা দু'বার নাযিল হয়েছিল। কেননা, মানবীয় সৌভাগ্যের প্রথম পাঠ ছিল এটাই এবং শেষ পাঠও এটাই।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, কোন সাহাবী এবং তাবিয়ী এ সম্পর্কে পরিস্কার কিছু বলেন নি। অতএব শুধু অনুমানের উপর ভিত্তি করে আমরা কুরআনের কোন সূরা বা আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ নির্ধারণ করতে পারি না।

কেউ কেউ বলেছেন, সূরা ফাতিহা একাধারে মক্কী ও মাদানী। কেননা, এর অর্ধেক নাযিল হয়েছে মক্কায় এবং বাকি অর্ধেক নাযিল হয়েছে মদীনায়। কিন্তু এই ব্যক্তিবর্গ একথা বেমালুম ভুলে বসেছেন যে, সূরা হিজর মক্কায় নাযিল হয়েছিল এবং তাতে সূরা ফাতিহার তিন আয়াত নয় বরং সাত আয়াত নাযিলের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

আসল কথা এই যে, মতবিরোধের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য এ ধরনের জোড়াতালির কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, একটু চিন্তা করলেই একথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, মাদানী হওয়ার পক্ষে যেসব রিওয়ায়াত রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই, যার উপর ভিত্তি করে এক্ষেত্রে নতুনভাবে একটি বিতর্কের সৃষ্টি করা যেতে পারে।

মূল রিওয়ায়াত প্রসঙ্গ

এখানে সর্বাধিক লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, সাহাবা কিরাম (রা)-এর মধ্যেও কি কেউ এটাকে মাদানী বলে ঘোষণা করেছেন? এর মক্কী হওয়ার ব্যাপারে তো হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মত বিখ্যাত সাহাবীদের

উক্তি রয়েছে। অবশ্য হাফিয ইবনে কাছীর ও ইবনে আতিয়া, এর মাদানী হওয়ার ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা(রা)-এর উক্তির উল্লেখ করেছেন। এর উত্তর দু'ভাবে দেওয়া যেতে পারে।

এক ঃ কুরআনের তাফসীরের ব্যাপারে হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তির চাইতে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর উক্তিকে অধিক ওজনদার বলা যেতে পারে না। দুইঃ এটা আবু হুরায়রা (রা)-এর অভিমত কিনা তাতেও সন্দেহ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে তাবিয়ী হযরত মুজাহিদ (রা)-এর অভিমত। তিনিই এটাকে বহুলভাবে প্রচার করেন। এই মুজাহিদই হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে উল্লেখিত মর্মের একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, যা তাবারানী তাঁর 'আওসাত' শীর্ষক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। যেমন–

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اِبْلِيْسَ رَنَّ حِيْنَ اُنْزِلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَاُنْزِلَتْ بِالْمَدِيْنَةِ (اتقان ص : ٢٥)

"মুজাহিদ হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন সূরা ফাতিহা নাযিল হলো তখন শয়তান চীৎকার দিয়ে উঠল। আর তা (সূরা ফাতিহা) মদীনায় নাযিল হয়(ইতকান ঃ পৃষ্ঠা-২৫)।

কিন্তু হাফিয সাইয়ূতী ইতকানে লিখেছেন–

ويحتمل ان الجملة الاخرة مدرجة من قول مجاهد (ص : ٢٥)

"এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, শেষ বাক্যটি মুজাহিদের, কিন্তু তা রিওয়ায়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।"

অর্থাৎ প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে যে, 'শয়তান চীৎকার দিয়ে উঠল' এ পর্যন্ত হযরত আবু হুরায়রার উক্তি। 'আর তা মদীনায় নাযিল হয়'–এ অতিরিক্ত বাক্যটি মুজাহিদ কর্তৃক রিওয়ায়াতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মক্কী হওয়ার অকাট্য প্রমাণ

প্রশ্ন হতে পারে, হযরত মুজাহিদ কেন এই অভিমত পোষণ করতেন? এর উত্তর এই যে, যখন এ ব্যাপারে বিখ্যাত সাহাবীদের মাযহাব আমরা জেনে নিয়েছি, তখন মুজাহিদের মাযহাব নিয়ে মাথা ঘামানোর তো আর কোন প্রয়োজন নেই। মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারে তার ভুল হয়ে গিয়েছিল, কিংবা কোন না কোন কারণে তিনি সন্দেহে পতিত হয়েছিলেন। ওয়াহিদী, 'আসবাবুল নুযূল' গ্রন্থে মুজাহিদের অভিমত উদ্ধৃত করে লিখেছেন–

قال الحسين بن الفضل لكل عالم هفوة هذه ٠ بادرة عن مجاهد لانه تفرد سهو القول والعلماء على خلافه ومما يقطع به انها رايه ......

"হুসায়ন বিন ফযল বলেছেন, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উক্তিসমূহে একটা না একটা অসার কথাবার্তা থাকে। মুজাহিদের একথাও সে ধরনেরই এবং তার দিক থেকে এধরনের ভুল হওয়াটা বিস্ময়কর বটে।

সমগ্র উলামাবৃন্দ তার বিরুদ্ধে রয়েছেন। অভিমতটি একা তারই। সূরাটি মক্কী। আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ۔

"আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত, যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়েছি মহা কুরআন।" (১৫ ঃ ৮৭)

এই 'সাত আয়াত' অর্থ সূরা ফাতিহা। অতএব অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, সূরা ফাতিহা একটি মক্কী সূরা।

ইমাম ওয়াহিদীর এই বর্ণনা দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, শুধু মুজাহিদেরই মাযহাব এই যে, সূরা ফাতিহা একটি মাদানী সূরা। এমতাবস্থায় একথা বলা যে – এ সম্পর্কে দু'টি মাযহাব রয়েছে – মোটেই ঠিক নয়। সব সাহাবা ও উলামা এ ব্যাপারে একটি মাত্র মাযহাবের অনুসারী। আর তা এই যে, সূরা ফাতিহা হচ্ছে মক্কী সূরা। শুধুমাত্র এক ব্যক্তি অর্থাৎ মুজাহিদ এ মাযহাবের বিরোধিতা করেছেন। অবশ্য আরো কিছু কিছু ব্যক্তির নামও আমাদের সামনে আসে; তবে তারা খুব সম্ভবত: মুজাহিদের উক্তি দ্বারাই প্রভাবিত।

প্রথম ওহী

এরপর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই সামনে আসে যে, মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম সূরা কোন্‌টি?

এ ব্যাপারে উলামা কিরামের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যেমন ঃ –

১। ইমাম বুখারী 'বাদউল ওয়াহ্‌য়ী' অধ্যায়ে হযরত আয়েশা (রা) থেকে একটি বিস্তারিত রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর প্রথমবার কিভাবে ওহী নাযিল হয়েছিল, উক্ত রিওয়ায়াতে তার বর্ণনা রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্ন হতে শুরু করে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্জন বাসের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তিনি প্রায়ই হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং রাতও সেখানে কাটাতেন। এমতাবস্থায় তাঁর সামনে 'নূরে হক' (সত্যের আলো) প্রকাশিত হয়।

وجاء الملك فيه فقال اقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ .... فقال اقرأ باسم ربك الذى خلق ..... الخ

"আল্লাহ্‌র ফিরিশতা প্রকাশিত হয়ে বলেন, পড়ুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি তো পড়তে জানি না। ফিরিশতা বলেন, এভাবে পড়ুন। একথা তিনি তিন বার বললেন। শেষ বারে বলেন, 'পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" ইমাম মুসলিমও তাঁর গ্রন্থে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। শব্দের মধ্যে কিছু কিছু বিভিন্নতাসহ হাকিম, তাবারানী, বায়হাকী প্রমুখও তাঁদের গ্রন্থে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম যে সূরা নাযিল হয়েছিল; তা হচ্ছে সূরা ইকরা। আর যেহেতু ইমাম বুখারী كيف كان بدء الوحى–(কিভাবে ওহীর সূচনা হলো?) শীর্ষক অধ্যায়টি এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করেছেন, তাই একথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, ইমাম সাহেবের মাযহাবও এটাই ছিল। অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও উলামার অভিমতও তাই। বিপুল সংখ্যক তাবিয়ী এবং ইমামও এই অভিমত পোষণ করতেন। হাফিয সাইয়ূতী এ সম্পর্কে মুজাহিদ এবং যুহরীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন (ইতকান ঃ পৃষ্ঠা-৫৩)।

দ্বিতীয় উক্তি

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাছ্‌ছির নাযিল হয়েছিল। ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু সালমাহ্ বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

سالت جابر بن عبد الله اى القرآن انزل قبل؟ قال يايها المدثر قلت : او اقرأ باسم ربك ؟ قال احدثكم ماحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم انى جاورت بحرا فلما قضيت حوارى نزلت فاستبطت بطن الوادى فنوديت فنظرت امامى وخلفى وعن يمينى وعن شمالى فلم ار احدا .... ثم نوديت

فرفعتُ راسى فاذا هو على العرش فى الهوا يعنى جبريل فاخذنى رجفة فاتيت خديجة فامرتها فدثرونى نزل الله يايها المدثر قم فانذر (مسلم)

"আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ্কে জিজ্ঞাসা করলাম, কুরআনের মধ্য থেকে কোন্ জিনিসটি প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিল? তিনি বললেন, 'ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাছছির।' আমি বললাম, অথবা 'ইকরা বিসমি রাব্বিকা'। জাবির বললেন, আমি তোমাকে তাই বলছি, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেছিলেন। তিনি (সা) বলেছিলেন, আমি হেরা গুহায় অবস্থান করতে থাকলাম। যখন আমার অবস্থান কাল শেষ হল তখন আমি সেখান থেকে বের হয়ে উপত্যকা অতিক্রম করতে লাগলাম। শুনতে পেলাম, আমাকে কেউ যেন ডাকছে। আমি আমার সামনে, পিছনে এবং ডানে ও বামে তাকালাম, কিন্তু কিছুই নজরে পড়ল না --------------। এভাবে তিনবার আওয়াজ শুনলাম। তারপর আমি যখন উপরের দিকে তাকালাম তখন দেখতে পেলাম যে, সে হাওয়ার উপর একটি কেদারায় বসে আছে। অর্থাৎ জিবরীল। এটা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। আমি খাদীজার কাছে আসলাম এবং বললাম, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। সে তা-ই করল। তখনই নাযিল হলো –

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَانْذِرْ

" হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর।" (৭৪ ঃ ১-২)

তৃতীয় উক্তি

তৃতীয় উক্তি এই যে, সর্বপ্রথম بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ –(করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে) নাযিল হয়। ইমাম ওয়াহিদী এ প্রসংগে ইকরামা ও হাসানের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। আর তা হলো –

اول ما نزل من القران بسم الله الرحمن الرحيم (اسباب النزول: ٦)

সর্বপ্রথম কুরআনের যে জিনিসটি নাযিল হয়েছিল তা হলো بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে)।

চতুর্থ উক্তি

চতুর্থ উক্তি এই যে, সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহা নাযিল হয়েছিল। ইমাম ওয়াহিদী আবূ মায়সারা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ প্রথম প্রথম একটি আওয়াজ শুনতেন – কেউ যেন তাঁকে নাম ধরে ডাকত। যখন তিনি এই আওয়াজের উত্তরে 'লাব্বায়ক্' (আমি হাযির) বলেন, তখন সে (আওয়াজদাতা) বলল, قُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। (বলুন, সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য)। (আস্বাবুন নুযূল)।

এরপর ইমাম ওয়াহিদী লিখেছেন, . وهذا قول على بن ابى طالب –"এটা হচ্ছে হযরত আলী (রা) এর উক্তি।"

ইমাম বায়হাকীও 'দালায়িল' গ্রন্থে এই রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তবে একথাও লিখেছেন যে, এটা হাদীসে মুরসাল। অতএব রিওয়ায়াতকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য। কাশ্শাফ প্রণেতা লিখেছেন, অধিকাংশ মুফাস্সিরীন এই অভিমত পোষণ করেন।

واكثر المفسرين الى ان اول سورة نزلت فاتحة الكتاب .

"অধিকাংশ মুফাস্সিরীনের মতে, সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহা নাযিল হয়।"

কিন্তু হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী কাশ্শাফের বর্ণনাকে অস্বীকার করেছেন। কেননা হযরত আইশা (রা)-এর রিওয়ায়াত এর বিরুদ্ধে। তিনি লিখেছেন, অধিকাংশের অভিমত এই যে, সর্বপ্রথম 'ইকরা' নাযিল হয়েছিল।

পরবর্তী মুফাস্সিরীনের মন্তব্য ও হাদীসের বচন

এই শেষ উক্তি সম্পর্কিত একটি রিওয়ায়াত আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা তাফসীরে নিশাপুরী-প্রণেতা 'সূরা ফাতিহা' এর তাফসীরে লিখেছেন।

قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث ابى بن كعب انها من اول ما نزل من القران وانها السبع المثانى (برحاشيه طبرى ١ :٧٢)

"নিঃসন্দেহে উবাই বিন কা'বের হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, সর্বপ্রথম কুরআনের যে জিনিসটি নাযিল হয়েছিল, তা হচ্ছে সূরা ফাতিহা এবং নিঃসন্দেহে এটাই হচ্ছে 'আস্সাবৃউল মাছানী' – অর্থাৎ সাত আয়াত, যা পুনঃ পুনঃ আবৃত হয়।

কিন্তু উল্লেখিত মুফাস্সিরের এই উক্তি হাদীস সম্পর্কে তার অজ্ঞতা ও অসাবধানতারই পরিচায়ক।

এই বাক্য পাঠ করে যে কোন ব্যক্তি এটাই মনে করবে যে, হযরত উবাই বিন কা'ব কোন রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন এবং তাতে পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআনের প্রথম যে জিনিসটি নাযিল হয়েছিল, তা হচ্ছে সূরা ফাতিহা। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কোন সহীহ্ হাদীস গ্রন্থেই এমন কোন রিওয়ায়াত পাওয়া যায় না, যাতে একথা বর্ণিত হয়েছে যে,. انها اول ما نزل من القران -(কুরআনের মধ্যে এটাই প্রথম নাযিল হয়েছে)।

উবাই বিন কা'বের রিওয়ায়াত

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সূরা ফাতিহার ফযীলত সম্পর্কে উবাই বিন কা'ব থেকে বর্ণিত বিস্তারিত রিওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে, যা সহীহ্ ও মুসনাদ গ্রন্থাদিতে ঐকমত্যে বর্ণিত হয়েছে। তাতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, সূরা ফাতিহা হচ্ছে সাত আয়াত, যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয়। কিন্তু এই রিওয়ায়াতের কোথাও একথা নেই যে, সূরা ফাতিহা সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিল।

এই একটি ঘটনা থেকেও অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, পরবর্তী যুগের এই মুফাস্সিরদের বর্ণিত তাফসীর এর অবস্থা কিরূপ। এছাড়াও এ সম্পর্কে সাধারণ মুফাস্সিরদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এ বিষয়টি হাদীস শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত, তাই এ ব্যাপারে শুধুমাত্র মুফাস্সিরদের উক্তি নির্ভরযোগ্য নয়।

ওহী প্রেরণের হাকীকত

বিভিন্ন উক্তি ও রিওয়ায়াত কেন ?

এখন আমাদের উচিত এই সব রিওয়ায়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে একটি সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

সর্ব প্রথম এ প্রশ্নটি সামনে আসে যে, কুরআন মজীদে ওহীর সূচনা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী এত বেশী উক্তি ও রিওয়ায়াত কেন? এ থেকে কি এটা নির্গত হচ্ছে না যে, কুরআন নাযিলের প্রাথমিক ইতিহাস প্রামাণিত ও স্পষ্ট নয়?

কিন্তু আমাদের মতে এ ধরনের আপত্তি উত্থাপন নিছক অদূরদর্শিতা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকারই পরিচায়ক। যদিও বাহ্যত: এই সব রিওয়ায়াতের মধ্যে পরস্পর বিরাধিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু আসলে তা কোন পরস্পর বিরোধিতা নয়। বরং সব রিওয়ায়াতই একই হাকীকত প্রকাশ করছে। আর এই চারটি উক্তির মধ্যে (যা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে) কোন উক্তিই এমন নয়, যা মূলত: ভ্রান্ত। পরবর্তী যুগের আলিমদের একটি সাধারণ অভ্যাস এই যে, তাঁরা বিভিন্নমুখী রিওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা খুব কমই করে থাকেন। যদি দুটি বর্ণনার মধে সামান্য মাত্র মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় তাহলে তাঁরা সাথে সাথে বলে উঠেন, এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব ও ভিন্ন ভিন্ন উক্তি। হাদীস শাস্ত্রের মধ্যে যা অন্যান্য শাস্ত্রের চাইতে অধিকতর স্পর্শকাতর তাদের এই ভ্রান্তি প্রায়শ: নজরে পড়ে।

ওহী প্রেরণের হাকীকত

সর্বপ্রথম এ কথা বুঝা প্রয়োজন যে, এ বিষয়টিকে বুঝতে গিয়ে সাধারণত: একটি মৌলিক ভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভ্রান্তির সুরাহা না হয় ততক্ষণ হাকীকত বা সারবস্তু প্রকাশিত হতে পারে না।

একটি জিনিস হচ্ছে কুরআন মজীদের প্রথম সূরা, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর উপর নাযিল হয়েছিল। আর একটি জিনিস হচ্ছে সর্বপ্রথম ওহী, যার মাধ্যমে ওহী নাযিলের ধারা শুরু হয়েছিল। এ দুটি হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। কিন্তু অনেক লোকই এগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। এ কারণে যখন কখনো এ দুটি অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্নমুখী বর্ণনা দৃষ্টিগোচর হয় তখন তারা এই ধোঁকায় পতিত হন যে, এখানে একই হাকীকত সম্পর্কে দু'টি ভিন্নমুখী বর্ণনা রয়েছে।

বিভিন্ন স্তরে প্রকাশ

আম্বিয়া কিরামের পবিত্র জীবনে নবুওয়াতের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় রয়েছে এবং সেগুলো একটি বিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল উর্ধগতির সাথে একের পর এক প্রত্যেকটি মন্‌যিল অতিক্রম করে শেষ মন্‌যিল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। এ গুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি মুকাম এবং প্রত্যেকটি মন্‌যিলের জন্য বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ ক্রমধারা রয়েছে। আর কুরআন মজীদ দিয়েছে এসবগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

প্রথম দৃষ্টান্ত

নবুওয়াত হচ্ছে একটি বীজ, যা আম্বিয়া কিরামের হৃদয় নামক ক্ষেত্রভূমিতে গচ্ছিত রাখা হয়। সেখানে সে ভেতরে ভেতরে বর্ধিত হয় এবং বিভিন্ন প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে। শেষ পর্যন্ত সেই সময় আসে, যখন তার শক্তি পরিপূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছে এবং তার শাখা প্রশাখা সমূহ নিজেদের বর্ধন ও প্রসারের জন্য একটি প্রশস্ত জায়গা তালাশ করে। ঐ সময় তার বর্ধন শক্তির উদগীরণ ক্ষমতা উৎক্ষিপ্ত হয়ে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে। ফলে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হয় এবং বীজের গোপন শক্তি তার উদগীরিত হওয়ার একটা পথ বের করে নেয়। এরপর আসে তার আত্মপ্রকাশের সময়কাল। তখন তার প্রসারিত ডালপালা জমির উপরিভাগ ছেয়ে ফেলে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

কিংবা নবুওয়াতের মর্যাদা প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষার ও পূর্ণতা প্রাপ্তির একটি রাত থাকে যার মুহূর্তগুলো একের পর এক অতিবাহিত হয় এবং রাত দ্রুত বাড়তে থাকে, যাতে তা সমাপ্তিলগ্নে গিয়ে পৌঁছে এবঙ সেই সাথে ভোরের প্রস্ফুটন শুরু হয়ে যায়। অতএব ঘটনা এরূপ ঘটে যে, প্রথমেই সূর্য উদিত হয় না; বরং সূর্য উদিত হওয়ার নিদর্শনসমূহ প্রতিভাত হয়। আপনারা দেখে থাকবেন, প্রথমে আকাশপ্রান্তে ধীরে ধীর শুভ্রতা প্রসারিত হতে থাকে। এই শুভ্রতা যতই বাড়তে থাকে ততই অন্ধকারের আবরণ দ্রুতগতিতে ছিন্নভিন্ন হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সূর্য কিরণ প্রকাশিত হওয়ার নির্ধারিত মুহূর্ত এসে পৌঁছে এবং হঠাৎ পূর্বাকাশে উজ্জ্বল আলোকমালা ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর এই উদয়নেরও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। সূর্যের আলো ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে প্রকাশ লাভের শেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। সর্বপ্রথম একটি উজ্জ্বল অবয়ব দৃষ্টিগোচর হয়। তারপর তা উপরের দিকে উঠতে থাকে এবং তার হালাকা নম্র কিরণরাজি সুউচ্চ মীনার ও বালাখানা সমূহের ছাদের উপর পতিত হয়। তখন নীচের জমি তা থেক্রে বঞ্চিত থাকে। অত:পর কিরণরাজি অধিকতর উঁচু ও ধারালো হয় এবং ক্রমে ক্রমে সেই মুহূর্তও আসে যখন যমীনের উঁচু-নীচু সব অংশেই সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে।

পরিপূর্ণতার শেষ পর্যায়

এরপর দুপুর বেলা সূর্য তার পরিপূর্ণতার শেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। এই সময় সূর্য তাপের প্রখরতা এবং আলো বিকিরণ শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়। তখন তাপরাশি যমীনের প্রতিটি অণুপরমাণূতে গিয়ে পৌঁছে। কোন চোখ তখন সূর্য কিরণের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা রাখে না। সূর্যের আলো বিকিরণের ক্ষমতা তখন এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তখন একদিকে যেমন গুহা ও পাতালভূমির প্রকোষ্ঠসমূহ দিনের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতে থাকে অপর দিকে ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরাও কিছু কিছু আলো প্রাপ্ত হয়। ফলে তারা চলতে গিয়ে, পদস্খলন থেকে রক্ষা পায়।। অবশ্য কোন অবস্থায়ই দেখতে পায় না। তার জন্য গভীর রাতের অন্ধকার, ভোরের শুভ্রতা প্রথম প্রহরের আলো এবং দ্বিপ্রহরের প্রখরতা সবই একরূপ । পবিত্র কুরআনের ভাষায় –

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ . خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ .

"আপিন তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ্ তাদের হৃদয় ও কান মোহর করে দিয়েছেন; তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে।" (২ ঃ ৬-৭)

অতএব প্রথমে রাত হয় এবং ভোরের অপেক্ষা করা হয়। এরপর ভোরের ক্ষীণ আলো প্রকাশ পায় অর্থাৎ অন্ধকার বিদীর্ণ হয় এবং তার ভেতর থেকে আলো ঠিক্‌রে বের হতে থাকে। তারপর ফজর তথা প্রভাত হয় এবং সূর্যের কিরণ প্রকাশ পায়। অত:পর দুপুর হয় অর্থাৎ সুর্যের আলো প্রবল প্রতাপে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নুবুওয়াত প্রকাশিত হওয়ার চারটি পর্যায়

অনুরূপভাবে নুবুওয়াত সূর্য ও আল্লাহ্‌র দ্বীন পকাশিত হওয়ার পথেও চারটি পর্যায় থাকে। আল্লাহ্‌র নবীগণ এই চারটি পর্যায় অতিক্রম করেন, যার ইঙ্গিত রয়েছে সূরা শামস, সূরা দুহা, সূরা ফজর প্রভৃতিতে এবং যার হাকীকত পুরাপুরি প্রকাশ পেয়েছে হযরত আইশা (রা)-এর ঐ রিওয়ায়াত থেকে, যাতে বলা হয়েছে–

فكان لايرى رويا الاجاءت مثل فلق الصبح .

"অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে স্বপ্ন দেখতেন ভোরের আলোর ন্যায় তার সত্যতা প্রকাশিত হত (বুখারী)।"

অত:পর অপেক্ষার রাত, যার মুহূর্তগুলো একের পর এক কেটে যায়, যাতে শ্যাঘ্র শীঘ্র ভোর হয়। এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী সময়কাল। তখন যে অবস্থা হয় সেটাকে বীজের অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তারপর আসে ভোরের আলো প্রকাশের পর্যায়। তখন অপেক্ষার রাত শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সূর্য উদিত হতে কিছুটা বিলম্ব ঘটে। এই সময়কালটি হয় খুবই আজব ধরনের। এটাকে বুঝতে হলে আমাদের সঠিক ও পরিপূর্ণ চিন্তাভাবনার দরকার। শব্দের মধ্যে এ ব্যাপারে আমরা কিছুই পেতে পারি না।

নবী প্রেরণের হাকীকত

সম্ভবত: এই অবস্থার একটি হালকা ধারণা লাভ করা যেতে পারে যদি আমরা দুনিয়ার বস্তুগত বিপ্লবসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। আমরা দেখতে পাই যে, প্রথমে একটি বস্তু ক্রমে ক্রমে তৈরী হয় ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। যখন সে পরিপূর্ণভাবে তৈরী হয়ে যায় তখন তার অভ্যন্তরে একটি প্রবল উদ্‌গীরণ ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। সে তখন তার যাবতীয় আবরণ তথা প্রতিবন্ধকসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করে বেরিয়ে আসতে চায় এবং বেরিয়ে আসেও। আর এই সাথে তার পরিবর্ধিত ও প্রকাশিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময়কালের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নবুওয়াত প্রকাশিত হওয়ার সময় যখন ঘনিয়ে আসে

নবুওয়াতের পর্যায় প্রকাশিত হওয়ার সময়কাল যখন একেবারে ঘনিয়ে আসে তখন নবুওয়াতের ইলাহী শক্তি নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ছটফট শুরু করে দেয় এবং এই পর্যায়ে পৌঁছার পর আম্বিয়া কিরামের উপর একটি অজ্ঞাত ও অনুভূতিবহির্ভূত উদ্বেগ ও ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয় এবং একটি নিষ্কলুস পরিবত্রতা তাদের আত্মাকে ভরে দেয়।

প্রেমের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা

অতএব এই সময় আম্বিয়া কিরামের উপর প্রেমের ন্যায় একটি অজ্ঞাত অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা অতিবাহিত হয়। তাঁরা এক অজানা সত্যের জন্য ব্যাকুল, এক অনির্দিষ্ট জিনিস উদঘাটনের চিন্তায় ডুবে যান। তাঁদের রূহানী নবুওয়ত তখন অস্থির ও স্পন্দিত হয়ে কোন অনির্দিষ্ট সত্যকে অনুসন্ধান ও ডাকতে থাকে, তাঁদের অনুসন্ধান একেবারে প্রশ্নের আকারে হয়ে থাকে –

' হে আগমণকারী, হে উদয়োন্মুখ, তুমি কোথায়? তুমি তোমার চেহারার আবরণ হটিয়ে দিচ্ছ না কেন? আপন সৌন্দর্যের দীপ্তি দ্বারা আমার সম্মুখবর্তী অন্ধকার সমূহ দূর করছ না কেন?

যখন কিছুদিন এভাবে কেটে যায় তখন শুধু ভোরের চিহ্নসমূহ নয়, বরং স্বয়ং ভোর তার সামনে এসে হাযির হয়। এই মুহূর্তে উদ্বিগ্নতা একেবারে চরমে গিয়ে পৌঁছে এবং সেই সাথে আল্লাহর ওহীও অনাবিল শান্তি ও স্বস্তি নিয়ে নেমে আসে।

ওহীর সূচনা

অন্য কথায়, এটা হচ্ছে ওহীর সূচনার প্রথম পর্যায়। এটা হচ্ছে নবুওয়াতে দারোদ্ঘাটনের ঘোষণা। এই পর্যায়ে নবীকে সেই সব কাজের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা তিনি ভবিষ্যত জীবনে আন্‌জাম দেবেন। এটা যেন ওহীর সেই প্রথম প্রকাশ, যার উদ্দেশ্য মানুষের শিক্ষার জন্য শিক্ষক প্রেরণ নয়, বরং শিক্ষকের জ্ঞানের উৎসের দ্বারোদ্ঘাটন।

ব্যাকুলতা ও অস্থিরতার দুটি পর্যায়ই আম্বিয়া কিরাম (আ)-কে অতিক্রম করতে হয়েছে। এই ব্যাকুলতা ও অস্থিরতাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে সেই নির্জন হেরাগুহায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের কোন আওয়াজ পৌছতে পারত না। সেই পবিত্র ভয়-ভীতি ও অস্থিরতা, যা তার পবিত্র আত্মার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল– থেমে থেমে বার বার উদগীরিত হত এবং আস্তে আস্তে বাড়তে থাকত এবং শেষ পর্যন্ত এই পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল যে, তিনি কখনো বলতেন – قَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ –"আমি আমার প্রাণ সম্পর্কে শংকাবোধ করছি।" আবার কখনো তিনি পাহাড়ে আরোহণ করতেন এবং মন চাইত নিজেকে উপর থেকে নীচে ফেলে দিতো।[১]

এটাই হচ্ছে নবুয়াত পুর্ববর্তী ঘটনা, যার প্রতি ইঙ্গিতকরে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। – وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى –"তিনি আপনাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, এরপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।" (৯৩ ঃ ৭)

এরই ফলশ্রুতিতে তিনি কখনো বলতেন, دَثِّرُوْنِىْ دَثِّرُوْنِىْ –"আমাকে কাপড় আবৃত কর, আমাকে কাপড় আবৃত কর।"

আবার কখনো বলতেন, زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ –আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর।

এবার এর মূল লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। এই ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা ছিল ওহী প্রাপ্তির সেই ঐকান্তিক প্রত্যাশা, যার মাধ্যমে তিনি শান্তি ও স্বস্তির নাগাল পেতে পারেন। যখন মূসা (আ)-এর উপর এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তখন তিনি তুওয়া উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বের পবিত্র ভূমিতে একটি আলোর চমক প্রত্যক্ষ করেন এবং তার ভেতর থেকে এই আহবান আসে, "হে মূসা, তুমি যে অনির্দিষ্ট (অভাবিত) হাকীকতের সন্ধান করছ, সে-ই তোমার সন্ধান করছে।" পবিত্র কুরআনের ভাষায় –

فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى . اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى . وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى . اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ . وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ . اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى .

"এরপর যখন সে আগুনের কাছে এল তখন আহ্বান করে বলা হল, হে মূসা, আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেল। কারণ তুমি পবিত্র 'তওয়া' উপত্যকায় রয়েছো। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা ওহী প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সাথে শোনো। 'আমিই আল্লাহ্, আমা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে।" (২০ ঃ ১১-১৫)

সুতরাং যে সত্যের প্রাথমিক আওয়াজ হযরত মূসা (আ) শুনেছিলেন, তা ছিল ওহীয়ে ইলাহীর সর্বপ্রথম বহি:প্রকাশ। আর এটা এজন্য ছিল, যাতে রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং নবুওয়াতধারী ব্যক্তি তার সামনে পেয়ে যান তাঁরই জন্য প্রস্তাবিত ও নির্ধারিত কর্মসমূহ। এটা ছিল 'মুআ'ল্লিমে হক' তথা সত্যের শিক্ষকের জন্য শিক্ষাদানের সর্বপ্রথম উদ্বোধন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির ঘটনা

হযরত মূসা (আ) কর্তৃক প্রাপ্ত এই সত্যের আওয়াজের অনুরূপ সেই নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বকালীন ঘটনাও, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হেরা গুহায় নির্জনে অবস্থানকালীন সময়ে ঘটেছিল। যেভাবে সময়ের পরিপক্কতা আসার কারণে ওখানে হযরত মূসা (আ)-এর রূহানী জগতে এক অস্থিরতা তথা বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল, সেভাবে এখানেও সময় ঘনিয়ে আসার কারণে একটি পবিত্র অস্থিরতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে দেখা দেয়। ফলে তিনি জনবসতি ছেড়ে দিয়ে এবং যাবতীয় পার্থিব সম্পর্ক থেকে আলাদ হয়ে একটি পাহাড়ের গুহায় আপন রূহানিয়াতের ঘর তৈরী করেন। এরপর ওখানে যেমন মূসা (আ)-এর সামনে আলোক মালার ভেতর থেকে আওয়াজ উঠেছিল, এখানেও তেমনি খোদ জিবরীল (আ) প্রকাশিত হয়ে ওহীর সর্বপ্রথম পর্যায়ের শিক্ষাদান কার্য শুরু করেন। ওখানে ছিল শুধুমাত্র আওয়াজ এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বিহ:প্রকাশ; কেননা মূসা (আ) এইটুকুই বহন করার সামর্থ্য রাখতেন। আর এখানে আওয়াজ ও আলো প্রকাশের স্থলে খোদ জিবরীল (আ)-এর আত্মপ্রকাশ। আর এটাই ছিল মুহাম্মদী মরতবার জন্য মানানসই। একজন ফারসী কবি কী সুন্দরই না বলেছেন।

হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র গুণাবলীর এক ঝলকে
একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন,
কিন্তু [হে মুহাম্মদ (সা)] আপনি হাসিমুখে
অবলোকন করলেন
অবিকল আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাকে ॥

পবিত্র কুরআনের ভাষায় –

عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى . ذُوْمِرَّةٍ ط فَاسْتَوٰى . وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى . ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى
. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى .

"তাকে শিক্ষাদান করে শক্তিশালী (জিবরীল), প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে, সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী; ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম।" – (৫৩ ঃ ৫-৯)

ওখানে ওহীর প্রথম সম্বোধন ছিল – اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى

অর্থাৎ আমি তোমাকে সত্যের দাওয়াত প্রদান এবং হুক্‌মে ইলাহীর প্রচারের জন্য মনোনীত করেছি। অতএব তুমি আমার পয়গাম ও হুকুমসমূহ শোনো, যাতে বিশ্ববাসীর কাছে তা পৌঁছাতে পার।

আর এখানে সম্বোধনের সূচনা এভাবে হলো যে, 'মালা-ই-আলা' এর সর্ববৃহৎ ফিরিশতা প্রকাশিত হয়ে বললেন – اِقْرَءْ[১] – পাঠ করুন। অত:পর ভয় প্রদর্শন তথা সতর্কবাণী প্রচারের হুকুম এল এবং তাকে সম্বোধন করে বলা হলো– قُمْ فَاَنْذِرْ . –"উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন।" (৭৪ঃ ২)

অর্থাৎ আপনি বস্ত্র আচ্ছাদিত হয়ে শুয়ে আছেন অথচ সমগ্র বিশ্ব মানবতা আপনার দর্শন লাভের জন্য ছটফট করছে। এবার উঠুন, অপেক্ষার দিন শেষ হয়ে গেছে। এবার সতর্কবাণী প্রচার করুন। কেননা সতর্কবাণী প্রচারের সময় এসে গেছে।

টীকা ঃ ১। ওহীর সুচনা হওয়ার পর যখন তা কিছুদিনের জন্য হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এই অবস্থা হয়েছিল।

ওহীর সূচনা ও আল্লাহ্‌র আদেশ-নির্দেশ প্রাপ্তি

ওহী প্রেরণ ও সূরা নাযিল

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আপনাদের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে থাকবে যে, যখন আম্বিয়া কিরামের উপর ওহী নাযিল হওয়ার ধারা শুরু হয় তখন তাঁদের সামনে ওহী উম্মোচনের ও আল্লাহ্‌র সম্বোধন শুরু হওয়ার পর্যায় প্রকাশিত হয়। এটা যেন নবুয়তের অস্তিত্ব সম্পর্কে শিক্ষা লাভের প্রথম পর্যায়। এরপর যখন আবরণ উন্মোচিত হয় এবং নুবুয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্বদ্ধ ওহীর জগতের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন এই ধারা সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং তাঁর কাছে সতর্কবাণী প্রচারের এবং কাওম ও জাতিকে শিক্ষা প্রদানের নির্দেশ এসে পৌছে। তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চান এই ধারা অব্যাহত রাখেন।

আপনাদের কাছে এ কথাটিও পরিষ্কার হয়ে থাকবে যে, ওহী এবং আল্লাহ্‌র সম্বোধন শুরু হওয়াটা এক বস্তু, আর আল্লাহ্‌র আদেশ নির্দেশ ও আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী নাযিল ও বিন্যাসিত হওয়া অন্য বস্তু। এ দু'টি বস্তুকে একত্রে মিলিয়ে দেওয়া উচিত হবে না ।

প্রথম ওহী

এবার আমরা কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়ার আলোচনার দিকে অগ্রসর হচ্ছি । সমগ্র রিওয়ায়াত এবং দলিলসমুহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে একথাই জানা যায় যে, সর্বপ্রথম ওহী ও সর্ব প্রথম এলাহী সম্বোধন ছিল 'ইকরা' বা পাঠ করুন। অর্থাৎ আল্লাহ্ দির্দেশ দিলেন , আল্লাহ্‌র ওহী পড়তে শুরু করুন। যখন তিনি (সা) এটা করলেন তখন সত্য প্রচারের হুকুম এলো قُمْ فَأَنْذِرْ অর্থাৎ উঠুন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌছিয়ে দিন। যখন তিনি উঠলেন তখন সর্ব প্রথম কুরআনের যে সূরা তাঁর উপর অবতীর্ণ হলো তা ছিল ওহীয়ে এলাহীর সার কথা, দ্বীনে এলাহীর হাকীকত ও ভিত্তি এবং সেই সূরা , যে সূরা ব্যতীত ইসলামের দাওয়াত ও উম্মতে মুসলিমার শিক্ষা সম্পন্ন হতেই পারে না । আর সে সূরাটি হচ্ছে সূরায়ে ফাতিহা বা কুরআনের প্রথম সূরা। এই সূরা দিয়ে নযুলে কুরআন ও তালিমে উম্মত (উম্মতের শিক্ষা) শুরু হয়েছে। এবং শুরু হয়েছে আল-কিতাব তথা কুরআনের বিন্যাস।

এ প্রসংগে বলা যায় যে, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন) এটা হচ্ছে সেই প্রাথমিক আওয়াজের স্থলবর্তী, যা ওয়াদিয়ে আয়মনে মূসাকে বলা হয়েছিল اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى (আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা ওহী প্রেরণ করা হয়েছে, তুমি তা মনোযোগের সাথে শোনো ।)

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ (হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, উঠুন সতর্কবাণী প্রচার করুন) এটাই হচ্ছে সেই নির্দেশেরই মত, যা হযরত মূসা (আ)-কে দেওয়া হয়েছিল এই বলে যে, اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى- "ফিরআওনের নিকট যাও , সে সীমালংঘন করেছে।" (২০:২৪)

হযরত মূসা (আ) এর দাওয়াত বনী ইসরাইলের প্ররিত্রাণ এবং ফিরআউনের মুকাবালার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এ কারণেই ভয় প্রদর্শনের দির্দেশে বিশেষভাবে ফিরআওনের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর দাওয়াত সমগ্র বিশ্বভূমন্ডল ও সমগ্র মানব জাতির নাজাত এবং বিশ্বের সমগ্র ফিরআউন ও নমরুদের জন্য ছিল । এজন্য সতর্কবাণী প্রচারের নির্দেশে কোন বিশেষ জাতি ও বিশেষ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি, বরং সাধারণ ভাবে সার্বজনীন ক্ষেত্রে বলা হয়েছে- قُمْ فَانْذِرْ "উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন।"

'ইকরা' প্রসঙ্গ

'ইকরা'(পড়) নাযিল হওয়াটা কোন সূরার নাযিল হওয়া নয়, বরং ওহী নাযিলের সূচনা মাত্র। এর পিছনে অনেক যুক্তি রয়েছে। এ প্রসংগে হযরত আয়শা (রা)-এর নিম্নের রিওয়ায়াতটির উপর চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। বুখারীতে হযরত আঈশা (রা)-এর এ সম্পর্কিত যে উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে 'তা হলো , হযরত জিবরীল তার প্রথম দিকের প্রকাশ কালীন সময়ে তিনবার শুধু ইক্‌রা বলেন এবং শেষবার مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত সূরা আলাকের প্রথম চারটি আয়াত তিলাওয়াত করেন।

অতঃপর চিন্তাভাবনা করা উচিত যে, প্রথমে অবতীর্ণ এ চারটি আয়াতের অর্থ কি ?

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ . الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

"পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে , যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে । পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।"-(৯৬ঃ১-৫)

এখানে শুধু রাসুলুল্লাহ্ (সা) কে সম্বোধন করে পাঠ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার ঐ দান এবং হিকমত ও তালীমের দিকে তার দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়েছে- যা একজন উম্মী দ্বারা, সমগ্র বিশ্বমানবতার কাজ সম্পাদন করিয়ে নিতে পারে। পরবর্তী সময়ে ঐ সব আয়াত একটি সূরার প্রথম অংশ বলে ঘোষিত হয়, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য ছিল ওহীয়ে এলাইহীর উদ্বোধন করা। আর এ কারণেই এতে ওহী পাঠ করার,শিক্ষা ও শিক্ষণের দরজা উম্মুক্ত করার এবং সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

এটা ছিল প্রথম পর্যায়,যা রসুলুল্লাহ্ (সা) এর সামনে এসেছিল । যখন তিনি পাঠ করলেন এবং তাঁর সাথে ওহীর ধারা প্রতিষ্ঠিত হল তখন তাবলীগ ও রিসালাতের পর্যায় সামনে এল। দ্বিতীয় হুকুম এল, এবার কাজ শুরু করে দিন। অর্থাৎ উঠুন ও সতর্কবাণী প্রচার করুন। এটাও কোন সূরা নাযিল হওয়া ছিল না; বরং ছিল শুধু মাত্র ওহী উদ্বোধনের পর কাজ শুরু করে দেওয়ার হুকুম। এ বিষয়টি হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রা) এর রিওয়ায়াতে, যার শেষ টুকরাটি ইমাম বুখারী كيف كان بدء الوحى (কিভাবে ওহীর সুচনা হলো) অধ্যায়ে গ্রহণ করেছেন - পরিস্কার ভাবে বর্ণিত আছে।

فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اِلٰى قَوْلِهٖ فَاهْجُرْ .

আমি খাদীজা (রা)-কে বললাম , আমাকে কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত কর, আমাকে কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত কর। এর উপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন-

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَانْذِرْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ . وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ . وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পরিচ্ছদ প্রবিত্র রাখুন, অপবিত্রতা হতে দূরে থাকুন।-(৭৪:১-৫)

অর্থাৎ শুধুমাত্র সুরা মাদ্দাছ্ছিরের এই প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হল।

একথা পরিস্কার যে, এই সব আয়াতের মধ্যেও শুধুমাত্র সতর্ককরণ ও তাবলীগের কথা আছে, যা ছিল ওহীর সূচনা পরবর্তী দ্বিতীয় পর্যায়। এ সব হুকুম স্বয়ং প্রচার করছে যে, তাবলীগী কাজ এখনো শুরু হয়নি। বরং একাজ করার জন্য নবীকে তৈরী করা হচ্ছে।পূর্ববর্তী আলিমগণের মধ্যেও কেউ কেউ এ হাকীকতটি ব্যাখা করেছেন। হযরত জাবির এবং হযরত আয়েশা (রা) এর রিওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জসা বিধান করতে গিয়ে হাফিয সাইয়ূতী লিখেছেন-

وعبّر بعضهم عنْ هذا بقوله اول مانزل للنبوة اقرأ واول مانزل للرسالة يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ .

"এবং কেউ কেউ এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, সর্বপ্রথম যে জিনিসটি নুবুওয়াতের জন্য নাযিল হয় তা ছিল ইকরা। আর সর্বপ্রথম যে জিনিসটি রিসালাতের জন্য নাযিল হয় তা ছিল 'ইয়া আইয়ূহাল মুদ্দাছ্ছির।"

অধিকতর পরিস্কার অভিমত

আর এর চাইতেও অধিকতর পরিস্কার অভিমত সেটি , যা কোন মুহাক্কিক ও বিজ্ঞজনের বরাতে আবূ উমামা বিন নাক্কাশ বর্ণনা করেছেন এবং 'মাওয়াহিব লাদুনিয়া' গন্থে কাসতালানীও এটাকে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন-

كان فى نزول "اقرأ" لنبوته وفى نزول "مدثر" لارساله بالنذارة والبشارة وهذا قطعا متاخر عن الاول لانه لما كانت سورة اقرأ متضمنة لذكر اطوار الادمى من الخلق والتعليم والافهام ناسب ان تكون اول سورة انزلت وهذا هو الترتيب طبعى وهو ان يذكر سبحانه اسداه . الى نبيه من العلم والفهم والحكمة والنبوة ...... ثم يامر بان يقوم فينذر عباده .

"ইকরা অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে মাকামে নুবুওয়াত অর্জন এবং মুদ্দাছ্ছির অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে রিসালাত তথা সতর্কবাণী প্রচার এবং সুসংবাদ দানের কথা রয়েছে। 'ইকরা'এর পরই এর অবতীর্ণ হওয়াটা যুক্তিযুক্ত ছিল। কেননা, 'ইকরা' এর মধ্যে মানব সৃষ্টির দুটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যে গুলোর সম্পর্ক রয়েছে, সৃজন, শিক্ষা , সৎপথ প্রদর্শন ও বুদ্ধি-বিবেকের উৎকর্ষ লাভের সাথে। অতএব প্রয়োজন ছিল প্রথমে এই সব আয়াতের তারপর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক আদেশ নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার। ওহী নাযিলের এটি একটি স্বাভাবিক ধারা যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম ইলম্ ও হিকমত ও নুবুয়তের ঐ সব মাকামের উল্লেখ করেন, যার জন্য তিনি কোন ব্যক্তিকে নুবুয়তের জন্য নির্বাচন করেছেন। এরপর তিনি ঐ বস্তু সম্পর্কে অবহিত করেন, যার জন্য এ সমস্ত মর্যাদা তার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

যে সব মহান ব্যক্তি উপরোক্ত উক্তি করেছেন, নিশ্চিত ভাবে তাঁদের এই লক্ষ্যই ছিল যে, ওহীর সূচনা ও নাযিল হওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে দুটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম প্রর্যায় এই যে, নুবুওয়াতের অস্তিত্বকে 'ওহীয়ে ইলাহী' এর দিকে

সম্বোধন করা হবে এবং তার দ্বারা ওহীর আওতা নির্ধারিত করা হবে। এর নাম তারা রেখেছে নুবুয়াত। দ্বিতীয় পর্যায় এই যে, যখন সম্পর্ক নির্ধারিত হয়ে যাবে তখন কাজ শুরু করার রির্দেশ দেওয়া হবে। এটা হচ্ছে রিসালাত অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রচার তথা মানুষের কাছে আল্লাহর হুকুম আহাকাম পৌছে দেওয়া।

প্রথম শিক্ষাদান

কিন্তু এখন পর্যন্ত আসল কাজ শুরু করা হয়নি। আসল কাজটি কি? আসল কাজটি হলো সতর্কবাণী প্রচার ও সুসংবাদ প্রদান। অর্থাৎ মানুষকে পাপকর্মের ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া এবং পুণ্যকর্ম ও সত্য গ্রহণের প্রতিদান সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদান করা। সেই সাথে একটি পুণ্যকামী উম্মতকে নুবুওয়াতের তালীম (শিক্ষাদান)ও তাযকিয়া (পবিত্রকরণ) এর মাধ্যমে তৈরী করা এবং আল্লাহ্র ওহীর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষা দেওয়া। যখন মু'আল্লিম (শিক্ষাদাতা)-এর অস্তিত্ব স্বয়ং তা'লীম অর্জন করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল; যেমন ঃ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ (তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না)-এর মধ্যে বলা হয়েছে, এরপর যখন তিনি এ নির্দেশও পেয়ে গেলেন যে,আপনি পড়াবার জন্য তৈরী হয়ে গেছেন, এবার কাজ শুরু করে দিন, যেমন قُمْ فَأَنْذِرْ (উঠুন এবং সতর্কবাণী প্রচার করুন) এর মধ্যে বলা হয়েছে– তখন তিনি একদিকে সতর্কবাণী প্রচার এবং সুসংবাদ দানের কাজ করলেন এবং অন্যদিকে উম্মতে মুসলিমাকে পড়াবার এবং কিতাব ও হিকমাত দ্বারা শিক্ষা প্রদানের কাজ শুরু করে দিলেন। অতএব যখন তা হয়ে গেল তখন সর্বপ্রথম পাঠ ও সর্বপ্রথম শিক্ষা যা প্রদান করা হল, তা ছিল 'সূরা ফাতিহা'- এর শিক্ষা।

রিওয়ায়াত সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য

এটা হচ্ছে হাকীকতের প্রকাশ ও ওহী অবতীর্ণ হওয়ার ধারা, যা জানার পর এ সম্পর্কিত যাবতীয় রিওয়ায়াতের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় এবং কোনরূপ মত-পার্থক্য আর নজরে পড়ে না।

১। ইমাম বুখারীর রিওয়ায়াত كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ (ওহীর সূচনা কিভাবে হয়েছিল) এ ক্ষেত্রে সব চাইতে নির্ভরযোগ্য। হাদীস শাস্ত্রের প্রায় সব ইমামই এটাকে গ্রহণ করেছেন। এটা সম্পূর্ণ সহীহ হাদীস। এর মধ্যে শুধুমাত্র ওহীর সূচনা' তথা ওহীর ভোর বেলার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে ওহীর সম্বোধনের প্রারম্ভিকা। আর যেসব সাহাবী থেকে اِقْرَأْ সর্বপ্রথম নাযিল হওয়ার কথা বর্ণিত আছে, তাঁদের সবাই প্রথম ওহী নাযিলের ভিত্তিতে ইকরাকে সর্বপ্রথম বস্তু বলে সাব্যস্ত করেছেন।

'মুদ্দাছ্ছির' এর মাকাম

২। দ্বিতীয় রিওয়ায়াত হচ্ছে মুদ্দাছ্ছির সম্পর্কে। পরবর্তী উলামাবৃন্দের কেউ কেউ এটাকে অপর একটা মাযহাব বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের উক্তি ও হযরত আঈশা (রা)-এর রিওয়ায়াতের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। আবদুর রহমান বিন মাসলামা হযরত জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, সর্বপ্রথম কোন্ জিনিসটি নাযিল হয়েছে? তিনি উত্তরে বলেন, মুদ্দাছ্ছির। কিন্তু প্রশ্নকারী ইতিপূর্বে শুনেছিলেন যে, 'ইকরা'-ই ছিল প্রথম সম্বোধন। তাই তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, ইকরা, না মুদ্দাছ্ছির? হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি তাই বলছি, যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে শুনেছি। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণীটি উদ্ধৃত করেন। আর তা হলো, আমি হযরত জিবরীলকে শূন্যের মধ্যে দেখলাম এবং ঘরে গিয়ে খাদীজাকে বললাম, আমাকে চাদর আবৃত কর। এর উপর এই আয়াতটি নাযিল হয়— يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . –"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!" (৭৪ ঃ ১)

একথা সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু এর মধ্যে শুধুমাত্র সূচনার ঐ কথাটি রয়ে গেছে যে, হযরত জিবরীলের সর্বপ্রথম দর্শনকালে 'ইকরা' হুকুম নাযিল হয়। তারপর দ্বিতীয় দর্শনকালে নাযিল হয় 'ইয়া আইয়ূহাল মুদ্দাছ্ছির।' এই রিওয়ায়াতের মধ্যেই আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যখন আমি ঊর্ধ দিকে তাকালাম তখন দেখলাম সে-ই (জিবরীল) সেখানে বিদ্যমান। 'সেই' শব্দের ইঙ্গিত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, এই দর্শন প্রথম ছিল না। যদি প্রথম হত তাহলে এ ধরনের ইঙ্গিত দ্বারা কথা বলা হত না।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ঘটনাবলীর ক্রমধারাকে সামনে রাখলে পর এ দু'টি রিওয়ায়াতের মধ্যে কোন বৈপরিত্য থাকে না। সর্বপ্রথম যখন আল্লাহ্‌র ফিরিশতা প্রকাশিত হলেন তখন তিনি বললেন, 'ইকরা' অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেরা গুহায় ই'তিকাফ অব্যাহত রাখেন। কিছুদিন পর তিনি যখন পুনরায় দেখেন যে, ঐ ফিরিশতা শূন্যে বিরাজমান তখন তাঁর মধ্যে পুনরায় ভীতির সঞ্চার হল এবং তিনি সংগে সংগে ঘরে চলে যান এবং খাদীজাকে বলেন, دَثِّرُوْنِىْ دَثِّرُوْنِىْ (আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর,আমাকে চাদর আবৃত কর)।

তখন নাযিল হয়- يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . . -"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!" (৭৪ ঃ ১)

আমরা যে রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করলাম তা সহীহ্ মুসলিমের 'বাদউল' ওহী অধ্যায়ে রয়েছে। কিন্তু ইমাম বুখারী এই রিওয়ায়াতটি 'কাইফা কানা বাদ্‌উল ওহী' অধ্যায়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর রিওয়াতের প্রর উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনি এই ক্রমানুবর্তিতা দ্বারা এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, প্রথম ঘটনা হচ্ছে 'ইকরা'-এর এবং দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে 'মুদ্দাছ্ছির'-এর। অতএব এর দ্বারা সব মতবিরোধের অবসান হয়ে গেল।

জাবির (রা)-এর উক্তির ব্যাখ্যা

এবার যে প্রশ্নটি বাকি থাকলো তা হলো, জাবির (রা) কেন বললেন যে, মুদ্দাছ্ছির প্রথমে নাযিল হয়েছিল? এ প্রসংগে বলা যায় যে, সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টির উপর আলোচনা করেছেন। হাফিয সাইয়ূতী এর সামঞ্জস্য বিধানের পাঁচটি পন্থা উদ্ধৃত করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার লিখেছেন, হযরত জাবির (রা) প্রথম নাযিল হওয়ার যে কথাটি বলেছেন এর উদ্দেশ্যে এই ছিল যে, 'ইকরা' নাযিল হওয়ার অর্থ হচ্ছে ওহীর উদ্বোধন। এটা কোন কারণের উপর ভিত্তি করে নাযিল হয়নি। কিন্তু সূরা মুদ্দাছ্ছির নাযিল হয়েছিল একটি কারণের উপর ভিত্তি করে। আর সে কারণটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভয়প্রাপ্তি। এই সামঞ্জস্য বিধানের পন্থাটি আমাদের বর্ণনার পক্ষে একটি অতিরিক্ত সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হবে। কেননা, আমাদের মতেও 'ইকরা' এর অবতীর্ণ হওয়াটা ওহীর উদ্বোধন ও স্বয়ং শিক্ষককে শিক্ষা দান। এতদসত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ উত্তর হচ্ছে সেটি, যেটি হাফিয সাইয়ূতীও মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর সূচনাকালের ঘটনাদি বর্ণনা করতে গিয়ে সেই টুকরাটিও যুক্ত করেন, যা ওহীর সূচনা হওয়ার পর তার দ্বিতীয় নুযূল। হযরত যাবির ধারণা করেন যে, এর মাধ্যমেই ওহী নাযিল হওয়ার ধারা শুরু হয়ে থাকবে। অতএব এটা তাঁর রিওয়ায়াতের অংশ নয়; বরং তাঁর একটা ইজতিহাদ। তাঁর রিওয়ায়াতকে হযরত আয়েশা (রা)-এর রিওয়ায়াতের পিছনে রেখে আমরা এখানে একটা সঠিক বিন্যাস সাধন করতে পারি।

'বিসমিল্লাহ্'এর ব্যাপার

৩। অত:পর আসে ঐ সব রিওয়ায়াত, যেগুলো দ্বারা জানা যায় যে, কোন কোন বিখ্যাত তাবিয়ী, যেমন হাসান ও ইকরামার উক্তি এই যে, সর্বপ্রথম 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' নাযিল হয়েছিল। এটাও একদম ঠিক এবং মূল লক্ষ্যের সহায়ক। সবচেয়ে প্রথম যে সূরা নাযিল হয়েছিল এবং সর্বপ্রথম শিক্ষা, যা ওহীয়ে ইলাহী মানুষকে দিয়েছিল

তা ছিল সূরা ফাতিহা। আর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' (পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে) হচ্ছে সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত। অতএব তাবিয়ীদের উক্তির সারকথা এই যে, সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহা নাযিল হয়। কেননা, এর প্রথম আয়াত হচ্ছে বিসমিল্লাহ্। তাদের এই উক্তিকে কোন পৃথক মাযহাব আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়।

প্রথম সূরা

এরপর চতুর্থ উক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। আর তা এই যে, সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহা নাযিল হয়েছিল। আমি ইতিপূর্বে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছি তা দ্বারা উল্লেখিত তিনটি রিওয়ায়াত এবং এই উক্তির মধ্যে কোন মত পার্থক্য বাকি থাকে না। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ওহীর উদ্বোধন এবং সতর্কীকরণ ও শিক্ষাদান সম্পর্কিত নির্দেশের পর সর্বপ্রথম যে সূরাটি নাযিল হয়নি বা হতে পারে না, তা হচ্ছে 'ফাতিহাতুল কিতাব' বা সূরা ফাতিহা। এটাই হচ্ছে হযরত আলী (রা)-এর অভিমত। (অসমাপ্ত)

'মুকাদ্দামা-ই-তাফসীর' এর যে ফর্মাটি পুলিশের হস্তক্ষেপ থেকে কোন না কোনভাবে রক্ষা পেয়েছিল, তা এখানেই শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে কি কি বিষয়ের আলোচনা ছিল, তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কিন্তু সূরা ফাতিহার নুযূল এবং রিওয়ায়াতের সূচনার অবস্থাদি সম্পর্কে মরহুম মাওলানা সাহেব যা কিছু বলেছেন, তার কোন দৃষ্টান্ত খুব সম্ভবত: অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হবে না।

অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

মাওলানা 'তরজামানুল কুরআন'এর প্রথম খন্ডের উপর দ্বিতীয়বার চোখ বুলাতে গিয়ে এক জায়গায় যে টীকা লিখেছেন তার সাথে এ বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে বিধায় তাও এখানে সংযোজিত হলো।

লক্ষ্য করুন–

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ওহীর সূচনাকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)- যে সব অবস্থাদির সম্মুখীন হয়েছেন– মোটামুটিভাবে সেসব অবস্থার একটি এই যে, ওহীর সূচনা হওয়ার পর কিছু কালের জন্য যখন তা বন্ধ হয়ে গেল তখন তাঁর অস্থিরতা চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো এবং কয়েকবারই এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, দারুণ মনোবেদনা ও অস্বস্তির কারণে তিনি নিজেকে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ফেলে দিতে মনস্থ করলেন।

যারা মাকামে নুবুওয়াতের এই সব ঘটনা ও অবস্থাদির হাকীকতের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যার ব্যাখ্যা আমি উপরে দিয়েছি-তারা সহীহ্-হাদীসমূহে এ ধরণের বর্ণনা দেখে শংকিত হয়ে উঠেন এবং বলেন, একজন নবী থেকে এধরনের দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া একটি অচিন্তনীয় ব্যাপার। তাই ওহীর সূচনা সম্পর্কিত এই সব রেওয়ায়াতকে–'মাওকূফ' করে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করাই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, উপরে বর্ণিত 'দুর্বলতা' কোন দুর্বলতা নয়; বরং বিরাট নবভী শক্তির এমনি প্রকাশ্য চিহ্ন ও সত্যিকার নিদর্শন যে, এগুলো থেকে সুস্থির বুদ্ধি সম্পন্নরা দলীল প্রমাণ লাভ করে এবং এগুলোর ভেতরে হক ও সত্যবাদী দৃষ্টির জন্য, সততার এমন উজ্জ্বল আলো রয়েছে, যা অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। এটা এমন কোন দৈহিক বা মানবিক অস্থিরতা নয়, যা একজন নবীর জন্য শোভা পায় না–বরং তা হচ্ছে আত্মার সেই পবিত্র ও ফিরিশতাসুলভ অস্থিরতা, যা বিদ্যমান না থাকলে একজন নবীর, নবী হওয়ার কোন দলীলই বাকী থকে না। যদিও এই হাকীকত অধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী, তবু আশা এই যে, ইশারা-ইঙ্গিতে যা বলা হয়েছে তা মূল উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য যথেষ্ট হবে।

অত:পর একটি কথা জেনে রাখা ভাল যে, বুখারীর এই রিওয়ায়াত এই পরিমাণ বিখ্যাত ও গ্রহণীয় হয়েছে এবং সর্ব স্তরের মুসলমানরা এটাকে এমনভাবে সত্য ও নির্ভরযোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন যে. ইমাম বুখারীর অস্তিত্বকে কেউ অস্বীকার করলেও করতে পারে, কিন্তু এই রিওয়ায়াতকে অস্বীকার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এবার থাকল রিওয়ায়াতকে মাওকূফ ঘোষণা করার বিষয়টি। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, এ বিষয়টিকে আমরা মাওকূফ বলে স্বীকার করে নিতে পারি না।

কেননা, অর্থের দিক দিয়ে এর 'মারফূ' হওয়ার চিহ্নাদি বিদ্যমান রয়েছে, অথচ হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যক্তিগত ইজতিহাদ এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কোন চিহ্নই বিদ্যমান নেই। রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এত নৈকট্য ও সম্পৃক্ততা থাকা সত্ত্বেও হযরত আয়েশা (রা) যদি ওহীর সূচনার মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির কথা ঠিকমত সংরক্ষণ করতে না পারেন তাহলে তো বিশ্বে সাক্ষ্যদানের ব্যাপারটি চিরতরে লোপ পেয়ে যাওয়ারই কথা।

মজার ব্যাপার এই যে, এই সন্দেহ নতুনভাবে নয় বরং পূর্বেও করা হয়েছে। আর মানুষের অধিকাংশ সন্দেহ সংশয়ই নতুন হয় না। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী এই রিওয়ায়াতের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিস ইসমাঈলীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন, মুহাদ্দিসদের পর অভিযোগ উত্থাপনকারী কোন কোন ব্যক্তি বলেন–

كيف يجوز لنبى ان يرتاب فى نبوته حتى يرجع الى ورقة .... حتى يوتى بذروة جبل ليطلق منها نفسه..

"নবীর জন্য এটা কেমন করে বৈধ হতে পারে যে, তিনি আপন নুবুওয়াতের বাপারে সংশয়ের মধ্যে পতিত হবেন– এমনকি বিষয়টির মীমাংসার জন্য ওরাকা বিন নওফলের কাছে ধর্ণা দেবেন কিংবা পাহাড়ের উপর উঠে নিজেকে নীচে ফেলে দিতে মনস্থ করবেন..........?

এরপর এই মুহাদ্দিস এই অভিযোগের উত্তরও দিয়েছেন, কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তার উত্তর সন্তোষজনক নয়। এই ঘটনার হাকীকত তা-ই, যা আমরা উপরে লিখে এসেছি। এই পবিত্র ঘটনারাজি দ্বারা নুবুওয়াতের মাকাম এবং নবীর সত্তার সত্যায়ন হয় অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে। ব্যাপারটি মোটেই এরূপ নয় যে, এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার ফলশ্রুতি কিংবা শুধুমাত্র মানব-স্বভার-সুলভ দুর্বলতা-যেমন বুখারীর ভাষ্যকারগণ, কাসতালানী এবং আরো কিছু সংখ্যক বিজ্ঞজন বলেছেন।

ইসলামের দা'ওয়াত

উপক্রমণিকা

মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদের লেখার মধ্যে 'দা'ওয়াতে হক' (সত্যের প্রতি আহবান)-এর কোন বিন্যস্ত রূপ ছিল না, যা উঠিয়ে কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যদিও তাঁর সারা জীবনের কর্মচাঞ্চল্য ও সংগ্রামী তৎপরতা দাওয়াতে হককে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছিলো। অতএব 'দাওয়াতে হক' সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়ই কিছু লিখে থাকবেন। কেননা, ইসলাম সম্পর্কে এত কিছু লিখা সত্ত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাব ও তাঁর নুবুওয়াতের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই লিখেন নি, একথা বিশ্বাস করা যেতে পারে না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল 'দাওয়াতে হক' তথা সত্যের প্রতি আহবান। যাহোক আমরা মাওলানার এ সম্পর্কিত বিচ্ছিন্ন ও অবিন্যস্ত লেখাগুলো এখানে পেশ করছি। আশা করি, যে সব ব্যক্তিবর্গ এগুলো পাঠ করবেন তারা 'সরল দ্বীন' ইসলামের হাকীকত ও বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে কিছু চিন্তাভাবনার সুযোগ পাবেন এবং এ থেকে নিশ্চয়ই কোন না কোনভাবে উপকৃত হবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দা'ওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকুক–চাই তা সম্পর্কিত হোক আকীদা-বিশ্বাসের সাথে অথবা রসম-রেওয়াজের সাথে অথবা আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের সাথে- এবং সৎকর্ম সমূহ অর্থাৎ খাঁটি আকীদা-বিশ্বাস, খাঁটি আচার-আচরণ এবং খাঁটি কর্মধারা গ্রহণ করুক। কিন্তু এ প্রসংগে এমন কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনাও জরুরী ছিল, যে গুলোর মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের ভিত্তি এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা সৃষ্টি হতে পারে।

আমি মাওলানার কয়েক হাজার পৃষ্ঠা থেকে আবশ্যকীয় খন্ডাংশ সংকলিত করে নিজের পছন্দমত এখানে তা সাজিয়ে দিয়েছি। আমার এ প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য পূরণে অন্তত: কিছুটা যে সহায়ক হবে, তাতে আমি নিঃসন্দেহ।

প্রসঙ্গত: একটি কথা নিবদেন করতে চাই যে, ঐসব টুকরা কথার মধ্যে যেখানে যেখানে আমার বিন্যাস ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনে কিছু কিছু শব্দ যোগ করেছি, সেখানে তা বন্ধনীর মাধ্যমেই করেছি; যাতে করে মাওলানার কথাগুলোর বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা বহাল থাকে। কোন কোন জায়গায় মাওলানার বিস্তারিত বর্ণনা থেকে আমি কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়েছি, আবার কোথাও কোথাও অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার কারণে তার কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত বর্ণনাকে একত্র করে দিয়েছি। তবে মাওলানার শব্দ বা বাক্যের মধ্যে কোন পরিবর্তন করি নি। মাওলানার প্রত্যেকটি বিক্ষিপ্ত বর্ণনার হাওয়ালা (রেফারেন্স) দেওয়া কঠিন ছিল না, তবে এক বা একাধিক বিক্ষিপ্ত বাক্যের রেফারেন্স দিতে গিয়ে পুস্তকের টীকা অংশকে ভারাক্রান্ত করে তোলাক আমি সমীচীন মনে করিনি। আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছু ছিল না যে, পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র জীবনকে মরহুম মাওলানা যেভাবে বুঝেছেন, পাঠকবৃন্দও যেন সেভাবে বুঝে নিতে পারেন। দা'ওয়াত সম্পর্কিত মাওলানার কিছু কিছু কথা এই গ্রন্থের বিভিন্ন ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জা'ফর বিন আবী তালিব (রা)-এর বক্তৃতা, মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জুমুআর ভাষণ, তাবুকের ভাষণ, কিংবা মক্কা বিজয় ও হজ্জের ভাষণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ঘটনার সাথে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অতএব এখানে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা আমার কাছে সমীচীন মনে হয়নি। মোটকথা, ঐসব ভাষণে যেসব জরুরী কথার বর্ণনা এসেছে, পারতপক্ষে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। (সংকলক)

ইসলামের দা'ওয়াত-১

বিশ্বজনীন দা'ওয়াত

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর দা'ওয়াত কোন বিশেষ জাতি বা বিশেষ দেশের জন্য ছিল না, বরং ছিল বিশ্বের সমগ্র মানুষের জন্য। সূরা আ'রাফের একটি আয়াতে, যা বিশ্বজনীন আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত, দা'ওয়াতে ইসলামের হাকীকত (স্বরূপ) অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমনঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ . فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ .

"বলো হে মানুষ, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র রাসূল যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, যাতে তোমরা পথ পাও। -(৭ ঃ ১৫৮)

দা'ওয়াতে ইসলামের হাকীকত হলো ঃ

১। এই দা'ওয়াত সমভাবে বিশ্বের সব মানুষের জন্য।

২। এই দা'ওয়াত সেই অদ্বিতীয় আল্লাহ্র সামনে সকলের মাথা ঝুকিয়ে দিতে চায়, যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ বা উপাশ্য নেই।

৩। আল্লাহ্ এবং তাঁর ওহীর যাবতীয় কালিমা সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন হচ্ছে এর শিআ'র বা চিহ্ন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)- বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের সবার প্রতি প্রেরণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন সেই আল্লাহ্, যার হাতে রয়েছে আসমান-যমীনের বাদশাহী। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি জগতে যখন একই আল্লাহ্রই শাসন চলছে, তখন এটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যে, তার হিদায়াতের বাণীও এক হবে এবং তা হবে সকলের জন্য।

জীবনের পয়গাম

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দা'ওয়াত এজন্য যে, তা তোমাদেরকে জীবন্ত করে তুলবে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ . . .

"হে মুসলিমগণ, রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করেন, যা তোমাদের জীবিত (প্রাণবন্ত) করে, তখন আল্লাহ্ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দেবে।"

অর্থাৎ ইসলামের দা'ওয়াত মানে সকলের কাছে পরিপূর্ণ মানবতার স্বরূপ উদঘটন করা এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান জানানো। চিন্তা করে দেখুন, এই আহবান সমসাময়িক কালের যাবতীয় মৃত (জীবন্মৃত) জনগোষ্ঠীকে কিভাবে কবর থেকে উঠিয়ে জীবনের ময়দানে সঞ্চরণশীল করে তুলেছিল। মৃতকে জীবন্ত করে তোলার এর চাইতে বড় দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে যে, এই দা'ওয়াতেরই প্রভাবে আরবের অশিক্ষিত রাখালদের মধ্যে থেকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন আবু বকর, উমর, আলী, আয়শা, খালিদ, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস, আমর ইবন আস(রা) প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিবর্গ এবং মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বর্বর আরবরা পরিণত হয়েছিলো সারা বিশ্বের সব চাইতে সুসভ্য জাতিতে।

তাওহীদ

আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি রাজাধিরাজ, চিরঞ্জীব এবং চিরবিদ্যমান। বিশ্বজগতের এক ইঞ্চি জায়গাও তার শাসনক্ষমতার বাইরে নয়। কোন কিছুই তাঁর অজ্ঞাত নয়। তাঁর কোন আলস্য নেই। তিনি ভুলত্রুটি থেকে পবিত্র। যে সত্তা এই সব গুণাবলীতে গুণান্বিত, তাঁর কাজে কারো কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার অবকাশ আছে কি? কারো কোন অধিকার আছে কি তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে কোন ব্যাপারে সুপারিশ করার? তাঁর আদেশ নির্দেশ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এমন কে আছে, যে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপনের ক্ষমতা রাখে?

কয়েকটি জরুরী তত্বকথা

পবিত্র কুরআনে সত্তাগত তাওহীদের সাথে গুণগত তাওহীদকেও পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে মানুষকে দ্বীনী আকায়িদ ও আমালের যে ধারণা দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে সর্বোতভাবে দয়া, করুণা ও প্রেম-ভালবাসার উপর। সূরা ফাতিহায় 'রাবুবিয়াত' (প্রতিপালন) ও 'রাহমাত' (কৃপা) গুণের পর 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (সেই দিনের মালিক, যেদিন মানুষের কর্মসমূহের প্রতিদান দেওয়া হবে) এই গুণ বর্ণনা করে 'আদালত' (ন্যায়বিচার)-এর দিকটিও তুলে ধরা হয়েছে এবং যাবতীয় গুণাবলীকে এই আদালত গুণেরই অধীন করে দেওয়া হয়েছে।

১। বিশ্বপ্রকৃতিতে 'রাবুবিয়াত' এবং 'রাহমাত' -এর সাথে 'মাজাযাত' (রূপক বা আলংকারিত দিক) ও আছে।

মানুষ এই মাজাযাতকে রাগ ও ক্রোধের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করেছে। এভাবে আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্যে ভয়ভীতির ধরণা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ যে সব বাহ্যিকতাকে রাগ ও ক্রোধ আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা পুরাপুরিভাবে 'রাহমত'-এরই অপর রূপ। কেননা, নির্মাণ কাজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং তাতে পরিপূর্ণতা দানের জন্য ধ্বংস ও ভাংগনের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। অন্যথায় ন্যায়বিচারের তুলাদন্ডের পাল্লা সমান সমান থাকে না এবং সৃষ্টির নিয়মকানূন ভেংগে চুরমার হয়ে যায়।

২। আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্যে রাগ ও ক্রোধের কোন স্থান নেই। 'আদালত' (ন্যায় বিচার) অবশ্যই আছে এবং ক্রোধ সম্পর্কিত গুণাবলী যে পরিমাণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে এই আদালতেরই বহি:প্রকাশ মাত্র। গুণগত তাওহীদের মধ্যে শুধুমাত্র তাওহীদের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে এবং তাতে শিরকের যাবতীয় রাস্তা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেছে।

(ক) ইবাদত এবং প্রার্থনার যোগ্য শুধুমাত্র আল্লাহ্র সত্তা। যদি তুমি উপাসনা সুলভ নম্রতা ও বিনয়ের সাথে অন্য কোন সত্তার সামনে মাথা নত কর তাহলে তোমার 'তাওহীদে এলাহী'-এর বিশ্বাস আর বাকী থাকে না।

(খ) শুধুমাত্র আল্লাহ্র সত্তাই মানুষের আহবান শুনে এবং তার দু'আসমূহ কবুল করে। যদি সে তার দু'আ ও আবেদনে অন্য কোন সত্তাকে শরীক করে নেয় তাহলে সে যেন এই খোদার খোদায়ীর মধ্যে অন্যকে শরীক করে নিল।

(গ) এভাবে মাহাত্ম্য, পরাক্রম, কর্ম সম্পাদন ও সর্ব বিষয়ে নির্ভরতার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কে যে ধারণা তোমার মধ্যে সৃষ্টি হবে তা আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট থাকা চাই। যদি অন্য কোন সত্তার জন্য এই ধারণা তোমার মধ্যে সৃষ্টি হয় তাহলে মনে করবে তোমার তাওহীদের ই'তিকাদ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

(ঘ) এ কারণেই 'সূরা ফাতিহা إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ . (আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি)-এর মধ্যে 'ইবাদত' এর সাথে সাথে 'ইসতি'আনাত' এরও উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর এ দুটি গুণের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য উভয় জায়গায়ই কর্মকারককে বাক্যের প্রথমে আনা হয়েছে। বলা হয়েছে শুধু ' তোমারই' ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

(ঙ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল নুবুওয়াত-ব্যক্তিত্বের সীমা নির্ধারণ। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মানুষ ও বান্দা হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং তাঁর শিক্ষার যে মৌলিক কালিমা নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো —

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

অর্থাৎ আমি স্বীকার করছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আমি স্বীকার করছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ এবং তাঁর রাসূল।

এই কালিমায় যেভাবে আল্লাহ্‌র তাওহীদের দিকটি স্বীকার করা হয়েছে ঠিক সেভাবে স্বীকার করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মানুষ ও রাসূল হওয়ার দিকটিও। লক্ষণীয় যে, (এখানে মানুষ হওয়ার দিকটি সর্বাগ্রে বর্ণিত হয়েছে। এরপর বর্ণিত হয়েছে রাসূল হওয়ার দিকটি)।

নুবুওয়াতের উজ্জ্বল প্রমাণ

সূরা ইউনূসে বলা হয়েছে–

قُلْ لَّوْشَاءَ اللّٰهُ مَاتَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرٰكُمْ بِهٖ صلے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّـ
قَبْلِهٖ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ .

"বলুন! আল্লাহ্‌র সেরূপ অভিপ্রায় হলে আমিও তোমাদের নিকট এটা পাঠ করতাম না এবং তিনিও তোমাদেরকে এবিষয়ে অবহিত করতেন না। আমি তো এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করেছি; তবু কি তোমরা বুঝতে পার না?" (১০ ঃ১৬)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নুবুওয়াতের সত্যতার স্পষ্টতম ও হৃদয়গ্রাহী দলীল বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, আমি তোমাদের কাছে এমন কোন নতুন লোক নই যে, তার উৎকৃষ্ট গুণাবলী ও অবস্থাদি সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। আমি তোমাদেরই লোক। ওহী ঘোষণার পূর্বে আমার জীবনের একটি দীর্ঘ সময় (চল্লিশ বছর) আমি তোমাদের মধ্যেই কাটিয়েছি। আর এটা হচ্ছে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি পাকাপোক্ত হওয়ার একটি বিশেষ সময়কাল। এই সমগ্র সময়কালে আমার জীবন তোমাদের চোখের সামনেই অতিবাহিত হয়েছে।

বলো, এই সমগ্র সময়ের মধ্যে তোমরা কি আমাকে এমন কোন কথা বলতে বা এমন কোন কাজ করতে দেখেছ, যা সত্যতা ও বিশ্বস্ততার বিরোধী। এরপর যদি ঐ সমগ্র জীবনে আমা থেকে এরূপ না হয়ে থাকে যে, কোন মনুষ্য ব্যাপারে মিথ্যা বলেছি, তবে কি এটা হতে পারে যে, এখন আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপের জন্য লেগে যাই আর বলতে থাকি আমার উপর তাঁর বাণী আসে? এই সাধারণ কথাটিও কি তোমাদের বোধগম্য হয় না?

সমগ্র মনস্তত্ত্ববিদ এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষের জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর সময়কাল তার চরিত্র ও গুণাবলী গঠিত ও সমৃদ্ধ হওয়ার সময়কাল। এই সময়কালে তার জীবনের যে ছাঁচ বা আকার-আকৃতি গড়ে উঠবে, তা পরবর্তী জীবনে কখনো পরিবর্তিত হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط اِنَّهٗ لَايُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ۰

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? অপরাধীরা সফলকাম হয় না।"(১০:১৭)

দুইটি কথা তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চাইতে নিকৃষ্টতর লোক আর কেউ হতে পারে না এবং যে ব্যক্তি সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে সে-ও সর্বাধিক নিকৃষ্টতর।

আমি যদি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করি তাহলে আমাকে পরিনামে বিফল ও ব্যর্থ হতে হবে। যদি তোমরা সত্যকে মিথ্যা বল তাহলে এর খারাপ পরিণাম তোমাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যাবতীয় বিষয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা আল্লাহ্র হাতে এবং তাঁর নীতি এই যে, তিনি দুস্কৃতিকারীদের রেহাই দেন না।

সুতরাং আল্লাহ্র ফায়সালা কার্যকর হয়েছে। যারা মিথ্যাবাদী ছিল তাদের নাম-নিশানা দুনিয়া থেকে মুছে গেছে। আর যিনি সত্যবাদী ছিলেন তার সত্যবাণী আজো টিকে আছে এবং চিরদিন টিকে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্যতা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্যতার এর চাইতে বড় দলীল আর কী হতে পারে যে, তাঁর কঠোর থেকে কঠোরতর প্রতিদ্বন্দ্বীও তাঁর সত্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার আকর্ষণ (প্রভাব) কাটিয়ে উঠতে পারত না। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার মধ্যে যে সব আকর্ষণীয় বিষয় ছিল, যেহেতু ব্যক্তিত্ব বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতার কারণে তারা তা স্বীকার করে নিতে পারত না। তাই জনসমক্ষে মুখ রক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে সেটাকে 'যাদু' বলে আখ্যায়িত করত।

যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে–

"ওদের অন্তর থাকে অমনোযোগী। সীমালংঘন কারীরা গোপনে পরামর্শ করে, এতো তোমাদের মতো একজন মানুষই, তবুও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর কবলে পড়বে? –(২১ ঃ৩)

অর্থাৎ ওরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মেলামেশা করতে মানুষকে বারণ করত এবং বলত, তোমরা তার সাথে মেলামেশা করার কারণে তার যাদুজালে আটকা পড়েছ। সে আমাদেরই মত একজন মানুষ। তার কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি থেকে যে প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তা তার ঐ যাদুর কারণেই হয়ে থাকে।

সত্যের সবচেয়ে বড় পরিচয় এই যে, একে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলা যাবে না। যদি অন্য কিছু বলতে চাও এবং এজন্য সর্বশক্তিও নিয়োগ কর তবু কোন কাজ হবে না। শেষ পর্যন্ত তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এটা সত্য। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, গুমরাহী ও অবাধ্যতার পরিবর্তে 'হক' তথা সত্যকে স্বীকার করে নেওয়াটা মানুষকের মন-মানসিকতার পক্ষে প্রায়ই কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সে লড়াই না করে অস্ত্র সংবরণ করতে চায় না। অবশ্য একদিন না একদিন সে সত্যকে স্বীকার করে নেবেই(কেননা, সত্যকে স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই), তবে কি তখন, যখন তাকে এজন্য বাধ্য করা হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সত্যের দিকে আহবান জানাতে শুরু করেন তখন মক্কার কুরায়শদের অবস্থাও ছিল তাই। তারা সত্যকে প্রত্যক্ষ করছিল, কিন্তু সেটাকে সত্য বলে মেনে নিতে চাচ্ছিল না। তারা কখনো বলত, সে [নবী করীম

(সা)] পাগল হয়ে গেছে, তাই নিজের স্বপ্ন ও চিন্তাধারাকে ওহী ও নুবুওয়াত আখ্যা দিচ্ছে। এরপর যখন তারা এগুলোর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করত তখন বলত, সে একজন যাদুকর বটে।

একটি রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, কুরায়শরা একদা 'দারুন নাদ্‌ওয়ায়' সমবেত হয়েছিল এবং আপোসে এসমস্ত কথাবার্তা বলেছিল (ইবনে হিশাম)।

আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও পুণ্যকর্ম

আল্লাহ্‌র উপর, আল্লাহ্‌র ফিরিশতাদের উপর, আল্লাহ্‌র কিতাব সমূহের উপর, আল্লাহ্‌র সকল রাসূলের উপর এবং পুনরুত্থান দিবসের উপর বিশ্বাস রাখাই প্রকৃত ও পরিপূর্ণ ঈমান। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব, তাঁর গুণাবলী এবং আখিরাতই হচ্ছে দ্বীনের মৌলিক হাকায়িক বা বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করোনা, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তানকে হত্যা করো না, আমি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করি এবং ওদের খাদ্যও আমিই সরবরাহ করব। তোমরা নির্লজ্জ কথাবার্তা বা আচার আচরণের ধারেকাছে ঘেঁসো না- চাই তা প্রকাশ্য হোক অথবা গোপনীয়। এমন কোন প্রাণীকে হত্যা করো না, যার হত্যা আল্লাহ্ তা'আলা অবৈধ করে দিয়েছেন। অনাথ-য়াতীমের ধন-সম্পদের দিকে হাত বাড়িয়ো না, যখন কোন কথা বল ন্যায়ের সঙ্গে বল–যদি সে ব্যাপারটি তোমার নিকটাত্মীয়দেরও হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্‌র সাথে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা পূর্ণ কর।

আল্লাহ্‌র বন্দেগী এবং পুণ্য অর্জনের এটাই সরল পথ, যা খোদ আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তোমরা এ পথেই চলো, অন্য কোন পথ অনুসরণ করো না। অন্যথায় আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে তোমরা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

যে আল্লাহ্‌র হুযূরে একটি পুণ্য অর্জন করবে, তার আমলনামায় দশটি পুণ্য লেখা হবে। আর যে একটি পাপ করবে, সে ঐ একটিমাত্র পাপেরই প্রতিফল ভোগ করবে। আমাকে [মুহাম্মদ (সা)কে] আমার প্রভু সহজ সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন; এটাই নির্ভুল ও সঠিক দ্বীন। এটাই হচ্ছে ইবরাহীম (আ) এর পথ, যে পথে রয়েছে আল্লাহ্‌র জন্য তৈরী হয়ে যাওয়া।

"আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।" (৬ঃ১৬২-৬৩)

আদেশ ও নিষেধসমূহ

১। 'তাওহীদ ফিল ইবাদাত'-এর তালকীন এজন্য জরুরী ছিল যে, শুধু একত্ববাদের বিশ্বাস তো প্রত্যেকটি অনুসরণীয় ধর্মের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল; কিন্তু 'তাওহীদ ফিল ইবাদত' (ইবাদতের মাধ্যমে তাওহীদ)এর হাকীকত মানুষের অন্তর থেকে মুছে গিয়েছিল।

২। অত:পর পিতামাতার 'হুকূক' (অধিকার সমূহ)-এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মানুষের জন্য পিতামাতার প্রতিপালন আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিপালনেরই প্রতিচ্ছবি। পিতামাতার সেবা ও আনুগত্যের পরীক্ষার প্রকৃত সময় আসে তাদের বার্ধক্য কালে; যখন তারা শারীরিক দুর্বলতার কারণে অন্যের সেবা শুশ্রূষার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন।

মানুষের পরমুখাপেক্ষিতার সময় দু'টি। শৈশব ও বার্ধক্য। শৈশবে পিতামাতা তাদের সেবা করে থাকেন। অতএব পিতামাতার বার্ধক্যে সন্তানের উচিত তাদের সেবা করা।

৩। পিতামাতার পরে ঐ সব আত্মীয় স্বজনের হুকূক(অধিকার সমূহ)-এর কথা আসে, যারা কোন না কোন ব্যাপারে আমাদের মুখাপেক্ষী। এই সাথে ইসলাম আমাদেরকে অপব্যয় থেকে বিরত রেখেছে। বলা হয়েছে, অপব্যয় করো না। যারা তোমার নিকটাত্মীয়, যারা তোমার প্রতিবেশী, যারা কোন না কোনভাবে তোমার সাহায্যের প্রত্যাশী তাদের জন্য খরচ কর।

৪। ধন সম্পদ খরচসহ প্রত্যেকটি ব্যাপারেই মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। হুজুগের বশবর্তী হয়ে কোন একদিকে ঝুকে পড়ে সবকিছু উড়িয়ে দিও না। অর্থব্যয়ে সাবধানতা অবলম্বন কর, কিন্তু কার্পণ্য করো না।

৫। সন্তান সন্ততিকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না।

৬। ব্যভিচার থেকে দূরে থাক। এটা খুবই গর্হিত কাজ এবং মন্দ পথ।

৭। যাদেরকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তাদেরকে হত্যা করো না। আমি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে কিসাস গ্রহণের অধিকার দিয়ে রেখেছি।.অতএব হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা উচিত।

৮। য়াতীমদের সম্পদের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করো না। হ্যাঁ, যে পদ্ধতিতে ব্যয় করলে তারা উপকৃত হয় সে পদ্ধতিতে ব্যয় করতে পার। যখন য়াতীমরা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায়, তখন তাদের আমানত (সম্পদ) তাদের হাতেই অর্পণ করো।

৯। অঙ্গীকার পূর্ণ করো। এ সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

১০। যখন কোন জিনিস পরিমাপ কর তখন মাপের পাত্রটি পরিপূর্ণ করে দাও। আর যখন কোন জিনিস ওজন কর তখন তুলাদন্ড সোজা রাখ(অর্থাৎ মাপে বা ওজনে কখনো কম করো না)।

আল্লাহ্‌র আনুগত্যকারীদের পরিচয়

ঐ সব লোক, যারা আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং নিজেদেরকে বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর জন্য উপকারী বলে প্রমাণিত করেছে তাদের পরিচয় হলোঃ

(ক) তারা আল্লাহ্‌র বন্দেগী তথা দাসত্বের প্রতিশ্রুতি পালন করে এবং নিজেদের উপাসনার ক্ষেত্রে সততা ও পরিপূর্ণতার স্বাক্ষর রাখে।

(খ) আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য মানুষের সাথে তাদের যে সম্বন্ধ জুড়ে দিয়েছেন জুলুম ও অবিচার দ্বারা অন্যের সাথে তারা তা ভঙ্গ করে না। বরং তারা সব সময় অন্যের সাথে সুসম্বন্ধ বহাল রাখার প্রতি যত্নবান থাকে এবং যার যা হক তা যথারীতি আদায় করে। সমগ্র হুকূকুল্লাহ্ ও হুকূকুল ইবাদ আপনা আপনি তাদের এই কর্ম ধারার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

(গ) আখিরাতের কথা তারা কখনো বিস্মৃত হয় না। তারা যা কিছু করে তাতে তাদের আখিরাতের ভয়ভীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তারা বিশ্বাস করে যে, একদিন আল্লাহ্‌র সামনে যাবতীয় কাজকর্মের জবাবদিহী করতে হবে এবং এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় নেই।

(ঘ) আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় তারা যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। যে কোন বিপদাপদেরে মুকাবালা করতে তারা ভয় পায় না। যে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেও তারা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে না।

(ঙ) তারা সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে তার যাবতীয় শর্ত (বিধিবিধান) পালন করে।

(চ) তারা যা কিছু অর্জন করে তা শুধুমাত্র নিজেদের জন্য খরচ করে না; বরং অন্যের জন্যও খরচ করে-কখনো প্রকাশ্যে আবার কখনো গোপনে।

(ছ) অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় দ্বারা গ্রহণ করা তাদের চরিত্র নয়। কেউ তাদের সাথে যত খারাপ ব্যবহার করুক, তারা তার সাথে ভাল ব্যবহারই করে।

মুমিনদের পাঁচটি গুণ

মুমিনদের পাঁচটি গুণ বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনের মতে, ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে এই পাঁচটি গুণ বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। যে জীবনে এই গুণগুলো অনুপস্থিত, সে জীবনকে মুমিনের জীবন বলা চলে না।

(ক) সালাতের হিফাযত করা এবং খুশূ'ও খুযূ (ভয় ও বিনয়) এর সাথে তা আদায় করা। কোন ভয়ানক স্থানে কিংবা অতি পরাক্রমশালী কোন লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে দেহে ও অন্তরে যে ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, আরবী ভাষায় সেটাকেই 'খুশূ' বলা হয়।

(খ) এমন কোন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা, যার মধ্যে কোন সারবত্তা নেই। শুধুমাত্র ঐ সব কথা বলা বা ঐ সব কাজ করা, যার মধ্যে দ্বীন-দুনিয়ার শান্তি ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

(গ) অর্জিত সম্পদ থেকে নিজদের অভাবগ্রস্ত ভাইদের জন্য কিছু খরচ করা।

(ঘ) কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া।

(ঙ) সব সময় নিজের বিশ্বস্ততা রক্ষা করা এবং প্রতিশ্রুতি পালন করা।

সত্যের পথের অগ্রদূত

সত্যের পথে সর্বাগে নির্গমনকারীগণ হচ্ছেন—

(ক) যারা আপন প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে এবং তার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস রাখে।

(খ) যারা আপন পরওয়ারদিগারের সাথে কাউকে শরীক করে না।

(গ) যারা আল্লাহ্র পথে যা কিছু দান করে তা বিনা দ্বিধায় দান করে। তারা সব সময় সন্ত্রস্ত এই ভয়ে যে, একদিন তাদেরকে মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হাযির হতে হবে।

মঙ্গল ও সৌভাগ্যের পথ

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিকটাত্মীয়দের হক আদায়ের কথা ভুলে যেয়ো না। য়াতীম, মিস্কীন, মুসাফির ও পাড়া-পড়শীদের খোঁজ খবর রাখো। তোমার প্রতিবেশী-চাই আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়-সব সময়ই তোমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী। যে সব লোক তোমার সাথে উঠাবসা করে-চাই তারা দাসদাসী হোক অথবা অন্য কেউ - তোমার উপর তাদের প্রত্যেকেরই হক রয়েছে। অতএব তোমার উচিৎ সবার সাথেই সদ্ব্যবহার করা এবং ভালবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্ক রাখা।

কার্পণ্য করো না। আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু তোমাকে দিয়েছেন তা তাঁর বান্দাদের সেবায় নিয়োজিত কর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখে তার হাত কখনো আল্লাহ্র পথে খরচ করা থেকে নিরস্ত হয় না। অবশ্য যা কিছু খরচ কর তা সুনাম অর্জনের জন্য নয়, বরং আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্য খরচ কর।

শৃঙ্খলা রক্ষা ও সাফল্য লাভের মূলকথা

সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সাফল্য লাভের মূলকথা হলো, কোন জিনিসের উপর কারো কোন হক থাকলে তুমি তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নাও। যে জিনিস যার প্রাপ্য সে জিনিস তার হাতে অর্পণ করো। উত্তরাধিকারীর পাওনা, যাতীমের সম্পদ, ঋণদাতার ঋণ, যে আমানত রেখেছে তার আমানত,যার যে পদের যোগ্যতা রয়েছে তাকে সে পদ— মোটকথা, যার যে হক এবং যার যা প্রাপ্য তা তারই পাওয়া উচিত।

যখন মানুষের কোন ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা কর তখন শুধুমাত্র ন্যায় ও সত্যকে সামনে রাখো। কখনো ন্যায় বিচারের পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো না।

মুসলমানদের জন্য আসল দ্বীন

মুসলমানদের আসল দ্বীন হলো আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, আল্লাহ্‌র রাসূলের আনুগত্য করা এবং যারা ক্ষমতার অধিকারী এবং আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসুলের অনুগত থেকে নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করে থাকেন, তাদের আনুগত্য করা। যখনই পরস্পরের মধে কোন মতবিরোধ দেখা দেয় তখন আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের আদেশ-নির্দেশের দিকে ফিরে যেতে হবে এবং সেখান থেকে যে ফয়সালা আসবে, তা-ই বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে।

ন্যায় বিচারে দৃঢ় থাকা

মুসলমানদের উচিত ন্যায়বিচারে দৃঢ় থাকা। অর্থাৎ তারা ন্যায় ও সত্যের উপর এমন দৃঢ়তার সাথে কায়েম থাকবে যে, কোন কিছুই তাদেরকে সেখান থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে হোক অথবা অন্য যে কোন ব্যাপারে হোক, তারা ন্যায় ও সত্যকে কখনো হাতছাড়া করবে না। সত্যকথা– চাই তা তাদের নিজেদের অথবা নিজেদের পিতামাতার অথবা নিজেদের আত্মীয় স্বজনের স্বার্থের বিরুদ্ধে চলে যাক– তারা নির্দ্বিধায় বলে যাবে। কেননা, মুমিনদের অন্তর সত্য ছাড়া অন্য কিছু ধারণ করতে পরে না এবং তাদের জিহবা সত্য ছাড়া অন্য কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না। সূরা মায়িদায় পরিস্কার ভাষায় বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَايَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوْا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ .

"হে মুমিনগণ, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে; সুবিচার করবে, এটা তাক্ওয়ার (পরহেযগারীর) নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ তার সম্যক খবর রাখেন।"-(৫ ঃ৮)

মৌলিক দায়িত্ব

মুসলমানদের জন্য একথা জরুরী যে, তারা যেন আল্লাহ্‌র শা'আয়ির (নিদর্শনসমূহ)-এর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন না করে। অন্যান্যদের ব্যাপারে তাদের কর্মপদ্ধতি এই হওয়া উচিত যে, তারা যেন সৎকর্মে তাদেরকে সাহায্য করে এবং পাপ ও সীমা লংঘনে সাহায্য না করে। জুলুম-অত্যাচার করা অন্যায়। অতএব এগুলো থেকে নিজেকে সব সময় দূরে রাখতে হবে। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা পুণ্যের কাজ। অতএব এর উপর সব সময় অবিচল থাকতে হবে। মোটকথা, সৎকর্ম ও তাকওয়ায় পরস্পরকে সাহায্য করা এবং অসৎকর্ম ও সীমালংঘনে একে অন্যকে সাহায্য না করা প্রত্যেক মুসলমানেরই মৌলিক দায়িত্ব।

দ্বীন ইসলাম ও আল্লাহ্‌র নি'মাতের পরিপরিপূর্ণতা এই চায় যে, আমরা যেন আপাদমস্তক ন্যায় ও সত্যের প্রতিমূর্তিতে পরিণত হই।

ইসলামের দা'ওয়াত–২

মানবিক সাম্য

ইসলাম মানব জাতির মধ্যে সাম্যের ঘোষণা দিয়েছে। ইতিপূর্বে যেসব বৈষম্য সৃষ্টির কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলো, ইসলাম অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সেসমস্ত বৈষম্যের মূলোৎপাটন করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ মাত্রই সমান। তারা প্রভু হোক অথবা গোলাম, পুরুষ হোক অথবা স্ত্রীলোক, বড় হোক অথবা ছোট, উঁচু বংশের হোক অথবা নীচু বংশের, আরব হোক অথবা অনারব–মানুষ হিসাবে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

(ক) রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের পর যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে কুরায়শকে সম্বোধন করে এই সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করেছিলেন যে, "হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মূর্খতামূলক দাম্ভিকতা এবং বংশ-গৌরব আজ বিলীন করে দিলেন। মানুষ মাত্রই আদমের সন্তান এবং আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

"হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সব খবর রাখেন।"–(৪৯:১৩)

যখন মানুষ একই পিতামাতার (আদম-হাওয়ার) সন্তান তখন মানুষ হিসাবে তাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির কী কারণ থাকতে পারে? আল্লাহ্ সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি হিসাবে যে জিনিসটি নির্ধারণ করে দিয়েছন তা হলো তাক্ওয়া। আর এটা এমন জিনিস, যা মানুষের মধ্যে বিনয়ভাব জাগ্রত করে, পরস্পর সাম্য ও বন্ধুত্বের সৃষ্টি করে এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে তাদেরকে দূরে রাখে। এছাড়া সম্মান ও মর্যাদার আর যত মাপকাঠি আছে–যেমন, ঐশ্বর্য, পদ, বর্ণ ইত্যাদি–সেগুলো থেকে পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছাড়া সাধারণত: অন্য কিছু আশা করা যায় না।

দ্বীনের মূল লক্ষ্য

সৌভাগ্য ও পরিত্রাণের পথ নিহিত রয়েছে আল্লাহ্র সত্যিকার ইবাদত ও জীবনের পুণ্যকামিতার মধ্যে। আসল বস্তু হলো অন্তরের পবিত্রতা ও কর্মের পুণ্যতা। শরীয়তের যাবতীয় বাহ্যিক আদেশ-নির্দেশ ও রসম-রেওয়াজ পালনের উদ্দেশ্যেই হলো এই আসল বস্তুটি লাভ করা।

কুরআন নাযিল হওয়ার সময় বিশ্বব্যাপী একটি ধর্মীয় গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা এই ছিল যে, মানুষ মনে করত, দ্বীনের আসল উদ্দেশ্য বাহ্যিক নিয়মকানূন ও রসম-রেওয়াজ পালন ছাড়া আর কিছু নয়। এগুলোর উপরই মানুষের সৌভাগ্য ও পরিত্রাণ নির্ভরশীল। অতএব দ্বীনের ব্যাপারে ওসীলা বা মাধ্যম নয়, বরং লক্ষ্য অর্জনই আসল উদ্দেশ্য হওয়া চাই।

ইবরাহীম (আ) এর পথ

দ্বীনের যে পথ হযরত ইবরাহীম (আ) বেছে নিয়েছিলেন তা কি ছিল? তার পরে তাঁর বংশধররা যেসব পন্থা অনুসরণ করেছিল সেগুলো কি ছিল? খোদ হযরত ইয়াকুত (আ) তাঁর মৃত্যুশয্যায় যে দ্বীনের ওসীয়ত করেছিলেন সেটা কোন্ দ্বীন ছিল? এটা সুনিশ্চিত যে, ঐ দ্বীন য়াহুদীবাদ বা ঈসায়ীবাদ ছিল না(ঐ সময় তো য়াহুদীবাদ বা ঈসায়ীবাদের অস্তিত্বই ছিল না)। এটা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর প্রদত্ত সৌভাগ্য মন্ডিত আইন কানুনের আনুগত্যের প্রকৃতিগত ও সার্বজনীন সত্যতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর প্রকৃতপক্ষে কুরআন মানুষকে এরই দা'ওয়াত দিয়েছিল।

আল্লাহ্‌র দ্বীনকে 'আল ইসলাম' বলা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ قف .

"ইসলাম আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন।" (৩ ঃ ১৯)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবূল করা হবে না।" (৩ ঃ ৮৫)

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

"এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"–(৫ঃ৩)

ইসলাম মানে আনুগত্য। অর্থাৎ সব রকমের সম্বন্ধ ও দলাদলি (GROUPING) বর্জন করে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি মানুষকে আহবান জানানো।

কর্মফল

আল্লাহ্‌র কানূন এই যে, প্রত্যেক মানুষ সেরূপ ফলই পায় যেরূপ কাজ সে করে। একজনের পুণ্য যেমন অন্য জনকে বাঁচাতে পারে না, তেমনি একজনের পাপের জন্য অন্যজনকে জবাবদিহী করতে হয় না।

গোড়ামি বা প্রাচীন আচার-আচরণের প্রতি ঝোঁক মানুষের একটি কঠিন ও মারাত্মক ফাঁদ। এর গোলকধাঁধাঁ থেকে সে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। সে স্বভাবত: অতীতের কেচ্ছাকাহিনীর মধ্যেই ডুবে থকতে চায়। হিন্দুরা হাজার হাজার বছর ধরে মহাভারত ও পুরাণের গালগল্পের মধ্যে ফেঁসে রয়েছে। মুসলমানদের দু'টি দল আজ পর্যন্ত এই বিতর্কের মধ্যে পড়ে রয়েছে যে, তের শ বছর পূর্বে সাকীফা-ই-বনী সায়িদা'য় খিলাফতের যে নির্বাচন হয়েছিল, তা সঠিক ছিল, না ভ্রান্ত ছিল ? কুরআন বলে,

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَاتُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

"সেই উম্মত অতীত হয়েছে– ওরা যা অর্জন করেছে তা ওদের, তোমরা যা অর্জন কর তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।"–(২ঃ১৩৪)

অর্থাৎ ওদের পিছনে পড়ে থাকার মধ্যে তোমাদের কোন লাভ নেই। তোমরা নিজেদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখ। ওরা যা করেছে তা তাদের জন্য ছিল এবং তোমরা যা করবে তা তোমাদের জন্যই হবে।

দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকার কুফল

'দ্বীনে হক' দুনিয়ার নয় , বরং দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকার বিরোধী। এই দুনিয়া পূজাই মনুষকে আল্লহ্‌র বন্দেগী ও সরল পথ থেকে বিমুখ করে ফেলে । যখন সে শক্তি ও রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয় তখন স্বার্থন্ধতা ও আত্মতুষ্টির জন্য সব কিছু করতে পারে। সে মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচার করতে পারে, সমাজ জীবনে ফিত্‌না-ফাসাদের সৃষ্টি করতে পারে। যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র অনুগত , তারা দুনিয়া নিয়ে যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন, কখনো স্বার্থান্ধ হয়ে পড়ে না। কেননা, একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই যে তাদের কাম্য।

আখিরাতের মুক্তি

আখিরাতের মুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিজের ঈমান ও আমলের উপর। সেখানে না মুক্তির কোন বেচাকেনা চলবে, না কারো বন্ধুত্ব কোন কাজে আসবে, আর না কারো সুপারিশে আযাব থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে। কোন পুণ্যবান ও বুযুর্গ ব্যক্তির কাছ থেকে ভাল কাজের শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে, তার সংস্পর্শে থেকে নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করা যেতে পারে, কোন বিজ্ঞজনের কাছ থেকে শরীয়তের মাসআলা-মাসায়িল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যেতে পারে, কিন্তু মুক্তি নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে নিজের আমল ও আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমতের উপর। এক্ষেত্রে অন্যের চেষ্টা বা সুপারিশ কোন কাজ দেবে না। এরূপ চিন্তাধারাই আগাগোড়া ইসলাম বিরোধী।

হক ও বাতিলের মাপকাঠি

হক ও বাতিলের ব্যাপারে মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যালঘিষ্ঠতা কোন মাপকাঠি নয়। পথভ্রষ্টতার এবং সত্যকে অবজ্ঞার এমন মুহূর্তও আসে, যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও হক ও ঈমান-ইয়াকীনের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় সমগ্র বিশ্বব্যাপী এমনি একটি মুহূর্ত বা যুগ অতিবাহিত হচ্ছিলো। পথভ্রষ্ট মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে লক্ষ্য করার প্রয়োজন নেই। যা প্রয়োজন তা হলো, কোন্‌ পথটি য়াকীন-বিশ্বাস ও দূরদর্শিতার, আর কোন্‌ পথটি মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যদি এপথে অল্প সংখ্যক লোকও থেকে থাকে তাতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আজ বিশ্বে মুসলিমদের নয়, বরং অমুসলিমদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তাহলে কি এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে ন্যায় ও সত্যের ফায়সালা করা হবে? প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের সংখ্যা বড় জোর কয়েক লক্ষ হয়ে থাকবে। কিন্তু তারাই বিস্ময়কর প্রচেষ্টা, অতুলনীয় দুঃসাহসিকতা, অপরিসীম আগ্রহ-উদ্দীপনা ও অবিশ্বাস্য রকমের আত্মোৎসর্গ দ্বারা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে হক ও সত্যের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। আজ বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা ষাট কোটি বলা হয়ে থাকে (বর্তমানে একশ কোটি – অনুবাদক)। এতদ্‌সত্ত্বেও বাতিলের অন্ধকার থেকে অন্তত: নিজেদেরকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাদেরকে অত্যন্ত অসহায় ও নিরূপায় বলে মনে হয়। (বরং এও বলা চলে যে, তারা আজ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যে সব পন্থা-পদ্ধতি অনুসরণ্‌ করছে, সেগুলোকে ন্যায় ও সত্য নয়, বরং অন্যায় ও বাতিল বলাই অধিক সঙ্গত।)

আখিরাত অস্বীকারকারী

যারা আখরাতকে অস্বীকার করে অর্থাৎ আখিরাতে যে পৃথিবীর যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব নিকাশ হবে, সেকথা বিশ্বাস করে না। তাদের মন-মানসিকতা অবশ্যই নিম্নের চারটি অবস্থার যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ক) তারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের তোয়াক্কা রাখে না।

(খ) তারা শুধু ইহজীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে।

(গ) এই অবস্থার বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না; বরং তারা এই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে।

(ঘ) তাদের অনুভূতি ও মন-মানসিকতায় এই পরিমাণ মরিচা পড়ে গেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নিদর্শনাদি – যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে, তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না।

উপরে বর্ণিত কথাগুলো শুধু অবস্থার বর্ণনাই নয়; বরং স্ব-স্ব-স্থানে এক একটি দলীলও বটে। আর এটাই হচ্ছে পবিত্র কুরআনের মু'জিযাপূর্ণ ভাষা-মাধুর্য।

বাধাবিপত্তি ও পরীক্ষাসমূহ

'কিতাব' (কুরআন) ও 'হিকমত' (যাবতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান) -এর শিক্ষা, ব্যক্তি নবীর নুবুওয়াত প্রশিক্ষণ (পবিত্রকরণ), হিদায়াত কেন্দ্র স্থাপন (কা'বাগৃহ), মুসলমানদের শ্রেষ্ঠতম উম্মত হওয়ার উদ্দেশ্য' ("তোমারা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের উদ্ভব হয়েছে।" – আলকুরআন) – এগুলো হচ্ছে এমন সব উপাদান, যা প্রতিশ্রুত উম্মতের পরিস্ফুটন ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য ছিল অপরিহার্য। অতএব যখন উপরে বর্ণিত সবগুলো পর্যায়ের বহি:প্রকাশ ঘটল তখনি কুরআনী দাওয়াতের অনুসরীদেরকে কর্মতৎপর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল।

আর এটা তো স্বাভাবিক কথা যে, কর্মতৎপর হওয়ার অপরিহার্য ফলশ্রুতি এই ছিল যে, নানা ধরনের বাধা-বিপত্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। অতএব দা'ওয়াতের নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে যেন মুসলমানদেরকে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও আত্মোৎসর্গেরও দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল।

ধৈর্য ও দৃঢ়তা

(ক) পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে –

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ·

" হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" – (২ ঃ ১৫৩)

এর মর্মকথা হলো ঃ

(ক) ধৈর্য ও সালাতের মধ্যে যে সব ক্ষমতা রয়েছে, সেগুলোর সাহায্য গ্রহণ কর। ধৈর্যের হাকীকত ও সারবত্তা এই যে, এর মাধ্যমে বাধা-বিপত্তি ও বিপদ-আপদ অতিক্রম করার এবং রিপুর তাড়নার উপর জয়লাভ করার ক্ষমতা অর্জন করা যায়। আর সালাতের হাকীকত এই যে, আল্লাহ্র যিকর ও ফিক্র দ্বারা আত্মিক শক্তি লাভ করা যায়। যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ দু'টি শক্তি (ধৈর্য ও সালাত) সৃষ্টি হবে তারা কখানো বিফলকাম হতে পারে না।

(খ) যে জনগোষ্ঠী মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনে কখনো সাফল্য লাভ করতে পারে না। সত্যের পথে যে মৃত্যু তা তো মৃত্যু নয়; বরং আদ্যোপান্ত জীবন।

অনেক ক্ষুদ্র বাহিনীর হাতে অনেক বিরাট বাহিনীও পরাজিত হয়। জয়-পরাজয় সেনাবাহিনীর সংখ্যাল্পতা বা সংখ্যধিক্যের উপর নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে মনোবল ও মনন শক্তির উপর। আল্লাহ্র সাহায্য তারাই পায় যারা ধৈর্য ধারণ করে ও সুদৃঢ় থাকে।

মুসলমানদের লক্ষ্যবস্তু

মুসলমানদের লক্ষ্যবস্তু এটা নয় যে, তারা একটি ক্ষমতাধর জাতি হবে এবং প্রভাব প্রতিপত্তিতে সবার উপরে থাকবে। কেননা পার্থিব ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সাথে গোষ্ঠীগত দম্ভ এবং জাতিগত উচ্চাভিলাষের সম্পর্ক রয়েছে। আর এটা হচ্ছে মানবজাতির শান্তি, নিরাপত্ত, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বিরোধী মনোবৃত্তি। এজন্য মুসলিম জাতির (পার্থিব সম্পদের উপর নয়, বরং তাদের), শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার উপরই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে

বলা হয়েছে – كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে।" (৩ ঃ ১১০)

আর এটা অনস্বীকার্য যে, শ্রেষ্ঠত্বের পরিপূর্ণতা নির্ভর করে চারিত্রিক ও মানসিক সৌন্দর্যাবলীর উপর। যে জনগোষ্ঠীর লক্ষ্যবস্তু এই হবে যে, তারা সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যবান হবে – তারা কখনো পার্থিব ক্ষমতা ও প্রতাপ-পরাক্রম জনিত বাড়াবাড়ি এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। (আর সত্যি কথা এই যে, মঙ্গল ও সৌভাগ্য লাভের ক্ষেত্রে সবার চাইতে অগ্রণী হওয়ার পর কোন জনগোষ্ঠীরই মানসিক শক্তির মধ্যে কোন খুঁত থাকতে পারে না। আর নিখুঁত মানসিক শক্তির উপর তো এমন কোন শক্তি নেই, যা মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে)।

দাওয়াতের একাত্মতা

পবিত্র কুরআন 'দ্বীনে হক' -এর ঐ মূল কথার ইংগিত প্রদান করেছে এই বলে যে, সকল নবীই শুধুমাত্র একই দ্বীনের 'দায়ী' (আহবানকারী) ছিলেন। যখন আল্লাহ্‌র দ্বীন এক, তখন সকল নবী একই শিকলের বিভিন্ন কড়া ছাড়া কিছু নন। যারা এদের মধ্যে বৈষমের সৃষ্টি করে, তারা গোটা হিদায়াত-শিকলকেই অস্বীকার করে। আল্লাহ্‌র দ্বীন এছাড়া আর কিছু নয় যে, তিনি যে সব 'ফিতরাতী' (স্বভাবসিদ্ধ) আইন-কানূন নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোর আনুত্য করা হবে। প্রকৃতপক্ষে আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবাই আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করছে। এরপরও কি কেউ আল্লাহ্‌র কানূন অস্বীকার করবে? সৃষ্টি জগতে এর চাইতেও শ্রেষ্ঠ কোন কানূন থাকতে পারে কি?

বিশ্বাস ও ভালবাসা

আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস এবং আল্লাহ্‌কে ভালবাসা এমন দুটি বস্তু, যা পরস্পর সম্পর্কিত। যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্তার কাছেও এভাবে কিছু প্রার্থনা করা হয়, যেভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে করা হয়ে থাকে তাহলে অন্যকে আল্লাহ্‌রই সমপর্যায়ভুক্ত করা হলো এবং এ কারণে আল্লাহ্‌র একত্বের বিশ্বাস চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। সে-ই মুমিন, যে আল্লাহ্‌কে সব চাইতে বেশী ভালবাসে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ

"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম।" – (২ ঃ ১৬৫)

যে কেউ আল্লাহ্‌কে ভালবাসার দাবী করে, তার উচিত আল্লাহ্‌র রাসুলের অনুসরণ করা। আল্লাহ্‌র ভালবাসার দাবী এবং তাঁর পথ প্রদর্শকের আনুগত্যকে অস্বীকার, এ দুটি জিনিস কারো অন্তরে এক সাথে থাকতে পারে না। যারা আল্লাহর রাসূলকে অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন এবং তাদের গুনাহ মাফ করে দেন।

পবিত্র কুরআনের চারটি গুণ

পবিত্র কুরআনের সূরা ইউনূসে বলা হয়েছে -

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۔ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۔

" হে মানুষ, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার প্রতিকার এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।"–(১০ঃ৫৭)

এই আয়াতে কুরআনের চারটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

(ক) উপদেশ (মাওয়িযাহ্) অর্থাৎ কুরআন অন্তরস্পর্শী দলীল-প্রমাণ এবং আত্মার উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী পন্থাসমূহের সাহায্যে ঐ সব কথা ও কাজের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, যা ন্যায় ও সত্য। আর ঐ সব কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখে, যা অন্যায় ও অনিষ্টকর। কেননা আরবী ভাষায় ওয়ায বা 'মাওয়িযাহ' (উপদেশ) শুধু (বাহ্যিক) উপদেশকে বুঝায় না, বরং সেই উপদেশকে বুঝায়, যা প্রভাব সৃষ্টিকারী ও অন্তরস্পর্শী দলীল-প্রমাণের উপর ভিত্তিশীল।

(খ) অন্তরে যা আছে তার প্রতিকার (শিফাউল লিমা ফিস্‌সুদূর)। অর্থাৎ কুরআন হচ্ছে অন্তরের যাবতীয় ব্যাধির শিফা বা প্রতিকার। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই ব্যবস্থাপত্র মেনে চলবে তার বা তাদের অন্তর হরেক রকমের অনাচার ও কুস্বভাব থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। স্মরণ রাখা উচিত যে, আরবী ভাষায় কালব্, ফুয়াদ ও স্দর – এই শব্দগুলো যখন এ ধরনের জায়গায় ব্যবহার করা হয়; যেমন এখানে করা হয়েছে, তখন এর দ্বারা মানুষের অভ্যন্তরীণ দিকটি বুঝানো হয়ে থাকে। (অর্থাৎ চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিগত অনুভূতি, উচ্ছ্বাস, স্নেহপ্রবণতা, স্বভাব, চরিত্র, অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি ইত্যাদি)। এর দ্বারা সেই অংগ বুঝানো হয় না, যা ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্তর ও বক্ষ হিসাবে পরিচিত।

(গ) হিদায়ত (হুদা) অর্থাৎ কুরআন হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্য একটি হিদায়াত বা পথপ্রদর্শক।

(ঘ) মুমিনদের জন্য রহমত (রাহমাতুল লিল মুমিনীন)।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস-স্থাপনকারীদের জন্য কুরআন হচ্ছে একটি রহমতের পয়গাম। এটা জুলুম-অত্যাচার, পাষাণতা এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ থেকে বিশ্বাসীকে মুক্তি দেয়। অন্তর পরিপূর্ণ করে দেয় দয়া, ভালবাসা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা।

শুধু ঘোষণা নয়, দলীলও বটে

এটা শুধু কুরআনের গুণাবলীর দাবীমূলক ঘোষণাই ছিল না, বরং এর সত্যতার সর্বাধিক প্রভাবশালী দলীলও ছিল। যদি কোন ব্যক্তি দাবী করে যে, সে চিকিৎসক তাহলে তার এই দাবী যাঁচাই করার সব চাইতে সহজ ও মোক্ষম পন্থা হলো, তার চিকিৎসায় রোগীরা আরোগ্য লাভ করে কিনা, তা নিরীক্ষণ করা। কুরআনও বিভিন্ন স্থানে তার অস্বীকারকারীদের সামনে এই যাচাইয়ের চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে। কুরআন বলেছে, আমি আরোগ্য লাভের ব্যবস্থাপত্র। এর প্রমাণস্বরূপ সে মু'মিন এবং মুত্তাকীদের একটি দল পেশ করেছে, যারা তারই আরোগ্যনিকেতনে তৈরী হয়েছে। আজো তার এই দলীল ঠিক সেরূপ মোক্ষম, যেরূপ মোক্ষম ছিল তার অবতরণকালীন সময়ে। জাহিলিয়া যুগের আরবের অধিবাসীরা, যারা ছিল আত্মা ও হৃদয়ের মারাত্মক রোগী, তাদের মধ্য থেকে যে কুরআন আবূ বরকর, উমর, আলী, খালিদ, সালমান, আবূ যর (রা) প্রমুখের মত সুস্থ-সবল আত্মার অধিকারী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছিল, সেই নিরাময় ব্যবস্থাপত্রে কি কোন সন্দেহ করা যেতে পারে ?

সরল পথ ও সরল দ্বীন

পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে – إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ – "এই কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ করে।"

কুরআন তার যে সব গুণাবলী বর্ণনা করেছে, তার মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণতার অধিকারী গুণ এই যে, জীবন এবং সৌভাগ্যের পথ প্রদর্শনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে সহজ থেকে সহজতর পন্থা অবলম্বন করেছে। তার পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কোথাও কোন বক্রতা, তেড়ামি, ঘোরপ্যাঁচ, বাড়াবাড়ি কিংবা ঔদাসিন্যের নামগন্ধও নেই। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় 'সিরাতে মুসতাকীম' (সৎপথ) ও 'দ্বীনে কাইয়িম' (সরল দ্বীন) দ্বারা এই হাকীকতকেই সর্ব সমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামের দা'ওয়াত - ৩

দ্বীনে হক্ (সত্য দ্বীন)-এর তিনটি মৌলিক নীতি

পবিত্র কুরআনের সূরা আরাফে বলা হয়েছে –

قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ .

"বলো, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায় বিচারের। তোমরা তোমাদের প্রত্যেক সালাত (ইবাদতে) লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তারই আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে।" (৭ ঃ ২৯)

এই আয়াতের মধ্যে 'দ্বীনে হক' তথা সত্য ধর্মের তিনটি বুনিয়াদী আদর্শ পরিস্কার ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো[১] আমল তথা ক্রিয়াকর্মে মধ্যপন্থা অবলম্বন,[২] ইবাদতে মনোনিবেশ এবং[৩] বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্র আনুগত্য। এই আয়াত তাওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্বের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি। দ্বীন পালন করতে গিয়ে আল্লাহ্কে বিশুদ্ধ চিত্তে ডাক। অর্থাৎ দ্বীনের যত কাজকর্ম আছে তা শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কর।

'খাল্ক' (সৃজন) এবং 'আমর' (নির্দেশ) উভয়ই আল্লাহরই সত্তাগত গুণ। অর্থাৎ তিনি অস্তিজগতের সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁরই নির্দেশ ও ক্ষমতাগুণে সে জগত পরিচালিত হচ্ছে।

লোক দেখানোর জন্য দান

লোক দেখানোর জন্য দান করা একেবারে মূল্যহীন। যে ব্যক্তি পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে নয়, বরং যশ ও সুনাম অর্জনের জন্য দান-খয়রাত করে এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে মানুষের কাছে নিজের গৌরব বৃদ্ধি করতে চায়, নিশ্চিত সে আল্লাহ্কে সত্যিকার বিশ্বাস করে না। এ ধরণের দান-খায়রাত থেকে মানুষকে রুখে রাখা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত লুকিয়ে-ছাপিয়ে খয়রাত না করতে পারে, ততক্ষণ খয়রাতই করো না। কিংবা এর অর্থ এই নয় যে, লুকিয়ে খয়রাত করার ব্যাপারটি স্বয়ং পুণ্যকর্ম সম্পাদনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। (দান-খয়রাতের ব্যাপারটি যদি লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর হয় এবং এমতাবস্থায় লুকিয়ে রাখা না হয় তাহলে ধীরে ধীরে তা লোক দেখানো তথা প্রদর্শনীর কারণে পরিণত হয়। যদি নিয়ত পবিত্র হয় এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে যে কোন মানুষের সামনেও দান-খায়রাত করা অসমীচীন নয়। বরং কোন কোন সময় প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করলে অপরাপর লোকের জন্য তা উৎসাহ উদ্দীপনার কারণে পরিণত হয়। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, লোক দেখানো ও প্রদর্শনী দ্বারা দান-খয়রাতকারীর মনের আয়নাটি যেন ধূলিখূসরিত হয়ে না পড়ে।)

দান-খয়রাতের নামে অভাবগ্রস্তকে অকেজো ও রদ্দি জিনিস দান করো না। যদি তোমাকে এ ধরণের জিনিস দেওয়া হত তাহলে তুমি কি এটা পছন্দ করতে?

ভালবাসা ও সহানুভূতির চাহিদা

পুণ্যের পথে ব্যয় করার আগ্রহ বর্ধিত ও বিকশিত হতে পারত না, যদি না এ সম্পর্কে নির্দেশ প্রদানের সময় ব্যয়কারীকে এমন সব কাজ থেকে বিরত রাখা হত, যে সব কাজ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই প্রেক্ষাপটেই 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ্' (আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা)-এর আদেশ প্রদানের সাথে সাথে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

'দ্বীনে হক' মানুষের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করতে চায়। দান-খয়রাতের নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যাতে প্রত্যেকটি মানুষ অপরের অভাবকে নিজেরই অভাব বলে মনে করে। সুদখোরের মনোবৃত্তি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে চায় অন্যের দারিদ্র্য ও অভাবের সুযোগে নিজের স্বার্থ হাসিল করতে এবং অভাবগ্রস্থকে নিজের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির উৎসে পরিণত করতে। (প্রকৃত পক্ষে সুদখোরের অন্তরে মানব-প্রেম তথা মানুষের প্রতি দয়া-ভালবাসা ও সহানুভূতির লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না)

মুমিন, আশা ও বিশ্বাস

পবিত্র কুরআন এ তত্ত্বটি অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বার বার ঘোষণা করেছে যে, ঈমান মানে আশা ও বিশ্বাস এবং কুফ্র মানে সন্দেহ ও নৈরাশ্য। পবিত্র কুরআন বার বার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছে ঃ নিরাশ হয়ো না, অন্তরে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখ এবং যে কোন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্র নি'মাত ও সৌভাগ্যের আশা রাখ। প্রকৃত পক্ষে এটাই হচ্ছে ঈমানের চাহিদা এবং এটাই হচ্ছে জীবনের মুল উৎস। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় শান্তি, মঙ্গল ও সাফল্য।

যে মানুষ আশা ও বিশ্বাসের স্থলে সন্দেহ ও নৈরাশ্যের পথ অবলম্বন করে-চাই তা ইহজীবনের জন্য হোক আর চাই পরজীবনের-তার জীবিত থাকা তথা মানব জীবন লাভের কোন স্বার্থকতা নেই। তার সামনে এছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই যে, সে গলায় ফাঁস পরে নিজের জীবনকে নিজেই চিরতরে খতম করে দেবে।

ঈমান আশারই অপর নাম। আর মুমিন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে কখনো নৈরাশ্যের ধার ধারে না। জীবনের বিপদ বাধা তাকে যতই পর্যুদস্ত করুক, সে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাবেই। পদস্খলন ও অসদাচরণের ফাঁদে সে যতই আটকা হোক, বরাবর আল্লাহ্র দরবারে তাওবা করতেই থাকবে। সে না দুনিয়ার সাফল্যে নিরাশ হতে পারে, আর না আখিরাতের পবিত্রাণে। কেননা, সে জানে যে, দুনিয়ার নৈরাশ্য মৃত্যু এবং আখিরাতের নৈরাশ্য দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছু নয়। সে উভয় জায়গায়ই আল্লাহ্র রহমত প্রত্যক্ষ করে এবং তার করুণার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়-

لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" -(৩৯-৫৩)

সত্যকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা

বৃষ্টি থেকে শুধুমাত্র সেই জমিই উপকৃত হতে পারে, যে জমির মধ্যে পানি টেনে নেওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। অনুরূপভাবে হিদায়াত থেকেও ঐসব আত্মা সঞ্জীবিত হতে পারে, যার মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রয়েছে। যারা এই ক্ষমতা বা যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাদের কপালে রয়েছে শুধু বঞ্চনা, লাঞ্ছনা আর বিফলতা।

সত্য গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ, কৃত্রিম ও মনগড়া মাহাত্মের উপর গর্ববোধ এবং বংশগত আভিজাত্যের কাছে নতি স্বীকার। মানুষ প্রথমে নিজে থেকে কিছু বিশ্বাস গড়ে নেয়। এরপর জনসাধারণ সেটাকে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত অনুসরণ ও অনুকরণ করার পর যখন তা একটি পবিত্র রীতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে তখন তার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে জনসাধারণের মনেও কোন সন্দেহ-সংশয় আর বাকি থাকে না এবং তখন এক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিবেকের কোন হস্তক্ষেপও আর চলে না। পবিত্র কুরআন এটাকে 'পিতৃপুরুষদের সৃষ্ট নাম' আখ্যা দিয়েছে। যেমন বলা হয়েছে—"যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ।" –(১২ ঃ ৪০)

মোটকথা, ঐ সব জিনিস 'মনগড়া নাম' ছাড়া কিছু নয় বিধায় বিবেক-বৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চোখে এগুলোর কোন মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না।

ইসলামী দাওয়াতের তিনটি বৈশিষ্ট্য

সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ لا وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۔

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইন্‌জীল, যা তাদের কাছে আছে, তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃঙ্খল (কঠিন বিধানাবলী যা পূর্ববর্তী শরীআতে ছিল অথবা পরাক্রমশালী শত্রুর অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃংখল) হতে, যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁকে সম্মান করে,তাঁকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।" – (৭ ঃ ১৫৭)

উপরোক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর দা'ওয়াতের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। যথা– (১) তিনি সৎকার্যে নির্দেশ দেন ও অসৎকার্যে বাধা দেন।

(২) তিনি পবিত্র বস্তুসমূহের ব্যবহার বৈধ করেন এবং অপবিত্র বস্তুসমূহের ব্যবহারে বাধা দেন। পবিত্র কুরআন এই অর্থেই "তাইয়িবাত' (পবিত্র বস্তু) ও 'খাবায়িছ' (অপবিত্র বস্তু) শব্দ ব্যবহার করেছে।

(৩) যে বোঝা আহলে কিতাবদের উপর পতিত হয়েছিল এবং যে ফাঁদে তারা আটকা পড়েছিল, তিনি তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করে দেন।

কি ছিল সেই বোঝা এবং কি ছিল সেই ফাঁদ, যা থেকে আহলে কিতাবদেরকে মুক্ত করা হয়েছিল – কুরআন অন্যত্র এর পরিস্কার ব্যাখ্যা দিয়েছে। ধর্মীয় নির্দেশাবলীর অযথা বাড়াবাড়ি, ধর্মীয় জীবনের কঠিন বাধ্যবাধকতা, অবোধগম্য আকীদা-বিশ্বাসের বোঝা, কল্পনা পূজারীদের সীমা লংঘন, আলিম ও ফকীহ্‌দের অনুকরণের বেড়ী, ধর্মীয় নেতাদের আনুগত্যের শৃংখল ইত্যাদি থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দা'ওয়াত মানুষকে মুক্ত করে দিয়েছে এবং তিনি সত্যের এমন সহজ-সরল পন্থা বাতলে দিয়েছেন, যার মধ্যে বুদ্ধি-বিবেক খাটানোর ক্ষেত্রে কোন বোঝা এবং আমল করার ক্ষেত্রে কোন কষ্টসাধ্যতা থাকেনি।

উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যসমূহ

কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

১। কুরআনের মতে কোন একটি দলের মুসলমান হওয়ার আমালী (কার্যগত) পরিচয় হচ্ছে দু'টি। যথা – (১) সালাত কায়িম করা ও (২) যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। যে দল এই দু'টি কাজ ছেড়ে দেবে, তারা (কার্যত:) মুসলমান বলে গণ্য হবে না। যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব হুকুমত (রাষ্ট্র) গ্রহণ করবে। যদি হুকুমত না করতে পারে কিংবা কোন জায়গার মুসলমান, আল্লাহ্ না করুন, অন্য কোন জাতির অধীনস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তারা নিজেরাই আপসের মধ্যে যাকাত ব্যবস্থা কায়েম করবে।

২। ভদ্রতা ও আভিজাত্যের কোন গতানুগতিক স্তর বিন্যাস থাকবে না। ঐ ব্যক্তি অভিজাত বলে গণ্য হবে, যে ঈমান ও আমালের ক্ষেত্রে অগ্রণী।

৩। কুরআনের মতে মানুষের মধ্যে ঐ সব লোকেরাই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যারা ঈমান ও সত্যানুসরণের পথে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে। যাদেরকে গতানুগতিক পুণ্যকর্মে কিংবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন প্রদর্শনী মূলক কাজে লিপ্ত দেখা যায়, তারা কখনো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নয়।

৪। মুমিন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার ঈমানী ভালবাসার উপর পার্থিব ভালবাসা কখনো জয়ী হতে পারে না।

৫। একটি জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত জীবনে এবং বিজয় ও সাফল্যের পথে এটাই হচ্ছে সব চাইতে ভয়ংকর প্রতিবন্ধকতা যে, তাদের মধ্যে সন্দিগ্ধমনা ও কপটাচারী ব্যক্তির অস্তিত্ব রয়েছে।

৬। হক ও সত্যের যে কারবার, তার পরিপূর্ণ সাফল্য কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না। ব্যক্তি তো এজন্য যে, সে বীজ বপন করবে। বাকি রইল পাতা ও ডালপালা গজানোর ব্যাপারটি। হতে পারে, তার জীবনকালেই এসব কিছুর আত্মপ্রকাশ ঘটবে – আবার এও হতে পারে যে, কিছু জিনিসের আত্মপ্রকাশ ঘটবে তার মৃত্যুর পর। এতে কিন্তু সত্যের কারবারের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়ে না।

৭। কোন বস্তুর হারাম অথবা হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে কুরআনের চারটি নীতি কার্যকর। যথা ঃ

(ক) প্রত্যেক জিনিসই মুবাহ। হ্যাঁ যেটাকে 'ওহীয়ে ইলাহী' নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তা হারাম।

(খ) আল্লাহ্র শরী'আত যে কোন বস্তুকে হারাম করার অধিকার রাখে।

(গ) শুধুমাত্র নিজের রায় ও অনুমান দ্বারা কোন বস্তুকে হারাম ঘোষনা করা 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন' তথা তার অপবাদ রটনা ছাড়া কিছু নয়।

(ঘ) মানুষের আকীদা-আমলের ভিত্তি অনুমান বা ধারণা-কল্পনার উপর নয়; বরং জ্ঞান ও বিশ্বাসের উপর হওয়া উচিত।

উপদেশ ও কর্মের বিধান প্রদান

নবীর কাজ হচ্ছে উপদেশ প্রদান, তাবলীগ (প্রচার), সুসংবাদ দান এবং ভয় প্রদর্শন। তিনি হচ্ছেন দায়ী (আল্লাহর প্রতি আহবানকারী) এবং উপদেশদাতা। কিন্তু ধর্মবিধায়ক বা দারোগা নন যে, জবরদস্তি করে কাউকে কোন পথে টেনে নিয়ে যাবেন, এরপর সেখান থেকে বের হতে দেবেন না। যেমন

কুরআনে সূরা ইউনূসে ঘোষণা করা হয়েছে–

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۔

"এবং আমি তোমাদের কর্ম বিধায়ক নই।" – (১০ ঃ ১০৮)

সূরা কাফে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে –

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۔

"আপনি ওদের উপর জবরদস্তীকারী নন।" – (৫০ ঃ ৪৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে –

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ .

"আপনি ওদের কর্মবিধায়ক নন।" – (৮৮ ঃ ২২)

আরো বলা হয়েছে –

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ .

"আপনার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।" – (১৩ ঃ ৪০)

কুরআন পরিস্কার বলে যে, আল্লাহ্‌র রাসূলগণের দায়-দায়িত্ব উপদেশ ও প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এমতাবস্থায় যে, তারা ছিলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট। অতএব অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে এটা কী করে সমীচীন হবে যে, সে মানুষের কর্মবিধায়ক ও জবরদস্তীকারীরূপে আবির্ভূত হবে?

উপদেশ ও প্রচার এবং তা পসন্দ ও গ্রহণ

প্রকৃতপক্ষে মানবীয় আমালের প্রত্যেকটি প্রান্তের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে তার সীমাসমূহ। প্রতিটি স্থলে মানুষ এখানেই আছাড় খেয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসের যে সীমা রয়েছে, মানুষ তার মধ্যে আটকে থাকতে চায় না।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের দুটি হক রয়েছে এবং এ উভয়টিকেই আপন আপন সীমার মধ্যে রাখতে হবে। একটি হচ্ছে আদেশ ও প্রচারের হক এবং অপরটি হচ্ছে পসন্দ ও গ্রহণের হক। প্রত্যেক মানুষের এ হক রয়েছে যে, সে যে জিনিসকে সঠিক বলে মনে করে, সেটা অন্যকেও যেন বুঝায়। কিন্তু তার এ হক বা অধিকার নেই যে, এক্ষেত্রে সে অন্যের অধিকারকে অস্বীকার করবে। অর্থাৎ একথা তার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, যেভাবে একটি কথা মানা না মানার অধিকার তার নিজের রয়েছে, সেভাবে অন্যেরও একথা মানা না মানার অধিকার রয়েছে এবং এক মানুষ অন্য মানুষের কোন কাজের জন্য দায়ী নয়।

মানব ইতিহাসকে বারশ বছর পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়েছে যে, একজন মানুষ অপর একজন মানুষকে শুধুমাত্র আকীদা-বিশ্বাসের মতানৈক্যের উপর ভিত্তি করে যেন হত্যা না করে। তারা একথাটি বুঝতে দীর্ঘদিন কাটিয়ে দিয়েছে যে, উপদেশ দান ও কর্মবিধান নিরূপণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাম্প্রতিক দেড় শ বছর থেকে একথা বিশ্ববিবেকের কাছে একটি স্থিরিকৃত বিষয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু বিশ্ববাসী একথা জানে না যে, এই সিদ্ধান্ত-ঘোষণার ইতিহাসের সূচনা আমেরিকা ও ফ্রান্সের মানবীয় অধিকার সংরক্ষণ ঘোষণা দ্বারা হয় নি, বরং এর সূচনা হয়েছে তারও বার শ বছর পূর্বে – পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে।

ভয় ও দুঃখ

আহলে ঈমান তথা ঈমানধারীদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআন যা কিছু বলেছে, তার মধ্যে একথার চাইতে পরিস্কার আর কোন কথা নেই যে, মুমিনদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। কুরআনের বেশ কয়েকটি জায়গায় একথার উল্লেখ রয়েছে। যেমন – لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ –"তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" – (৪১ ৩০)

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানব জীবনের সৌভাগ্যের জন্য এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। অনুরূপভাবে তার যাবতীয় দুর্ভাগ্যও এ দুটি শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। ভয় ও দুঃখ – এ দু'টি জিনিস থেকে মানুষ যখন পরিত্রাণ পায় তখন যাবতীয় সৌভাগ্য তার হাতের মুঠোয় এসে যায়। জীবনে যত রকমের কাঁটা হতে পারে একটি একটি করে সবগুলোকে একত্রিত করে – চাই তা দেহের মধ্যে গেঁথে থাক, চাই মস্তিষ্কের মধ্যে, চাই তা

বর্তমান জীবনের শান্তিকে বিনষ্ট করুক, আর চাই আখিরাতের জীবনের শান্তিকে – তুমি দেখতে পাবে কোন কিছুই এ দুটি জিনিস থেকে বাইরে নয় – হয় তা ভয়ের কাঁটা, নয়ত দুঃখের। পবিত্র কুরআন বলে, ঈমানের পথ সৌভাগ্যের পথ। যে ব্যক্তি এই পথে নিজের পদদ্বয়কে সুদৃঢ় করে রাখতে পেরেছে তার জন্য এ উভয় কাঁটাই ' বে আছর' তথা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তার জন্য না কোন প্রকারের আশংকা থাকে, আর না কোন প্রকারের দুঃখ-যাতনা।

বুদ্ধি ও বুদ্ধি-বহির্ভূত

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ব্যবহার ছাড়া কোন কথাকে মেনে নেওয়া কিংবা শুধুমাত্র অনুমানের উপর ভিত্তি করে কোন কথাকে অস্বীকার করা – কুরআন এ দুটি পন্থাকেই অসমীচীন ও অসঙ্গত বলে মনে করে। যদি চিন্তা কর তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে, এ ব্যাপারটি হচ্ছে ভ্রষ্টতার মূল উৎস। হয় সে বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে এই পরিমাণ আনাড়ী হয়ে পড়েছে যে, প্রত্যেকটি কথাকেই না বুঝে মেনে নেয় এবং প্রতিটি পথেই চোখ বন্ধ করে চলতে থাকে কিংবা সে তার বুদ্ধি-বিবেচনাকে ভ্রান্ত পথে ব্যবহার করে। এমতাবস্থয় যেখানে কোন বিষয় তার বিবেক-বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায়, সেটাকে সে অস্বীকার করে বসে। এভাবে কোন বস্তুর অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের ব্যাপারটি একটি বিশেষ ব্যক্তির বুদ্ধি-বিবেচনার মধ্যেই আটকা পড়ে যায়।

অবস্থা দু'টি এবং এতদুভয়ের হুকুম এক নয়। একটি অবস্থা হল, কোন কথা তোমার বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী। আর অপরটি হলো তা তোমার বুদ্ধি বহির্ভূত। অনেক বিষয় এমন হতে পারে, যার পরিসীমা তোমার বুদ্ধি নির্ধারণ করতে পারে না। এমতাবস্থায় তুমি এ সিদ্ধান্ত নিতে পার না যে, তা তোমার বুদ্ধির বিপরীত। প্রথমত: মানুষের বুদ্ধিগত শক্তি সমান নয়। দ্বিতীয়ত: মানবিক বুদ্ধি সর্বদা বিকাশ লাভ ও উন্নতির অবস্থায় থাকে। একটি যুগের মানবিক বুদ্ধি সেসব কথাকে স্বীকার করে নিতে পারে না, অপর যুগে সে সব কথাই বুদ্ধিগত স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়। তৃতীয়ত: মানবিক বুদ্ধির অনুভূতি একটি বিশেষ সীমা থেকে আগে বাড়তে পারে না। আর এটা বুদ্ধিরই সিদ্ধান্ত যে, কোন জিনিসের হাকীকত ও সারবত্তা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায় না।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের চরিত্রগত সাম্য

পবিত্র কুরআন পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই উল্লেখ সমান মর্যাদা সহকারে করেছে। ফযীলত ও প্রকৃষ্টতার দিক দিয়ে সে উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করে নি। কুরআন সূরা নিসার মধ্যে যেখানে নারী পুরুষের বৈবাহিক জীবনের হুকুম-আহকামের ব্যাখ্য প্রদান করা হয়েছে, সেখানে একথাও পরিস্কার ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, ফযীলত ও মান-মর্যাদার দিকদিয়ে তারা সমান্তরালভাবে আপন আপন পথ ধরে চলেছে। অন্য কথায় তাদের জন্য একই ধরনের প্রকৃষ্টতার দরজা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে –

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ط

"পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।" – (৪ : ৩২)

কুরআন যেমন পুণ্যবান পুরুষের প্রকৃষ্টতা ও মর্যাদাবলীর বর্ণনা দিয়েছে তেমনি বর্ণনা দিয়েছে পুণ্যবান স্ত্রীলোকদের মর্যাদাবলীরও। অর্থাৎ যেভাবে পুরুষদের মধ্যে মুসলিম ও মুমিন আছে তেমনি স্ত্রীলোকদের মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গকারিণী। পুরুষদের মধ্যে যেমন সাদিক (সত্যবাদী) রয়েছে তেমনি স্ত্রীলোকদের মধ্যেও রয়েছে সাদিকা (সত্যবাদিনী)। যেভাবে পুরুষদের মধ্যে আল্লাহ্ভীরু ও আল্লাহকে স্মরণকারী রয়েছে তেমনিভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ্ভীরু এবং তাঁকে স্মরণকারিণী।

পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য

পবিত্র কুরআন পুরুষদের সম্পর্কে বলেছে –

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ .

"ওরা তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকরী, রুকূ ও সিজদাকারী, সৎকার্যের নির্দেশদাতা, অসৎকার্যে নিষেধকারী এবং আল্লহ্র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী।" – (৯ ঃ ১১২)

আর স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে বলেছে –

مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ .

"আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদতকারী ও সিয়ামপালনকারী।" – (৬৬ ঃ ৫)

মুনাফিকদের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাদের উভয় লিঙ্গেরই উল্লেখ করেছে। যেমন–

اَلْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ .

"মুনাফিক নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ, ওরা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্মে নিষেধ করে।

এরপর বলে –

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتٰتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقٰتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمٰتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظٰتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا :

"অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়ামপালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী—এদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।" – (৩৩ ঃ ৩৫)

চিন্তা করে দেখ, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে গুণের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃষ্টতার ক্ষেত্রে নেই কোন বৈষম্য। গৌরব অর্জনের ক্ষেত্রেও নেই কোন ভেদাভেদ। এরপর এটা কি করে সম্ভব যে, যে কুরআন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের চারিত্রিক সাম্যকে এভাবে একই সমতলে রেখেছে, সে কি কখনো এ ফয়সালা দিতে পারে যে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের মুকাবালায় অধিকতর মন্দ স্বভাবের।

সবর ও শুক্‌র

সবর বা ধৈর্যের অর্থ হচ্ছে নানা প্রতিকূলতা ও বিপদ-বাধার মধ্যে নিজেকে সুদৃঢ় ও অবিচলিত রাখা। আর শুক্‌র বা কৃতজ্ঞতার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য এবং নি'মাত সমূহেকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান ও যথার্থভাবে সেগুলোকে কাজে লাগানো। আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত নীতি এই যে, যে জাতি (নানা প্রতিবন্ধকতা ও বিপদবাধার মধ্যে সুস্থির ও সুদৃঢ় থাকে এবং) আল্লাহ্‌র দেওয়া নি'মাতসমূহকে যথার্থ মর্যাদা দান করে এবং সেগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আরো অধিক নি'মাত দান করেন। কিন্তু যারা নি'মাত সমূহকে অস্বীকার করে (কৃতঘ্নতার পরিচয় দেয়) অর্থাৎ সেগুলোকে যথার্য মর্যাদা দেয় না; তারা বঞ্চনা ও বিফলতার শিকারে পরিণত হয়। আর এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সেই কঠিন আযাব, যা কোন মানব গোষ্ঠির উপর পতিত হয়ে থাকে।

চিন্তা করে দেখ, এটা হচ্ছে বাস্তব অবস্থার একটি সত্যিকার রূপ। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আল্লাহ্ প্রদত্ত নি'মাতসমূহকে যথার্থ মর্যাদা দান করে – যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যে সাফল্য ও কৃতকার্যতা দান করেছেন সেটাকে সে অনুভব করে, যথাযথভাবে কাজে লাগায় এবং তার হিফাযত থেকেও গাফিল হয় না, সে আরো বেশী নি'মাত লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। আর যে অনুরূপ করে না, তার বিফলতা ও ধ্বংস যে অনিবার্য, সে সম্পর্কে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

সম্পদ অর্জন ও সম্পদ খরচ

প্রত্যেক মানুষের মানসিক ও দৈহিক যোগ্যতা একরূপ হয় না। এ কারণেই জীবন ধারণের উপাদানাদি করায়ত্বের ব্যাপারে তাদের মধ্যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ অর্থোপার্জনের অধিকতর সুযোগ পায়, আবার কেউ পায় না। প্রথমে তো ক্ষমতার ক্ষেত্রে মুকাবালা হয়। এক্ষেত্রে সবল দুর্বলকে হারিয়ে দেয়। অথবা মুকাবালা হয় মানসিক ক্ষেত্রে। আর এক্ষেত্রে অধিকতর মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে পরাজিত করে।

কুরআনও এ বিষয়টি অস্বীকার করে না যে, সামর্থ্যের দিক দিয়ে সব মানুষের অবস্থা এক নয়। কিন্তু সে একথা বরদাশত করতে রাজী নয় যে, জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অসাম্য বিরাজ করুক। অর্থাৎ কেউ তা লাভ করুক এবং কেউ তা থেকে বঞ্চিত থাকুক। কুরআনের মর্মবাণী হলো, যে মানুষই দুনিয়াতে জন্মলাভ করেছে, দুনিয়ার মাল-আসবাব এবং দুনিয়ার রিয্‌ক থেকে অংশ প্রাপ্তির ব্যাপারে সে সমান হকদার।

প্রকৃতপক্ষে কুরআনের এই নীতির ব্যাপারে যে মৌলিক আদর্শটি কাজ করছে তা হলো, সে (কুরআন) মানবজাতির বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে একে অপর থেকে পৃথক এবং আলাদা বলে স্বীকার করে না। বরং সে সবাইকে একই পরিবারের সদস্য বলে মনে করে। আর এই সব সদস্য, যারা আপসে একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত তারা প্রত্যেকটি অবস্থায় একে অন্যের অংশীদার।

কুরআনের মতে, অর্থোপার্জনের অধিকার, ব্যয় করার দায়িত্বের সাথে ওতপ্রোত। এগুলোর একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য। তাই একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করা যাবে না। এখানে অর্থোপার্জনের অর্থ হচ্ছে ব্যয় করার (দান করার) দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নেওয়া। তোমরা যে পরিমাণ অর্জন করতে পার কর, বরং অধিক থেকে অধিকতরই কর। কিন্তু একথা ভুলে যেয়ো না যে, অধিক থেকে অধিকতর অর্জন অধিক থেকে অধিকতর দান করারই নাম। ইসলামের মতে, ব্যক্তির হাত অর্জনের জন্য। তাই সে অর্জন করবে; কিন্তু সে অর্জনকে ব্যয় করার অধিকার শুধু ব্যক্তির নয় বরং গোষ্ঠীরও।

মোট কথা, অর্থনীতির সাথে কুরআনের যে পরিমাণ সম্পর্ক রয়েছে তাতে সে সম্পদ অর্জনের ব্যাপারটি সম্পদ ব্যয় করার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। যদি অর্জনকারী ব্যয় (দান)-কে অস্বীকার করে তাহলে তার সম্পদ অর্জন

বৈধ বলে স্বীকৃত হবে না। যে উপার্জন শুধুমাত্র উাপার্জনের জন্য, যে উপার্জনের জন্য ব্যয়ের (দানের) দরজা খোলা হয় না, কুরআনের দৃষ্টিতে সে উপার্জন অবৈধ, অস্পৃশ্য এবং শাস্তিযোগ্য।

কুকর্মের বৃহৎ কেন্দ্র

ব্যক্তিগত জীবনে কুকর্মের বৃহৎ উৎস হচ্ছে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন। স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের অবস্থা এমন একটি অবস্থা যে, তা যদি কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তার লাভ করে থাকে তাহলে ঐ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এর চাইতে বড় কল্যাণ আর কিছু নেই। আর যদি এই স্বাচ্ছন্দ্য শুধুমাত্র ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তাদের জন্য এর চাইতে বড় অঘটনও আর কিছু নেই। কেননা সম্পদ যখন ব্যক্তি বিশেষের কবজায় চলে যায় তখন আমাদের অবশিষ্ট লোকেরা বঞ্চনার শিকারে পরিণত হয়। তখন স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক ধরনের প্রাধান্য গোটা কয়েক লোকের হাতে চলে যায় এবং এমনি ধরনের প্রাধান্যের পরিণাম ঘৃণিত অহংকার এবং ন্যায় ও সত্য থেকে ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ারই নামান্তর (এই অবস্থার দুঃখজনক দৃশ্য আজ বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে বিদ্যমান)।

এ কারণেই কুরআন যে সমষ্টিগত স্বাচ্ছন্দ্যকে আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় অবদান আখ্যা দিয়েছে – সেটা যদি ব্যক্তি বিশেষের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে তাহলে সেটাকে 'ফিত্না' (পরীক্ষা) ও 'মাতায়ে গুরূর' (ছলনাময় ভোগ) আখ্যা দিয়ে থাকে।

আজ সারা বিশ্বে এ আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে যে, ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ দুনিয়ার জন্য একটি বিপদ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু কুরআন আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে এটাকে ফিত্না আখ্যা দিয়েছে এরজন্য 'ইকতিনায' (পুঞ্জীভূত করণ) শব্দ ব্যবহার করেছে। যেমন -

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ .

"আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভুত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না ওদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সংবাদ দাও।"–(৯ : ৩৪)

মুশকিলের কথা হলো, যতক্ষণ কুরআনের আওয়াজ কুরআনের আওয়াজ হিসাবে থাকে ততক্ষণ তা তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু যখন ঐ কথাই সময়ের চাহিদা অনুযায়ী মানুষের মন-মানসিকতায় আলোড়নের সৃষ্টি করে তখন সংগে সংগে তোমরা এটাকে পূজা করতে শুরু কর। [তরজমানুল কুরআন থেকে সংকলিত]

ইসলামের দাওয়াত-৪

মর্যাদা ও সাফল্য অর্জনের পন্থা

সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে -

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَايَسْمَعُوْا ط وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَايُبْصِرُوْنَ . خُذِالْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ .

"যদি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করেন তবে তারা শ্রবণ করবে না এবং আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে; কিন্তু তারা দেখে না। আপনি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা করুন।" – (৭ ঃ ১৯৮)

দেখুন, মাত্র কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে কী চমৎকার পদ্ধতিতে মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান এবং কী সুন্দরভাবে প্রকৃষ্টতা ও সাফল্যের যাবতীয় পন্থাদি বলে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন, সৎকাজের নির্দেশ ও অজ্ঞদের উপেক্ষা করা অর্থাৎ অবুঝদের নির্বুদ্ধিতাকে ক্ষমা করা, পুণ্যের আহবানে আত্মনিয়োগ করা এবং মূর্খদের মূর্খতাকে উপেক্ষা করা– এমন তিনটি আদর্শ, যার মধ্যে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নিহিত রয়েছে। ভাসা ভাসা চিন্তা করলে হবে না। গভীরভাবে বার বার চিন্তা করে দেখুন। এ সত্যটি আপনার চোখে অবশ্যই ধরা পড়বে।

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা আপনাকে দেখে না। যদি দেখত তাহলে আপনাকে কখনো অস্বীকার করত না। একটি দেখা ছিল সালমান ফারসীর – যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রথম দৃষ্টিতে দেখেই চীৎকার দিয়ে বলে উঠেছিলেন -

والله ماهذا الوجه كذاب .

"আল্লাহ্র কসম, এই চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চোহারা হতে পারে না।"

আর এক দেখা ছিল আবু জেহেলের, যে রাসূরলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে বলত–

مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ .

"এ কেমন রাসূল, যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে।" – (২৫ ঃ ৭)

সত্তা ও গুণাবলী

আল্লাহ্র অস্তিত্বের উপর বিশ্বাসই হচ্ছে মানব স্বভাবের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান। পশুত্বের স্তর অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য উর্ধ্বগমনের একটি লক্ষ্যস্থল থাকা চাই।

আর সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার প্রচেষ্টা এমন একটি ধারণা ছাড়া সফল হতে পারে না, যা কোন না কোন আকারে তার সামনে আসবে। কিন্তু মুশকিলের কথা হলো, 'মুতলাক' (ABSOLUTE, আপেক্ষিক নয়, এমন) -এর ধারণা ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে আসতে পারে না; যতক্ষণ না সে ইতবিচক গুণাবলী নির্ধারণের কোন না কোন ঘোমটা দ্বারা নিজের চেহারাকে ঢেকে না নেয়। এ কারণেই পবিত্র কুরআন (আল্লাহ্‌র গুণাবলী বর্ণনা) যে পন্থা অবলম্বন করে তা একদিকে তো 'তানযিয়াহ' ('তানযিয়াহ' এর লক্ষ্য এই যে, যে পর্যন্ত মানবিক বুদ্ধি কুলায় সে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা থেকে পবিত্র বা ঊর্ধ্বে রাখা)-কে পরিপূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়, অন্যদিকে তেমনি 'তা'তীল' [তা'তীল'-এর অর্থ হচ্ছে 'তানযীহ'-এর মানা' ও 'নাফী' (না সূচকর্তা) ওক সেই পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া, যেখানে মানবীয় চিন্তার ধারণার জন্য কোন কথা বাকি না থাকে। পবিত্র কুরআনের গুণাবলীর ধারনা 'তানযীহ' এর পরিপূর্ণতা বটে, কিন্তু 'তা'তীল'এর সূচনা নয়। এভাবে কুরআন 'তাশবীহ' এরও মূলোৎপাটন করেছে।] থেকেও ধারণাকে পবিত্র রাখে। সে এক এক করে সম্পূর্ণ গুণাবলীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে, কিন্তু সেই সাথে 'মুশাবাহাত' (সাদৃশ্যতা) কেও পরিপূর্ণভাবে অস্বীকার করে। সে বলে, আল্লাহ্ তা'আলা সৌন্দর্য ও অনুপমতার ঐ সব গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত, যা মানবিক চিন্তা-ধারণায় আসতে পারে। তিনি জীবিত, মহাশক্তিশালী ও পরম করুণাময়। কিন্তু সে এগুলোকে এমন পরিস্কার ও স্বাভাবিক ভাষায় বর্ণনা করে যে, তা শুনে অনায়াসে যে কেউ বুঝতে পারে যে, এ ক্ষেত্রে তাঁর সাথে তুলনীয় এমন কোন বস্তু নেই, যা মানুষের ধারণায় আসতে পারে। অন্য কথায় তিনি অতুলনীয়।

অসহায়ত্বের একটি মাত্র সমাধান

মোটকথা, আল্লাহ্‌র ধারণা সম্পর্কে কুরআনের এই বর্ণনাভঙ্গি প্রকৃতপক্ষে এপথের যাবতীয় অসহায়ত্বের একটি পরিপূর্ণ সমাধান। যাবতীয় অস্থিরতা কাটিয়ে এই মনযিলে পৌঁছতে পারলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। এখানে একদিকে হাকীকতের ছাদের উচ্চতা প্রাপ্তি ও বুদ্ধিহীনতার পিছুটান পরিলক্ষিত হয়, অপরদিকে পরিদৃষ্ট হয় আমাদের প্রকৃতির চাহিদা, চাঞ্চল্য ও আমাদের অন্তরের তাগাদা। উক্ত ছাদ এত উঁচু হয় যে, তাতে ধারণার দৃষ্টি ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং অবলোকনের তাগাদা এত চরম যে, কারো 'জালওয়া' (আবির্ভাব, প্রকাশ) সামনে উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত সে শান্তি পেতে পারে না। যদি সে 'তানযীহ'-এর দিকে বেশী ঝুঁকে পড়ে তাহলে 'তা'তীল'-এ গিয়ে পতিত হয়, আর যদি গুণাবলীর প্রামাণ্যতার দৃশ্য অবলোকন করতে করতে বেশী দূরে এগিয়ে যায় তাহলে নিজেকে হারিয়ে ফেলে 'তাশবীহ' ও 'তাজাস্‌সুম'-এর মধ্যে। অতএব পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা এই যে, সে এই উভয় অবস্থার মধ্যে নিজের পদদ্বয়কে সুদৃঢ় ও সুস্থির করে রাখবে– প্রামাণ্যতার আঁচলকেও হাতছাড়া করবে না, আবার 'তানযীহ'-এর লাগামও ঢিলা হতে দেবে না।

মুহকামাত ও মুতাশাবিহাত

কুরআন তার অর্থের দুটি মৌলিক দিক নির্ধারণ করেছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে মুহকামাত এবং অপরটি হচ্ছে মুতাশাবিহাত। মুহাকামাত হচ্ছে সেই কথা বা বাণী, যা মানুষ পরিস্কার বুঝতে পারে এবং যা মানুষের আমালী যিন্দেগীর সাথে সম্পর্কিত। আর এ কারণেই এর একাধিক অর্থ থাকার কোন সম্ভাবনা থাকেনা। আর মুতাশাবিহাত হচ্ছে ঐ সব কথা বা বাণী, মানুষ যার সম্পূর্ণ অর্থ উদ্ধার করতে পারে না যে; শেষ পর্যন্ত এ ছাড়া তার কোন গতি থাকে না যে, একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কূটতর্ক করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। পবিত্র কুনআনে বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ
مُتَشٰبِهٰتٌ ط فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ ج وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ اِلاَّ اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ
يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَايَذَّكَّرُ اِلاَّ اُولُوْ الْاَلْبَابِ .

"তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ; এগুলো কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলো রূপক; যাদের অন্তরে সত্যলংঘন-প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিত্না (বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ, শির্ক, কুফ্র, ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি) এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এটা বিশ্বাস করি, সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত এবং বোধশক্তিসম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।" – (৩ ঃ ৭)

'মুতাশাবিহাত' এর হাকীকত (গূঢ় অর্থ) অনুধাবন করা মানুষের বুদ্ধির নাগালের বাইরে। তবে তা বুদ্ধি-বহির্ভূত ব্যাপার নয়। মানুষ এটাকে বিশ্বাস করতে পারে, তবে এর হাকীকতের নাগাল পেতে পারে না।

অঙ্গীকার পালন ও কুরআন

জাহিলিয়া যুগের আরবরা অঙ্গীকার পালনের চারিত্রিক মর্যাদা ও মূল্যমান সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। তাদের মধ্যে এমন সব ব্যক্তিও ছিলেন, যারা তাদের গোত্রের গৌরবজনক কাজসমূহের তালিকায় সর্বপ্রথম অঙ্গীকার পালনের কথা উল্লেখ করতেন। কিন্তু গোষ্ঠীগত অঙ্গীকারসমূহের যে বিশ্বাসগত দিক ছিল, তাতে তা পালনের উপর সেরূপ কোন আমালী গুরুত্ব বা মর্যাদা প্রদান করা হত না। যেমন, এক গোত্র অন্য গোত্রের সাথে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হত। কিন্তু পরে যখন দেখত যে, তাদের বিরুদ্ধ পক্ষ অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তখন তারা নির্দ্বিধায় বিরুদ্ধ পক্ষের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলত এবং যাদের সাথে তাদের মৈত্রী চুক্তি ছিল তাদের (মিত্র পক্ষের) উপর হামলা করে বসত। তাছাড়া তখন (জাহিলিয়া যুগে) তারা কোন কোন শত্রুপক্ষের সাথে শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদন করত। এরপর যখন দেখত যে, ওদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে, তখন সেই সম্পাদিত চুক্তির কোন পরোয়া না করে তারা সোজা ওদেরকে আক্রমণ করে বসত। এ দুষ্কর্ম থেকে কোন বস্তুই তাদেরকে নিবৃত্ত করতে পারত না।

কুরআন যে ধরনের সততা সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলো, তা নিমিষের জন্যও চরিত্রহীনতাকে বরদাশ্‌ত্ করতে রাজী ছিল না। ইসলাম অঙ্গীকার পালন ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার যে মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে, তা এই পরিমাণ উন্নত, মজবুত ও বিশ্বজনীন যে, মানবিক আমলের কোন একটি প্রান্তও এ থেকে বাদ যেতে পারে না। কুরআন বলে, ব্যক্তি হোক কিংবা গোষ্ঠী হোক, ব্যক্তিগত ব্যাপার হোক অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হোক, পরিচিত হোক অথবা অপরিচিত, স্বজাতীয় ও স্বধর্মীয় হোক অথবা বিজাতীয় ও বিধর্মীয় হোক, বন্ধু হোক অথবা শত্রু হোক, শান্তির অবস্থায় হোক অথবা যুদ্ধের অবস্থায় হোক – কোন অবস্থায় বা কোন পরিবেশেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বৈধ নয়। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা সর্বাবস্থায়ই একটি অপরাধ। আল্লাহ্‌কে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করা তার নাফরমানী ও অবাধ্যতা ছাড়া কিছু নয়। যে অনুরূপ করে সে নিঃসন্দেহে নিজেকে কঠিন শাস্তির যোগ্য বলেই প্রমাণিত করে।

কুরআনী নির্দেশ সমূহ

উপরোক্ত কারণেই কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিশ্রুতি পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কুরআনের যেখানেই মুমিনদের ঈমানী প্রকৃষ্টতার ছবি আঁকা হয়েছে, সেখানেই এগুণটিও উল্লেখযোগ্যভাবে শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। যেমন–

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا ۔

"এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করলে।" – (২ ঃ ১৭৭)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ۔

"এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।" – (২৩ ঃ ৮)

تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ۔

" তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমাদের শপথ ব্যবহার করে থাক, যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও। আল্লাহ তো এটা দ্বারা কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। তোমাদের যে বিষয়ে মতভেদ আছে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবেন।" – (১৬ ঃ ৯২)

অতঃপর অনুরূপ অঙ্গীকার ভংগের উপমা কি? পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে –

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا .

"সেই নারীর মত হয়োনা, যে তার সূতা মজবুত করে পাকাবার পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়।" (১৬ ঃ ৯১)

অর্থাৎ যে উন্মাদিনী সারাদিন সূতা কেটে দিন শেষে সূতাগুলো ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে, শপথ করে যে তা ভংগ করে তার উপমা সেই উন্মাদিনীর মতই। অন্য কথায়, যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোন অঙ্গীকার করে তখন সেটাকে সুদৃঢ় করার জন্য দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চালায় এবং অপর পক্ষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে। যে কথাটি এত চেষ্টার পর সুদৃঢ় করা হল সেটাকে পুনরায় নিজে থেকে ভঙ্গ করাটা কী করে কখনো সমীচীন হতে পারে?

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দয়া ও করুণা গুণ

সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াতে তৎকালীন আরবদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .

" তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি দয়াদ্র ও পরম দয়ালু। এরপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।" – (৯ ঃ ১২৮-২৯)

উপরোক্ত দুটি আয়াতের মধ্যে আরবের ঐ জাতি-বংশকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা তখন ছিল জীবিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তিনি তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি অপর কোন দেশ বা অঞ্চল থেকে তোমাদের এখানে এসে হাযির হন নি। আল্লাহ্র স্বত:সিদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী তিনি স্বয়ং তোমাদের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন। আর যেহেতু তিনি তোমাদেরই লোক তাই তাঁর আদিঅন্ত সব অবস্থাই.তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে। তাঁর শিশুকাল ও যৌবনকাল তোমাদের মধ্যেই কেটেছে। এরপর যখন তিনি নুবুওয়াতের ঘোষণা দেন তখন তিনি তোমাদের থেকে আত্মগোপন করে কোথাও তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন নি। মোটকথা তাঁর যাবতীয় অবস্থা, যাবতীয় ব্যাপার তোমরা নিজেদের চোখের সামনেই দেখছিলে। তারপর যা ঘটার ছিল তা ঘটল। তোমরা নির্যাতিতের ও অসহায়ের ঘোষণাও শুনলে। জয় ও সাফল্যের ক্ষেত্রে তোমরা তাঁকে সত্যায়নও করলে। তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে তাঁর নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ জীবনের সাক্ষী হয় নি এবং তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাঁর প্রত্যেকটি কথার সত্যতাকে পরীক্ষা করে দেখেনি।

এরপর কুরআন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এমন একটি গুণের উপর জোর দিয়েছে, যা রিসালাতের জন্য এবং এ ধরনের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য যিনি বা যারা জাতির নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মত মর্যাদা রাখেন, সব

চাইতে বেশী প্রয়োজনীয়। আর তা হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য দয়া ও করুণা গুণ। তিনি (সা) তোমাদের দুঃখ-ব্যথা সহ্য করতে পারেন না। তোমাদের প্রতিটি কষ্ট চাই তা দৈহিক হোক অথবা আত্মিক তাঁর অন্তরের মধ্যে দারুন জ্বালা-যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। তিনি যারপর নেই তোমাদের মঙ্গলাকাংখী। এর প্রতি তাঁর অন্তরে এতই টান যে, যদি তাঁর পক্ষে সম্ভব হত তাহলে তিনি হিদায়াত ও সৌভাগ্যের যাবতীয় উপাদানকে একই নি:শ্বাসে তোমাদের গলাধ:করণ করিয়ে তবে ছাড়তেন। অত:পর তার এই কৃপা ও করুণা শুধু তোমাদেরই জন্য নয়; বরং তা সমগ্র মুমিনের জন্য— চাই তারা আরব হোক অথবা অনারব। তিনি সকলের জন্যই দয়াদ্র-ও পরম দুয়ালু।

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় নিজের ক্ষেত্রে এ দু'টি গুণ বর্ণনা করলেও এখানে তাঁর রাসূলকেও এ দু'টি গুণে গুণান্বিত করেছেন।

উপদেশ বাণীর আবশ্যকতা

এত সব ঘটনা নিরীক্ষণ এবং হাতে কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সত্ত্বেও যদি সম্বোধিত লোকেরা আমার কথা না শুনে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে হে নবী, আপনি শেষ বারের মত ঘোষণা করে দিন যে, আমার জন্য পূর্বেও আল্লাহ্ যথেষ্ট ছিলেন এবং এখনো যথেষ্ট আছেন। তিনি তাঁর 'কালিমা-ই- দ্বীন'এর রক্ষাকর্তা। তিনি যা ইচ্ছা করবেন এবং যেই সিদ্ধান্ত নেবেন তা সর্বাবস্থায় বাস্তবায়িত হতেই হবে। তাঁর দ্বীনের অস্তিত্ব এবং উন্নয়ন কোন বিশেষ দেশ এবং বিশেষ জাতির পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল নয়। আদিতে আমার ভরসা ছিল আল্লাহ্র উপর এবং এখানো আছে। আমি আমার দায়িত্ব সম্পাদনের কাজ শেষ করেছি।

এখানে উক্ত উপদেশবাণীটির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন? এটি বুঝার জন্য দুটি কথা সামনে রাখা প্রয়োজন। সুরাটি (সূরা তাওবা) নাযিল হওয়ার কাল এবং সূরার মর্মকথা। সূরাটি তখন নাযিল হয় যখন সমগ্র আরবে কালিমা-ই- হক এর আহ্বান মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। যদিও কুরআনের বিশ্বব্যাপী সাফল্যের সংবাদ প্রদান করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ঐ লোকদের জন্য সুসংবাদ ছিল; যারা কাল পর্যন্ত দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের চরম পর্যায়ে ছিল। সমগ্র আরবের ইসলাম গ্রহণ ছিল বিরাট সাফল্য। আর এজন্য মানুষের মনে এক এক ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য ও বেপরোয়া ভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কারো কারো দিক থেকে যে আলস্য ও অন্যমনস্কতা দেখা দিয়েছিল, তার মুলেও এই অবস্থার একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া কার্যকর ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। একারণেই এই সূরার মধ্যে এত বিস্তারিতভাবে ও গুরুত্বের সাথে কর্ম চাঞ্চল্য, সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের প্রতি মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করর হয়েছে, যা অন্য কোন সূরায় করা হয় নি।

মানব ইতিহাসের বিস্ময়কর ঘটনাবলী

কোন ব্যক্তি যতই বিরোধী মনোবৃত্তি নিয়ে অধ্যয়ন করুক, সে ইসলামী ইতিহাসের মধ্যে এধরণের এমন কিছু ঘটনা পাবে, যা অত্যন্ত পরিস্কার বাস্তব এবং অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত: একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, যে সব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে ছিল, তাদের যাবতীয় কাজ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জুলুম, অত্যাচার, বাড়াবাড়ি, প্রতারণা প্রভৃতি দোষে ছিল দুষ্ট। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সংগীদের যাবতীয় কাজ ছিল ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, আমানত, বিশ্বস্ততা এবং ক্ষমা ও করুণার শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর নমুনা। যেমনঃ

(ক) তাঁদের উপর যখন অত্যাচার-উৎপীড়ন চালানো হত তখন তাঁরা ধৈর্যাবলম্বন করতেন।
(খ) শত্রুর মুকাবালায় তাঁরা দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন।
(গ) তাঁরা তাঁদের প্রত্যেকটি কাজ ও আচার-ব্যবহারে ছিলেন সৎ ও আন্তরিক।
(ঘ) শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের বিরোধীদের ক্ষমা করে দিতেন।

এগুলো হচ্ছে মানব ইতিহাসের সেই সব বিস্ময়কর ঘটনা, যা কোন একজন মানুষের জীবনে কখনো একত্রিত হয়নি, যেমনটি হয়েছিল রাসূলে আকরাম (সা)-এর কল্যাণময় সত্তায়। উপরন্তু নুবুওয়াতের সমগ্র যুগটি ছিল অনুরূপ বিস্ময়কর ঘটনারাজিতে উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল। যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র জীবনের নির্যাস হচ্ছে তা-ই, যা মূলত: মহান মানবতা ও সর্বোত্তম মনুষ্যত্বের 'সিদরাতুল মুনতাহা'।

সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহক

মানব জাতির একটি বিশ্বজনীন পথভ্রষ্টতা এই যে, যখন কোন ব্যক্তি আত্মিক বা আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য নিয়ে আবির্ভূত হন তখন তারা তাঁকে, বান্দার স্তর থেকে অনেক উপরের স্তরে অধিষ্ঠিত দেখতে চায়। কিন্তু পবিত্র কুরআন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থা ও সঠিক মর্যাদাকে এত পরিস্কার ও অকাট্য ভাষায় বর্ণনা করেছে যে, চিরদিনের জন্য এই গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অবসান ঘটেছে। আর শুধুমাত্র এই একটি কথাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)- এর সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

যে দুনিয়ার ঝোঁক ছিল ধর্মীয় পথপ্রদর্শকদেরকে খোদা ও খোদা তনয়ের আসনে অধিষ্ঠিত করার, ইসলামের নবী সেই দুনিয়ার কাছে এতটুকুও কামনা করেন নি যে, তাঁকে অন্তত: গণক ও জ্যোতিষীদের মতই অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে স্বীকার করে নেওয়া হোক। তিনি নিজের সম্পর্কে অধিক থেকে অধিকতর যে কথাটি শুনিয়েছেন তা ছিল এই যে, আমি অস্বীকার ও দুস্কর্মের প্রতিফল সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী এবং ঈমান ও সুকর্মের কল্যাণসমূহ সম্পর্কে সুসংবাদদাতা এক বান্দা। যদি গায়ব জানতাম জীবনের কোন অনিষ্টই আমাকে পেত না। এমন মানুষের কণ্ঠ থেকে কি অসত্য কথা বের হতে পারে?

সূরা ফাতিহার শিক্ষামূলক দিক

'সূরা ফাতিহা' হচ্ছে 'উম্মুল কুরআন' (কুরআন-জননী),' আল কাফিয়া' (সম্পূরক), 'আসাসুল কুরআন (কুরআনের ভিত্তিমূল) এবং 'আসসাবউল মাছানী' (নিত্য পাঠ্য বাণী সপ্তক)। গোটা কুরআনে 'দ্বীন-ই- হক' এর উদ্দেশ্যাবলীর যে বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে সূরা ফাতিহা যেন তার সার-নির্যাস। এর ভঙ্গি হলো দু'আইয়াহ্ তথা প্রার্থনামূলক। এটাকে প্রতিদিনের 'ইবাদত'-এর একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে ধার্য করা হয়েছে। এর শিক্ষমূলক দিকগুলোর অন্যতম হলোঃ

(১) সূরা ফাতিহা পাঠকারী তথা প্রার্থনাকারী আল্লাহ্র প্রশংসায় প্রপ্তমুখ এবং নিবেদিত প্রাণ। আল্লাহ্ কোন বিশেষ বংশ, জাতি বা ধর্মালম্বীর নন, বরং তিনি রাব্বুল আ-লামীন, নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক। তিনি সমগ্র মানব জাতিকে একই দৃষ্টিতে দেখেন এবং সকলের মধ্যে আপন দয়া-দাক্ষিণ্য সমান বণ্টন করেন।

(২) এরপর সে আল্লাহ্র গুণবাচক নাম ধরে ডাকতে চায়। কিন্তু এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় গুণাবলীর মধ্যে শুধুমাত্র করুণা ও ন্যায় বিচারের গুণটি তার মনে পড়ছে। যেন এই মুহূর্তে তার কাছে তার প্রভুর অস্তিত্ব আগাগোড়া করুণাময় ও ন্যায় বিচারকরূপে প্রতিভাত হচ্ছে।

(৩) সে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তার প্রভুর সামনে মাথা অবনত করে এবং স্বীকৃতি প্রদান করে তাঁর বন্দেগীর। সে বলে, শুধু-তুমিই হচ্ছ সেই সত্তা, যার সামনে মাথা ঝুকানো যেতে পারে এবং একমাত্র তুমিই আমার সকল অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করতে পার। সে তার বন্দেগী নিবেদন করে এবং সাহায্য প্রার্থনা করে একই শক্তির কাছে এবং সেই সাথে ছিন্ন করে দেয়, বিশ্বের সকল ধরনের শক্তির দাসত্ব ও বিধি-নিষেধের বেড়াজাল। এখন থেকে সে আর কোন শক্তির কাছে মাথা নত করবে না, অবনত হবে না মরণশীল মানুষের কাছে, সাহায্যের হাত বাড়াবে না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি।

(৪) তারপর সে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কামনা করে সহজ সরল পথে চলার শক্তি। মানুষের প্রাণের প্রার্থনা এছাড়া আর কী হতে পারে? তবে সে সহজ সরল পথ কোন্টি? বিশেষ কোন গোত্রের সরল পথ, না বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের? না, এর কোনটিই নয়। সে সোজা পথ হচ্ছে ঐ পথ, যা দুনিয়ার সকল ধর্ম প্রর্বতকরা, সকল গোত্রের সকল দেশের ভাল মানুষেরা সর্বসম্মতভাবে অনুসরণ করে গেছেন।

(৫) এরপর সে পরিত্রাণ কামনা করে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথ হতে। এখানেও সে বাঁচতে চায় সর্বকালের সর্বদেশের সকল পথ হতে।

(৬) যেন সে তাই পেতে চায়, যা সার্বজনীন ভাল এবং তাই ছাড়তে চায় যা সার্বজনীন মন্দ। সে পতিত হতে চায় না ব্যক্তি, গোত্র, সম্প্রদায়, দেশ বা অঞ্চল বিশেষের বিভ্রাটে।

(৭) এবার চিন্তা করে দেখো, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার ধরনটি একজন মানুষের চিন্তা ও অনুভূতির জগতে কি ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি করবে? যে ব্যক্তির মন-মস্তিস্ক এই কাঠামোয় গড়ে উঠবে সে কিরূপ মানুষ হবে ? অন্ততঃপক্ষে দু'টি কথা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। আর তা হলো–

এক ঃ এই ব্যক্তির ইবাদত-বন্দেগী পরিচালিত হবে আল্লাহ্ তা'আলার বিশ্বব্যাপী দয়া ও সৌন্দর্যের ধারণাকে কেন্দ্র করে।

দুই ঃ কোন ক্রমেই সে কোন গোত্র, সম্প্রদায় বা দেশের সীমারেখায় আবদ্ধ থাকবে না। অত্যন্ত নিশ্চিতভাবেই সে উদ্বুদ্ধ হবে আর্ন্তজাতিক মানবতাবোধে। আর এটাই তো হচ্ছে কুরআনী আহবানের মূল প্রেরণা (তরজমানুল কুরআন থেকে গৃহীত)।

আবিসিনিয়ায় হিজরত, বয়কট এবং রাতের বেলা ভ্রমণ বা উর্ধলোকে গমন

কুরায়শের জুলুম-অত্যাচার ও মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরত

কুরায়শের নিষ্ঠুর আচরণ

ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে কুরায়শের শত্রুতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের উপর জুলুম-অত্যাচার শুরু হল। কিন্তু ইসলামী দাওয়াতের যে সারকথা আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, তাতে এমন কী জিনিসটি আছে, যার উপর দাওয়াতকারীকে শত্রু জ্ঞান করা যেতে পারে কিংবা তার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলা যেতে পারে। আভিজাত্যের দাবীদার কোন ব্যক্তির পক্ষেই অনুরূপ করাটা সমীচীন হতে পারে না।

দাওয়াতের সার কথা এই যে, আল্লাহ্ এক ও একক, একমাত্র তিনিই উপাসনার যোগ্য। সূর্য, চন্দ্র, তারকা, গাছ, পাথর মূর্তি প্রভৃতি বস্তু কারো কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। দ্বীনে ইসলামে তো বিশ্বস্ততা, অঙ্গীকার পালন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির ও নিঃস্বদের দেখাশুনা, পরস্পরের সাথে মিলে-মিশে জীবন যাপন, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা, ভাল কাজ করা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নীতিকথা ছাড়া অন্য কিছু নেই। কিন্তু কুরায়শ এগুলোকে বরদাশ্ত করতে পারল না। কেন পারল না তার বিস্তারিত বিবরণ সীরাত গ্রন্থাদিতে রয়েছে।[১]

নিঃস্বদের উপর অমানুষিক নির্যাতন

বিশেষ করে ঐসব নিঃস্ব মুসলমান, যারা ছিল ক্রীতদাস এবং যাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী ছিল না; তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। যেমন–

১। গলায় রশি লাগিয়ে হযরত বিলাল (রা)কে ভর দুপুরে মক্কা মুকাররমার পাহাড়সমূহের উত্তপ্ত জমির উপর শুইয়ে রাখা হত এবং সেই সাথে চাপিয়ে দেওয়া হত তাঁর বুকের উপর উত্তপ্ত জগদ্দল পাথর। তাকে কাঠের চেলা দিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করা হত এবং ঘন্টার পর ঘন্টা খাঁ খাঁ রৌদ্রে বসিয়ে রাখা হত। শেষ পর্যন্ত হযরত আবু বকর বিলাল (রা)-কে তাঁর মালিকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন।

২। হযরত আম্মার(রা) এবং তাঁর পিতামাতা ইয়াসির ও সুমাইয়া (রা)-এর উপর আবু জেহেল অকথ্য নির্যাতন চালায়, এমন কি হযরত সুমাইয়া (রা) শেষ পর্যন্ত তারই বর্শার নির্মম আঘাতে শাহাদত বরণ করেন।

৩। একদা হযরত খাব্বাবকে জনৈক জালিম জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর এমন শক্তভাবে পা চাপিয়ে দেয় যে, তিনি মোটেই পার্শ্ব পরিবর্তন করতে পারেন নি এবং এই অবস্থায়ই(তাঁর দেহের চর্বি গলে গিয়ে তাতে) আগুন নিভে যায়।

হযরত আবু বকর (রা) এই নিঃস্বদের মধ্য থেকে বিলাল (রা) ছাড়াও তার মহিয়সী মাতা, আমির বিন ফুহায়রা, উম্মে উবায়স, যান্নিরাহ, তাঁর মেয়ে এবং লাবীনাকে চড়া মূল্যে খরিদ করে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন।

হযরত উছমান (রা) কে তাঁর চাচা একটি মাদুরে লেপটিয়ে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখতেন। এরপর নীচে থেকে তাঁর নাকেমুখে ধোঁয়া ছেড়ে দেওয়া হত। ফলে ঐ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্যে হযরত উছমান (রা) অনবরত: ছট্ফট্

করতে থাকতেন। হযরত মুস'আব বিন উমায়র(রা)কে তাঁর মা ঘর থেকে বের করে দেন। কোন কোন নওমুসলিমকে গরু, উট প্রভৃতির চামড়ায় লেপটে নিয়ে প্রখর রৌদ্রে ফেলে রাখা হত। কাউকে কাউকে লৌহবর্ম পরিয়ে অগ্নিঝরা রৌদ্রে তেতিয়ে-উঠা পাষাণ খন্ডের উপর ছুঁড়ে মারা হত।

আল্লাহ্র পথে প্রথম হিজরত

অবিরাম মেঘের বর্ষণ সত্ত্বেও যখন কুরায়শের অত্যাচার ও সীমালংঘনের ঘনঘটা মোটেই কেটে গেল না তখন দয়াল নবী (সা) ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ সাহাবা কিরামকে হিজরত করে কুরায়শের প্রাচীন বাণিজ্য কেন্দ্র আবিসিনিয়ায় চলে যেতে নির্দেশ দেন।[২]

অনেক প্রাচীনকালেই আবিসিনিয়ার সাথে কুরায়শের যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল তা তখনো ছিল অটুট। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রপিতামহ হাশিম, রোম সম্রাটের কাছ থেকে একটি বাণিজ্য পরোয়ানা লাভ করলে পর তিনি (রোম সম্রাট) তার স্বধর্মীয় আবিসিনিয়ার সম্রাটের কাছে একটি সুপারিশনামা লিখে দিয়েছিলেন এই মর্মে যে, তিনি যেন মক্কা বাসীদের বাণিজ্য-কাফেলাকে তার রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি দেন। সীরাতুন্নবীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাশিম আবিসিনিয়ার সম্রাটের কাছ থেকে এমন একটি ফরমান লাভ করেছিলেন, যার বলে কুরায়শের পণ্য সামগ্রীর উপর কোন ট্যাক্স ধার্য করা হত না।[৩] ঐ সময় থেকে কুরায়শের বণিকরা দলে দলে আবিসিনিয়ায় যাতায়াত করতে থাকে।

আবিসিনিয়ার সম্রাটকে আরবরা 'নাজ্জাশী' বলত। এটা হচ্ছে আবিসিনীয় ভাষার শব্দ নাজ্জুস (কিংবা নগূস) এর 'তা'রীব' তথা আরবায়ন। নাজুস বা নেগূনের অর্থ হচ্ছে সম্রাট। আবিসিনিয়ার ঐ সময়কার সম্রাটের নাম ছিল আসমাহা। তাঁর 'আদল' তথা ন্যায় বিচারের খুব সুখ্যাতি ছিল।

হিজরতের একটি বাহ্যিক উপকারিতা এই ছিল যে, এতে মজলুমদের পরিত্রাণের একটি উপায় বের হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আর দ্বিতীয় ও অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা এই ছিল যে, 'দাওয়াতে হক'-এর অনুসারীরা হিজরত করে যেখানেই যেতেন সেখানেই ইসলামের আলো আপনাআপনি ছড়িয়ে পড়ার একটা সুযোগ সৃষ্টি হত। তাঁরা তাঁদের কথার মাধ্যমে যেমন ইসলামের দাওয়াত দিতেন তেমনি নিজেদের সুন্দর আচার-আচরণ ও কার্যাবলী দ্বারাও মানুষকে হক ও সত্যের দিকে আকৃষ্ট করতেন। কেননা, তাঁদের স্বভাবচরিত্র ও আচার-আচরণ এতই সুন্দর ও আকর্ষণীয় ছিল যে, তাঁদের প্রত্যেকেই যেন ইসলামী দাওয়াতের এক একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

প্রথম হিজরতকারীগণ

প্রথম দফায় হিজরত করেন এগারো জন পুরুষ ও চার জন মহিলা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত উছমান (রা) তাঁর সহধর্মিনী হযরত রুকাইয়া বিন্‌তে রাসূলুল্লাহ্ (সা), হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা), হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ(রা), হযরত মুসআব বিন উমায়র (রা), হযরত আবু সালমা মাখযূমী (রা), তাঁর সহধর্মিণী হযরত উম্মে সালমা (রা)[৪], হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা), হযরত উছমান বিন মায্উন (রা) প্রমুখ। পরবর্তী সময়ে দফায় দফায় আরো বেশ কয়েকটি কাফেলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করে এবং সেখানকার মুহাজিরদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় একশ এক-এ (তার মধ্যে ছিলেন তিরাশি জন পুরুষ ও আঠারো জন স্ত্রীলোক)। পরবর্তী কাফেলাগুলোতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিজরত করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত জা'ফর বিন আবু তালিব (রা), যিনি পরবর্তী সময়ে নাজ্জাশীর দরবারে আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের মুখপাত্রে পরিণত হন।

কুরায়শের চরম শত্রুতা

ঐ সময়ে শায়ীবাহ্ ছিল মক্কাবাসীদের সমুদ্র বন্দর। সেখান থেকেই তারা জাজাজে চড়ে আবিসিনিয়া ও অন্যান্য দেশে যেত। এ স্থানটি জিদ্দা বন্দর থেকে সামান্য দক্ষিণে। হযরত উসমান (রা) এর খিলাফতকালে জিদ্দা সমুদ্র বন্দর হিসাবে গড়ে উঠে এবং শায়ীবাহ বন্দরের জাঁকজমক ধীরে ধীরে লোপ পায়।

মুহাজিরদের প্রথম কাফেলাটি হিজরী ৫সনে (ইং ৬১৪ সনে) দু'টি বাণিজ্য জাহাজে করে আবিসিনিয়ায় গিয়ে পৌছে। কুরায়শরা যখন এই হিজরতের কথা জানতে পারে তখন তারা বন্দর পর্যন্ত মুহাজিরদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু তারা সেখানে পৌছার পূর্বেই মুহাজিরদের জাহাজ নোঙ্গর তুলে আবিসিনিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল।

পরবর্তী সময়েও মুহাজিররা চুপি চুপি হিজরত করতে থাকে। এতে তাঁদের প্রতি কুরায়শদের শত্রুতা এতই চরমে গিয়ে পৌছে যে, তারা আবিসিনিয়া পর্যন্ত তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করতে মনস্থ করে। তারা আবিসিনিয়ার সম্রাটের কাছে একদল প্রতিনিধি পাঠায়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী রাবীআহ, আমর ইবন আস(যিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর মিসর জয় করেছিলেন) প্রমুখ ছিলেন ঐ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত। কুরায়শ প্রতিনিধিদল নাজ্জাশী এবং তাঁর সভাসদদের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন সংগে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সম্রাটের সভাসদদেরকে নিজেদের পক্ষে টেনে তাদের সমর্থন ও সহায়তায় মজলূম মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়া থেকে ফিরিয়ে আনা–যাতে করে ইসলামবিমুখ করার জন্য তাঁদের উপর পূর্বের ন্যায় জুলুম-নির্যাতন চালানো যেতে পারে। ঐ সময়ে আকসূম ছিল আবিসিনিয়ার রাজধানী। বর্তমানে তা আবিসিনিয়ার দক্ষিণপূর্ব কোনে একটি সাধারণ জনবসতি হিসাবে বিদ্যমান আছে। আবিসিনীয়রা ইং ১৮৯৫ সনে ইতালীয়দেরকে আদওয়া নামক স্থানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। আকসূমের অবস্থান আদ্ওয়ার সন্নিকটে। পরবর্তী সময়ে আদ্দিস আবাবা আবিসিনিয়ার রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়। কেননা, এর অবস্থান ছিল আবিসিনিয়ার ঠিক মাঝামাঝি স্থানে।

প্রতিনিধিদলের দাবী

কুরায়শপ্রতিনিধিদল আবিসিনিয়া পৌছেই সম্রাটের সভাসদ এবং সেখানকার পাদ্রীদের সাথে সাক্ষাত করে এবং উপঢৌকন প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে নিজেদের পক্ষে টেনে নেয়। তারা সকলের কাছে একথাই বলে যে, আমাদের এখানকার কিছু লোক তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে ইসায়ী কোন ধর্মই গ্রহণ করেনি; তাই তাদেরকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। এরপর প্রতিনিধিদল খোদ শাহী দরবারে গিয়ে পৌছে এবং সম্রাট নাজ্জাশীর সাথেও অনুরূপ ভঙ্গিতে আলাপ-আলোচনা করে। তারা বলে, আমাদের যে লোকগুলো আপনার দেশে পালিয়ে এসেছে, তারা আমাদের ধর্ম বর্জন করলেও আপনার ধর্ম গ্রহণ করেনি। বরং তারা অন্য একটি নতুন ধর্ম গড়ে নিয়েছে। আমাদের গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, যাদের মধ্যে ওদের বাবা-চাচারাও রয়েছেন–আমাদেরকে আপনার সাথে ফেরত পাঠিয়েছেন, যাতে আপনি ওদেরকে আমাদের সাথে ফেরত পাঠিয়ে দেন। আপনার সভাসদ এবং এখানকার পাদ্রী পুরোহিতরাও যথারীতি আমাদের দাবীর পক্ষে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

উপঢৌকনের মধ্যে ছিল চামড়ার তৈরী বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী। ঐ যুগে উপঢৌকন হিসাবে এগুলোই ছিল কুরায়শদের কাছে সবচাইতে মূল্যবান বস্তু। আর একারণেই তখন কুরায়শদের পণ্যসামগ্রীর একটি বিশেষ ফর্দই ছিল এই চামড়াজাত দ্রবাদি।

নাজ্জাশী তাদের বক্তব্য শুনে বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ঐ লোকদের সাথে কথাবার্তা না বলব এবং তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত না হব ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কোন হুকুম জারী করা আমার জন্য ন্যায়ানুগ হবে না। যাহোক শেষ পর্যন্ত মুসলিম মুহাজিরদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে শাহী দরবারে ডেকে পাঠানো হয়। তাঁরা সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দরবারে হাযির হন, কিন্তু তৎকালীন রাজকীয় দস্তুর অনুযায়ী দরবারে প্রবেশকালে সম্রাটকে সিজ্দা করেন নি।

হযরত জা'ফরের ভাষণ

সম্রাট নাজ্জাশী মুসলমানদের কাছে যখন তাঁদের ধর্মের হাল-অবস্থা জানতে চান তখন প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে হযরত জা'ফর (রা) শাহী দরবারে একটি অতি আকর্ষণীয় ও অর্থপূর্ণ ভাষণ দেন। তাতে তিনি ইসলামের সব কয়টি গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর আলোকপাত করেন এবং ইসলামপূর্ব যুগের আরবদের অবস্থাদি সম্পর্কেও একটি স্পষ্ট ধারণা দেন। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল তখনকার সমগ্র বিশ্বের অবস্থা। হযরত জা'ফর (রা) তাঁর ভাষণে বলেনঃ

"হে মহামান্য সম্রাট, আমরা মূর্খতায় লিপ্ত ছিলাম, মূর্তিপূজা করতাম, নিকটাত্মীয়দের হুকূক ও অধিকারসমূহ বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম, প্রতিবেশীদের সাথে দুর্ব্যবহার করতাম এবং আমাদের সবলরা দুর্বলদের জুলুম-নির্যাতন চালাত-এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যার পরহেযগারী সম্পর্কে আমরা খুব ভালভাবে অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে তাওহীদ (একত্ববাদ)-এর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আমাদেরকে বুঝিয়ে বলেন, তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, মূর্তিপূজা ত্যাগ কর, সত্য কথা বলো, আমানতে খিয়ানত করো না, নিকটাত্মীয়দের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখো, প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করো, হারাম ও অবৈধ কাজকর্ম এবং রক্তারক্তি থেকে দূরে থাকো। তিনি বলেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলো না, য়াতীমের মাল আত্মসাৎ করো না, সতীসাধবী মেয়েদের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা করো না, অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং পাপাচার থেকে দূরে থাকো। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দেন, তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, সালাত আদায় করো, যাকাত দাও, রোযা রাখ। তিনি যে জিনিসকে হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছেন আমরা সেটাকে হারাম বলে জেনেছি। তিনি যে জিনিসকে হালাল ও বৈধ ঘোষণা করেছেন আমরা সেটাকে হালাল ও বৈধ জ্ঞান করেছি। আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি, শিরক এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেছি এবং কুকর্ম থেকে বিরত থেকেছি আর এজন্যই আমাদের সম্প্রদায় আমাদের প্রাণের শত্রুতে পরিণত-হয়েছে। তারা আমাদেরকে বাধ্য করছে যেন আমরা লা-শরীক আল্লাহ্র উপাসনা ছেড়ে দিয়ে গাছ পাথরের তৈরী মূর্তিসমূহের পূজা করি। আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের হাতে অনেক নির্যাতন সহ্য করেছি এবং শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আপনার দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছি।"

নাজ্জাশী এই ভাষণ শুনে বললেন, যে কালামে ইলাহী (আল্লাহ্র বাণী) তোমাদের নবীর উপর নাযিল হয়েছে তা থেকে কিছু পাঠ কর। তখন হযরত জা'ফর (রা) সূরা মারয়াম থেকে কয়েকটি আয়াত পাঠ করেন। এগুলো শুনতেই নাজ্জাশীর চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতে থাকে। তিনি বলে উঠেন, আল্লাহ্র কসম, এই বাণী এবং ইন্জীলের বাণী-উভয়ই একই প্রদ্বীপের দুটি প্রতিবিম্ব ছাড়া কিছু নয়।

এরপর নাজ্জাশী কুরায়শ প্রতিনিধিদলকে বলেন, তোমরা চলে যাও। আমি এদেরকে কখনো তোমাদের সাথে ফেরত পাঠাব না।

হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে প্রশ্ন

পরের দিন 'আমর বিন আস পুনরায় শাহী দরবারে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেন। সেদিন তিনি নাজ্জাশীকে বলেন, হে মহামান্য সম্রাট! আপনি কি জানেন, ওরা ঈসা (আ) সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে? এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য নাজ্জাশী পুনরায় মুসলমানদের শাহী দরবারে ডেকে পাঠান। সাধারণ মুসলমানরাও আশংকা করেছিলেন যে, যেহেতু নাজ্জাশী খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী, তাই মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসের কথা শুনে তিনি হয়ত ক্ষেপে উঠবেন। কিন্তু জা'ফর (রা) তাঁদেরকে বললেন, যা কিছু ঘটুক, আমরা এ সম্পর্কে তাই বলবো, যা আমাদের আল্লাহ্ এবং আমাদের রাসূল (সা) বলেছেন। যা হোক, শাহী দরবারে হযরত ঈসা(আ) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে হযরত জা'ফর (আ) উত্তরে বলেন, তিনি (হযরত ঈসা) ছিলেন আল্লাহ্র বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর রূহ এবং তাঁর কালিমাহ্ যা কুমারী মারয়ামের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। নাজ্জাশী একথা শুনেই একটি তৃণখন্ড মাটি থেকে তুলে নেন এবং বলেন, আল্লাহ্র কসম, হযরত ঈসা(আ) এই তৃণখন্ডের সমপরিমাণও উপরে নন [যা জা'ফর (রা) বলেছেন]।

প্রকৃতপক্ষে নাজ্জাশী ছিলেন ঐসব আরইউসী[৫] খ্রীষ্টানদের অন্যতম, যারা এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, হযরত ঈসা (আ) হচ্ছেন একক ফিতরাতের অধিকারী। ত্রিত্ববাদীদের মত তিনি একথা স্বীকার করতেন না যে, হযরত ঈসা (আ) এর মধ্যে দুটি ফিতরাত তথা সত্তা একত্রিত হয়েছে– একটি দাসত্বের এবং অন্যটি প্রভুত্বের। যাহোক উপরোক্ত কারণে নাজ্জাশী মুসলানদের আকীদাকে নির্দ্বিধায় সত্য ও সঠিক বলে ঘোষণা করেন।

নাজ্জাশীর সেবা

মাওলানা শিবলী মরহুম লিখেছেন, ইতিমধ্যে একদল শত্রু নাজ্জাশীর রাজ্য আক্রমণ করে বসল এবং ঐ আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য খোদ সম্রাটকে যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা হতে হল। অনুরূপ পরিস্থিতিতে মুহাজিররা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁদের মধ্য থেকেও এক ব্যক্তি সম্রাটের সাথে যাবেন এবং উপস্থিত পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ পাঠাতে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে অন্যান্যরাও নাজ্জাশীর সাহায্যে এগিয়ে যাবেন। হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম ছিলেন মুহাজিরদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তিনি নিজে থেকেই উপরোক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মশকের উপর ভর করে নীলনদ পাড়ি দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পৌছেন। অন্যান্য সাহাবীরা নাজ্জাশীর জন্য দু'আ করতে থাকেন। কিছুদিন পর হযরত যুবায়র (রা) ফিরে এসে সুসংবাদ দেন যে, আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহে নাজ্জাশী বিজয় লাভ করেছেন।

মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

একটি বর্ণনা অনুযায়ী আবিসিনিয়ায় এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, কুরায়শরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এটা শুনে সাহাবীরা মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু শহরের নিকটবর্তী হওয়ার পর জানতে পারেন যে, উক্ত সংবাদ মিথ্যা। তখন কেউ কেউ সেখানে থেকেই আবিসিনিয়ায় ফিরে যান। অবশ্য তাঁদের অধিকাংশই গোপনে মক্কায় প্রবেশ করেন। কিছু সংখ্যক মুহাজির রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পর আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। অবশ্য তখনো কেউ কেউ আবিসিনিয়ায় রয়ে গিয়েছিলেন। এরপর হুদায়বিয়ায় যখন মুসলমানদের সাথে কুরায়শদের সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবশিষ্ট মুহাজিরদেরকে আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় ডেকে নিয়ে আসেন। অবশ্য হযরত জা'ফর বিন আবু তালিব (রা) ঠিক সেই সময়ে আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় এসে পৌছেন যখন এই খবর পাওয়ামাত্র হযরত জা'ফর (রা)ও কালবিলম্ব না করে খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌছেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন।[৬]

আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের গৃহ পরিত্যাগকারী

এক্ষেত্রে মাওলানার বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত। এতদ্‌সত্ত্বেও কোন প্রয়োজনীয় বিয়ই এ থেকে বাদ পড়ে নি। আমি এতদ্ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আমার লেখায় কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলাম যাতে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা তাদের সমগ্র জ্ঞাতব্য বিষয়াদি একই জায়গায় পেয়ে যান।

যখন মুসলমানদের উপর জুলুম-অত্যাচার এই পর্যায়ে গিয়ে পৌছল যে, তাঁদের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে উঠল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়া অভিমুখে হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন। প্রথম দফায় যে দলটি হিজরত করে তার লোকসংখ্যা ছিল ষোল। তার মধ্যে বার জন পুরুষ ও চারজন স্ত্রীলোক। ঐ দলের নেতা ছিলেন হযরত উসমান বিন আফফান(রা)। এরপর আরো কয়েক ব্যক্তি হিজরত করেন, যাদের সংখ্যা একশ এক-এ গিয়ে পৌছে। তার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল তিহাত্তর এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা আঠারো।

এটা হচ্ছে ইসলামী ইতিহাসের প্রথম হিজরত। দ্বিতীয় হিজরত সংঘটিত হয়েছিল ইয়াছরিব তথা মদীনা অভিমুখে।

পবিত্র কুরআনের সূরা নাহলে যে সব মুহাজিরের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন ঐ সব সাহাবী বা সাহাবিয়া, যারা আবিসিনিয়া অভিমুখে হিজরত করেছিলেন। আয়াতটি হলো–

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ط وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ . اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ .

"যারা অত্যাচারিত হবার পর আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দেব, এবং আখিরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ। হায়, ওরা যদি তা জানত! তারা (অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করেছে, তারা) ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।" –(১৬ ঃ৪১–৪২)

ঘটনাটি বাস্তবেও ঘটেছিল তাই। আবিসিনিয়ার মত অপরিচিত বিদেশ-বিভুঁই মুসলমনদের জন্য একটি সম্মানজনক আশ্রয়ে পরিণত হয়েছিল। এটা হচ্ছে সেই আবিসিনিয়া, যেখানকার আবরাহা নামীয় জনৈক সেনাপতি তখন থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে মক্কা আক্রমণ করেছিল। এখন সেই আবিসিনিয়ায়ই মুসলমানদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সম্মানের সাথে স্বাগত জানানো হচ্ছে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত মুসলমানদের এই হিজরত সত্য প্রচারের ক্ষেত্রেও একটি অতি আশাব্যাঞ্জক ভূমিকা পালন করেছিল আর তা হলো, হযরত জা'ফর (রা)-এর একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ শুনেই। আবিসিনিয়ার সম্রাটের অন্তর ইসলামের প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠে এবং তিনি নিদ্বির্ধায় ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন।[৭]

নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ

ইসলামের সূচনাকাল ছিল সত্য প্রচারের একটি দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত। নাজ্জাশী তথা নেগোশ তথা আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান শাসক কোনরূপ ইতস্তত: না করে বলতে গেলে একেবারে আকস্মিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমানদের যে দলটি হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিল নাজ্জাশী তাঁদের কাছে এই মর্মে আগ্রহ ব্যক্ত করেনঃ তোমরা আমাকে তোমাদের নবীর বাণী শুনাও। তাঁরা সূরা মারয়াম তিলাওয়াত করে শুনালে নজ্জাশীর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। তিনি বলেন, এই বাণীর মধ্যে সেই আত্মাই কথা বল্‌ছে, যা হযরত ঈসা (আ)-এর মধ্যে কথা বলেছিল।

নাজ্জাশী ছাড়া স্বয়ং আরবেরও বহু খ্রীষ্টান ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু য়াহূদীদের জমাট বাঁধা গুমরাহীতে এর কোন প্রভাব পড়েনি। তারা সব সময়ই মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত থাকে। শেষ পর্যন্ত হযরত উমর (রা)-এর যুগে তাদেরকে খায়বার থেকে বিতাড়িত করা হয়। সূরা মায়েদার ৮২ ও ৮৩ নং আয়াতে উল্লেখিত আছে যে, মুসলমানদের সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টানদের চাইতে য়াহূদীরাই অনেক অগ্রণী। কেননা, খ্রীষ্ট্রানদের মধ্যে এমন অনেক পন্ডিত ও সংসার-বিরাগী রয়েছেন–ইনজীলের অনেক শিক্ষা যাদের অন্তরকে বিনয়-নম্র করে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর যে বাণী নাযিল হয়েছে– যখন তারা তা শুনেন তখন তাদের চোখ অশ্রুবিগলিত হয়ে উঠে।

হযরত জা'ফর (রা) কর্তৃক পঠিত সূরা মারয়ামের আয়াতগুলো শুনেও নাজ্জাশীর চক্ষু অশ্রুবিগলিত হয়ে উঠেছিল। এটা হচ্ছে তখনকার অবস্থা যখন কুরআন নাযিল হচ্ছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে খ্রীষ্টান রাজ্যসমূহের মধ্যেও মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্রে সেই অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা এতদিন শুধু য়াহূদীদের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। (সংকলক)

বনী হাশিমের সাথে বয়কট এবং তায়েফ সফর

কুরায়শের রোষাগ্নি

একদিকে কুরায়শ প্রতিনিধিদল মুসলমান মুহাজিরদেরকে আবিসিনিয়া থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, অপরদিকে হযরত উমর ফারূক ও হযরত হামযা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে কুরায়শের রোষানল আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। এবার তারা এই ষড়যন্ত্র করে যে, অবরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। এর ভিত্তিতে কুরায়শের সমগ্র শাখা গোত্রের লোকেরা একটি অঙ্গীকারপত্র প্রণয়ন করে-যার বিষয়বস্তু এই ছিল যে, যখন থেকে বনী হাশিম পরিবারের সাথে কোন ব্যক্তি আত্মীয়তা করবে না, বা তাদের কাছ থেকে কেউ কোন জিনিস ক্রয় করবে না এবং তাদেরকে কোন পানাহারসামগ্রী সররাহ করা হবে না। আর এই অঙ্গীকারপত্র ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকবে যতক্ষণ না বনী হাশিম মুহাম্মদ (সা)কে হত্যার জন্য কুরায়শের কাছে সোপর্দ করবে। মানসূর বিন ইকরামা এই অঙ্গীকারপত্র লিপিবদ্ধ করে এবং তা কা'বা শরীফের দরওয়াজায় ঝুলিয়ে রাখা হয়।

যদিও বনী হাশিমের সমগ্র লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি; তবু তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল মনে করা হত। এ কারণে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সমগ্র বনী হাশিমকে বয়কটের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা অপরিহার্য মনে করা হয়।

বাধ্য হয়ে বনী হাশিমের সমগ্র লোকেরা শাবে আবি তালিব (আবু তালিব উপত্যকা)-এ আশ্রয় নেয়। উত্তরাধিকার সূত্রে হাশিম ছিল ঐ উপত্যকাটির মালিক। প্রায় তিন বছর তাঁরদেরকে সেখানে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়। শুধুমাত্র হজ্জের মওসুমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে বের হয়ে এসে ইসলাম প্রচার করতে পারতেন।

অকথ্য নির্যাতন

বনী হাশিমের ঐ বন্দীকাল অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাটে। সাহাবা কিরাম (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তারা বলেন, ঐ সময়ে আমরা গাছের পাতা খেয়ে দিন কাটাতাম। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা রাতের বেলা একটি চামড়া আমার হস্তগত হয়। আমি সেটাকে পানি দিয়ে ধুইয়ে আগুনে সিদ্ধ করে নিই। এরপর পানির সাথে মিশিয়ে খেয়ে ফেলি।

ইবন সা'দ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় যখন কান্নাকাটি করত তখন অবরোধের বাইরে থেকেও সে কান্নার আওয়াজ শোনা যেত এবং কুরাইশরা তা শুনে ঠাট্টাবিদ্রূপ করত।

হজ্জের দিনগুলোতে কাফিররা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করাকে হারাম মনে করত। তাই ঐ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবরুদ্ধ উপত্যকা থেকে বের হয়ে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার জন্য জনগণকে নসীহত করতেন। হারাম মাসসমূহে (যীলকাদ, যিলহাজ্জ, মুহররম ও রজব) আরবের স্বীকৃত প্রথানুযায়ী কেউ কারো সাথে যুদ্ধবিগ্রহ করতে পারত না।

আবু লাহাবের কাজ এটাই ছিল যে, সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্(সা)-এর পিছনে পিছনে লেগে থাকত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে সে মানুষকে বলত, দেখ, এটা হচ্ছে একটা উন্মাদ, এর কথা শুনিও না। কেননা, এর কথা যে শুনবে এবং মানবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অবরোধের পরিসমাপ্তি

ঐ সময়ে একদিন হযরত খাদীজা (রা)-এর ভাইপো হাকীম বিন হাযাম, কিছু গম আপন এক ক্রীতদাসের মাধ্যমে খাদীজা (রা)-এর কাছে পাঠান। পথিমধ্যে আবু জেহেল তা দেখে ফেলে এবং গমগুলো ছিনিয়ে নিতে চায়। ঘটনাক্রমে আবু বাহ্তারী সেখানে এসে হাযির হন। যদিও তিনি কাফির ছিলেন তবু করুণাবশে বলে উঠেন, "এক ব্যক্তি তার ফুফুর কাছে কিছু খাবার পাঠাচ্ছে, আর তাতে তুমি বাধা দিচ্ছ?" এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মক্কার বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় লোক একত্রিত হয় এবং অঙ্গীকারপত্র ছিঁড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। আবু জেহেল এবং তার পক্ষের কিছু লোক এর ঘোর বিরোধিতা করে; কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় নি। এর মধ্যে এও লক্ষ্য করা গেল যে, কাবার দরজায় ঝুলিয়ে রাখা অঙ্গীকার পত্রটি উই পোকা সম্পূর্ণ রূপে খেয়ে ফেলেছে। অতএব বিভিন্ন গোত্রের লোক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বনী হাশিমের কাছে যায় এবং তাঁদেরকে উপত্যকা থেকে বের করে নিয়ে আসে। এভাবে মুসলমানদের ঐ দুর্যোগপূর্ণ সময় কালের অবসান ঘটে।

আ'মুল হুয্ন

অবরোধ থেকে বেরিয়ে আসার কয়েক দিন পর হযরত আবু তালিব ও হযরত খাদীজা (রা) মাত্র কিছু দিনের ব্যবধানে পর পর ইন্তিকাল করেন। এটা হচ্ছে নুবুওয়াতের দশম বর্ষের ঘটনা। আবু তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিরাপত্তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। আর হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ জীবন সঙ্গিণী, তাঁর প্রতি সীমাহীন সহানুভূতিশীলা এবং তাঁর ও তাঁর আদর্শের প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এই মহান ব্যক্তি দ্বয়ের আকস্মিক ইনতিকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এতই শোকাভিভূত হয়ে পড়েন যে, ঐ বছরটি 'আ'মূল হুয্ন' (শোক বর্ষ) নামে খ্যাতি লাভ করে।

মক্কাবাসীদের প্রবল বিরোধীতার প্রেক্ষিতে তায়েফ সফর

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফ সফরের সিদ্ধান্ত নেন। মক্কা থেকে পঞ্চাশ ষাট মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত তায়েফ হচ্ছে হিজাযের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। সেখানে ছিল অনেক নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তির বাস। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই ধারণা ছিল যে, যদি ঐ সব ব্যক্তি সৎপথে চলে আসে তাহলে 'দাওয়াতে হক'-এর ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য-সহানুভূতি পাওয়া যাবে এবং এতে সত্যানুসারীর (মুমিনের) সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। এই সফরে হযরত যায়দ বিন হারিছা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। এটা হচ্ছে নুবুওয়াতের দশম সালের (ইং ৬১৯) শাওয়াল মাসের ঘটনা।

হুযূর (সা) একের পর এক রাস্তার পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে পায়ে হেঁটেই মক্কা থেকে তায়েফে গিয়ে পৌছেন। তৎকালীন সময়ে আমর ইবন ইমায়র ইবন আওফ ছাকাফীর তিন পুত্র আবদিয়া লায়ল, মাসঊদ এবং হাবীব ছিল তায়েফের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। হুযূর (সা) একের পর এক ঐ তিন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাদের কাছে আল্লাহ্র পয়গাম পৌছান। দুর্ভাগ্যক্রমে ওদের কেউই সত্যের আহ্বানে সাড়া দেয় নি। বরং তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে অশিষ্ট ধরনের অনেক কথাবার্তা বলে। তাদের প্রথম জন বলে, আল্লাহ্ যদি তোমাকে রাসূল বানিয়ে থাকেন তাহলে আমি কা'বার সম্মুখেই আমার দাড়ি কামিয়ে ফেলব। দ্বিতীয় জন বলে, রাসূল বানানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পান নি? তোমার তো একটি সওয়ারীরও সংস্থান নেই। আল্লাহ্ তা'আলা যদি একান্ত কাউকে রাসূল বানাতে চাইতেন তাহলে

নিশ্চয়ই কোন শাসক বা সর্দারকেই এজন্য মনোনীত করতেন। তৃতীয় জন বললো, আমি তোমার সাথে কখনো কথা বলব না। কেননা আমি যদি তোমার কথা অগ্রাহ্য করি তাহলে এটা হবে ভয়ংকর ব্যাপার। আর যদি তুমি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে থাক তাহলে তোমার সাথে কথা বলাই তো উচিত নয়।

তাদের এইসব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি শুধু এই চাই যে, তোমরা তোমাদের এইসব চিন্তাধারা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ। এমন যেন না হয় যে, এগুলো অন্যান্য মানুষের পদস্খলনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তিরস্কার, হাততালি এবং পাথর নিক্ষেপ

ঐ হতভাগারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর শেষ উপদেশটিও গ্রহণ করেনি। তারা তাদের ক্রীতদাস এবং বখাটে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করল এই মর্মে যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়ায করতে থাকেন তখন তারা যেন তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনগণকে উপদেশ দিতে শুরু করতেই ঐ বখাটেরা তাঁর উপর এমনভাবে পাথর বর্ষন করল যে, তাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল। যখন তিনি তায়েফ থেকে ফিরে আসছিলেন তখন ঐ পাষন্ডরা সারিবদ্ধভাবে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে দু'তিন মাইল পর্যন্ত তাঁর উপর অনবরত: পাথর বর্ষণ করলো। তারা তাঁকে উদ্দেশ্য করে হাত তালি দিল এবং অকথ্য ভাষায় গালি গালাজও করল। শেষ পর্যন্ত তিনি বাধ্য হয়ে একটি বাগানের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। বাগানটির মালিক ছিল রাবীআর পুত্র উতবা এবং শায়বা। তিনি ঐ বাগানের একটি আংগুর ঝোপের ছায়ায় উপবেশন করলেন। তায়েফের বখাটেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর যে জুলুম অত্যাচার চালিয়েছিল উতবা ও শায়বা তা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা তাদের ক্রীতদাস আদ্দাসকে এক ছড়া আংগুর দিয়ে তাঁর কাছে পাঠাল। তিনি 'বিসমিল্লাহ্' বলে তা খেতে শুরু করলেন। তখন আদ্দাস বিস্ময়াবিভূত নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে বলল, এটা (বিসমিল্লাহ্) এমন কথা, যা এখানকার বাসিন্দারা বলে না।

হুযূর (সা) : তুমি কোথাকার লোক ? তোমার ধর্ম কি ?
আদ্দাস : আমি খ্রীস্টান এবং নেনভয়ের অধিবাসী।
হুযূর (সা) : তুমি কি পুণ্যবান বান্দা ইউনূস (আ) এর শহরের অধিবাসী ?
আদ্দাস : আপনি কি জানেন ইউনুস কে ছিলেন এবং কিরূপ ছিলেন ?
হুযূর (সা) : তিনি আমার ভাই। তিনিও নবী ছিলেন এবং আমিও নবী।

আদ্দাস একথা শুনতেই সমভ্রমে মাথা নুয়ালো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মাথা, হাত ও পদদ্বয় চুম্বন করল।

হুযূর (সা) এর দু'আ

এত জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অন্তর আল্লাহ্‌র মুহাব্বাতে ও প্রেম ভালবাসায় ছিল পরিপূর্ণ। তখন তিনি এই দু'আ করেন—

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আমার দুর্বলতা, অসহায়তা এবং মানুষের চোখে মর্যাদাহীনতার ফরিয়াদ জানাচ্ছি। হে পরম করুণাময়, তুমিই অসহায়-দুর্বলদের মালিক; নিশ্চয় আমার মালিকও তুমিই। যদি তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হও তাহলে আমি কোন বিপদাপদেরই পরোয়া করি না। কেননা তোমার হিফাযত ও করুণা আমার জন্য অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রশস্ত। আমি তোমার সত্তার নূরের আশ্রয় নিচ্ছি, যে নূর দ্বারা সমগ্র অন্ধকার আলোকিত হয়ে উঠে এবং দুনিয়া-আখিরাতের সমগ্র সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তুমি আমার উপর নারাজ হয়ো না প্রভু। আমি তোমার রেযাবন্দী ও সন্তুষ্টির প্রত্যাশী। পুণ্যকর্ম করার কিংবা পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার যাবতীয় ক্ষমতা তোমার কাছ থেকেই আসে।"

এখন চিন্তা করুন, উপরোক্ত দু'আর মধ্যে আল্লাহ্ প্রেম এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কাছে আত্মনিবেদনের যে ছবি ভেসে উঠছে সে ছবি কি চন্দ্র-সূর্য, হযরত মুহাম্মদ (সা) ছাড়া বিশ্বের অন্য কোন ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে?

সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠতম নমুনা

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদেরকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁদের এক বিরাট সংখ্যক মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন। খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও আহত হন। হযরত আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একদা জিজ্ঞাসা করেন, আপনার উপর কখনো এর চাইতেও কঠিন সময় কি এসেছে ? হযযূর (সা) উত্তর দেন, "হে আইশা! তোমার জাতির পক্ষ থেকে কঠিন মুহূর্ত আমি দেখেছি।" এরপর তিনি এ প্রসংগে তায়েফের ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমার কাছে পাহাড়সমূহের ফিরিশতা এসে বললো, আপনি যদি হুকুম দেন তাহলে পার্শ্ববর্তী পাহাড় দু'টি এইসব লোকের উপর উল্টিয়ে দিই এবং ওরা পিষ্ট হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। আমি বললাম, না না, আমি আশা করি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যারা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে।

এ-ই ছিল হুযূর (সা) এর দয়া ও রহমতের মাহাত্ম্য, এ-ই ছিল সৃষ্টির উপর তাঁর অপরিসীম স্নেহের দৃষ্টান্ত, ধৈর্য ও দৃঢ়তার বিস্ময়কর উদাহরণ, সৃষ্টির উপকার সাধনের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের স্বরূপ এবং আল্লাহ্র পয়গামের সত্যতার উপর তাঁর অতুলনীয় বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। বিশ্ববাসীর কাছে আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়ার তাঁর যে অপরিসীম আকুতি উক্ত বাণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা বিশ্বের অন্য কোন ব্যক্তি সত্তার বাণীতে কখনো লক্ষ্য করা যায় নি।

তায়েফের ঘটনার গুরুত্ব

দেখুন, হযূর (সা) সেই পয়গাম নিয়ে তায়েফে গিয়েছিলেন, যে পয়গাম ছিল মানুষের সর্বাংগীন শান্তি ও মঙ্গলের। এই কর্মপন্থার চাইতে উৎকৃষ্ট কোন কর্মপন্থা সেখানকার মানুষের কাছে ইতিপূর্বে পৌঁছে নি। এই পয়গাম ছিল তায়েফবাসীদের শান্তি ও মঙ্গলের পয়গাম। এক্ষেত্রে কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এতদসত্ত্বেও হতভাগা তায়েফবাসীরা শুধু ঐ পয়গামই অস্বীকার করে নি বরং হুযূর (সা)-এর উপর তারা যত নির্যাতন করতে পারে নির্বিঘ্নে সবই করে। এরপরও হুযূর (সা) এর পবিত্র মুখ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারিত হয় নি। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে তাদের যাবতীয় জুলুম-নির্যাতন ও দুঃখকষ্ট সহ্য করেন, কিন্তু তাদের উপর এ কারণে কোন বিপদ আসুক তা কখনো চান নি। সত্যের পয়গাম পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তায়েফ সফর অপরিসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার একটি অতি দুর্লভ ঘটনা। অন্য কোন 'দায়ীয়ে হক' (সত্যের প্রতি আহ্বানকারী)-এর ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা কখনো ঘটে নি। তায়েফ সফর হুযূর (সা) এর পবিত্র জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই নয়, বরং একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক মোড়ও বটে। পরিষ্কার হল যে, মক্কা এবং তায়েফ উভয় ভূ-খন্ডই হুযূর (সা) এর 'পয়গামে হক' আর শুনতে রাজী নয়। এখন ইয়াছরিবের দরজা তাঁর জন্য উন্মুক্ত হওয়ার পথে, অতি অল্প দিনের মধ্যে মদীনা মুনাওওরার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মদীনায়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সেই সোনালী যুগের সূচনা হয়, যে যুগে মাত্র ত্রিশ/চল্লিশ বছর সময়কালের মধ্যে ভূগোলকের একটি বিরাট অংশ 'দাওয়াতে হক'-এর কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে 'তায়েফ সফর' হিজরতের প্রাথমিক ভূমিকারূপেই প্রতিপন্ন হয়।[৮] [সংকলক]

ইস্‌রা অথবা মি'রাজ

সাধারণ অবস্থা

কেউ কেউ এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঘটনার সাধারণ অবস্থা বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। এরপর বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে মতপার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এখানে শুধুমাত্র ঐসব হাকায়িক (বিষয়বস্তু) মোটামুটিভাবে উপস্থাপন করা অপরিহার্য যেগুলোর সাহায্যে মিরাজের হাকীকত উপলব্ধি করা যেতে পারে।

মরহুম মাওলানা হাকীম আবদুর রঊফ দানাপুরী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর একান্ন বছর ন'মাস বয়সে মি'রাজের ঘটনা ঘটে। যমযম ও মাকামে ইব্‌রাহীমের মধ্যবর্তী স্থান থেকে তিনি বুরাকে চড়ে হযরত জিবরীল (আ) এর সঙগে প্রথমে 'বায়তুল মুকাদ্দাস' যান। এরপর সেখান থেকে তাঁকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের সেই প্রান্তবর্তী মন্‌যিলসমূহে ডেকে পাঠানো হয়, যেখানে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতারাও যেতে পারেন না। আর ঐ রাতেই তাঁর উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়।[৯]

কাযী সুলায়মান মানসূরপুরী লিখেছেন, নবুওয়াতের দশম বর্ষে ২৭শে রজব তারিখে মিরাজের ঘটনা ঘটে। ঐ দিন আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-কে তাঁর আসমান-যমীনের বাদশাহীসমূহ প্রত্যক্ষ করান। প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গমন করেন। সেখানে তাঁর ইমামতীতে আম্বিয়া কিরাম সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি আসমানসমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং জায়গায় জায়গায় নবীদের সাথে সাক্ষাত করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' (প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষ) এবং বায়তুল মা'মূর পর্যন্ত গিয়ে পৌছেন। সেখানে তিনি আল্লাহ্‌র বিশেষ নৈকট্য লাভ করেন এবং নানাবিধ ওহী লাভে ধন্য হন।[১০]

মরহুম কাযী সাহেব টীকায় লিখেছেন, "প্রকাশ থাকে যে, দৈহিক উরূজ (ঊর্ধগমন)-কে অস্বীকার করা বর্তমান যুগের রসকষহীন দর্শনের দৃষ্টিতেও বেমানান। কেননা যে মহাশক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা বিরাট বিরাট গ্রহ-নক্ষত্রকে মহাশূন্যে ধরে রেখেছেন, তিনি নিঃসন্দেহে মানুষের এই ক্ষুদ্র দেহকেও মহাশূন্যে নিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখেন। আজকাল নাইট্রোজেনের শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ উড়োজাহাজে বসে মহাশূন্যে উড়াউড়ি করছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে তাঁর নবীকে 'বুরাক' ('বুরাক', 'বারক' ধাতু থেকে উৎপন্ন। বুরাক শব্দটি বিদ্যুতের গোপনীয় শক্তির প্রতিই ইঙ্গিতবহ) সওয়ারীর মাধ্যমে আপন আসমান-যমীনের রাজ্যসমূহ পরিভ্রমণ করানোটা আদৌ কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। আমার বিশ্বাস এই যে, মিরা'জ দৈহিকভাবে হয়েছিল এবং জাগ্রত অবস্থায়ই"।[১১]

মরহুম সাইয়িদ সুলায়মানের অভিমত

সীরাতুন্নবী তৃতীয় খণ্ডে রাতের বেলা ভ্রমণ বা ঊর্ধলোকে গমনের বিবরণ কমবেশী আশি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে রয়েছে (পৃষ্ঠা ৩৫৫-৪৩৫)। এতে মিরাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। যেমন, আম্বিয়া কিরামের মহাশূন্যের রাজ্যসমূহ পরিভ্রমণ, নবী (সা)-এর মিরাজ বা ঊর্ধলোকে গমন, তার সময়, তারিখ ও সংখ্যা, এ সম্পর্কিত সহীহ রিওয়ায়াতসমূহ, ঘটনাসমূহের হাকীকত, এর উপর কাফিরদের মিথ্যা আরোপ, নবী (সা) কি আল্লাহ্‌কে দেখেছিলেন ? মিরাজ দৈহিক ছিল, না আত্মিক ? জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল, না ঘুমন্ত অবস্থায় ? ইত্যাদি

ইত্যাদি। এরপর সম্পূর্ণ বনী ইসরাঈল সূরাকে মি'রাজের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন নবী (সা) 'নাবীউল কিবলাতাইন' হলেন, বনী ইসরাঈলের মুদ্দাতে 'তাওলিয়াত' (তত্ত্বাবধান কাল) এর পরিসমাপ্তি ঘটল, মক্কায় কাফিরদের সম্পর্কে সর্বশেষ ঘোষণা প্রদান করা হল, মিরাজের আহকাম ও নির্দেশাবলী, হিজরত, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের 'ফরযিয়াত' (ফরয হওয়া) কুরআন, কিয়ামত, মি'রাজ ও মুজিযাত, হযরত মূসা (আ) এর ঘটনাবলী থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ, মিরাজের উপহারসমূহ এবং এর রহস্যঘন দৃশ্যাবলী।

এইসব বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে নয়, তবে সহীহ্ রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে মূল ঘটনার ধারাবাহিক অবস্থা বর্ণনা, অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।

সহীহ্ রিওয়ায়াত

মাওলানা সাইয়্যিদ সুলায়মান বলেন, বহু সংখ্যক সাহাবী এই ঘটনার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হাদীস ও সীরাত গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লামা যারকানী এ ধরনের বর্ণনাকারী চল্লিশজন সাহাবীর কথা তাঁদের নামসহ উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনে কাছীর সূরা বনী ইসরাঈলের তাফসীরে বেশীর ভাগ রিওয়ায়াতকে একত্রিত করে দিয়েছেন। এর মধ্যে সাহীহ্, কাভী, যায়ীফ, মাওকূফ, মুরসাল, মুনকার সব রকমেরই রিওয়ায়াত রয়েছে। সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে সহীহ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে পৃথকভাবে মি'রাজের ঘটনা উল্লেখিত আছে। তিরমিযী, নাসায়ী তথা সকল হাদীসগ্রন্থেরই বিভিন্ন অধ্যায়ে সংক্ষেপে ও প্রাসঙ্গিকভাবে এই ঘটনার বর্ণনা এসেছে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটাকে হযরত আবূ যর, হযরত মালিক বিন সা'সাহ, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ— এই সাতজন মহান সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন।

মূল ঘটনা

মাওলানা সাইয়্যিদ সুলায়মান বলেন, যখন ইসলামের কঠোর ও বিপজ্জনক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছিলো এবং হিজরতের পর শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছিল তখন সেই মহান রাত্রি ও সৌভাগ্যের মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়, যা ভাগ্যলিপিতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মহাশূন্যের রাজ্যসমূহ পরিভ্রমণের জন্য নির্ধারিত ছিল। 'রূহুল আমীন' (জিবরীল) সেই বাহন, যা বিদ্যুতের চাইতেও দ্রুতগামী এবং আলোকের চাইতেও অধিক দ্রুত গতি সম্পন্ন (এটা লাহূতের পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট),হরমে কাবায় নিয়ে আসেন।

হযরত আবূ যর (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত জিবরীল (আ) যমীনে অবতরণ করেন। তিনি তাঁর (রাসূলুল্লাহর) পবিত্র বক্ষ বিদীর্ণ করে তা যমযম কূপের পানি দ্বারা ধৌত করেন। এরপর ঈমান ও হিকমত দ্বারা ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে আসেন এবং তা তাঁর পবিত্র বক্ষের মধ্যে ঢেলে দিয়ে (বক্ষের) দরজা বন্ধ করে দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হাত ধরে তাকে আসমানের উপর নিয়ে যান। সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা), হযরত আদম, হযরত ইবরাহীম, হযরত ইদরীস, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁকে 'সিদরাতুল মুনতাহা'য় পরিভ্রমণ করান হয়। এবার তিনি এমন জায়গায় গিয়ে পৌছেন যেখানে 'কলামে কুদরাত' (কুদরতের লেখনী) এর চলার শব্দ আসছিল। এই মুহূর্তে তাঁর উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। হযরত জিবরাঈল তাঁকে জান্নাতের মধ্যেও নিয়ে যান।

কোন কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বুরাকের উপর চড়ে ঊর্ধ্বে গমন করেন। তিনি নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলেন এবং হাতীমে শুয়ে ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি বায়তুল মা'মূরে পিঠ লাগিয়ে (হেলান দিয়ে) বসে ছিলেন। 'সিদরাতুল মুনতাহা'-এর উপর 'শানে রাব্বানী' এর প্রতিচ্ছায়া ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসমান থেকে যমীনে অবতরণ করেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে

দেখেন, সেখানে আম্বিয়া (আ)-এর সমাবেশ ঘটেছে এবং হযরত মূসা এবং হযরত ইবরাহীম (আ) নামাযরত অবস্থায় রয়েছেন। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন সে নামাযে 'ইমামত' এর দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হাফিয ইবনে কাইয়িম (র)

হাফিয ইবনে কাইয়িম (র) যাদুল মা'আদে লিখেছেন, ইবনে ইসহাক (র), হযরত আইশা (র) ও হযরত মুআভিয়া (র) এবং হযরত হাসান বসরী (র) থেকে এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন যে, মি'রাজে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আত্মাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তখন তাঁর দেহ হারিয়ে যায় নি অর্থাৎ তা দুনিয়ায় আপন জায়গায়ই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু 'মি'রাজ স্বপ্ন ছিল' এবং 'মিরাজ আত্মার মাধ্যমে হয়েছিল –দেহের সাথে হয়নি'–এ দু'কথার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে যা কিছু দেখে তার অনুভূত রূপ তার সামনে ভেসে উঠে। আর আত্মিকভাবে রাতের বেলা ভ্রমণের অর্থ হচ্ছে পবিত্র রূহকে ঐ সব জায়গা পরিভ্রমণ করানো হয়েছে। স্বপ্নে এরূপ করা যায় না। এটা হচ্ছে স্বপ্নের চাইতে অধিক পরিপূর্ণ ও অধিক বাস্তব অবস্থা। জমহূর উলামার মতে, ইসরা বা রাতের বেলা ভ্রমণ দেহ ও আত্মার সাথেই হয়েছিল।

মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা কিছু লাভ করেছিলেন তা ছিল এর চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ যা আত্মার দেহ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর লাভ করা যায়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমনি অলৌকিকতার স্তরে অবস্থান করেছিলেন যে, তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করা হল এবং তিনি জীবিত থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যথা পেলেন না। অনুরূপভাবে স্বয়ং তাঁর পবিত্র আত্মাকে উপরে তুলে নেওয়া হল এমতাবস্থায় যে, তাঁর মৃত্যু হল না। তিনি (সা) ছাড়া অন্য কারো আত্মার পক্ষেই মৃত্যু তথা দেহ থেকে চিরতরে পৃথক হওয়া ছাড়া এই ঊর্ধগমন সম্ভব হয়নি। আম্বিয়া (আ)-এর আত্মাসমূহ, যারা ওখানে অবস্থান করছিলেন তাঁরা তো দেহ থেকে চিরতরে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র আত্মা তাঁর দেহ জীবিত থাকা অবস্থায়ই সেখানে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে আবার ফিরেও এসেছিল।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিছে দেহলভী

শাহ সাহেব বলেন, মি'রাজে তাঁকে মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরপর সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা এবং সেখান থেকে যেখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। আর এসব কিছু তাঁর পবিত্র দেহের ক্ষেত্রে জাগ্রত অবস্থায়ই ঘটেছিল। কিন্তু যেহেতু এই স্থান 'আলমে মিছাল' ও 'আলমে যাহির' এর মধ্যবর্তী এবং উভয় আলমের হুকুমসমূহ প্রকাশিত হয়েছে এবং আমার উপর আত্মিক ব্যাপারসমূহ দেহের স্বরূপেই প্রতিভাত হয়েছে। এই ঘটনা রাজির মধ্যকার প্রতিটি ঘটনারই একটি ব্যাখ্যা রয়েছে। তিনি বলেন,

(ক) বক্ষ বিদীর্ণ করা, তারপর ঈমান দ্বারা তা পরিপূর্ণ করার অর্থ তাঁর মধ্যে মালাকিয়াত (ফিরিশতাসুলভ গুণ)-এর আলোকরাজি প্রাধান্য লাভ করেছে এবং মানবতাসুলভ আলোকরাজি নিভে গেছে।

(খ) বুরাকের উপর আরোহণ করার অর্থ এই যে, তাঁর 'নাফসে নাতিকাহ (মানবিক আত্মা) 'রূহে হায়ওয়ানী'-এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে, অর্থাৎ তাঁর মানবিক আত্মার হুকুমসমূহ (ক্রিয়াকলাপ) পাশবিক আত্মার উপর জয়লাভ করেছে।

(গ) মসজিদে আকসায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এজন্য যে, 'মালা-ই-আলা' এর ইচ্ছা সমূহের সংযোগ কেন্দ্র এবং আম্বিয়া (আ) এর দিকে একটি পাদ প্রদীপ, যা থেকে আলো ছিনিয়ে নিয়ে মানবীয় গোলক আলোকিত করা হয়।

(ঘ) আম্বিয়া (আ) এর সাথে সাক্ষাত এবং তাদের ইমামতী করার অর্থ হচ্ছে, তাঁরা সকলেই একই সূত্রে 'হাযীরাতুল কুদ্স্' এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। উপরন্তু এটা হচ্ছে তাঁর ঐ সব মর্যাদায় পরিপূর্ণতার প্রকাশ, যেসব মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি এবং আম্বিয়া কিরাম সাধারণ মানুষ থেকে একটি পৃথক স্তরে অবস্থান করেছেন।

(ঙ) ক্রমে ক্রমে আসমানসমূহের বিভিন্ন স্তরে আরোহণ করা এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র আরশে উপনীত হওয়ার অর্থ এই যে, প্রতিটি আসমানে, যে সব ফিরিশতা মোতায়েন আছেন, এবং যে যে স্তরে পৌঁছে তিনি মহান ব্যক্তিদের (আম্বিয়া কিরামের) সাথে সাক্ষাত করেছেন তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং ঐসব পরিচালন-কৌশল সম্পর্কেও অবহিত হওয়া, যা আসমানে ফিরিশতাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

(চ) সিদ্রাতুল মুন্তাহা অস্তিত্বের বৃক্ষ। এর এক অংশ অপর অংশের সাথে গ্রথিত, অতঃপর একই পরিচালনার মধ্যে একত্রিত–যেভাবে গাছের ডালপালাসমূহের পরস্পর বিভিন্নতা সত্ত্বেও, একটির অস্তিত্ব অপরটির অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কেননা তাদের প্রত্যেকটিই 'কুওয়াতে গাযিয়াহ' (খাদ্য গ্রহণ শক্তি) ও 'কুওয়াতে নামিয়াহ (বর্ধন শক্তি)-এর পরিচালনার ক্ষেত্রে একত্রিত তথা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

(ছ) যে আলোকরাজি ঐ বৃক্ষকে ঢেকে রেখেছিল তা হচ্ছে ঐসব তানায্যুলাতে ইলাহীয়া ও 'তাদ্বীরাতে রাহমানিয়াহ' (এলাহী দান ও পরম করুণাময়ের পরিচালন কৌশল) যা ঐ 'আলাম যাহির' এর সেখানেই চমকায়, যেখানে এগুলো গ্রহণ করার ক্ষমতা বিদ্যমান।

(জ) সেখানে নদীসমূহের স্রোত পরিদৃষ্ট হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ওটা হচ্ছে করুণা, জীবন ও বর্ধনের উৎসভূমি, যা আলমে মালাকূতেও সেভাবে জারী আছে যেভাবে জারী আছে আলমে যাহিরে।

(ঞ) 'বায়তুল মামূর' এর অর্থ হচ্ছে সেই 'তাজাল্লীয়ে এলাহিয়া' যার দিকে মানুষের যাবতীয় সিজ্দা ও ইবাদত-বন্দেগী ফিরে যায়। ওটা ঘরের আকৃতিতে এজন্য প্রতিভাত হয়েছে যে, তা যেন ঐ সব কিবলার মত হয়, যা মানুষের মধ্যে কাবা ও বায়তুল মুকাদ্দাসের আকারে বিদ্যমান আছে।

পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিদের আকিদা

মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী (র) ইবনে ইসহাক (র) এর ভাষায় এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিদের যে আকীদা বর্ণনা করেছেন তা হলো, "তাঁর এই রাতের বেলা ভ্রমণ এবং এ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে পরীক্ষা এবং কাফির ও মুমিন যাচাই করার সূত্র। এর মধ্যে বিবেকবানদের জন্য রয়েছে উপদেশ–যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছে এবং তাকে চিরন্তন সত্য বলে জেনেছে। যারা আল্লাহ্র কার্যাদির উপর বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য এর মধ্যে হিদায়াত ও রহমত রয়েছে–রয়েছে সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকার অনুপ্রেরণা। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাকে রাতের বেলা উর্ধলোকে নিয়ে যান, যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন, যাতে তাকে আপন নিদর্শনাদি দেখিয়ে দেন যেটুকু তিনি দেখতে ইচ্ছা করেন। তিনি অবলোকন করেন আল্লাহ্র সেই কুদরত, যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা যা চান তা-ই করেন।[১২]

সূরা বনী ইসরাঈল ও মি'রাজের ঘটনা

মরহুম সাইয়িদ সুলায়মান (র) বলেন, "সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, কুরআন মজীদের সূরা বনী ইসরাঈলের- শুধুমাত্র প্রাথমিক তিন চারটি আয়াতে মি'রাজের বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু আমি সূরা বনী ইসরাঈল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার পড়েছি এবং প্রতিবারই মনের মধ্যে এই প্রতীতি জন্মেছে যে, এই গোটা সূরাটাই

মি'রাজের রহস্য, তত্ব, তথ্য, উপদেশ, ফলাফল, আহকাম ও ঘোষণারাজিতে পরিপূর্ণ। অতঃপর সাইয়িদ সুলায়মান মরহুম এই সূরার যে প্রকাশ্য বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করেছেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

(১) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দুই কিবলার নবী হওয়া। (সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত-১)

(২) বনী ইসরাঈলের 'মুদ্দাতে তাওলিয়াত' (কর্তৃত্ব কাল)-এর পরিসমাপ্তি ঘটানো। (ঐ আয়াত-২-৭)

(৩) কুরায়শের নামে শেষ ঘোষণা। (ঐ আয়াত ৮-২১)

(৪) মি'রাজের আহ্কাম ও অসীয়তসমূহ। (ঐ আয়াত ২২-৩৯)

(৫) হিজরত এবং আযাবের বর্ণনা। (ঐ আয়াত ৫৭-৭৭)

(৬) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়া। (ঐ আয়াত ৭৮)

(৭) হিজরতের দু'আ (ঐ আয়াত ৭৯)

(৮) নুবুওয়াত, কুরআন, কিয়ামত, মি'রাজ এবং মু'জিযা সমূহ। (ঐ আয়াত ৮২-১০০)

(৯) হযরত মূসা (আ) এর ঘটনাবলী থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ। (ঐ আয়াত ১০১-১০৪)

মি'রাজের বিশেষ উপহারসমূহ

সাইয়িদ সুলায়মান লিখেছেন, মি'রাজে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে আরো দুটি বিশেষ উপহার প্রদান করা হয়। এক ঃ এই সুসংবাদ যে, উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে যে ব্যক্তি শিরক করবে না, আল্লাহ্ তা'আলার মাগফিরাতের (ক্ষমার) ছায়ায় সে আশ্রয় পাবে। দুই ঃ এই সময়েই একটি বিশেষ ফরমান হিসাবে সূরা বাকারার সর্বশেষ রুকূ রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রদান করা হয়। এই রুকূর মধ্যে মানুষকে সর্বপ্রথম ঈমান পরিপূর্ণ করার মূলনীতি এবং ক্ষমা ও মাগফিরাতের শিক্ষা প্রদান করা হয়। এ থেকে এটাও জানা যাবে যে, প্রথম উপহারের সুসংবাদ প্রকৃতপক্ষে ঐ সব আয়াতের মধ্যেই উল্লেখিত আছে।

মি'রাজের রহস্যঘন দৃশ্য

সূরা বনী ইস্রাঈলের প্রারম্ভে আল্লাহ্ তা'আলা শুধুমাত্র দুটি শব্দের মাধ্যমে মি'রাজের আত্মিক (রূহানী) দৃশ্যের বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন। শব্দ দু'টি হলো- لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا

"(আমার বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছিলাম) তাঁকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য।"-(১৭ ঃ ১)

কি ছিল সেই সব নিদর্শন? সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অক্ষম অযোগ্য মানুষের ভাষায় কোন শব্দ আছে কি? হ্যাঁ, আছে; তবে তা অসম্পূর্ণ। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের জ্ঞান, আমাদের কল্পনা, আমাদের অনুমান-মোটকথা, যা কিছু আমাদের কাছে আছে তার আওতা, আমাদের অনুভূতি ও বুদ্ধি-বিবেচনা থেকে আগে বাড়তে পারে নি। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, ঐ সব ভাবার্থ, যা না সাধারণ মানবীয় অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত, আর না বুদ্ধি-বিবেচনা ও ধারণা-কল্পনার আওতাধীন-তার সংকুলান শব্দ ও বাক্যের মধ্যে কী করে হতে পারে? যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরাতের দ্বারা এই সব ভাবার্থকে অক্ষর ও শব্দের জামা পরিয়েও দেন তবু মানুষের মন-মস্তিষ্ক সেগুলোকে বুঝার এবং হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি কোথা থেকে পাবে? (সংকলক)

রাতের বেলা ভ্রমণ সম্পর্কে মাওলানার অভিমত

হাকীকতের দলীলাদি প্রত্যক্ষকরণ

মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, 'ইসরা' তথা রাতের বেলা ভ্রমণ সম্পর্কিত ঘটনার উপর যা কিছু লিখেছেন, তা ব্যাপক অর্থ জ্ঞাপক; তবে খুবই সংক্ষিপ্ত। এ কারণে আমাকে ভুমিকায় বিভিন্ন বিজ্ঞজনের এ সম্পর্কিত মতামত উদ্ধৃত করতে হয়েছে। মাওলানা বলেন,

মদীনায় হিজরতের আনুমানিক এক বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর 'ইসরা' তথা রাতের বেলা ভ্রমণের ঘটনাটি ঘটে, যা প্রধানত: মি'রাজ নামে খ্যাত। এ সূরার (সূরা বনী ইসরাঈলের) প্রথমে ঐ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ ঘটনার উদ্দেশ্য কি ছিল তা তাতে পরিস্কার ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন– لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا

"তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য (রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছিলাম)।"–(১৭ ঃ ১)

অর্থাৎ এই ঘটনা আমি এজন্য ঘটিয়েছিলাম যাতে সে হাকীকতের দলীলাদি প্রত্যক্ষ করে নিতে পারে। এ থেকে জানা গেল যে, এটি ছিল ওহীর পরিপূর্ণতার ব্যাপার। এ কারণেই অত:পর বলা হয়েছে–

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِىْ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ .

"আর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, যা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যা সব কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ-নির্দেশ এবং দয়া স্বরূপ-যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।–(৬ ঃ ১৫৪)

এভাবে হযরত মূসা (আ) এর অহীর ব্যাপারটিও তূর পাহাড়ে ই'তিকাফের মাধ্যমে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। অর্থাৎ তাকে শরীয়তের কিতাব দেওয়া হয়েছিল। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন।"

এখানে 'মসজিদুল হারাম' দ্বারা মক্কা এবং 'মসজিদুল আকসা' দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসের হায়কলকে বুঝাচ্ছে। একে আক্সা এজন্য বলা হয়েছে যে, আরবদের জন্য নিকটতম ইবাদতখানা ছিল খানা কা'বা, আর দূরবর্তী ইবাদতখানা ছিল হায়কল।

ঘটনার ধরন

ইসরার ধরন কি ছিল? এটা কি জাগ্রত অবস্থায় ঘটেছিল, না ঘুমন্ত অবস্থায়? এটা কি শুধু আত্মার উপর ঘটেছিল, না দেহ এতে শরীক ছিল? এ ব্যাপারে সাহাবা কিরাম (রা) ও পূর্ববর্তী জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ সাহাবী ও তাবিয়ী এই মত পোষণ করেন যে, আত্মা ও দেহ-উভয়ের উপরই এই ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা) হাসান (রা) মুআভিয়া (রা) ইবনে ইসহাক (রহ্) প্রমুখের মতে, এটা ছিল একটি আত্মিক ঘটন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আম্বিয়া কিরাম (আ)-এর অবস্থা ও কার্যক্রম

এমন একটি জগতের সাথে সম্পর্কিত, যেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কোন কাজ দেয় না। আমাদের প্রত্যেকটি বিশ্লেষণ এমন কোন অবস্থার ধারণা সৃষ্টি করে দেবে, যা সাধারণভাবে আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু আম্বিয়া কিরাম (রা) এর ক্ষেত্রে ঘটনা যেভাবে ঘটে তার ধরনই আলাদা। কেননা সেগুলো আমাদের অনুভূতি ও উপলব্ধির আওতা বর্হিভূত।

নুবুওয়াতের হাকীকত

স্বয়ং নুবুওয়াতের হাকীকত কি? ওহীর ব্যাপারটি কিভাবে সম্পন্ন হয়? এক্ষেত্রে কি আমাদের কোন কোন বিশ্লেষণ প্রকৃত অবস্থার পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ হতে পারে। বুখারী-মুসলিমের একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন ওহী আসে তখন মনে হয় যেন তা ঘণ্টাধ্বনি। বলাবাহুল্য, এটি হচ্ছে একটি উপমা? এ উপমা গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হল, ওহী-সম্পর্কিত ঘটনার এমন একটি নিকটবর্তী ধারণা দেওয়া, যা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। অন্যথায় ওহীর আগমনের আওয়াজ তো ঘণ্টাধ্বনির মত হতে পারে না।

নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থা

অতএব ইসরার ব্যাপারেও আমাদের সীমাবদ্ধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কোন কাজ হবে না। আর এ কারণেই এক্ষেত্রে সাহাবীরা পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করেছেন। যারা বলেন, এটা জাগ্রত অবস্থায় ঘটে নি, তাঁদের যুক্তি হলো, এটা আমাদের দৈহিক গতিবিধির সাথে সম্পর্কিত কোন ঘটনা ছিল না। আর যারা জোর দিয়ে বলেন, এটা জাগ্রত অবস্থায় ঘটেছিল, তাদের যুক্তি হলো, এটাকে শুধুমাত্র স্বপ্নের ঘটনা বলা যায় না। প্রকৃত ব্যাপার এই উভয় পক্ষই তাদের চিন্তা-ধারণা অনুযায়ী যেটা সত্য, সেটাকে গ্রহণ করেছেন। অতএব উভয়পক্ষই সত্যের উপর রয়েছেন বলা চলে। খোদ বুখারী-মুসলিমের হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি তখন এমন অবস্থায় ছিলাম যে, না ঘুমন্ত, আর না জাগ্রত। (بين النائم واليقظان) এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এই ঘটনাকে এমন ঘটনা আখ্যা দেওয়া যাবে না, যা আমরা স্বপ্নের মধ্যে দেখে থাকি। এটা ছিল ঐ দুই অবস্থার মধ্যবর্তী একটি ভিন্ন ধরনের অবস্থা, যার কোন বিশ্লেষণ আমাদের জানা নেই। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত ব্যাখ্যা 'আল বয়ান'-এ পাওয়া যাবে।

রু'ইয়া বা স্বপ্নের উপর আলোচনা

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ؕ

"আমি যে স্বপ্ন (দৃশ্য) তোমাকে দেখিয়েছি, তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য।" –(১৭ : ৬০)

উল্লেখিত রু'ইয়া বা স্বপ্নই হচ্ছে মি'রাজের ঘটনা। এই বিশ্লেষণ আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস, সায়ীদ বিন জুবায়র, মাসরূক, কাতাদা, মুজাহিদ, ইকরামা, ইবনে জুরায়জ (রা) প্রমুখের। হাফিয ইবনে কাছীর (র) লিখেছেন, এর উপর বিজ্ঞ মুফাস্সিরগণ একমত। অতএব যে সব মুফাস্সির এই রু'ইয়াকে অন্য রু'ইয়ার অর্থে ব্যবহার করেছেন–যেমন মক্কা বিজয়ের রু'ইয়া (স্বপ্ন) তাঁদের কথা এখানে গ্রহণীয় হতে পারে না। কেননা সূরা বনী ইসরাঈল সর্ব সম্মতিক্রমে একটি মক্কী সূরা। তাছাড়া ঐ ঘটনা একযুগ পর মদীনায় ঘটেছিল। তাছাড়া সামঞ্জস্য বিধানের জন্য নানা ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান আল্লাহ্র কিতাব কুরআনকে একটি প্রহেলিকায় পর্যবশিত করারই নামান্তর।

উপরোক্ত মুফাসসিরগণ এ জাতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন এ জন্য যে, 'রু'ইয়া' স্বপ্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর যদি এই রু'ইয়া দ্বারা ইসরার ঘটনা বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে ঐ সাহাবীদের উক্তি স্বীকার করে নিতে হবে, যাদের অভিমত হলো, এটা জাগ্রত অবস্থায় ঘটে নি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এরা হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-এর তাফসীরের উপর চোখ বুলান নি। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) হচ্ছেন ঐ সব সাহাবীদের অন্যতম, যারা মি'রাজকে জাগ্রত অবস্থারই একটি ঘটনা বলে মনে করেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন এই

মতের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা। তিনি 'রু'ইয়া' এর যে তাফসীর করেছেন তা হলো, رؤيا عين اريها رسول الله ص (بخارى)। "এটি একটি চোখে দেখা স্বপ্ন (দৃশ্য), যা রাসূলুল্লাহ (সা) কে ইসরার রাত্রে দেখানো হয়েছিল।" উল্লেখিত আয়াতের এই ব্যাখ্যা প্রদানে যদি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর যিনি ছিলেন এই মতের সর্ব প্রধান প্রবক্তা, কোন অসুবিধা না হয়ে থাকে-তাহলে এসব লোক এমন কোন্ অসুবিধায় পতিত হলেন যে, তাদেরকে এক্ষেত্রেই নানা ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদানে আত্ম নিয়োগ করতে হল?

প্রকৃত পক্ষে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রু'ইয়ার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন-অর্থাৎ এটি হলো চোখে দেখা একটি দৃশ্য, যা ইসরার রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে দেখানো হয়েছিল-তা দ্বারা তিনি পুরাপুরিভাবে এ বিষয়টির নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন। এ দ্বারা ঐ হাকীকত প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, যার প্রতি আমরা এই মাত্র ইঙ্গিত করলাম। অর্থাৎ যা কিছু ঘটেছিল তা রু'ইয়াই ছিল, কিন্তু কি ধরনের রু'ইয়া? সে ধরনের রু'ইয়া, যা আমরা স্বপ্নের জগতে দেখে থাকি? না তা নয়। বরং তা হচ্ছে এমন রু'ইয়া, যার মধ্যে চোখ গাফিল (অন্যমনস্ক) থাকে না, বরং থাকে জাগ্রত এবং যা দেখা হয় তা এমনভাবে দেখা হয় যেন চোখ দেখছে।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى .

"তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয় নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত হয় নি। তিনি তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন।" (৫৩ ঃ ১৭-১৮)

মর্মার্থ এই যে, চোখ যা কিছু দেখেছে, তা সম্পূর্ণ ধীরে-সুস্থে ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে দেখেছে। তাঁর চোখ টেরা বা তেরছা ছিল না যে, তা ডানে অথবা বাঁয়ে কিংবা উর্ধে অথবা নিম্নে হেলে পড়েছিল। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যে বস্তুটি দেখাতে চেয়েছিলেন, সে বস্তুর উপর তাঁর চোখ ভালভাবেই নিবদ্ধ ছিল।

টীকা ঃ

(১) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-১৯৮ ও রাহমাতুল লিল আলামীন্ ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৬২।

(২) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-২১৭।

(৩) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-১৫৫।

(৪) আবূ সালমার মৃত্যুর পর হযরত উম্মে সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং 'উম্মুল মুমিনীন' হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

(৫) আরীইউস (ARIUS) ছিলেন আলেকজান্ডারের পুরোহিত। তিনি খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত ঈসা (আ) এর 'একক ফিতরাত'-এর আকীদা পেশ করেন। হযরত মূসা (আ) এর 'আলূহী ফিতরাত' (প্রভুত্ব সত্তা) অস্বীকার করার সূচনা এখানেই। পরবর্তী সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রীস্টান পুরোহিত এই আকীদাকে বাতিল ঘোষণা করলেও প্রাচ্যদেশীয় খ্রীস্টান এবং 'গথ'দের একটি বিরাট দল দীর্ঘদিন পর্যন্ত আরীইউস-এর আকীদার উপর ছিল অনড়।

(৬) এই অধ্যায় যেখানে আবিসিনিয়া হিজরতের কারণসমূহ ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যাখ্যা রয়েছে-এ পর্যন্ত সংকলক কর্তৃক রচিত। এরপর যে বর্ণনা রয়েছে তা স্বয়ং মাওলানা আবুল কালাম আযাদের।

(৭) তরজমান ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-২১৯।

(৮) এ অধ্যায়টিও সংকলক কর্তৃক রচিত। এ বিষয়ের উপর মাওলানার কোন রচনা আমার হস্তগত হয়নি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র জীবনের এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অর্থাৎ বনী হাশিমের সাথে বয়কট এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তায়েফ সফর-তাঁর জীবনকথা থেকে কখনো বাদ দেওয়া চলে না। বিস্তারিতভাবে না হলেও এ দুটি বিষয় সম্পর্কে আমি কিঞ্চিৎ আলোচনা করলাম, যাতে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে কোন শূন্যতা বা অসম্পূর্ণতা না থাকে।

(৯) আসাহ্হুস্ সিয়ার ঃ পৃষ্ঠা -৫৭।

(১০) রাহমাতুল লিল আলামীন ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৮৬।

(১১) রাহমাতুল লিল আলামীন ঃ পৃষ্ঠা-৮৬ (টীকা)।

(১২) সীরাতুন্নবী ঃ তৃতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৪০৬-৭। শাহ ওয়ালী উল্লাহ এবং হাফিয ইবনে কাইয়িমের উদ্ধৃতিসমূহ এই গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপে নেওয়া হয়েছে।

হিজরত

হিজরতস্থল

সাধারণ অবস্থা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হিজরতস্থল, ইয়াছরিব মক্কা মুকাররামা থেকে আনুমানিক ২৮০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এটা হচ্ছে সেই জায়গা, যা পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র পরশে ধন্য হয়ে মদীনা মুনাওওয়া নামে খ্যাতি লাভ করে। এটা পর্বত রাজির মধ্যবর্তী একটি প্রশস্ত প্রান্তর, যার দৈর্ঘ্য বারো মাইল এবং প্রস্থও এর চাইতে কিছু কম। ইয়াছরিব প্রান্তরের দক্ষিণে উঁচু আয়র পর্বত, উত্তরে ছুর পর্বত এবং ডানে-বাঁয়ে অর্থাৎ পূর্বপশ্চিমে লাভার তৈরী প্রাচীর। এগুলোকে 'লাবাতায়ন' বা 'বাররাতায়ন' বলা হয়। 'হাররা' অর্থ কালো পাথরবিশিষ্ট ভূমি। পূর্ব দিকের ভূমিকে বলা হয় 'হাররা-ই-ওয়াকিম' এবং পশ্চিম দিকের ভূমিকে বলা হয় 'হাররা-ই-ওয়াবারাহ'। মদীনা উপত্যকার দক্ষিণ পূর্বাংশের জমি কিছুটা উঁচু। এজন্য এটাকে বলা হয় 'আলিয়া' কিংবা আওয়ালী (উচ্চভূমি)। এরপর ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ দিকের জমি কিছুটা নীচু বা সমতল হয়ে গেছে। প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানেও পাহাড়সদৃশ ছোট-বড় টিলা রয়েছে। যেমন জাবালে সিলা', জাবালে যুবাব ইত্যাদি। 'জাবালে সিলা' মদীনা শহরের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত। জাবালে সিলা'র সম্মুখে জাবালে যুবাব। তা থেকে সামান্য অগ্রসর হলে ওয়াদিয়ে কানাত এবং কানাতের দক্ষিণ কোণে জাবালে আইনায়ন বা জাবালে রামাত। 'জাবালে আইনায়ন'-এর সম্মুখে জাবালে উহুদ। উহুদ টিলাটি বেশ দীর্ঘ এবং উঁচু।

উপত্যাক্যসমূহ

প্রান্তরের মধ্যে প্রস্রবণ ছাড়াও অনেকগুলো উপত্যকা রয়েছে, যেগুলোর উপর দিয়ে বৃষ্টির সময় পানি প্রবাহিত হয়। উপত্যকাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ ঃ

১। ওয়াদিয়ে রানূনা। এই উপত্যকা জাবালে 'আয়র' থেকে বের হয়ে উত্তর দিকে চলে গেছে।

২। ওয়াদিয়ে মাহযূর। এই উপত্যকা 'হাররা-ই-ওয়াকিম' থেকে বের হয়ে প্রায় সাত মাইল দীর্ঘ ওয়াদিয়ে মুযাইনীবের সাথে মিলিত হয়েছে। অত:পর দুটি উপত্যকার সম্মিলিত নাম হয়েছে ওয়াদিয়ে বুত্হান।

৩। কুবা থেকে সামান্য অগ্রসর হয়ে ওয়াদিয়ে রানূনা, ওয়াদিয়ে বুতহানের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর সম্মিলিত উপত্যকা বুতহান নাম ধারণ করে মদীনা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে।

৪। একটি উপত্যকা পূর্ব দিক থেকে মদীনা মুনাও্রার আনুমানিক তিন মাইল উত্তরে এসে জাবালে উহুদের সম্মুখ দিক দিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে।

৫। 'ওয়াদিয়ে আকীক' নামক একটি উপত্যকা 'জাবালে আয়র' এর দিক থেকে এসে হাররা-ই-ওয়াবারার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে উত্তর দিকে চলে গেছে।

৬। 'ওয়াদিয়ে বুতহান' 'ওয়াদিয়ে কানাত'-এর সাথে মিলিত হয়েছে। অত:পর এ দুটি উপত্যকা উহুদের পশ্চিম পার্শ্বে 'ওয়াদিয়ে আকীক' এর সাথে মিলিত হয়ে যাগাবাহ্ পর্যন্ত গিয়েছে। 'যাগাবাহ্' উহুদের উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

জনবসতি

এই প্রশস্ত প্রান্তরে একটি নয়, বরং অনেকগুলো ছোট-বড় জনবসতি বা মৌজা ছিল। এর অধিকাংশই ছিল মদীনার দক্ষিণে এবং দক্ষিণপূর্ব অংশে। যেমন ঃ

১। কুবা। কুবা মদীনা থেকে আনুমানিক তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। মক্কা থেকে হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম এখানেই উপনীত হন এবং কিছুদিন অবস্থান করেন। এ জায়গাটি এখনো বিদ্যমান আছে।

২। আলিয়া। এটাকে আওয়ালীও বলা হয়। এটা মদীনার দক্ষিণপূর্ব দিকে অবস্থিত এবং এখনো বিদ্যমান আছে।

৩। 'জাবালে আয়র'-এর পূর্বদিকে এবং কুবা ও আওয়ালীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং ওয়াদিয়ে মুযায়নীবের দক্ষিণ কোণে ছিল য়াহূদীদের বনী নাযীর গোত্রের বাসভূমি। এর দক্ষিণভাগে ছিল কা'ব বিন আশরাফের দুর্গ।

৪। য়াহূদীদের বনূ কুরায়যা গোত্রের জনবসতি ছিল আওয়ালীর অন্তর্গত ওয়াদিয়ে মাহযূর-এর দক্ষিণ কোণে।

৫। বনী যুফার, বনী আবদিল আশহাল, বনী হারিছা এবং বনী মুআভিয়ার জনবসতিগুলো হাররাহ -ই-ওয়াকিমের সাথে সাথে একের পর এক উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল।

৬। ইয়াছরিব ঐ যুগে ছিল সর্ববৃহৎ জনবসতি। 'জাবালে সিলা' এর উত্তর পশ্চিমে ওয়াদিয়ে কানাত ও ওয়াদিয়ে বুতহানের সঙ্গমস্থলে ছিল এর অবস্থান। সামগ্রিকভাবে ঐ প্রশস্ত প্রান্তরের সমগ্র জনবসতিকেই ইয়াছরিব বলা হত।[১]

৭। কুবা এবং মদীনা মুনাওওয়ার মধ্যবর্তী স্থানেও বেশ কিছু জনবসতি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কুবা থেকে মূল গন্তব্যস্থানের দিকে রওয়ানা হন তখন পথিমধ্যে তিনি বনী সালিমের মহল্লায় জুমু'আর সালাত আদায় করেন। সেখানে এখনো মসজিদে জুম্'আ'-এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। অতএব বলা যেতে পারে যে, বনী সালিমের মহল্লা বা বসতি এ জায়গায়ই ছিল।

৮। যে জায়গাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তা ছিল আবদুল মুত্তালিবের মাতামহের জনবসিত। এই জনবসতিতেই ছিল হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা)-এর বাড়ী। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মদীনা জীবনের প্রথম সাত মাস অতিবাহিত করেন। সেখানে তার আশেপাশেই ছিল স'দ বিন উবাদা, সা'দ বিন মুআয, উমারা বিন হাযাম (রা) প্রমুখ সাহাবীদের বাড়ী। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জমি কিনে এখানেই মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের আশে পাশে নির্মাণ করা হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সহধর্মিণীদের জন্য পৃথক পৃথক হুজরা। পরবর্তীকালে এই বসতিই নগরীর রূপ ধারণ করে এবং 'মদীনাতুর রাসূল' বা মাদীনাতুন্নবী নামে বিখ্যাত হয়। সাধারণের ভাষায় 'মদীনা' নামই থেকে যায়।

অধিবাসী

হিজরতপূর্ব যুগে ইয়াছরিবের অধিবাসীরা ছিল দু'দলে বিভক্ত। এক দল ছিল আরব। তারা ছিল আওস ও খাযরাজ নামক দু'টি গোত্রে বিভক্ত। সাধারণ আরবদের ন্যায় তারাও মূর্তি পূজা করত। অপর দল ছিল য়াহূদী। য়াহূদীরা ছিল তিনটি গোত্রে বিভক্ত। যথা ঃ বনী কুরায়যা, বনু নাযীর ও বনূ কাইনুকা। এরা নিজেদেরকে মূসা (আ) এর অনুসারী বলত; কিন্তু তাদের বিশ্বাসগত, আমলগত ও চরিত্রগত জীবন এমনভাবে বিগড়ে গিয়েছিল যে, তার সাথে য়াহূদী ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল না। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বনী ইসরাঈলের যে চিত্র অংকিত হয়েছে তা মূলত: ইয়াছরিবের যাহূদীদেরই চিত্র। অবশ্য সমগ্র বনী ইসবাঈলের উপরই - চাই তারা যেখানেই থাকুক-এটা ছিল সমভাবে প্রযোজ্য। আমার অনুমান মতে; এখনো সে চিত্রে কোন পরিবর্তন আসে নি, যদিও কোন কোন স্বভাব পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয়। বড় জোর বলা যেতে পারে যে, চরিত্রহীনতার ছাঁচে পড়ে তাদের মন্দ স্বভাব নবরূপে আরো অধিক মন্দরূপ গ্রহণ করেছে।

ইয়াছরিবের সূচনা ও উৎকর্ষ

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, আমালিকারা খ্রীষ্টপূর্ব ১০১৬ অব্দে (হিজরী সন শুরু হওয়ার আনুমানিক এক হাজার ছয়শ আটত্রিশ বছর পূর্বে) ইয়াছরিবে জনবসতি গড়ে তুলেছিল। কয়েক শ বছর শাসন পরিচালনার পর যখন ওদেরকে মিসর থেকে বের করে দেওয়া হয় তখন ইয়াছরিবে এসে তারা খেজুর বাগান গড়ে তোলে এবং ক্ষেত-কৃষিরও প্রসার ঘটায়। এরপর খুব সম্ভব য়াহূদীরা ঐ সময় হিজাযে এসে পৌঁছে। যখন বাবিলের রাজা ফেলিস্তিনকে পর্যুদস্ত এবং সেখানকার হায়কালটি ধ্বংস করে ফেলে তখন সে অনেক য়াহূদীকেও বন্দী করে বাবিলে নিয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যে ঐ বন্দীরা বাবিল থেকে পালিয়ে এসে খায়বার, ফিদাক ও ওয়াদিউল কুরায় আশ্রয় নেয় এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই নিজেদের স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলে। ক্রমে ক্রমে তারা আমালিকাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে। এরপর হয় ওদেরকে এই সব জায়গা থেকে বের করে দেয় অথবা য়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত করে ফেলে।

'সায়লে আরিম' (বাঁধ ভাংগা বন্যা) এর কারণে 'মা-আরিব' বাঁধ যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং সেখানকার অধিবাসীও বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন আওস ও খাযরাজ দক্ষিণ আরব থেকে এখানে এসে নতুনভাবে নিজেদের বসতি গড়ে তোলে।

আওস ও খাযরাজকে সাধারণত: মূল কাহতানী বলা হত। কিন্তু মরহুম সাইয়িদ সুলায়মান তাঁর 'আরদুল কুরআন' দ্বিতীয় খণ্ডে ওদেরকে ইসমাঈলী আরব বলেছেন। তাঁর মতে, শুধুমাত্র এ কারণে ওদেরকে কাহতানী বলা হত যে, তারা কাহতানী এলাকা সমূহে দীর্ঘদিন পর্যন্ত অবস্থান করেছিল। মরহুম সাইয়িদের মতে, ঐ গাসসানীরাও ছিল ওদের সমগোত্রীয়, যারা সিরিয়া চলে গিয়েছিল এবং সেখানে গিয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

প্রভাব-প্রতিপত্তি

আওস ও খাযরাজ ছিল দুই ভাই। তাদের থেকে দু'টি গোত্রের সূত্রপাত হয়। পরবর্তী সময়ে এ দুটি গোত্র বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত ইয়াছরিবে য়াহূদীরা ছিল শক্তিশালী। জ্ঞানের দিক দিয়ে তারা ছিল অগ্রণী। ধনসম্পদের ক্ষেত্রেও আরবরা তাদের অনেক পিছনে পড়েছিল। শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও য়াহূদীরা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, ইয়াছরিব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানেই য়াহূদীরা তাদের বসতি গড়ে তুলেছিল। ফলে ব্যবসা বাণিজ্য পুরাপুরিভাবে তাদের দখলে চলে গিয়েছিল। মরহুম মাওলানা শিবলী বলেন, বংশধরদের সংখ্যাধিক্যের ফলে য়াহূদীরা বিশ একুশটি গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।[২] ফলে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল তাদের জনবসতি। আওস ও খাযরাজ তাদের সাথে সহযোগিতা ও নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদন করেছিল। ঐ আরবরা য়াহূদীদের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা এত বেশী প্রভাবিত ছিল যে, যদি কোন আরবের ঘরে মোটেই সন্তান হত না তাহলে তারা এই মর্মে মানত করত যে, যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে তাকে য়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত করা হবে।

এরপর য়াহূদীদের মধ্যে ফাতয়ূন নামীয় একজন আরামপ্রিয় ও লম্পট সর্দারের আবির্ভাব হয়। এক আরব তাকে হত্যা করে সোজা সিরিয়ায় গিয়ে পৌঁছে ও সমগ্রোত্রীয় হিসাবে গাসসানীদেরকে আরবদের সাহায্যের জন্য ইয়াছরিবে ডেকে নিয়ে আসে। গাসসানীরা এখানে এসে সব বড় বড় য়াহূদীকে হত্যা করে ফেলে। এ কারণে ইয়াছরিবে য়াহূদীদের ক্ষমতা তখনকার মত হ্রাস পায়।

গৃহযুদ্ধ

য়াহূদীদের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার পর আওস ও খাযরাজ পুনরায় ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে। কিন্তু তাদের এই ক্ষমতা বেশীদিন বহাল থাকে নি। যতদূর জানা যায়, এর প্রধান কারণ এই ছিল যে, ঐ সময় কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তাদের মধ্যে সর্বশেষ যে বড় যুদ্ধ হয়েছিল, তা 'বুআছ' নামে বিখ্যাত। এই যুদ্ধ ইসলামের অভ্যুদয়ের পর এবং হিজরতের কিছুদিন পূর্বেই সংঘটিত

হয়েছিল।[৩] এই গৃহযুদ্ধে উভয় গোত্রেরই অনেক বড় বড় সর্দার এবং প্রচুর সংখ্যক সাধারণ লোক নিহত হয়। ফলে উভয় গোত্রই একেবারে দুর্বল ও নি:স্ব হয়ে পড়ে। একথা অনস্বীকার্য যে, য়াহূদীরা বিভিন্ন গোপন কলাকৌশলের মাধ্যমে আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যকার শত্রুতা ও মনোমালিন্যকে আরো বাড়িয়ে তোলে। কেননা এর মধ্যেই তাদের বিভিন্নমুখী স্বার্থ নিহিত ছিল। যাহোক ঐ যুদ্ধের কারণে বলতে গেলে কোনরূপ চেষ্টা-তদবীর ছাড়াই য়াহূদীরা তাদের পূর্বতন ক্ষমতা ফিরে পায়। এটাও সম্ভব যে, তারা অর্থকড়ি ও যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে উভয় দলকেই সাহায্য করতে থাকে, যাতে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে এবং আরবদের উপর তাদের অজ্ঞাতেই য়াহূদীদের সুদযুক্ত ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত উভয় গোত্রই সন্ধি করতে বাধ্য হয় এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সম্মিলিতভাবে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে নেতা হিসাবে বরণ করে নেওয়া হবে- যাতে তারা একক শক্তির অধিকারী হয় এবং ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে এ ধরনের কোন বিরোধ বা সংঘর্ষ দেখা না দেয়। পরষ্পর আলাপ আলোচনার পর খাযরাজ গোত্রের আওফ কাবিলার সর্দার আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালূলের নেতৃত্ব সকলেই এক বাক্যে মেনে নেয়। তখনো ইবনে উবাইকে আনুষ্ঠানিকভাবে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয় নি, এমনি সময়ে ইসলাম রবির কিরণরাজি ইয়াছরিব প্রান্তরেও ছড়িয়ে পড়ে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইয়াছরিবে চলে আসেন। ফলে উবাই বিন সালূলকে কেন্দ্র করে যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল তা সমূলে বানচাল হয়ে যায়। এই হচ্ছে সেই পটভূমি, যার প্রেক্ষিতে উবাই বিন সালূল একজন মুনাফিক (কপট) হিসাবেই রাসূলুল্লাহ্(সা) ও মুসলমানদের সাথে তার সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছিল।

মদীনা মুনাওওরার পরিবেশ

এখনো একথা বলা হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর আগমনের ফলে যে জনবসতি কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিল এর পরিবেশ ছিল কিরূপ? এর দক্ষিণে, দক্ষিণপূর্বে ও উত্তর পূর্বে ছিল খেজুর বাগান এবং তা এতই ঘন ছিল যে, তার মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র দু একজন করে লোক চলাফেরা করতে পারত। কোন সেনাবাহিনীর পক্ষে দলগত ভাবে অতিক্রান্ত হওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ঐ অংশে সর্বত্রই ছোট ছোট জনবসতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ইয়াছরিবের উত্তর-পূর্ব দিকেও উহুদ পাহাড় পর্যন্ত এ ধরনেরই বাগান ছিল। শুধুমাত্র উত্তর দিকে কিছু জায়গা এরূপ ছিল, যেখান দিয়ে কোন সেনাবাহিনী দলগত ভাবে মদীনা আক্রমণ করতে পারত। অনুমান করা হয় যে, আহযাব যুদ্ধের সময় এই অংশেই পারিখা খনন করা হয়েছিল। 'আছারুল মদীনা মুনাও ওরা' গ্রন্থে এর সীমা উত্তর পূর্ব দিক থেকে উত্তর পশ্চিম দিক পর্যন্ত বলা হয়েছে। মরহুম মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কাল 'ফী মানযিলিল্ ওয়াহী' গ্রন্থে এই মতই সমর্থন করেছেন। ডক্টর হামীদুল্লাহ্‌র মতে, পরিখার সূচনা হয়েছে 'দিয়ারে বনী আশহাল' তথা পূর্বদিকের লাভা প্রাচীর (হাররা-ই-ওয়াকিমা) এর পাদদেশ থেকে। প্রথমে সেটাকে 'হাররা-ই-ওয়াবারাহ্' পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এরপর সেখান থেকে মোড় ঘুরিয়ে 'জাবালে সিলা' এর উত্তর-পশ্চিম কোণার সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর ওয়াদিয়ে বাতহানের সাথে সাথে সেটাকে এমন স্থানে নিয়ে আসা হয়েছে, যেখানে বাতহান ও রানূনা একত্রে মিলিত হয়েছে- যেন সম্পূর্ণ উত্তর ও সম্পূর্ণ পশ্চিম দিক পরিখার মধ্যে চলে এসেছে। এই নক্সাও অনুমানের উপর তৈরী করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এ ধারণাই করা হয় যে, যেদিক দিয়েই শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল, সেদিকই পরিখা খননের মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়েছে। ডক্টর হামীদুল্লাহ্‌র মতে, পরিখাটি ছিল আনুমানিক তিন মাইল দীর্ঘ, দশগজ প্রস্থ এবং ঐ পরিমাণ গভীর। প্রস্থ এবং গভীরতা নিরূপণের কোন প্রমাণ নেই বটে, তবে একথা পরিষ্কার যে, আক্রমণকারীদের একজন দু'জন ছাড়া কেউই ভিতরে প্রবেশ করতে পারে নি। যেন এটা এই পরিমাণ প্রশস্ত ও গভীর ছিল যে, সাধারণ আশ্বারোহী কিংবা পদাতিকের জন্য সেটা লাফিয়ে অতিক্রম করা মোটেই সহজ ছিল না। অতএব এর উপর অনুমান করেই একটা ধারণার জন্ম দেওয়া হয়েছে।

ইয়াছরিবের বিশেষ গুরুত্ব

ইয়াছরিব কিংবা মদীনা শুধুমাত্র এই দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যে, তা মজলুম মুসলমানদের জন্য একটি সার্বিক আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল। বরং এর অসীম গুরুত্ব এজন্যও ছিল যে, তা সম্মিলিতভাবে হাককানী শিক্ষার উপর আমল করার একটি পরিপূর্ণ রূপরেখা বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছিল। ঐ যুগে ভৌগলিক দিক দিয়ে স্থানটি ছিল মুসলমানদের জন্য যার পর নেই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সেই রাজপথ মদীনা মুনাওওরা থেকে কেবল আশি মাইল দূরে ছিল, যা দিয়ে কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া যাতায়াত করত। আর কুরায়শের জন্য ঐ রাজপথটি ছিল তাদের অর্থনীতির শাহ রগ (গ্রীবাস্থিত ধমনী) তুল্য। মদীনা মুনাওওরায় বসে মুসলমানরা কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলার উপর অতর্কিতে সফল আক্রমণ পরিচালনা করতে পারত। অন্যকথায় বলতে গেলে, মুসলমানরা সিরিয়ার রাজপথ কুরায়শের জন্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে পারত। আর এটা ছিল কুরায়শের জন্য একটি অতি মারাত্মক অর্থনৈতিক আঘাত। কুরায়শের সামরিক যোগ্যতা ও ক্ষমতার উপরও অনায়াসে এর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া পড়ত। সত্যের পয়গামের বিরুদ্ধে শত্রুতা ছাড়াও কুরায়শদের দুশ্চিন্তার একটি বড় কারণ এও ছিল যে, মূল বাণিজ্যপথের একেবারে ধার ঘেঁসে মুসলমানদের এভাবে একত্রিত হওয়াটা, মক্কাবাসীদের ভবিষ্যৎ বাণিজ্যপথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ারই লাল সংকেত দিচ্ছিল। কিংবা মক্কাবাসীরা এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিল যে, যদি মদীনা মুনাওওরায় ইসলাম একবার প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পায় তাহলে এই স্থানটি তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের পথে এক মহা সর্বনাশ ডেকে আনবে। (সংকলক)

আকাবার প্রথম বাই'আত

সুভায়দ বিন সামিত

ইয়াছরিববাসীদের জন্য ইসলামী দাওয়াতের সূচনা আকাবা-ই উলার বাইআতের পূর্বে হয়েছিল। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সুভায়দ বিন সামিতের নাম আসে, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের খালাত ভাই[৪]। জাহিলিয়া যুগে যীকা'দার প্রথম থেকে মুহাররমের শেষ পর্যন্ত এই তিন মাস হজ্জের জন্য এবং রজব মাস উমরার জন্য নির্ধারিত ছিল। এই চার মাস সারা আরবে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করত। তাই এই মাসগুলোতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের কাছে যেতেন। আর যারা এই সময়ে বাইরে থেকে হজ্জ ও উমরা পালনের জন্য মক্কায় আসত তাদের মধ্যেও তিনি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ– بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ। অনুযায়ী ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে চেষ্টার কোন ক্রটি করতেন না।

সুভায়দ বিন সামিত বীরত্ব ও কাব্য রচনায় ইতিমধ্যে সেই মর্যাদা লাভ করেছিলেন, যে মর্যাদায় কেউ পৌঁছলে পর আরববাসীরা তাকে 'কামিল' আখ্যা দিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুভায়দের মক্কা আগমনের সংবাদ জানতে পেরে তার তাঁবুতে গিয়ে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সুভায়দ বললেন: সম্ভবত: আপনার কাছে তাই আছে, যা আমার কাছে আছে ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঃ তোমার কাছে কি জিনিস আছে?

সুভায়দ ঃ লুকমানের হিক্‌মত।

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ তা থেকে আমাকে কিছু পড়ে শুনাও।

সুভায়দ কিছু পড়ে শুনালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, নিঃসন্দেহে এতে ভাল কথা রয়েছে। কিন্তু যে বাণী আমার কাছে রয়েছে, তা এর চাইতেও শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। এটা হচ্ছে আদ্যোপান্ত আল্লাহ তা'আলার নূর, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমার উপর নাযিল করা হয়েছে। এরপর তিনি সুভায়দকে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পড়ে শুনালেন। সুভায়দ তা শুনে স্বীকার করলেন যে, নি:সন্দেহে এটি একটি ভাল বাণী। তবে ইসলাম গ্রহণও করলেন না, আবার তা অস্বীকারও করলেন না। এরপর মক্কা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি কোন একটি গৃহযুদ্ধে মারা যান। এটা হচ্ছে বু'আছ যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা।[৫] সুভায়দের স্বগোত্রীয়দের কারো কারো উক্তি এই যে, তিনি মুসলমান হয়েই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

আয়াস বিন মু'আয

গৃহযুদ্ধে আওস গোত্র খাযরাজ গোত্রের কাছে পরাজিত হওয়ার পর আপন প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের বিরুদ্ধে কুরায়শের সাথে 'মিত্রতা চুক্তি' সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধি দল মক্কায় প্রেরণ করে। ঐ প্রতিনিধি দলের নেতা ছিল রয়ীস আবুল হায়সার আনাস বিন রাফি'। বনু আশহাল গোত্রের আয়াস বিন মু'আয নামক জনৈক যুবক ছিল প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য। এটাও হচ্ছে বু'আছ যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী

ঐ প্রতিনিধিদলের কাছেও যান। তিনি তাদেরকে এই মর্মে দাওয়াত দেন ঃ তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। তিনি তাঁদেরকে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াতও পড়ে শুনান। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দাওয়াত শুনতেই উচ্চস্বরে বলে উঠলেন: ভাই সব, আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের জন্য এ দাওয়াত সে জিনিসের চাইতেও শ্রেষ্ঠ, যার জন্য আমরা এখানে এসেছি। আয়াস একথা বলেই চুপ হয়ে যায়। তবে একথাও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি সেখানেই ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। কিন্তু দেশে ফেরার পর কোন একটি যুদ্ধে নিহত হয়। মৃত্যুর সময়েও নাকি তাঁর মুখে তাকবীর (আল্লাহু আকবর ধ্বনি) জারী ছিল।

ইসলামী দাওয়াত থেকে উপকৃত হওয়ার এ'দুটি ঘটনা প্রাথমিক স্তরেই বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যায়। তাই এগুলো থেকে ইসলামের অন্য কোন প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় নি বা হওয়ার সুযোগও পায়নি।

খাযরাজ গোত্রের ছয়জন ভাগ্যবান লোক

নবম হিজরীর হজ্জ মওসুমেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী দাওয়াতের কাজে বের হন।[৬] তিনি যখন আকাবায় (আকাবা জবলে হেরা ও মিনার মধ্যবর্তী একটি স্থান, যা মক্কা থেকে আনুমানিক তিন মাইল দূরে ও মিনার অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থিত) পৌছেন তখন সেখানে কয়েকটি লোক দেখতে পান। তিনি তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী অত্যন্ত নম্র ও বিনীত ভঙ্গিতে যখন তাঁদের নাম-ঠিকানা জানতে চান তখন তাঁরা বলেন যে, তাঁরা খাযরাজ গোত্রের লোক- অর্থাৎ ইয়াসরিবের যাহূদীদের প্রতিবেশী। তখন তিনি বলেন, আপনারা কি এখানে বসে আমার কিছু কথা শুনতে পারবেন? তাঁরা যখন তা শুনতে আগ্রহী হলেন তখন তিনি তাঁদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং কুরআন মজীদ থেকে কয়েকটি আয়াত পড়ে শুনান। তাঁরা য়াহীদীদের কাছ থেকে বহুবার শনেছেন যে, শীঘ্রই একজন নবীর আবির্ভাব হবে। য়াহূদীরা প্রসঙ্গত: এও বলত, আমরা এই নবীর পক্ষাবলম্বন করে পৌওলিকতার মূলোৎপাটন করব।

খাযরাজীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দাওয়াত এবং কুরআন শরীফের আয়াত শুনে একে অন্যের প্রতি তাকিয়ে বললেন, য়াহূদীদেরকে এক্ষেত্রে বাজিমাত করার সুযোগ মোটেই হাতছাড়া করা যায় না। তাঁরা সংগে সংগে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরাই হচ্ছেন সেই ছয়জন ভাগ্যবান ব্যক্তি, যাদের ইসলাম গ্রহণ, ইয়াছিরিবকে ইসলামের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করার সুযোগ করে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হিজরতের পর থেকে ইয়াছরিব 'মদীনাতুর রাসূল' নামে খ্যাতি লাভ করে এবং চিরদিনের জন্য বিশ্ব ইতিহাসে আপন স্থান করে নেয়।

কেউ কেউ এটাকে ' বাইআতে আকবা-ই-উলা' আখ্যা দিয়েছিল। তাদের মতে, আকাবায় তিনটি বাইআত হয়েছিল। আবার কারো কারো মতে আকাবায় শুধুমাত্র দু'টি বাইআত হয়েছিল। একটি দ্বাদশ নববীর হজ্জ মওসূমে।[৭] এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে।

উল্লেখিত ছয় জন ভাগ্যবানের নাম হচ্ছে ঃ

(১) আবূ উমামা আস'আদ্ বিন যুরারাহ্ (রা) [বনী নাজ্জার (খাযরাজ)]
(২) আওফ বিন হারিছ (রা) "
(৩) রাফি' বিন মালিক (রা) [বনী যুরায়ক(খাযরাজ)]
(৪) কুতবা বিন আ'মির (রা) [বনী সালমাহ্(খাযরাজ)]
(৫) উকবা বিন আ'মির (রা) "
(৬) জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রা) [বনী উবায়দ(খাযরাজ)]

কোন কোন বর্ণনায় ছয় এর পরিবর্তে আট জনের উল্লেখ রয়েছে, সপ্তম- আলবারা বিন মারূর ও অষ্টম আবুল

হাইছম মালিক বিন তায়্যিহান।

আকাবা-ই-উলা'র বাই'আত

উল্লেখিত ছয়জন বিশুদ্ধচিত্ত মুসলিমের মাধ্যমে আওস ও খায়রাজ গোত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নাম ছড়িয়ে পড়ে। নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষে হজ্জ মওসুমে আওস ও খাযরাজ গোত্রের বারো জন লোক মক্কা মুকাররমা আসেন এবং ঐ আকাবা উপত্যকায়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে মিলিত হন, যেখানে গত বছর ছয়জন খাযরাজীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল। ঐ ছয়জনের পাঁচ জন এ বছরও এসেছিলেন। শেযোক্ত জন অর্থাৎ জাবির বিন আবদুল্লাহ্ কোন কারণে আসতে পারেন নি। নতুনভাবে যে সাতজন এসেছিলেন তাঁরা হলেন–

(১) মু'আয বিন হারিছ (রা) [বনী নাজ্জার (খাযরাজ)]

(২) যাকওয়ান বিন আবদে কায়স (রা) [বনী যুরায়ক, (খাযরাজ)]

(৩) উবাদা বিন সামিত (রা) [বনী আওফ (খাযরাজ)]

(৪) আবূ আবদুর রহমান ইয়াযীদ বিন সা'লাবা (রা) [বনী বাল্লী (খাযরাজের মিত্র)]

(৫) আব্বাস বিন উবাদা বিন নাজলাহ (রা) [বনী সালিম, (খায়রাজ)]

(৬) আবুল হায়ছাম মালিক বিন তায়্যিহান [বনী আবদিল আশহাল, (আওস)]

(৭) উ'য়ায়ম্ বিন সায়িদাহ [বনী আমর বিন আওফ, (আওস)]

বাই'আতের শর্তসমূহ

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর বাই'আত করেন।

(১) আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না।

(২) চুরি ও ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবো।

(৩) নিজেদের সন্তানদের (কন্যা সন্তানদের) হত্যা করবো না।

(৪) কারো বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করবো না এবং কারো নিন্দাও করবো না।

(৫) যাবতীয় ভাল কাজে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অনুগত থাকবো।

এই বাই'আতকে 'বাইআতুন নিসা' বলা হয়ে থাকে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রী লোকদের কাছ থেকে এই বাই'আতই গ্রহণ করতেন। তখন পর্যন্ত যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয় নি। ইয়াছরিববাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে এই মর্মে একটি নিবেদন করেন যে, তিনি যেন তাদেরকে শিক্ষাদানের জন্য একজন 'মুআল্লিম' (শিক্ষক) তাদের সাথে প্রেরণ করেন। তাদের ঐ নিবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত মুস'আব বিন উমায়র (রা)কে ইয়াছরিবে প্রেরণ করা হয়েছিল। হযরত মুস'আব (রা) ছিলেন আবদুদ্দার গোত্রের একজন বিত্তশালী যুবক। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে বের হতেন তখন তাঁর গায়ে থাকত অতি মূল্যবান পোশাক এবং তাঁর সামনে পিছনে থাকত দাসদের একটি বহর। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি যাবতীয় বাহ্যিক শান-শওকত পরিত্যাগ করেন। তখন তিনি শুধুমাত্র একটি কম্বল গায়ে দিতেন এবং তা কয়েকটি কাঁটার সাহায্যে আটকিয়ে পরিধান করতেন। ইয়াছরিব বাসীরা তাঁকে 'আল মুকাররী' (পাঠদানকারী বা উস্তাদ) বলত। তখন তাবলীগ শুধুমাত্র কুরআন মজীদ শুনানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, পরবর্তী সময়ে খুব সম্ভবত: আবদুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতূমকে ইসলাম শিক্ষাদানের জন্য ইয়াছরিবে পাঠানো হয়েছিল। (সংকলক)

আকাবার দ্বিতীয় বাই'আত

ইয়াছরিবে ইসলাম

হযরত মুস'আব বিন উমায়র (রা) আবূ উমামা আসআ'দ বিন যুরারাহ (রা)-এর ঘরে পদার্পণ করেন। তাঁর তাবলীগে ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে থাকে,- এমন কি আওস গোত্রের বনী আবদিল আশহাল শাখা গোত্রের সকল লোক এক দিনেই ইসলাম গ্রহণ করে। সা'দ বিন মু'আয এবং উসায়দ বিন হুযায়র (রা) ছিলেন ঐ গোত্রের সর্দার। ইসলাম তাঁদের গোত্রে প্রচারিত ও প্রসারিত হোক, সা'দ তা পছন্দ করেন নি। কিন্তু যেহেতু আস'আদ বিন যুরারাহ (রা) ছিলেন তাঁর নিকটাত্মীয় তথা খালাত ভাই, তাই আসআ'দের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে– এই ভয়ে তিনি তাঁর (আসআ'দের) অতিথি ও ইসলাম প্রচারক হযরত মুস'আব (রা) কে ইসলাম প্রচারের কাজে সরাসরি বাধা প্রদান করতে ইতস্তত: করছিলেন। অগত্যা তিনি উসায়দ বিন হুযায়র (রা)কে বললেন, আপনিই মুস'আবকে ইসলাম প্রচারের কাজ থেকে বিরত রাখুন। আস'আদ বিন যুরারাহ উসায়দ্‌কে দূর থেকে আসতে দেখে মু'সআব (রা)কে বললেন, এই যে গোত্রপতি আসছেন। আল্লাহ্ করুন যে, তিনি আপনার কথা মেনে নেন। যা হোক উসায়দ শীঘ্রই সেখানে এসে পৌছেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মুস'আব (রা)কে গালিগালাজ করতে থাকেন। তিনি তাঁকে এও বলেন, তুমি সরল প্রাণ অজ্ঞ লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করছ।

মুস'আব (রা) তখন অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। তিনি অত্যন্ত নম্রভাবে উসায়দকে বলেন, আপনি একটু বসুন, আমার কথা শুনুন, এরপর নিজ বিবেক-বুদ্ধি মত একটা সিদ্ধান্ত নিন। উসায়দ, মুস'আবের আবেদনে সাড়া দিয়ে সেখানে বসে পড়েন। আর মুস'আব (রা) অত্যন্ত নম্রভাবে তার সামনে ইসলামের শিক্ষা পেশ করেন এবং কুরআন মজীদ থেকেও কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শুনান। উসায়দ তা শুনে বলে উঠলেন, বলো, তোমাদের ধর্মে প্রবেশ করার পদ্ধতি কি? মুস'আব বললেন, গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে কলিমা-ই-শাহাদত পড়তে হয়, এরপর দু'রাক'আত নফল নামায। উসায়দ সব শর্ত মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর বলেন, আমার পরে আর এক ব্যক্তি আসবেন। যদি তিনি তোমার অনুসারী হয়ে যান তাহলে এখানে তোমার বিরুদ্ধবাদী আর কেউ থাকবে না।

এরপর উসায়দ (রা) সা'দ (রা)কে আস'আদ বিন যুরারাহ (রা) এর ঘরে পাঠিয়ে দেন। তাঁর ক্ষেত্রেও ঠিক সেরূপ ঘটনা ঘটে, যা উসায়দ (রা) এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। শেষ পর্যন্ত সা'দ (রা) ও ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আপন গোত্রের কাছে যান এবং সবাইকে সম্বোধন করে উচ্চস্বরে বলেন, হে বনী আবদিল আশহাল, আমার সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? তারা একবাক্যে জবাব দিল, আপনি আমাদের সর্দার, আপনার উপর আমাদের পুরাপুরি আস্থা আছে। সা'দ বললেন, আমার গোত্রের কোন ব্যক্তি চাই সে নর হোক অথবা নারী, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান না আনবে ততক্ষণ তার সাথে কথা বলা আমি হারাম ও অবৈধ বলে মনে করি। তাঁর একথা শুনে গোটা গোত্র একই দিনে ইসলাম গ্রহণ করে।

মোটকথা, হযরত মুস'আব (রা) তাঁর তাবলীগ ও প্রচারের কাজ অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করে মক্কা মুকাররামায় ফিরে আসেন এবং সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করেন।

আকাবার দ্বিতীয় বাই'আত

তেরো নবভীতে ইয়াছরিব থেকে তিহাত্তর ব্যক্তি হজ্জ পালনের জন্য মক্কা মুকাররমায় আসেন। তাদের মধ্যে দু'জন ছিলেন মহিলা। ইয়াছরিবের মুসলমানরা এদেরকে একথাও বলে দিয়েছিলেন যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে মদীনা আগমনের আমন্ত্রণ জানান। রাত্রের বেলা মিনার একটি নির্জন স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে তাঁর চাচা আব্বাসও ছিলেন, যদিও তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

আব্বাস ইয়াছরিব বাসীদেরকে সম্বোধন করে বলেন, মুহাম্মদ নিজ গোত্রের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আমরা শত্রুর মুকাবালায় তাকে সব সময়ই নিরাপত্তা দিয়ে আসছি। এখন সে তোমাদের কাছে যেতে চায়। যদি তোমরা আমৃত্যু তার পক্ষে থাক তাহলে তো ভাল কথা, অন্যথায় এখনি তাকে প্রত্যাখান করে চলে যাও।

ইয়াছরিববাসীদের মধ্য থেকেও এক ব্যক্তি তার স্বগোত্রীয়দের বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে যে ওয়াদা ও অঙ্গীকার করছ তাতে তোমরা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকেই আহ্বান জানাচ্ছ। যদি তোমরা এই অঙ্গীকার পালন করতে গিয়ে তোমাদের ধন ও প্রাণ বিসর্জন দিতে পার তাহলে দুনিয়া-আখিরাতে সাফল্য লাভ করতে পারবে। আর যদি তা না পার তাহলে তোমরা ভাগীদার হবে দুনিয়া আখিরাতে যাবতীয় লাঞ্ছনা বঞ্চনার।

ইয়াছরিবাসীরা ইতিপূর্বে বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার পরই একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে মক্কায় এসেছিলেন। অতএব কোন ভয়ই এখন আর তাদেরকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারছিলো না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের আমন্ত্রণের জবাবে শুধুমাত্র দুটি কথা বলেন। আর তা হলো–

(১) আপনারা কি ইসলাম প্রচারে আমাকে পুরাপুরি সাহায্য করবেন?

(২) আপনারা কি আপনাদের শহরে আমার এবং আমার সঙ্গীদের ঠিক সেরূপ যত্ন নেবেন, যেরূপ যত্ন নেন আপনাদের নিজস্ব আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গের।

ইয়াছরিববাসীরা জিজ্ঞাসা করল, আমরা এ সব কাজের বিনিময়ে কি পুরস্কার পাব?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বললেন, জান্নাত (যা হচ্ছে পরিত্রাণ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জায়গা)।

জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি আমাদের কাছে যাওয়ার পর যাহূদীদের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে, তা তো নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব এমন যেন না হয় যে, আপনি যখন ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হবেন তখন আমাদেরকে পরিত্যাগ করে আপন জন্মভূমিতে ফিরে আসেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বলেন, না, এরূপ হবে না। তোমাদের রক্ত আমার রক্ত। তোমরা আমার এবং আমি তোমাদের।[৮]

অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি (সা) তখন বলেন, আমার জীবিত থাকা এবং মৃত্যু বরণ করা তোমাদের সাথেই হবে।[৯]

যাহোক দীর্ঘ তেরো বছর অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে যাবতীয় জুলুম-নির্যাতন সহ্য করার পর আল্লাহ্ তা'আলা আপন করুণা গুণে ইসলামের জন্য এমন একটি আশ্রয় স্থলের ব্যবস্থা করে দেন, যেখান থেকে এই সত্য দ্বীনের আইন কানুন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিশ্বের জন্য অভূতপূর্ব কল্যাণ ও বরকত বয়ে নিয়ে আসে। যেখানে মক্কা মুকাররমা এবং তায়েফের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই পবিত্র দ্বীন এবং এর পবিত্র শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল সেখানে আওস ও খাযরাজ গোত্র এটাকে পরম সোহাগভরে নিয়েছিল নিজদের মাথায় তুলে। এই সত্য দ্বীনকে সাহায্য করার কারণেই তাঁরা 'আনসার' (সাহায্যকারী) উপাধিতে ভূষিত হন।

প্রতিনিধি নিয়োগ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াছবিরবাসীদের মধ্য থেকে বারো ব্যক্তিকে আপন প্রতিনিধি নিয়োগ করেন, যাতে তারা নিজ গোত্রের লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করে। 'সীরাতুন্নবী'-এর বর্ণনানুয়ী এই নামগুলো খোদ ইয়াছরিব-

বাসীরাই পেশ করেছিল।১০ এদের মধ্যে ন'জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং তিনজন আওস গোত্রের। প্রতিনিধিরা হচ্ছেন–

১। আস'আদ বিন যুরারাহ (রা)। ইনি ছিলেন বনী নাজ্জার (খাযরাজ) গোত্রের লোক। ইয়াছরিবে জুমুআর সালাতের সূচনা তিনিই করেছিলেন। বদর যুদ্ধের পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

২। আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা)। তিনি ছিলেন বনী হারিছ (খাযরাজ) গোত্রের লোক। মূতা যুদ্ধে হযরত যায়দ ও হযরত জা'ফর (রা)-এর পর তিনিই ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান কালে শাহাদত বরণ করেন।

৩। উসায়দ বিন হুযায়র (রা)। তিনি ছিলেন বনী আবদিল আশহাল (আওস) গোত্রের লোক। হযরত উমর (রা) এর খিলাফত কালে ইন্তিকাল করেন।

৪। আবুল হায়সাম মালিক বিন তায়্যিহান (রা)। তিনিও ছিলেন বনী আবদিল আশহাল (আওস) গোত্রের লোক। তিনি সিফ্ফীন যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন।

৫। সা'দ বিন উবাদা (রা)। তিনি ছিলেন বনী সায়েদাহ (খাযরাজ) গোত্রের লোক। সাকীফা-ই-বনী সায়েদায় তাঁকেই আনসাররা খিলাফতের জন্য মনোনীত করেছিল। এরপর তিনি সিরিয়ায় চলে যান এবং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত কালে সেখানেই ইনতিকাল করেন।

৬। বারা বিন মা'রূর (রা)। তিনি ছিলেন বনী সালিমাহ্ (খাযরাজ) গোত্রের লোক। বেশ বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াছরিবে পদার্পণ করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

৭। সা'দ বিন রাবী (রা)। তিনি ছিলে বনী সালিমাহ্ (খাযরাজ) গোত্রের লোক। উহুদ যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁর সন্ধানে লোক পাঠান তখন তিনি মারাত্মক-ভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন। ইতিমধ্যে শাসকষ্ট দেখা দিয়েছিল। তিনি লোকদেরকে বলেন, এখন আমাকে মৃতই মনে কর এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিয়ে বলো, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যেন উত্তম প্রতিদান দেন। আর আমাদের জাতিকে বলো, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তিও তোমাদের মধ্যে জীবিত থাকবে ততক্ষণ যদি শত্রুরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে আল্লাহ্র দরবারে তোমরা এর কোন ওজর পেশ করতে পারবে না।

৮। উবাদা বিন সামিত (রা)। তিনি ছিলেন বনী আওফ (খাযরাজ) গোত্রের লোক। তিনি শিক্ষিত সাহাবার মধ্যে পরিগণিত হতেন। তার থেকে হাদীসসমূহ বর্ণিত আছে। হযরত উসমান (রা) এর খিলাফত আমলে তিনি ইনতিকাল করেন।

৯। রাফি বিন মালিক (রা)। তিনি ছিলেন বনী যুরায়ক (খাযরাজ) গোত্রের লোক। উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

১০। আবদুল্লাহ্ বিন অমর (রা)। তিনি ছিলেন বনী সালিমাহ্ (খাযরাজ) গোত্রের লোক। উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, তোমার পিতাকে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হে আমার বান্দা, যা চাওয়ার চেয়ে নাও। তোমার পিতা নিবেদন করলেন, হে আমার সৃষ্টিকর্তা, আমার একটি মাত্র কামনা। আর তা হলো, আমি যেন পুনরায় জীবিত হই এবং ইসলামের জন্য জান কুরবান করি।

১১। সা'দ বিন খায়সামা (রা)। তিনি ছিলেন বনী হারিছা (আওস) গোত্রের লোক। বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর পিতা তাঁকে বলেন, যুদ্ধে আমারও অংশ আছে, (অর্থাৎ তাতে অংশ গ্রহণ করা আমারও কর্তব্য), তবে একজনকে তো ঘরে থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত লটারী করা হলো এবং তাতে সা'দ (রা)-এরই নাম উঠলো। অতএব তিনিই যুদ্ধে যান এবং শাহাদত বরণ করেন।

১২। মুনযির বিন আমর (রা)। তিনি ছিলেন বনী সায়েদা (খাযরাজ) গোত্রের লোক। বি'-রে মাউনায় শাহাদত বরণ করেন।

হিজরতের অনুমতি

এরপর সাহাবীদেরকে ইয়াছরিবে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও নিজের (হিজরতের) জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতির অপেক্ষায় রইলেন। এটা ছিল দ্বীনে হক প্রচারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। অন্যান্য সাহাবীদের মত হযরত আবূ বকর (রা) ও হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেন। এতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ধারণা হলো, হয়ত তিনি হিজরতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। (সংকলক)

হিজরত সফরের সূচনা

হিজরতের অনুমতি

আকাবার দ্বিতীয় (অপর বর্ণনা অনুযায়ী তৃতীয়) বাই'আতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবা কিরাম (রা) কে ইয়াছরিবে হিজরত করার অনুমতি দেন। তাঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে যেতে থাকেন। কেউ কেউ এ যাত্রাকালে অত্যন্ত দুঃখ-যাতনা ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হন, যা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনার স্থান এটা নয়। এই গণ-হিজরতের ফলে কেবল কিছু সংখ্যক মুসলমান মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হচ্ছেন, হুযূরে আকরাম (সা) এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত আলী (রা)। অবশিষ্ট যারা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ঐ সব ব্যক্তিবর্গ, যারা নি:স্ব ও অক্ষম হওয়ার কারণে হিজরত করতে পারছিলেন না। অবশ্য বেশ কিছু দিন পর তারাও হিজরত করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

কুরায়শের পরিকল্পনা

এবার কুরায়শদের মাথায় এ চিন্তা ঢুকলো, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মদীনায় চলে যান তাহলে মুসলমানরা সেখানে সংগঠিত হয়ে অধিকতর সুন্দর ও সুষ্ঠু পদ্ধতিতে ইসলাম প্রচার করতে থাকবে। ফলে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা একটি সম্মিলিত শক্তিতে পরিণত হয়ে কুরায়শদের জন্য একটি ভয়ংকর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কুরায়শের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা 'দারুন্নাদ্ওয়ায়' (যা ছিল তাদের পরামর্শ স্থল) একত্রিত হয়ে বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে। ঐ বৈঠকে আলোচনার জন্য তিনটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। যেমন ঃ

১। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে শিকল পরিয়ে একটি স্থানে বন্দী করে রাখা হবে।

২। তাকে এমন একটি জায়গায় বিতাড়িত করা হবে, যেখান থেকে সে কোনভাবেই যেন তার ঐ সব উৎসর্গীকৃতপ্রাণ অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে না পারে, যারা মদীনায় চলে গেছে।

৩। তাকে হত্যা করা হবে।

প্রথম প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয় এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বন্দী করা সম্ভব হলেও বন্দী করে রাখা সম্ভব ছিল না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুগামীরা তাকে যে কোন মূল্যে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবকেও বাহ্যত: অযৌক্তিক মনে করা হয়। কেননা এমন কোন জায়গাই ছিল না, যেখান থেকে ইয়াছরিবের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ছিল অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তবে এক্ষেত্রে একটি জিজ্ঞাসা ছিল। আর তা হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর গোষ্ঠী (বনূ আবদে মানাফ)-এর প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে? আবু জাহ্ল প্রস্তাব দিল, কুরায়শের প্রতিটি অভিজাত গোত্র থেকে একজন করে যুবক নির্বাচন করা হবে। তারা রাত্রের বেলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর গৃহ অবরোধ করে রাখবে এবং ভোর বেলা যখন তিনি সালাতের জন্য বের হবেন তখন তারা সবাই একযোগে হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করবে। এভাবে বনূ আবদে মানাফ ছাড়া কুরায়শের সবগুলো গোত্রই একাজে শরীক হয়ে যাবে এবং তাদের মুকাবালা করা শুধুমাত্র বনু আবদে মানাফের পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমেই এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা

কুরআন মাজীদ থেকেও এ পরিকল্পনার সত্যতা প্রমাণিত হয়। যেমন বলা হয়েছে–

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ط وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ .

"স্মরণ করুন, কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আপনাকে বন্দী করার, হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেন। আর আল্লাহ্ই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

(৮ ঃ ৩০)

শেষ পর্যন্ত সত্য অস্বীকারকারী ও বিদ্বেষ পোষণকারীদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র নষ্যাৎ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই যে ফয়সালা করে রেখেছিলেন, দিবালোকের ন্যায় তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

অবরোধকারী

যে সব লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর গৃহ অবরোধ করেছিল, 'তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাদের নাম হচ্ছে ঃ–

১। আবূ জাহ্‌ল (অমর বিন হিশাম)
২। উকবা বিন আবী মুয়ীত।
৩। নাযার বিন হারিছ।
৪। উমাইয়া বিন খালাফ।
৫। উবাই বিন খালাফ।
৬। যামা'আ' বিন আসওয়াদ।
৭। নাবীহ বিন হাজ্জাজ।
৮। মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ।
৯। তুআ'য়মা বিন আদ্দী।
১০। হাকাম বিন আবিল আস।
১১। আবূ লাহাব।
১২। ইবনুল গাইতালা।

এদের মধ্যে প্রথম আটজন ছিল ঐ সব লোক, যারা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়।

সফরের সিদ্ধান্ত

একদিকে বারো জন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বাসস্থান অবরোধের জন্য মনোনীত হয়, অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন। অনুমতি পাওয়া মাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রিয় স্বদেশ ত্যাগের সংকল্প নেন।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা ঠিক দুপুর বেলা ঘরে বসেছিলাম। কেউ একজন বললো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাশরীফ এনেছেন। তখন তাঁর মাথা ঢাকা ছিল।[১১] অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর এই সময়ে আমাদের ঘরে আসার কথা নয়। আমার পিতা (আবূ বকর) তখন বলেন, আমার পিতামাতা তাঁর উপর কুরবান হোন, আল্লাহ্র কসম, এটা তাঁর শুভাগমনের সময় নয়, নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে বলেন, যারা আপনার কাছে আছে তাদের বের করে দিন। আবূ বকর (রা) নিবেদন করেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, এখানে তো শুধুমাত্র আপনার পরিবারবর্গ রয়েছে।[১২] রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি হিজরতের অনুমতি পেয়ে গেছি। আবূ বকর (রা) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোন, আমি আপনার সফরসঙ্গী হওয়ার আশা রাখি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হ্যাঁ (তুমি আমার সঙ্গী হবে)। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি খুশীতে কাউকে কাঁদতে দেখি নি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ দিয়ে যখন 'হ্যাঁ' উচ্চারিত হয় তখন আবূ বকর (রা) এর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

এটা ছিল আনন্দাশ্রু। আর দুনিয়ায় এর চাইতে বড় আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে যে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সফরে তিনি (আবু বকর) জগতের পথপ্রদর্শকের সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

হযরত আবূ বকর (রা) নিবেদন করেন, আমি বাবুলের পাতা খাইয়ে দু'টি উট লালন-পালন করেছি, এজন্য যে, যাতে আপনি এর একটি গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, নেব, তবে মূল্যের বিনিময়ে।

আমানতসমুহের সুরাহা এবং হযরত আলী (রা)

বিষয়টি ফায়সালা করে রাসূলুল্লাহ (স) আপন ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন। যদিও কুরায়শ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রাণের শত্রু ছিল, তবু মক্কা মুকাররমার বেশীর ভাগ লোক তাদের জিনিসপত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছেই আমানত রাখত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সব আমানতের ব্যাপারটি হযরত আলী (রা) কে বুঝিয়ে দিয়ে বলেন, তুমি এগুলো এসবের মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে ইয়াছরিবে চলে আসবে। এখন নিশ্চিন্তে আমার বিছানায় শুয়ে পড়। আল্লাহ্র ফযল ও করমে তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

এই সব ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার পর অবরোধকারীরা তাঁর বাসগৃহ ঘেরাও করে ফেলে। তিনি রাত্রির প্রথম প্রহরেই ঘর থেকে বেরিয়ে যান। যারা দরজায় বসেছিল তারা ব্যাপারটি মোটেই আঁচ করতে পারে নি।

এদিকে হযরত আবূ বকর (রা) এর ঘরে হযরত আয়েশা ও হযরত আসমা (রা) অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সফর-সামগ্রী তৈরি করে দেন। তাঁরা খাবার তৈরী করে একটি চামড়ার থলেতে ভরে নেন। যখন থলের মুখ বাঁধার মত কোন জিনিস পাওয়া গেল না তখন হযরত আসমা (রা) আপন কটিবন্ধ থেকে একটি টুকরা ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে থলের মুখ বেঁধে দেন, তখন থেকেই তিনি 'যাতুন্ নাতাকায়ন' (দুটি কটিবন্ধের অধিকারিণী) উপাধিতে ভূষিত হন। এক বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি তাঁর কটিবন্ধটিকে দু'টুকরা করে এক টুকরা দিয়ে খাবার থলের এবং অন্য টুকরা দিয়ে পানির মশকের মুখ বেঁধে দিয়েছিলেন।

ছাওর গুহা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন বাসগৃহ থেকে বের হয়ে মক্কা মুকাররমার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত হযরত আবূ বকর (রা) এর ঘরে যান এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছাওর পাহাড় অভিমুখে যাত্রা করেন। ছাওর পাহাড়ের অভ্যন্তরে একটি বিরাট গুহা ছিল। এই গুহায় যাবার রাস্তা ছিল অত্যন্ত পাথুরে। হযরত আবু বকর (রা) এই কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে কিছুদূর পর্যন্ত আপন কাঁধে বসিয়ে নেন। এরপর উভয়ে পায়ে চলার সময় তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগে, কখনো পিছনে, কখনো ডানে, আবার কখনো বামে হাঁটতেন-যেন তিনি সব দিক থেকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে রক্ষা করার জন্য ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ। গুহার মুখে পৌঁছে হযরত আবু বকর (রা) প্রথমে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং তা ভালভাবে পরিষ্কার করে নেন। গুহার অভ্যন্তরে অনেকগুলো ছিদ্র ছিল। তিনি আপন পরিধেয় কাপড়টি ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে সবগুলো ছিদ্র বন্ধ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ভেতর নিয়ে যান। এই গুহার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা) তিন দিন এবং তিন রাত অবস্থান করেছিলেন।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা

শুধুমাত্র আল্লাহ্ই ছিলেন প্রকৃত রক্ষা-কর্তা। তিনি শত্রুদের প্রতিটি পরিকল্পনাকে বানচাল করে আপন প্রিয় নবীকে যাবতীয় বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যখন থেকে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তখন থেকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা) মক্কা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার যাবতীয় কৌশল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে থাকবেন। যেমন ঃ

১। হযরত আবু বকর (রা) প্রথম থেকেই দু'টি উট হিজরতের সফরের জন্য তৈরী করে রেখেছিলেন।

২। মক্কা মুকাররমা থেকে দক্ষিণ অভিমুখে সফর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এজন্য যে, ইয়াছরিব ছিল মক্কার উত্তর দিকে এবং সেদিকে যাতায়াতের সবগুলো রাস্তাই ছিল উত্তরমুখী। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পশ্চাদ্ধাবনকারীরা তাঁদেরকে ঐ সমস্ত রাস্তায়ই তন্ন তন্ন করে খুজবে। দক্ষিণ দিকে গিয়ে তাঁদেরকে তালাশ করার কোন চিন্তাই তাদের মাথায় আসবে না।

৩। খুব সম্ভবত: ছাওর গুহায় আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্তটি পূর্বেই নেওয়া হয়েছিল, উপস্থিত সময়ে নেওয়া হয়নি।

৪। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ্ (রা) কে এই কাজে নিয়োজিত করে গিয়েছিলেন যে, তিনি সারাদিন কুরায়শের আলাপ আলোচনার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন এবং তা থেকে যে সব কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলার প্রয়োজন বোধ করবেন তা রাতের বেলা গুহায় গিয়ে বলে আসবেন।

৫। এ ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছিল যে, হযরত আসমা (রা) রাতের বেলা গুহায় গিয়ে খাবার পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবেন।

৬। আ'মির বিন ফুহায়রা ছিল হযরত আবূ বকর (রা) এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম। সে তাঁর বকরী চরাত। তাকে ভালভাবে বলে রাখা হয়েছিল যে, সে যেন দুগ্ধবতী বকরীগুলোর দুধ ওলানে আটকে রাখে এবং রাতের বেলা সেগুলোকে দোহাবার জন্য গুহার মুখে নিয়ে যায়। এভাবে দৈনিক টাটকা দুধ পাওয়ার একটি ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছিল।

৭। ভোর বেলা আমির বিন ফুহায়রা বকরী পালকে গুহার নিকট থেকে অনেক দূরে, একেবারে মক্কা মুকাররমার কাছে নিয়ে যেতেন, যাতে কোন আগমন নির্গমনকারীর পদচিহ্ন গুহার আশেপাশে না থাকে।

৮। আবদুল্লাহ্ বিন উরায়কাত নামীয় জনৈক ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রথম থেকেই নিয়োগ করে রাখা হয়েছিল। আবদুল্লাহ্ যদিও তখন পর্যন্ত মুসলমান হয় নি, তবে মানুষ হিসাবে তার উপর পুরাপুরি আস্থা রাখা যেত।

এত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল যে, প্রত্যেকটি কাজই যথা সময়ে ও অত্যন্ত গোপনে একের পর এক সম্পন্ন হতে থাকে।

এই ছাওর গুহায়ই সেই শিক্ষণীয় ঘটনাটি ঘটেছিল, যার উল্লেখ রয়েছে পবিত্র কুরআনে। যেমন–

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

"তখন তিনি তাঁর সংগীকে বলেছিলেন, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সংগে আছেন।"

মরহুম মাওলানাও এ ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, যার আলোচনা সামনে আসছে।

হযরত আবূবকর (রা) ও তাঁর পরিবার বর্গের আত্মত্যাগ

উপরোক্ত ব্যবস্থাপনা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর দূরদর্শিতা, বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন, গোপনীয়তা রক্ষা ও প্রাণ উৎসর্গের এরূপ সাক্ষ্য বহন করছে, যার থেকে উজ্জ্বল কোন দৃষ্টান্ত হতে পারে না।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর সম্পত্তির একটি বড় অংশ ইসলামী দাওয়াতের সূচনা কালেই ব্যয় করে ফেলেছিলেন। যেমন তিনি ঐ সমস্ত নিঃস্ব মুসলমান কৃতদাসদেরকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, যারা ইসলাম গ্রহণের

কারণে তাঁদের প্রভুদের হাতে দিনের পর দিন অকথ্য নির্যাতন ভোগ করে আসছিলেন। তিনি নিরাশ্রয় মুসলমানদেরকেও নানাভাবে সাহায্য করেন। এভাবে তেরোটি বছর অনবরত: অর্থ ব্যয়ের পর যা কিছু তাঁর হাতে অবশিষ্ট ছিল, তার সম্পূর্ণটাই তিনি হিজরতকালে সংগে করে নিয়ে যান। এক বর্ণনা অনুযায়ী এর পরিমাণ ছিল পাঁচ হাজার 'দাম'[১৩] (তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রা বিশেষ)।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ বকর (রা) এর কন্যা হযরত আসমা (রা) এর একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিজরতের পরদিন হযরত আবূ বকরের অন্ধ পিতা আবূ কুহাফা (তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি) তাঁর জেষ্ঠ্য নাতনী হযরত আসমা (রা) কে সম্বোধন করে বলেন, মনে হয় আবূ বকর তোমাদেরকে দুটি বিপদে ফেলে গেছে। সে নিজে চলে গেছে, আবার সকল সম্পদও তার সাথে করে নিয়ে গেছে। হযরত আসমা (রা) পাথরের কিছু টুকরা নিয়ে যেখানে ঘরের টাকা রাখা হত সেখানে রেখে সেগুলো কাপড় দ্বারা ভাল করে ঢেকে দিলেন। আবু কুহাফার দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল। হযরত আসমা (রা) বললেন, দাদাজান! তিনি আমাদের জন্য অনেক সম্পদ রেখে গেছেন। তিনি বৃদ্ধ দাদার হাত ধরে ঢেকে রাখা পাথরের উপর রাখেন। এভাবে তাকে সান্ত্বনা দেন। তখন পর্যন্ত আবু কুহাফা ইসলাম গ্রহণ করেননি। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে এভাবে সাহাবা কিরামের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) একটি বিরাট বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে যান যে, তাঁর বংশের চার পুরুষই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।[১৪]

হিজরতের পরদিন ভোরবেলা আবূ জাহ্‌ল হযরত আবু বকর (রা)-এর ঘরে যায় এবং হযরত আসমা (রা) কে জিজ্ঞাসা করে, তোমার পিতা কোথায়? আসমা (রা) উত্তর দেন, আমি জানি না। পাষাণচিত্ত আবূ জাহ্‌ল তখন রাগের বশে হযরত আসমা (রা) কে এমন জোরে থাপ্পড় মারে যে, তাঁর কানের দুলটি ছিঁড়ে নীচে পড়ে যায়।[১৫]

হযরত আবূ বকর (রা) এবং তাঁর পরিবারবর্গ এই সমস্ত দুঃখ কষ্ট ও জুলুম-নির্যাতন সেই পবিত্র সত্তার হিফাযতের উদ্দেশ্যে হাসিমুখে সহ্য করে যান, যে সত্তা ছিলেন উভয় জাহানের হিদায়াত ও সাফল্যের উজ্জ্বলতম মীনার।

দিন-তারিখ নির্ধারণের ব্যাপার

এখন শুধুমাত্র একটি বিষয় অবশিষ্ট রয়ে গেল। আর তা হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন্ তারিখে মক্কা মুকাররমা থেকে বের হয়ে ছাওর গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। মরহুম কাযী সুলায়মান মনসুরপুরীর বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ত্রয়োদশ নবভীর ২৭শে সফর হিজরতের সংকল্প নিয়ে আপন ঘর থেকে বের হন। সেটা ছিল বৃহস্পতিরবার গিয়ে শুক্রবারের রাত। ইসায়ী সন অনুযায়ী ১০ই সেপ্টেম্বর, ৬২২ ইং। সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এ ক্ষেত্রে একদিন অগ্র-পশ্চাৎ করার সম্ভাবনাও আছে। তাবাকাতে ইবনে সা'দের বর্ণনা অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার তারিখ হচ্ছে ১লা রাবীউল আউয়াল, ত্রয়োদশ নবভী অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ৬২২ ইং। প্রথমোক্ত হিসাব অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিন দিন তিন রাত ছাওর গুহায় অতিবাহিত করে ১লা রাবীউল আউয়াল অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর ৬২২ইং ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অন্য হিসাব অনুযায়ী তিনি (সা) ৪ঠা রাবীউল আউয়াল অর্থাৎ ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২২ইং রওয়ানা হন। প্রথমোক্ত হিসাব অনুযায়ী রওয়ানা হওয়ার দিন ছিল নিঃসন্দেহে সোমবার। তাবাকাতে ইবনে সা'দেও ছাওর গুহা থেকে রওয়ানা হওয়ার দিন সোমবার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, মক্কা মুকাররমা কিংবা ছাওর গুহা থেকে রওয়ানা হওয়ার দিন সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। মতভেদ শুধু তারিখ নিয়ে। (সংকলক)

মরহুম মাওলানার বিশ্লেষণ

এই ভূমিকার পর পৃথক অধ্যায় হিসাবে মরহুম মাওলানার অভিমত পাঠ করুন। যদিও এটা আকারে অতি সংক্ষিপ্ত।

মক্কায় যখন হযরত মুহাম্মদ (সা) এর দাওয়াত প্রচারিত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে দুটি দলের উদ্ভব হয়। এক দল ছিল ঐ সব লোকের, যারা এ দাওয়াত কবুল করেছিলেন। অন্যদিকে গোটা জাতি ও তাদের সর্দার, যারা এই দাওয়াতের বিরোধী ছিল। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, তাদের মধ্যে এই বিরোধিতার ভিত্তি কি ছিল? দাওয়াত গ্রহণকারীরা বলত, তারা যেটাকে সত্য মনে করে সেটা গ্রহণ করার অধিকার তাদের রয়েছে। আর বিরোধীরা বলত, তাদের এই অধিকার নেই। অন্য কথায়, তারা মানুষের বিশ্বাসের স্বাধীনতা স্বীকার করত না। তারা তরবারির জোরে মুসলমানদের তাদের আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তের বছর পর্যন্ত সব ধরনের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেন। শেষ পর্যন্ত যখন মক্কায় টিকে থাকা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তখন তিনি মদীনায় হিজরত করেন। কিন্তু কুরায়শরা সেখানেও তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। তারা তাঁর উপর একের পর এক হামলা শুরু করে। পবিত্র কুরআনে হিজরত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ .

"স্মরণ করুন, কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আপনাকে বন্দী করার, হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেন; আর আল্লাহ্ই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

–(৮ ঃ ৩০)

অর্থাৎ কাফিররা ষড়যন্ত্র করার ব্যাপারে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র কৌশলই জয়যুক্ত হল এবং কাফিরদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহর হিফাযতে ইয়াছরিবে পৌছে গেলেন।

'বিষণ্ন হয়ো না'

সূরা তাওবার ৪০তম আয়াতে হিজরতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যখন মক্কায় ইসলামের শত্রুরা এই সিদ্ধান্ত নিল যে, সমগ্র গোত্রের লোক সমবেতভাবে একই সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর উপর হামলা করবে ঠিক তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হিজরতের নির্দেশ দেন। তিনি প্রথমে হযরত আবূ বকর (রা) কে সঙ্গে নিয়ে ছাওর গুহায় আত্মগোপন করেন। সেখানে তিনি তিন রাত অতিবাহিত করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। যে সব শত্রু তাঁর সন্ধানে ছিল তারা ছাওর গুহায় গিয়েও পৌছেছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে রক্ষার জন্য এমন কৌশল অবলম্বন করেন যে, তারা তাকে ভালভাবে খুঁজে দেখার চেষ্টা না করেই ফিরে যায়। পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবায় এর প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে–

"যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর তবে স্মরণ করো, আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দুজনের একজন, যখন তাঁরা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, তিনি তখন তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, 'বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।' এরপর আল্লাহ্ তাঁর উপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন। এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দিয়ে, যা তোমরা দেখ নি, এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন, আল্লাহ্‌র কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"– (৯ ঃ ৪০)

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এর বিষণ্নতা ও ভীতিগ্রস্ততা

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), যিনি ছিলেন নুবুওয়াত-প্রদীপের উৎসর্গীকৃত প্রাণ পতঙ্গ, ছাওর গুহায় ঐ তিন রাত কি অবস্থায় কাটিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে একটা ধারণা করা শুধু তার পক্ষেই সম্ভব, যে কখনো প্রেমের কিছুমাত্র স্বাদ উপভোগ করেছে।

আল্লাহ্‌র রাসূল গুহার মধ্যে আত্মগোপন করে আছেন। শত্রুরা তাঁর সন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছে। প্রতিটি মুহূর্তে এ ভয় রয়েছে কখন না শত্রুরা আবার তাঁর সন্ধান পেয়ে যায়। একবার তো তাদের আওয়াজ শুনাই যাচ্ছিলো। এমতাবস্থায় তার অন্তরে কি পরিমাণ ভয়-ভীতি বিরাজ করবে তা তো জানা কথা। তবে নিঃসন্দেহে তার এ বিশ্বাসও ছিল যে, আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা) কে অবশ্যই সাহায্য করবেন। কিন্তু প্রেম-ভালবাসার প্রকৃতিগত চাহিদা এই ছিল যে, প্রেমিক তাঁর প্রিয়জনকে বিপদের মধ্যে দেখে অবশ্যই ভীতিগ্রস্ত হত। এ থেকে সে কখনো আপন অন্তরকে রুখে রাখতে পারত না। আর পারলেও প্রেমের আদালতের ফয়সালা তার বিরুদ্ধে চলে যেত।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মানসিক স্বস্তির অবস্থা ছিল অন্যরূপ। যখন তাঁর গুহার সাথী (আবু বকর) প্রেমোচ্ছ্বাসের দরুণ ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়তেন তখন তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন,- 'বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।' খোদ হযরত আবূ বকর (রা) বলেছেন, যখন শত্রু গুহার সন্নিকটে এসে পৌঁছল তখন আমি ভীতিগ্রস্ত হয়ে বললাম, যদি এদের কেউ পা একটু উঁচু করে দাঁড়ায় তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের দেখে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, আবূ বকর। তুমি এই দু'জন মানুষ সম্পর্কে কী ধারণা করছ, যাদের সাথে তৃতীয় আর একজন রয়েছেন এবং তিনি হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা (বুখারী-মুসলিম ঃ আনাস থেকে বর্ণিত)

এখানে 'আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন'–এর অর্থ 'আবূ বকর (রা) এর উপর শান্তি ও স্বস্তি বর্ষণ করেন।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর উপর শান্তি বর্ষণের কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা তিনি তো আল্লাহ্‌র ফযলে প্রথম থেকেই শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে ছিলেন।

কুরআনী শিক্ষার মু'জিযাসমূহ

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

"হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ অতিশয় মংগলময়।" (৮ ঃ ২৯)

এ থেকে জানা গেল যে, যে জনগোষ্ঠী আল্লাহ্‌কে ভয় করবে তাদের অন্তরে ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-খারাপের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের একটি বিশেষ ক্ষমতা বিরাজ করবে। এ প্রেক্ষিতে নিশ্চয় বিশ্ববাসী লক্ষ্য করেছে, প্রথম যুগের মুসলমানদের অবস্থা কি ছিল। আরবের বেদুইন, যাদের সমগ্র জীবন উট চরানোর মধ্যে কেটে যেত, সেই তারাই

হঠাৎ একদিন ইরানী ও রোমকদের মত সভ্য জাতির দণ্ডমুন্ডের কর্তা বলে বসল। সেই সাথে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির এমন একটি ক্ষমতাও তাদের করায়ত্তে এসে গেল যে, তারা যা কিছু করত এবং যেভাবে করত, তা ন্যায়, সত্য, মঙ্গল ও পুণ্য ছাড়া কিছু হত না। জনৈক কবির ভাষায়–

সেই যামানা কোথায় গেল যখন আমার
'আহ্' এরও একটা প্রভাব ছিল,
এ-ই ছিল আমার রক্ত ঝরানো চোখ
এ-ই ছিল অন্তর, এই ছিল মন॥

সূরা আনফালের ৩০ তম আয়াতের প্রতি চিন্তা করলে দেখা যায়, মানুষ তার মূর্খতা ও অন্যমনস্কতার কারণে কি চিন্তা করে এবং হিকমাতে ইলাহীর গোপন কৌশলসমূহের সিদ্ধান্ত কি হয়ে থাকে। হিজরতের পূর্বে মক্কার কুরায়শরা যখন এই পরিকল্পনা নিয়েছিল তখন তারা কি ক্ষণিকের জন্যও ঐ সব পরিণামের কথা চিন্তা করতে পেরেছিল? মূলত: তাদেরই জুলুম-অত্যাচার এবং বাড়াবাড়ি এই সব পরিণামের পটভূমি তৈরী করে দিয়েছিল?

যদি জুলুম-অত্যাচার না হত তাহলে হিজরতও হত না। আর যদি হিজরত না হত তাহলে ঐ সব পরিণামও প্রকাশিত হত না। এটাই হচ্ছে আল্লাহ্র বিধানের গোপন কৌশল যে, মানুষ যখন সত্যের অনুসারীদের উপর জুলুম অত্যাচার করে তখন তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও কলাকৌশল বানচাল করে দেওয়া হয়।

এরপর সূরা আনফালের ৩৩তম আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۰

"আল্লাহ্ এমন নন যে, আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন।"–(৮ ঃ ২২)

মক্কায় কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে হিজরত করতে বাধ্য করে এবং তাদের বাড়াবাড়ি এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তারা আল্লাহ্র বান্দাদেরকে তাদের উপাসনালয় থেকে জবরদস্তিমূলকভাবে রুখে রাখে। এমতাবস্থায় তো এমন কোন কারণ থাকতে পারে না যে, তাদের ঐ দুষ্কর্মের পরিণতি প্রকাশিত হতে বিলম্ব ঘটবে। শেষ পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয়ও। যার ফলে মক্কার কুরায়শদের গোষ্ঠীগত সৌভাগ্য সূর্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়ে যায়।

ইয়াছরিবের মনযিলসমূহ

ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে যাত্রা

ছাওর গুহায় তিন রাত অতিবাহিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন গন্তব্যস্থান অভিমুখে রওয়ান হন। খুব সম্ভবত: এই সিদ্ধান্ত পূর্বেই গ্রহণ করা হয়ে থাকবে। অবশ্য মক্কা মুকাররমায় বিশেষ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সে অনুযায়ী এ সিদ্ধান্তে রদবদল করার সুযোগও নিশ্চয়ই রাখা হয়ে থাকবে। যথাসময়ে দু'টি উট গুহার কাছে এসে পৌছে, যেগুলোকে কয়েকমাস ধরে বাবুলের পাতা খাইয়ে এ উদ্দেশ্যেই তৈরী করা হচ্ছিলো এবং এগুলোর একটির মূল্য খোদ রাসূলুল্লাহ্ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। সম্ভবত: এই উটনীর নাম ছিল কাস্ওয়া।

কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী এই সফর রাতের বেলা শুরু হয়েছিল। ঐ মুহূর্তের চাহিদাও ছিল তাই। সম্ভবত: খুব প্রত্যুষে তাঁরা রওয়ানা হয়ে থাকবেন, যাতে সূর্য উঠার আগেই মক্কার নিকটবর্তী এলাকা অনেক পেছনে ছেড়ে যেতে সক্ষম হন। একটি উটনীর অগ্রভাগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরোহণ করেন। তাঁর পিছনে বসেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। অপর উটটিতে আরোহণ করে আবদুল্লাহ্ বিন উরাইকাত এবং 'আমির বিন ফুহাইরা।[১৬]

ছাওর গুহা থেকে বের হয়ে তাঁরা সেই রাস্তা ধরে চলতে থাকেন, যে রাস্তা সাধারণভাবে যাতায়াতের জন্য তখন ব্যবহৃত হত না। এভাবে পশ্চিম-উত্তরমুখী হয়ে চলতে চলতে তাঁরা সমুদ্রের কাছাকাছি গিয়ে পৌছেন। আমার অনুমান মতে, এটা হচ্ছে সেই রাস্তা, যা জেদ্দা থেকে রাবিগ অভিমুখে চলে গেছে।[১৭]

মঙ্গলবার দিন দুপুর বেলা একটি কঙ্করময় ভূমির পাশে হযরত আবূ বকর (রা) ছায়া দেখতে পান। জায়গা পরিষ্কার করে তাতে একটি চাদর বিছিয়ে দেন, যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারেন। এদিক সেদিক তাকাবার পর হযরত আবূ বকর (রা) সেখানে একটি রাখালকে দেখতে পান। তিনি রাখালকে তার হাত এবং বকরীর স্তন ভালভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে ওলান থেকে কিছু দুধ বের করতে বলেন। সে তাই করে। তখন আবূ বকর দুধের পাত্রটি ঢেকে নেন, যাতে কোন ধূলাবালি তাতে না পড়ে। অতঃপর দুধের সাথে কিছু পানি মিশিয়ে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে পেশ করেন। তিনি তা পান করেন। এরপর তাদের কাফেলটি পুনরায় চলতে শুরু করে।

রাস্তার স্থানসমূহ

তাবাকাতে ইবনে সা'দ, সীরাতে ইবনে হিশাম, ওয়াফাউল ওয়াফা এবং অন্যান্য গ্রন্থাদিতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সমস্ত স্থান অতিক্রম করেছিলেন, সেগুলোর নামও দেওয়া হয়েছে। যেমন তাবাকাতে রাবিগ্ পর্যন্ত কুদায়দ এবং ইবনে হিশামে আসফানের উল্লেখ করা হয়েছে। মরহুম মাওলানা শিবলী তাঁর সীরাতুন্নবী গ্রন্থে 'রাবিগ' এর নাম উল্লেখ করেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাগরিবের সালাত আদায় করেছিলেন।[১৮]

এগুলো হচ্ছে 'মদীনার রাজপথ'-এর বিখ্যাত স্থান সমূহ। এটা হচ্ছে ঐ সময়কার কথা, যখন মোটরগাড়ীর প্রচলন হয়নি এবং উট ছিল সফরের একমাত্র মাধ্যম। 'আসফান' এবং 'রাবিগ' এই পথের উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহের অন্যতম।

'তাবাকাত' এর বর্ণনানুযায়ী রাবিগ-এর পরবর্তী স্থানগুলো হচ্ছে খাররার, ছানিয়াতুল মুররা, লাকাফ, মাদলাজাতে লাকাফ, মাদলাজাতে মাজাহ্, মীরজাহে মাজাহ, বতনে মারজাহ, যাতে কিশ্‌দ (কারো কারো মতে কিশত্) জাদাজাদ, আযাখির, বাত্‌নে রাইম, যা সালাম আছ্ ছানিয়াহ, বাতনুল ফাহা, উরজ, জাদওয়াত, গায়ির, রাকূবাহ, বাতনুল হাকীক, জাছজাছা ও আল আসাবাহ্।

যেমন আমরা টীকায় লিখে দিয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাতনে রাইমে মাগরিবের সালাত আদায় করেছিলেন এবং মদীনা থেকে ঐ স্থানের দূরত্ব ত্রিশ মাইল।[১৯] আল আসাবাহ্ কুবার সন্নিকটে। এটা হচ্ছে কায়লা গোত্রের বাসভূমি।

এটা যেন মনে না করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসব জায়গার প্রত্যেকটিতেই অবতরণ করেছিলেন। না, তিনি তা করেন নি। তবে যে পথে এই সব বিখ্যাত স্থানসমূহ পড়ে, সে পথ ধরেই তিনি মদীনায় হিজরত করেছিলেন।

মদীনা মুনাও্ওরার রাস্তাসমূহ

তুর্কীদের শাসনামলে এবং মটর গাড়ীর প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত মক্কা থেকে মদীনাগামী চারটি রাস্তা ছিল বিখ্যাত। যেমন ঃ

১। তারীকে শারকী। এখানে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাদানের প্রয়োজন নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐরাস্তা ধরে মদীনা যান নি।

২। তারীকে সুলতানী। এটা ছিল হজ্জযাত্রী ও যিয়ারতকারীদের রাস্তা। রাবিগ থেকে এর সম্মুখবর্তী মানযিল (ষ্টেশন) গুলোর নাম ছিল মাসতুরাহ, বি'-রুশ শায়খ, দিয়ারে বনী হিসানী, বি'-রে আব্বাস, বি'-রে দরবেশ, আ-বারে আলী (যুল হুলায়ফা) ও মদীনা মুনাও্ওরাহ।

৩। তারীকুল ফারয়ে। রাবিগ থেকে এর সম্মুখবর্তী মানযিলগুলোর নাম ছিল বি'-রে রামাদান, আবূ যাবা', ওয়াদিয়ে রাইয়ান, আল কাদীর, ওয়াদিউল মুআয্‌যাম, বি'রুল মাশী, আবারে আলী, যুল হুলায়ফা ও মদীনা মুনাও্ওরা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সম্ভবত: এই রাস্তা অনুসরণ করেছিলেন।

৪। তারীকুল গাইর। এটাকে সব চাইতে ক্ষুদ্র রাস্তা মনে করা হত। রাবিগ থেকে এর সম্মুখবর্তী মানযিলগুলোর নাম ছিল বি'-রে মাবীরীক, রাসফাহ, জাবালুল গাইর, বি'-রুল মাশী, আ-বারে আলী ও মদীনা মুনাও্ওরা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর রাস্তা

রাস্তার নামগুলোর নক্সা সামনে রাখলে পরিষ্কার জানা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'তারীকুল গাইর' ধরে মদীনা সফর করেছিলেন। সবচেয়ে ক্ষুদ্র রাস্তা হওয়ার কারণে অন্যান্য রাস্তার অনুপাতে এ রাস্তাটি অপেক্ষাকৃত কম সময়ে অতিক্রম করা যেত। তাছাড়া 'জাবালুল গাইর' অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য ছিল বলে অনেক কম লোকই এ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করত। আর এ কারণেই এটাকে সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা মনে করা হয়ে থাকবে।

লেখকের মদীনা সফর

১৯২৫ ইং সনের শীত মওসুমে এই লেখকের মদীনা মুনাওওরা সফরের সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার সফর সঙ্গীরা ছিলেন মরহুম মাওলানা যাফর আলী খান, মরহুম শুয়াইব কুরায়শী, মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ ইরফান এবং জনাব রিয়াজুল হাসান। আমরা ছিলাম সাউদী সরকারের অতিথি। আমাদের সাথে ছিল তিন জন নাজদী সওয়ার এবং বাবুর্চী। সন্ধ্যা বেলা সফর শুরু করা হত এবং সাধারণত: রাতভর তা অব্যাহত থাকত। ভোর হওয়ার সাথে সাথে কাফেলা কোন এক মানযিলে অবতরণ করত। আমরা আমাদের অনুমান মতে, তারীকে সুলতানী দিয়ে মদীনা

মুনাওওরার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। রাবিগ থেকে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর আমরা অত্যন্ত স্বস্তির সাথে শাগদাফের উপর শুয়ে পড়লাম।[২০] উষ্ট্রচালক রাতের অন্ধকারে রাস্তা হারিয়ে তারীকে সুলতানীর পরিবর্তে 'তারীকে জাবালুল গাইর' ধরে চলতে থাকে। এক মানযিল অতিক্রম করার পর বুঝতে পারি যে, আমরা ভুল রাস্তার উপর দিয়ে চলেছি। বেশ কিছুটা চিন্তাভাবনার পর এক মানযিল পিছিয়ে গিয়ে তারীকে সুলতানী ধরার পরিবর্তে ঐ রাস্তা (তারীকে জাবালুল গাইর)-ধরে সফর অব্যাহত রাখাটাই আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। ঐ সময় পর্যন্ত মদীনা মুনাওওরার উপর নাজদের শাসনকর্তার দখল প্রতিষ্ঠিত হয় নি। জাবালুল গাইরের সন্নিকটে পৌঁছতেই একটি দ্রুতগামী বার্তাবাহক আমাদের সাথে সাক্ষাত করত: এই সুসংবাদ দেয় যে, নাজ্‌দী সেনাবাহিনী বিনা রক্তপাতে মদীনা মুনাওওরায় প্রবেশ করেছে। বার্তাবাহক মক্কা মুকাররমায় যাচ্ছিলো এবং সে ঐ রাস্তা ধরে সফর করছিলো এজন্য যে, অন্যান্য রাস্তার চাইতে এর দূরত্ব ছিল অপেক্ষাকৃত কম।

আমাদের সাথে মক্কা মুকাররমা থেকে যে বন্ধুরা এসেছিলেন তারা পথিমধ্যে দু তিনটি স্থানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এগুলো হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হিজরতকালীন অবতরণস্থল। যেমন একটি জায়গায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুপুর বেলা বিশ্রাম নিয়েছিলেন এবং একটি জায়গায় সালাত আদায় করেছিলেন। এ থেকে অনুমিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাবিগ থেকে আগে বেড়ে 'তারীকুল গাইর' ধরেই ইয়াছরিব পৌঁছেছিলেন।

এখানে আরেকটি কথা স্পষ্ট করে বলে রাখছি যে, 'জাবালুল গাইর'-এর উচ্চভূমির খাড়া অংশটুকু অতিক্রম করতে কিছুটা কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। কেননা সেখানে আমাদেরকে উট থেকে অবতরণ করে পায়ে হাঁটতে হয়েছিল। এছাড়া এই রাস্তার বন্ধুরতা সম্পর্কে যে সব গল্প শুনেছিলাম, তা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়।

সুরাকার ঘটনা

রাবিগ থেকে কিছুটা সামনে সুরাকা বিন মালিক বিন জুশামের ঘটনা ঘটেছিল। রাবিগ ছিল তারই গোত্রের দখলাধীন। কুরায়শের কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে না পেয়ে এ ঘোষণা দিল যে, মুহাম্মদ (স) কিংবা আবূ বকর (রা) কে যে-ই জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারবে তাকে একশ উট পুরস্কার দেওয়া হবে। সুরাকার কাছেও এ সংবাদ পৌঁছেছিল। তখন সে একটি মজলিসে বসা ছিল। এমন সময় কে একজন এসে বলল, সমুদ্রোপকূলের দিকে ছায়ার মত কয়েকটি বস্তু দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত: এগুলো মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সংগীদেরই কায়া। সুরাকার মনে হল , হ্যাঁ, তা-ই হবে। কিন্তু সে মানুষকে এই বলে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করল যে, এরা হচ্ছে অমুক অমুক ব্যক্তি এবঙ তারা এখান থেকেই ওদিকে গিয়েছে। আসল ব্যাপার এই যে, সে একাই এই পুরস্কার হস্তগত করতে চাচ্ছিল এবং অন্য কোন লোককে তাতে শরীক করতে চাচ্ছিল না।

সুরাকা চুপি চুপি সেখান থেকে উঠে পড়ল এবং ঘরে গিয়ে আপন দাসীকে বললো, আমার ঘোড়াটি নিয়ে তুমি টিলার অপর পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াও। এরপর সে আপন বর্ম ও বর্শা নিয়ে পায়ে হেঁটে সেখানে গিয়ে পৌঁছল এবং ঘোড়ায় চড়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পশ্চাদ্ধাবনে দ্রুতবেগে ছুটে চললো। কিছুটা নিকটবর্তী হওয়ার পর তার নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছেন। সে তীর বের করে লটারী করল, কিন্তু সেটা তার ইচ্ছার অনুকূল হলো না। এমতাবস্থায় একশ উটের পুরস্কারের কথা না শুনলে সে নিশ্চয়ই সেখানে থেকে ফিরে আসত।

আমাননামা (নিরাপত্তা লিপি)

সুরাকা স্বয়ং বলে যে, আমি লটারীর ফলাফলের বিপরীত কাজ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মন রুজূ করে অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করছিলেন এবং এদিক ওদিক মোটেই তাকাচ্ছিলেন না। কিন্তু আবূ বকর (রা) ছিলেন অত্যন্ত সতর্কাবস্থায়। সব দিকেই তাঁর কড়া নজর ছিল। সুরাকা ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে নিকটে এসে পৌঁছল। আবূ বকর (রা) তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে

অবহিত করলে তিনি শুধু বললেন, 'প্রভু, এর অনিষ্টকারিতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।' সংগে সংগে সুরাকার ঘোড়ার পা একেবারে হাঁটু পর্যন্ত যমীনে ধ্বসে গেল এবং সুরাকা নীচে পতিত হলো। এরপর সে নিজেকে কোন মতে টেনে তুললো। ঘোড়াটিও খুব কষ্টে যমীন থেকে তার পাগুলোকে টেনে বের করলো। সুরাকা বলে, তখন আকাশে ধূলা উড়তে শুরু করে এবং ধোঁয়ার মত তা আকাশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

সুরাকার তখন বিশ্বাস হল যে, এটা একটা ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। সে তখন অনুরোধ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সওয়ারীটিকে থামায় এবং তাঁর খিদমতে কিছু পাথেয় পেশ করে। কিন্তু তা কবুল করা হয় নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে শুধুমাত্র একটি কথা বলেনঃ তুমি কারো কাছে আমাদের কথা বলো না। সুরাকা তখন নিবেদন করে, আমি নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি পশ্চাদ্ধাবনকারীকে পিছন থেকেই ফিরিয়ে নিয়ে যাব। ফিরে যাবার সময় সুরাকা একটি আমান নামার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিবেদন করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ মুতাবিক আমির বিন ফুহায়রা একখন্ড চামড়ার উপর আমানামা লিখে সুরাকার হাতে সমর্পণ করেন।[২১] উহুদ যুদ্ধের পর সুরাকা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা বিজয়ের পর এই আমাননামটিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখান।

কিস্‌রার কাঁকন

'ইসতি'আব' গ্রন্থে আছে, সুরাকা ফিরে যাবার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বলেন, হে সুরাকা, ঐ সময় তোমার অবস্থা কী হবে, যখন তোমার হাতে কিসরার শাহী কাঁকন পরানো হবে? সুরাকা জিজ্ঞাসা করলো, এটা কি শাহানশাহ-ই-ইরান কিসরা বিন হরমুযের কাঁকন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বলেন, হ্যাঁ।

একথা শুনে সুরাকার চোখ একেবারে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠে।

হযরত উমর ফারুক (রা) এর খিলাফত আমলে যখন মাদ্‌য়ান বিজিত হয় এবং ইরান থেকে মালে গনীমত মদীনা মুনাওওয়ারায় এসে পৌঁছে তখন সেগুলোর মধ্যে কিসরার কাঁকনও ছিল। উমর ফারক (রা) সে কাঁকনটি সুরাকাকেই পরিয়ে দেন।

যুবায়র (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ

পথিমধ্যে হযরত যুবায়র (রা) এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাক্ষাৎ হয়। যুবায়র (রা) একটি বাণিজ্য কাফেলার সাথে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা) এর খিদমতে এক এক জোড়া সাদা কাপড় পেশ করে বলেন, আমিও এই বাণিজ্য কাফেলা ও পণ্য সামগ্রী মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়ে দিয়ে মদীনা মুনাওওরা অভিমুখে হিজরত করবো।

হযরত আবূ বকর (রা) ইতিমধ্যে অনেক বাণিজ্য সফর করেছিলেন। তাই বাণিজ্য পথগুলোর আশেপাশের অনেক লোকের সাথেই তার জানাশোনা ছিল। ঘটনাচক্রে তাদের কারো সাথে রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে সে জিজ্ঞাসা করত, আপনার সামনে বসা এই আরোহী কে? তখন তিনি বলতেন– هذا يهديني السبيل –'ইনি আমাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যান।' এর দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা) এই অর্থ নিতেন যে, তিনি আমার পথ প্রদর্শক। তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন এবং সরল পথে নিয়ে এসেছেন। অপর দিকে শ্রোতা মনে করত, হযরত আবূ বকর (রা) তার সফরের পথ প্রদর্শনের জন্য এ লোকটিকে সংগে নিয়ে এসেছেন।

কুবায় পদার্পণ

হিজরতের এই সফরে মোট আটদিন অতিবাহিত হয়। যাদের মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১লা রাবীউল আউয়াল ছাওর গুহা থেকে যাত্রা করেছিলেন তাদের হিসাব অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৮ রাবীউল আউয়াল কুবায় পৌঁছেন। আর যে সব ঐতিহাসিকের মতে রাসূলুল্লাহ্ ৪ঠা রাবীউল আউয়াল যাত্রা করেছিলেন, তাদের হিসাব অনুযায়ী তিনি ১২ই রাবীউল আউয়াল কুবায় পৌঁছেছিলেন। মরহুম কাযী সুলায়মান প্রথমোক্ত দলকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন,

৮ই রাবীউল আউয়াল, তেরো নববী সন, সোমবার (২৩শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ইং), মুতাবিক ১০ই তাশরী, ৪৩৮২ য়াহূদী সন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুবায় উপনীত হন।[২২] মাওলানা শিবলী বলেন, অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, এটা ৮ই রাবীউল আউয়াল, তেরো নববী সন (মুতাবিক ২০শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ ইং) মূসা খারিযমী লিখেছেন, বৃহস্পতিবার দিন এবং ফারসী 'মাহেতীর' এর ৪ঠা তারিখ, রোমান 'মাহে ঈলুল; ৯৩৩ আলেকজান্দ্রিয় সনের ১০ই তারিখ ছিল।[২৩]

কিভাবে পদার্পণ করেছিলেন

মরহুম মাওলানা শিবলী, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিভাবে মদীনায় পদার্পণ করেছিলেন, তার একটি চিত্র যেভাবে অংকন করেছেন তা হলো–

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মদীনা পদার্পণের সংবাদ পূর্বেই পৌঁছে গিয়েছিল। সমগ্র শহরের লোক অধীর আগ্রহে তার অপেক্ষা করছিলো। শিশুরা গর্ব ও উচ্ছ্বাসভরে বলে বেড়াচ্ছিলো, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসছেন।' লোকেরা প্রতিদিন প্রত্যুষে শহরের বাইরে গিয়ে একত্রিত হত এবং দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করে আক্ষেপ করতে করতে ফিরে আসত। একদিন তারা এভাবে অপেক্ষা করে ফিরে গিয়েছিল; এমন সময় একজন য়াহূদী দুর্গের উপর থেকে তাঁকে দেখে ফেলে এবং বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে তাঁর পরিচয় পেয়ে উচ্চস্বরে বলে উঠে, হে আরববাসী, নাও, তোমরা যার অপেক্ষা করছিলে, তিনি এসে গেছেন। সংগে সংগে সমগ্র শহর 'আল্লাহ্ আকবর' (আল্লাহ মহান) ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে। আনসাররা তখন অস্ত্রসজ্জিত হয়ে পাগলের মত নিজ নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে।"[২৪]

মরহুম মাওলানার মতে, এখানে শহর মানে কুবা। এটা ছিল আনসারদের বেশ অনেকগুলো বসতির অন্যতম। ঐ সময় সবগুলো বসতির আনসাররা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কারণ প্রথমত: তাদের এ বিশ্বাসই হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বপ্রথম কুবায় পৌঁছবেন। দ্বিতীয়ত: সমগ্র বসতির অধিক লোক সেখানে পৌঁছতেই পারত না। কেননা অনেক বসতিরই অবস্থান ছিল সেখান থেকে বেশ দূরে। তবে এটা সম্ভব যে, কিছু সংখ্যক লোক প্রতিদিন কুবায় এসে থাকবেন।

সোমবারের বৈশিষ্ট্য

রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুপুরের পর কুবা পৌঁছেন। কেননা ঐ দিন (৮ই রাবীউল আউয়াল) আনসাররা দুপুর পর্যন্ত যথারীতি অপেক্ষা করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গিয়েছিল। কেউ এটাকে আকস্মিক ঘটনা মনে করুক, কিংবা আল্লাহ্র ইচ্ছাই মনে করুক, হুযূর (সা) যে দিন কুবা পৌঁছেন, সেদিন নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হচ্ছিলো এবং পরদিন থেকে সূচনা হচ্ছিলো নতুন আর একটি বর্ষের। যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নুবুওয়াতের একটি যুগ পূর্ণ হলো। আর দ্বিতীয় যুগ শুরু হলো নতুন বর্ষের প্রথম দিন থেকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জীবন কথায় সোমবারের যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি (সা) এই সোমবারেই দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছেন, সোমবারেই নুবুওয়াত লাভ করেছেন, সোমবারেই ছাওর গুহা থেকে বের হয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন, সোমবারেই কুবা পৌঁছেছেন এবং সোমবারেই দুনিয়া থেকে শেষ বিদায় নিয়েছেন।[২৫] (সংকলক)

হিজরত এবং হিজরীসনের সূচনা–১

হিজরতের ঘটনার গুরুত্ব

আজ মুহাররমের ১৩ তারিখে[২৬] আমি এ লাইনগুলো লিখছি। বিগত ১৩টি দিন এই চিন্তায়ই আমার কেটে গেছে যে, একটি বছর শেষ হয়ে গেল এবং নতুন বছর শুরু হল, কিন্তু হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে সম্ভবত: একটি লোকও এমন পাওয়া যাবে না, যে এ বিষয়টি চিন্তা করে থাকবে যে, এই বার্ষিক সমাপ্তি ও সূচনার মধ্যে বিশ্ব-ইতিহাসের কিরূপ বিপ্লবাত্মক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারাজি নিহিত রয়েছে? ঐ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার চাইতে অধিকতর উপদেশপূর্ণ ও শিক্ষণীয় কোন ঘটনা ইসলামী ইতিহাসে নেই, সেই ঘটনা আজ আমাদের মনের মণিকোঠা থেকে অনেক দূরে। আর আমরা নিজেদের জীবনে তার কল্যাণ-প্রভাব থেকে কতই না বঞ্চিত!

দলীয় স্মরণ শক্তি এবং তার ধরন

ব্যক্তিগত জীবনে আমরা দেখি যে, কোন ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্রের পরিমাপ তার স্মরণ শক্তির গতি-প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। একজন চরিত্রবান ব্যক্তির স্মরণ শক্তির উৎসভূমিতে অপ্রয়োজনীয় ও খারাপ কথা স্মরণ রাখার জন্য কোন জায়গা খালি থাকে না। কিন্তু প্রয়োজনীয় ও ভালকথা সে কখনো বিস্মৃত হয় না। একজন চরিত্রহীন লোকের ব্যাপারটি এর ঠিক বিপরীত। তাকে যত বেশী উপকারী ও ভাল কথা শোনানো হোক না কেন, তার স্মরণশক্তির উৎসভূমিতে সেগুলোর জন্য কোন জায়গা খালি থাকে না। সে শুধুমাত্র মূল্যহীন ও খারাপ কথাগুলোই মনের মধ্যে গেঁথে রাখে।

হুবহু এই একই অবস্থা দলসমূহ এবং জাতিসমূহের মস্তিষ্ক তথা মন-মানসিকতারও। তাদের অধ:পতন ও নিম্নগামিতার একটি বিরাট আলামত এই যে, তাদের দলগত স্মরণ শক্তির অবস্থাও একেবারে বিপরীতমুখী হয়ে যায়। যে সব কথা স্মরণ রাখা উচিত, সেগুলোকে তারা এমনভাবে বিস্মৃত হয়ে যায় যে, বার বার স্মরণ করিয়ে দিলেও তা তাদের মনে থাকে না। আর যে সব কথা ভুলে যাওয়া উচিত, তারা সেগুলোকে শুধু স্মরণ রাখে না, বরং তা স্মরণ রাখার জন্য এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করে যে, যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, তাদের অন্তর থেকে সেসব কথা কখনো মুছে যায় না।

প্রাথমিক ও বর্তমান যুগের মুসলমান

প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের সাথে বর্তমান যুগের মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের তুলনা করলে উপরোক্ত বিষয়টির সারবত্তা অনায়াসে উপলব্ধি করা যাবে। ঐ যুগের মুসলমানরা উঠতে বসতে ঐ সব কথাই স্মরণ রাখতেন, যার উপর আজ সাধারণত: কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় না। আজকাল যে সব কথা বক্তৃতা-বিবৃতি, উৎসব-পর্বাদি ও বৈঠক-মজলিসের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়, সেগুলোর কথা ঐ যুগের মুসলমানদের চিন্তায়ও কখনো আসে নি। তারা তাদের যুগে, শুধুমাত্র ঐ সব জিনিসই তাদের অন্তরে গেঁথে রাখতে চাইতেন, যেগুলোর মধ্যে তাদের জীবনের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। আর আজকালকার মানুষের স্মরণশক্তি শুধুমাত্র ঐ সব কথাই ধরে রাখতে চায়, যেগুলো দ্বারা আমাদের সমাজ জীবনের প্রতি স্রেফ উপেক্ষা প্রদর্শন ছাড়া

অন্য কিছু করা হয় না। প্রথম যুগের মুসলমানরা ঐ সব জিনিস বিস্মৃত হতে পারতেন না, যেগুলোকে অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত। আর আমরা ঐ সব জিনিসকে কখনো ভুলতে পারি না, যেগুলোকে চিরদিনের জন্য ভুলে যাওয়া উচিত।

বিজয়ের উৎস

বিশ্ব ইতিহাসের এই বিরাট ঘটনা, যার স্মৃতি বছরের এই সমাপ্তি ও সূচনার মধ্যে নিহিত, তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হিজরতের ঘটনা। কেননা ১লা মুহাররম থেকে নতুন ইসলামী বছর শুরু হয় এবং এর ভিত্তি হিজরতের ঘটনার উপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রতি বছর যখন ৩০ যিলহাজ্জার দিন শেষ হয় এবং ১লা মুহাররমের চাঁদ উঠে তখন এই বিরাট ঘটনার স্মৃতি আমাদের অন্তরকে সঞ্জীবিত করে তোলে। এটা প্রকৃতপক্ষে ঐ ঘটনার একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন বটে। এটা দুনিয়ার তাবৎ জাতির স্মৃতিচিহ্নের মত শক্তি প্রদর্শন ও সাফল্য অর্জনের কোন ব্যাপার নয়, বরং এটা হচ্ছে দুর্বলের বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন। এটা আসবাবপত্র বা উপায়-উপাদানের স্মৃতিচিহ্ন নয়; বরং নিঃস্বতা ও সাফল্যের স্মৃতিচিহ্ন। এটা শক্তি ও শাসনক্ষমতার প্রভাব-প্রতিপত্তির স্মরণ-চিহ্ন নয়; বরং অসহায় ও শোষিতের দৃঢ়তার স্মারক। এটা মক্কা বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন নয়, যা দশ হাজার তরবারির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল; বরং মদীনা বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন, যা কোন তরবারির ঝিলিক নয় এবং এক নিঃস্ব গৃহহীন মানুষের হিজরতে বিজিত হয়েছিল। মানুষ বদর যুদ্ধের সামরিক বিজয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর জাঁকজমকপূর্ণ মক্কা প্রবেশের কথা স্মরণ রেখেছে, কিন্তু মদীনার রক্তপাতহীন বিজয়ের কথা ভুলে বসেছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলামী ইতিহাসের পরবর্তীকালের যাবতীয় বিজয়ের উৎস হচ্ছে এই পূর্ববর্তী বিজয়। এ কারণেই যখন বাহ্যিক বিজয়সমূহ ঘোষণার সময় এসেছিল তখন এই অর্থপূর্ণ বিজয়ের কথাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেমন–

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ج فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

"তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তাঁরা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, তিনি তখন তাঁর সংগীকে বলেছিলেন, 'বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সংগে আছেন।' এরপর আল্লাহ্ তাঁর উপর আপন প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দ্বারা, যা তোমরা দেখ নি, এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন; আল্লাহ্র কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"–(৯ : ৪০)

মুহাররমের স্মৃতি

এই হিজরী সনের ৬০তম বছরে কারবালার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা এতই হৃদয়বিদারক, মর্মস্পর্শী এবং এর রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এতই শক্তিশালী ও বিস্তৃততর ছিল যে, যতই দিন অতিবাহিত হলো, এর স্মৃতিও একটি মাতমী স্মৃতির রূপ ধারণ করলো। এমন কি, শেষ পর্যন্ত মুহাররম মাসে সংঘটিত যাবতীয় ঘটনার স্মৃতি শুধুমাত্র এই দু:খজনক ঘটনার স্মৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ও কেন্দ্রিভূত হয়ে পড়ল এবং অন্যান্য ঘটনার কথা মানুষ বেমালুম ভুলে বসল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কারবালার ঘটনার হৃদয়বিদারকতা ও দুঃখজনক স্মৃতি কখনো বিস্মৃত হবার নয়। কিন্তু আমাদের গোষ্ঠীগত চিন্তাধারা ও মনমানসিকতার জন্য এটি একটি ভ্রান্তিকর ব্যাপার হবে যদি আমরা অন্যান্য ঘটনা ও দিকগুলোর কথা একেবারে ভুলে বসি। এটা হচ্ছে হিজরী সনের ৬০তম বছরের একটি ঘটনার স্মৃতি। তবে এই স্মৃতি রক্ষা করতে গিয়ে আমরা হিজরী সনের প্রথম বছরের ঘটনাটি বেমালুম ভুলে বসবো কেন?

হিজরী সনের সূচনা

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়ার সভ্য ও সংস্কৃতিবান জাতিসমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সনের প্রচলন ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল য়াহূদী, রোমান ও ইরানী সন। জাহিলিয়া যুগের আরবের অভ্যন্তরীণ জীবন এরূপ সভ্যভব্য ছিল না যে, এর হিসাব-নিকাশের জন্য এমন কোন বিস্তৃততর পরিমাপ-কাঠামোর প্রয়োজন হবে, যা গৃহীত হবে দেশের কোন বিখ্যাত ঘটনা থেকে এবং তারই ভিত্তিতে বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন মওসুমের ঘটনাবলী স্মৃতির কোঠায় ধরে রাখা হবে। অবশ্য জাহিলিয়া যুগের আরবে মোটামুটিভাবে একটি সনের প্রচলন ছিল। আর তা ছিল 'আমুল ফীল'—অর্থাৎ আবিসিনিয়ার বাদশাহের[২৭] হিজাযে আক্রমণের বছর। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আরবের হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে এই সনই ব্যবহৃত হতে থাকে। ইসলামের আবির্ভাবের পর এর বিভিন্ন ঘটনাবলী উপরোক্ত ঘটনার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। সাহাবা কিরাম (রা)-এর রীতি ছিল যে, তাঁরা ইসলামী যুগে সংঘটিত ঘটনাবলী থেকে কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে তা দিয়েই হিসাব-নিকাশের কাজ সমাধা করতেন। মদীনায় হিজরতের পর পর সূরা হজ্জের ঐ আয়াত নাযিল হয়, যার মধ্যে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যেমন—

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۔

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম।" (২২ ঃ ৩৯)

এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মনে করে কিছুদিন পর্যন্ত একে কেন্দ্র করেই একটি সনের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এই সনকে বলা হত 'সনে ইয্ন' তথা যুদ্ধের অনুমতি প্রাপ্তির বছর। অনুরূপভাবে 'সূরা বারাআত' নাযিল হওয়ার পর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনায় 'সনে বারাআত' এর প্রচলন দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নুবুওয়াতের শেষ বর্ষকে 'সানাতুল ভিদা' নামে অভিহিত করা হয়। এটা ছিল সেই বছর, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর 'বিদায় হজ্জ' তথা 'হাজ্জাতুল ভিদা' পালন করেন। এটা ঘটেছিল হিজরী দশম বছরে। কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা আরো বেশ কিছু সনের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন সানাতুল মাহীস, সানাতুয যিল্যাল্, সানাতুল ইস্তেনাস ইত্যাদি। বেরুনী 'আল-বাকিয়া' নামক গ্রন্থে এ জাতীয় সন সমূহের উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ওফাতের পর কিছুদিন পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত থাকে। কিন্তু হযরত উমর (রা) এর খিলাফত আমলে অধিক থেকে অধিকতর দেশ বিজিত হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় দফতর স্থাপিত হয় এবং ঐ সব দফতরের দীর্ঘদিনের প্যাঁচালো হিসাব-নিকাশ সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সংরক্ষণের জন্য সরকারীভাবে একটি মাত্র সন প্রচলনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করা হয় এবং হিজরী সনই সরকারী সন হিসাবে গৃহীত হয়। হিজরতের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ষোল বছর পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

প্রয়োজনের অনুভূতি ও পরামর্শ

একটি ইসলামী সন কার্যকর করার বিষয়টি যখন বিবেচনায় এল তখন হযরত উমর (রা) ও অন্যান্য সব সাহাবীর মনোযোগ কেন হিজরীর ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট হল। এটা হচ্ছে ইসলামী ইতিহাসের একটি প্রয়োজনীয় ও প্রণিধানযোগ্য বিষয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, আজ পর্যন্ত এ নিয়ে কেউ কোন চিন্তা গবেষণা করেন নি।

এ সম্পর্কে বেশ অনেকগুলো রিওয়ায়াত আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত রিওয়ায়াত হচ্ছে মায়মূন বিন মাহরানের। ঐতিহাসিক মাত্রই এ রিওয়াতটি উদ্ধৃত করেছেন, যার সারকথা হলো, একদা হযরত উমর (রা) এর সামনে একটি কাগজ পেশ করা হল, যাতে শা'বান মাস লেখা ছিল। হযরত উমর (রা) বললেন, এই শা'বান অর্থ কোন্ শাবান? এই বছরের না আগামী বছরের? এরপর তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের একত্রিত করে বললেন, এখন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারসমূহ অনেক বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয়ে গেছে। ফলে যা কিছু আমরা সংশ্লিষ্ট

কর্মকর্তাদের মধ্যে বণ্টন করি, তা একই সময়ে সম্পন্ন করা যায় না। অতএব হিসাব-নিকাশের জন্য এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন অত্যাবশ্যকীয়, যার মাধ্যমে আমরা কোন্ সময়ে কি পেলাম বা বণ্টন করলাম, তা যেন সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। আলোচনা প্রসঙ্গে লোকেরা বললো, এ বিষয়ে ইরানীদের সাথে পরামর্শ করে জেনে নেওয়া উচিত, তাদের ওখানে এর কি পদ্ধতি চালু ছিল বা আছে। অতএব হযরত উমর (রা) ইবানের অধিবাসী হরমুযানকে ডেকে পাঠান। সে বললো, আমাদের ওখানে হিসাবের একটি পদ্ধতি আছে, যাকে 'মাহেরূয' বলা হয়। এই মাহেরূযকেই আরবীতে 'মুয়াররাখাহ্' বলা হতে থাকে। যা হোক, এরপর প্রশ্ন উঠে, ইসলামী রাষ্ট্রের তারিখ নির্ধারণের জন্য যে সন গ্রহণ করা হবে, তার সূচনা হবে কখন থেকে? তখন সকলেই এক বাক্যে বলেন যে, তার সূচনা হবে হিজরতের বছর থেকে। অতএব শেষ পর্যন্ত হিজরী সন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২৮]

অপর রিওয়ায়াত

ইবনে জান, কুবরা বিন খালিদ থেকে অপর একটি রিওয়ায়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে অপর একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই যে, হযরত উমর (রা)-এর কাছে ইয়ামেন থেকে একজন কর্মচারী এসেছিল। সে কথা প্রসঙ্গে বললো, আপনারা কাগজপত্রে তারিখের উল্লেখ করেন না। যেমন, অমুক ঘটনা অমুক সনে বা অমুক সনের অমুক মাসের কোন্ দিনে ঘটেছিল? এতে বিষয়টির প্রতি হযরত উমর (রা) এবং অন্যান্যদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রথমে তাঁরা মনস্থ করলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নুবুওয়াত-প্রাপ্তির সময় থেকে সনের হিসাব শুরু করা হবে। এরপর মনস্থ করলেন, তাঁর ওফাতের সময় থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতি ক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হিজরত থেকেই সনের হিসাব শুরু করা হবে।

এই সব রিওয়ায়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইমাম শা'বীর রিওয়ায়াতের মধ্যে পাওয়া যাবে, যা তাবারী উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত রিওয়ায়াতের সার কথাহলো–

ان ابا موسى الاشعرى كتب الى عمر انه تاتينا منك كتب ليس لها تاريخ وقد كان عمر دون الدوابين و وضع الاخرجة واحتاج الى تاريخ ولم يحب التاريخات القديمه فجمع عليه عند ذالك واستشار الناس فاتفقوا على ان يكون المبدأ من الهجرة (رياض النضرة)

"আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হযরত উমর (রা)-কে লিখলেনঃ আপনার কাছ থেকে আমার নামে পত্রাদি আসে; কিন্তু তাতে কোন দিন-তারিখের উল্লেখ থাকে না। আর এটা হচ্ছে ঐ সময়ের কথা, যখন হযরত উমর (রা) বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতর প্রতিষ্ঠা করেছেন, খেরাজ আদায় করার আইন কানুনও নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং তা থেকে এ বিষয়টি অনুভূত হচ্ছে যে, সময়ের রেকর্ড রাখার জন্য একটি বিশেষ তারিখ নির্ধারণ অতীব প্রয়োজন। পুরাতন অনেক তারিখ প্রচলিত ছিল, কিন্তু কেউই তা পছন্দ করছিলেন না। আবূ মূসা (রা) এর ঐ চিঠি পাওয়ার পর বিষয়টির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাহাবীদের একত্রিত করে এ ব্যাপারে পরামর্শ করা হলে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, হিজরতের ঘটনার উপর ভিত্তি করেই ইসলামী সন তথা হিজরী সন প্রবর্তন করা হবে।"

হযরত আলী (রা) এর অভিমত

আবূ হিলাল আসকারী 'আল-আওয়ায়িল' গ্রন্থে এবং মাকরিযী তার ইতিহাস গ্রন্থে সায়ীদ ইব্ন্ মুসাইয়িব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হিজরতের ঘটনা থেকে ইসলামী সন প্রবর্তনের অভিমত হযরত আলী (রা) ই প্রদান করেছিলেন।

جمع عمر الناس فسالهم من اى يوم يكتب التاريخ ؟ فقال على بن ابى طالب من يوم هاجر رسول اللّه وترك مكة ففعله عمر ۰ (كتاب الا وائل قلمى ومقريزى طبع ثانى جلد ٢ - صفحه ٥٦)

"কোন্ দিন থেকে সন-তারিখের হিসাব শুরু করা হবে-এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলে হযরত আলী (রা) বলেন, ঐ দিন থেকে শুরু করা যেতে পারে, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরত করে মক্কা ত্যাগ করেছেন। হযরত উমর (রা) তাই করলেন।"

ইয়া'কূবীও এটাকে মোটামুটিভাবে হযরত আলী (রা)-এর অভিমত বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন-

وفيها ارخ عمر الكتب واراد ان يكتب التاريخ منذ مولد رسول اللّه ثم قال من المبعث فاشار عليه على بن ابى طالب ان يكتبه من الهجرة (جلد : ٢ صفحه ١٦٦)

"ঐ যুগে হযরত উমর (রা) তারিখ লিপিবদ্ধ করার একটি পন্থা নির্ধারণ সম্পর্কে চিন্তা করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জন্ম দিবস থেকেই তা শুরু করতে মনস্থ করেন। এরপর মনস্থ করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নুবুওয়াত লাভের ঘটনা থেকে শুরু করতে। কিন্তু হযরত আলী (রা) হিজরতের ঘটনা থেকে তা শুরু করার ব্যাপারে আপন অভিমত ব্যক্ত করেন। অতএব হিজরতের ঘটনা থেকেই ইসলামী সন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"

জাতীয় সনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

এই সব রিওয়ায়াত অধ্যয়ন করার পর কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে হবে। তার মধ্যে প্রথম বিষয়টি হলো, হযরত উমর ও সাহাবা কিরাম (রা) একটি নতুন সন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন কেন? ইমাম শা'বীর বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত উমর (রা) তারিখ নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু অন্যান্য জাতির সন-তারিখ গ্রহণ করাটা তাঁর কাছে অপছন্দনীয় ছিল। প্রথম রিওয়ায়াতে যে হরমুযানকে ডেকে পাঠানোর এবং তাঁর পরামর্শ গ্রহণের উল্লেখ আছে, তিনি ছিলেন খুযিস্তানের বাদশাহ্ এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় অবস্থান করছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর শূরার মজলিস সমূহের বিবরণীতে তাঁর কথা বার বার উল্লেখিত আছে।[২৯] বিরূনী লিখেছেন, যখন হযরত উমর (রা) হরমুযানের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন তখন তিনি শুধুমাত্র ইরানীদের পদ্ধতি সম্পর্কে নয়, বরং রোমানদের পদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করেন। ইরানীদের ওখানে সর্বশেষ প্রচলিত সন ছিল ইয়াযদ গিরদের সন। আর রোমানদের ওখানে যে সন প্রচলিত ছিল তাকে বলা হত 'সনে সিকান্দারী।' এই সনের সূচনা করা হয় বাদশা সিকান্দারের জন্মদিবস থেকে। এই দুটি সনের যে কোন একটি গ্রহণের ব্যাপারে কেউ কেউ চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাদের সাথে একমত হতে পারেন নি। এথেকে জানা যাচ্ছে যে, ইরানী ও রোমান সনও সাহাবীদের সম্মিলিত আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল এবং কেউ কেউ এটাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে নিজেদের অভিমত ব্যাক্ত করেছিলেন। তবে সাধারণ অভিমত এই ছিল যে, সম্পূর্ণরূপে একটি নতুন সনের প্রবর্তন করা হোক।

অপরিচিত সনের প্রতি অনীহা কেন?

এখানে এ বিষয়টি অবশ্যই লক্ষণীয় যে, সনের প্রয়োজনীয়তা এবং তা প্রয়োগের প্রধান স্থল ছিল হিসাব নিকাশের দফতর সমূহ। আর হযরত উমর (রা) সাহাবীদের সর্বসম্মতিক্রমে দফতরসমূহের জন্য ঐ সব ভাষা গ্রহণ

করেছিলেন, যা ইতিপূর্বে বিজিত দেশসমূহে প্রচলিত ছিল। যেমন ইরানের জন্য ফারসী, সিরিয়ার জন্য সুরয়ানী এবং মিসরের জন্য কিবৃতী ভাষা গ্রহণ করা হয়েছিল।[৩০] অতএব দফতর সমূহের জন্য যখন ইরান ও সিরিয়ার ভাষাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছিল তখন এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, ঐ সব সনই গ্রহণ করা হবে, যা ঐ সব ভাষার হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। কিন্তু হযরত উমর (রা) ও সাহাবা কিরাম তা করেন নি। তাঁরা ইরান, রোম ও মিসরের ভাষাসমূহ গ্রহণ করেন সত্য, তবে নিজেদেরই একটি সন চালু করতে চান। এবার চিন্তা করে দেখা উচিত এর মূলে কি কারণ নিহিত ছিল?

অন্তরের ঔদার্য ও প্রশস্ততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

এর মূলে এ কারণ নিশ্চয়ই থাকতে পারে না যে, সাহাবা কিরাম (রা) শুধুমাত্র জাতীয় বিদ্বেষ ও হীনমন্যতার কারণে অন্যান্য জাতির উত্তম ও উপকারী বিষয়সমূহ থেকেও পরাঙ্মুখ থাকতেন। প্রথমত: এ সম্পর্কে ইসলামের একটি পরিষ্কার নীতি রয়েছে। আর তা এই যে, এ ব্যাপারে মুসলমানদেরকে নিরুৎসাহ করার পরিবর্তে বরং উৎসাহই প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ঐ যুগের অসংখ্য ঘটনা এমন আছে, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ যুগের মুসলমানদের মন-মানসিকতায় এ ধরনের হিংসা-বিদ্বেষের কোন স্থান ছিল না। বরং তাঁরা বিশ্বের সমগ্র জ্ঞানগত ও সভ্যতাগত উপাদানরাজিকে– চাই তা যে কোন জাতির সাথে সম্পর্কিত থাক-নিজেদের জাতীয় উত্তরাধিকার বলেই মনে করতেন। ঐ যুগে খোদ হযরত উমর (রা) ও অন্যান্য জাতির অনেক সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানগত আদর্শ ও মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন এবং সেগুলোর মধ্য থেকে যে সমস্ত বিষয় তাঁর কাছে উপকারী বা অপরিহার্য মনে হয়েছে তা তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণও করেছেন। যখন কখনো এ ধরনের কোন বিষয় সামনে আসত তখন তিনি জরুরী ভিত্তিতে ইরানী, রোমান এবং মিসরীয়দেরকে ডেকে পাঠিয়ে সে সম্পর্কে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। সরকারী দফতরসমূহ বণ্টন, খেরাজ ও মাশুল নির্ধারণ, ভূমি জরীপ, কর ধার্যকরণ, হিসাব-নিকাশের নিয়মনীতি নির্ধারণ ইত্যাদি অনেক ব্যাপারেই মুসলমানরা ইরানী ও রোমানদের অনুকরণ করেছেন। ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে ফারায়িয তথা উত্তরাধিকার বণ্টনের আইনকানুন। যেহেতু এটা হিসাবের সাথে সম্পর্কিত, তাই হযরত উমর (রা), এর মূলনীতি যথাযথভাবে প্রণয়নের জন্য হিসাব-নিকাশে পারদর্শী একজন লোকের সাহায্য চেয়েছিলেন। ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুযায়ী এ উদ্দেশ্যে একজন রোমান খ্রীস্টানকে মদীনায় তলব করা হয়েছিল। সিরিয়ার মুসলিম শাসনকর্তার কাছে প্রেরিত ঐ তলবী ফরমানে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল তা হলো–

ابعث لنا برومى يقيم لنا حساب فرائضنا .

"আমাদের ফারায়েযের হিসাব ঠিক করে দেওয়ার জন্য একজন রোমানকে পাঠিয়ে দাও।"[৩১]

অতএব হযরত উমর (রা) যখন ফারায়েযের মত শরয়ী বিষয় ঠিক করে দেওয়ার জন্য একজন রোমান খ্রীস্টানের সাহায্য প্রার্থনা করতে দ্বিধা করেন নি, তখন তো ইরানী কিংবা রোমান সন গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। কেননা এ বিষয়টি তো শুধুমাত্র হিসাব-নিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট। নিশ্চয়ই এর পিছনে এমন কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল, যা তাঁকে ইরানী ও রোমানদের প্রচলিত সন গ্রহণ না করে একটি নতুন সন উদ্ভাবন করতে বাধ্য করেছিল।

সাহাবা কিরাম (রা)-এর মস্তিষ্কের ছাঁচ

আসল কথা এই যে, ইসলামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সাহাবা কিরাম (রা) এর মস্তিষ্ককে যে ছাঁচের মধ্যে ঢালাই করেছিল, সেটা ছিল এমন ছাঁচ, যার মধ্যে অন্যান্য পর্যায়ের কোন ধ্যান-ধারণা ঢুকতেই পারত না। ওটা শুধুমাত্র প্রথম পর্যায়ের ধ্যান-ধারণার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এটা খুবই সম্ভব যে, তখন পর্যন্ত বিশ্বে যথার্থ সাংস্কৃতিক ও তামাদ্দুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলন না হওয়ায় সে যুগের মানুষ কোন কথাকে জ্ঞানগত পদ্ধতিতে এবং প্রচলিত

শব্দালংকারে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারত না। এটাও সম্ভব যে,তারা কোন কোন সময় একটি কথার কার্যকারণ ঠিক সেই দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করত না, যে দৃষ্টিতে আজকাল বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে থাকে–তবু তাদের স্বভাবগত প্রতিভা ও মন-মানসিকতার ধারা এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে, যখন তারা যে ব্যাপারেই চিন্তা-ভাবনা করতেন–তার কার্যকারণ হৃদয়ঙ্গম করুন অথবা না করুন তাদের মস্তিষ্ক ঠিক সেদিকেই চালিত হত, যে দিকটি ছিল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সর্বাধিক নিকটবর্তী। এটাই হচ্ছে আম্বিয়া কিরামের তাযকিয়া তথা পবিত্র করণের ফলশ্রুতি। অর্থাৎ আম্বিয়া শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের মন্-মস্তিষ্ককে এমন একটি সুন্দর ছাঁচে ঢালাই করে নেন যে, যখন এর মধ্যে কোন রদ্দি জিনিস রাখা হয় তখন সে তা গ্রহণ করে না, বরং শুধুমাত্র সে জিনিসই গ্রহণ করে, যা ঐ সুন্দর ছাঁচের সাথে মানানসই।

টীকা ঃ

(১) আমার জানা মতে, বেশীর ভাগ সীরাত রচয়িতা সেই নির্দিষ্ট স্থানকেই ইয়াছরিব মনে করেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবস্থান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইয়াছরিবের মূল জনবসতি ছিল এখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে, বেশ কিছু দূরে এবং এখনো সেখানে তা বিদ্যমান।

(২) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-২৪০।

(৩) খুব সম্ভবত: ইং ৬১৭ সনে অর্থাৎ হিজরতের চার পাঁচ বছর পূর্বে বু'আছ' নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ স্থানটি ইয়াছরিব ভূ-খণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বে অর্থাৎ বনু নাযীর ও বনু কুরাইয়ার জনবসতির পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত।

(৪) পুরা নাম সুভায়দ বিন সামিত বিন আতিয়া বিন হাওত বিন হাবীব বিন আমর বিন আওফ বিন মালিক বিন আওস। তার মায়ের নাম ছিল লায়লা বিনত আমর। তারই বোন সালমা বিনতে আমর আন্নাজ্জারিয়া আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিমের মা ছিলেন (আল বিদায়া ওয়ান হিহায়া ঃ পৃষ্ঠা-১৪৭)।

(৫) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ঃ তৃতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-১৪৭।

(৬) এটা হচ্ছে রাহমাতুল লিল আলামীন এর লেখক (প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৯৪) মরহুম কাযী সুলায়মানের উক্তি। আর এটাই সঠিক বলে মনে হয়। 'সীরাতুন্নবী' গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা -২৪৩) এটাকে দশম নবভীর ঘটনা বলা হয়েছে। যদি এটাকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে প্রথমত: হিজরী তারিখের সাথে এর সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়ত: এটাও মেনে নিতে হবে যে, আরবরা উমরার জন্যও যখন মক্কায় আসত তখন মীনায় অবস্থান করত। অথবা প্রকৃত ঘটনা এই যে, উমরার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সমগ্র মাস জুড়ে অনবরত: আসতে থাকত এবং তখন কোথাও এমন কোন বড় সমাবেশ হত না, যার কারণে তাদের জন্য মক্কা মুকাররমা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থান করা অপরিহার্য হয়ে পড়ত। এটাও জানা কথা যে, হজ্জের জন্য মীনায় অবস্থানের একটি কারণ এও ছিল যে, ৯ই যিল্ হাজ্জাহ আরফায় যেতে হত, যা ছিল মিনা থেকে ন'মাইল সম্মুখে। এটা অপর কয়েকটি বর্ণনার সাথেও মিলে; কিন্তু আমার জ্ঞান মতে, এ ক্ষেত্রে মরহুম কাযী সুলায়মানের উক্তিই সঠিক। চন্দ্র বর্ষ ও সৌর বর্ষের তারিখের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন। কিন্তু আমি যা কিছু লিখেছি, নিজের জ্ঞানমত অনেক ভেবে-চিন্তে লিখেছি। এরপরও যদি কোন ভুল থেকে যায় তাহলে আমি সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

(৭) রাহমাতুল লিল আলামীন ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-১০০।

(৮) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-২৪৬।

(৯) রাহ্মাতুল লিল্ আলামীন ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-১০০।

(১০) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-২৪৬।

(১১) এটা ছিল গ্রীষ্মের মওসুম। আগস্ট মাসের শেষাংশের দুপুর বেলা। খুব সম্ভবত: রৌদ্র তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছিলেন।

(১২) অর্থাৎ আপনার স্ত্রী (হযরত আয়েশা) কিংবা তাঁর বোন এবং মাতা (যথাক্রমে হযরত আসমা ও হযরত উম্মে রূমান)।

(১৩) রাহ্‌মাতুল লিল্ আলামীন ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-১০৮।

(১৪) রাহ্‌মাতুল লিল আলামীন ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-১০৮।

(১৫) ঐ।

(১৬) রওয়ানা হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা মুকাররমার দিকে আক্ষেপের দৃষ্টিতে তাকান এবং বলেন, "হে মক্কা, তুমি আমার কাছে সকল জায়গা থেকেই অধিক প্রিয়, কিন্তু কি করবো, তোমার বাসিন্দারা তো এখানে আমাকে থাকতে দেয় না।"

(১৭) ঐ রাস্তাটি সমুদ্রের উপকূল ঘেঁষে রাবিগ অভিমুখে গিয়েছে। এই লেখকও একবার এই রাস্তা ধরে রাবিগ থেকে জেদ্দা এসেছিল। যাহ্‌বান হচ্ছে এই রাস্তারই একটি উপকূলীয় স্থান। ইং ১৯১৬ সনে বৃটিশ জাহাজ সমূহ মক্কার শরীফের জন্য এখানেই যুদ্ধাস্ত্র নামিয়ে দিয়েছিল। আর এভাবেই শরীফকে উছমানিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল।

(১৮) কোন কোন গ্রন্থে বাতনে রাইমে মাগরিবের সালাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ 'বাতনে রাইম' কে 'বাতনে রাইগ' লিখেছেন। আর মদীনা মুনাওওরা থেকে 'বাতনে রাইম' এর দূরত্ব হচ্ছে ত্রিশ মাইল। বেশ কয়েক বারই আমার এ ধারণা হয়েছে যে, মরহুম মাওলানা শিবলী 'রাইগ'কে 'রাবিগ' মনে করে নেন নি তো?

(১৯) ওয়াফাউল ওয়াফা ঃ দ্বিতীয় খণ্ডঃ পৃষ্ঠা-৩১৭।

(২০) যখন উটের উপর চড়ে সফর করা হত তখন চার পায়া আকারের দুটি বস্তু (যে গুলোর এক দিকের পায়া ছোট থাকে এবং এর একটিকে অন্যটির সাথে রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে উটের পালানের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এতে উটের দুদিকে দুজন মানুষের বসার এবং শোবার ব্যবস্থা হয়ে যায়। প্রচলিত ভাষায় এগুলোকে বলা হয় শাগ্‌দাফ। এ গুলোর ভেতরে গদী বিছিয়ে এবং তাকিয়া লাগিয়ে অত্যন্ত আরামে সফর করা যায়। দিনের সফরে বইপত্র বেশ অধ্যায়ন করা যায় এবং রাতের বেলা ভালভাবে নিদ্রা যাওয়া যায়। হ্যাঁ, যদি দুই আরোহীর কোন একজন নীচে অবতরণ করে তাহলে অপর আরোহীর জন্যও শাগদাফ পরিত্যাগ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই অপর আরোহীর সুবিধার্থে অবতরণকারী ব্যক্তি নিজের জায়গায় সাময়িক ভাবে কাউকে বসিয়ে রাখে।

(২১) সীরাতে ইবনে হিশামে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবু বকর (রা)কে বলেন এবং তিনি ঐ আমাননামা লিখে দেন।

(২২) মরহুম কাযী সাহেব ৮ রাবীউল আউয়ালের জন্য শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভীর 'সুরূরুল মাহযূন' শীর্ষক গ্রন্থের এবং সোমবারের জন্য সহীহ্ বুখারীর হিজরত অধ্যায়ের রেফারেন্স দিয়েছেন। আমার হিসাব অনুযায়ী ঈসায়ী তারিখ হচ্ছে ২০ সেপ্টেম্ববর, ৬২২ ইং (২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ ইং নয়)। মরহুম মাওলানা শিবলীর মতেও ২০ সেপ্টেম্বর সঠিক। মরহুম কাযী সাহেব তেরো নবভী সন এজন্য লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির তারিখ ছিল ৯ রাবীউল আউয়াল, আর ৮ তারিখ ছিল ত্রয়োদশ সনের শেষ দিন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যারা ১২ রাবীউল আউয়ালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কুবায় উপনীত হওয়ার পক্ষে, তারাও ঈসায়ী তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর, ৬২২ ইং বলে থাকেন।

(২৩) সীরাতুন্নবী প্রথম খণ্ডের ২৫৭ পৃষ্ঠার টীকায় মরহুম মাওলানা লিখেছেন, রোমান 'মাহে ঈলূল' এর ১০ তারিখের স্থলে আধুনিক হিসাব মতে ২০ তারিখ প্রমাণিত হয়। খারিয্‌মী বলেছেন, বৃহস্পতিবার ছিল। কিন্তু সঠিক হিসাব মতে তা সোমবার দিন বলে প্রমাণিত হয়।

(২৪) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ডঃ পৃষ্ঠা -২৫৫।

(২৫) সংকলকের বর্ণনা এখানেই শেষ। এরপর মাওলানার বর্ণনা শুরু হচ্ছে।

(২৬) মুহাররম, ১৩৪৬ ইং (মুতাবিক জুলাই, ১৯২৭ ইং)।

(২৭) এই আক্রমণ সরাসরি আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ দ্বারা নয়, বরং তার ইয়ামেনের শাসনকর্তা আবরাহা কর্তৃক সংঘটিত হয়েছিল।

(২৮) তারীখে কবীরঃ যাহ্বী ও তারিখে মিসর, মাকরীযী।

(২৯) বালাযূরী, তাবারী ইত্যাদি।

(৩০) মাসউদী ও বালাযুরী।

(৩১) ছীরাতে মুসতাকীম ঃ হাফিয ইবনে তাইমিয়া।

হিজরত এবং হিজরী সনের সূচনা-২

জাতীয় জীবনের মৌলিক ভিত্তি

ইসলামের প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালন সাহাবা কিরামের মন-মস্তিষ্কে আভিজাত্য ও প্রাণ ফুঁকে দিয়েছিল। জাতীয় জীবনের ভিত্তিসমূহ যে সব ইটের উপর রচিত হয়, তার প্রত্যেকটি ইটের স্বরূপ তাঁদের জানা ছিল। যদিও তাঁরা শব্দালংকারের মাধ্যমে তার প্রকাশ করতে পারেন নি। যখন হযরত উমর (রা) এর কাছে একটি সন তারিখের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল তখন যদিও বিশ্বের সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে বিভিন্ন সনের প্রচলন ছিল, কিন্তু তাঁর মনমানসিকতা সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয় নি। কেননা এরূপ করাটা, শুধুমাত্র জাতীয় আভিজাত্য ও স্বকীয়তার বিরোধী ছিল না, বরং তাতে জাতীয় জীবনের ভিত্তিমূলের ইটসমূহের একটি ইটও হারিয়ে ফেলার পুরাপুরি সম্ভাবনা ছিল।

যে সব বস্তু জাতীয় জীবনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তার মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হচ্ছে সন ও তারিখ। যে জাতির নিজস্ব কোন সন নেই, তাদের জাতীয় ভিত্তির একটি ইটের জায়গা যেন শূন্য রয়ে গেছে। কোন জাতির সন তাদের জন্ম ও আবির্ভাবের তারিখ নির্দেশ করে। এটা অক্ষুণ্ন রাখে তাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে। এটা ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠা করে তাদের সৌভাগ্য কাঠামোকে। প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের ক্রমোন্নতি ও উৎকর্ষের একটি স্থায়ী স্মারক হিসাবে বিবেচিত হয় যুগের পর যুগ এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। একটি জাতির অন্য সব কীর্তি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে; কিন্তু এটা কখনো বিলুপ্ত হতে পারে না। কেননা সূর্যের উদয়াস্ত এবং চন্দ্রের চিরায়ত আবর্তন-বিবর্তনের সাথে এর আঁচল বাঁধা হয়ে যায় এবং বিশ্বের আয়ু বর্ধিত হওয়ার সাথে সাথে এর আয়ুও বর্ধিত হতে থাকে। আজ অগাষ্টাস, বিক্রমাদিত্য, জালালুদ্দীন মালিক শাহ্ এবং বাদশাহ্ আকবরের নাম তাদের প্রবর্তিত সন সমূহের মাধ্যমে প্রতিদিন আমাদের সামনে এসে হাযির হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা তাদের কথা কখনো ভুলে বসতে পারি না।

নিজস্ব সনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই ছিল

এটা কোন মতেই সম্ভব ছিল না যে, জাতীয় জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হযরত উমর ও সাহাবা কিরাম (রা) এর সামনে আসবে এবং তাঁরা সে সম্পর্কে একটি ভুল সিদ্ধান্ত দেবেন। যদি এমনটি হত তাহলে ইসলাম -প্রদত্ত মানসিকতার প্রশিক্ষণই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হত। এটা কোন অপরিহার্য বিষয় ছিল না যে, তাঁরা তাঁদের এই অনুভূতির কোন বিচার-বিশ্লেষণ করবেন বা কার্যকারণের দিকটি বিবেচনা করবেন। কেননা কোন জিনিসের পরিণাম বা ফলাফল, বিশ্লেষণ বা কার্যকারণ নির্ধারণের সাথে নয়, বরং সঠিক কর্মপন্থার সাথেই সম্পৃক্ত থাকে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, সাহাবীরা অন্যান্য জাতির বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানগত জিনিস সমূহ গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাদের সন-তারিখ গ্রহণ করার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন নি। তাঁদের মনের মধ্যে আপনা আপনি ঐ ধারনার সৃষ্টি হয় যে, আমাদের জাতীয় সন অন্য সবার চাইতে পৃথক হওয়া চাই এবং এমনটি হওয়া চাই যে, আমাদের নিজস্ব ইতিহাসের কোন না কোন ঘটনার উপর এর ভিত্তি স্থাপিত। তাঁরা তাঁদের সরকারী অফিসসমূহ

পরিচালনার জন্য ইরানী ও রোমান ভাষা ব্যবহার করেন, তাদের হিসাব-নিকাশের নিয়মনীতি গ্রহণ করেন, ইরানী ও রোমানদের ওখানে প্রচলিত ও সংরক্ষিত হিসাব-নিকাশকেও বৈধ বলে স্বীকার করে নেন, কিন্তু তাদের কাছে প্রচলিত ও বহুলভাবে ব্যবহৃত তাদের সন ও তারিখ গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। এটা ছিল জাতীয় জীবনের ভিত্তিমূলেরই ইট। তাই এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়াটা অপরিহার্য ছিল। প্রয়োজন ছিল নিজেদের হাতেই এর ভিত্তি স্থাপনের। বাস্তবেও তাঁরা তাই করেছিলেন। আর ইসলাম তাঁদের মধ্যে যে মন-মানসিকতার সৃষ্টি করেছিল তার চাহিদাও যে ছিল তাই।

পরবর্তী যুগের জ্ঞানীদের কার্যকারণ নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ

আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ইতিহাসের যে চেহারা ছিল, পরবর্তী যুগের মুসলমানদের ক্ষেত্র বিশেষে অনধিকার চর্চা ও অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে, সে তার আসল রূপ হারিয়ে বসে। প্রত্যেক যুগের ইতিহাস রচয়িতা প্রকৃতপক্ষে ঐ যুগের মন-মানসিকতা সুলভ আবহাওয়া তথা পরিবেশ-প্রসূত বিষয়ের অনুসরণ করে থাকেন। তাই তারা পূর্ববর্তীদের ঘটনারাজির ছবি আঁকতে গিয়ে সেই ভাব-ভঙ্গিই গ্রহণ করেন, যা তাদের যুগের আবহাওয়া ও পরিবেশের অনুকূল। ইসলামের সত্যিকার সমষ্টিগত জীবনের আসল যুগ সাহাবা কিরাম (রা) এর সময়কালেই শেষ হয়ে গেছে। এরপর যতই সময় অতিবাহিত হয়েছে ঐ যুগের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যাদিও ক্রমাগত বিলীন হয়ে গেছে। পরবর্তী সময়ে যখন লেখক ও পর্যবেক্ষকদের যুগ এল তখন প্রথম যুগের চিন্তাগত পরিবেশের স্থলে একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত অপর একটি পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে এ যুগের লেখকরা প্রথম যুগের অবস্থাদি লিপিবদ্ধ করার জন্য যখন কলম হাতে তুলে নিলেন তখন তারা ঐ যুগের পরিবেশ ও মিযাজ-মরযী অনুযায়ী প্রতিপাদ্য বিষয়টি আগাগোড়া অধ্যয়ন করার পরিবর্তে নিজেদের যুগসৃষ্ট রং ও রূপ অনুযায়ী প্রত্যেকটি কথাকে রূপায়িত করে তুললেন। এতে শুধু সামগ্রিক ইতিহাসের উপর নয়, বরং জীবনের প্রতিটি প্রান্ত পর্যন্ত তাদের এই ক্রিয়াকলাপের প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়ল। এমনকি 'ফিক্‌হ্ ও আহ্‌কাম' অধ্যায়টি পর্যন্ত এই প্রভাব থেকে রক্ষা পেল না। সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে যে যুগে গ্রন্থনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যদি সে যুগ পর্যন্ত প্রত্যেকটি যুগে গ্রন্থ রচিত হত এবং তা ধারাবাহিক ভাবে বিদ্যমানও থাকত এবং যুগসমূহের ক্রমানুসারে সেগুলোর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নেওয়া সম্ভব হত তাহলে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হত যে, প্রথম যুগের ঘটনাবলী ও ক্রিয়াকলাপ পরবর্তী প্রত্যেকটি যুগে নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে এসেছে এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সেই সাথে শব্দাবলীর খুটিনাটি প্রয়োগ পদ্ধতিতেও প্রত্যেকটি যুগের অর্থগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। যেমন, গত তেরটি শতাব্দীর যদি তেরটি ধারাবাহিক ইতিহাস বিদ্যমান থাকত তাহলে যে কোন লোক চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারত যে, প্রথম যুগের একই ঘটনা আপন শাখা-প্রশাখায় ও আকৃতি-প্রকৃতিতে কিভাবে তেরটি বিভিন্ন ধরনের পোষাক নিজের জন্য মানানসই করে নিয়েছে।

একটি উদাহরণ

উদাহরণ স্বরূপ এই ঘটনাটির উপর দৃকপাত করা যায়। ইমাম শা' বীর পরিষ্কার উক্তি হলো–

ولم يحب التاريخات القديمة

অর্থাৎ "হযরত উমর (রা) একটি ইতিহাস সুনির্দিষ্ট করণের প্রয়োজন বোধ করছিলেন, কিন্তু তিনি প্রাচীন ইতিহাসসমূহ গ্রহণ করাটা পছন্দ করছিলেন না।" এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, তিনি অপর কোন জাতির ইতিহাস গ্রহণ করাটা পছন্দ করতেন না এবং এ বিষয়টি তাঁর দৃষ্টিতে এমনি ছিল যে, মুসলমানদের জন্য যেন অবশ্যই একটি জাতীয় ইতিহাস রচনা করা হয়। কিন্তু পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিকরা আপন মন-মানসিকতা ও স্বভাব-প্রকৃতির আকর্ষণ অনুযায়ী এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু করেন। এ ক্ষেত্রে তারা ঘটনারাজির মূল কারণের প্রতি দৃকপাত

না করে সেগুলোর গায়ে নতুন নতুন অর্থ সম্পৃক্ত করে দেন। আমি এখানে শুধুমাত্র দু'টি যুগের দু'টি বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করবো।

নাসিউ ও কাবীসাহ্

হিজরী নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে আল্লামা মাক্‌রীযী আপন অতুলনীয় ইতিহাস গ্রন্থ 'তারীখে মিসর' রচনা করেন। তাতে তিনি লিখেছেন,

"হযরত উমর ও সাহাবা কিরাম (রা) ইরানী ও রোমান সন-তারিখ পসন্দ করেন নি। কেননা এ দুটি হিসাবের মধ্যেই 'কাবীসাহ্' ছিল [অর্থাৎ পৃথিবী প্রদক্ষিণের ভাংতি (সময়ের ভগ্নাংশ) পূরণের জন্য কয়েক বছর পর পর মাসসমূহের দিনের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি করা – যেমন গ্রেগরী ক্যালেন্ডারের মধ্যে প্রতি চতুর্থ বৎসরে একদিন করা হয়ে থাকে]। যেহেতু ইসলাম নাসিউ থেকে বিরত রেখেছিল [যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "এই যে নাসিউ (মাসকে পিছিয়ে দেওয়া) কেবল কুফরী বৃদ্ধি করা, যা দ্বারা কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা এটাকে কোন বছর বৈধ করে এবং কোন বছর অবৈধ করে, যাতে তারা আল্লাহ্ যেগুলোকে নিষেধ করেছেন, সেগুলোর গণনা পূর্ণ করতে পারে, অনন্তর আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হালাল করতে পারে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে; আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না (৯:৩৭)]" এবং কাবীসাহ্ এর উপর নাসিউ'-এর সন্দেহ হতে পারত, তাই এই পদ্ধতি গ্রহণ করাটা সমীচীন ছিল না।

উল্লেখিত ঐতিহাসিক, বাস্তব ঘটনা থেকে অনেক দূরবর্তী এই বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়েছিলেন শুধু এ কারণে যে, জাতীয় ক্যালেন্ডারের গুরুত্বের দিকটি বিবেচনা করার জন্য তার চিন্তাকাশে একটুখানি শূন্যতাও অবশিষ্ট ছিল না। আর যেহেতু এর অন্য কোন সঙ্গত কার্যকারণ তার বুদ্ধির গোচরে আসে নি, তাই বাধ্য হয়ে তিনি 'নাসিউ' এর শরয়ী নিষিদ্ধতার চারণভূমিতে গিয়ে পৌঁছেছেন। অথচ কোন দিক দিয়েই তার এই কারণ নির্ধারণ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত: এটা ঐ সব রিওয়ায়াতের বিরোধী, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কেননা এর মধ্যে যাবতীয় প্রাচীন ক্যালেন্ডারের অপসন্দনীয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তবে কোন বিশেষ ক্যালেন্ডারের অপসন্দনীয় হওয়ার কথা বলা হয় নি। দ্বিতীয়ত: নাসিউ হচ্ছে জাহিলিয়া যুগের প্রচলিত একটি বিশেষ শব্দ এবং কাবীসাহ হচ্ছে হিসাব সম্পর্কে প্রচলিত একটি শব্দ। অতএব দেখা যাচ্ছে, এ দুটি শব্দ হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি বস্তু। যে নাসিউ থেকে ইসলাম বিরত রেখেছে এবং কুরআন যেটাকে 'কুফ্‌রী বৃদ্ধি করা' আখ্যা দিয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে চান্দ্র মাসসমূহের প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাসকে এমনভাবে ওলট পালট করে দেওয়ার নামান্তর. যার কারণে শা'বান কখনো মুহাররমে পরিণত হত, আর কখনো রমযান আখ্যায়িত হত যুল হাজ্জাহ নামে। এর ফলশ্রুতি এই ছিল যে, আমল ও ইবাদতসমূহের নির্দিষ্ট করণের (নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার) কোন গুরুত্ব ও যথার্থতা বাকি থাকত না। কিন্তু 'কাবীসাহ' হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বস্তু। এর লক্ষ্য ভিন্ন এবং এর শাখা প্রশাখার ফলশ্রুতিও ভিন্ন। বছর বা মাসের উপর 'নাসিউ' এর মত এর কোন প্রভাব পড়ে না। তা শুধু এ কারণে যে, এক বছরের পরিমাণ তিন শ ষাট দিন নির্ধারণ করার পর সময়ের যে ভগ্নাংশ বাকি থাকে, সেটাকে কিছু দিন পর পর পূরণ করে দেওয়া; যাতে করে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কয়েক মাস বা কয়েক বছরের পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। অতএব কোনভাবেই একথা স্বীকার করা যেতে পারে না যে, হযরত উমর এবং অন্যান্য প্রবীণ ও বিজ্ঞ সাহাবা কিরাম (রা) 'নাসিউ' এর হাকীকত বা সারবত্তা সম্পর্কে এই পরিমাণ অজ্ঞ ছিলেন যে, ক্যালেন্ডারের কাবীসাহ্‌কেও তারা নাসিউ মনে করতেন কিংবা 'কাবীসাহ'- এর নাসিউ হওয়ার উপর তাদের সন্দেহ-সংশয় ছিল।

হাফিয সাইয়ূতীর দর্শন

এটা ছিল নবম শতাব্দীর সূচনা কাল। কিন্তু এক'শ বছর অর্থাৎ দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে এই ঘটনাই অপর একটি নতুন রূপ ধারণ করে। হাফিয জালালুদ্দীন সাইয়ূতীকে 'তাকভীম' (ক্যালেন্ডার) ও 'সিনীন' (সনসমূহ)

সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হলে তিনি এর উত্তরে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তাতে তিনি লিখেন, হযরত উমর এবং সাহাবা কিরাম (রা) রোমান ও ইরানী সন-তারিখ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন এজন্য যে, এগুলো ছিল খ্রীষ্টান ও অগ্নিউপাসকদের সন। আর ইসলাম মুসলমানদেরকে এ থেকে বিরত রেখেছিল, যাতে তারা কাফিরদের তরীকা-পদ্ধতি গ্রহণ করে ওটাকে আরো প্রচলিত ও গ্রহণীয় করে না তুলে। এবার চিন্তা করে দেখুন, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়াচ্ছে। কোথায় কাফিরদের আচার আচরণ ও তরীকা পদ্ধতি থেকে বিরত থাকার ব্যাপার, আর কোথায় সেই ব্যাপার, যা হিসাব নিকাশের একটি জ্ঞানগত সূত্র বা মূলনীতি ছাড়া কিছু নয়। হাফিয সাইয়ূতী উল্লেখিত কার্যকারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ফারূকী যুগের অর্ধেক ইতিহাস বেমালুম ভুলে বসেছেন। যদি এ ধরনের ব্যাপারে অন্যান্য জাতি থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া অবৈধ হত তাহলে কেনই বা হযরত উমর (রা) অসংখ্য ব্যাপারে ইরান ও রোমের প্রাচীন ব্যবস্থাপনা এবং তামাদ্দুনিক পন্থা-পদ্ধতি থেকে উপকৃত হওয়াটা বৈধ মনে করতেন? এ কথা ঠিক যে, সাহাবা কিরাম (রা) অন্যান্য জাতির অনেক কথাবার্তা ও আচার আচরণ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন এবং একথাও ঠিক যে, খোদ আঁ হযরত (সা) ও অন্যান্য জাতির অনেক আচার-আচরণ থেকে মুসলমানদেরকে বিরত থাকতে বলেছেন এবং তাদের অনুকরণ না করার উপর গুরত্ব আরোপ করেছেন; কিন্তু সেগুলোর ক্ষেত্র অন্য এবং প্রয়োগ স্থলও ভিন্ন। প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাথে সেগুলোর কোনই সম্পর্ক নেই।

হিজরতের ঘটনার বিশেষত্ব

মোটকথা, এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য সর্বপ্রধান বিষয়টি এই ছিল যে, একটি জাতীয় সন প্রবর্তন এবং তার গুরুত্বের দিকটি সাহাবা কিরাম গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। অর্থাৎ দূর-দূরান্তের কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় না নিয়েই একথা অনায়াসে বুঝা যায় যে, এ বিষয়টি হযরত উমর ও প্রবীণ সাহাবা কিরাম (রা)- এর সক্রিয় বিবেচনাধীন ছিল। তারা একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, জাতীয় জীবনের ক্যালেন্ডারের জন্য একটি জাতীয় সনের প্রয়োজন রয়েছে। আর তা বাইরে থেকে গ্রহণ করা যাবে না, বরং ভিতর থেকে তৈরি করে নিতে হবে।

এরপর দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল হিজরতের বিশেষত্ব। এ ক্ষেত্রেও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আর তা হলো, সনের সূচনা করার জন্য যত জিনিসই সামনে আসতে পারত তার কোনটির প্রতিই সাহাবা কিরাম (রা) এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, তা ছিল হিজরতে নববীর ঘটনা, যা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের নি:স্বতা ও দুর্বলতার দিকটিই স্মরণ করিয়ে দিত। জাতীয় সনের সূচনা করার জন্য তাঁরা এ ঘটনাকেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কেন?

মুসলমানদের জাতীয় সন প্রবর্তনের জন্য প্রকৃতিগতভাবে যে সব জিনিস সামনে এসেছিল, তা ছিল ইসলামের অভ্যুদয়, ইসলামের প্রতি আহ্বানকারীর (রাসূলের) জন্মদিবস, ওহী নাযিলের সূচনা, বদরযুদ্ধের এতিহাসিক বিজয়, বিজয়ীবেশে মুসলমানদের মক্কা প্রবেশ এবং বিদায় হজ্জের জনসমাবেশ ও মূল্যবান ভাষণ, যা ছিল ইসলামের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতা ও বিজয়ের শেষ ঘোষণা। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা গুলোর মধ্য থেকে কোন ঘটনাকেই গ্রহণ করা হয় নি। বরং হিজরতে- মদীনার ঘটনার দিকেই হযরত উমর (রা) ও সাহাবা কিরামের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল, যা না ছিল কোন জন্মোৎসব, না কারো প্রভাব-প্রতিপত্তির বহিঃপ্রকাশ, না কোন যুদ্ধ জয়, আর না কোন পরাক্রম ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আনন্দোৎসব। বরং তা প্রকৃতপক্ষে ঐ যুগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন ইসলামের একেবারে প্রারম্ভিক অবস্থায় মুসলমানদের নিঃস্বতা ও বিফলতা এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, 'দায়ীয়ে ইসলাম' [মুহাম্মদ (সা)] এর জন্য আপন জন্মভূমিতে টিকে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর অসহায়ত্ব এবং তাঁর প্রতি জুলুম নির্যাতন এমনি চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল যে, তিনি আপন জন্মভূমি, আপন ঘর, আপন আত্মীয়স্বজন তথা আপন বলতে তাঁর যা কিছু ছিল সব কিছু পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র একজন সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল বন্ধুর সাথে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন।

এখানে একথাটিও লক্ষ্যণীয় যে, এ ধরনের ব্যাপারে অন্যান্য জাতির নমুনাও স্বাভাবিকভাবে সামনে এসে পড়ে। হযরত উমর ও সাহাবা কিরাম (রা) এর সামনেও এই সব নমুনা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাঁরা সেগুলো অনুকরণ করতে উদ্যত হন নি। বরং এ ক্ষেত্রে অপর একটি পৃথক পথ অবলম্বন করেছিলেন।

বিশ্বের জাতীয় সনসমূহ

জাতীয় সন প্রকৃতপক্ষে একটি জাতির জন্ম, উৎকর্ষ ও সৌভাগ্য অর্জনের তারিখ। এর মাধ্যমে জাতিসমূহ নিজেদের ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ঘটনাটি স্মরণীয় করে রাখতে চায়। প্রত্যেক বার মাস পর এই সনের আবর্তনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং নতুনভাবে তা আবার শুরু হয়। এভাবে নতুন বছরে হর্ষোৎফুল্লতার সাথে এর ঐতিহাসিক এতিহ্যের আনন্দরাশিও নতুনভাবে সবুজ সতেজ হয়ে উঠে। একারণেই বিশ্বে যত সনের প্রচলন হয়েছে, সব গুলোর ভিত্তি এমন কোন ঘটনার উপর রচিত হয়েছে যার মাধ্যমে কোন জাতীয় বিজয় ও সৌভাগ্য লাভের সূচনা হয়েছিল। যেহেতু এই সূচনা হয়েছিল সাধারণত: কোন মহান বাদশাহ্‌র সিংহাসনে আরোহণ থেকে কিংবা কোন বড় যুদ্ধে বিজয়লাভ থেকে কিংবা কোন নতুন দেশ পদানত করা থেকে - তাই বিশ্বের অধিকাংশ সনের সূচনা বিখ্যাত ও মহান ব্যক্তিদের জন্মদিবস ও সিংহাসনে আরোহণ থেকেই হয়েছে। বিরূনী 'আছারুল বাকিয়াহ' শীর্ষক একটি গ্রন্থ শুধুমাত্র 'সন-তারিখ' - এর উপর লিখেছেন। গ্রন্থটি এমন উঁচু পর্যায়ের যে, আজ পর্যন্ত এ বিষয়ের উপর এর চাইতে উৎকৃষ্ট কোন গ্রন্থ কেউ লিখতে পারেন নি। তিনি বিশ্বের সমগ্র সনের মোটামুটি বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "এ সম্পর্কে জাতিসমূহের মধ্যে যে নিয়ম প্রচলিত হয়ে আসছে, তা হলো রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, ধর্মের অভ্যুদয়, রাজা-বাদশাহদের সিংহাসনে আরোহণ, নবীদের আবির্ভাব, দেশসমূহ বিজয় ও পদানত করণ, সাম্রাজ্যের পরিবর্তন ও হস্তান্তরিত হওয়া এবং পৃথিবীতে সংঘঠিত বিরাট কোন ঘটনা থেকেই সনসমূহের সূচনা করা হত"।

প্রাচীন সনসমূহের মধ্যে বাবিলী,য়াহূদী, রোমান, খ্রীষ্ট্রীয়, ভারতীয় এবং ইরানী সনসমূহ সর্বাধিক বিখ্যাত ও বহুলভাবে প্রচলিত। এই সব সনের সূচনা নিশ্চয়ই উল্লেখিত ধরনেরই কোন ঘটনা থেকে। বাবিলী সনের ভিত্তি রচিত হয়েছিল বুখতে নসর (প্রথম) এর জন্মদিনের উপর। কেননা তার আর্বিভাবের ফলে বাবিলের উন্নতি ও উৎকর্ষের সূচনা হয়েছিল। য়াহূদীরা প্রথমে মিসর থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার দুঃখজনক ঘটনার উপর থেকেই তাদের জাতীয় স্বাধীনতার যুগ শুরু হয়েছিল। এ জন্য এর স্মরণে তারা তাদের সন তারিখের সূচনা করেছিল। রোমানদের সবচেয়ে বিখ্যাত সন হচ্ছে ইস্কান্দরীয় (আলেকজান্দ্রীয়) সন। এই সনের সূচনা হয়েছে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের জন্ম থেকে। এরপর অগাস্টাসের জন্ম থেকে নতুন সনের সূচনা করা হয়। কেননা তার সফল বিজয়-অভিযান রোমান জাতির বীরত্ব ও পরাক্রমকে অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিল। খ্রীষ্ট্রীয় সনের নামই হচ্ছে মীলাদী সন (জন্মের উপর ভিত্তি করে রচিত সন)। কেননা হযরত ঈসা (আ) এর জন্মগ্রহণের ঘটনার উপর ভিত্তি করে এই সনের সূত্রপাত করা হয়।

ভারতে, যেখানে প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর পৃথক পৃথক ভাষা ও পৃথক পৃথক পেশা রয়েছে সেখানে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন সনও প্রচলিত রয়েছে। জ্যোতিষীরা নিজেদের হিসাবের জন্য একটি বিশেষ জোতিষী সনের প্রচলন করেছিল। সাধারণ লোকেরাও তাদের দৈনন্দিন ঘটনাবলী স্মরণ রাখার জন্য পৃথক পৃথক সনের প্রচলন করেছিল। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনায়কের সন তাদের নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু উল্লেখিত যাবতীয় সনের ভিত্তি উপরোক্ত কোন না কোন ধরনের ঘটনার উপর ছিল ভিত্তিশীল। শেষপর্যন্ত ভারতে যে সনটি সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করেছিল এবং আজ পর্যন্ত যা বহুলভাবে ব্যবহৃত, তা হচ্ছে বিক্রমী সন। এই সনের সূচনা হয়েছে রাজা বিক্রমাদিত্যের জন্মদিন থেকে। ইরানীদের মধ্যেও যে সব সন প্রচলিত হয়েছে তার সবগুলোর সূচনা হয়েছে কারো জন্ম, কারো সিংহাসনে আরোহণ, অথবা এক বংশের কাছ থেকে অপর বংশের কাছে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। একজন বাদশাহ্ কর্তৃক ইতিপূর্বে প্রচলিত সনকে রহিত করে নিজের সিংহাসন আরোহণের

ঘটনার উপর ভিত্তি করে নতুন সনের প্রচলন করার (যাকে 'সনে জুলুস'বা সিংহাসনে আরোহণের সন বলা হত) প্রচলন সর্বপ্রথম ইরানীরাই করে। মুসলমান এবং ইরানীদের মধ্যে যখন যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন ইরানে 'ইয়ায্দ্গিরদ (ইরানের শেষ অমুসলিম শাহানশাহ) সনে জুলুস' প্রচলিত ছিল।

হযরত উমর (রা) এর সিদ্ধান্তহীনতা

উল্লেখিত রিওয়ায়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথমে হযরত উমর (রা)-এরও এই ধারণা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জন্ম কিংবা বি'ছাত (নুবুওয়াত প্রাপ্তি) এর সময় থেকে সনের সূচনা করা হবে। সায়ীদ বিন মুসাইয়্যিব এবং ইয়াকূবীর রিওয়ায়াতে আছে, যখন হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা) এর সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন তখন তিনি হিজরতের ঘটনা থেকেই সনের সূচনা করার পরামর্শ দেন। এ পরামর্শটি হযরত উমর (রা) এর মনঃপুত হয় এবং সাহাবা কিরাম (রা) ও এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত হন। ইবনে মাহরানের বর্ণনায় আছে, সন-তারিখের সূচনার ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে যথারীতি সলাপরামর্শ হয়েছিল। এ ব্যাপারে বিভিন্ন জন বিভিন্ন অভিমতও ব্যক্ত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সকলেই একমত হন যে, হিজরতের ঘটনা থেকেই এর সূচনা করা হবে।

এই সব বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এ বিষয়ে সাহাবীগণ খুব ধীরে সুস্থেই চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। যেহেতু প্রথমে এ বিষয়টি সামনে এসেছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জন্মদিবস অথবা নুবুওয়াত লাভ থেকেই সন-তারিখের সূচনা করা হবে এই প্রেক্ষাপটে যে, এ দু'টি দিনই হচ্ছে- ইসলামের অভ্যুদয়ের মূল ভিত্তি- তাই হযরত উমর (রা) এর চিন্তা প্রথমে সেদিকেই গিয়েছিল। কিন্তু এও বুঝা যায় যে, এর মধ্যে এমন কোন খট্কা ছিল যে, তাঁর মন পুরাপুরিভাবে তাতে সায় দিচ্ছিল না। অন্যকথায় তিনি এ ব্যাপারে যেন কিছুটা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। কথা তো ছিল যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তাতে তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে আরো শলা-পরামর্শ করা হলো। তখন হযরত আলী (রা) অভিমত প্রকাশ করলেন যে, হিজরতের ঘটনা থেকেই এই সনের সূচনা করা উচিত। এই অভিমত এতই মনোমত ছিল যে, হযরত উমর (রা) তা গ্রহণ করে অন্তরে পুরাপুরি স্বস্তি লাভ করেন। সেই সাথে প্রবীণ সাহাবা কিরামও তাতে একমত হন। যেন এটি ছিল এমন একটি ভুলে যাওয়া কথা, যা সকলের অন্তরে এক সাথে জেগে উঠেছিল। এবার একথা জানা চাই যে, হিজরতের ঘটনার মধ্যে এমন কি যৌক্তিকতা ও সামঞ্জস্যতা ছিল যে, 'ইলমে নুবুওয়াতের শহরের দরজা' এবং হিকমাত, সুন্নাত ও রিসালাতের রহস্যভেদী হযরত আলী (রা)-এর দৃষ্টি এ বিষয়টির প্রতি নিবদ্ধ হল? আর কি ছিল সেই জ্ঞাত-বিখ্যাত বিশেষত্ব, যার কারণে এত দূরত্বের একটি কথা সমগ্র সাহাবা কিরাম (রা) এর অন্তরে গেড়ে বসল এবং তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে এমনভাবে প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন, যেমনভাবে পূর্ব পরিকল্পিত ও বহুলভাবে আলোচিত কোন প্রস্তাব একবাক্যে সমর্থন করা হয়ে থাকে।

হিজরত ও হিজরী সনের সূচনা–৩

সাহাবীদের স্থান

হ্যাঁ, আজ আমরা যারা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের মন-মানসিকতা ও আত্মসচেতনতা হারিয়ে ফেলেছি, তাদের কাছে এ কথাটি যতই বিস্ময়কর ঠেকুক না কেন, সাহাবা কিরাম (রা) এর জন্য, যারা ইসলামের জন্য ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং ইসলামী মন-মস্তিষ্কের সার্থক অধিকারী, তাদের কাছে এ কথাটি এতই পরিষ্কার, এতই খোলামেলা এবং এতই বোধগম্য ছিল যে, এ বিষয়টির দিকে শুধুমাত্র একটি ইঙ্গিত তাঁদের জন্য ছিল যথেষ্ট। 'দায়ীয়ে ইসলাম'-এর প্রতিপালন, প্রশিক্ষণ ও পবিত্রকরণ এবং কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা তাঁদের মধ্যে এমন একটি মন-মানসিকতার সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে, কোন কথা–চাই তা যতই গ্রহণীয়, প্রচলিত ও অগ্রগণ্য হোক না কেন– যদি তা মূল বিষয় এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির আনুকূল্য থেকে সামান্যমাত্র তফাতে থাকত তাহলেও সংগে সংগে তাঁদের মনে সে সম্পর্কে খট্‌কার সৃষ্টি হয়ে যেত। আর কেবলমাত্র তখনই তাদের সে খট্‌কা দূর হত যখন আসল ও পরিপূর্ণ জিনিসটি সামনে এসে হাজির হত। আজ আমরা তাঁদের জ্ঞান ও বিজ্ঞতার গভীরতার দিকটি বিস্মৃত হয়ে গেছি। অথচ আসল ব্যাপার এই যে, শুধু তাঁদের অন্তরই পুণ্যকামী ছিল না। বরং তাঁদের বিজ্ঞতা এবং হিকমতও ছিল গভীর থেকে গভীরতর। যেমন খোদ তাঁদের মধ্য থেকে জনৈক সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি বলেছিলেন–

اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة وابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفًا واختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة دينه (عن عبد الله مسعود - رواه الدارمى)

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবারা তাঁর উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের অন্তর ছিল সর্বাধিক পবিত্র, তাঁদের জ্ঞান ছিল সর্বাধিক গভীর এবং সর্বপ্রকার প্রদর্শনীমূলক কাজে তাঁরা থাকতেন সকলের পিছনে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে আপন পবিত্র নবীর সংসর্গের জন্য এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচিত করেছিলেন।"

হিজরতের ঘটনার গুরুত্ব

জাতীয় সন নির্ধারণের বিষয়টি আলোচনার সময় বিভিন্ন জাতির পন্থা-পদ্ধতি সাহাবা কিরাম (রা) এর সামনে আসে। আর স্বয়ং তাঁদের কাছেও একথাটি পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, 'দায়ীয়ে ইসলাম' এর জন্ম কিংবা বি'ছাত (নুবুওয়াত লাভ)-কে নিজেদের জাতীয় সনের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু একথাটি দৃষ্টির ঐ মাপকাঠি থেকে কিছুটা তফাতে ছিল, যে মাপকাঠি, এ ধরনের ব্যাপারে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাই বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে পুরাপুরি আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না। তাঁদের কাছে যেন অনুভূত হচ্ছিলো, এ ক্ষেত্রে এর চাইতেও অপর কোন ভাল জিনিস থাকতে পারে। কিন্তু সে অপর জিনিসটি কি? এরপর যখন হিজরতে মদীনার ঘটনাটি সামনে এল তখন সবার অন্তরই এক বাক্যে তা স্বীকার করে নিল। কোন জাতীয় সনের এ ধরনের সূচনা সমগ্র ইতিহাস ও অতীত কীর্তিকলাপের বিরোধী ছিল। শুধু বিরোধী নয় বরং ছিল

পরিষ্কার বিপরীত। বিশ্বের সমগ্র জাতি বিজয় ও উত্থান দ্বারা নিজেদের সনের সূচনা করে থাকে। কিন্তু সাহাবীগণ নিজেদের অসহায়তা ও নিরাশ্রয়তা দ্বারা তাঁদের জাতীয় সনের সূচনা করলেন। বিশ্বের সমগ্র জাতি নিজেদের আবির্ভাব ও উত্থানের সব চাইতে বড় বিজয়টি স্মরণ রাখতে চাইল। কিন্তু সাহাবীগণ চাইলেন নিজেদের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ নিঃস্বতার দিকটি চিরস্মরণীয় করে রাখতে। বিশ্বের সমগ্র জাতির সিদ্ধান্ত এই যে, তাদের জাতীয় ইতিহাস তখন থেকে শুরু হোক, যখন তাদের ইতিহাসের সব চাইতে পরাক্রমশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে একের পর এক বিজয় লাভ করবেন। কিন্তু সাহাবীদের সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, তাঁদের জাতীয় ইতিহাসের সূচনা সেই দিন থেকে হবে, যখন সর্বাধিক পরাক্রমশালী মানুষের নয়, বরং সর্ববৃহৎ আমলের সূত্রপাত হবে। উপরন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ের দিন থেকে তাঁদের জাতীয় সনের সূচনা হবে। বিশ্বের সমগ্র জাতির বিশ্বাস এই ছিল যে, তাদের পরাক্রম ও শৌর্য-বীর্যের ভিত্তি সেই দিন থেকে রচিত হয়েছে, যখন তারা বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন রাজ্যের উপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু সাহাবীদের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁদের শক্তি ও ক্ষমতার দরজা সেই দিনই উন্মুক্ত হয়েছে, যেদিন বিভিন্ন দেশের উপর তাঁরা তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁদের এই বিচার বিবেচনা দুনিয়ার সমগ্র জাতির বিচার বিবেচনার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কিন্তু এটা ছিল সেই বিচার-বিবেচনার নিকটতর, যা ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছিল। তাঁরা তাঁদের সমষ্টিগত জীবনের নির্মাণ কাজ বিভিন্ন জাতির অনুকরণের মাধ্যমে নয়, বরং ইসলামের রূহ ও চিন্তাভাবনার নিরিখেই করতে চাচ্ছিলেন।

বিপদের কথা এই যে, বিশ্ববাসী অর্থের চেয়ে শব্দের এবং আত্মার চেয়ে দেহের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তারা ফলের প্রত্যাশা করে, কিন্তু বীজের খোঁজ নেয় না। তারা মিনারা ও মিহ্রাবের উচ্চতা ও অনুপমতার দিকে তাকায়, কিন্তু ভূমির অভ্যন্তরে প্রোথিত ভিত্তিসমুহের দিকে তাকায় না। সাহাবা কিরাম (রা) যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাব ও নুবুওয়াত লাভের মহান ঘটনাসমূহের কথা ছেড়ে দিয়ে হিজরতের ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তখন তাঁদের দৃষ্টিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাব, অভ্যুদয়, বিজয়, ভাগ্যের প্রসন্নতা, আনন্দোৎসব এবং আনন্দোল্লাসের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। কেননা তাঁরাও পরাজয় ও বিফলতার প্রত্যাশী ছিলেন না। তবে তাঁরা বিজয় ও ভাগ্যোন্নয়নের বাহ্যিক রূপ তথা ফল ও ফুলের প্রতি তাকাচ্ছিলেন না, বরং তাঁরা তাকাচ্ছিলেন বীজ ও ভিত্তির প্রতি। তাঁদের কাছে এ গুঢ় রহস্যটি প্রতিভাত হয়ে গিয়েছিল যে, ইসলামের অভ্যুদয়, আত্মপ্রকাশ, বিজয় ও ভাগ্য-প্রসন্নতার মূল ভিত্তি এই সব ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা বাহ্যত: আমরা দেখতে পাচ্ছি, বরং তা 'হিজরতে মদীনা' এবং তার আমাল ও হাকীকত সমূহের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এ কারণেই জন্ম, বি'ছাত এবং বদর ও মক্কা বিজয়ের উপর দুনিয়াবাসী যে গুরুত্ব আরোপ করত, তাঁদের দৃষ্টিতে হিজরতে মদীনার গুরুত্ব ছিল তার চাইতে অনেক বেশী।

হিজরতে মদীনার হাকীকত

কিন্তু হিজরতের ঘটনা কি ছিল?–তা একটিমাত্র ঘটনা ছিল না, বরং ছিল অগণিত আমাল ও ঘটনার সমষ্টি। অন্তত: কিছুক্ষণের জন্য আমরা তার হাকীকত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে পারি।

ইসলামের অভ্যুদয়ের ইতিহাস মূলত: দুটি বৃহৎ ও মৌলিক যুগের মধ্যে বিভক্ত। একটি যুগ হচ্ছে মক্কার জীবন এবং সেখানকার আমাল। অপর যুগ হচ্ছে মদীনায় অবস্থান এবং সেখানকার আমল। প্রথম যুগ শুরু হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নবুওয়াত লাভ থেকে এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে হিজরতের উপর। প্রথম যুগের সূচনা হয়েছে হেরা গুহার ই'তিকাফ থেকে এবং তা পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে ছাওর গুহায় আশ্রয় গ্রহণ থেকে। অপর যুগ শুরু হয়েছে হিজরত থেকে এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে বিদায় হজ্জের উপর। অর্থাৎ এর সূচনা হয়েছে মদীনা বিজয় থেকে এবং পরিসমাপ্তি ঘটেছে মক্কা বিজয়ের উপর।

বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে ইসলামের অভ্যুদয় ও উৎকর্ষের আসল যুগ ছিল দ্বিতীয় যুগ। কেননা এই যুগে ইসলামের অসহায়ত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং মুসলমানরা বাহ্যিক ক্ষমতা ও শানশওকতের অধিকারী হতে থাকে। বদরের সামরিক বিজয় ছিল সমরাস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের প্রথম বিজয়। মক্কা বিজয় ছিল আরব বিজয়ের একটি প্রকাশ্য ঘোষণা। কিন্তু স্বয়ং ইসলামের দৃষ্টিতে তার জীবনের আসল যুগ দ্বিতীয় যুগ নয়, বরং প্রথম যুগ ছিল। কেননা তার যাবতীয় ক্ষমতার ভিত্তিসমূহ দ্বিতীয় নয় বরং প্রথম যুগেই সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত হয়েছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বদরের সমরাস্ত্রসমূহ বিশ্ববাসীর কাছে আপন অসীম ক্ষমতার ঘোষণা প্রদান করেছিল; কিন্তু যে হাতে এই সব সমরাস্ত্র ধরেছিল সেগুলোর ক্ষমতা কোন্ ময়দানে তৈরি হয়েছিল? এতে বিজয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা প্রদান করেছিল। কিন্তু যদি মদীনা বিজয়ের ঘটনা না ঘটত তাহলে মক্কা বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হত কী করে? এটা সত্য কথা যে, মক্কা সমরাস্ত্রের মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল। কিন্তু মদিনা বিজিত হয়েছিল সমরাস্ত্রের মাধ্যমে নয় বরং হিজরত এবং ঐ সময়ের কার্যক্রম দ্বারা। অতএব দ্বিতীয় যুগে দেহ যতই শক্তিশালী হোক, তার আত্মার উন্মেষ তো ঘটেছিল প্রথম যুগেই।

প্রথম যুগ ছিল বীজ, আর দ্বিতীয় যুগ ছিল লতা ও ফল। প্রথম যুগ ছিল ভিত্তি আর দ্বিতীয় যুগ ছিল স্তম্ভ ও মিহ্‌রাব। প্রথম যুগ ছিল বর্ধিষ্ণুতার, আর দ্বিতীয় যুগ ছিল তার প্রকাশ ও প্রবাহের। প্রথম যুগ ছিল অর্থ ও হাকীকত, আর দ্বিতীয় যুগ ছিল রূপ ও প্রকাশ। পথম যুগ ছিল আত্মা, আর দ্বিতীয় যুগ দেহ। প্রথম যুগ সৃজন করল, সুঠাম করল এবং বিন্যস্ত করল আর দ্বিতীয় যুগ পা বাড়াল, অগ্রসর হল, বিজয়ের ঘোষণা দিল এবং পদানত করল। দ্বিতীয় যুগের বহি:প্রকাশ যতই জাঁকজমকপূর্ণ হোক, কিন্তু প্রাথমিক ভিত্তি ও আঁয়োজন-প্রস্তুতির যাবতীয় কৃতিত্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী তো প্রথম যুগই।

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নৈপুণ্য

অস্তিত্ব তথা জীবনের প্রত্যেকটি দিকের জন্য আল্লাহ্ তালার 'কানূনে অজূদ' তথা 'অস্তিত্ব রীতি' রয়েছে। এটাকে যত ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হোক না কেন, মূলত: এটা একের চেয়ে বেশী নয়। এবার একটু থামুন এবং চিন্তা করুন, সৃজন ও অস্তিত্বের পরিপূর্ণতার জন্য আল্লাহ্‌র 'হায়াতে কানূন' বা জীবন নীতি কি?

ব্যক্তির ন্যায় সমষ্টিরও অস্তিত্ব আছে। বাহ্যিক জগতের ন্যায় ভাব জগতেরও একটি অস্তিত্ব আছে। কিন্তু বস্তু যাই হোক, সৃজন ও পরিপূর্ণতার জন্য এটা অপরিহার্য যে, সে একের পর এক দুটি ভিন্ন যুগ অতিক্রম করবে। প্রথম যুগ হবে অভ্যন্তরীণ নৈপুণ্যের এবং দ্বিতীয় যুগ হবে বাহ্যিক নৈপুণ্যের। এটা অপরিহার্য যে, প্রথমে সে অভ্যন্তরীণ নৈপুণ্য লাভ করবে। আর এটাও অপরিহার্য যে, অভ্যন্তরীণ নৈপুণ্যের পরিপূর্ণতার সাথে বাহ্যিক নৈপুণ্যও তার মধ্যে সৃষ্টি হবে।

এই বিষয়টি খোলাসা করার জন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। আল্লাহ্‌র করুণা ও প্রতিপালন গুণ সমগ্র অস্তিত্ব জগতকে তার বদান্যতার ভাণ্ডার এবং সাধারণ দয়া- দাক্ষিণ্যের অবতরণ ক্ষেত্র বানিয়ে রেখেছেন। জীবন ও অস্তিত্বের জন্য যে সব জিনিসের প্রয়োজন, তার মধ্যে প্রত্যেকটি জিনিসই বিদ্যমান আছে। আর এর অস্তিত্ব শুধু এজন্য যে, যাতে করে নৈপুণ্য সন্ধান করা যায়, যোগ্যতা অর্জন করা যায়, আর চেষ্টাকে পরিণত করা যায় কার্যে। সূর্য দৈনিক আকাশে চমকায়, তারকা সর্বদা যমীনের দিকে উঁকি মারে, বাতাস সর্বদা নিয়ম নিষ্ঠার সাথে প্রবাহিত হয়, মেঘের আনাগোনায় কখনো কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না, সূর্যের কিরণ রাশি সমুদ্রকে টানে এবং সেখান থেকে পানি উঠিয়ে নিয়ে আসতে সে কখনো শৈথিল্য প্রদর্শন করে না। ভূপৃষ্ঠ আপন যাবতীয় ভাণ্ডার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাটির প্রত্যেকটি অণুপরমাণু আপন আপন পৃথক বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব রাখে। ঋতুর আবর্তন-বিবর্তন এবং দিন রাত্রির আগমন নির্গমনও আপন লক্ষ্য ও কৌশল থেকে বাইরে নয়। এভাবে অগণিত জিনিস রয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا ٠

এভাবে অগণিত বস্তুরাজি যাবতীয় শক্তিসমূহের ভান্ডার এবং বদান্যতা ও প্রতিপালনের অপরিসীম অবদান বটে। এই অবদানরাজি হচ্ছে আপন সমষ্টিগত রূপে অস্তিত্ব জগতের ঐ বাহ্যিক নৈপুণ্য, যা অস্তিতের জন্য সৃজন ও সুঠাম করার উপাদান সংগ্রহ করে এবং সর্বদা এর অপেক্ষায় চক্ষু উম্মীলিত করে রাখে। কিন্তু বাহ্যিক নৈপুণ্য থেকে শুধু ঐ সমস্ত বস্ত উপকৃত হতে পারে এবং আপন অংশের বখশীশ ও পেতে পারে, যে সমস্ত জিনিসের মধ্যে স্বয়ং তাদের অভ্যন্তরীণ নৈপুণ্য অস্তিত্ব লাভ করেছে তা অভ্যন্তরীণ নৈপুণ্যের বাইরের 'নৈপুণ্য-কারখানায়' প্রভাব সৃষ্টির জন্য যেন বিশৃঙ্খলা পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই এলোমেলো-প্রশ্নের একটা মীমাংসা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা কার্য ও প্রভাব সৃষ্টির উপর আন্দোলিত তথা কার্যকর হতে পারে না।

বীজের দৃষ্টান্ত

কৃষক একটি বীজ নেয় এবং তা যমীনে সোপর্দ করে। এবার দেখুন, এই বীজকে বিকশিত ও ফলবতী করার জন্য আল্লাহ্‌র কুদরত ও মহিমা কিভাবে আপন সমগ্র অস্তিত্বের কারখানা কর্মচঞ্চল করে রেখেছে। সূর্য অপেক্ষা করছে এর জন্য আপন উষ্ণতা উৎসর্গ করতে। মেঘমালা তৈরী হয়ে আছে আপন ভাণ্ডার এর জন্য উন্মুক্ত করে দিতে। যমীন সদাপ্রস্তুত রয়েছে আপন নম্রকোমল কোলে একে তুলে নিতে। কিন্তু এই সব বদান্যতাপূর্ণ কারখানা থেকে বীজটি তখনি উপকৃত হতে পারে যখন এই অভ্যন্তরীণ নৈপুণ্য ও যোগ্যতা সুস্থ ও সঠিক হবে। যদি তা না হয় তাহলে এই যাবতীয় বদান্যতার কারখানা তার জন্য সম্পূর্ণ বেকার প্রমাণিত হবে। তখন সূর্য তার জ্বলজ্বলে চুলার আগুন দ্বারাও একে গরম করতে পারবে না। মেঘমালা যদি সম্পূর্ণ পানি রাশি লুটিয়ে দেয় তবুও একে এক ফোটা জীবনও প্রদান করতে পারবে না।

এরপর একটি সুস্থ বীজ যখন যমীনের মধ্যে আপন জায়গা করে নেয় তখন তার অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা প্রকাশিত হয় এবং ভিতরে ভিতরে সে বর্ধিত হতে থাকে। তখন তার অস্তিত্ব থাকে খুবই ছোট, যার মধ্যে সূক্ষ্ম অণুপরমাণু এবং শিরা উপশিরা ছাড়া কোন জিনিস নজরে পড়ে না। কিন্তু ঐ সব অণুপরমাণু ও শিরা-উপশিরার মধ্যে তার ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের যাবতীয় মাহাত্ম্য ও বিরাটত্ব নিহিত থাকে। এমন কি এও বলা যেতে পারে যে, একটি বিরাট বৃক্ষের যাবতীয় শাখা প্রশাখা, পত্রপল্লব এবং তার শত সহস্র ফুল ও ফল ঐ সব অণুপরমাণু ও সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তা অনবরত: বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে একের পর এক সৃজন ও সুঠামতার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে। এরপর যখন এই সব পর্যায় অতিক্রান্ত হয় তখন সেই সময় এসে হাজির হয় যখন ভূপৃষ্ঠে ফাটল ধরে এবং সেই ফাটল দিয়ে বীজ থেকে অংকুর বেরিয়ে আসে। এরপর তা বাড়তে থাকে এবং প্রকৃতি যমীনের নীচে তার উপর যে মঙ্গলবারি বর্ষণ করেছিল, যমীনের উপরেও তা অব্যাহত রাখে। ফলে একদিন বৃক্ষজগতের নবাগত এই নওজোয়ান সদস্যটি আপন মূল ও কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায় এবং প্রকৃতির কারখানার প্রত্যেকটি উপাদান থেকে জীবন ও শক্তি লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। তখন সবাই তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, বাইরের শক্তি ও নৈপুণ্য এর জন্য অনবরত যা কিছু সরবরাহ করছে, এটা মূলত: সেই যোগ্যতারই প্রত্যুত্তর এবং সেই বস্তুর ফলশ্রুতি, যা যমীনের ভিতরে এর অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক নৈপুণ্য সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

প্রাণী জগতের দৃষ্টান্ত

প্রাণী জগতের দিকে তাকালে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাবে। পশু এবং মানুষ যখন অস্তিত্ব-জগতে পা রাখে এবং শৈশব থেকে বাধর্ক্য পর্যন্ত স্তরগুলো অতিক্রম করে তখন তা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সেই সত্তা, যা প্রথমে খোদ আপন অস্তিত্বের মধ্যে সৃজন ও পরিপূর্ণতা লাভের স্তরসমূহ ইতিপূর্বে অতিক্রম করে ফেলেছে।

যদি এর অভ্যন্তরীণ নৈপুণ্যের স্তর সুষ্ঠুভাবে ও সজীবতার সাথে শেষ না হত তাহলে তার এই বাহ্যিক নৈপুণ্যের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেত না। সে প্রথমে মাতৃগর্ভে ভ্রূণেরই একটি আদি উপাদান ছিল। এরপর তা ভিতরে ভিতরেই বর্ধিত ও বিস্তৃত হয়েছে। তারপর একের পর এক সৃজন ও সুঠামতার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেছে। প্রথমে সে ছিল একটি ক্ষুদ্র জীবাণু.যা একটি জোঁকের আকার ধারণ করে। এরপর এই জোঁক বৃদ্ধি পেতে পেতে একটি গোশ্ত খণ্ডে পরিণত হয়। তারপর গোশ্তখণ্ডের মধ্যে হাড়ের কাঠামো তৈরি হতে শুরু করে এবং সেই কাঠামো গোশত চামড়ার ঢাক্নীতে ভরাট হয়ে উঠে। এরপর গোশত ও হাড়ের এই সম্মিলিত বস্তুটি পরস্পর সামঞ্জস্য বজায় রেখে এমন একটি ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায় যে, আকার ও আকৃতির যাবতীয় সূক্ষ্মতা ও গঠনকাঠামোর যাবতীয় চিত্তাকর্ষতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এরপর যখন ভিতরে ভিতরে পরিপূর্ণতা ও সুঠামতার যাবতীয় পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন এই অস্তিত্ব সেই পরিমাণ যোগ্যতা অর্জন করে যে, সে মাতৃগর্ভ থেকে বহির্জগতে বেরিয়ে আসে। তখন যে কেউ তাকে একটি জীবিত ও সুন্দর সত্তা হিসাবে দেখতে পায়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ۔

"অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান।" (২৩ঃ ১৪)

মোটকথা, দুনিয়ায় প্রত্যেক জিনিসের সৃজন ও পরিপূর্ণতা লাভের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যে, তার মধ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত কারখানার নিমাতসমূহ থেকে উপকার হাসিলের সুস্থ ও সঠিক যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের উন্মেষ ঘটবে। আর এই যোগ্যতা প্রকাশিত হওয়ার প্রথম স্তর হচ্ছে বাহ্যিক। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তু তার এই প্রথম স্তরে সঠিক শক্তি সঞ্চয় করতে না পারবে ততক্ষণ তার মধ্যে অপর শক্তি বা যোগ্যতা সৃষ্টি হতে পারবে না। বাইরের প্রবৃদ্ধির জন্য ভিতরের প্রবৃদ্ধি 'সবব' বা কার্যকারণ সদৃশ। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সবব বা কার্যকারণের অস্তিত্ব না পাওয়া যাবে ততক্ষণ কোন ফলশ্রুতি প্রকাশ লাভ করবে না।

জামাআতের অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা বা নৈপুণ্য

ব্যক্তি ও গোষ্ঠী (জামাআ'ত) উভয়ের অবস্থা একই। এতক্ষণ ব্যক্তি বা বস্তুর উদাহরণ পেশ করা হল। এগুলোকে জামাআত ও জাতিসমূহের উপর প্রয়োগ করা হলে দেখা যাবে, ব্যক্তি ও বস্তুর ন্যায় জামাআতও সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর সৃজন, বর্ধিষ্ণুতা এবং উন্নতি ও পরিপূর্ণতার জন্যও হুবহু ঐ সব আইনকানুন প্রযোজ্য, যা ব্যক্তি ও বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যেভাবে ফিত্‌রাতে ইলাহীর রাবুবিয়াত বা প্রতিপালন সৃষ্টি রাজির জীবন, বর্ধিষ্ণুতা ও প্রবৃদ্ধির জন্য আপন বকশীশ ও বদান্যতার মেঘমালা যমীনের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে, যা প্রত্যেকটি বস্তুকে জীবন দান করে, প্রত্যেকটি জিনিসকে প্রতিপালন করে এবং প্রত্যেকটি জিনিসকে তার অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, ঠিক অনুরূপভাবে জামাআত ও উম্মতের প্রকাশ ও প্রবৃদ্ধির জন্যও প্রত্যেক প্রকারের বকশীশ, বদান্যতা ও প্রত্যেক প্রকারের কল্যাণ ও উপকার পৌঁছানোর সহায় সামগ্রীর যোগান দিয়ে থাকে। রাবুবিয়াত বা প্রতিপালন এর অভ্যুদয়ের অপেক্ষা করে এবং প্রকৃতির বখশীশ ও বদান্যতা এর পদার্পণনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু যেভাবে ব্যক্তি ও বস্তুসমূহের জন্য ফিতরাতের যাবতীয় সামগ্রী শুধুমাত্র এই অবস্থায় উপকারী হতে পারে যখন স্বয়ং তার মধ্যে সুস্থ-সঠিক নৈপুণ্য তথা যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে, এরপর যেভাবে এই নৈপুণ্যের পরিপূর্ণতার প্রথম স্তর অভ্যন্তরীণ এবং দ্বিতীয় স্তর বাহ্যিক-ঠিক সেভাবে জামাআত ও জাতিসমূহের স্বভাবগত নৈপুণ্যের জন্যও প্রথম স্তর অভ্যন্তরীণ এবং দ্বিতীয় স্তর বাহ্যিক। কোন দল কোন জাতি এবং মানুষের কোন সমষ্টিগত অস্তিত্ব জীবন সংগ্রামে ততক্ষণ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ না একটি বীজ ও ভ্রূণের ন্যায় সে তার অভ্যন্তরীণ নৈপুণ্য তথা যোগ্যতার স্তর অতিক্রম করে। এর অভ্যন্তরীণ সৃজন ও পরিপূর্ণতার জন্যও একটি নির্দিষ্ট সময় এবং সময়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। যদি একটি জামাআত অস্তিত্ব ও পরিপূর্ণতার পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করতে

চায় তাহলে তার জন্য এটা অনিবার্য যে, সে আভ্যন্তরীণ নৈপুণ্যের পরিপূর্ণতার মেয়াদ অতিক্রম করবে। তারপর বাইরের কর্মতৎপরতা ও বিজয়ের দরজা তার জন্য আপনা আপনি খুলে যাবে। কেননা বাইরের যাবতীয় সাফল্য, এর অভ্যন্তরীণ যোগ্যতার পরিপূর্ণতা লাভের ফলশ্রুতি হয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআনের সংস্কার কর্ম 'তাযকিয়া'

যেভাবে ব্যক্তি ও বস্তুর দেহের অভ্যন্তরীণ নৈপুণ্য, তার ভিতরে ভিতরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং পরিপক্ক হওয়ার পর নির্ভর করে সেভাবে ব্যক্তিও জামাআতের মানসিকও চারিত্রিক নৈপুণ্য নির্ভর করে তার প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রতিপালনের উপর। যেমন কুরআন শরীফ, এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছে আপন পরিভাষা 'তাযকিয়াহ' (পবিত্রকরণ) দ্বারা।

চরিত্র ও নাফ্সের তাযকিয়া বা পবিত্রকরণের উদ্দেশ্য এই যে, একটি জামাআতের, জামাআত হিসাবে যে মনোবৃত্তি ও মন-মানসিকতার দরকার, তা যেন এর প্রত্যেকটি সদস্যের মধ্যে সৃষ্টি করে দেওয়া হয় এবং এরূপ দৃঢ়তা ও চিরাচরিত পদ্ধতিতে সৃষ্টি করে দেওয়া হয়-যেন একটি লৌহ নির্মিত ছাঁচের মধ্যে প্রত্যেকটি ব্যক্তির মনমস্তিষ্ক একই রূপে ও একই আকারে ঢালাই করে দেওয়া হয়েছে। দেহজগতে দেহের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি ও শ্রেষ্ঠতম প্রবৃদ্ধি দলগত শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে হয়ে থাকে। দলগত জীবনের মূল শক্তি ও যোগ্যতা এটাই। এই যোগ্যতা দ্বারা সে সবকিছু পায় এবং এ যোগ্যতা ছাড়া সে কিছুই করতে পারে না। নাফ্স পবিত্র করণের পদ্ধতি এই যোগ্যতাই সৃষ্টি করে। এর সৃজন ও পরিপূর্ণতা সাধনই হচ্ছে জামায়াত এবং জাতিসমূহের অভ্যন্তরীয় শক্তি ও যোগ্যতা।

দলগত মানসিকতা ও চরিত্র

জামাআতের অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের জন্য যে মানসিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তা যদিও জামাআতের প্রত্যেকটি লোকের জন্য অপরিহার্য কিন্তু এর যাবতীয় শক্তি সমষ্টিগত তথা দলগত মানসিকতা ও চরিত্রের সাথে ওতপ্রোত অর্থাৎ এই প্রশিক্ষণ জামাআতের মানসিকতা ও চরিত্রের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবোদ্দীপনা সৃষ্টি করে দিতে চায়। যেহেতু এই ভাবোদ্দীপনা ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে না যতক্ষণ জামাআতের প্রত্যেক ব্যক্তি আপন ব্যক্তিগত মানসিকতা ও আচার-আচরণের দিকটি বিস্মৃত হয়ে সমষ্টিগত ভাবোদ্দীপনা সৃষ্টি না করে। এজন্য সে মানসিকতা ও আমালের একটি বিশেষ ছাঁচ তৈরি করে নেয়। এরপর সমাজে প্রত্যেকটি সদস্যের মন-মানসিকতা ও স্বভাব চরিত্র তার মধ্যে ঢালাই করে নিতে শুরু করে। এমন কি শেষ পর্যন্ত সমগ্র মানুষের মানসিকতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদি একই ভঙ্গি ও একই রূপ ধারণ করে এবং তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অসংখ্য মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মানসিকতা ও চরিত্রের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মোটামুটি এ ধরনের সামঞ্জস্য ও সমঝোতা সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটি মানুষের বাসনা এক ধরনের হতে পারে না এবং হয়ও না। তাদের আচার-আচরণের সাধারণ ভাবভঙ্গিও এক ধরনের হয় না। তারা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনায়, নিজেদের জীবন ও জীবিকায় তথা সর্বক্ষেত্রে এক হতে পারে না এবং হয়ও না। কিন্তু তারা মানসিকতা ও আমলের ঐ ক্ষেত্রে যা সমষ্টিগত জীবনের ভিত্তিস্বরূপ এবং স্বভাব চরিত্রের প্রকৃষ্টতার মাপকাঠি এমনভাবে একই সারিতে দাঁড়ায় যে, মনে হয় সবার মধ্যে যেন একই মস্তিষ্ক কাজ করছে এবং সবার ভিতরে যেন একই আত্মা কথা বলছে।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জায়গা এটা নয়। অন্যথায় এখানে এই সব চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটিরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করা হত এবং এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া হত যে, কুরআন ও সুন্নাহ সমষ্টিগত স্বভাব-প্রকৃতির কি কি মৌলিক গুণাবলী বর্ণনা করেছে এবং সেগুলোর অভ্যন্তরীণ যোগ্যতার স্তম্ভ বা বুনিয়াদ কি?

মোট কথা, বস্তু ও ব্যক্তির ন্যায় জামাআত এবং জাতিসমূহের মধ্যেও জীবনের মূল উৎস বাহ্যিক কার্যকলাপের মধ্যে নয় বরং সেগুলোর অভ্যন্তরীণ শক্তি ও নৈপুণ্যের মধ্যেই নিহিত থাকে।

অভ্যন্তরীণ নৈপুণ্যের যুগ

ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রথম যুগ, 'বি'ছাত' থেকে শুরু হয়ে হিজরতে গিয়ে শেষ হয়েছে এবং যার পরিপূর্ণতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল হিজরতের ঘটনা, তা প্রকৃতপক্ষে ছিল জামাআতের অভ্যন্তরীণ নৈপুণ্যের যুগ। আর এ কারণেই প্রথম যুগই ছিল ইসলামের অভ্যুদয়ের সমগ্র সাফল্য ও বিজয়ের সূচনাকাল। মাদানী জীবনের দ্বিতীয় যুগ নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিশ্ববাসীর বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা ছিল বিপদ-বাধার যুগ এবং অসহায়ত্ব ও নিঃস্বতার একটি ব্যথাতুর মুহূর্ত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মুসলিম উম্মতের প্রত্যেকটি বিজয় এই বিপদ-বাধা ও দুঃখ-ব্যথার মধ্যেই উন্মোচিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছিল। এগুলোই ছিল সেই সব বিপদ-বাধা, যা জামাআতের মানসিকতা ও চরিত্রের জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালনের কেন্দ্রভূমি এবং নাফস ও আত্মার পরীক্ষাস্থল ছিল। বদরের বিজয় এই পাঠ্যসূচীর মধ্যেই পাঠ গ্রহণ করছিল। মক্কা বিজয়ের গৌরব এর মধ্যেই রূপ লাভ করছিল। শুধু এই পর্যন্ত নয়, বরং ইয়ারমুক এবং কাদিসিয়ার বিজয়লগ্নও এই সব পরীক্ষা ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল। এ কারণে কুরআন মজীদ এই জিহাদকে, যা মাদানী জীবনে যুদ্ধাস্ত্রের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল, স্রেফ জিহাদ নামে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু নাফ্স্ ও চরিত্রের পবিত্রকরণ ও প্রতিপালনকে—যা অস্ত্রযুদ্ধের পূর্বে অব্যাহত ছিল—সেটাকে আখ্যায়িত করেছে 'জিহাদে আকবর' (সর্ববৃহৎ জিহাদ) নামে। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটা তো হচ্ছে সর্ববৃহৎ জিহাদ।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا .

"সুতরাং আপনি কাফরিদের আনুগত্য করবেন না এবং কুরআনের সাহায্যে ওদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যান।" -(২৫ ঃ ৫২)

সূরা ফুরকান যে একটি মক্কী সুরা এতে কোন দ্বিমত নেই। আর মক্কী জীবনে যে বৃহৎ জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা নিশ্চয়ই অস্ত্রের জিহাদ ছিল না। সেটা ছিল ধৈর্য, দৃঢ়তা, সংযম ও সহিষ্ণুতার জিহাদ। আর এই সব গুণাবলীর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ছিল জামাআতের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার ভিত্তিসমূহ।

পরিপূর্ণতার ঘোষণা

হিজরতের ঘটনা ছিল ঐ যুগের বিপদসমূহের একেবারে চরম রূপ। এজন্য এর বরকত ও সৌভাগ্য সমূহও ছিল চূড়ান্ত পরিপূর্ণ। সাহাবা কিরাম (রা) এই সত্য সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। আর অনবহিত থাকবেনই বা কেমন করে? তাঁদের মস্তিষ্কগত প্রতিপালনের মূল আত্মা তো এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অতএব যখন এই প্রশ্ন সামনে এল যে, ইসলামী সনের সূচনা কোন্ ঘটনা থেকে করা হবে তখন তাঁরা এমন একটি ঘটনার সন্ধান করতে থাকেন, যা উম্মতের দৃঢ়তা ও সৌভাগ্য অর্জনের মূল উৎস। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জন্মের ঘটনা নিশ্চিতভাবে সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল, কিন্তু ঘটনার স্মরণে রাসূলুল্লাহ (সা) এর ব্যক্তি সত্তা সামনে আসত, তাঁর কার্যাবলী সামনে আসত না। নবুওয়াত প্রাপ্তির ঘটনাও বড় ঘটনা ছিল; কিন্তু সেটা ছিল বিষয়ের সূচনা; সমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা ছিল না। বদর যুদ্ধ ও মক্কা বিজয় নিঃসন্দেহে বড় ঘটনা ছিল। কিন্তু সেগুলো ইসলামের বিজয় ও সৌভাগ্যের ভিত্তি ছিল না, বরং ছিল অপরাপর ভিত্তির ফলশ্রুতি। এই সব ঘটনাও সাহাবীদের বিচার-বিবেচনায় এসেছিল, কিন্তু এগুলোর কোনটির ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁরা তাদের মনে শান্তি ও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না।

এরপর যখন হিজরতের ঘটনা সামনে এল তখন তাঁদের সবার অন্তরই তা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করল। তখন তাঁদের মনে একথা উদিত হল যে, ইসলামের অভ্যুদয় ও উত্থানের সত্যিকার সূচনা এই ঘটনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। অতএব এটাই সেই ঘটনা যা থেকে ইসলামী সন-তারিখের সূচনা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

মদীনা বিজয়

এরপর এদিকে দৃকপাত করা হলে এ সত্য কত উত্তম ভাবে ফুটে উঠে যে, ইসলামের যাবতীয় বিজয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম বিজয় ছিল মদীনা বিজয় আর হিজরতের ঘটনা দ্বারাই এর পূর্ণতা লাভ হয়েছিল। মদীনার সাথে বিজয় শব্দটি জুড়ে দেওয়ার কারণে কেউ কেউ হয়ত বিস্ময়বোধ করবেন। কেননা তারা বিজয় বলতে যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয়কেই বুঝে থাকেন। কিন্তু এ কথা তারা জানেন না যে, যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয়ের চাইতে অন্তরকে আবাদ করা এবং আত্মার জগতকে জয় করাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই জয়ের জোরেই যুদ্ধক্ষেত্রের জয় অর্জিত হয়ে থাকে। ঠিক ঐ সময়ে যখন ইসলামের দায়ী (আহবায়ক) আপন জন্মভূমি ও আপন দেশবাসীর পাপাচার ও সীমালংঘনের কারণে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন তখন ইয়াছরিবের একটি ছোট্ট দল তাঁর কাছে পৌঁছে এবং রাতের অন্ধকারে চুপিসারে তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকারের প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন তো পার্থিব শৌর্যবীযের কোন ব্যাপারই সেখানে ছিল না, তীর-তরবারির ভীতি প্রদর্শন বা পরাক্রম দেখানোর কোন প্রশ্নই সেখানে ছিল না। সেখানে যা ছিল তা হলো আপাদমস্তক অসহায়তা এবং বিপদ-আপদে জড়িয়ে পড়ার বিরূপ পরিস্থিতি। এতদ্‌সত্ত্বেও ইয়াছরিবের সম্পূর্ণ আরব অধিবাসীরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে, ইসলামের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে নিজেদের দেশে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এমন উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে, যা বিশ্ব-ইতিহাসে কোন দ্বিগ্বিজয়ী বীর বা রাজা-বাদশাহ্র ক্ষেত্রে কখনো লক্ষ্য করা যায় নি।

মনের তথা আত্মাসমূহের এই বিজয়ও আনুগত্যের চাইতে অধিকতর বিজয় কি অন্য কিছু হতে পারে? হিজরতের যুগের দুঃখ যাতনা ও বিপদবাধার মধ্যে এর সূচনা হয় এবং হিজরতই এর মধ্যে পরিপূর্ণতা এনে দেয়।

হিজরতের ঘটনা ও আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় দান

এ কারণেই পবিত্র কুরআন হিজরতের ঘটনাকে এমনভাবে উল্লেখ করেছে, যাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নিঃস্বতা ও দারিদ্র্যের এই কার্যক্রমের মধ্যে বিজয় ও ইলাহী সাহায্যের সবচেয়ে বড় রহস্য নিহিত ছিল। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ج
فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

"তিনি ছিলেন দুই জনের একজন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, তিনি তখন তাঁর সংগীকে বলেছিলেন, 'বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সংগে আছেন।' এরপর আল্লাহ্ তাঁর উপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দিয়ে যা তোমরা দেখ নি, এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন, আল্লাহ্র কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"– (৯ ঃ ৪০)

উপরোক্ত আয়াতটি সূরা বারাআতের। আর সূরা বারাআত সর্বসম্মতিক্রমে তখন নাযিল হয়েছিল যখন ইসলামের বাহ্যিক বিজয় অভিযান সমূহ পরিপূর্ণতায় পৌঁছে গিয়েছিল। এ থেকে জানা গেল যে, ইসলামের যাবতীয় বিজয় অর্জিত হওয়ার পরও এর প্রয়োজন বাকি ছিল যে, হিজরতের ঘটনার অভ্যন্তরীণ বিজয়কেও স্মরণীয় করে রাখা হবে।

কুবা থেকে মদীনা মুনাওওরা

কুবায় অবতরণ

যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৮ রাবীউল আউয়াল, ত্রয়োদশ নববী সন (২০ সেপ্টম্বর, ৬২২ইং) দুপুরের পর কুবায় উপনীত হন এবং একটি গাছের ছায়ায় উপবেশন করেন। আনসারগণ নিজ নিজ ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। তখন জনৈক য়াহূদী তার উঁচু দুর্গে উঠেছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সোয়ারী দেখে আলামতে চিনে ফেলল। চীৎকার দিয়ে বললঃ হে আরব বাসী, তোমরা যে মহান ব্যক্তির অপেক্ষা করছিলে, তিনি এসে পড়েছেন। একথা শোনার সাথে সাথে আনসারগণ একেবারে ব্যস্তত্রস্ত অবস্থায় নিজ নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। তখন অন্যান্য জনবসতিতেও এই সংবাদ পৌঁছে গিয়ে থাকবে। সবার মুখে একই কথাঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসে পড়েছেন, মুহাম্মদ (সা) এসে পড়েছেন। তাঁরা বার বার একথাটির পুনরাবৃত্তি করছিলো। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সম্পূর্ণ জনবসতির মানসিক অবস্থা ঠিক ঐ একই ধরনের ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই শুভাগমনের চাইতে বিরাট ঘটনা মদীনাবাসীদের কাছে আর কীই বা হতে পারে?

সিদ্দীকে আকবর (রা) তাঁদের মনের ভাব আঁচ করতে পেরেছিলেন

যে সব আনসার সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে মিলিত হন তাঁদের মধ্যে সম্ভবত: কেউই ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে চাক্ষুষ দেখেন নি। বাস্তব ঘটনাও এই সাক্ষ্যই দেয় যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে চিনতে গিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত হয়েছিল। কিন্তু শিষ্টাচারের খাতিরে তাঁরা জিজ্ঞাসা করতেও ভরসা পাচ্ছিলো না। তাঁরা বার বার হযরত আবূ বকর (রা) এর দিকে তাকাচ্ছিলো। কেননা আবূ বকর (রা) বয়সের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চাইতে দুবছরের ছোট হলেও তাঁর দেহ ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চাইতে অপেক্ষাকৃত জীর্ণশীর্ণ ও দুর্বল। তাঁর চুল ও বেশী পরিমাণ সাদা হয়ে গিয়েছিল। যেন তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চাইতে অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠই দেখাচ্ছিলো। সিদ্দীকে আকবর (রা) মদীনাবাসীদের এই মনোভাব আঁচ করে নিয়েছিলেন। ঠিক ঐ মুহূর্তেই যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে রোদ এসে পড়ল তখন আবূ বকর (রা) তড়িৎ বেগে এগিয়ে গিয়ে আপন চাদর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে ছায়া প্রদান করেন। আবূবকর (রা)-এর এই সহজ-সরল ও অতি বোধগম্য শিষ্টাচারমূলক আচরণ দ্বারা লোকেরা সহজেই বুঝে নিলেন যে, কে সেই মহান ব্যক্তি, যার জন্য তারা এতদিন যাবৎ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর শুভ অবস্থান

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুবায় কুলসূম বিন আল হিদাম-এর ঘরে অবস্থান করেন।[১] তিনি ছিলেন বনী আমর বিন আওফের লোক। বেশ কিছু সংখ্যক মুহাজিরও কুলসূমের ওখানে অবস্থান করছিলেন। তাদের মধ্যে আবূ উবায়দা, মিকদাদ, খাব্বাব, সাফ্ওয়ান, আয়ায, আবদুল্লাহ্ বিন মাখরামা, ওহাব বিন সা'দ, মুহাম্মদ বিন আবী সুরাহ্ এবং উমায়র বিন আওফ (রা) ছিলেন অন্যতম। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি (আ) সা'দ বিন খায়ছামার ওখানে অবতরণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কুলসূম বিন আল হিদামেরই কাছে ছিলেন। কিন্তু সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি সা'দ বিন খায়ছামার ঘরকে বৈঠকখানা হিসাবে নির্বাচন করেন। কেননা সা'দ অবিবাহিত ছিলেন। আর মুহাজিরগণের মধ্যে অবিবাহিতগণ সে ঘরেই অবস্থান করছিলেন। এজন্যই সা'দের ঘরকে 'বায়তুল উযাব' বা অবিবাহিতদের আস্তানা বলা হত।[২]

হযরত আলী (রা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পর হযরত আলী (রা) তিন দিন মক্কা মুকাররমায় অতিবাহিত করেন। যখন মক্কার প্রতিটি লোক এবং প্রতি ইঞ্চি জমি দিনের পর দিন ইসলাম ও মুসলমানদের প্রাণঘাতী শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছিল ঠিক তখন হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর কাছে রক্ষিত মক্কাবাসীদের সব আমানত, একটি একটি করে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেন। এই গুরু দায়িত্ব পালন করার পর তিনি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং কুবায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে অবস্থান করতে থাকেন।

ইবনে ইস্হাকের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলী (রা) কুবায় এক অথবা দুদিন বাত অবস্থান করেন। অর্থাৎ তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দুই অথবা তিন দিন পর মক্কা থেকে কুবায় গিয়ে পৌঁছেন।

মহান আদর্শ

এখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মহান আদর্শের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেওয়া যাক।

১। সত্য দ্বীন প্রচারের জন্য যদিও মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রাণের দুশমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল এতদ্সত্ত্বেও তাদের বেশীর ভাগ লোক তাঁর কাছে নিজেদের মাল-সামগ্রী গচ্ছিত রাখত। কেননা তাদের জানা মতে, আমানত রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চাইতে অধিকতর বিশ্বস্ত লোক তখন মক্কায় আর কেউ ছিল না।

২। কুরায়শের কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জন্য মক্কা মুকাররমার পরিবেশ এমন বিপদসংকুল করে তুলেছিল যে, সেখানে তাঁর অবস্থান কেবল অসম্ভবই ছিল না, বরং তাঁর কাছে রক্ষিত বিভিন্ন লোকের আমানতসমূহ যথাযথভাবে ফেরত দেওয়ার সুযোগটুকুও ছিল না। তাই তিনি বাধ্য হয়ে হযরত আলী (রা) এর উপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এতে তিনি এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন যে, আমানতের সংরক্ষণ ও হিফাযত শুধুমাত্র অনুকূল অবস্থার উপর নির্ভর করে না, বরং অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায়ও এটাকে তার প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হয়।

এবার চিন্তা করে দেখুন, যে মহান ও পবিত্র সত্তা পার্থিব জড় আমানতসমূহ সম্পর্কে এই উজ্জ্বলপ্রোজ্জ্বল মাপকাঠি স্থাপন করেছেন, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়াতরূপ পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে কি পরিমাণ সতর্ক, দায়িত্বশীল ও নিষ্ঠাবান হতে পারেন?

কুবায় অবস্থানকাল

ইতিহাস ও জীবন চরিত রচয়িতারা এই সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কুবায় অবস্থানের মেয়াদ চার দিন বর্ণনা করেছেন। তিনি সোমবার দুপুরের পর (৮ রবীউল আউয়াল) সেখানে পৌঁছেন এবং মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার অবস্থান করে শুক্রবার দিন (১২ রাবীউল আউয়াল, ১লা হিজরী, মুতাবিক ২৪ সেপ্টেম্বর, ৬২২ ইং) দুপুরের পর নির্দিষ্ট অবস্থানস্থলের দিকে রওয়ানা হন।

সহীহ্ বুখারীতে সেখানে অবস্থানের মেয়াদ ১০ দিনের চাইতে কিছু বেশী বলা হয়েছে। যেহেতু এই রিওয়ায়াত অনুযায়ীও তিনি জুমু'আর দিন রওয়ানা হয়েছিলেন তাই তাঁর অবস্থানকালের মেয়াদ মোট ১২ দিনই ছিল।

বাহ্যত: অনুমিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুবায় সর্বমোট চারদিন অবস্থান করেছিলেন। কেননা নির্দিষ্ট অবস্থানস্থল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইতিপূর্বেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছিলেন। তাছাড়া স্থায়ী অবস্থানস্থলে পৌঁছে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বেশ কয়েকটি তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা তাঁর জন্য জরুরী ছিল। তাছাড়া কুবা নির্বাচিত অবস্থানস্থল থেকে দূরেও ছিল না। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ইচ্ছা তখনই সেখানে থেকে চলে আসতে পারতেন।

স্থায়ী অবস্থান স্থল

আনসারের প্রত্যেক গোত্র এবং প্রত্যেক খান্দান আন্তরিকভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর 'অতিথিসেবক' হতে চাচ্ছিলো। কিন্তু এটা জানা কথা যে, এই সব গোত্র ও খান্দান যেহেতু ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়ে সমসাময়িক ও সম মর্যাদার অধিকারী ছিল, তাই তাঁদের একটিকে অপরটির উপর বিশেষ কোন কারণ ব্যতিরেকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব ছিল না এবং সাধারণ সৌজন্যবোধও এ আচরণকে সমর্থন করছিল না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথম থেকেই এ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন যে, তিনি তাঁর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের মতামহের সম্প্রদায়েই অবস্থান করবেন। অতএব পূর্ব আত্মীয়তার প্রেক্ষিতে সমগ্র মদীনাবাসী সন্তুষ্টচিত্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঐ সিদ্ধান্তকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছিল।

এটা অবশ্য আলাদা কথা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে শহরে অবস্থান করার ইচ্ছা করেছিলেন পরবর্তী সময়ে তা মদীনাতুন নবী বা মদীনাতুর রাসূল্ল নামে খ্যাতি লাভ করে। তবে সাধারণ্যে তা মদীনা নামেই পরিচিত হয়ে উঠে।

এরপর মদীনা শহরের যখন বিস্তৃতি বা পরিবর্ধনের কাজ শুরু হল তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতি, আবাস স্থল অথবা মহল্লাসমূহ মূল শহরের সাথে যুক্ত হতে লাগল। যে সব আবাসস্থল ও বসতি কিছুটা দূরত্বে ছিল সেগুলো অবশ্য তাদের পৃথক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই বিদ্যমান থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুবার কথা বলা যায়। এর দূরত্ব ছিল কমবেশী তিন মাইল।

মসজিদের ভিত্তি

কুবায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। হিজরতের পর এটাই ছিল প্রথম মসজিদ, যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পবিত্র হস্ত দ্বারা। এই মসজিদ সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে।

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ط فِيْهِ رِجَالٌ
يُحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ .

"যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর, ওটাই তোমার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য। সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন।"

এই মসজিদের নির্মাণ কাজ ছিল খুবই সাদাসিধে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উসমান (রা) এর খিলাফতকালে নতুনভাবে মসজিদটি নির্মাণ করা হয় এবং এর আয়তনও বৃদ্ধি করা হয়। উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের খিলাফতকালে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রা) মদীনা মুনাওওরার গভর্ণর ছিলেন। তিনি এই ইমারতের স্থলে একটি নতুন ইমারত নির্মাণ করেন এবং এর এক কোণে আযান দেওয়ার একটি স্থানও পৃথকভাবে নির্মাণ করেন। বর্তমানে ইমারতটি হিজরী ১২৪৫ মুতাবিক ইং ১৮৩১ সনে নির্মাণ করা হয়। সেটা ছিল উসমানী সুলতান মাহমুদ খানের শাসনকাল।

জুমু'আর সালাত

১২ রাবীউল আউয়াল প্রথম হিজরী (২৩সেপ্টেম্বর, ৬২২ ইং) জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুপুরের পূর্বে কুবা থেকে রওয়ানা হন। বুঝা যায় যে, তাঁর সওয়ারীর গতি দ্রুত ছিল না। কেননা তাঁকে এক নজর দেখা এবং অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আনসার দলে দলে রাস্তার উভয় পার্শ্বে দাঁড়াতে শুরু করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনী সালিম বিন আওফের মহল্লায় পৌঁছেন তখন জুমু'আর সময় হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানেই জুমু'আর সালাত

আদায় করেন। যদিও মদীনা মুনাওওরায় এর আগে থেকেই জুমু'আর সালাত চালু হয়ে গিয়েছিল। তবে এখানে ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রথম সালাত।

এ উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি খুতবাও প্রদান করেন, যার বিভিন্ন অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

الحمد للّه احمده واستعنيه واستغفره واستهديه واو من به ولا اكْفُرهُ واعادى من يكفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمداعبده ورسوله ارسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة و قرب من الاجل

"প্রশংসা ও প্রশস্তি শুধুমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য। আমি তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর সাহায্য চাই। আমি তাঁর পুরস্কার ও হিদায়াত কামনা করি। এর উপরেই আমার ঈমান। যারা এটাকে অস্বীকার করে আমি তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে হিদায়াত, নূর ও উপদেশসহ এমন এক যুগে পাঠিয়েছেন, দীর্ঘদিন থেকে যখন পৃথিবীতে কোন রাসূলের আবির্ভাব হয়নি। জ্ঞানের দরজা সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল পথভ্রষ্টতা। তাকে শেষ যুগে, কিয়ামতের কিঞ্চিৎ পূর্বে এবং প্রতিশ্রুত মেয়াদকালের নিকটবর্তী সময়ে পাঠানো হয়েছে।"

শ্রেষ্ঠতম নসীহত ও শ্রেষ্ঠতম উপদেশ

من يطع اللّه ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا اوصيكم بتقوى الله فانه خير ماوصى به المسلم المسلم ان يحضه على الاخرة وان يامر بتقوى الله فاحذروا ماحذركم اللّه من نفسه ولاافضل من ذلك نصيحة ولا افضل من ذالك ذكراً .

"যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করেছে সেই পথ পেয়েছে। যে তাঁর অবাধ্য হয়েছে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অপরাধী প্রমাণিত হয়েছে এবং মারাত্মক গুমরাহীর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। আমি তোমাদেরকে তাকওয়া (আল্লাহ্ সম্পর্কে সদাসতর্ক থাকার) অসীয়ত করছি। শ্রেষ্ঠতম নসীহত, যা একজন মুসলমান অপর একজন মুসলমানকে করতে পারে তা হলো এই যে, তাকে আখিরাতের জন্য তৈরী থাকতে বলবে এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে। লোকসকল, যে সব কথাবার্তা ও কাজকর্ম থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দূরে থাকতে বলেছেন তোমরা সেগুলো থেকে দূরে থাক। জেনে রেখ, এর চাইতে উৎকৃষ্ট না কোন নসীহত আছে, আর না কোন উপদেশ।

তাকওয়া

وانّ تقوى اللّه لمن عمل به على وجل ومخافةٍ من ربّه عون صدقٍ على ماتبغون من امر الاخرة ومن يصلح الذى بينه وبين الله من امره فى السرّ

والعلانية لاينوى بذلك الا وجه الله يكن له ذكرا فى عاجل امره وزخرا فيما
بعد حين يفتقر المرء انى ماقدم ...وان تقوى الله يؤقى مقته ويوقى عقوبته
ويوقى سخطه وان تقوى الله تبيض الوجوه ويرضى الربّ ويرفع الدرجة .

"আখিরাতের ব্যাপারে যে ব্যক্তির অন্তর আল্লাহ্‌র ভয়ে পরিপূর্ণ থাকবে তাকওয়া তার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী প্রমাণিত হবে। আর যে ব্যক্তি বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্ এবং তাঁর মধ্যকার ব্যাপারসমূহ—চাই তা গোপন হোক অথবা প্রকাশ্য–ঠিক করে নেবে তা তাঁর জন্য হবে মূল্যবান উপদেশ স্বরূপ। অধিকন্তু মৃত্যুর পর তা তার জন্য পুজির কাজ দেবে যখন মানুষ মাত্র আমলেরই প্রত্যাশী হবে।

তাক্ওয়া হচ্ছে এমন বস্তু, যা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি শাস্তি এবং রোষানলকে প্রশমিত করে। তাকওয়া হচ্ছে এমন বস্তু, যা দ্বারা চেহারা দীপ্তিমান হয়ে উঠে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।"

সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকরণ

خذوا بحظكم ولا تفرطوا فى جنب اللّه وقد علمكم الله كتابه ونهج لكم
سبيله ليعلمَ الذين صدقوا ويعلمَ الكاذبين فاحسنوا كما احسنَ الله اليكم
......لاقوة الابالله فاكثروا ذكر الله واعلموا لمابعد اليوم .... الله اكبر ولاقوة
الا باللّه العلى العظيم :

"তোমরা তোমাদের অংশ বুঝে নাও। আল্লাহ্‌র অধিকারসমূহের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না। তিনি তোমাদেরকে তাঁর কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন এবঙ তার পথ দেখিয়েছেন যাতে সত্য ও মিথ্যা পৃথক হয়ে যায়। আল্লাহ্ তোমাদের সাথে যেভাবে ভাল ব্যবহার করেছেন তোমরাও সেভাবে মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার কর।

পুণ্যকর্ম আল্লাহ্‌র সাহায্য-সহায়তায়ই সম্পাদন করা যায়। বেশী বেশী করে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কিছু তৈরী রাখো। আল্লাহ্ সব চাইতে মহান। পুণ্যকর্ম সম্পাদনের শক্তি তাঁর কাছ থেকে আসে। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।[৩]

যে জায়গায় এ জুমু'আর সালাত আদায় হয়েছিল সেখানে স্মরণীয় কীর্তি হিসাবে পরবর্তীকালে একটি মসজিদও নির্মাণ করা হয়। তা এখনো 'রানূনা' উপত্যকার পাশে, মদীনা মুনাওওরা ও কুবার রাস্তায় বিদ্যমান আছে।

আনসারের উৎসর্গের নমুনা

সালাত শেষ হওয়ার পর বনী সালিম বিন আওফ (খাযরাজ)-এর ইতবান বিন মালিক এবং আব্বাস বিন উবাদা নিবেদন করেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (স) আপনি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমরা সংখ্যাধিক্য এবং ধনসম্পদ ও সম্মান-প্রতিপত্তিতে মদীনাবাসীদের মধ্যে অগ্রণী। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন উটনীর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এর রাস্তা ছেড়ে দাও। সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'বণীবায়াযা'-এর মহল্লায় উপনীত হন। সেখানে যিয়াদ এবং ফারওয়া বিন আমরও অত্যন্ত বিনীতভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে তাদের আতিথ্য গ্রহণের মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকেও ঐ একই কথা বলেন, যা বনী সালিমকে বলেছিলেন। এরপর উটনী সম্মুখ পানে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে বনী সায়েদার পক্ষ থেকে সা'দ বিন উবাদা এবং আল মান্‌যার বিন আমর, বনী হারিছের পক্ষ থেকে সা'দ বিন রাবী, খারিজা বিন যায়দ এবং

আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাও অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে তাদের আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ জানান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) সবাইকে ঐ একই কথা বলেন।

লক্ষ্যস্থল

অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনী আদী বিন নাজ্জারের মহল্লায় উপনীত হন। তাঁর পিতৃব্য আবদুল মুত্তালিবের মাতা এই খান্দানের মেয়ে ছিলেন। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অবস্থানের ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ছেড়ে দেন। কিন্তু বনী 'আদী গোত্রের সুলায়ত বিন কায়স এবং আবূ সুলায়ত বিন খারিজা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করেনঃ আমরা হলাম আপনার মাতামহের বংশের লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বলেন, তোমরা উটনীর রাস্তা ছেড়ে দাও। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট। শেষ পর্যন্ত উটনীটি বনী মালিক বিন নাজারের মহল্লার সীমানায় পৌঁছেই সেখানে বসে পড়ে। [পরবর্তী সময়ে সেখানেই মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা নির্মিত হয়েছিল] কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) উটনী থেকে অবতরণ করেন নি; বরং লাগামটি তার ঘাড়ের উপরই ফেলে রাখেন। এতে উটনী দাঁড়িয়ে যায় বটে, কিন্তু কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে পুনরায় সেই জায়গাই ফিরে আসে, যেখানে ইতিপূর্বে বসেছিল। এবার সে এমন গেট হয়ে বসে পড়ে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার দেহ অনেক নড়ালেন, কিন্তু সে এমন ভঙ্গিতে বসে থাকল, যেমন উটেরা স্থায়ীভাবে আরাম করার সময় অনড় হয়ে বসে থাকে। এরপর সে নিজের ঘাড়টিও মাটির উপর রেখে দিল। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। সেখান থেকে অদূরে ছিল হযরত আবূ আইয়ূব খালিদ বিন যায়দ আনসারীর ঘর। তিনি এগিয়ে এসে উটের পিঠের পালানটি খুলে ফেললেন এবং সৌভাগ্যক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ঘরেই অবতরণ করলেন। এতে কেউ মনে কোন ব্যথা অনুভব করল না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা উটনীর মাধ্যমে বিষয়টি ফয়সালা করে দিয়েছিলেন। তারপর যতদিন পর্যন্ত মসজিদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হুজরা তৈরী না হয়েছিল ততদিন তিনি আবূ আইয়ূবের ঘরেই অবস্থান করেছিলেন।

আবূ আইয়ূব (রা) এর আশা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ঘরের উপরে তলায়ই থাকবেন। তিনি তার কাছে এই মর্মে একটি আবেদনও করেছিলেন, আমি এটাকে বেআদবী মনে করি যে, আপনি নীচের তলায় থাকবেন এবং আমি উপরের তলায় থাকব।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বলেছিলেনঃ আমার সাথে যে সব লোক দেখা-সাক্ষাত করতে আসবে, তাদের সুবিধার জন্যই আমার নীচের তলায় থাকা উচিত। একদা ঘটনাচক্রে উপরের তলায় একটি পানির পাত্র ভেঙ্গে যায়। তখন আবূ আইয়ূব (রা) এবং তাঁর স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে সব পানি লেপ দ্বারা মেঝে থেকে চুষে নেন। ফলে এক ফোটা পানিও নীচে টপকে পড়তে পারে নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রতি এই ছিল তাঁদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। অবশ্য পরবর্তী সময়ে আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর বার বার অনুরোধের ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীচের তলা থেকে উপরের তলায় উঠে গিয়েছিলেন।

হযরত আবূ আইয়ুব (রা) এর মর্যাদা

হযরত আবূ আইয়ুব (রা) অত্যন্ত মর্যাদাশীল সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অতিথি পরায়ণতার ফলে তাঁর মযর্যাদা আরো বেড়ে গিয়েছিল। হযরত আলী (রা) এর খিলাফত কালে হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) যখন বসরার প্রশাসক ছিলেন তখন তিনি (আবূ আইয়ুব) বসরায় গেলে ইব্নে আব্বাস তাঁর জন্য আসবাবপত্রসহ নিজের গোটা বাসভবনটি খালি করে দেন এবং নিজে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। যখন হযরত আবূ আইয়ুব (রা) সেখান থেকে ফিরে আসার সংকল্প নেন তখন ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর জন্য হাদিয়া স্বরূপ বিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা এবং চল্লিশ হাজার খাদিম দান করেন।

আমীর মু'আভিয়ার খিলাফতকালে মুসলিমরা যখন কন্সটান্টিনোপলের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন তখন আবূ আইয়ুব (রা)-ও মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেন। তিনি কন্সটান্টিনোপল অবরোধ চলাকালেই ইন্তিকাল করেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসীয়ত করে যান, যেন তাঁর মৃতদেহ প্রাচীরের সন্নিকটে নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয়। মুসলিম বাহিনী তাঁর সেই অসীয়ত কার্যকর করেছিল। ইং ১৪৫৩ সনে সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ যখন কন্স্টান্টিনোপল দখল করেন তখন তিনি হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) এর সমাধিস্থলের সন্ধান বের করে সেখানে তাঁর সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন এবং সেই সাথে একটি বিরাট মসজিদও তৈরী করে দেন। বরকত ও কল্যাণ লাভের আশায় উছমানী সুলতানদের সিংহাসনে আরোহণের অনুষ্ঠান ঐ মসজিদেই সম্পন্ন করা হত।

পরবর্তীকালে হযরত আবূ আইয়ূব (রা) এর এই গৃহটি মুগীরা বিন আবদুর রহমান বিন হারিছ (রা) এক হাজার দীনারের বিনিময়ে খরিদ করে নেন এবং সেটাকে মেরামত করে মদীনার নিঃস লোকদের জন্য ওয়াক্‌ফ্ করে দেন।

অভ্যর্থনা গীতি

কুবা থেকে আপন লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এই মহান সফরেই আনসারদের নিষ্পাপ শিশুকন্যারা এই অভ্যর্থনা গীতি গাইতে থাকে–

طلع البدر علينا　　من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا　　مادعى لله داع .

'ওদা'-এর ঘাটিসমূহ থেকে পূর্ণ চন্দ্র উদিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব, যতক্ষণ দু'আকারীরা দু'আ করতে থাকবে।"[৪]

বনী নাজ্জারের মেয়েদের অভ্যর্থনাগীতি ছিল নিম্নরূপ ঃ

نحن جوارمن بنى نجار　　ياحبذامحمداًمن جار .

"আমরা হচ্ছি বনী নাজ্জারের মেয়ে। আমরা কত ভাগ্যবান যে, মুহাম্মদ (সা) আজ আমাদের প্রতিবেশী।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি আমাকে চাও? ওরা এক বাক্যে উত্তর দেয়, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তখন বলে উঠেন, আমিও তো তোমাদেরকে চাই।[৫]

হিজরী সন

হিজরী সনের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে মরহুম মাওলানাই তো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে শুধু আমার একটি নিবেদন— আর তা হলো, হযরত উমর (রা) এর খিলাফত আমলে যখন ইসলামী সন নির্ধারণের প্রশ্ন উঠে তখন হিজরতের ঘটনা থেকেই তার সূচনা করার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। কেননা এটি ছিল ইসলামী ইতিহাসের একটি বৈপ্লবিক মোড়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ত্রয়োদশ হিজরীর ৮ রাবীউল আউয়াল দুপুর বেলা কুবায় পৌঁছেন। এটা হচ্ছে নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষের শেষ দিন। ৮ রাবীউল আউয়াল থেকে চতুর্দশ বর্ষ শুরু হয়। আর এই দিন থেকে সূচনা হয় হিজরী সনের। যেন হিজরতের প্রথম বছরের মধ্যেই দু'মাস আট দিনের ঘাটতি রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাধারণ হিসাবের জন্য এর সূচনা মুহাররম থেকেই মেনে নেওয়া হয়–যদিও কোন কোন ব্যক্তি হিসাবটিকে অধিক থেকে অধিকতর সঠিক রাখার জন্য হুযূর (সা) এর মদীনায় পৌছার দিন থেকেই গণনা শুরু করা জরুরী বলে মনে করেছিল। পরবর্তীতে বেশ কয়েক জায়গায়ই এর উল্লেখ আসবে-ইনশাআল্লাহ্।

টীকা ঃ

(১) কুলসূম বিন আল হিদাম অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মদীনা আগমনের সামান্য কিছু দিন পরই তিনি ইনতিকাল করেন।

(২) 'উযাব' হচ্ছে 'আযব' (আইন, যা, বা) এর বহুবচন। 'আযব' বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যার কোন স্ত্রী নেই। পরিশেষে এ কথাটি বলে রাখতে চাই যে, মুহাম্মদ আসিম সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী (পরবর্তীকালে) মসজিদে কুবা সংলগ্ন দক্ষিণে অর্থাৎ কিবলা অভিমুখে দুটি গৃহ নির্মিত হয়েছে, যেগুলোর ছাদ গুম্বজ আকারের। বলা হয়ে থাকে যে, এর মধ্যে একটি ঘর সেই জায়গায় নির্মিত হয়েছে, যেখানে কুলসূম বিন আল হিদাম-এর ঘর ছিল। আর অপর একটি নির্মিত হয়েছে সেই জায়গায় যেখানে সা'দ বিন খায়ছামা বসবাস করতেন (সফরনামা-ই-আরদুল কুরআন ঃ পৃষ্ঠা-২০৩)

(৩) এ খুতবাটি তাবারীর রেফারেন্সে ইবনে কাছরীও বর্ণনা করেছেন। মরহুম কাযী সুলায়মানের 'রাহমাতুল লিল আলামীন' এর প্রথম অংশেও এ ভাষণটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

(৪) মরহুম কাযী সুলায়মান মানসূরপূরী 'তালাআল বাদরু' এর স্থলে 'আশরাকাল বাদরু' লিখেছেন। তাছাড়া উপরোক্ত দুটি কবিতার সাথে তিনি নিম্নের পংক্তিগুলোও যুক্ত করেছেন।

ايها المبعوث فينا　　　جئت بالامر المطاع .

হে আল্লাহ্র প্রেরিত ব্যক্তি, আপনি আমাদের মধ্যে অবশ্য পালনীয় হুকুম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।

"ছানিয়াতুল ওদা"-এর অর্থ কুবার দক্ষিণ দিকের পাহাড়, লোকজন অতিথিদেরকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য যার ঘাটিসমূহ পর্যন্ত এগিয়ে যেত। এরকম একটি স্থান মদীনার উত্তর পার্শ্বেও ছিল। মরহুম মওলানা শিবলী বলেন, সেদিন আনন্দ উল্লাসে মদীনাবাসীরা এতই মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল যে, পর্দানশীন মেয়েরাও ছাদের উপর বেরিয়ে পড়ে এবং এই গীতি কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে। [সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-২৫৮)

(৫) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-২৫৯।

মাদানী জীবন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মাদানী জীবনের প্রারম্ভিক যুগ

মস্‌জিদুন্নবী (সা)

স্থায়ী অবস্থান স্থলে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বপ্রথম কুবার ন্যায় এখানেও একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার সত্যিকার পুণ্যবান বান্দাদের কাছে প্রত্যেকটি জনবসতিতে এই ইমারত (মসজিদ)-ই হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সালাতের মাধ্যমে এখানেই সে তার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর সাথে দৈনিক অন্তত: পাঁচবার সংযোগ সৃষ্টি করে। হযরত আবূ আইয়ূব (রা)-এর ঘরের সামনে একটি জায়গা খালি পড়েছিল। সেখানে ছিল কিছু ঝোপঝাড় কয়েকটি খেজুর বৃক্ষ এবং সেই সাথে মুশরিকদের কয়েকটি কবর বা সমাধিসৌধ। সেখানে প্রয়োজনে উটও বসিয়ে রাখা যেত এবং খেজুরও শুকানো হত। যে কোন জনবসতিতে বাসগৃহসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে কিছু জায়গা খালি পড়ে থাকলে পাড়াপ্রতিবেশীরা সাময়িকভাবে নিজেদের বিভিন্ন কাজে তা ব্যবহার করেই থাকে। এ জায়গাটি ছিল বনী নাজ্জারের সাহ্ল ও সুহায়ল নামক দু'টি য়াতীমের। তাদের পিতার নাম ছিল আমর। ঐ য়াতীমদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হযরত আসআদ বিন যুরারাহ (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ জায়গাটি মসজিদের জন্য খুবই উপযুক্ত বিবেচিত হয়। তাই তিনি অর্থের বিনিময়ে সেটি খরিদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে শুধু গোটা বনী নাজ্জারই নয়, বরং ঐ জায়গার মালিকরাও সন্তুষ্টচিত্তে তা মসজিদের জন্য হেবা (দান) করার ইচ্ছা ব্যাক্ত করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা হেবা হিসাবে গ্রহণ না করে তার সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দেন। এরপর তা পরিষ্কার ও সমতল করে তাতে পবিত্র মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং আগাগোড়া এর নির্মাণকাজে নিজেও শরীক থাকেন।

কাঁচা ইট ও পাথর দ্বারা মসজিদের প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। তারপর খেজুর গাছের শাখা দিয়ে তৈরী ছাপড়া, ছাদের উপর বসিয়ে তার উপর মাটি বিছিয়ে দেওয়া হয়। স্তম্ভ তৈরীর কাজে খেজুর বৃক্ষই ব্যবহার করা হয়। মাটির মেঝে ছিল কাঁচা। যখন বৃষ্টি হত এবং ছাদ দিয়ে পানি টপ্‌কাত তখন সমস্ত মেঝে কর্দমাক্ত হয়ে উঠত।

মদীনা মুনাওওরায় যেখানে কোন নদীনালা প্রবাহিত হত সেখানে স্রোতের টানে মাটির নীচে থেকে লাল রংয়ের ক্ষুদ্রকায় অতি স্বচ্ছ মসৃণ এক ধরনের নুড়ি পাথর বেরিয়ে আসত। এই পাথর এখনো মসজিদ মুবারকের আঙ্গিনায় পরিলক্ষিত হয়। সাহাবা কিরাম (রা) এই সব নুড়ি পাথর থলেতে ভরে নিয়ে আসতেন এবং তা দিয়ে মসজিদের মেঝে ক্রমে ক্রমে এমনভাবে শুকনো-মজবুত করে তোলা হয় যে, এর পর ছাদ থেকে পানি টপকালেও তা আর কর্দমাক্ত হয়ে উঠত না।

পরবর্তী রদবদল

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এর খিলাফতকালে মসজিদ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হলে তা পুনরায় নতুন করে পূর্বের মতই নির্মাণ করা হয়। হযরত উমর (রা) এর খিলাফতকালে মসজিদটি বিস্তৃত করার প্রয়োজন দেখা দেয়ায় সেভাবেই সেটির আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। হযরত উছমান (রা) এর খিলাফতকালে চুনার সাথে নক্‌শা করা পাথর

মিশিয়ে পাকা প্রাচীর নির্মাণ করা হয় এবং ছাদের জন্য সেগুন কাঠ ব্যবহার করা হয়। ক্রমে ক্রমে মসজিদটির ব্যাহ্যিক চাকচিক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওলীদ বিন আবদুল মালিক সেটিকে একটি বিরাট ইমারতে রূপান্তরিত করেন। আব্বাসী আমলে মসজিদটির আয়তন আরো বৃদ্ধি করা হয়। মিসরের বাদশাহগণও ইমারতটির সৌন্দর্য বর্ধনে অংশগ্রহণ করেন। উসমানী সুলতানদের আমলে যে ইমারত নির্মিত হয়েছিল তার একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, হালকা নজরে তাকালে ইমারতটির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হত না, কিন্তু স্তম্ভগুলো এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে, সেগুলোর মাধ্যমে পূর্বতন প্রত্যেকটি যুগে, মসজিদের আয়তন কিরূপ ছিল তা অতি সহজেই অনুমান করা যেত। শেষবারের মত মসজিদটির আয়তন বৃদ্ধি করা হয় সাউদী আমলে। এতে ইমারতটি উত্তর দিকে দৈর্ঘপ্রস্থে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উছমানীদের আমলে মসজিদেরই 'বাব' বা দরজা ছিল পাঁচটি। 'বাবু জিবরীল' ও 'বাবুন্ নিসা' ছিল পূর্বদিকে, 'বাবুস্ সালাম' এবং 'বাবুর রাহমাত' পশ্চিম দিকে এবং 'বা-বু মাজীদ' উত্তর দিকে। এখন দরজার সংখ্যা দশটি। পূর্বদিকে 'বা-বু আবদুল আযীয' উত্তর দিকে 'বা-বু উছমান' ও 'বা-বু উমর বিন খাত্তাব' এবং পশ্চিম দিকে 'বা-বু সিদ্দীক' ও 'বা-বু সাউদী'-এই মোট পাঁচটি দরজা পরবর্তীকালে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীগণের হুজরাসমূহ

পবিত্র মসজিদ নির্মাণের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) আপন সহধর্মিণীদের জন্য হুজরা নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। মসজিদ নির্মাণের সময় তার দুজন সহধর্মিণী ছিলেন–একজন সাওদা (রা) এবং অপরজন হযরত আইশা (রা)। অতএব মসজিদের পূর্বদিকে শুধুমাত্র দু'টি হুজরা নির্মিত হয়, যেগুলোর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ ছিল ১৫ফুট এবং প্রস্থ ছিল ১০ ফুট। হুজরাগুলোর দেওয়াল ছিল কাঁচা। সেগুলোর খেজুর শাখার তৈরী ছাদ এই পরিমাণ উঁচু ছিল যে, কোন মানুষ হুজরায় দাঁড়িয়ে উপর দিকে হাত উঠালে তা ছাদে গিয়ে ঠেকত। প্রথম প্রথম ঝোলানো থাকতে। এরপর তাতে কপাট লাগানের ব্যবস্থা করা হয়। রাতের বেলা সাধারণত: হুজরাগুলোতে প্রদীপ জ্বলত না।

এরপর সহধর্মিণীদের সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে ততই হুজরার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। মসজিদের পূর্ব দিকে যখন আর জায়গা বাকি ছিল না তখন উত্তর দিকে ক্রমান্বয়ে হুজরা তৈরী হতে থাকে। কিছু সংখ্যক হুজরা মসজিদের দক্ষিণ দিকেও ছিল। পূর্ব দিকে খুব সম্ভবত: হযরত আয়েশা ও হযরত সাওদা (রা) এর হুজরার মাঝখানে একটি হুজরা হযরত ফাতিমা (রা) এরও ছিল। এই সব হুজরার অবস্থা মোটামুটিভাবে একই ধরনের ছিল। হয় সেগুলোর দেওয়াল ছিল কাঁচা, নয়ত খেজুরের ডাল খাড়া করে তার উপর মাটির লেপ দেওয়া। হযরত আবূ বকর (রা) এর ঘর মসজিদের পশ্চিম দিকে সেই স্থানে ছিল, যেখানে বর্তমানে 'বাবে সিদ্দীক' রয়েছে।

স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হিফাযতের ব্যবস্থা

এখন ঐ হুজরাগুলোর কোনটিই আর অবশিষ্ট নেই। উমাইয়া খলীফা ওলীদ বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে মসজিদের আয়তন বৃদ্ধির জন্য যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সহধর্মিণীগণের হুজরাগুলো ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছিলো তখন মদীনাবাসী অঝোরে ক্রন্দন করতে থাকে। তাঁরা বলছিলেন, হায়! যদি এই হুজরাগুলো তাদের আসল অবস্থায় সংরক্ষণ করা হত তাহলে বিশ্ববাসী চিরদিন দেখতে পেত আমাদের নবী (সা) এর পবিত্র জীবন ছিল কতই না অনাড়ম্বর ও সহজ সরল। অবশ্য হযরত আয়েশা (রা) এর হুজরার শুধুমাত্র সেই অংশটি সংরক্ষিত আছে, যেখানে হুযূর (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক এবং হযরত উমর ফারুক (রা) এর পবিত্র সমাধিগুলো রয়েছে। অংশটি হযরত আয়েশা (রা) এর হুজরার ঐ অংশ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি বসবাস করতেন। যতদিন হযরত আয়েশা (রা) জীবিত ছিলেন ততদিন কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর দুই সাথী হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) এর উপর সালাম নিবেদন করার উদ্দেশ্যে ভিতরে যাওয়ার ইচ্ছা করলে তাকে সেজন্য হযরত আয়েশা (রা) এর কাছে

থেকে অনুমতি নিতে হত–অন্যথায় বাইরে দাঁড়িয়েই সালাম নিবেদন করে ফিরে যেতে হত। ১৭ রমযান, হিঃ ৫৮ যহরত আয়েশা (রা) ইন্তিকাল করলে তাঁর হুজরার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

হিঃ ৮৮ সনে (ইং ৭০৬ সনে) হযরত উমর বিন আবদুল আযীয মদীনা মুনাওরার গভর্ণর ছিলেন। তিনি হুজরাগুলোর চতুর্দিকে পঞ্চকোণ বিশিষ্ট দেওয়াল নির্মাণ করেন এবং সেগুলোর ছাদ ফেলে দিয়ে তার উপর পিতলের তৈরী জাল বিছিয়ে দেন। ঐ ইমারতে না ছিল কোন দরজা, আর না কোন জানালা। এরপর হযরত উমর বিন আবদুল আযীয-এর তৈরী ইমারতের বাইরের দিকে কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়ে একটি চতুষ্কোণাকার ইমারত নির্মাণ করা হয়, যার উপর বর্তমান সবুজ গম্বুজটি দাঁড়িয়ে আছে। একে 'কুব্বা-ই খাযরা' বলা হয়। আসল ব্যাপার এই যে, গম্বুজের উপর সীসার মোটা চাদর (শীর) বিছিয়ে তার উপর গাঢ় সবুজ রং মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল, যেন বৃষ্টির পানি গম্বুজের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে না পারে। পঞ্চকোণাকার ইমারতের দেওয়ালসমূহ অতি মনোরম পর্দায় ঢাকা রয়েছে। এর অভ্যন্তরের হুজরাটি আপন আসল রূপে এখনো সংরক্ষিত আছে। মরহুম কাযী সুলায়মান মানসূরপুরী যখন প্রথমবার হজ্জ করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি সে জায়গাটি পুরোপুরি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার পর লিখেছিলেন ঃ

হযরত রাসূলে আকরম (সা) এর কাঁচা হুজরাটি এখনো তার আসলরূপে ও মূল অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। বিশ্বের অন্য কোন নবী-রাসূলের ঘরের এবং কবরের হিফাযত স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এভাবে কখনো হয় নি।

সুফ্ফা ও আসহাবে সুফ্ফা

মসজিদের পূর্বচত্বরে আঙ্গিনার ভিতরেই একটি চবুতারা (চত্বর, চাতাল) বানিয়ে তার উপর একটি চাঁদোয়া (চন্দাতপ) লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই চাঁদোয়াকে বলা হত সুফ্ফা। এখানে ঐ সমস্ত মুহাজির কালাতিপাত করতেন যাদের কোন কাজ-কারবার বা ঘরবাড়ী ছিল না। তাঁদের বেশীর ভাগ সময় ইবাদত বন্দেগী, তিলাওয়াতে কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কল্যাণময় সংস্পর্শে কেটে যেত। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বাণীসমূহ শুনতেন, সেগুলোকে সংরক্ষণ করতেন এবং অন্যের কাছেও তা পৌঁছিয়ে দিতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ছিলেন অন্যতম। সাহাবীগণ গাছ থেকে খেজুরের ছড়া ভেঙ্গে এনে মসজিদের খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখতেন। কিন্তু আসহাবে সুফ্ফা তা থেকে শুধুমাত্র ঐসব খেজুরই খেতেন যা ছড়া থেকে নীচে টপকে পড়ত। মাওলানা শিবলী বলেন–

আঁ হযরত (সা) এর কাছে যখন কারো কাছ থেকে সদকার খাবার আসত তখন তিনি তার সবটুকুই আসহাবে সুফফার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আর যখন তাঁর কাছে দাওয়াতের (হাদিয়ার) খাবার আসত তখন আহসাবে সুফ্ফাকে ডেকে পাঠাতেন এবং তাঁদের সাথে বসে ঐ খাবার খেতেন। প্রায়ই এমন হত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতের বেলা আসহাবে সুফ্ফাকে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। অর্থাৎ তাঁদেরকে বলতেন, যেন তাঁরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আসহাবে সুফ্ফার মধ্য থেকে এক অথবা দু'জনকে নিজেদের সাথে করে নিয়ে যান এবং তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা করেন ..।[২] আসহাবে সুফ্ফার জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল, যার কাছে তারা নিয়মিত বিদ্যশিক্ষা করতেন। ফলে তাঁদের অধিকাংশকেই 'কারী' বলা হত। ইসলামের দাওয়াতের জন্য কাউকে কোথাও পাঠানোর প্রয়োজন হলে, ঐ কারীদেরকেই পাঠানো হত। বি'-রে মাউনার ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট, সত্তরজনই ছিলেন আসহাবে সুফ্ফার লোক।[৩]

আযান

সালাতের সময় তো প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট ছিল; কিন্তু নামাযীদের আহ্বান করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সাহাবা কিরাম নিজে থেকেই অনুমানের উপর ভিত্তি করে সালাতের জন্য মসজিদে এসে হাজির হতেন। তাঁদের মধ্যে যারা আগেভাগে মসজিদে এসে যেতেন তাদেরকে অন্যান্যদের আগমনের অপেক্ষা করতে হত। অন্যান্য ইসলামী

ইবাদতের ন্যায় সালাতের প্রকৃত মর্যাদাও জামাআত এর মধ্যেই পরিস্ফুট হওয়ার ছিল। সালাতের জন্য আহ্বানের ধারাবাহিকতায় য়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের অনুকরণে বাদ্য-শঙ্খ অথবা ঘণ্টা বাজিয়ে আহ্বান করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কিন্তু এ ধরনের কোন প্রস্তাবই সাহাবীদের মনঃপূত হচ্ছিলো না। হযরত উমর (রা) এই মর্মে একটি প্রস্তাব পেশ করেন যে, এমন একজন ঘোষক নিয়োগ করা হোক, যে নির্দিষ্ট সময়ে সকলকে সালাতের জন্য আহ্বান জানাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর (রা) এর ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। এরপর আবদুল্লাহ্ বিন যায়দ বিন ছা'লাবা খাযরাজী নিবেদন করেন ঃ আমি স্বপ্নের মধ্যে আযানের জন্য কিছু শব্দের নির্দেশ পেয়েছি। ঠিক এ ধরনের একটি স্বপ্ন হযরত উমর (রা) ও দেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, বিলালের কণ্ঠস্বর উঁচু। তাকে এই শব্দগুলো শিখিয়ে দাও। সে আযান দিলে তার আওয়াজ দূর দূরান্তে গিয়ে পৌঁছবে।

সালাতের রাক'আতের মধ্যে পরিবর্ধন

সালাত ফরয হয়েছিল মক্কা মু'আয্যামায়। কিন্তু মাগরিব ছাড়া সব সালাতেরই রাক'আতের সংখ্যা ছিল দুই। শুধুমাত্র মাগরিবের সালাতই প্রথম থেকে তিন রাক'আত নির্দিষ্ট ছিল। এরপর যুহ্‌র 'আসর ও 'ইশার সালাত দু দু' রাকআতের পরিবর্তে চার চার রাক'আত নির্দিষ্ট করা হয়। ফজর ও মাগরিবের রাক'আতের সংখ্যা পূর্বের মতই বহাল থাকে। তবে সফর কালীন সময়ে মাগরিব ছাড়া সব ওয়াক্তের সালাতই ছিল পূর্বের ন্যায় দু দু' রাক'আত। লক্ষ্য করুন, জামাআতী (সমষ্টিগত) জীবনের প্রক্রিয়া শুরু হতেই কিভাবে এক একটি বিষয় পরিপূর্ণ হতে থাকে।

কিবলা পরিবর্তন

ইসলামের সূচনা কাল থেকেই বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই সালাত আদায়ের নির্দেশ ছিল। বায়তুল মুকাদ্দাসেরঅবস্থান মক্কা মুকাররমা থেকে উত্তর দিকে। মক্কায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সালাত আদায় করতেন তখন এমন এক স্থানে দাঁড়াতেন যেখানে থেকে দুটি কিবলাই (বায়তুল হারাম ও বায়তুল মুকাদ্দাস) তাঁর সামনে থাকে। কিন্তু মদীনায় হিজরত করার পর উভয় কিবলাকে সামনে রেখে সালাত আদায়ের কোন সুযোগ আর বাকি রইল না। কেননা মদীনা মুনাওওরা ছিল বায়তুল মুকাদ্দস থেকে উত্তর দিকে এবং বায়তুল হারাম ছিল (কাবা) দক্ষিণ দিকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আশা পোষণ করতেন, যেন কা'বাই সেই পবিত্র ঘর হিসাবে মনোনীত হয়, যা ছিল বিশ্বে আল্লাহ্‌র ইবাদতের সর্বপ্রথম ঘর এবং যা হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ) এর নির্মাণে স্থায়ী মর্যাদালাভ করেছিল। বস্তত: মদীনা মুনওওরায় প্রারম্ভিব ষোল সতেরো মাস বায়তুল মুকাদ্দাসই যথারীতি কিবলা হিসাবে বহাল থাকে। কিন্তু শা'বান, হিঃ ২ সনে (ফেব্রুয়ারী, ইং ৬২৪ সনে) অথবা এর কিছু পূর্বে কাবা 'কিবলা' হিসাবে মনোনীত হয়ে যায়। ফলে ইসলাম ইবরাহীমী কেন্দ্রের দিকে মোড় নেয়। ঐ সময় থেকেই যাবতীয় মসজিদের দিক কা'বার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। মদীনা মুনাওওরায় এখন পর্যন্ত এমন একটি মসজিদ আছে, যার মধ্যে সাময়িক কিবলা (বায়তুল মুকাদ্দাস) এবং ভবিষ্যৎ কিবলা (কা'বা মুকাররমা) উভয়ের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। তাই এটাকে 'মসজিদ কিবলাতায়ন' বলা হয়।

রোযা ফরয হলো

হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে এবং বদর যুদ্ধের পূর্বে রমযান শরীফের রোযা ফরয করা হয়। এই পবিত্র মাসেই কুরআন নাযিল হওয়ার সূচনা হয়েছিল।

যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ .

"রমযান মাস, এতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে" -(২ঃ১৮৫)

রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা অবশ্যই রাখতেন। মদীনা মুনাওওরায় তিনি য়াহূদীদেরকে আশূরার রোযা রাখতে দেখে বলেন, যেহেতু এই দিন হযরত মূসা (আ) এবং বনী ইসরাঈলকে ফিরআউনদের জুলুম অত্যাচার থেকে নাযাত দেওয়া হয়েছিল তাই আমরাই এই রোযা রাখার অধিকতর হকদার। এর পর আল্লাহ্ তা'আলা রমযান মাসের রোযা ফরয করে দেন। এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (সা) নফল রোযা রাখতেন এবং এক্ষেত্রে সাহাবা কিরাম (রা) ও তাঁকে অনুসরণ করতেন। ...... রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র ইচ্ছা এই ছিল যে, পুণ্যকর্ম সম্পাদনে যেন মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হয়, যাতে করে জীবনের যাবতীয় অযীফা (দৈনন্দিন কাজকর্ম) সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, পুণ্যার্জনের জন্য সকল সময় মন উদগ্রীব থাকে এবং কোন কাজ কোন দিক দিয়েই বোঝা স্বরূপ মনে না হয়। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ব্যাপার ছিল এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা।

দুই বিরাট ব্যক্তির ইনতিকাল

মদীনা মুনাওওরায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর আগমনের কিছু দিন পরই কুলসূম বিন আল হিদাম ইনতিকাল করেন। এই কুলসূমই কুবায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর আতিথ্যের সুযোগ পেয়ে চিরধন্য হয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন। এরপর আস'আদ বিন যুরারাহ (রা) ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন ঐ ছয়জন মহান ব্যক্তির অন্যতম, যাদের সাথে মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর যোগাযোগ সৃষ্টি হওয়ার পর ইসলাম প্রচারের একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর পথ বেরিয়ে এসেছিল। এই আস'আদ (রা) একাধারে আকাবা-ই-উলা ও আকাবা-ই-ছানিয়ায় শরীক ছিলেন। আকাবা-ই-ছানিয়ায় যে বারোজন 'নকীব' (প্রতিনিধি) নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইসলামের মু'আল্লিম হিসাবে তার ওখানেই হযরত মুস'আব বিন উমায়র (রা) এর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মোটকথা, তাঁরই সক্রিয় চেষ্টায় ইয়াছরিবে দ্রুত ইসলামের প্রসার ঘটে। তাঁর ওখানে জুমু'আর সালাতও অনুষ্ঠিত হত।

এ দু'টি মৃত্যু য়াহূদী এবং দু'দিল বান্দা (দ্বিধাগ্রস্ত অন্তরের) মুসলমানদের পরীক্ষার কারণে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,

لَاأَمْلِكُ لِنَفْسِىْ وَلَا لِصَاحِبِىْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا .

"আমার নিজের জন্য কিংবা আমার বন্ধু বান্ধবদের জন্য আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু করার কোন ইখতিয়ার আমার নেই"।

হযরত আস'আদ (রা)-এর মৃত্যুর পর বনী নাজ্জার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে নিবেদন করেঃ আপনি তাঁর স্থলে অন্য কাউকে নকীব নিয়োগ করুন। হুযূর (সা) তখন বলেন, আপনারা হচ্ছেন আমার মাতামহের বংশের লোক। আপনাদের যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করার জন্য আমি স্বয়ং বিদ্যমান রয়েছি এবং আমিই আপনাদের নকীব।

আহলে বায়তের আগমন

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা (রা) ও স্বীয় কন্যাগণকে নিয়ে আসার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যায়দ (রা) কে পাঁচশত দিরহাম দিয়ে মক্কা পাঠান।জ্যেষ্ঠা কন্যা হযরত যয়নাব (রা) এর বিয়ে তার খালাত-ভাই-আবুল আস বিন রবী এর সাথে হয়েছিল। তিনি তখন পর্যন্ত মুসলমান হননি। এজন্য তাঁকে আটকিয়ে রাখেন। দ্বিতীয় কন্যা হযরত রুকাইয়া (রা) এর বিয়ে হযরত উসমান (রা) এর সাথে হয়েছিল। তিনি তখন স্বামীর সাথে আবিসিনীয়ায় ছিলেন। হযরত 'আইশা (রা) এর বিয়ে হয়েছিল কিন্তু তাঁর রুখ্সাতী (স্বামীগৃহে আসা) হয়নি। হযরত যায়দ মক্কা মুকাররমা পৌছে হযরত সাওদা (রা) হযরত উম্মু কুলসূম (রা) ও হযরত ফাতিমা (রা)-কে নিয়ে আসেন। হযরত আইশা স্বীয় ভাই আবদুল্লাহ্ ও অন্যান্যদের সাথে মদীনা আসেন।

আবদুল্লাহ্ বিন সালাম

আবদুল্লাহ্ বিন সালাম, যার আসল নাম ছিল হুসায়ন, তিনি মদীনা মুনাওওরায় একজন অতি জ্ঞানী ও ঐশ্বর্যশালী য়াহূদী ছিলেন। পুণ্য-প্রকৃতি ও পবিত্রচিত্ততার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কথা শুনতেই তিনি ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েন। কুবায় যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে দেখতে যান তখন নিজের পরিবার পরিজনসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি কামনা করছিলেন যেন সমগ্র য়াহূদী সমাজ তার দেখাদেখি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। তিনি এ ব্যাপারে একটি কৌশলও অবলম্বন করেছিলেন। আর তা ছিল এই যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে নিবেদন করেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি কার্যত: আমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করবেন না। আমি আত্ম গোপন করে থাকি। আপনি য়াহূদীদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। যদি তারা আমার সম্পর্কে ভাল করে তাহলে আপনি বলুন, আচ্ছা সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে কি তোমরাও ইসলাম গ্রহণ করবে?

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা) নেতৃস্থানীয় য়াহূদীদেরকে ডেকে পাঠিয়ে প্রথমে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। এরপর হুসায়ন (আবদুল্লাহ্) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। য়াহূদীরা জবাব দিল, তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার পুত্র। এই সংগে তারা তার জ্ঞান এবং বিজ্ঞতারও প্রশংসা করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে তোমরাও কি তার অনুসরণ করবে? তারা উত্তর দেয়, আল্লাহ্র পানাহ্, এটা কি কখনো সম্ভব যে, হুসাইন ইসলাম গ্রহণ করবে? ইত্যবসরে হুসায়ন আড়াল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং আপন স্বজাতীয়দেরকে বুঝিয়ে বলেন, 'মুহাম্মদ (সা) হচ্ছেন সেই নবী, যার উল্লেখ আমাদের আসমানী কিতাবসমূহে রয়েছে। তোমরা এ বিষয়টি অস্বীকার করতে যেয়ো না।' য়াহূদীরা একথা শুনে প্রথমে একেবারে থ' হয়ে গেলেও পরবর্তী মুহূর্তে নিজেদের সামলে নিয়ে বলে উঠে, তার কথা আমরা মানি না। এ হচ্ছে মিথ্যাবাদী। যা হোক বিশিষ্ট য়াহূদীদের মধ্যে হুসায়ন অত্যন্ত আগ্রহের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ইসলামী নাম রাখেন আবদুল্লাহ্।

মুখাইরিকের ইসলাম গ্রহণ

মুখাইরিকও একজন বিত্তশালী এবং বিশিষ্ট য়াহূদী ছিলেন। তিনিও প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধের মুহূর্তে তিনি তাঁর স্বজাতীকে বলেছিলেন, মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। য়াহূদীরা উত্তরে বলেছিল, আজ 'সাব্ত্' অর্থাৎ শনিবার তথা সাপ্তাহিক পর্বের দিন।[৪] ওদের এ উত্তর শুনে মুখাইরিক অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়েন। যাবার সময় তিনি অসীয়ত করে যানঃ যদি আমি নিহত হই তাহলে আমার অধিকারে যা কিছু আছে তার সবই যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে পেশ করা হয়।

ঘটনাক্রমে উহুদ যুদ্ধেই মুখাইরিক শাহাদত বরণ করেন। ফলে মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি যে অসীয়ত করে ছিলেন সেটাকে যেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজের রক্তসীল দিয়ে সত্যায়িত করে গেলেন।

পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً ۔

"মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, ওদের কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।"– (৩৩ ঃ ২৩)

হযরত সালামন ফারসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত সালমান (রা) ও ইসলাম গ্রহণ করেন। সত্যের সন্ধানে সীমাহীন কষ্ট স্বীকার এরপর তাতে আশানুরূপ সাফল্য অর্জনের এটি একটি বিস্ময়কর ঘটনা। সালমান (রা) এর জন্মভূমি ছিল ইরানের বিখ্যাত কেন্দ্রীয় শহর ইস্‌পাহানের শহরতলীতে। তার পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত জমিদার। পুত্রকে যারপর নেই ভালবাসতেন বলে তিনি কখনো তাকে চোখের আড়াল করতেন না, বরং সব সময় ঘরের মধ্যে আটকে রাখতেন। একদা সালমান (রা) কোন এক সুযোগে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। তিনি খ্রীস্টানদের একটি গির্জার নিকট দিয়ে যাবার সময় তাদের উপাসনার নিয়ম-পদ্ধতি দেখেন এবং তা তার কাছে অগ্নি-উপাসকদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর মনে হয়। তিনি তার পিতার কাছে (যেহেতু তিনি ছিলেন অগ্নি উপাসক) এ বিষয়টির উল্লেখ করলে তিনি তাকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে ঘরের মধ্যে আটকে রাখেন। কিন্তু সালমান (রা) এই অবস্থায়ও গোপনে গোপনে খ্রীস্টানদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার মানসে সিরিয়া যাবার সংকল্প নেন। তিনি অতি সংগোপনে আপন গৃহ পরিত্যাগ করেন এবং সিরিয়ায় গিয়ে একজন বিশপের ঘরে কিছুদিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি মুসেল[৫], নাসীবাইন[৬] ও আমূরিয়া[৭] সফর করেন। আমূরিয়ারই জনৈক পবিত্রচেতা খ্রীষ্টান তাকে এই মর্মে ওসীয়ত করেন যে, দ্বীনে ইবরাহীমী নিয়ে শীঘ্রই একজন নবী আবির্ভূত হবেন। অতএব তুমি তাঁর সন্ধানে আরবের দিকে যাও। তিনি সালমান (রা) এর কাছে আরবের ইয়াছরিব শহরের এমন কিছু কিছু নিদর্শনও বর্ণনা করেন, যেগুলোর মাধ্যমে অনুমান করা হয় যে, সেখানে ঐ প্রতিশ্রুত নবী আবির্ভূত হবেন। সালমান (রা) আরব অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু যে কাফেলার সাথে তিনি এসেছিলেন সেই কাফেলারই নেতৃস্থানীয় কিছু লোক তাকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে ফেলে। এরপর বনী কুরায়যার জনৈক য়াহূদী সালমান (রা) কে ক্রয় করে মদীনায় নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে যখন মদীনায় পৌঁছেন তখন প্রথম দিকেই সালমান (রা) তাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আপন ঐকান্তিক আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। এরপর হুযূর (সা)-এর নির্দেশ মুতাবিক য়াহূদীর সাথে আলাপ করে নিজের মুক্তিলাভের ব্যাপারে শর্ত নির্ধারণ করে নেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সাহাবা কিরাম-বিশেষ করে হুযূর (সা) এর সাহায্যে ঐ শর্তগুলো পূরণ করে দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেন। খন্দক যুদ্ধে হযরত সালমান (রা)ও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মদীনা শহর রক্ষার জন্য ঐ উপলক্ষে খন্দক খননের প্রস্তাব তিনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে পেশ করেছিলেন। (সংকলক)

টীকা ঃ

(১) সফরনামা–ই-হিজায (ইল্‌হা ইলা সাবীলির রাশাদ)ঃ পৃষ্ঠা–২৪৬।

(২) সীরাতুন্নবীঃ প্রথম খন্ডঃ পৃষ্ঠা–২৭২।

(৩) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা– ২৭৩।

(৪) উহুদ যুদ্ধ ১৫ শাওয়াল , হিঃ ৩ সনে (৩১ মার্চ, ইং ৬২৫ সনে) সংঘটিত হয়েছিল। ঐ দিন ছিল শনিবার তথা য়াহূদীদের সাপ্তাহিক পর্বের দিন। তবে পর্বের দিনে ধর্মের জন্য যুদ্ধ করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল না। আসলে য়াহুদীরা এ দিনটিকে ওজর এবং বাহানা হিসাবে ব্যবহার করেছিল।

(৫) ইরাকের বিখ্যাত শহর,যা ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত।

(৬) ইরাকের একটি দ্বীপ। উত্তর ইরাকের একটি ছোট্ট নদীর নাম হারাস, যা উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে ফুরাতের সাথে মিলিত হয়েছে। এই নদীর সূচনা অংশে নাসীবাইন অবস্থিত। এটাকে ইরাকেরই একটি শহর বলা যায়।

(৭) আমূরিয়া হচ্ছে আনাতোলিয়ার (এশিয়া মাইনর) একটি প্রাচীন শহর, যা আব্বাসী খলীফা মুতাসিমের আমলে মুসলমানদের হাতে বিজিত হয়।

আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

তামীরে মিল্লাতের ভিত্তি প্রস্তর

لَوْاَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ. (الانفال :٦٣)

"পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও আপনি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন।"–(৮ঃ৬৩)

'তাযকিয়া–ই-আখলাক' তথা চরিত্র সংশোধনের নবী সুলভ কর্মপদ্ধতি

মওহুম মাওলা(আবুল কালাম আযাদ) বলেন, "মানুষের জন্য বিশ্বে কোন কাজ এর চাইতে অধিকতর কঠিন নয় যে, সে পরস্পর বিছিন্ন মানুষের অন্তর সমূহকে একই সূতায় গেঁথে দেবে। আর একাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে যখন ব্যাপারটি ঐসব মানুষকে কেন্দ্র করে হয়, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে আসছে এবং তাদের মন-মানসিকতার ছাঁচের মধ্যে পরস্পর প্রেমভালবাসা ও আন্তরিকতার কোন রূপ-রং বাকি থাকে নি।"

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব এ ধরণের মানুষের মধ্যেই হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দাওয়াতের দশ বারো বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই ওদের মধ্যে এমন একটি দলের সৃষ্টি হল যারা এক্ষেত্রে ছিল সম্পূর্ণ নতুন ধাতে গড়া। তারা যতক্ষণ ইসলাম গ্রহণ করেনি ততক্ষণ ছিল পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষের যেন এক একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি। কিন্তু যখনই তারা ইসলাম গ্রহণ করল তখনই তাদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও আনুকল্য প্রদানের এমন পূত-পবিত্র মনমানসিকতার সৃষ্টি হল যে, তারা তখন আর পরস্পরের জন্য সবকিছু বিলিয়ে দিতে মোটেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল না।"

প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে সেই নবী সুলভ 'তাযকিয়া-ই-আখলাক' বা চরিত্র সংশোধনের কর্মধারা, যা ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দ্বারা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এ থেকে এও বুঝা যায় যে, মুসলমানদের পরস্পর ভালবাসা এমন একটি নিঁমাত, যেটাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের একটি বিশেষ দান হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আক্ষেপ তাদের জন্য যারা এই নিঁমাত থেকে বঞ্চিত হয়ে অনুভব করছে না। আজ পরস্পর প্রেম-ভালবাসার স্থলে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ যেন মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এটাকেই বলে অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন। (তরজমান দ্বিতীয় খন্ড পৃ ঃ–৬৯-৭০)

নও-মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

ইসলামের দাওয়াত পরস্পর ভালবাসা ও মিল-মুহাব্বতের যে প্রাণ মানুষের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিল তার একটি বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব দিক ইতিহাস আজো সংরক্ষণ করে রেখেছে। আর এটা হচ্ছে নও মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব

বন্ধন স্থাপন। এটাকে আরবী ভাষায় বলে 'মুআখাত'। অর্থাৎ ইসলামের সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করে একজন নওমুসলিম অপর একজন নওমুসলিমের ভাইয়ে পরিণত হত। এরপর তারা সব ব্যাপারে একে অন্যের শরীক হয়ে যেত, যেভাবে সহোদর ভাই হয়ে থাকে। এমন কি তাদের একজন মৃত্যুমুখে পতিত হলে অপরজন তার উত্তরাধিকারীও হত।

এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনের ঘটনা দুবার ঘটেছিল। একবার ঘটেছিল মক্কায়। আর তা হয়েছিল শুধুমাত্র মুহাজিরদের মধ্যে। দ্বিতীয়বার ঘটেছিল মদীনায় এবং তা হয়েছিল মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে। অর্থাৎ যারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন এবং যারা মদীনার স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন তাদের মধ্যেই এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল। এক উক্তি অনুযায়ী,এরা ছিল সংখ্যায় নব্বই জন, আর অপর উক্তি অনুযায়ী একশ জন। যেসব লোক ঈমান এনেছিলেন, নিজেদের ঘরাবাড়ী পরিত্যাগ করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করেছিলেন তারা যে কোন গোত্র বা যে কোন শ্রেণীর হোন না কেন, একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আর তাদের এই বন্ধন ছিল সত্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারীদের বন্ধন। তাদের একজন ছিল অপর জনের বন্ধু। আর এই বন্ধুত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল তাদের যাবতীয় উন্নয়ন ও উৎকর্ষ, সাধনের ধারা। (তরজমানুল কুরআন ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা–৭১-৭২)

ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা

মুহাজিরদের সম্পর্ক ছিল মক্কা মুকাররমার সাথে। তাঁরা দীর্ঘ দিন থেকেই ইসলামী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং স্বভাব-চরিত্র পবিত্র করণের পথনির্দেশ পেয়ে আস্‌ছিলেন। তাঁরা বিপদাপদের এই ভয়ংকর ঝড়তুফানের মধ্যেই জীবনের বেশ কয়েকটি বছর অতিবাহিত করেছিলেন। আর এই সব ঝড়তুফানের একটি ধাক্কাই মানুষকে বিদ্যোৎসাহী ও দৃঢ়সংকল্প করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-মর্যাদা-বোধ সম্পন্ন মানুষ। আকাশচুম্বী বাসনা,সংকল্পের দৃঢ়তা এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পবিত্রতার উপর শক্ত ঈমানের অধিকারী এই সব মানুষের সামনে যদি জীবনের যে কোন পরিস্থিতি এসে হাযির হত তাঁরা সেটাকে মুকাবালার ব্যাপারে কোন অসুবিধারই সম্মুখীন হতেন না। তাঁদের এই বিশ্বাসও ছিল যে, তাঁরা যে মানবীয় জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চান যে, তা কোন ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হলে মনুষ্যজগতে অগণিত কল্যাণ ও মঙ্গলের এমন একটি মহান যুগের সূচনা হবে, যার দৃষ্টান্ত এযাবত কালের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি এত সরল ও সংক্ষিপ্ত ছিল যে, যে কোন পরিস্থিতি সামনে এলে তাঁরা সহজেই তার মুকাবালা করতে পারতেন। তাঁরা এই উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ী ছেড়ে আসেন নি যে, নতুন ভূখন্ডে পৌছে তারা পূর্বের ন্যায়ই ধন-সম্পদের অধিকারী হবেন। বরং তাঁরা এসেছিলেন বিশ্বের প্রত্যেকটি অঞ্চলের মানুষকে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলার আন্দোলনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের উদ্দেশ্য তো এছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর যদিও আনসারগণ মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত সময় অতিবাহিত করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কোন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েই মুহাজিরদের পিছনে ছিলেন না। বরং সত্যি কথা বলতে গেলে, তাদের দ্বিধাহীন উৎসর্গ ও কুরবানী যে যে আকারে প্রতিভাত হয়েছিল তাতে বলতে গেলে চিরদিনের জন্য এ তত্বটি প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল যে, এধরনের খাঁটি একদল মানুষের অস্তিত্ব না ইতিপূর্বে কখনো দেখা গেছে; আর না পরবর্তী সময়ে কখনো দেখা যাবে। যেন আনসারদের এই আত্ম কুরবানী তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্মের মূল কারণ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং তাঁরাই ইসলাম ও মুসলমানদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হওয়ার স্থায়ী সৌভাগ্য অর্জন করেন।

এটা জানা কথা যে, মানুষ চারিত্রিক ও আর্থিক উৎকর্ষের স্তরসমূহ অতিক্রম করে যতই উপরে উন্নীত হোক না কেন, সে তার আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতার নির্দিষ্ট নির্ভরশীলতা থেকে চিরদিনের জন্য সম্পর্কহীন তথা গাফিল থাকতে পারে না। কোন না কোন সময় আত্মার গভীরতা থেকে এ ধরনের যে তরঙ্গাদি ঊর্ধ দেশে এসে পড়ে, সেটাকে

আমরা 'আপন করে নেওয়ার অনুভূতি' ছাড়া অন্য কোন বস্তু দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি না। খুব সম্ভবত: মানবিক আত্মার এটাই ছিল প্রকৃতিগত পিপাসা, যা নিবারণের জন্য ভ্রাতৃত্ববন্ধনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কয়েকটি স্বত:স্ফূর্ত হাকীকত

(১) মুহাজিরগণের মধ্যে অশান্তি ও অস্বস্তি সৃষ্টি হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল তা বন্ধের জন্য সুকৌশলে যা কিছু করা সম্ভব ছিল তা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়। এর পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আল্লাহ্‌র ফযলে এটা অত্যন্ত আশাবর্ধক প্রমাণিত হয়েছিল।

(২) সহোদর ভাই এবং নিকটাত্মীয়দের মধ্যেও বিভিন্ন কারণে অসন্তোষ থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তাতে এমন কোন পরিস্থিতি দেখা দেয়নি বা দিতে পারেনি।

(৩) ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সম্পর্ক প্রকৃত ও রক্ত সম্পর্কের অনুপাতে প্রতিটি পর্যায়েই অধিকতর সফল প্রমাণিত হয়েছিল।

(৪) মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে অধিক থেকে অধিকতর একাগ্রতা সৃষ্টি এবং পারস্পরিক ঐক্য সুদৃঢ় করার শক্তিশালী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনাধীন রাখা হয়েছিল।

জনসমাবেশ ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

মসজিদে নবভীর নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর হযরত আনাস বিন মালিক (রা)এর ঘরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসার ও মুহাজিরদের একত্রিত করেন। ঐ জনসমাবেশে নব্বই অথবা একশ জন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অর্ধেক ছিলেন মুহাজির,আর অর্ধেক আনসার।

হুযুর (সা) ঐ সমাবেশে বলেন ঃ

تَآخَوْا فِى اللّٰهِ اَخَوَيْنِ اَخَوَيْنِ .

"আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের মধ্যে দু'জন দু'জন (একজন আনসার ও একজন মুহাজির) যেন পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়।"[১]

উপস্থিত আনসার ও মুহাজিরদের পরিপূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে যতটুকু জানা গেছে তা নিম্নে পেশ করা গেল ঃ

মুহাজির	আনসার
১। আবু বকর সিদ্দীক (রা)	১। খারিজা বিন যায়দ বিন হারিছ (রা)
২। উমর ফারূক(রা)	২। ইতবান বিন মালিক (রা)
৩। আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা)	৩। সা'দ ইবন মুআ'য (রা)
৪। আবদুর রহামন বিন'আওফ (রা)	৪। সা'আদ বিন আররাবী' (রা)
৫। যুবায়র বিন আওয়াম (রা)	৫। সালমা বিন সালামা (রা)
৬। তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা)	৬। কা'ব বিন মালিক (রা)
৭। উসমান বিন 'আফফান (রা)	৭। আনাস বিন সাবিত (রা)
৮। সায়ীদ বিন যায়দ (রা)	৮। উবাই বিন কা'ব (রা)
৯। মুসা'আব বিন উমায়র (রা)	৯। আবু আইয়ুব (রা)

মুহাজির	আনসার
১০। আবু হুযায়ফা বিন উতকা বিন রাবিআ (রা)	১০। উব্বাদ বিন বিশর (রা)
১১। আম্মার বিন ইয়াসির (রা)	১১। হুয়ায়ফা বিন ইয়ামান (রা)
১২। আবু যর গিফারী (রা)	১২। মানযার বিন আমর (রা)
১৩। হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রা)	১৩। উভয়ম বিন সায়ি'দাহ্ (রা)
১৪। সালমান ফারসী (রা)	১৪। আবু দারদা (রা)
১৫। বিলাল (রা)	১৫। আবু রুভায়হা রহমান আবদুল্লাহ্ বিন আবদুর রহামন আল-খাশ 'আমী (রা)

কোন কোন নামের ব্যাপারে রিওয়ায়াত সমূহে মতবিরোধ আছে। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী বিন আবু তালিব (রা)এর হাত ধরে বলেন, هٰذَا اَخِىْ (এ আমার ভাই)। এমতাবস্থায় একে (আলীকে) ঐ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের আওতাভুক্ত করা যেত না, যা মদীনা মুনাওওরায় করা হয়েছিল এরপর হামদ ও যায়দ বিন হারিছা (রা)-এর ভ্রাতৃত্বের উল্লেখ আছে। এটা মক্কী 'মুওয়াখাত' (ভ্রাতৃত্ব বন্ধন) হতে পারে, কিন্তু মাদানী মুওয়াখাত হতে পারে না, যার মধ্যে এক পক্ষ আনসার এবং অপর পক্ষ মুহাজির ছিল। জাফর বিন আবু তালিব এবং মু'আয বিন জাবালের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উল্লেখও পাওয়া যায়, অথচ মাদানী ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সম্পন্ন হওয়ার সময় জাফর বিন আবু তালিব আবিসিনিয়ায় ছিলেন। তিনি ছয় সাত বছর পর মদীনায় পৌছেন এবং সোজা খায়বারে পৌছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন।

প্রত্যেকটি রক্ত-সম্পর্কের উর্ধে

বস্তুত: এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন মুহাজির ও আনসার উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অতুলনীয় প্রেম-ভালবাসার সৃষ্টি করেছিল। মরহুম মাওলানা আযাদ বলেন–

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধন মুসলমানদের মধ্যে এমন এক ভাবোদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল যে, এর একপক্ষ অন্য পক্ষকে আপন রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের চাইতেও অপেক্ষাকৃত নিকটতর মনে করতে শুরু করেছিলেন। এমন কি এদের মধ্যে যদি কেউ মারা যেতেন তাহলে অপরজনকে তাঁর আইনত: উত্তরাধিকারী মনে করা হত। তাঁরা তাঁদের প্রাচীন যাবতীয় সম্পর্ক ভুলে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল শুধুমাত্র একটি সম্পর্ক।

অর্থাৎ তাঁরা সকলেই ছিলেন আল্লাহ্র রাসূলের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য নিজেদের সবকিছু কুরবান করতে সদা প্রস্তুত।

শেষ পর্যন্ত তাদের উত্তরাধিকারীত্বের সীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ط وَاُولُوا
الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ط

"যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে থেকে জিহাদ করেছে তারাও একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার।" -(৮ঃ৭৫)

অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে হিজরত না করে পরে যারা হিজরত করেছেন তারাও মুহাজির, কিন্তু পূর্ববর্তী মুহাজিরদের মর্যাদা পরবর্তীদের অপেক্ষা অধিক। এই দুই শ্রেণীর মুহাজিররা আত্মীয়ও ছিলেন। মর্যাদার পার্থক্যের জন্য তারা

পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতে পারবেন কিনা এ প্রশ্ন উঠেছিল। তখন বলা হয়, মর্যাদার পার্থক্য থাকলেও আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত আত্মীয়তার হক সমতুল্য।

আনসারের ত্যাগ স্বীকার

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রত্যেক আনসারী আপন মুহাজির ভাইকে সংগে নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসের হিসাব পেশ করেন এবং বলেন, এগুলোর অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক তোমার। উদারহরণ স্বরূপ বলা যায়, আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) সা'দ বিন রাবী' (রা) এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সা'দ (রা) কে আনসারগণের মধ্যে সর্বাধিক বিত্তশালী মনে করা হত। তিনি তাঁর মুহাজির ভাইকে এও বললেন, আমার দুই স্ত্রী আছে। আপনি এর মধ্য থেকে যাকে পছন্দ করেন আমি তাকেই তালাক দিয়ে দেব এবং ইদ্দতপূর্ণ হবার পর আপনি তার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে পারবেন। কিন্তু আবদুর রহমান (রা) আপন আনসারী ভাইয়ের এই ইহ্সান ও সদিচ্ছার শুকরিয়া আদায় করে বললেন, আমি আপনার এই সব সম্পদের কিছুই নেব না। আমাকে শুধু বাজারের পথ দেখিয়ে দিন। শেষ পর্যন্ত তিনি (আবদুর রহমান) বনী 'কাইনুকা'-এর বাজারে যান এবং ক্রমে ক্রমে তাঁর এই ব্যবসায় অত্যন্ত উন্নতি হতে থাকে। এমন কি তিনি একদা বলেছিলেন, "আমি মাটি স্পর্শ করলেও তা সোনা হয়ে যেত।" প্রকৃত পক্ষে তাঁর পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, প্রায় সাতশ উট তা বহন করে নিয়ে আসত। আর যেদিন তাঁর এই বাণিজ্য কাফেলা মদীনায় এসে পৌঁছত সেদিন সমগ্র শহরে হৈচৈ পড়ে যেত।[২]

আনসারগণের অনেক খেজুর বাগান ও কৃষিক্ষেত ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অনুরোধ করেন, যেন তিনি এই সব জিনিসও তাঁদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) একথা ভালভাবেই জানতেন যে, ব্যবসা বাণিজ্যই হচ্ছে মুহাজিরদের ঐতিহ্যগত পেশা। ক্ষেতকৃষি এবং উদ্যান রচনা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই তিনি আনসারদের ঐ আবেদন মঞ্জুর করেন নি। এতদসত্ত্বেও আনসাররা নিবেদন করেন, ক্ষেতকৃষির যাবতীয় কাজ আমরাই করবো। কিন্তু এ থেকে যা উৎপাদন হবে তার অর্ধেক অংশ আপনি মুহাজির ভাইদের দিয়ে দিন।

এগুলো ছিল প্রাথমিক যুগের অস্বাভাবিক অবস্থা। বদর যুদ্ধের পর এই অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক হতে থাকে। তাই জরুরী অবস্থার পন্থাসমূহ শিথিল হতে থাকে।

বনূ নাযীরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করার পর তাদের যেসব জমি ও বাগান ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেগুলো মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং ইতিপূর্বে আনসারগণ মুহাজিররদেরকে যেসব জিনিসপত্র দিয়েছিল তা তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু আনসারগণ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমাদের ক্ষেত এবং বাগান সমূহ ও মুহাজিরদের অধিকারে থাকতে দিন এবং বনূ নাযীরের ধন-সম্পত্তিও তাঁদেরকে দান করুন।

খায়বার বিজয়ের পর এধরনের জরুরী কর্মপন্থা অবলম্বনের কোন প্রয়োজন আর বাকি থাকে নি। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসার প্রদত্ত যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি তাঁদেরকে ফেরত দিয়ে দেন।

মরহুম মাওলানা শিবলী বলেন,"আনসারগণ মুহাজিরদের আতিথ্য ও ভ্রাতৃত্বের যে হক আদায় করেছিলেন বিশ্বের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাহরাইন বিজিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-আনসারদের ডেকে বলেন, আমি এখানে প্রাপ্ত যাবতীয় সম্পদ আনসারদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে চাই। তখন তাঁরা নিবেদন করেন, প্রথমে আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে এই পরিমাণ ভূ সম্পদ দান করুন। এরপর আমরা এটা গ্রহণ করবো।"[৩]

মুহাজিরদের আত্মসম্মানবোধ

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও মুহাজিরগণ নিষ্কর্মা বসে না থেকে নিজ নিজ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। হযরত আবু বকর (রা) যথারীতি কাপড়ের ব্যবসা শুরু করে দেন। হযরত উছমান (রা) 'কায়নুকা'এর বাজারে গিয়ে খেজুরের ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন। হযরত উমর (রা)-এর ব্যবসা তো একেবারে ইরান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য সাহাবীগণও নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। সম্ভবত: অতি অল্প সংখ্যক মুহাজির এমন ছিলেন, যারা প্রথম প্রথম এমন কোন কাজ সংগ্রহ করতে পারেননি, যার দ্বারা তাঁদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হতে পারে।

মুহাজিরগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা এভাবে করা হয়েছিল যে, আনসারগণ তাঁদের বিভিন্ন বসতি ও মহল্লার পতিত জমিগুলো মুহাজির ভাইদের কাছে সমর্পণ করেন, যাতে তাঁরা সেগুলোতে প্রয়োজন মুতাবিক নিজেদের ঘরবাড়ী তৈরী করে নিতে পারেন। কোন মুহাজিরের জন্য তৈরী ঘরও খালি করে দেওয়া হয়। এটি ছিল এমনি ধরনের একটি প্রয়োজন, যা পূরণ করার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর চাপানো সম্ভব ছিল না। তাছাড়া কোন আনসারী ভাইয়ের উপর অধিক বোঝা চাপানো কোন মুহাজিরই সমীচীন মনে করেনি। শেষ পর্যন্ত এ সমস্যাটির সমাধান এভাবে হয়েছিল যে, মুহাজিরদের জন্য আনসারদের বদান্যতা ও উৎসর্গের স্পৃহা শুধু অব্যাহতই থাকেনি; বরং দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে মুহাজিরদের আত্মসম্মানবোধ, কষ্টসহিষ্ণুতা, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ এবং জীবিকা অর্জনের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহেও কোনদিন ভাটা পড়েনি।

'তারা ওদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়'

বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একজন অতিথি আসে। তিনি তখন তার খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য জনৈক ব্যক্তিকে আপন কোন এক সহধর্মিণীর কাছে পাঠান। কিন্তু জনা গেল যে, তাঁর কাছে কোন খাবার নেই। শুধুমাত্র পানি আছে। কিন্তু তা দিয়ে তো আর অতিথির হক আদায় করা যায় না। শেষ পর্যন্ত তিনি (সা) বলেন, এমন কে আছে, যে এই ব্যক্তিকে নিয়ে যাবে এবং তার খাবারের ব্যবস্থা করবে? তখন আনসারদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং অতিথিকে নিয়ে আপন ঘরে চলে যান। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর ঘরে শুধুমাত্র এই পরিমাণ খাদ্য-সামগ্রী ছিল, যার দ্বারা কোনমতে শুধুমাত্র ছোট ছোট বাচ্চাদের খাবারের সংস্থান করা যেতে পারে। অতএব স্বামী-স্ত্রী পোগন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেন যে, খাবার ঠিকই রান্না করা হবে, তবে বাচ্চাদেরকে কিছু-না খাইয়েই ভুলিয়ে ভালিয়ে শুইয়ে রাখা হবে। এরপর দস্তরখান বিছিয়ে সবটুকু খাবার অতিথির সামনে পেশ করা হবে। তারপর সল্‌তে ঠিক করার বাহানায় প্রদীপটি নিবিয়ে দেওয়া হবে। অত:পর অন্ধকারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী অতিথির সাথে খাবারে শরীক আছেন এমন অঙ্গভঙ্গি করবেন, কিন্তু কিছুই খাবেন না। এতে অতিথি ভাববে যে, তারা সত্যি সত্যি তার সাথে খাচ্ছেন। রাত কেটে গেল। ভোরবেলা ঐ আনসারী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলে তিনি (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের (স্বামী স্ত্রীর) কাজে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং এই আয়াত নাযিল করেছেন–

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ
فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ
يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۔

"মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে ও মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাংখা পোষণ করে না, আর তারা

তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য হতে নিজেদের মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।"-(৫৯:৯)

বিশ্ব ইতিহাসের উজ্জ্বলতম যুগ

উল্লেখিত আয়াতে শুধু ঐ আনসারী পরিবারেই নয়, বরং গোটা আনসার সম্প্রদায়ের পুণ্যকামিতা, পরোপকারিতা ও উত্তম চরিত্রের ছবিটি চিরদিনের জন্য সুসংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিভিন্ন জাতির চরিত্র ও আচার আচরণের দিকটি সকলের সামনেই রয়েছে। যদি পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি জাতির আচার-আচরণ অধ্যয়ন করা যায় তাহলে এটা সম্ভব যে, তাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে এমন দু'একজনের সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, যাদের ব্যক্তি সত্তা-প্রকৃতই অস্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কোন জাতির মধ্যে একেবারে 'দল কে দল' এমন ধরনের লোক কখনো পাওয়া যাবে না-যেমন পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে মদীনা মুনাওওরায়। তার প্রশিক্ষণ ও হিদায়াতের কল্যাণে মদীনায় এমন একটি জন সমষ্টির সৃষ্টি হয়েছিল, যাদের চরিত্র ও আচরণ এমনি ছিল যে, তারা শুধু নিজেরদেরকে নয় বরং গোটা মানব-জাতিকে পশ্চাৎপদতা, পশুত্ব ও অধ:পতনের অন্ধকার থেকে সত্যিকার অগ্রগতি, মনুষ্যত্ব ও প্রকৃত মানবতার উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে তারা উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসাবে বিরাজ করবেন।

এ ব্যাপারে কি কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারে যে, দশ বছরের একটি সংক্ষিপ্ত সময়কালে যে জাতি আল্লাহ্র পবিত্র নবীর ছায়ার নীচে প্রতিপালিত হয়েছিল, এক শতাব্দী অতিবাহিত হতে না হতেই আল্লাহ্ তা'আলা সে যুগের পরিচিত দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ ভূখন্ড সমূহের অধিকার ও কর্তৃত্ব তাঁদের হাতে সমর্পণ করেন এবং মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা এমন সব কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আনজাম দেয়, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বেকার বিশ্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। আক্ষেপের বিষয় যে, পরবর্তী যুগের মুসলমানরা এই অতি মূল্যবান মীরাছ (অধিকারত্ব)-টি সংরক্ষণের ব্যাপারে নিজেরকে যোগ্য প্রমাণিত করতে পারে নি। ফলে তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের দায়িত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এতদ্সত্ত্বেও নেতৃত্বের ঐ স্বর্ণযুগটি আজো বিশ্ব ইতিহাসে সেভাবে উজ্জ্বল প্রজ্জ্বল হয়ে আছে এবং চিরদিন থাকবে-যেমন ছিল আজ থেকে তের 'শ বছর আগে। এই ঔজ্জ্বল্যের উপর শুধু গর্ব করা আমাদের জন্য সাজে না। তবে হ্যাঁ, আমরা নিজেদেরকে এই ঔজ্জ্বল্য ও কৃতিত্বের কেন্দ্রস্থল বা উৎসরূপে গড়ে তুলতে পারি। আর যদি তা পারি তা হলে অবশ্য অবশ্যই আমরা আমাদের এই সৌভাগ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তার একান্ত বিনীত বান্দা হিসাবে সিজদা-ই-শুকর আদায় করবো। (সংকলক)

টীকা ঃ

(১) ইবনে হিশাম ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৫০৫।

(২) তরজমানুল কুরআন ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা -৭৩।

(৩) সীরাতন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-২৭।

শান্তি ও নিরাপত্তা দৃঢ়ায়ন এবং মদীনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

মদীনা মুনাওওরার অবস্থা

ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সাথে শুধুমাত্র মুসলমান তথা মুহাজির ও আনসাররা সম্পর্কিত ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় পদার্পণ করেন তখন সেখানে মুসলমান ছাড়াও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর যথেষ্ট সংখ্যক লোক বসবাস করত।

১। ঐ সমস্ত আরব (আওস ও খাযরাজের লোক), যারা তখনো ইসলাম গ্রহণ করে নি। প্রচলিত ভাষায় তাদেরকে মুশরিকই মনে করা হত। পরবর্তী সময়ে এদের সংখ্যা দ্রুত লোপ পেতে থাকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত তাদের অস্তিত্বই আর বাকী থাকে নি।

২। ঐ সমস্ত মুনাফিক, যাদেরকে সাধারণভাবে মুসলমান মনে করা হত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। আন্তরিক দিক দিয়ে ওরা মুসলমানদের সাথে ছিল না, আবার মুশরিকদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সাময়িক সুযোগ-সুবিধার প্রতি। মুসলিম জামা'আত এদের দিক থেকে হরহামেশা দুঃখ পেয়েছে, কদাচিৎ কোন উপকার কখনো পায়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও এদের ইসলামের (মৌখিক) দাবী রদ করার কোন উপায় ছিল না। আর যদি তারা তাদের বুক চিরেও দেখিয়ে দিত তবু তারা প্রকৃত মুসলমান কিনা তা তো জানা যেত না। মোটকথা, এদেরকে মুসলমান বলে যেমন অস্বীকার করা যেত না, তেমনি তাদের উপর কোন আস্থাও রাখা যেত না। বাহ্যত: সংখ্যার দিক দিয়েও এরা কম ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, উহুদ যুদ্ধের সময় মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই-এর সাথে যে তিনশ যোদ্ধা মুসলিম বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে মদীনা মুনাওরায় ফিরে এসেছিল, ওরা বাহ্যত: মুনাফিকই ছিল।

৩। য়াহূদীদের তিনটি সম্প্রদায়, যাদের জনসংখ্যা চার পাঁচ হাজারের কম ছিল না। ঐ তিনটি সম্প্রদায় হচ্ছে বানূ কাইনূকা, বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যা। এরা শুধু ধর্মীয় দিক দিয়ে নয়, বরং বংশগত দিক দিয়েও মুহাজির ও আনসারদের থেকে ভিন্ন ছিল।

অবস্থার চাহিদা

যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লেখিত জনগোষ্ঠীকে শান্তি ও নিরাপত্তার সম্মিলিত লক্ষ্যে একতাবদ্ধ করা না যেত ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সব আগত প্রতিকূল অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের কোন আশাই করা যেত না, যেগুলো সম্পর্কে অন্তত: রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহান ও পবিত্র সত্তা ভালভাবেই অবহিত ছিলেন। যদি ঐ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা বিদ্যমান না থাকত, যা কুরায়শের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল এবং যেগুলোর ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত বিপদাপদের মুকাবালা করতে গিয়ে কমপক্ষে দু'টি বছরের প্রত্যেক দিবারাত্রি উৎসর্গ করতে হয়েছিল তবু বংশ ও ধর্মের দিক দিয়ে বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন পথের অনুসারী যে জনবসতিসমূহ পাশাপাশি বসবাস করছিল, তাদের সম্পর্কে কী করে এই আশা রাখা যেত যে, তারা এক দেহে লীন হয়ে নাগরিক কল্যাণ ও উৎকর্ষের জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাবে?

এটা তো জানা কথা যে, উল্লেখিত সার্বজনীন স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে জনগণকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রতি অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে হলে একটি মাত্র পথ সামনে খোলা ছিল। আর তা হলো, ধর্ম-বংশ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি লোকের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করা যে, তার নাগরিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করা হবে। আর এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন ধর্ম ও বংশের লোকদের নিয়ে যে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন, তা শুধু চৌদ্দ শ বছর পূর্বেকার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দলীলই ছিল না, বরং আকৃতি-প্রকৃতি ও গঠন-কাঠামোর নিরিখে বিশ্ব ইতিহাসে ছিল তুলনা বিহীন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মন-মানাসিকতা ও আন্তরিক চাহিদার দিকটি সঠিক বিবেকচনায় রেখে এ ধরনের একটি সার্বজনীন ও সর্বসম্মত পরিকল্পনা তথা সংবিধান রচনা করা একটি মু'জিযা তথা অস্বাভাবিক ঘটনা ছাড়া কিছু ছিল না।

সম্মিলিত কর্মপন্থা

সুতরাং এই জরুরী বিষয়ের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টি সর্বপ্রথম নিবদ্ধ হয়। 'দ্বীনে হক'-এর দাওয়াতের কাজ অব্যাহত ছিল। তবে এটাকে এখতিয়ার বা গ্রহণ করার বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক গোষ্ঠীর মেযাজ-মর্জির উপর ছিল নির্ভরশীল। জবরদস্তিমূলকভাবে কাউকে ইসলামে দাখিল করা নীতিগতভাবে একটি ভ্রান্তিমূলক পদক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়।

কেননা, মুসলমান হওয়ার পর একজন মানুষের পক্ষে যে সব আমল বা কাজ করা একান্ত বাঞ্ছনীয় তা তো তার সহীহ্ আকীদা বা সঠিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। কাউকে ভীতি প্রদর্শন করা বা কোন কিছুর লোভ দেখিয়ে মুসলমানদের পক্ষে টেনে আনা যায় সত্যি, কিন্তু তাতে তো সে আর প্রকৃত মুসলমান হয় না বা হতে পারে না। উপরন্তু তার কাছ থেকে ঐ সব আমাল বা কাজকর্ম পাওয়ারও আশা করা যেতে পারে না, যা ইসলাম একজন মানুষের কাছ থেকে চায়। তাছাড়া তার উপর কোন ব্যাপারে আস্থাও রাখা যেতে পারে না। কেননা, ভয়ভীতি ও লোভ-লালসার কারণসমূহ দূর হতেই তার সাবেক অবস্থায়ই ফিরে যাবে।

এক্ষেত্রে এটাও সম্ভব যে, যদি অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে তার প্রতি অধিকতর ভয়ভীতি বা লোভ-লাল্সা দেখানো হয় তাহলে সে স্বাভাবিকভাবে ঐ দিকেই ঝুঁকে পড়বে।

এই ব্যবস্থাপনা (সন্ধিচুক্তি) শুধু এজন্য সবিশেষ আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী নয় যে, যে যুগে তা সম্পাদিত হয়েছিল সে যুগে জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে এ ধরণের সন্ধিপত্রের কোন অস্তিত্বই ছিল না, বা যে যুগে তা সম্পাদিত হয়েছিল সে যুগে তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিশেষ সাফল্যের অধিকারী ছিল–বরং এই দিক দিয়েও তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল যে, বিশ্বে যে সব ব্যক্তি মানব জাতির গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আনজাম দিতে আসেন তাঁরা কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থায়ও অধিক থেকে অধিকতর সমন্বিত ও সার্বজনীন কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেন-তবে এই শর্তে যে, একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতার সাথে তারা যেন প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর সম্মান-মর্যাদা রক্ষার প্রতি যত্নবান থাকেন এবং কোন জনগোষ্ঠীকে যেন কথার মারপ্যাঁচে ফেলে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র না করেন। প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক ও যথার্থ দাবী সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিলে তো আর মতবিরোধের কোন কারণ বাকি থাকে না। সত্যানুসারী ও মানব কল্যাণকামী দল অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও এক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যায়। শুধুমাত্র ক্ষমতাপূজারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর শর্তাদি মেনে নেওয়া সত্ত্বেও তাদের আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি এবং কখনো পারেও না।

মৌলিক লক্ষ্যসমূহ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা মুনাওওরার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পরস্পর সাহায্য-সহানুভূতির যে সমন্বিত কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিলেন, তার মৌলিক লক্ষ্যসমূহ এতই সার্বজনীন ও সহজবোধ্য ছিল যে, তার বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদানের কোন প্রয়োজনই পড়ে না। যেমন–

১। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। এটা তো জানা কথা যে, প্রত্যেকটি জনবসতিই মোটামুটিভাবে শান্তি ও স্বস্তির জীবন কামনা করে, যাতে করে তারা একনিষ্ঠভাবে ও একাগ্রতার সাথে জীবিকা অর্জনে ব্যাপৃত থাকতে পারে, অধিক থেকে অধিকতর অর্থ উপার্জন করতে পারে, সন্তান-সন্ততিকে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর পদ্ধতিতে লালন পালন করতে পারে এবং সামাজিক সম্বন্ধ বজায় রাখার ক্ষেত্রে আপন দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে। স্বাভাবিকভাবে কোন শান্তিপ্রিয় মানুষই অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতাকে পছন্দ করে না।

২। প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর যেসব আকায়িদ (ধর্মীয় বিশ্বাস) ও রসম-রেওয়াজ রয়েছে সেগুলোর উপর কোন অবাঞ্ছনীয় বাধা-নিষেধ আরোপ না করা।

৩। ফিত্না-ফ্যাসাদ এবং দাঙ্গা হাঙ্গামার উৎসসমূহ বন্ধ করে দেওয়া।

৪। বহির্দেশীয় হামলা ও সংঘর্ষসমূহ প্রতিরোধ করা। এটা এজন্য অপরিহার্য যে, এর কারণে শুধু অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয় না, বরং জীবিকা অন্বেষণ, সন্তান প্রতিপালন, ধন-প্রাণরক্ষা এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্তব্য পালনের প্রত্যেকটি ব্যবস্থাই পঙ্গু হয়ে পড়ে। ফলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেমে আসে অনিশ্চয়তা, অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের 'ফিতরাত' (সহজাত প্রবৃত্তি তথা শান্তিকামী মনোবৃত্তি) একেবারে বিকৃত হয়ে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সাধারণত: এধরনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তৈরী হয় না।

এই লেখার উপর বার বার চিন্তা করলে উল্লেখিত লক্ষ্যাদি অতি সহজেই যে কোন পাঠকের সামনে ফুটে উঠবে।

মূল কর্মসূচী

মূল কর্মসূচীর অনুবাদ নিম্নে পেশ করা হচ্ছে। এটা 'সাহীফা' নামে খ্যাত। আপনারা এটাকে 'লিপি', স্বীকারোক্তি -যে নামে ইচ্ছা আখ্যায়িত করতে পারেন। ডক্টর হামীদুল্লাহ্ এটাকে 'হুকুমনামা' নামে আখ্যায়িত করেছেন ঃ

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে

মুহাম্মদ (সা), যিনি একজন নবী, এটা তার (লিখিত) একটি দলীল কিংবা চুক্তিপত্র। কুরায়শ ও ইয়াছরিববাসীদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এটা তাদের জন্য, তাদের অনুগতদের জন্য এবং যারা তাদের মিত্রে পরিণত হবে ও তাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধে অংশ নেবে।

১। এরা সবাই একই 'মিল্লাত' (রাজনৈতিক ঐক্যফ্রন্ট) হিসাবে পরিগণিত হবে, ঐ সব জনগোষ্ঠীর মুকাবালায় যারা এই দলীলের বাধ্যবাধকতার সম-অংশীদার নয়।

২। কুরায়শের যে সব লোক হিজরত করে ইয়াছরিবে এসেছে তারা পূর্ববর্তী বিধান অনুযায়ী সম্মিলিতভাবে রক্তমূল্য আদায় করবে এবং রক্তমূল্য পরিশোধ করেই নিজেদের কয়েদীকে ছাড়িয়ে আনবে, যাতে করে মুমিনদের আচার-ব্যবহার পারস্পরিক পুণ্যকামিতা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে হয়।

৩। বানূ আউফ পূর্বতন বিধান অনুযায়ী নিজেদের 'ওয়াজিবুল আদা' (অবশ্য পরিশোধযোগ্য) রক্তমূল্য স্বয়ং নিজেরা মিলে মিশে পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেকটি গোষ্ঠী নিজেদের কয়েদীকে স্বয়ং রক্তমূল্য পরিশোধ করেই ছাড়িয়ে আনবে,যাতে করে মুমিনদের আচার-ব্যবহার পারস্পরিক পূণ্যকামিতা ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক হয়।

৪। বনূ হারিছ বিন খায্‌রাজ পূর্বতন বিধি অনুযায়ী নিজেদের 'ওয়াজিবুল আদা' রক্তমূল্য স্বয়ং মিলে মিশে পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেকিট গোষ্ঠী আপন কয়েদীকে স্বয়ং রক্তমূল্য পরিশোধ করে ছাড়িয়ে আনবে,যাতে করে মুমিনদের আচার-ব্যবহার পারস্পরিক পুণ্যকামিতা ও ইনসাফ ভিত্তিক হয়।

৫। বনী সায়ি'দা পূর্বের ন্যায় নিজেদের ওয়াজিবুল আদা রক্তমূল্য খোদ মিলেমিশে পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেকটি গোষ্ঠী স্বয়ং রক্তমূল্য পরিশোধ করে নিজেদের কয়েদীকে ছাড়িয়ে আনবে, যাতে করে মুমিনদের আচার-ব্যবহার পারস্পরিক পুণ্যকামিতা ও ইনসাফভিত্তিক হয়।

৬। বনূ জুশ্‌ম্‌ পূর্বের ন্যায় নিজেদের 'ওয়াজিবুল আদা' রক্তমূল্য পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেকটি গোষ্ঠী আপন কয়েদীকে স্বয়ং রক্তমূল্য পরিশোধ করে ছাড়িয়ে আনবে, যাতে করে মুমিনদের আচার-ব্যবহার পারস্পরিক পুণ্যকমিতা ও ইনসাফ ভিত্তি হয়।

৭। বনূ নাজ্জার পূর্বের ন্যায় নিজেদের 'ওয়াজিবুল আদা' রক্তমূল্য স্বয়ং পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজেদের কয়েদীকে নিজেরাই রক্তমূল্য দিয়ে ছাড়িয়ে আনবে, যাতে করে মুমিনদের আচার-ব্যবহার পাস্পরিক পুণ্যকামিতা ও ইনসাফ ভিত্তিক হয়।

৮। বনূ আমর বিন আওফ পূর্বের ন্যায় নিজেদের 'ওয়াজিবুল আদা' রক্তমূল্য স্বয়ং মিলে মিশে পরিশোধ করেব এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজেদের কয়েদীকে স্বয়ং রক্তমূল্য দিয়ে ছাড়িয়ে আনবে, যাতে করে মুমিনদের আচার-ব্যবহার পারস্পরিক পুণ্যকামিতা ও ইন্‌সাফভিত্তিক হয়।

৯। বনূ নাবীত (আওস) পূর্বের ন্যায় নিজেদের 'ওয়াজিবুল আদা' রক্তমূল্য স্বয়ং মিলে মিশে পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজেদের কয়েদীকে স্বয়ং রক্তমূল্য পরিশোধ করে ছাড়িয়ে আনবে, যাতে করে মুমিনদের আচার-ব্যবহার পারস্পরিক পুণ্যকামিতা ও ইনাসাফভিত্তিক হয়।

১০। বনূ আউস পূর্বের ন্যায় নিজেদের 'ওয়াজিবুল আদা' রক্তমূল্য স্বয়ং মিলেমিশে পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজেদের কয়েদীকে স্বয়ং রক্তমূল্য পরিশোধ করে ছাড়িয়ে আনবে, যাতে করে মুমিনদের আচার-ব্যবহার পারস্পরিক পুণ্যকামিতা ও ইনসাফভিত্তিক হয়।

[লক্ষণীয় যে, ক্রমিক নম্বর ২ থেকে ১০ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধারার বাক্য ও বক্তব্য একই। যা পার্থক্য তা হলো, শুধুমাত্র গোষ্ঠীর নাম বদল]

মুমিনের শি'আর (রীতিপদ্ধতি)

১১। মুমিনরা নিজেদের এমন কোন ব্যক্তিকে -যে নিঃস্ব কিংবা যার উপর ঋণের বোঝা রয়েছে- অবশ্যই সাহায্য দান করবে, যাতে করে সে তার উপর ধার্যকৃত রক্তমূল্য ইত্যাদি অনায়াসে পরিশোধ করতে পারে।

১২। কোন মুমিন নিজের মুমিন ভাইয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে তার মাওলা (চুক্তিবদ্ধ ভাই বা মিত্র) -এর সাথে কোন চুক্তি সম্পাদন করবে না। (অর্থাৎ মুমিনদের মধ্যে পরস্পর ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির কোন অবকাশই যেন না থাকে।)

১৩। মুমিন ও মুত্তাকীরা এ ধরনের প্রত্যেকটি লোকের বিরোধিতায় সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকবে, যে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করে; জুলুম, অত্যাচার, পাপ, ও বাড়াবাড়িমূলক আচরণ করত: মুমিনদের মধ্যে ফিতনাহ-ফ্যাসাদের সৃষ্টি করে। এ ধরনের লোকের বিরোধিতায় মুমিনদের হাত একসাথে উত্থিত হবে- এমন কি সে যদি তাদের কারো না কারো পুত্রও হয়ে থাকে।

১৪। কোন মুমিন কোন মুমিনকে কাফির (হারবী) এর বদলে হত্যা করবে না এবং কোন মুমিনের বিরুদ্ধে কোন কাফির (হারবী)-কে সাহায্যও করবে না।

১৫। আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার এবং (মুমিনের দেওয়া) প্রতিশ্রুতি একই বস্তু। মুমিনদের মধ্যে একজন সাধারণ ব্যক্তিও কাউকে আশ্রয় দিয়ে সকলের উপর তার বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারবে। কেননা, মুমিনরা অন্যান্যদের মুকাবালায় পরস্পর ভাই ভাই।

১৬। য়াহূদীদের মধ্যে যারা আমাদের আনুগত্য করবে তাদেরকে সাহায্য ও সমঅধিকার প্রদান করা হবে। এমতাবস্থায় তাদের কারো উপর অত্যাচার করা হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করা হবে না।

১৭। আল্লাহ্র রাহে যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে এক মুমিন অন্য মুমিনকে পরিত্যাগ করে শত্রুর সাথে সন্ধি করবে না। এই সন্ধি সকল মুমিনদের জন্যই সমান তথা সমতাভিত্তিক হওয়া চাই।

১৮। ঐ সব গোষ্ঠী যারা আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করবে তাদেরকে মাঝে মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে।

১৯। আল্লাহ্র রাহে মুমিনদের প্রাণের যে ক্ষতি হবে,তারা সম্মিলিতভাবে তার বদলা নেবে।

২০। নিঃসন্দেহে মুমিন মুত্তাকীরা সবার চাইতে উত্তম এবং তারা রয়েছে সব চাইতে সরল পথে।

কুরায়শ আশ্রয় থেকে বহির্ভূত

২১। কোন মুশরিক (যে এই চুক্তিপত্রের অংশীদার) কুরায়শকে আশ্রয় দেবে না এবং তাদের ধন-সম্পদ রক্ষার দায়িত্বও গ্রহণ করবে না। এক্ষেত্রে সে কোন মুমিনের কাজে হস্তক্ষেপও করবে না।

২২। যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে হত্যা করবে এবং তার প্রমাণও পাওয়া যাবে, তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে। তবে হ্যাঁ, যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রক্তমূল্য গ্রহণ করতে সম্মত হয়ে যায় তাহলে কিসাস গ্রহণ করা হবে না। আর তখন সকল মুমিনের কর্তব্য হবে এটাকে মেনে চলা। এছাড়া অন্য কিছু করা তাদের জন্য বৈধ হবে না।

২৩। যে মুমিন এই চুক্তিপত্রের ধারাগুলো স্বীকার করে নিয়েছে, উপরন্তু সে আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে–তার জন্য কখনো বৈধ হবে না যে, নতুন কোন কথা উদ্ভাবন করত: তা দ্বারা ফিতনা সৃষ্টিকারীদেরকে কোন না কোনভাবে সহায়তা করা কিংবা প্রশ্রয় দেওয়া। যে ব্যক্তি অনুরূপ ফিতনা সৃষ্টিকারীকে কোনভাবে সহায়তা করবে কিংবা প্রশ্রয় দেবে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র অভিশাপ ও রোষানলে পতিত হবে, যে দিন কারো কাছ থেকে কোন বিনিময় বা বদলা গ্রহণ করা হবে না।

২৪। যদি এই চুক্তিপত্র মান্যাকারীদের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে এর মীমাংসার দায়িত্ব আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অর্পণ করা হবে।

য়াহূদীদের অধিকার

২৫। য়াহূদীরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুমিনদের পক্ষ নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে ততক্ষণ এর ব্যয়ভারও নিজেরাই বহন করবে।

২৬। বনূ আওফের য়াহূদীরা মুমিনদের সাথে রাজনৈতিক মৈত্রীর একই উম্মত (রাজনৈতিক ঐক্য) বলে গণ্য হবে। য়াহুদীদের নিজেদের ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার থাকবে। মুসলমানদেরও পূর্ণ অধিকার থাকবে তাদের ধর্ম পালনের। অবশ্য যারা জুলুম কিংবা বাড়াবাড়ি করবে তারা তাদের নিজেদের ও নিজেদের পরিবার বর্গ ছাড়া অন্য কারো বিপদ ডেকে আনবে না।

২৭। বনূ নাজ্জারের য়াহূদীরাও সেই অধিকার ভোগ করবে, যে অধিকার ভোগ করবে বনূ আওফের য়াহূদীরা (যাদের কথা ২৬ নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে)।

২৮। বনী হারিছের য়াহূদীরাও সেই অধিকার ভোগ করবে, যে অধিকার ভোগ করবে বনী আওফের য়াহূদীরা।

২৯। বনী সায়ীদার য়াহূদীরাও সেই অধিকার ভোগ করবে,যে অধিকার ভোগ করবে বনী আওফের য়াহূদীরা।

৩০। বনী জা'শমের য়াহূদীরাও সেই অধিকার ভোগ করবে, যে অধিকার ভোগ করবে বনী আওফের য়াহূদীরা।

৩১। বনী আওসের য়াহূদীরাও সেই অধিকার ভোগ করবে, যে অধিকার ভোগ করবে বনী আওফের য়াহূদীরা।

৩২। বনী ছা'লাবের য়াহূদীরাও সেই অধিকার ভোগ করবে, যে অধিকার ভোগ করবে বনী আওফের য়াহূদীরা। অবশ্য যে জুলুম বা বাড়াবাড়ি করবে, সে নিজের ও নিজের পরিবারবর্গ ছাড়া অন্য কারো বিপদ ডেকে আনবে না।

৩৩। জাফনাহ্-বনূ ছা'লাবার একটি শাখা। অতএব বনী জাফনাহ্-এর য়াহূদীরাও সেই অধিকার ভোগ করবে, যে অধিকার ভোগ করবে বনী ছা'লাবার য়াহূদীরা।

৩৪। বনূ শাতীবাহ্ও সেই অধিকার ভোগ করবে, যে অধিকার ভোগ করবে বনী আওফের য়াহূদীরা।

৩৫। বনূ ছা'লাবার মাওয়ালীরা (মিত্ররা)-ও সেই অধিকার ভোগ করবে, যে অধিকার ভোগ করবে খোদ বনূ ছা'লাবার লোকেরা।

৩৬। য়াহূদীদের সবগুলো শাখাগোত্র সেই অধিকার ভোগ করবে, যে অধিকার ভোগ করবে তাদের মূল গোত্রের লোকেরা।

প্রতিরক্ষা ও জুলুম প্রতিরোধ

৩৭। মুহাম্মদ (রা)-এর অনুমতি ছাড়া কেউই যুদ্ধের জন্য বের হতে পারবে না।

৩৮। কেউ আহত হলে তার বদলা গ্রহণের ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হবে না। যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে সে হত্যার দায়িত্ব বর্তাবে তার ও তার পরিবারবর্গের উপর। এক্ষেত্রে ঐ ব্যতিক্রম,যার উপর জুলুম করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যার সাথে রয়েছেন।

৩৯। য়াহূদীরা তাদের খরচের জন্য দায়ী হবে এবং মুসলমানরা দায়ী হবে তাদের খরচের জন্য।

৪০। এই চুক্তিপত্রে অংশগ্রহণ কারীদের বিরুদ্ধে যে-ই যুদ্ধ করবে তার বিরুদ্ধে য়াহূদী ও মুসলমানরা একে অন্যকে সাহায্য করবে, একে অন্যের শুভাকাংখী হবে, একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। মোটকথা, তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ হবে বিশ্বস্ততার, বিশ্বাস ঘাতকতার নয়।

৪১। কোন ব্যক্তিকে, তার হালীফের (মিত্রের) অসদাচরণের জন্য দায়ী করা যাবে না। সর্বাবস্থায়ই মজলুমকে সাহায্য প্রদান করা হবে।

৪২। য়াহূদীরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুমিনদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকবে ততক্ষণ নিজেদের খরচাদিও নিজেরাই বহন করবে।

মদীনা মুনাওওরার পবিত্রতা

৪৩। এই চুক্তিপত্রে অংশ গ্রহণকারীদের কাছে ইয়াছরিব প্রান্তর[২] পবিত্র ও সম্মানিত বলে গণ্য হবে।

৪৪। আশ্রয় প্রার্থীদের সাথে সেই আচরণ করা হবে যা আশ্রয় গ্রহণকারীদের সাথে করা হয়ে থাকে। না তাদের কোন ক্ষতি করা হবে, আর না তারা মুসলমানদের সাথে কোনরূপ বিশ্বাস ঘাতকতা করবে।

৪৫। কোন স্ত্রীলোককে তার পরিবার বা আত্মীয় স্বজনের অনুমতি ব্যতিরেকে আশ্রয় প্রদান করা যাবে না।

৪৬। এই চুক্তিপত্রে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যদি কোন নুতন কথার উদ্ভব হয় কিংবা কোন ব্যাপারে এমন মতবিরোধ দেখা দেয়, যা থেকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশংকা থাকে তাহলে এর ফয়সালার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা এবং মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে অর্পণ করা হবে। এই চুক্তিপত্রের মধ্যে যা কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এটাই পছন্দনীয় যে, সেগুলোকে অধিক থেকে অধিকতর সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার সাথে মান্য করা হবে।

৪৭। না কুরায়শকে আশ্রয় প্রদান করা হবে, আর না ঐ ব্যক্তিকে, যে তাদের সাহায্যকারী।

৪৮। যদি কেউ মদীনার উপর হামলা করে তাহলে সে মুহূর্তে য়াহূদী ও মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে একে অন্যকে সাহায্য করা।

পরস্পর সহযোগীতা ও ধর্মীয় ব্যাপারে যুদ্ধ

৪৯। যদি মুসলমানরা কারো সাথে সন্ধি করে এবং তাতে অংশগ্রহণের জন্য য়াহূদীদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তাহলে তারা সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে। আর যদি য়াহূদীরা কারো সাথে সন্ধি করে এবং তাতে অংশগ্রহণের জন্য মুসলমানদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তাহলে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্যও অবশ্য কর্তব্য হবে। তবে এর ব্যতিক্রম হবে শুধু এই পরিস্থিতিতে যখন কেউ ধর্মীয় ব্যাপারে যুদ্ধ করে(অর্থাৎ ধর্মীয় যুদ্ধে একদলের উপর, অন্য দলকে সাহায্য করার কোন দায়িত্ব বর্তাবে না।)

৫০। প্রত্যেক দলের ভাগে পড়বে সে ধরনেরই প্রতিরোধ, যা তাদের বিরুদ্ধে করা হবে।

৫১। আওসের য়াহূদীরা-চাই তারা মাওয়ালী হোক অথবা আসল–সেই অধিকার ভোগ করবে, যা ভোগ করবে এই চুক্তিপত্র গ্রহণকারীরা।

৫২। এই লিপি চুক্তিপত্র কোন (প্রাক্তন) জালিম বা অপরাধীর ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। সে নিরাপত্তার হকদার হবে যে যুদ্ধের জন্য বের হবে এবং সেও যে ঘরে বসে থাকবে। শুধু এই সব লোক এর আওতায় আসবে না, যারা জুলুম কিংবা অপরাধের সাথে জড়িত রয়েছে।

৫৩। আল্লাহ্ তা'আলা তার বন্ধু ও আশ্রয়দাতা, যে তার কথা ও অঙ্গীকার পালন করবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করবে। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)ও তার বন্ধু এবং আশ্রয়দাতা।

ডক্টর হামীদুল্লাহ্র মন্তব্য

ডক্টর হামীদুল্লাহ্র এই চুক্তিপত্র বা সংবিধানকে–যাকে 'সাহীফা' নাম দেওয়া হয়েছে-বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান আখ্যা দিয়েছেন।[৩] তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহান যুগে মক্কা একটি সুসংগটিত নগর রাষ্ট্র ছিল, যেখানে বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মোটামুটিভাবে পচিশটি সরকারী পদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু ইয়াছরিব, যা পরবর্তী সময়ে 'মদীনা' নামে অভিহিত হয়, সেখানে সম্পূর্ণ নৈরাজ্য বিরাজ করছিলো। অর্থাৎ সেখানে কোন সংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল না। আরবরা (আওস ও খাযরাজ) বারোটি গোত্রে এবং য়াহূদীরা দশটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক গোত্রেই ছিল এক একটি পৃথক সমাজব্যবস্থা। তারা নিজ নিজ সাকীফা বা চাঁদোয়ায় একত্রিত হয়ে আপন আপন বিষয়াদির মীমাংসা করত।[৪] রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন সেখানে এমন অনেকগুলো প্রয়োজন ছিল, যেগুলো পূরণ করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না। যেমনঃ

১। নিজেদের এবং স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ।

২। মক্কায় মুহাজিরদের গৃহায়ন ও জীবিকার্জনের ব্যবস্থা।

৩। শহরের অমুসলিম আরব–বিশেষ করে য়াহূদীদের সাথে সমঝোতা স্থাপন।

৪। শহরের রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং সামরিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

উল্লেখিত চুক্তিপত্র এই সব প্রয়োজন পূরণের জন্যই রচিত হয়েছিল।[৫]

এ চুক্তিপত্র যে আকৃতিতে আমাদের কাছে পৌঁছেছে তার উপর মোটামুটিভাবে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে একথা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না যে,যদিও এর মৌলিক নীতিগুলো পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়ে গিয়েছিল, তা সত্ত্বেও এগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কিছু না কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। কোন কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি থেকেও একথা পরিস্কার হয়ে উঠে যে, বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীর সাথে পৃথক পৃথক আলাপ-আলোচনা করে চুক্তিপত্রের ধারাগুলো এমন ভঙ্গিতে লেখা হয়, যাতে তা সকলের মানবিক শান্তি ও স্বস্তির কারণে পরিণত হয়। যেমনঃ

১। ২৫ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, য়াহূদীরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকবে ততক্ষণ নিজেদের খরচাদি নিজেরাই বহন করবে। ৩৯ নং ধারায়ও বিষয়টির পরিস্কার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। অতএব এটা অকারণে কিংবা ঘটনা চক্রে হয়ে গিয়েছিল তেমনটি মনে করা যেতে পারে না।

২। য়াহূদীদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি গোত্র ও শাখা গোত্রের ক্রমানুসারে ২৬ নং ধারা থেকে ৩৬ নং ধারা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ৫১ নং ধারায় আওসের য়াহূদীদের বিষয়টি পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ৩১ নং ধারায়ও এর উল্লেখ ছিল।

এক্ষেত্রে যে বিষয়টি সর্বাধিক প্রণিধানযোগ্য, তা এই যে, প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে মোটেই শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়নি। যার ফলে একটি সংঘবদ্ধ ও সম্মিলিত কর্মপন্থা গ্রহণ করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। যদিও য়াহূদীরা নিজেদের ফিত্‌রাত ও জন্মগত অভ্যাস অনুযায়ী অতি অল্পদিনের মধ্যেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, তবু মুসলমানদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা এ ব্যাপারে তাদেরকে কোনরূপ উৎসাহ যোগায়নি। বরং মুসলমানরা আগাগোড়া অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে নিজেদের অঙ্গীকার পালন করে যায়। কখনো কখনো কুরায়শদের প্ররোচনা য়াহূদীরাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে অনুপ্রেরণা যোগায়, আবার কখনো ব্যক্তিগত লাভক্ষতি, ভয়ভীতি ও ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারটি তাদেরকে বিচলিত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত তাদের যাবতীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং যাবতীয় আশা আকাংখা তাদেরই প্রজ্জ্বলিত আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সুন্দর নিয়াত (সংকল্প), সুন্দর ব্যবহার এবং সুষ্ঠুভাবে অঙ্গীকার পালনের মুকাবেলায় বদ্‌নিয়্যাত (কুসংকল্প), দুরাচার এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিণতি সর্বদা এমনিই হয় এবং ভবিষ্যতেও হবে।

টীকা ঃ

(১)'আল বিদায়া ওয়ান হিদায়া' গ্রন্থে বনূ শাতীবাহ্‌কে বনূ শাতনা বলা হয়েছে(তৃতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা–২২৫)।

(২) ইয়াছরিব প্রান্তর বলতে ঐ ভূখন্ডকে বুঝায়, যার উত্তরে ও দক্ষিণে ছাওর, আইর ইত্যাদি পাহাড়, পূর্বে ও পশ্চিমে হাররা-ই- ওয়াকিম, হাররা-ই-ওবারাহ প্রভৃতি হাররাহ (কালো পাথর বিশিষ্ট ভূখন্ড) রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনা আগমনকালে এই ভূখন্ডে অনেকগুলো জনবসতি বা মহল্লা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এই সম্পূর্ণ প্রান্তরটি পবিত্র হারামের মত পবিত্র ও সম্মানিত বলে পরিগণিত হয়।

(৩) আহদে নবভী মে নিযামে হুকমরানী ঃ পৃষ্ঠা–৭৪।

(৪) এ ভুলের উদ্ভব হয়েছে সম্ভবতঃ 'সাকীফা-ই-ই বনী সায়িদা' কে ভিত্তি করে, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আনসাররা সমবেত হয়েছিল। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বিশ্বের প্রতিটি অংশে প্রত্যেকটি ছোট বড় জনবসতি তাদের জন সমাবেশের সুবিধার্থে এক বা একাধিক সার্বজনীন ঘর তৈরী করে নেয়। 'সাকীফা-ই-বনী সায়িদা' ছিল এ ধরণেরই একটি ঘর। খুব সম্ভবত: এ ধরনের ঘর ইয়াছরিবের প্রত্যেকটি জনবসতিতেই থেকে থাকবে–যদিও ইতিহাসে সেগুলোকে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন বোধ করা হয়নি।

(৫) আহদে নবভী কা নিযামে হুকমরানী ঃ পৃষ্ঠা–৮০।

গায্ওয়া (যুদ্ধ) সমূহ

যুদ্ধের অনুমতি

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।" (২২ ঃ ৩৯)

কুরায়শ কাফিরদের অকথ্য জুলুম- অত্যাচার

এবার একটু চিন্তা করে দেখুন, কি পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল? দাওয়াতের সূচনাকাল থেকে তাদেরকে যেসব কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো—

১। সত্যের দাওয়াত প্রদানের সাথে সাথে মুসলমানদের উপর অকথ্য জুলুম নির্যাতন শুরু হয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)- কেও সব রকম অত্যাচার করা হয়েছে। বিশেষ করে সত্যের অনুসারীদের উপর যে অমানুষিক জুলুম-নির্যাতন চালানো হয় তা ভাষায় ব্যক্ত করা প্রায় অসম্ভব। তারা দুর্বল ও নিঃস্ব, অসহায় ও নির্যাতিত ছিল শুধুমাত্র এজন্য যে,তাঁরা সেই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করত যিনি এক ও অদ্বিতীয়,যার কোন শরীক নেই এবং তাঁর দিকেই মানুষকে দাওয়াত দিত। তারা কোন অবস্থায়ই কাউকে জবরদস্তি মূলকভাবে নিজেদের 'হাম আকীদা' (সম-বিশ্বাসী) বানাবার চেষ্টা করেনি।

২। সত্যের অনুসারীদের অবস্থা যখন অত্যন্ত শাসরুদ্ধকর হয়ে দাঁড়ল তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ মুতাবিক হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে গেলেন। কিন্তু কাফির কুরাইশ তাঁদের আবিসিনিয়া থেকে বের করে দেওয়ার জন্য উপঢৌকনসহ একদল প্রতিনিধি আবিসিনিয়ার সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করে।

৩। তায়েফে সত্যের দাওয়াত পেশ করতে গেলে সেখানকার উচ্ছৃঙ্খল লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর পাথর বর্ষণ করে—যে কারণে তাঁর পবিত্র ললাট ফেটে গিয়ে এমনভাবে রক্ত প্রবাহিত হয় যে, তা তাঁর কদম মুবারাক আপ্লুত করে ফেলে।

৪। এভাবে তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা সুদীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত নানা ধরনের জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে যান। যখন এর পরিসমাপ্তি ঘটার কোন লক্ষণই পরিলক্ষিত হল না তখন তিনি নিজের ঘরদোর ছেড়ে জন্মভূমি মক্কা মুকাররমা থেকে আড়াইশ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি জনবসতিতে হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)- যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে হিজরত করেছিলেন, তা আপনারা পাঠ করেছেন।

৫। এত দূরদেশে চলে যাওয়া সত্ত্বেও কুরায়শরা মদীনার য়াহূদীদের সাথে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা তার সাঙ্গপাঙ্গদের বলে ঃ তোমরা আমাদেরই লোককে(মুহাম্মদকে) আশ্রয় দিয়েছ। হয় তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তাকে তাড়িয়ে দাও, নয়ত আল্লাহ্র শপথ, আমরা লোক-লস্কর নিয়ে আসব এবং হামলা চালিয়ে তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করব এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদের আমাদের জন্য হালাল মনে করব।

৬। মদীনা মুনাওওরায় মুসলমানদের প্রারম্ভিক যুগ এভাবে অতিবাহিত হয় যে, তারা সর্বক্ষণ অস্ত্র সজ্জিত থাকতেন এই ভয়ে যে, কখন না আবার শত্রুরা তাদের উপর হামলা করে বসে। রাতভর তারা পাহারা দিতেন এবং কোথাও একটুখানি সাড়াশব্দ পেলে তা খতিয়ে দেখার জন্য সেদিকে দৌঁড়ে যেতেন।

মুকাবালায় দৃঢ়তা অবলম্বন

মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানগণ' নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ'এর পর্যায় অতিক্রম করে 'মুকাবালায় দৃঢ়তা অবলম্বনের' পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেন। তাঁদেরকে অনুমতি দেয়া হয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার। যেমন– পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ . أُذِنَ
لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ط وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ط
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ط إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ .

"আল্লাহ্ রক্ষা করেন মুমিনদেরকে। নিশ্চয় তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বের করা হয়েছে শুধু একারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্'। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধবস্ত হয়ে যেত খ্রীষ্টান সংসার-বিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা. য়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ– যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে, তাকে সাহায্য করে (অর্থাৎ তার দ্বীনকে সাহায্য করে)। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।"[১]

–(২২ ঃ ৩৮-৪০)

প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি

মাওলানা আবূল কালাম আযাদ বলেন, উপরোক্ত আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, এবার তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নিতে পারে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, এটাই হচ্ছে প্রথম আয়াত, যাতে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়।

অবশ্য এর পূর্বে মক্কার কুরায়শদের জুলুম অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই বলে যে,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ
لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ط وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ
أَلِيمٍ .

"যারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্‌র পথ হতে ও মসজিদুল হারাম হতে, যা আমি করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান, আর যে সীমা লংঘনপূর্বক ওতে পাপ কার্যের ইচ্ছা করে তাকে আমি আস্বাদন করাবো মর্মন্তুদ শাস্তি।"–(২২ঃ২৫)

এরপর যুদ্ধ বৈধ হওয়ার কারণ কি, তা পরিস্কার ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো, 'তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।' অর্থাৎ মুসলমান মজলূম ও অত্যাচারিত। আর মজলূমের অধিকার আছে জালিম থেকে নিজেকে রক্ষা করার।

এই মজলূমরা তের বছর পর্যন্ত মক্কায় করায়শদের অত্যাচার ও নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করে। কিন্তু বিদেশ বিভূইয়েও তাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তাদের অপরাধ কি ছিল? শুধুমাত্র এই যে, তারা বলত, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্'। অর্থাৎ তারা বলত, আমরা আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের প্রভুকে স্মরণ করতে চাই। আমরা কাউকে বাধ্য করি না যে, সেও আমাদের ইতিকাদ (বিশ্বাস) স্বীকার করুক। কিন্তু অন্যরা কেন আমাদেরকে বাধ্য করে তাদের ইতিকাদ স্বীকার করে নিতে?

তারপর এ বিষয়টি পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, এটা হচ্ছে মজলূমদের জন্মগত অধিকার। যদি তাদেরকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয় তাহলে বিশ্বের মনুষের জুলুম ও বাড়াবাড়ি থেকে নিজেকে রক্ষা করার কোন পথই আর অবশিষ্ট থাকে না। যে দলই যখন শক্তিশালী হবে সে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের ইতিকাদ ও আমলের স্বাধীনতা কেড়ে নেবে। অতএব বলা হয়েছে, আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিশ্বে আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগীর পথ বন্ধ হয়ে যেত। কোন দলেরই ইবাদতগাহ্ বা উপাসনালয় মানুষের জুলুম অত্যাচার থেকে রক্ষা পেত না।

সূরা তাওবার প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ

মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে সূরা তাওবার প্রারম্ভিক ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)- হযরত আবু বকর এবং হযরত আলী (রা) কে যীলকাদ মাসে হজ্জ উপলক্ষে মক্কা প্রেরণ করেন, যাতে তাঁরা হজ্জের সময় একটি সাধারণ ঘোষণা হিসাবে সেই আয়াতগুলো প্রচার করেন। অর্থাৎ

১। যেসব দল অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে তাদের সাথে মুসলমানদেরও কোন অঙ্গীকার থাকল না। এতদ্‌সত্ত্বেও আকস্মিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা হবে না। বরং তাদেরকে চার মাসের অবকাশ দেওয়া হবে। এই অবকাশ কাল হজ্জের দিন থেকে শুরু হয়ে রাবীউল আখিরের দশ তারিখে শেষ হবে।[2] এই সময়কালের মধ্যে তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারবে।

২। যেসব দল বা গোষ্ঠী অঙ্গীকার ভঙ্গ করেনি মুসলমাদের সাথে ইতিপূর্বে সম্পাদিত তাদের অঙ্গীকার নামাও বহাল থাকবে।

৩। 'হারামে কা'বা'কে এখন ঐসব শিরক্ থেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হল, যা আরবের মুশরিকরা এতদিন যাবত সেখানে করত। এখন থেকেই এই ইবাদতগাহ (কা'বা) শুধুমাত্র আহলে তাওহীদ ও আহলে ঈমানের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। অতএব কোন মুশরিক আগামী বছর থেকে যেন কা'বায় আসার সংকল্প না করে।

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ . قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ
اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ . وَيُذْهِبْ
غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . أَمْ حَسِبْتُمْ أَن
تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا

رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ . مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِى النَّارِ هُمْ خَالِدُوْنَ .

"তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও রাসূলের বহিস্করণের সংকল্প নিয়েছে? ওরাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? মুমিন হলে আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে সমীচীন। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ ওদেরকে শাস্তি দেবেন, ওদেরকে বিজয়ী করবেন ও মুমিনদের চিত্ত.প্রশান্ত করবেন এবং ওদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেবেন, যখন তিনি এ পর্যন্ত প্রকাশ করেননি তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ এবং কে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে তার রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহণ করেনি। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেরদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন হতে পারে না। ওরা এমন যাদের সব কর্ম ব্যর্থ এবং ওরা আগুনেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।"-(৯ঃ ১৩-১৭)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, কিভাবে শত্রুদের অনবরত: অঙ্গীকার ভঙ্গ ও অপরিসীম জুলুম অত্যাচারের কারণে যুদ্ধ ঘোষণা করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। বলা হয়েছে,যারা বার বার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং বার বার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, এরপর হুদায়বিয়ার সম্পাদিত শেষ চুক্তিও অন্যায়ভাবে পদদলিত করেছে এখন তাদের অঙ্গীকারকে কী করে অঙ্গীকার মনে করা যেতে পারে? হ্যাঁ,যে জাতিগোষ্ঠী তাদের অঙ্গীকারের উপর কায়েম থাকবে নিশ্চিতভাবে মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত তাদের অঙ্গীকারও বহাল থাকবে। কেননা, ইসলাম কোন অবস্থায়ই অঙ্গীকার ভঙ্গকে বৈধ মনে করে না।[৩]

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে, ওদের শত্রুতার ধরণ এই যে, যদি তারা এখনো সুযোগ পায় তাহলে একজন মুমিনকেও জীবিত ছাড়বে না। যেমনঃ

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَاللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖ اِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ج فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে মুশরিকদের চুক্তি কেমন করে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে মসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, যাবৎ তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে। আল্লাহ্ মুত্তাকীদের পছন্দ করে না।"-(৯ঃ৭)

মোটকথা, যদি যুদ্ধের ঘোষণা না দেওয়া হত তাহলে এর পরিণাম দাঁড়াত এই যে, মুসলমানরা চিরদিন বিপদ ও আশংকার মধ্যেই দিন কাটাত।

একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, যুদ্ধের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তার সম্পর্কও শুধুমাত্র ঐসব মুশরিক দলসমূহের সাথে ছিল, যারা আরবে ইসলামী দাওয়াতকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে লড়ে যাচ্ছিলো। বিশ্বের তাবৎ মুশরিকদের সাথে নয়। সুতরাং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সম্বোধন নির্দিষ্ট দলগুলোর প্রতি।

যুদ্ধের উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা পার্থিব সম্পর্কচ্ছেদ নয়

পুনরায় লক্ষণীয় যে, কুরআন যে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে, তা কি উদ্দেশ্যে দিয়েছে? পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَاِنْ نَكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لاَ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ٠

"তাদের চুক্তির পর তারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে, তবে কাফিরদের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করবে। এরা এমন লোক, যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয়, সম্ভবত: তারা নিরস্ত হতে পারে।"–(৯ ঃ ১২)

অর্থাৎ যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে শুধু এজন্য যে, যাতে তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিরস্ত হয়।

এভাবে পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে–

فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ٠

"যুদ্ধে যদি তোমরা ওদেরকে তোমাদের আয়ত্বে পাও তবে ওদেরকে ওদের পশ্চাতে যারা আছে, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে যাতে ওরা শিক্ষা লাভ করে।"–(৮ ঃ ৫৭)

অর্থাৎ প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কিংবা পার্থিব সম্পর্কচ্ছেদ ও নিছক বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জালিম ও অত্যাচারীদেরকে তাদের জুলুম-অত্যচার থেকে বিরত রাখা। এ কারণেই একান্ত জরুরী অবস্থা ছাড়া কুরআনের দৃষ্টিতে একমুহূর্তও যুদ্ধ অব্যাহত রাখা বৈধ নয়।

সূরা তাওবার ১৪ নং আয়াতে ছয়টি কথা বলা হয়েছে। যথাঃ–

১। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে শাস্তি দেবেন।

২। ওদেরকে লঞ্ছিত করবেন।

৩। ওদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন।

৪। মুমিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন।

৫। ওদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন।

৬। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হন।

আল্লাহ্র লিখন পূর্ণ হলো

চিন্তা করুন, কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ঐ কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হলো। যেমন ঃ–

(ক) আরবের মুশরিকদের অস্তিত্ব চিরতের বিলীন হয়ে গেল।

(খ) যে মুসলমানরা বিশ বছর পর্যন্ত তাদের হাতে নির্যাতিত ও উৎপীড়িত হয়েছিল সেই মুসলমানদের হাতেই তাদের (মুশরিকদের) শক্তির চির সমাপ্তি ঘটল।

(গ) এর চাইতে অধিক লাঞ্ছনা তাদের জন্য আর কী হতে পারে যে, তাদের এই লাঞ্ছনার কথা ইতিহাসের পাতায় চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে রইলো?

(ঘ) এরপর মুসলমানদের অন্তরে নির্যাতন ও অসহায়ত্বের পরিবর্তে কী অতুলনীয় প্রশান্তির সৃষ্টি হলো যে, তারা মাত্র ২৫ বছরের মধ্যে ভূলোকের সবচাইতে প্রতাপশালী ও শ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করল।

টীকা ঃ

(১) যারকানীর বর্ণনা অনুযায়ী ১২ সফর, হিঃ ২ সনে (মুতাবিক ১৫ আগষ্ট, ইং ৬২৩ সনে) যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়। ক্যালেন্ডারের গণনা অনুযায়ী ঐ দিন ছিল সোমবার।

(২) এই অবকাশকাল ছিল ৯ই যিল্‌হাজ্জ হিঃ ৯ সন (মুতাবিক ১৯ মার্চ, ইং ৬৩২ সন) থেকে ১০ রাবীউল আখির, হিঃ ১০ সন (মুতাবিক ১৬ জুলাই, ইং ৬৩১ সন) পর্যন্ত। প্রকাশ থাকে যে, এই দীর্ঘ অবকাশ দানের উদ্দেশ্য এই ছিল, যাতে হঠাৎ তাদেরকে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে না হয়। সেখানে আর একটি উদ্দেশ্য এও ছিল যে, তারা যেন তাদের পূর্ববর্তী অবস্থার উপর স্থির মস্তিস্কে চিন্তা করে এবং যদি সমীচীন মনে করে তাহলে তাতে যেন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ নেয়। প্রকৃত পক্ষে এই অবস্থায়ও তাদের সামনে আপোষকামিতা ও পরস্পর চিন্তাভাবানার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। অবশ্য তাদের পূর্ববর্তী আচার-ব্যবহারকে সম্পূর্ণ অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়।

(৩) যদি বর্তমান যুগে অথবা যে কোন যুগে মুশরিক ও বিরুদ্ধবাদীরা ইসলামী দাওয়াতের পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেই পথ অবলম্বন করে, যে পথ আরবের মুশরিকরা অবলম্বন করেছিল, তাহলে মুসলমানানদের জন্য আল্লাহ্‌র এই নির্দেশের উপর আমল না করে গত্যন্তর থাকবে না।

সন্ধি স্থাপন ও প্রতিরক্ষামূলক অভিযান

[হিজরত থেকে বদর যুদ্ধ পর্যন্ত]

হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন দিকে ছোট ছোট অভিযান পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। কোন কোন অভিযানের নেতৃত্ব তিনি স্বয়ং দিয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে কোন কোনটিকে সারিয়া এবং কোনটিকে গায্ওয়া বলা হয়ে থাকে। যেহেতু এই সব অভিযান মূলত: সন্ধি, স্থাপন ও যুদ্ধ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ছিল, তাই ইতিহাসে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাষায় এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। আমি এগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র অধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেই আমার বক্তব্য শেষ করবো।

গায্ওয়া–ই-আব্ওয়া

রাসূলুল্লাহ্ (সা)- হিঃ ২ সনের সফর মাসে (মুতাবিক ইং ৬২৩ সনের আগষ্ট মাসে) মদীনা মুনাওওরা থেকে রওয়ানা হন। তিনি সা'দ বিন উবাদা (রা) কে মদীনায় আপন পতিনিধি নিয়োগ করে যান। তিনি ওয়াদ্দানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ওয়াদ্দান ছিল আবওয়ার নিকটে।[১] এদুটির মধ্যে দূরত্ব ছয় অথবা আট মাইল। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই গায্ওয়াকে একাধারে গায্ওয়া-ই- আবওয়া ও 'গায্ওয়াকে-ই- ওয়াদ্দান' বলা হয়ে থাকে। নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহীয়সী মাতা ইয়াছরিব থেকে প্রত্যাবর্তন কালে আবওয়া নামক স্থানেই ইন্তিকাল করেন এবং এখানেই সমাহিত হন।

এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)- বনূ যামরা বিন আবদে মানাত-এর সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। সন্ধি পত্রে বনূ যামরার নেতা মাখশী বিন আমর স্বাক্ষর করেন। এটা হচ্ছে প্রথম গায্ওয়া, যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)- স্বয়ং অংগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত উবায়দার অভিযান

আবওয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফর মাসের বাকি দিন এবং রাবীউল আউয়াল মাস মদীনা মুনাওওরায় অতিবহিত করেন। রাবীউল আখির, হিঃ ২সনে (মুতাবিক অক্টোবর, ইং ৬২৩ সনে) উবায়দা বিন হারিছের নেতৃত্বে সত্তর জন উষ্ট্রারোহীকে একটি অভিযানে প্রেরণ করা হয়। তাঁরা 'সানইয়াতুল মুররা'-এর নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ে গিয়ে পৌছেন।[২] সেখানে ইকরামা বিন আবু জাহ্ল (অপর বর্ণনা মতে মাকরিয বিন হাফস)-এর নেতৃত্বে কুরায়শের একটি দল অবস্থান করছিলো। কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে কোন যুদ্ধ হয়নি। অবশ্য সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস, যিনি এই অভিযানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, একটি তীর নিক্ষেপ করেন। ইসলামী অভিযান পরিচালনার পথে এটাই ছিল প্রথম তীর। কুরায়শ দলের সাথে মিকদাদ বিন আমর এবং উতবা বিন গাযওয়ান (রা) ও ছিলেন। তাঁরা ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পৌছার কোন পথ তারা পচ্ছিলেন না। এবার এই অভিযান থেকে সুযোগ গ্রহণ করে তাঁরা উভয়ে মুসলিম অভিযাত্রীদের সাথে এসে মিলিত

হন। উতবা বিন গাযওয়ান হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি পরবর্তীকালে, হযরত উমর (রা)-এর খিলফত আমলে বসরা শহরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

হযরত হামযা (রা)-এর অভিযান

রাসূলুল্লাহ্ (সা) উবায়দ বিন হারিছ (রা) কে প্রেরণ করার পর হযরত হামযা (রা)কে ত্রিশ জন অশ্বারোহীসহ সমুদ্রোপকূলবর্তী ঈস এর দিকে পাঠান। তারা আবু জাহলের নেতৃত্বাধীন ত্রিশজন কুরায়শ অশ্বারোহীর একেবারে মুখোমুখী হয়ে পড়েন। কিন্তু মাজিদ্দী বিন আমর আল জুহনী দুই দলের মধ্যে পড়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয় নি। কেননা উভয় দলের সাথেই মাজিদ্দীর সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ছিল। অভিযানে শুধুমাত্র মুহাজিরগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাতে আসনারগণের কেউ ছিলেন না।

গাযওয়া-ই-বাওয়াত

রাবীউল আখির, হিঃ ২ সনে (অক্টোবর, ইং ৬২৩ সনে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) সায়িব বিন উছমান বিন মায্উনকে মদীনা মুনাওওরায় আপন প্রতিনিধি নিয়োগ করে খোদ বাওয়াত অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু কোন যুদ্ধ বা সংঘর্ষ ছাড়াই তিনি সেখান থেকে মদীনায় ফিরে আসেন। বাওয়াত বা বুয়াত হচ্ছে জুহায়না এলাকার একটি পাহাড়ের নাম। ঐ পাহাড়ের দু'টি উঁচু চূড়া থাকায় সেটাকে বাওয়াতানও বলা হত।

গায্ওয়া-ই-উশায়রাহ

জমাদিউল উলা, হিঃ ২ সনে (মুতাবিক নভেম্বর, ইং ৬২৩ সনে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সালামাহ্ বিন আবদুল আসাদ মাখযূমীকে মদীনায় আপন প্রতিনিধি নিয়োগ করে এক অভিযানে উশায়রাহ্ অভিমুখে রওয়ানা হন। উশায়রাহ ইয়াম্বু' অঞ্চলেরই একটি স্থানের নাম। তিনি (সা) সেখানে জামাদিউল উলার বাকি দিন এবং জমাদিউল উখরার কিছুদিন অতিবাহিত করেন। ইতিমধ্যে বনূ যুমরাহ্-এর মিত্র বনূ মুদলিজের সাথেও একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ইতিপূর্বে বনূ যুমরাহ্-এর সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন হওয়ার কারণে বনূ মুদলিজের সাথে চুক্তি সম্পাদনে কোনই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। মরহুম মাওলানা শিবলী 'রাওযুল উনুফ' ও 'যারকানী'-এর হাওয়ালা (রেফারেন্স) দিয়ে বিভিন্ন গোত্রের সাথে চুক্তি সম্পাদনের যে ধারাগুলোর উল্লেখ করেছেন, তার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিম্নে দেওয়া গেল।

১। গোত্রসমূহের জানামালের নিরাপত্তা থাকবে।

২। যারা ওদের উপর হামলা করবে তাদের (হামলাকারীদের) বিরুদ্ধে ওদেরকে সাহায্য করা হবে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে শুধু তখনই যখন গোত্রগুলো আল্লাহ্র দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়বে।

৩। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ওদেরকে সাহায্যের জন্য আহবান জানাবেন তখন তারা সে আহ্বানে সাড়া দেবে।

বাহ্যত: এ ধরণের চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্য শুধুমাত্র এই ছিল যে, গোত্রগুলো যেন মুসলমানদের দিক থেকে পুরোপুরি নিশ্চিত (প্রশান্ত চিত্ত) হয়ে যায় এবং কুরায়শরা যেন ওদের কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা না পায়। এর মধ্যে দু'টি উপকারিতা ছিল।

(ক) মুসলমানদের জন্য মদীনার আশে পাশে, বিশেষ করে ঐ সব স্থানে, যেখান দিয়ে কুরায়শের বাণিজ্য-কাফেলা অতিক্রান্ত হয় – নিরাপত্তা ও সন্ধির আওতা মজবুত, সুদৃঢ় ও বিস্তৃততর হবে।

(খ) স্বয়ং গোত্রগুলোর মধ্যেও পরস্পর সংঘর্ষ ও রেষারেষির মনোবৃত্তি ক্রমশ: লোপ পাবে।

গাযওয়া-ই-বদরুল উলা

গাযওয়া-ই-উশায়রা থেকে প্রত্যাবর্তনের দশ দিন পর কুরয বিন জাবির আল ফিহ্রী মদীনা মুনাওওরার চারণভূমির উপর হামলা চালায়। সে কিছু গাছ কাটে, এক জন মুসলমানকে শহীদ করে এবং কিছু গৃহপালিত পশু

ধরে নিয়ে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার পশ্চাদ্ধাবনে বের হন, এমন কি বদর এলাকার সেই উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছেন্, যাকে সাফওয়ান বলা হয়। কিন্তু কুরয দ্রুত পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে ফিরে আসেন। এই গায্ওয়াকে 'বদরুল ঊলা' ও বলা হয়ে থাকে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ উপলক্ষে বদর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আবার এটাকে 'গাযওয়া-ই-সাফওয়ান'ও বলা হয়। কেননা সাফওয়ান হচ্ছে ঐ বিশেষ উপত্যকার নাম, যেখান পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরযের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন।

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের অভিযান

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আটজন মুহাজিরসহ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসকে প্রেরণ করেন। সা'দ খাররার পর্যন্ত যান। খাররার, জাহ্ফাহ্-এর সন্নিকটে এবং রাবিগের উত্তরে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম। ধারণা করা হয় যে, এই অভিযানও কুরযের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু কুরযকে পাওয়া যায় নি, অতএব কোন যুদ্ধও হয় নি। সা'দ সেখান থেকে নিরাপদেই মদীনায় ফিরে আসেন।

আবদুল্লাহ বিন জাহশের অভিযান

রজব,হিঃ ২ সনের শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আটজন লোকসহ আবদুল্লাহ বিন জাহশকে একটি অভিযানে পাঠান এবং তাঁর সফরের দিক-নির্দেশও প্রদান করেন। তিনি তাঁর সাথে একটি লিখিত লিপিও দেন এবং নির্দেশ দেন, যেন তিনি (আবদুল্লাহ্) দু'দিন পর তা পাঠ করেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন। আবদুল্লাহ্ বিন জাহশ দু'দিন পর লিপিটি পাঠ করেন। তাতে বলা হয়েছিল, নাখলায় যাও এবং সেখানে কুরায়শের গতিবিধি লক্ষ্য কর কিংবা তাদের কাফেলাসমূহের উপর নজর রাখ এবং আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় খবর পাঠাও। কিন্তু তোমার কোন সংগীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বাধ্য করো না।

লিপি পাঠ করে আবদুল্লাহ্ তাঁর সংগীদেরকে পরিস্কার ভাষায় বলে দেন, যার শাহাদত লাভের বাসনা আছে, সে যেন আমার সংগে থাকে। যেহেতু সকলেই শাহাদত লাভে আগ্রহী ছিলেন, তাই কেউই এ ব্যাপারে তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন নি। অবশ্য সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস ও উতবাহ্ বিন গাওয়ানের উট হারিয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁরা কাফেলা ছেড়ে পিছনে থেকে যান। সকল সাহাবী নাখলায় গিয়ে পৌঁছেন। ঠিক তখনি কুরায়শের একটি বাণিজ্য কাফেলা মুনাক্কা, চামড়া এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রী নিয়ে তাঁদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলো। আমর বিন আল হায্রামীও ঐ কাফেলার সাথে ছিল।

কুরায়শ-কাফেলার লোকরা ঐ মুহাজিরদের দেখা মাত্র ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু উক্কাশাহ্ বিন মিহ্সানের মাথা মুন্ডিত ছিল বিধায় তারা মনে করে যে, এই সব লোক উমরা করে আসছে। অতএব এদের ব্যাপারে ভীতিগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই।

ইবনে জাহশ (রা)-এর সিদ্ধান্ত এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন

আবদুল্লাহ্ বিন জাহশ তাঁর সংগীদেরকে বলেন, যদি আজ রাতেই এদের উপর হামলা করা না হয় তাহলে আগামীকাল এরা 'হারাম' -এর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়বে। তখন তাদেরকে তো আর স্পর্শ করা (হত্যা করা) যাবে না। যদি আজ হামলা করা হয় তাহলে এটা হচ্ছে রজবের শেষ দিন।[৩] অতএব আজ তাদের মধ্যে যদি কেউ নিহত হয় তাহলে এটাও 'হারাম মাসের হত্যাকান্ড' বলে পরিগণিত হবে।[৪] কিন্তু এক্ষেত্রে একটি আশংকা এও ছিল যে, এই সব লোক মক্কা পৌঁছেই কুরায়শদেরকে মুহাজিরদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবে এবং ওরা সংগে সংগে এখানে এসে মুহাজিরদের উপর নির্ঘাত আক্রমণ চালাবে। যাহোক, চিন্তাভাবনার পর বাণিজ্য কাফেলার উপর হামলা চালাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওয়াকিদ তামীমীর তীরের আঘাতে আমর বিন আল হাযরামী নিহত হয়। উছমান বিন আবদুল্লাহ এবং আল হাকাম বিন কায়সানকে বন্দী করা হয়। নওফল বিন আবদুল্লাহ বিন জাহশ এবং তার সঙ্গীরা কাফেলার উট এবং কয়েদীদেরকে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। ইবনে জাহশ মালে গনীমতের এক পঞ্চমাংশ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জন্য পৃথক করে রাখেন এবং অবশিষ্টাংশ সংগীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তিনি মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সামনে তাঁর অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, 'আমি তোমাকে হারাম মাসগুলোতে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেই নি।' অতএব মালে গনীমত ও কয়েদীদের ব্যাপারটি তখনকার মত স্থগিত (মুলতবী) হয়ে পড়ে।

আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্ত

এরপর নিম্নের আয়াত নাযিল হয় –

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ط وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ .

"পবিত্র মাসে (যীলকাদা, যীলহাজ্জ, মুহাররম ও রজব এই চার মাস আরবদের কাছে অতি পবিত্র ছিল। তাই তারা এই সময়কালে সুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হত না।) যুদ্ধ সম্পর্কে লোকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে; বলুন, 'ওতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্কে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে (প্রবেশে) বাধা দেওয়া এবং এর বাসিন্দাকে সেখানে থেকে বহিস্কার করা আল্লাহ্র কাছে তার চাইতেও অধিক অন্যায়, ফিত্না (দাংগা, বিশৃঙ্খলা, শিরক, কুফর, ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি) হত্যা অপেক্ষা ভীষণ অন্যায়।" – (২ ঃ ২১৭)

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'খুমুস' (এক পঞ্চমাংশ) গ্রহণ করেন, মালে গনীমত অভিযাত্রীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং সা'দ ও উতবা নিরাপদে ফিরে আসার পর ফিদিয়ার বিনিময়ে মক্কার কয়েদীদের মুক্তি প্রদান করেন। কয়েদীদের মধ্য থেকে আল হাকাম বিন কায়সান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায়ই থেকে যান। পরবর্তীকালে তিনি বি'-রে মাঊনার ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেন। অপর কয়েদী উছমান বিন আবদুল্লাহ্ মক্কায় কাফির অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করে।

আবূ জাহ্ল, আমর বিন হাযরামীর হত্যাকেই বিভিন্ন কূটকৌশলের মাধ্যমে 'গাযওয়া-ই-বদর' এর মৌলিক কারণে পরিণত করেছিল। সামনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হরা হবে। (সংকলক)

টীকা ঃ

(১) মক্কা ও দীনার মধ্যস্থলে রাবিগ একটি বিখ্যাত স্থান। সেখান থেকে উত্তর দিকে অগ্রসর হলে 'আবওয়া' পাওয়া যায়। মদীনা মুনাও্ওরা থেকে এর দূরত্ব আশি অথবা একশ মাইল হবে।

(২) সানইয়াতুল মুররা একটি পাহাড়ের নাম, যার উল্লেখ হিজরতের সফরেও এসেছে। অধিকাংশের মতে শব্দটি আল মুররা। কিন্তু ইয়াকূতের মতে 'আল মুরারা'।

(৩) ৩০ রজব, হিঃ ২ সন (মুতাবিক ২৭ জানুয়ারী, ইং ৬২৪ সন)।

(৪) আরবদের মতে, রজব মাস, হারাম মাস চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ এই মাসেও কাউকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ছিল।

গায্‌ওয়া-ই-বদর বা বদর যুদ্ধ

বদর যুদ্ধ-১

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ج

"এবং বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন।"

রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানগণ মক্কা মুকাররমা ছেড়ে আড়াই'শ মাইল উত্তরে চলে আসেন, নিরাপদে সত্য দীনের প্রচার চালাতে। কিন্তু কুরায়শের শত্রুতা সেখানেও তাদের শান্তিতে থাকতে দেয়নি

ইবনে উবাইয়ের সাথে ষড়যন্ত্র

কুরায়শরা সর্বপ্রথমে আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে ষড়যন্ত্রের কাজে ব্যবহারের জন্য নির্বাচন করে। এরা মদীনা মুনাওওরার দুই বৃহত্তম আরব সম্প্রদায় আওস ও খাযরাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নি। কুরায়শরা তাদেরকে লিখলো, তোমরা আমাদের যে সব লোককে তোমাদের ওখানে আশ্রয় দিয়েছ, তাদেরকে যদি অবিলম্বে বের করে না দাও তাহলে আমরা সবাই একযোগে তোমাদের উপর হামলা চালাবো। তোমাদের যুবকদের হত্যা করবো এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে আমাদের অধিকারে নিয়ে আসবো।

ইবনে উবাই এবং তার সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যুদ্ধ করার সংকল্প নেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এই সংবাদ জানতে পারেন তখন তিনি ওদের কাছে যান এবং ওদেরকে বুঝিয়ে বলেন ঃ কুরায়শরা তোমাদের ধোকা দিচ্ছে। যদি তোমরা যুদ্ধ কর তাহলে তোমাদেরই ঐসব সন্তান ও ভাইদের সাথে যুদ্ধ করবে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে তোমরা উভয় পক্ষই আপন। অতএব এ যুদ্ধে অন্য কেউ নয়, বরঙ তোমরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু যদি কুরায়শের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর তাহলে এ যুদ্ধ অন্যের সাথে হবে (নিজেদের মধ্যে নয়)। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত তাদের অন্তরে এমনি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যে, তারা মুসলামানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প পরিত্যাগ করে।

য়াহূদীদের চুক্তি ভঙ্গ

এরপর কুরায়শারা মদীনা মুনাও্ওয়ারার য়াহূদীদের সাথে ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং যখন তাদেরকে নিজেদের পক্ষে টেনে নিতে সক্ষম হয় তখন মুসলামানদেনকে বলে পাঠায়ঃ আমাদের চোখ ফাকি দিয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে গেছ বলে গর্ববোধ করো না । কেননা আমরা কখনো তোমাদের পেছন ছাড়বো না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, য়াহূদীরা 'সাহীফা' তথা মদীনা চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করেছিল। এতদ্‌সত্বেও তারা কুরাইশদের প্ররোচনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

এরপর কুরায়শরা মদীনায় মুসলমানদের উত্যক্ত করতে শুরু করে। রাবীউল আউয়াল,হিঃ ২ সনে (মুতাবিক সেপ্টেম্বর, ইং ৬২৩ সনে) কুরয বিন জাবির আল ফিহ্‌রী নামক জনৈক কুরায়শ সরদার মদীনা মুনাওওরায় এসে পৌছে। তখন আনসারদের গৃহপালিত পশুগুলো মাঠে চরছিল। কুরয সেগুলোকে ধরে নিয়ে চলে যায়। তারপর

তার পশ্চাদ্ধাবন করা হয় সত্য , তবে সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এটা একথার ইঙ্গিত ছিল যে, কুরায়শরা মুসলমানদেরকে মদীনা মুনাওওয়ারায়ও স্বস্তিতে থাকতে দেবে না। শেষ পর্যন্ত ঘটেওছিল তাই। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল যে,রাসুলূল্লাহ (সা) সারা রাত জেগে জেগে কাটিয়ে দিতেন। বুখারীর একটি রিওয়ায়াতে আছে, তিনি একদা বলেছিলেন, আজ যদি কোন একজন ভাল লোক পাহারা দিত। তার এ আহবানে সাড়া দিয়ে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) রাতভর পাহারা দেন এবং ঐ সুযোগে রাসুলুল্লাহ্ (সা) বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

দু'টি কার্যকর পাল্টা সিদ্ধান্ত

রাসুলুল্লাহ (সা) কুরায়শদের আক্রমণ থেকে মদীনাকে রক্ষার জন্য দু'টি কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একঃ কুরায়শদের সিরিয়াগামী বাণিজ্যপথ বন্ধ করে দেওয়া হবে। দুইঃ মদীনার আশে পাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোর সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালানো হবে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য , রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর শান্তি চুক্তি সম্পাদনে এ কর্মধারাটি বরাবর অব্যাহত থাকে।

কুরায়শরা যুদ্ধর জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে বসেছিল এবং যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্যও তারা সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যে, মক্কাবাসীদের হাতে এখন যে পুঁজি আছে, তা সিরিয়াগামী বাণিজ্য কাফেলার হাতে অর্পণ করা হবে এবং এই বাণিজ্যে যত মুনাফা হবে, তার সম্পূর্ণটাই যুদ্ধ সামগ্রী ক্রয়ের কাজে নিয়োগ করা হবে। এটাই হচ্ছে সেই বাণিজ্য কাফেলা, যার উপর হামলা চালানোর কথা সেই মুসলমানরা সর্বপ্রথমে চিন্তা করেছিল। প্রবিত্র কুরআনের সূরা আনফালে বর্ণিত দুই দলের একদল (إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ) দ্বারা প্রথমে এই কাফেলাকেই মনে করা হয়েছিল, যাতে এক হাজার উট ও পঞ্চাশ হাজার দীনার মূল্যের ব্যবসা -সামগ্রী ছিল।

বাণিজ্য- কাফেলার উপর হামলা প্রসঙ্গ

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে কাফেলাকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার ব্যাপারটা সমর্থন না করাটা এক ধরনের কপটতা ছাড়া কিছুই নয়। কুরায়শ এবং মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। আর যুদ্ধাবস্থায় শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা কোন নিন্দনীয় ব্যাপার হতে পারে না । যে সব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ এব্যাপারে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়েছেন,আমরা মনে করি তারা প্রকৃত ব্যাপারটি তলিয়ে দেখেন নি। তারা শুধু এই ভেবে বিষয়টি সমর্থন করেন নি যে, এতে না আবার মুসলমানরা লুটপাটের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু শত্রুর আগ্রাসন বন্ধ করার জন্য তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং তার যুদ্ধ সামগ্রী ও সহায়-সম্বল কেড়ে নেওয়া সব দিক দিয়েই ন্যায় এবং বৈধ । এটা সবার কাছেই কার্যকর যুদ্ধ কৌশল। اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ –(ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর) এর অর্থ তাই । আল্লাহই জানেন, উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ এই চিরন্তন সত্যটি স্বীকার করে নিতে কেন ইতস্তত: করলেন? এটা কোন লুণ্ঠন ছিল না; বরং ছিল একজন প্রাণঘাতী শত্রুর হিংসা ও বিদ্বেষপুর্ণ পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা মাত্র। এটা কি সত্য নয় যে, মক্কার কুরায়শরা নির্বিবাদে ঐ সব বিষয় সম্পদ হাতিয়ে নিয়েছিল, সেগুলো মুহাজিররা মক্কায় রেখে এসেছিলেন। তাছাড়া কুরায়শরা নিয়মিত ও আকস্মিক হামলা বরাবর অব্যাহত রেখে ছিল। অথচ মুসলমানরা না কুরায়শের সাথে যুদ্ধ করতে আগ্রহী ছিল,আর না অন্য কারো সাথে। কুরায়শ কাফেলার উপর হামলা করাটা কোন আগ্রাসী পদক্ষেপ ছিল না, বরং ছিল সরাসরি একটি পরীক্ষা মূলক পদক্ষেপ এবং যুদ্ধাবস্থায় এটা করা হয়েছিল। এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাণিজ্য কাফেলার উপর হামলার পবিবর্তে ঐ মুহুর্তে বদরের যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। সেটাকে (ঐ দিনকে, যেদিন বদরযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল) পবিত্র কুরআনে 'ইয়াওমুল ফুরকান' (মীমাংসার দিন) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

অজুহাত পেশ কেন ?

প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যাপারেই অজুহাত পেশ করা নিছক দুর্বলতার লক্ষণ। আর যখন কখনো দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে তখন সেটাকে দলীল-প্রমাণ বা ভাষার মারপ্যাঁচ দ্বারা মজবুত ও সুদৃঢ় করা যায় না। আর যেখানে কোন বিষয়ের স্বরূপ ও সত্যতা মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান, তার দিকে চোখ বন্ধ করে অজুহাত পেশ করতে যাওয়া নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ও অভাবনীয়।

আবূ সুফ্য়ানের সতর্ক বাণী

নি:সন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলার প্রত্যাবর্তনের খবর জানার জন্য একটির পর একটি সন্ধানী দল পাঠাতে থাকেন। এ ধরনেরই কোন একটি দল কর্তৃক প্রেরিত সংবাদ অনুযায়ী তিনি মদীনা মুনাওওরা থেকে বের হন। ওদিকে কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলার অধিনায়ক আবূ সুফ্য়ানও বেকার বসে ছিল না। তারও এই দুশ্চিন্তা ছিল যে, মুসলমানরা নিশ্চয়ই তার সন্ধানে রয়েছে। অতএব পথিমধ্যে সে যাকেই পেত তাকেই এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করত এবং নিঃসন্দহ না হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হত না। খোঁজ খবর নেওয়ার পর যখন তার বিশ্বাস হল যে, মুসলমানরা রাস্তায় টহল দিচ্ছে তখন সে বদর নামক স্থানে পৌঁছার পূর্বেই যাম্‌যাম্ গিফারীকে মক্কা অভিমুখে প্রেরণ করে যাতে সে কুরায়শকে এই মর্মে খবর দেয় যে, তাদের বাণিজ্য কাফেলা বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে। অতএব এটাকে রক্ষা করার জন্য তারা যেন অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই ছিল যে, তখন পর্যন্ত সে কোন প্রকাশ্য বা অদূরবর্তী বিপদেরও সম্মুখীন হয় নি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্গমন

'তারীখ-ই ইবনে ইসহাক' অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৮ রমযান, হিঃ ২ সন, (মুতাবিক ৪ অথবা ৫ মার্চ, ইং ৫২৪ সন) সোমবার দিন মদীনা মুনাওওরা থেকে রওয়ানা হন। আর 'তারীখ-ই-ইবনে সা'দ' অনুযায়ী তিনি (সা) মদীনা মুনাওওরা থেকে রওয়ানা হন ১২ রমযান, হিঃ ২ সন (মুতাবিক ৮ মার্চ, ৬২৪ সন) রোজ শনিবার।

সফরের মনযিলসমূহ

ঐ সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সব স্থান অতিক্রম করেন সেগুলো হলো, আকীক, যুল হালীফা (বর্তমানে আ-বারে আলী), উলাতুল জায়শ, তুরবান, মালাল, আমীসুল হাম্মাম[১], সাখীরাতুল ইয়ামামাহ্, সায়ালাহ্, ফাজুর রাওহা, শানূকাহ্, আরকুয্ যবীহ্, সাজসাজ[২], মুনসারিফ[৩], আল গাযিয়াহ্, ওয়াদিয়ে রুহকান, সাফরা,[৪] ওয়াদিয়ে যাফিরান। এই স্থানেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, মক্কার কুরায়শ বাহিনী বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসছে। তখন পর্যন্ত দুই দলের মধ্যে শুধু একটি দল অর্থাৎ বাণিজ্য কাফেলা মুসলমানদের লক্ষ্যবস্তু ছিল। অপর দল (কুরায়শ বাহিনী) সম্পর্কে তারা নিশ্চিতভাবে কিছুই জানতেন না। এবার দু'টি দলই স্বাভাবিক দৃষ্টিগোচর হল।

কুরআনের ভাষায়—

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ .

"স্মরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের (একদল আবূ সুফয়ানের বাণিজ্য কাফেলা, অন্যদল আবু জাহলের নেতৃত্বাধীন কাফিরদের সশস্ত্র বাহিনী) একদল তোমাদের আয়ত্বাধীন হবে।" – (৮ : ৭)

যাফিরানেই সেই পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যে; বাণিজ্য কাফেলার স্থলে কুরায়শ বাহিনী সমানাসামনি এসে পড়লে কি করতে হবে।

মুসলিম গোয়েন্দা বাহিনী

এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফরাত থেকে এবং অপর রিওয়ায়াত অনুযায়ী মদীনা মুনাওওরা থেকে বাস্‌বাস্ বিন আমর আলজুহ্‌নী এবং 'আদী বিন আবিয যাগ্‌বাকে বাণিজ্য কাফেলার সংবাদ সংগ্রহের জন্য বদর নামক স্থানে প্রেরণ করেন[৫]। তাঁরা বদরে পৌঁছে জলাশয়ের কাছে উট বসিয়ে মশকে পানি ভরছিলেন, এমন সময় স্থানীয় দু'টি মেয়েও পানি ভরার জন্য সেখানে আসছিলো। তারা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করছিলো। তাদের একজন অপর জনের কাছে ঋণী ছিল এবং ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতাকে জবাবে বলছিলো, আগামী কাল অথবা পরশু বাণিজ্য কাফেলা আসছে। আমি তাদের কাছে শ্রমিক হিসাবে খেটে তোমার ঋণ পরিশোধ করে দেব। মাজদী বিন আল জুহনী নামক জনৈক ব্যক্তিও সেখানে ছিল (সে ইতিপূর্বে কুরায়শ এবং মুসলমানদের মধ্যকার বহু সংঘর্ষ ঠেকিয়েছে)। সেও বাণিজ্য কাফেলার আগমনের সংবাদ সত্যায়িত করলো। ফলে মেয়েদের এতটুকু তথ্যই যথেষ্ট ছিল। তাঁরা সংগে সংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে গিয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন।

কাফেলা পালিয়ে বাঁচলো

ওদের চলে যাওয়ার পর আবূ সুফ্‌য়ান বদরে এসে পৌঁছল। মাজদীকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি এখানে কোন প্রতিকূল অবস্থার সন্ধান পেয়েছ। মাজদী উত্তর দিল, দুজন উষ্ট্রারোহী এসেছিল। তারা এখানে তাদের উষ্ট্র বসিয়ে জলাশয় থেকে পানি ভরে নিয়ে গেছে। আবূ সুফ্‌য়ান তখন উট বসার জায়গার দিকে এগিয়ে গেল এবং উটের লাদ ভেংগে পরীক্ষা করে দেখতে পেল, তাতে খেজুরের বীচির টুকরা রয়েছে। এটা ছিল মদীনাবাসীদের উটের একটি বিশেষ খাবার। এ থেকে তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, মুসলিম কাফেলা তার সন্ধানে রয়েছে। সে সংগে সংগে আপন কাফেলার কাছে ফিরে গেল এবং বদর থেকে তার মোড় সেই রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে দিল, যে রাস্তাটি সমুদ্র উপকূল ঘেঁসে মক্কার দিকে চলে গেছে। মোটকথা, আবূ সুফ্‌য়ান বদরকে বাঁয়ে রেখে সমুদ্র উপকূলের রাস্তা ধরে দ্রুত মক্কার দিকে পালিয়ে গেল।

হিকমতে ইলাহী

এবার আল্লাহ্‌র হিকমত ও রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথমে মুসলমানদের লক্ষ্য ছিল শত্রুদের একটি দল অর্থাৎ বাণিজ্য-কাফেলা। অপর দলের কথা হয়ত তাঁরা চিন্তা করে থাকবেন। তবে তার অস্তিত্বের ব্যাপারটি তাঁদের কাছে মোটেই নিশ্চিত ছিল না। এরপর দু'টি দলই সামনে এসে পড়ল। কিন্তু প্রথম দলটি বিপদের একটুখানি আঁচ পেয়ে রাস্তা বদল করে পালিয়ে গেল। আর যে দলটি প্রথমে অদৃশ্য ছিল তারা শুধুমাত্র এজন্য দৃশ্যমান হল যে, তারা তাদের বাণিজ্য-কাফেলাকে সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু পথিমধ্যে যখন তারা জানতে পারল যে, তাদের কাফেলাটি নিরাপদে মক্কা অভিমুখে চলে গেছে তখন কিন্তু তারা তাদের নেতা আবূ জাহ্‌লের কারণেই মক্কায় ফিরে গেল না, বরং দাঁত খিঁচাতে খিঁচাতে বদর পর্যন্ত এগিয়ে এল, যাতে নিজেদের প্রতিপত্তি ও বল-বিক্রম প্রদর্শন করে আশেপাশের গোত্রগুলোকে অভিভূত তথা সতর্ক করে যেতে পারে। যাহোক ঐ দুইদলের একদল মুসলমানদের আয়ত্বাধীনে আসবে – আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি এমনভাবে পূর্ণ হল যে, এর মাধ্যমেই ইসলামী ইতিহাসের পাতায় সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয়ের পাতা উন্মুক্ত হয়ে গেল।

কুরায়শের মনযিলসমূহ

এখানে একথাটিও মনে রাখা ভাল যে, কুরায়শ বাহিনীর মক্কা মুকাররমা থেকে রওয়ানা হয়ে বদর পৌছতে আট দিন সময় লেগেছিল। তাদের মনযিলসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে–

১। মক্কা মুকাররমা ও ইসফানের মধ্যবর্তী স্থান। এখানে আবূ জাহ্‌ল সম্পূর্ণ কুরায়শ বাহিনীর জন্য দশটি উট জবাই করে।

২। উসফান। এখানে উমাইয়া বিন খালফ নয়টি উট জবাই করে।

৩। কুদায়দ। এখানে সাহল বিন আমর দশটি উট জবাই করে।

৪। কুদায়দ থেকে কুরায়শ বাহিনী সমুদ্রের দিকে মোড় নেয় এবং পথিমধ্যে যেখানে মিঠা পানির জলাশয় ছিল সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে। শায়বা বিন রাবী'আ সেখানে নটি উট জবাই করে।

৫। জুহফাহ্। এখানে উতবা বিন রাবীআ দশটি উট জবাই করে।

৬। আরওয়া। হাজ্জাজের ছেলেরা এখানে দশটি উট জবাই করে।

৭। আবওয়া ও বদরের মধ্যবর্তী স্থান। আব্বাস এখানে দশটি উট জবাই করেন।

৮। বদর। এখানে আবুল বাখতারী দশটি উট জবাই করে।

যাফিরানের বৈঠক

কুরায়শের আগমন সংবাদ শুনামাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবা কিরামকে একত্রিত করেন, যাতে করে পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে তাঁদের মতামত জানা যায়। ঐ বৈঠকে সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর (রা) একটি অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। এরপর হযরত উমর (রা) তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তারপর মিকদাদ বিন আমর বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্ আপনাকে যা বলেছেন, আপনি তা-ই করুন। আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহ্র কসম, আমরা আপনাকে সেকথা বলব না, যা বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-কে বলেছিল। তারা বলেছিল,

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ .

"তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকবো (৫ ঃ ২৪)।"

সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি সত্যসহ আপনাকে পাঠিয়েছেন, যদি আপনি 'বারকুল গামাদ'[৬] পর্যন্ত এগিয়ে যান, তাহলে সেখানে পৌছা পর্যন্তও আমরা আপনার সাথে থাকবো।

হুযূর (সা) একথা শুনে তাঁদের প্রশংসা করেন এবং তাঁদের জন্য দু'আ করেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর , হযরত উমর, হযরত মিকদাদ—এ তিনজনই ছিলেন মুহাজির। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসারদের মতামতও জানতে চাচ্ছিলেন। কেননা, ধারণা হচ্ছিলো, আনসাররা হয়ত শুধুমাত্র মদীনা মুনাওওয়ারার জন্য তাঁর হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সুতরাং তিনি (সা) আবার বললেন, আমাকে পরামর্শ দাও। এবার সা'দ বিন মুআয[৭] দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি সম্ভবত: আমাদেরকে সম্বোধন করেছেন। আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনাকে সত্য বলে জেনেছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য। আমরা অত্যন্ত পাকাপাকিভাবে আপনার আনুগত্যের অঙ্গীকার প্রদান করেছি। আপনার যেদিকে ইচ্ছা এগিয়ে যান, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি সত্যসহ আপনাকে পাঠিয়েছেন, যদি আপনি সমুদ্রকেও আমাদের সামনে নিয়ে আসেন এবং আপনি তাতে দাখিল হন তাহলে আমরাও আপনার সাথে দাখিল হব এবং আমাদের কেউই এথেকে পিছপা হবে না। আপনি আগমী কাল আমাদের সংগে নিয়ে শত্রুদের মুখামুখি হোন। আমরা অপসন্দ করি না। আমরা যুদ্ধে সুদৃঢ় এবং শত্রুর মুকাবালায় বিশ্বস্ত। আশা করি, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের দিক থেকে আপনাকে এমন কৃতিত্বপূর্ণ কাজ দেখাবেন, যাতে আপনার চোখ জুড়াবে। আল্লাহ্র ফযলে এগিয়ে যান।"

হুযূর (সা) হযরত সা'দের বক্তৃতা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং বলেন, এগিয়ে চলো এবং এই মর্মে সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্ দু'দলের একদলকে আমার আয়ত্বাধীন করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি যেন এখনি ঐ সব জায়গা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে কুরায়শরা আমাদের তরবারির আঘাতে ভূলুণ্ঠিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাফিরান থেকে রওয়ানা হন এবং ঐ সব ঘাটি অতিক্রম করেন, যেগুলোকে 'আল্ আসিফর' বলা হয়। এরপর তিনি

আদ্ দাব্বাহ্ নামক বসতিতে অবস্থান করেন। তারপর তিনি 'হান্নান'কে[৮] ডানে রেখে বদরের কাছে গিয়ে অবতরণ করেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আলী, যুবায়র এবং সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসকে একটি দলের সাথে 'বদর' (একটি জলাশয়ের নাম) অভিমুখে পাঠান যাতে তারা সেখানকার চলতি খবরাখবর নিয়ে আসেন। তাঁরা দু'জন ক্রীতদাসকে বন্দী করে নিয়ে আসেন, যারা কুরায়শ বাহিনীর জন্য পানি বহন করে নিয়ে যাওয়ার কাজে নিয়োজিত ছিল। ওদেরকে আবূ সুফ্য়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা উত্তর দেয়, আমরা কিছুই জানি না। তারপর কিছু উত্তম মধ্যম দেওয়া হলে উভয়েই স্বীকার করে যে, তারা আবূ সুফ্য়ানের ভৃত্য। একথার উপর সাহাবীহণ তাদেরকে ছেড়ে দেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন সালাত আদায় করছিলেন। সালাত শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন, যখন ওরা সত্য বললো তখন তোমরা ওদেরকে মারধোর বরলে, আর যখন মিথ্যা বলল তখন তোমরা ওদেরকে ছেড়ে দিলে। এরপর তিনি স্বয়ং ওদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা আমাকে কুরায়শ সম্পর্কে বলো।

দাসদ্বয় ঃ তারা ঐ টিলার পিছনে রয়েছে, যা এখান থেকে বেশ দূরে দেখা যাচ্ছে। এরপর তাদের ইঙ্গিত ছিল এ টিলার প্রতি, যেটাকে 'আকানকাল' বলা হত। আর ঐ দিকের উপত্যকাকে বলা হত 'আল উদওয়াতুল কুসওয়া' (দূর প্রান্তের উপত্যকা)।

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ তাদের সংখ্যা কত?

দাসদ্বয় ঃ অনেক।

রাসুলুল্লাহ্ (সা) ঃ তাদের খাবারের জন্য দৈনিক কয়টি উট জবাই করা হয়?

দাসদ্বয় ঃ কোনদিন নয়, আর কোন দিন দশ। এই উত্তর দ্বারা রাসুলুল্লাহ্ (সা) বুঝে নিলেন যে, ওদের সংখ্যা নয়শ থেকে এক হাজার হবে। রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর ঐ অনুমান একদম সঠিক ছিল। কেননা কুরায়শ-বাহিনীর সংখ্যা সাড়ে নয়শ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ্ (সা) ঃ কুরায়শের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে কারা কারা এই বাহিনীতে রয়েছে?

দাসদ্বয় ঃ উতবা বিন রাবীআ, শায়বা বিন রাবীআ, আবুল বাখতারী বিন হিশাম, হাকীম বিন হাযাম, নওফল বিন খুভায়লদ, হারিছ বিন আমির, তুআ'য়মা বিন আদ্দী, নামার বিন হারিছ, যা'মা বিন আসওয়াদ, আবূ জাহল বিন হিশাম, উমাইয়া বিন খালফ, সুহায়ল বিন আমর এবং আমর বিন আবদে উদ্দ্।

একথা শুনার পর রাসুলুল্লাহ্ (সা) আপন লোকদের সম্বোধন করে বললেন, মক্কা তার প্রাণের টুকরাগুলো তোমাদের সামনে নিক্ষেপ করেছে।

রাসুলুল্লাহ্ (সা) বদরে পৌঁছে প্রথমে নিকটবর্তী একটি জলাশয়ে অবতরণ করেন। হুবাব বিন মানযার (রা) তখন নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই স্থানেই কি আল্লাহ্ আপনাকে অবতরণ করেছেন? তিনি বললেন; না, এটি একটি অভিমত। হুবাব (রা) বললেন, এটা ভাল জায়গা নয়। আপনি সামনে অগ্রসর হোন। আমরা সেই জলাশয়ের কাছে অবতরণ করব, যা কুরায়শদের নিকটে রয়েছে। এর পিছনে যত জলাশয় আছে আমরা সেগুলোকে অকোজো করে দেব। আর উল্লেখিত জলাশয়ের কাছে হাউয বানিয়ে তাতে পানি ভরে নেব। তখন রাসুলুল্লাহ্ (সা) হুবাবেরই অভিমত মেনে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন এবং কুরায়শদের নিকটে যে জলাশয় ছিল, তার কাছে গিয়ে অবতরণ করেন। (সংকলক)

টীকা ঃ

(১) 'ওফাউল ওফা' গ্রন্থে এটাকে উমায়স লেখা হয়েছে।

(২) এখানেই বি'-রে রাওহা অবস্থিত, যার দূরত্ব মদীনা মুনাও্ওরা থেকে ৪০ মাইল বলে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। কারো কারো মতে ৩৬ মাইল।

(৩) রাসুলুল্লাহ্ (সা) এখান থেকে মক্কা মুকাররামাগামী রাস্তা বাঁয়ে রেখে ডান দিকের রাস্তা ধরে রওয়ানা হন। রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর সময়কালীন রাস্তা সমূহের অবস্থা আমাদের জানা নেই। তুর্কীদের শাসনামলে মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওওরার মধ্যবর্তী যে রাস্তাটি 'তারীকে সুলতানী' নামে বিখ্যাত ছিল, সেটাকে সামনে রাখলে জানা যায় যে, মদীনা মুনাও্ওরা থেকে অগ্রসর হলে প্রথম যে মনযিলটি পড়ত, তার নাম ছিল 'আবারে আলী', এরপর বি'-রে দরবেশ, এপর মাসীজদ (যাকে বি'-রে আব্বাসও বলা হত। এখান থেকেই রাসুলুল্লাহ্ (সা) মক্কার রাস্তা ছেড়ে ডান দিকের রাস্তা ধরেন।)

(৪) সাফরকে বাঁয়ে রেখে ডান দিকের রাস্তা ধরে অগ্রস হয়ে যাফিরান পৌছেন।

(৫) এমনও বলা হয়ে থাকে যে, ঐ গোয়েন্দাবাহিনীকে দু'বার পাঠানো হয়েছিল – প্রথমবার মদীনা মুনাও্ওরা থেকে এবং দ্বিতীয়বার পথিমধ্য থেকে।

(৬) 'বারকুল গামাদ' ইয়ামনে অবস্থিত। মক্কা মুকাররমা থেকে এর দূরত্ব পাঁচ মনযিল। আরবরা খুব বেশী দূরত্ব বুঝাবার সময় এ জায়গাটিরও উল্লেখ করত।

(৭) হযরত আনাস (রা) -এর একটি রিওয়াতে সা'দ বিন মু'আয-এর স্থলে সা'দ বিন 'উবাদার উল্লেখ করা হয়েছে।

(৮) হান্নান একটি টিলার নাম, যা দেখতে অনেকটা পাহাড়ের মত।

বদর যুদ্ধ–২

বদরের অবস্থান ও পরিবেশ

বদর, মদীনা মুনাও্ওরা থেকে প্রায় আশি মাইল পশ্চিম দক্ষিণে সেই রাজপথে অবস্থিত, যা প্রাচীনকাল থেকে সিরিয়া ও মক্কা মুকাররমার মধ্যবর্তী বাণিজ্য কাফেলাগুলোর অবতরণস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মদীনা মুনাও্ওরা থেকে মক্কা মুকাররমা যাবার আরো কয়েকটি পথ রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে কোন কোনটির দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু মানুষ বদর হয়েও আসা যাওয়া করত। সম্প্রতি মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাও্ওরার মধ্যে যে সংযোগ রাস্তা নির্মিত হয়েছে, তা বদরের ধার ঘেঁষেই গিয়েছে। লোহিত সাগরের উপকূল থেকে বদরের দূরত্ব দশ বারো মাইলের বেশী হবে না।

বদর ডিম্বাকৃতির একটি প্রান্তরে অবস্থিত, যা চতুর্দিক থেকে পর্বত বেষ্টিত। এই প্রান্তরের দৈর্ঘ সাড়ে পাঁচ মাইল এবং প্রস্থ প্রায় চার মাইল। আশে পাশের পাহাড়গুলোর পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। পূর্ব প্রান্তের পাহাড় বা টিলাসমূহের নাম জানা যায় নি। উত্তর ও দক্ষিণে সাদাটে রংয়ের দু'টি টিলা রয়েছে, যেগুলোকে দূর থেকে বালুর উঁচু টিপি (উপত্যকা) বলে মনে হয়। এর মধ্যে উত্তরের টিলার নাম 'আল উদ্ওয়াতুদ্ দুনয়া' (নিকট প্রান্তের উপত্যকা) এবং দক্ষিণের টিলার নাম 'আল উদওয়াতুল কুস্ওয়া' (দূর প্রান্তের উপত্যকা)। পরবর্তী টিলার কাছে যে উঁচু টিলাটি রয়েছে, সেটাকে 'আকানকাল' বলা হয়। পশ্চিম প্রান্তের টিলার নাম জাবালে আসফাল। সেখান থেকে সমুদ্র পরিস্কার নজরে পড়ে। বদর যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনী ও কুরায়শ বাহিনী কোথায় কোথায় অবস্থান করেছিল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে –

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ .

"স্মরণ করো, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তারা দূরপ্রান্তে, আর উষ্ট্রারোহী দল ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে।" – (৮ ঃ ৪২)

প্রথম দু'টি নাম (আল্ 'উদ্ওয়াতুদ্ দুনয়া ও আল্ 'উদওয়াতুল কুসওয়া) হয় কুরআন নাযিলের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল, নয়ত কুরআনে উল্লেখিত নামগুলোই হুবহু গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য 'জাবালে আসফাল' নামটি বাহ্যত: কুরআন নাযিলের পূর্বে ছিল না। হয় পরে রাখা হয়েছে, নয়ত এমনিতেই বিখ্যাত হয়ে গেছে। কুরআনের 'আসফাল' (নিম্নভূমি)-এর সম্পর্ক পাহাড়ের সাথে নয়, বরং সেই 'জিহাত' (দিক)-এর সাথে, যেদিকে বাণিজ্য কাফেলা বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা পাহাড়ের নামের অত্যাবশ্যকীয় অংশে পরিণত হয়েছে। শোনা যায় যে, পূর্বদিকের পাহাড়টি অধিকতর উঁচু। সম্ভবত: এ কারণে পশ্চিম দিকের পাহাড়ের জন্য 'জাবালে আসফাল' নামটি নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো যে আশ্চর্য ধরনের নামকরণ, তাতে কোন সন্দে নেই।

জনবসতির অবস্থা

বদরের জনবসতি বাহ্যত: বেশ বড়। ডক্টর হামীদুল্লাহ্ বলেন, সেখানে পাথরের তৈরী বেশ কয়েক শ ঘর রয়েছে, যেগুলোকে স্থানীয় পরিভাষায় 'কারস' বলা হয়। দুটি 'পাঞ্জেগানা মসজিদ' ও একটি 'জামি মসজিদ'

রয়েছে। জামি মসজিদটি ঠিক সেই জায়গায় নির্মিত হয়েছে, যেখানে বদর যুদ্ধের দিন রাসুলুল্লাহ্ (সা) -এর জন্য 'আরীশ' বা চাঁদোয়া তৈরী করা হয়েছিল। এটি ছিল একটি উঁচু জায়গা। তাই সেখান থেকে সম্পূর্ণ মাঠটি পরিষ্কার নজরে পড়ত। এই মসজিদকে 'মসজিদুল আরীশ' এবং 'মসজিদুল্ না'মামাহ' ও বলা হয়। পরবর্তী নামটি কেন রাখা হয়েছে তা জানা যায় নি। মদীনা মুনাওওয়ারায়ও এই নামের একটি মসজিদ রয়েছে। 'উৎকীর্ণ লিপি' (EPITAPH) অনুযায়ী, এই মসজিদটি ' খোশ কদম'-এর তত্বাবধানে ১২ রাবীউল আউয়াল, হিঃ ৯০২ সনে মুতাবিক ১৫ অক্টোবর, ইং ১৫০০ সনে নির্মিত হয়েছে। এই বছরই মিসরের বার্জী মামলূক শাসক, আশরাফ কানসূহ্ ঘুরী সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাকেই এই বংশের সর্বশেষ শাসক মনে করা হয়। অত:পর মামলূক সুলতানাত ও আব্বাসী খিলাফত উভয়ই সুলতান সালীমের হাতে চলে যায় এবং সূচনা হয় তুর্কী খিলাফত আমলের। 'খোশকদম' ছিলেন মিসরের মামলূক সুলতানাতের যাবতীয় সরকারী নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।

তুর্কীদের শাসনামলে শরীফ আবদুল মুত্তালিব বদরে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ও মেরামতের অভাবে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু বদর ছিল একটি বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র এবং বিখ্যাত বাণিজ্য পথের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান; তাই সেখানে জাহিলিয়া যুগেও প্রতি বছর মেলা বসত এবং তা ১যীকা'দা পর্যন্ত অব্যাহত থাকত। ডক্টর হামীদুল্লাহ্ বলেন, আজকালও প্রতি শুক্রবারে সেখানে হাট বসে। সেখানে বিক্রির জন্য লোকেরা দূরদূরান্ত থেকে ঘি, চর্ম, চর্ম নির্মিত বিভিন্ন সামগ্রী, তেল, কম্বল, পোষাক পরিচ্ছদ, উট, ভেড়া-বকরী প্রভৃতি নিয়ে আসে। কোন কোন সময় এই হাটে গরুও কিনতে পাওয়া যায়।

মাঠ ও জমির অবস্থা

মাঠটি পাথুরে। অর্থাৎ কংকর বা ছোট ছোট গোল পাথর এখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে। অবশ্য দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশের জমি নরম। সেখানে প্রবাহমান বালুরাশি এসে স্তূতীপকৃত হয়ে থাকে। এ কারণে বিভিন্ন রিওয়ায়াতে আছে, সেদিন যোদ্ধাদের পা মাটিতে ধ্বসে যাচ্ছিলো। যুদ্ধ মাঠের এই অংশেই সংঘটিত হয়েছিল। ঐ মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উপর তাঁর সমস্ত অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন। পবিত্র কুরআন তার কিছু কিছু উল্লেখ রয়েছে। যেমন–

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ
وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۔

"স্মরণ করো, তিনি তাঁর পক্ষ হতে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন সেটা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য তোমাদের উপর থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য।" – (৮ ঃ ১১)

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত বাণী থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, জমি নরম ছিল, যার কারণে পা মাটিতে ধ্বসে যাচ্ছিল। বৃষ্টি হওয়ার পর বালু জমে গেল, যার কারণে মুসলমানদের পা ধ্বসে যাওয়ার ব্যাপারটি আর থাকলো না। কিন্তু কুরায়শ বাহিনী যে দিকে ছিল সে দিকটি ছিল অপেক্ষাকৃত নীচু। তাই বৃষ্টি হওয়ার ফলে তারা বরং অসুবিধারই সম্মুখীন হয়েছিল। 'তাবাকাতে ইবনে সা'দে আছে, মুসলমানরা উড়ন্ত বালুর ভিতর দিয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেছিল। তারপর বৃষ্টি হলো। যার ফলে বালুকাময় স্থানটি এমনি শক্ত পাথরের মত হয়ে গেল যে, লোকেরা তার উপর অনায়াসে দৌড়া-দৌড়ি করতে পারত। অপরদিকে কুরায়শের অবস্থানস্থল অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে হওয়ার কারণে বৃষ্টি হওয়ার পর তা কাদার আকার ধারণ করলো।

ডক্টর হামীদুল্লাহ্ বলেন, এখন ঐ জায়গাটি একটি সবুজ-শ্যামল খেজুর বাগান। তাই বলা যায়, বদর যুদ্ধের সময় এ জায়গাটির যে বাহ্যিক রূপ ছিল, তা এখন আর অবশিষ্ট নেই।

জলাশয় ও বাগ-বাগিচা

বদরে কূয়া আছে এবং জলাশয়ও আছে। বৃহৎ জলাশয়, যা প্রথমে গভীর নদীর মত দেখায়, বসতির মসজিদগুলোর কাছে এসে ভূপৃষ্ঠের সাথে একাকার হয়ে গেছে। এই জলাশয়ে নামাযীরা অযু করে এবং এথেকে খেজুর বাগান, কৃষি ক্ষেত ও বাগ-বাগিচায় পানি সেচ করা হয়। খেজুর বাগান মাইলের পর মাইল ব্যাপী বিস্তৃত। সেখানে বিভিন্ন ধরনের শাকসব্জীরও চাষ করা হয়।

ডক্টর হামীদুল্লাহ্ বলেন, মদীনা মুনাওওরা থেকে বদর পর্যন্ত রাস্তাটিও খুব সবুজ শ্যামল। বদর ও হামরার মধ্যবর্তী স্থানে যে ঘন জঙ্গল রয়েছে, তাকে 'ঈস' বলা হয়। সম্ভবতঃ এটা হচ্ছে সেই স্থান, যার উল্লেখ হযরত হামযা (রা) এর 'সারইয়া-ই-সাইফুল বাহর' এর মধ্যে আছে। এই স্থানেই হুদায়বিয়া সন্ধি সম্পাদনের পর হযরত আবূ বাসীর অবস্থান করছিলেন এবং তখন মক্কা মুকাররমা থেকে যে সব মুসলমান পালিয়ে আসতেন, তাঁরা মদীনায় না গিয়ে তাঁর কাছেই একত্রিত হতেন। শেষ পর্যন্ত আবূ বাসীর এই নওমুসলিমদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন, যারা সিরিয়া থেকে আগত কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলার উপর আকস্মিক আক্রমণ চালাত। যার ফলে কুরায়শদের এই বাণিজ্যপথ সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। আর তারা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মদীনায় চলে যাওয়া মুসলমানদের ফেরত প্রদানের যে শর্ত হোদাইবিয়ার সন্ধিতে লিখিয়েছিল, তা স্বয়ং তারা বাতিল করে দেয় এবং বলে দেয় যে, রাসুলুল্লাহ্ (সা) যেন এই সব মুসলমানদেরকে মদীনায় নিজের কাছে ডেকে নিয়ে যান।

ডক্টর হামীদুল্লাহ্-এর বর্ণনা অনুযায়ী মদীনা ও বদরের মধ্যবর্তী স্থানে প্রচুর মিঠা পানি এবং উট ও ভেড়া বকরীর অনেক চারণভূমি রয়েছে। একজন উষ্ট্রারোহী দশ ঘন্টায় মদীনা মুনাওওরা থেকে বদরে পৌছতে পারে। আর মোটরগাড়ীতে গেলে সর্বাধিক সময় লাগে আড়াই থেকে তিন ঘন্টা।

হক ও বাতিলের পরীক্ষাগুলো

বদর হচ্ছে সেই স্থান, যেটাকে আল্লাহ্ তা'আলা হক বা বাতিলের মধ্যকার সংঘর্ষের প্রথম পরীক্ষাস্থলে পরিণত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এখনেই বাহ্যিক আসবাব-সামগ্রীর অপ্রতুলতা সত্ত্বেও সত্যকে জয়ী এবং সব রকম পার্থিব প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও মিথ্যাকে পরাজিত ও বিপর্যস্ত করেন। তারা পরাজয়ের গর্তে পড়ে যায় এবং তাদের কপালে অপমান ও বিফলতার আসমানী সীল লেগে যায়। বদরের যুদ্ধ থেকে বাতিলের সাকারাতের যুগ শুরু হয়। ছয় বছর পর মক্কার কুরায়শদের মুখে সেই পবিত্র নবী (স) এর দয়া ও করুণার প্রশংসাগীতি আরম্ভ হয়, যার সত্যের আহবান প্রতিরোধ করার জন্য তারা নানা প্রকার ফন্দি এঁটে আসছিলো।

দুই পক্ষের অবস্থা

মূল যুদ্ধ অধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রাখে না। কিন্তু দুই পক্ষের সমরশক্তির তুলনামূলক আলোচনা এবং তাদের যুদ্ধ ও আঘাত হানার দৃশ্যটি তার পরিণাম ও ফলফলসহ উপস্থাপনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। কেননা মরহুম মাওলানা যুদ্ধের উপর শুধু একটি ভাসা ভাসা পর্যালোচনা পেশ করেছেন, উভয় পক্ষের সমরশক্তি সম্পর্কে কোন বিস্তারিত আলোচনা করেন নি।

(ক) রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবা কিরামের সংখ্যা ছিল তিন শ'-এর চাইতে সামান্য বেশী। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে এই সংখ্যা তিন শ পাঁচ থেকে তিন শ উনিশ পর্যন্ত বলা হয়েছে। তার মধ্যে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল চুয়াত্তর অথবা ছিয়াত্তর। বাকি সবাই ছিলেন আনসার। তাদের সাথে ছিল দুটি ঘোড়া এবং সত্তরটি উট। দুটি ঘোড়ার একটি ছিল হযরত মিক্দাদ বিন আমর (রা)-এর এবং অপরটি ছিল হযরত মারছাদ বিন আবী মারছাদ আল গানাভী (রা)-এর। ঘোড়ার মালিকানা প্রসঙ্গে হযরত যুবায়র বিন আওয়াম এবং মুস'আব বিন 'উমায়র (রা)-এর নামও এসেছে। তিন তিনজন করে আরোহী ছিলেন এক একটি উটের। তাই পালাক্রমেই তাঁদেরকে উটের উপর আরোহণ করতে হত। রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর সহআরোহীদের একজন ছিলেন হযরত আলী (রা) এবং অপরজন ছিলেন আবূ লাবাবা (রা),

যাকে আর রাওহা থেকে রাসুলুল্লাহ্ (সা) আপন প্রতিনিধি হিসাবে মদীনা মুনাওওরায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উভয় সহ-আরোহীই রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে নিবেদন করেন, আপনি উটের উপর আরোহণ করুন, আমরা দুজন পায়ে হেটেই যাবো। রাসুলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, পায়ে হেটে যাবার ক্ষেত্রে তোমরা দুজন না আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী আর না পুণ্যার্জনের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের চাইতে কিছুটা কম প্রত্যাশী। অর্থাৎ পায়ে চলার মধ্যে যে পূণ্য রয়েছে আমি তা ছেড়ে দিতে যাব কেন? এটাই হচ্ছে নবুওয়াতের নেতৃত্ব ও সাম্যের নমুনা। আজকাল মুসলিম নেতারা এই মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি সম্পূর্ণ গাফিল এবং অমনোযোগী। তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য এমন সব বাহানা তালাশ করেন, যা শুধুমাত্র ছলনা ও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়।

(খ) কুরায়শ বাহিনীর জনসংখ্যা ছিল কমপক্ষে সাড়ে ন'শ। তাদের সাথে ছিল এক শ'টি ঘোড়া। আর তাদের উটের সংখ্যা যে কত বেশী ছিল তা শুধুমাত্র এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রত্যেক মনযিলেই তারা শুধু খাবারের জন্য নয় থেকে দশটি উট জবাই করত। বর্ম এবং অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রীও ছিল তাদের কাছে অনেক। তবে বালুর প্রাচীর নির্মাণ করা সম্ভব হলে, হতেও পারে, কিন্তু পার্থিব আসবাব-সামগ্রীর প্রাচুর্য, বাতিলকে কী করে এবং কতক্ষণ পর্যন্ত সোজা ও সুদৃঢ় রাখতে পারে? ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া কিংবা ধোঁয়ার মত শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া যে জিনিসের প্রকৃতি তার স্থায়িত্ব তথা টিকে থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। অবশ্য একথাও ঠিক যে, সত্যকে আপন প্রতিষ্ঠালাভের জন্য পরীক্ষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

দু'আ

হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা) একটি টিলার উপর রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর জন্য একটি চাঁদোয়া বানিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে ছিলেন। হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা) ছিলেন দরজায় প্রহরারত। রাসুলুল্লাহ্ (সা) সারা রাত দু'আর মধ্যেই কাটিয়ে দেন। মরুহুম মাওলানা শিবলী লিখেছেন, এটা ছিল একটা বিস্ময়কর দৃশ্য। এত বড় দুনিয়ায় তাওহীদের ভাগ্য শুধুমাত্র কয়েকটি প্রাণের উপর সীমাবদ্ধ। ----- রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর অতি বিনয়ভাব প্রকাশিত হচ্ছিলো। তিনি তাঁর উভয় হাত প্রশস্ত করে বলছিলেন, 'হে আল্লাহ্, তুমি আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছে তা আজ পূর্ণ কর।' তিনি তখন এতই আত্মবিস্মৃত ছিলেন যে, কাঁধের উপর থেকে তাঁর চাদর নীচে গড়িয়ে পড়ছিল, অথচ সেদিকে তাঁর কোন খেয়াল ছিল না। তিনি কখনো সিজ্দাবনত হয়ে বলতেন, হে আল্লাহ্, যদি আজ এ কয়েকটি প্রাণ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তোমার ইবাদত আর কেউ করবে না।[১]

সারিবদ্ধ করণ

রাসুলুল্লাহ্ (সা) খুব ভোরেই মুজাহিদদেরকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করান। সারি সোজা করতে তিনি একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে যান এবং যে পিছনে ছিল তাকে সামনে অগ্রসর হওয়ার এবং যে আগে ছিল তাকে পিছনে হটার নির্দেশ দেন। এই সময়েই হযরত সাওয়াদ বিন গাযিয়াহ (রা) এর ঘটনাটি ঘটেছিল। সাওয়াদ (রা) সারি থেকে কিছুটা আগে বেড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ্ (সা) তীর দ্বারা তাঁর পেট স্পর্শ করে বলেন, সাওয়াদ, সোজা হও। সাওয়াদ (রা) তখন নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও ন্যায়ের সাথে প্রেরণ করেছেন। অতএব আপনি আমার বদলা দিন। রাসুলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁর পবিত্র পেট থেকে জামা উঠিয়ে নেন এবং বলেন, সাওয়াদ, তোমার বদলা গ্রহণ করো। হযরত সাওয়াদ (রা) অস্থির হয়ে রাসুলুল্লাহ্ (সা) -এর পবিত্র পেটে চুমো খান। রাসুলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করেন, এটা কি? হযরত সাওয়াদ নিবেদন করেন, যুদ্ধের ব্যাপার, তাই এটাই হয়ত আপনার সাথে আমার শেষ সাক্ষাত। অতএব মন চাইল, আমার চর্ম আপনার পবিত্র চর্মকে স্পর্শ করুক। রাসুলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁর জন্য দু'আ করেন। কুরায়শরাও সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়লো। এরপর তারা মুসলিম বহিনীর সৈন্য সংখ্যা জানার জন্য উমায়র বিন ওহবকে পাঠাল। মুসলিম বাহিনীর

কোন অংশ কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা সেটাও, সে লক্ষ্য করলো। এরপর সে আপন বাহিনীর কাছে বললো, মুসলিম বাহিনীতে মোটামুটি তিনশ' লোক রয়েছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি লোক এমনি যে, যতক্ষণ তোমাদের মধ্য থেকে অন্তত: একটি লোককে না মারবে ততক্ষণ সে মরবে না। এরপর বললো এ প্রেক্ষাপটে তোমাদের বেঁচে থাকার মধ্যে কি কোন সার্থকতা আছে?

আবূ জাহ্লের বাড়াবাড়ি

এমতাবস্থায় কুরায়শ বাহিনী হাকীম বিন হাযাম, উতবাহ্কে বললো, হায্রামী হত্যার কারণেই তো এসব কিছু ঘটছে। তার রক্তমূল্য দিয়ে দাও, ঝামেলা চুকে যাক্। উতবা সেজন্য তৈরীও হয়ে গেল। কিন্তু আবূ জাহ্ল বিষয়টি জানতে পেরে একদিকে উতবাকে ভীরুতার অপবাদ দিল, অপর দিকে হায্রামীর ভাইকে প্ররোচিত করল, যেন সে তার পরিধানের কাপড় ছিন্ন ভিন্ন করে আপন ভাইয়ের জন্য মাতম শুরু করে দেয়। এমনিতে প্রথমে আবূ জাহ্লই কুরায়শদেরকে বদরে নিয়ে এসেছিল এমতাবস্থায় যে, বাণিজ্য কাফেলা পালিয়ে যাচ্ছিলো। এবার যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছিল, আবূ জাহ্ল সেটাকে নষ্ট করে দিল। মনে হয়, আল্লাহ্র ইচ্ছাই ছিল তাই। সত্যের সবচেয়ে কট্টর এই শত্রু বাতিলকে শুধু সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যায় নি; বরং সেটাকে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত করে তুলে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল এবং আবূ জাহ্ল শুধু নিজেকে নয় বরং তার নামকরা সব সংগীকেই সে আগুনের ইন্ধনে পরিণত করে।

যুদ্ধ

যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত অবস্থা হলো, তৎকালীন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, প্রথমে শায়বা, তার ভাই উৎবা এবং তার ছেলে ওলীদ মুসলিম বাহিনীর দিকে এগিয়ে আসে। আর তাদের কুকাবালার জন্য মুসলিম বাহিনী থেকে এগিয়ে আসেন আফরার পুত্র আওফ ও মুআভ্ভিয এবং রাওয়াহার পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা)। কিন্তু রাসুলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে থামিয়ে দিয়ে নিজেরই খান্দানের হামযা, আলী এবং উবায়দা বিন হারিছ (রা) কে পাঠান। এই সংঘর্ষে উতবা, শায়বা এবং ওলীদ নিহত হয়। হযরত উবায়দা (রা)-ও সাংঘাতিকভাবে আহত হন। হযরত আলী (রা) তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে আসেন। মদীনা মুনাওওরায় প্রত্যাবর্তনকালে হযরত উবায়দা (রা) পথিমধ্যে ইন্তিকাল করেন। কুরায়শ বাহিনীর উবায়দা বিন সায়ীদ বিন আস নিজের সর্বাঙ্গ লোহার পাতে জড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্র আসে। শুধুমাত্র তার দুটি চোখই দেখা যাচ্ছিলো। এই অবস্থায় হযরত যুবায়র বিন আওয়াম (রা) তার চোখ লক্ষ্য করে এমনভাবে বর্শা নিক্ষেপ করেন যে, সে সংগে সংগে ভূপাতিত হয়ে মারা যায়।

এরপর সাধারণভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। কুরায়শের বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একের পর এক নিহত হলো। আফরার দুই পুত্র মু'আয এবং মুআভ্ভিয (রা) আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ লোকটি আবূ জাহল ? যখন তারা এটা জেনে নিলেন তখন বাজপাখীর মত ছুটে চললেন এবং সারির পর সারি অতিক্রম করে সোজা আবূ জাহ্লের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন এবং সংগে সংগে তাকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, সে ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গেল। তখন আবূ জাহ্লের পুত্র ইকরামা পিছন দিক থেকে মু'আযের বাহুতে এমনভাবে আঘাত করল যে, তাতে তাঁর হাত সম্পূর্ণভাবে কেটে গিয়ে শুধু চামড়ার সাথে ঝুলে রইলো। যুবক মু'আয (রা) তখন লক্ষ্য করলেন যে, এই কর্তিত হাত তাঁর লাড়ইয়ের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে তখন তিনি তা পায়ের নীচে চেপে ধরে হেচকা টানে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এদিকে আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) এগিয়ে গিয়ে আবূ জাহ্লের দেহ থেকে তার মস্তক পৃথক করে ফেলেন।

রাসুলুল্লাহ্ (সা) ইতিপূর্বে সাহাবীগণকে এই মর্মে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, কুরায়শদের কেউ কেউ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধ করতে এসেছে। অতএব ওদেরকে যেন হত্যা করা না হয়। আব্বাস এবং আবুল বুখতারীও

ছিলেন ওদের অন্যতম। সাহাবা কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ঐ নির্দেশ পুরাপুরিভাবে পালন করেন। আবুল বুখতারীকে হত্যা করা হয় এজন্য যে, সে শুধু নিজের প্রাণের নিরাপত্তার উপর রাজী হয় নি, সাথে সাথে নিজের সঙ্গীকেও বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু এজন্যা তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পূর্বানুমিত ছিল অত্যাবশ্যকীয়।

আবদুর রহমান বিন্ আওফ (রা) উমাইয়া বিন খালফকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিলাল (রা) তাকে দেখে নীরব থাকতে পারেন নি। তিনি আনসারদেরকে এ সংবাদটি দেন এবং তাঁরা দ্রুতবেগে এগিয়ে এসে উমাইয়া এবং তার পুত্রকে এক সাথে হত্যা করে।

মোটকথা, এই যুদ্ধে কুরায়শবাহিনীর সত্তর জন লোক নিহত হয়। তাদের মধ্যে অনেক নেতৃস্থানীয় লোক ছিল। যেমন, শায়বা, আবূ জাহ্ল (আমর বিন হিশাম) আবুল বুখতারী (আল আস বিন হিশাম) যাম'আ বিন আসওয়াদ, উমাইয়া বিন খাল্ফ, মুনাব্বিহ্ বিন হাজ্জাজ প্রমুখ। আর বন্দী হয় সত্তর জন। তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চাচা আব্বাস, জামাই আবুল আস বিন রাবী এবং আলী (রা) -এর ভাই আকীল ছিলেন।

বদরের শহীদবৃন্দ

বদর যুদ্ধে চৌদ্দজন সাহাবী শহীদ হন। তাঁদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন মুহাজির এবং আটজন আনসার। মুহাজিরগণ হচ্ছেন ঃ

১। হযরত উবায়দা বিন হারিছ বিন মুত্তালিব (রা)।

২। হযরত উমায়র বিন আবী ওয়াক্কাস (রা)। তিনি ছিলেন সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর ভাই। রাসুলুল্লাহ্ (সা) মদীনা মুনাও্ওরা থেকে বের হওয়ার সময় বয়সের স্বল্পতার কারণে উমায়র (রা) কে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে ক্রন্দন করতে থাকেন। অতএব রাসুলুল্লাহ্ (সা) তাকেও সংগে আসার অনুমতি দেন। শাহাদত বরণ কালে উমায়র (রা) এর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর।

৩। উমায়র বিন আবদে আ'মর বিন নাযলা খুযায়ী' (রা)।

৪। মিহজা' (রা) (হযরত উমরের মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম)। বদর যুদ্ধের প্রথম শহীদ খুব সম্ভবত: ইনিই ছিলেন।

৫। সাফ্ওয়ান বিন বারযা (রা)।

৬। আকিল বিন আল বাকীর আল লায়ছী (রা)।

আর আনসারগণ হচ্ছেন ঃ

৭। উমায়র বিন আল হুমাম। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে খেজুর খাচ্ছিলেন। রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র মুখ থেকে জিহাদের ফযীলত ও মাহাত্ম্যের কথা শুনে হাত থেকে খেজুর ফেলে দিয়ে ন্যাকড়া জড়ানো তরবারিটি বের করে সম্মুখ যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন এবং বেশ কয়েকজন শত্রুকে হত্যা করে নিজেও শাহাদত বরণ করেন।

৮। সা'দ বিন খায়ছামা (রা) (আওস বংশীয়)।

৯। মুবাশ্বির বিন আবদুল মানযার (রা) (ঐ)।

১০। ইয়াযীদ বিন হারিছ (রা) (খাযরাজ বংশীয়)।

১১। রাফি বিন মু'আল্লা (রা) (ঐ)।

১২। হারিছা বিন সুরাকা (রা) (ঐ)।

১৩। আওফ বিন আফরা (রা) (ঐ)।

১৪। মুআভ্বিয্ বিন আফরা (রা) (ঐ)।

লাশ দাফন

নিজেদের শহীদদের লাশ তো দাফন করতেই হবে। রাসুলুল্লাহ্ (সা) -এর এই রীতি ছিল যে, কোথাও কোন লাশ দেখা গেলে তিনি সেটাও দাফন করতেন। অতএব তিনি (সা) কুরায়শের সবগুলো লাশ একত্রিত করে একটি

গভীর গর্তের মধ্যে ফেলে তার উপর মাটি চাপা দেবার ব্যবস্থা করেন। উমাইয়া বিন খালফের লাশ ফুলে গিয়েছিল। কেননা সে তার দেহে লৌহ বর্ম পরে রেখেছিল এবং এই বর্মের কারণে তার দেহে প্রখর সূর্যকিরণ আরো গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ফলে তার লাশ গর্ত পর্যন্ত নিয়ে যাওয় সম্ভব হয় নি বলে যেখানে তা পড়েছিল সেখানেই তার উপর মাটি চাপা দেওয়া হয়।

আবূ লাহাব কোন কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে নি। তবে সে তার এক ঋণগ্রহীতাকে চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে যুদ্ধে পাঠিয়েছিল। অবশ্য এর কিছুদিন পর সে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হুযূর (সা)-এর দু'আ

আমি এখানে কিছু কিছু বিষয় আমার বর্ণনা থেকে বাদ দিয়েছি। কেননা এগুলো সীরাতের সাধারণ পুস্তাকাদিতেও রয়েছে। যেমন রাসুলুল্লাহ্ (সা) -এর কংকর নিক্ষেপ এবং 'শাহাতিল ভুজুহ' (চেহারা বিগড়ে গেছে) বলার ঘটনা কিংবা পবিত্র ফিরিশতা কর্তৃক সাহায্য করার ঘটনা । পবিত্র কুরআনে আছে –

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهِ .

রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত বেশ কয়েকটি দু'আর উল্লেখ বিভিন্ন রিওয়ায়াতে আছে। যেমন, বদরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তিনি এক জায়গায় এ দু'আ করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ্, এরা (সাহাবা কিরাম) ভুখা, এদেরকে তৃপ্ত করো। এরা নাংগা, এদের কাপড় চোপড়ে ব্যবস্থা করো। এরা পায়ে হেটে চলেছে, এদের বাহনের ব্যবস্থা কর।

লক্ষণীয় যে, পার্থিব সম্পদের জন্য রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর দু'আ শুধুমাত্র প্রয়োজন পূরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি এ থেকে আর সামনে অগ্রসর হন নি।

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (সা) কে দেখার জন্য আমি বার বার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে আসতাম। একবার দেখলাম, তিনি জিসদাবনত হয়ে আছেন এবং বলছেন, ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইউম। এপর তার কথা আর শোনা যাচ্ছিলো না। যুদ্ধ জয়ের পর আবূ জাহ্লের মস্তক যখন রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর সামনে নিয়ে আসা হলো তিনি তিনবার বললেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ .

আল্লাহ্ তিনিই, যিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। এরপর বললেন –

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ .

"আল্লাহ্ মহান। সব প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি তাঁর সাহায্যের অঙ্গীকার সত্য করে দেখিয়েছেন, আপন বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং এই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ই সমগ্র শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।"

দেখেছেন ? এখানেও কিন্তু তিনি আপন সঙ্গী সাথীদের আত্মোৎসর্গ, দৃঢ়সংকল্পতা, অতুলনীয় বীরত্ব, ন্যায় ও সত্য লাভের জন্য বেপরোয়া প্রাণ বিসর্জন কিংবা এ ধরনের কোন বিষয়েরই উল্লেখ করলেন না, অথচ এর প্রত্যেকটি বিষয়ই সেদিন ছিল দিবালোকের ন্যায় সত্য। তিনি শুধুমাত্র আল্লাহ্র প্রশংসা ও প্রশস্তি বর্ণনা করলেন, যিনি তাঁকে বিজয় প্রদান করেছেন।

وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ .

"বিজয় তো শুধুমাত্র আল্লাহ্র দিক থেকেই আসে।"

মদীনা প্রত্যাবর্তন

রাসুলুল্লাহ্ (সা) তিন দিন বদর প্রান্তরে অবস্থান করেন। এরপর মালে গনীমত ও বন্দীদের নিয়ে মনযিলের পর মন্যিল অতিক্রম করতে থাকেন। কুরায়শ বন্দীদের মধ্যে দু'ব্যক্তি ছিল দ্বীনের বড় শত্রু। তাদের হাতে মুসলমানদেরকে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। এ দু'জনকে হত্যা করানো হয়। সাফরায় পৌঁছার পর মালে গনীমত সমানভাবে বন্টন করা হয়। রাসুলুল্লাহ্ (সা) ও নিজের জন্য সাহাবীদের সমপরিমাণ অংশ নেন। এ প্রসংগে ঐ তরবারির উল্লেখ করা যেতে পারে, যা 'যুলফিকার' নামে অত্যধিক খ্যাতি লাভ করে। এই যুদ্ধেই ঐ তরবারিটি হস্তগত হয় এবং রাসুলুল্লাহ্ (সা) তা নিজের কাছে রেখে দেন। আবু জাহ্লের মালিকানাধীন একটি উট রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে আসা হয়, যার নাকের মধ্যে রৌপ্যের আংটা লাগানো ছিল। পরবর্তীকালে হুদায়বিয়া রওয়ানা হওয়ার সময় এই উটটিকে কুরবানীর পশু সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং হুদায়বিয়া চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ওটাকে সেখানেই জবাই করা হয়েছিল। সাফরায় পৌঁছার পর নাযর বিন হারিছ বিন কালদাকে এবং 'আরফুয যুবিয়াহ' পৌঁছার পর উকবা বিন মুয়ীতকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়।

বিজয়ের বার্তাবাহক

মদীনা মুনাওওরায় প্রথমেই দু'জন বার্তাবাহক পাঠানো হয়। মদীনা মুনাওওরার জন্য পাঠানো হয় হযরত যায়দ বিন হারিছা (রা) কে এবং উঁচু মদীনার জন্য হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা) কে। হযরত যায়দ বিন হারিছা (রা) যখন মদীনা পৌঁছেন তখন হযরত উছমান (রা) এবং মদীনায় অবস্থানকারী অন্যান্য মুসলমানরা হযরত রুকাইয়া (রা)-এর দাফন কার্য সম্পন্ন করে ফেলেছেন।

রাসুলুল্লাহ্ (সা) যখন বদর অভিমুখে রওয়ানা হন তখন তাঁর কন্যা (হযরত উছমানের স্ত্রী) রুকাইয়া (রা) ভয়ানক অসুস্থ ছিলেন। এ কারণে তিনি হযরত উছমান (রা) কে, আপন স্ত্রীকে দেখাশুনা করার জন্য মদীনায় রেখে আসেন। তাঁকে এরকম রেখে আসা অতীব জরুরী ছিল বলে হযরত উছমান (রা) কে মালে গনীমতের সমান অংশ দেওয়া হয়। এভাবে আরো কয়েকজন সাহাবী, যাদেরকে বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত রাখা হয়েছিল, তাঁরাও মালে গনীমাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সমান অংশ লাভ করেন। হযরত রুকাইয়া (রা) ঠিক বদর যুদ্ধের দিন কিংবা এক দিন পর ইন্তিকাল করেন।

বন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহার

মদীনা মুনাওওরায় পৌঁছার সাথে সাথে যুদ্ধ বন্দীদেরকে সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। কেননা তখন বন্দীদের রাখার মত কোন কয়েদখানা ছিল না। এদের মধ্যে আবূ উমায়য বিন উযায়র নামক জনৈক বন্দী বলে, আমাকে যার হাতে সমর্পণ করা হয়েছিল তিনি নাশ্তা বা খাবারের সময় রুটিগুলো আমাকে দিয়ে দিতেন এবং নিজে শুধু খেজুর খেতেন। এতে আমার খুব লজ্জা হত। তাই আমি রুটিগুলো তাঁকে ফিরিয়ে দিতাম কিন্তু তিনি তা আমাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতেন। এটাই ছিল রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপদেশ প্রদানের প্রতিচ্ছবি।

এবার এর বিপরীত দৃশ্য দেখুন। একদা মুসআব বিন উমায়র (রা) আপন বন্দী ভাইয়ের নিকট ফিরে যাবার সময় যাদের হাতে তাকে অর্পণ করা হয়েছিল, তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, একে শক্ত বাঁধনে রাখবে। এর মা খুবই সম্পদশালী। সম্ভবত: সে উল্লেখযোগ্য ফিদ্য়া দিয়ে একে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। বন্দী আবূ উযাইয তখন বলে, ভাই, তুমি আমার সম্পর্কে ওদেরকে এই নির্দেশ দিলে? মুস'আব (রা) সংগে সংগে বলে উঠেন, তুমি আমার ভাই নও; এই সব লোকেরাই আমার ভাই।

আবু উযায়যের মা (মাসআবের মাও বটে) লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, একজন কয়েদীকে ছাড়িয়ে আনতে ফিদ্য়া বাবদ সর্বাধিক কি পরিমাণ অর্থ দিতে হয়েছে ? যখন তাকে বলা হলো, চার হাজার দিরহাম, তখন সে তা-ই দিয়ে আপন পুত্রকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

ফিদয়ার বিভিন্ন রূপ

চিন্তাভাবনা ও সলা-পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে –

১। বন্দীদেরকে ফিদ্‌য়ার বিনিময়ে মুক্ত করে দেওয়া হবে।

২। ফিদ্‌য়ার সর্বাধিক পমিাণ ধার্য করা হয় চার হাজার দিরহাম। কিন্তু এই পরিমাণ আর্থিক সামর্থ্য বহু কম লোকরেই ছিল।

৩। এরপর সামর্থ্য অনুযায়ী কারো জন্য তিন হাজার, কারো জন্য দুই হাজার, কারো জন্য এক হাজার দিরহাম নির্ধারণ করা হয়।

৪। যাদের এই পরিমাণ সামর্থ্যও ছিল না, কিন্তু তারা লেখাপড়া জানত, তাদেরকে বলা হয়, যদি তোমরা মুসলমান শিশুদেরকে লেখাপড়া শেখাও তাহলে তোমাদেরকে এমনিতেই মুক্ত করে দেওয়া হবে। হযরত যায়দ বিন ছাবিত (রা) এভাবেই লেখাপড়া শিখেছিলেন।

৫। যারা কিছুই দিতে পারে নি তাদেরকে শুধুমাত্র অনুগ্রহের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

হযরত আব্বাস (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে যথারীতি ফিদ্‌য়া গ্রহণ করা হয়। আবুল 'আস বিন রাবী (রাসূলুল্লাহ্‌র জামাতা,হযরত যায়নাবের স্বামী)ও কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তখন পর্যন্ত মুসলমান হন নি। তিনি তার ফিদ্‌য়ার ব্যবস্থা করার জন্য হযরত যয়নাবের কাছে খবর পাঠান। যায়নাব (রা) যে ফিদ্‌য়া পাঠান তার মধ্যে হযরত খাদীজা (রা) এর সেই হারও ছিল, যা তিনি বিবাহ উপলক্ষে উপহারস্বরূপ আপন কন্যাকে দান করেছিলেন। এই হার রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর চোখে পড়তেই তাঁর মনোজগতে অনেক পুরাতন কথা উথলে উঠে। ফলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি সাহাবীদেরকে শুধু বলেন, যদি তোমাদের মর্জি হয় তাহলে কন্যাকে তার মায়ের এই স্মৃতিচিহ্নটি ফিরিয়ে দাও।

অতএব হারটি নির্দ্বিধায় হযরত যায়নাব (রা)-কে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং মূল্যমান আবুল আসের ফিদ্‌য়ার সাথে যোগ করে নেওয়া হয়।

এরপর আবুল 'আস পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়ায় যান। ইতিমধ্যে হযরত যায়নাব (রা) মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওওরায় এসে পৌঁছেন। যাহোক সিরিয়া থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন কালে আবুল 'আসের বাণিজ্য-কাফেলার সব পণ্যসামগ্রী মুসলমানরা লুণ্ঠন করে মদীনায় নিয়ে আসেন। কিন্তু এর প্রত্যেকটি বস্তুই সংরক্ষিত থাকে। আবুল 'আস তখন মদীনা মুনাওওরায় পৌঁছে যায়নাব (রা)-এর সাথে দেখা করেন। ফলে তার যাবতীয় সামগ্রী ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি এই সব সামগ্রী নিয়ে মক্কায় ফিরে যান এবং যার যার সিনিস তাকে ফেরত দেন। এরপর ইসলাম গ্রহণ করেন।

কোন্ তারিখে যুদ্ধ হয়েছিল

বদর যুদ্ধের তারিখ নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশের মতে, যুদ্ধ হয়েছিল ১৭ রমযান, হিঃ ২ সন, রোজ শক্রবার। যদি ১৭ রমযানের কথাটি স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে বর্তমানে প্রচলিত ক্যালেন্ডার মতে সেদিন মঙ্গলবার ছিল বলে প্রমাণিত হয়। মিসরের কোন কোন ঐতিহাসিক এরই ভিত্তিতে বদর যুদ্ধ মঙ্গলবার সংঘটিত হয়েছিল বলে তাদের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আমার মতে ভুলের সম্ভাবনা বারের মধ্যে কম এবং তারিখের মধ্যে বেশী ছিল। ঘটনাক্রমে 'তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এর এ সম্পর্কিত একটি বর্ণনা পাওয়া গেছে। বর্ণনাটি হয়রত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) এর। তিনি বলেছেন, হয় রমযান মাসের সতেরো দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং তেরো দিন বাকি থাকতে, নয়ত উনিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং এগারো দিন বাকি থাকতে

বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।[২] ক্যালেন্ডারের হিসাব অনুযায়ী হিঃ ২ সনের রমযানের সূচনা ২২ ফেব্রুয়ারি, ইং ৬২২ সনে হয়েছিল। আর ঐ দিন ছিল শনিবার। অতএব ১৭ তারিখ মঙ্গলবার এবং ১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার হবে। উপরোক্ত রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে একদিন অগ্রপশ্চাৎ হওয়া সম্ভব, কিন্তু চারদিন তো হতে পারে না। আমার অনুমান এই যে, এক্ষেত্রে খুব সম্ভবত: ১৯ তারিখ সম্পর্কিত রেওয়াতাটিই সহীহ এবং সঠিক। আল্লাহ্ই সঠিক জানেন (সংকলক)

টীকা ঃ

(১) সীরাতুন্নবী ঃ পৃষ্ঠা - ২৯৭।

(২)। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ২১।

বদর যুদ্ধ - ৩

[মাওলানা আবুল কালাম আযাদ লিখিত]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাওয়াত ও তার ফলাফল

মক্কায় যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাওয়াতের সূচনা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার লোক দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল হচ্ছে ঐ সব লোক যারা সেই দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিল। আর অপর দল হচ্ছে অবশিষ্ট সমগ্র জাতি এবং তাদের নেতৃবৃন্দ, যারা ঐ দাওয়াতের বিরোধিতা করেছিল। এবার প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, ঐ দলের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার ভিত্তি কি ছিল?

যারা দাওয়াতের অনুসারী ছিল তাঁরা বলতেন, যে কথা আমরা সঠিক মনে করি তা গ্রহণ করার অধিকারও আমাদের রয়েছে। আর যারা দাওয়াতের বিরোধী ছিল তারা বলত, না, ওদের সে অধিকার নেই। অর্থাৎ পরবর্তী দল মানুষের আকীদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতা স্বীকার করত না। অতএব তারা প্রথমোক্ত তথা মুসলমানদেরকে অস্ত্রের জোরে তাঁদের বিশ্বাস থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করত।

হযরত মুহাম্মদ (সা) তের বছর পর্যন্ত তাদের সর্ব প্রকার জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেন। শেষ পর্যন্ত যখন মক্কায় টিকে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন তিনি মদীনায় চলে আসেন। কিন্তু মক্কার কুরায়শরা এখানেও তাঁকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় নি। তারা তাঁর উপর একের পর এক আক্রমণ চালায়। এমতাবস্থায় তাঁর সামনে মাত্র তিনটি পথ খোলা ছিল। আর তা হলো—

(১) তিনি যে কথা সত্য মনে করেন, তা পরিত্যাগ করবেন।

(২) তিনি তাঁর কথার উপর অটল থাকবেন। তবে মুসলমানদের উপর জুলুম-অত্যাচার ও হত্যাকান্ড অবিরাম চলতে থাকবে।

(৩) তিনি একজন বীরের মতই জুলুম-অত্যাচারের মুকাবালা করবেন এবং এই মুকাবালার পরিণতির কথা চিন্তা না করে এর যাবতীয় দায়দায়িত্ব আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করবেন।

রাসুলুল্লাহ্ (সা) শেষোক্ত পন্থাই অবলম্বন করেন এবং তার ফলাফল তা-ই হয়, যা সর্বদা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সত্য জয়লাভ করে এবং অত্যাচারীরা চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

পবিত্র কুরআন যে যুদ্ধকে বৈধ রেখেছে তার গূঢ় কথা এছাড়া আর কিছুই নয়।

যুদ্ধের আহ্কাম

যেহেতু মুখামুখি যুদ্ধের অবস্থা দেখা দিয়েছিল, তাই এর প্রয়োজনীয় আহ্কামও বলে দেওয়া হলো। সূরা আন্ফাল এবং এর পরবর্তী সূরায় এ ব্যাপারে যে উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল তার প্রেক্ষাপটও ছিল মূলত: এটাই।

১। যুদ্ধে যে মালে গনীমত হস্তহত হবে তার অধিকারী হবেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল। অর্থাৎ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে দেওয়া হবে না যে, যে মাল যার হাতে আসবে সে-ই তার মালিক হয়ে যাবে। বরং সবকিছু সর্বাধিনায়কের সামনে পেশ করা হবে এবং তিনি তা সবার মধ্যে বন্টন করে দেবেন।

২। শান্তির অবস্থা হোক অথবা যুদ্ধের অবস্থা মুসলমানদের মধ্যে সব সময়ই পরস্পরের সম্প্রীতি ও ভালবাসা বিরাজ করবে।

৩। সর্বাবস্থায় তাদের লক্ষ্যবস্তু হবে তাক্ওয়া ও আনুগত্য। কেননা এগুলো ছাড়া সত্যের পথে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।

৪। সে-ই সত্যিকার মুমিন, যার আত্মা আল্লাহ্‌র ইবাদত দ্বারা সঞ্জীবিত থাকে, যার ঈমান হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে অনবরত বৃদ্ধি পেতে থাকে, যে সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে কখনো কুণ্ঠিত হয় না।

৫। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে –

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .

"মুমিন তো তারাই, যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তার আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।"

– (৮ ঃ ২-৩)

এই আয়াত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মুমিনের ঈমান সর্বাবস্থায় এক রকম থাকে না, বরং তা কখনো হ্রাস পায়, আবার কখনো বৃদ্ধি পায়। তাসদীক (সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া) -এর ক্ষেত্রে সবাই সমান হলে আস্থা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

৬। জাহিলিয়া যুগে আরবে এই রীতি ছিল যে, যুদ্ধে যে মাল যার হস্তগত হত, তাকেই সে মালের অধিকারী বলে মনে করা হত। রোমানদের মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত ছিল। এই আধুনিক যুগেও ইউরোপের সমগ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এই রীতিই প্রচলিত যে, সেনাবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে যে শহর জয় করে নেবে – একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত সে শহরে লুটপাট চালানোর অধিকার তাদের থাকবে। এই রীতি অনুযায়ীই বৃটিশরা হিন্দুস্তানের শ্রীরঙ্গাপতম, ভরতপুর এবং সিন্ধুর হায়দরাবাদে অবাধে লুণ্ঠন চালিয়েছিল। ইং ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন দিল্লী বিজিত হয় তখন সেখানে সাতদিন পর্যন্ত সৈন্যদেরকে লুটপাট চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কুরআনের নির্দেশ হলো, যুদ্ধে যা কিছু সৈন্যদের হস্তগত হবে তার মালিক হবে হুকূমত তথা রাষ্ট্র। প্রকৃতপক্ষে কুরআন তার এই নির্দেশের বলে লুটপাটকারীদের তথা সৈন্যদের ব্যক্তিগত লোভ-লালসা উজ্জীবিত হওয়ার পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়। যেহেতু এটা ছিল একটি নতুন ধরনের কঠোরতা (বাধ্যবাধকতা), তাই তা মানুষের কাছে অপসন্দনীয় ঠেকাটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। আর এ কারণেই ইসলাম মানুষকে প্রথমে তাক্ওয়া ও আনুগত্যের শিক্ষা দিয়েছে। এরপর তাদের কাছে সত্যিকার মুমিনের অবস্থা বা স্বরূপ তুলে ধরেছে।

বিভিন্ন মানসিকতা

গনীমতের ব্যাপারটিকে সে ধরনেরই একটি ব্যাপার মনে করতে হবে, বদর যুদ্ধ উপলক্ষে মুসলমানরা যার সম্মুখীন হয়েছিল। তখন সাধারণ মুসলমানদের ইচ্ছা ছিল এক এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্ত ছিল অন্য। শেষ পর্যন্ত সবাই দেখে নিলেন যে, মুলত: সেটাই সত্য, যা আল্লাহ্‌র রাসূল চেয়েছিলেন।

ব্যাপারটি ছিল এই যে, হিজরী ২ সনে, যখন মক্কার সর্দাররা মদীনার উপর হামলা চালায়, ঠিক তখনি তাদের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন করছিলো। সে কাফেলাটিকে মদীনার নিকট দিয়েই যেতে হচ্ছিলো।[১] তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র অহীর মধ্যমে অবগত হয়ে মুসলমানদেরকে বলেন ঃ একটি দল (বাহিনী)

মক্কা থেকে আসছে। আর অপরটি হচ্ছে বাণিজ্য কাফেলা। এই দুই দলের যে কোন একটির সাথে তোমাদের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং তোমরাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে। যেহেতু বাণিজ্য কাফেলার লোক সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম; তাই মুসলমানরা চাচ্ছিলো মক্কা থেকে আগত বাহিনীর পরিবর্তে যেন ওদের সাথেই তাদের মুকাবালা হয়। কেননা মক্কা থেকে আগত বাহিনী স্বভাবতঃ খুবই শক্তিশালী হবে। আর মুসল্মানরা তখন ছিল অত্যন্ত দুর্বল ও নি:স্ব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাধারণ মুসলমানদের ঐ চিন্তাভাবনার কোন পরোয়াই করেন নি। তিনি মক্কার ঐ আক্রমণকারী বাহিনীর মুকাবালারই সিদ্ধান্ত নেন। শেষ পর্যন্ত ফল দাঁড়ালো এই যে, মাত্র তিন শ তের জন নিঃস্ব লোক, মক্কার বাছা বাছা লোকদের নিয়ে গঠিত ঐ শক্তিশালী বাহিনীকে একেবারে তছনছ করে দেয়। পবিত্র কুরআনে আছে –

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ.

“স্মরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু'দলের (একদল আবূ সুফইয়ানের বাণিজ্য কাফেলা এবং অপর দল আবূ জাহ্লের নেতৃত্বে গঠিত মক্কার কাফিরদের সশস্ত্র বাহিনী)। একদল তোমাদের আয়ত্বাধীন হবে ; অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্বাধীন হোক, আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করেন; এটা এজন্য যে, তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীরা এটা পসন্দ করে না।” – (৮ ঃ ৭ - ৮)

এই আয়াত غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ দ্বারা বাণিজ্য কাফেলাকে বুঝানো হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আরো আছে –

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰۤئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ وَمَاجَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

“স্মরণ করো, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে; তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ‘আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো এক হাজার ফিরিশ্তা দিয়ে, যারা একের পর এক আসবে। আল্লাহ্ এটা করেন শুধু শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে, আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্র নিকট হতেই আসে, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” – (৮ ঃ ৯-১০)

এই আয়াতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, যদিও মুসলমানদের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিল, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল তারা খুবই উদ্বিগ্ন। তারা মক্কীবাহিনীর মুকাবালায় বের হয়েছিল সত্যি, কিন্তু ছিল খুবই ভীতিগ্রস্ত, এমনি ভীতিগ্রস্ত যে, তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

ফিরিশতাদের ব্যাপারে সূরা আন্ফালের, ৯-১০ আয়াত দ্বারা এ কথাটি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ফিরিশতাদের কথা শুধু এজন্য উত্থাপিত হয়েছিল, যাতে দুর্বলমনা মুসলমানদের অন্তর সুদৃঢ় হয়। একথা এজন্য উত্থাপিত হয় নি যে, বিজয়লাভের ব্যাপারে সরাসরি তাদেরও কিছুটা দখল ছিল। আর এ কারণেই তাফসীর ও হাদীস বিশেষজ্ঞরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ফিরিশতাদের অবতরণ ছিল মুসলমানদের অন্তরকে সবল ও সুদৃঢ় রাখার জন্য। কেননা তারাও যে যুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তার কোন প্রমাণ যেমন পাওয়া যায় নি, তেমনি তাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কোন প্রয়োজনও দেখা দেয় নি।

১২ নং আয়াতে

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

(সুতরাং তাদের কাঁধে ও সর্বাংগে আঘাত করো) বলে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে– ফিরিশতাদের উদ্দেশ্যে নয়।

মুসলমানদের অন্তরকে সুদৃঢ় রাখার জন্য ফিরিশতারা নাযিল হয়েছিল– একথার গূঢ় রহস্য কি? এর উত্তর এই যে, এ ব্যাপারটিও অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্ তা'আলার গূঢ় রহস্যাদির সাথে সম্পর্কিত। আমাদের মনমানসিকতা ও সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা এর রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। তাঁদের মাত্র তিনশ তের জন লোক ছিল যুদ্ধ করার যোগ্য। আর তাঁদের অবস্থাও এই ছিল যে, মাত্র একজন ছাড়া অন্য কারো কাছে ঘোড়া ছিল না। অতএব স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা ছিলেন কিছুটা ভীতিগ্রস্ত। আর তাঁদের মধ্যে যাদের অন্তর ছিল দুর্বল তাঁদের অবস্থা তো ছিল আরো নাজুক। আর সব চেয়ে বড় বিপদ এই ছিল যে, সেখানে জলাশয় ছিল মাত্র একটি এবং তা আগে ভাগেই শত্রুরা দখল করে নিয়েছিল। এছাড়াও দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ায় সেখানকার জমি ছিল অত্যন্ত বালুকাময়। তাই তাতে চলতে গেলে পা ধ্বসে যেত। শত্রুরা তো ছিল অশ্বারোহী। তাই জমি বালুকাময় হলেও তাদের কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু মুসলমানরা ছিল পদাতিক। তাই তারাই চলতে ফিরতে দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলো।

তিনি মুসলমানদের অন্তরে স্বস্তি প্রদানের জন্য তাঁদের সবাইকে নিদ্রাচ্ছন্ন করে ফেলেন। যখন তাঁরা জেগে উঠেন তখন লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁদের অন্তর থেকে যাবতীয় ভয়ভীতি দূর হয়ে গেছে। হযরত আলী (রা) বলেন, বদরের প্রথম রাতে আমাদের কোন ব্যক্তি এমন ছিল না, যে আরামে নিদ্রা যায়নি। তবে হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতভর ইবাদতেই মগ্ন থাকেন(বায়হাকী ফিদ্ দালায়িল)। আর এটা জানা কথা যে, যার অন্তরে ভয়ভীতি থাকবে সে কখনো স্বস্তিতে ঘুমাতে পারবে না। অতএব এই নিদ্রাচ্ছন্ন করাটা তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেওয়ারই নামান্তর। তারপর ঠিক ঐ সময়ে বৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে সবার করায়ত্ত হয়ে গেল প্রচুর পানি। ফল দাঁড়ালো এই যে, মুসলমানরা গোসল করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে সজীব, সতেজ ও সঞ্জীবিত হয়ে উঠেনি। বৃষ্টির কারণে বালুকারাশিও জমে শক্ত হয়ে উঠেছিল। তাই চলাফেরা করার সময় মুসলমানদের মাটিতে পা ধ্বসে যাওয়ার আশংকা আর রইলো না । নিজেদের সাফল্য সম্পর্কে অবিশ্বাস ও নৈরাশ্য, যা প্রকৃতপক্ষে শয়তানী কুমন্ত্রণারই ফলশ্রুতি, তাও মুসলমানদের অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল।

মনন শক্তি সুদৃঢ় করণ

আজকাল যুদ্ধ বিষয়ে যে কথার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হলো, সৈনিকদের মননশক্তি সঠিক ও সুদৃঢ় রাখতে হবে। এখানে এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শুধুমাত্র একথা যে, পানির প্রয়োজন ছিল তা পুরণ হয়েছে, বালুর মধ্যে ধ্বসে যাওয়ার ভয় ছিল তা দুর হয়েছে, গোসল না করার দরুন দেহ রুক্ষ ও শুস্ক-মলীন ছিল-গোসল করার ফলে দেহে সজীবতা এসেছে–এই সব বিষয় মানুষের মনে কি পরিমাণ আত্মনির্ভরশীলতা ও আগ্রহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, তা বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরাই নির্ধারণ করতে পারেন। তবে এটা বাস্তব সত্য যে, কোন কোন সময় প্রাকৃতিক ঘটনারাজির একটি সামান্য ঘটনাও জয়পরাজয় নির্ধারণ করে দিতে পারে। ওয়াটার লু যুদ্ধ সম্পর্কে সকল ঐতিহাসিকই একমত যে, যদি ইং ১৮১৫ সনের ১৭ ও ১৮ জুনের মধ্যবর্তী রাতে বৃষ্টি না হত তাহলে হয়ত ইউরোপের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। কেননা, বৃষ্টি না হলে নেপোলিয়নকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত জমি শুস্ক হয়ে উঠার অপেক্ষায় বসে থাকতে হত না। তিনি ভোর বেলাই যুদ্ধ শুরু করে দিতেন। ফল দাঁড়াল এই যে, বালূখারের সেখানে পৌছার পূর্বেই ওয়েলিংটন নেপোলিয়নের কাছে পরাজিত হয়ে যেতেন।

ওয়াটারলূতে বৃষ্টি না হলে ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে যেত, কিন্তু বদরে বৃষ্টি না হলে কি হত? এই হত যে, সমগ্র বিশ্বের 'হিদায়াত' (পথ প্রদর্শন) ও 'সাআদাত' (সৌভাগ্যে)-এর নক্সা বদলে যেত। এ বিষয়টির প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দু'আর মধ্যেও ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন।

اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكَ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ فَلَاتُعْبَدُ فِى الْاَرْضِ ۔

"হে আল্লাহ্! তোমার অনুগত এই ক্ষুদ্র দলটি যদি আজ ধ্বস হয়ে যায় তাহলে সমগ্র বিশ্বে তোমার সত্যিকার উপাসনাকারী আর কেউ থাকবে না।"

ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوْا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ط وَاللّٰهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۔

" হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন; এবং আল্লাহ্ অতিশয় মঙ্গলময়।"–(৮:২৯)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যে দলটি মুত্তাকী হয়, তাদের ন্যায়-অন্যায় ও ভাল মন্দ পার্থক্য করার একটি বিশেষ ক্ষমতা জন্মে এবং তারা আর ন্যায় ও মন্দের দিকে পা বাড়ায় না। বিশ্ববাসী ভালভাবে দেখে নিয়েছে, এক্ষেত্রে প্রথম যুগের মুসলমানগণ কী বিমস্ময়কর ভূমিকাই না পালন করছিলেন। যে আরবরা ছিল বেদুঈন যাযাবর, উট চরানো ছিল যাদের প্রধান পেশা –দেখা গেল তারাই, একেবারে রাতারাতি ইরানী ও রোমানদের মত সভ্যভব্য জাতিসমূহের ভাগ্য নির্ধারণের মালিক হয়ে বসলো।

আর সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ন্যায়-অন্যায় ও ভালমন্দ নির্ণয়ের এমন একটি ক্ষমতা তাঁদের হাতে এসে গেল যে, তাঁরা যা কিছু করতেন এবং যেভাবে করতেন, তা ন্যায়, সত্য এবং মঙ্গল ও সৌভাগ্যবাহী ছাড়া কিছু হত না।

আল্লাহ্র গোপন কৌশল

পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে, যাতে বলা হয়েছে–

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ۔

"স্মরণ করুন, কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত করে আপনাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেন আর আল্লাহ্ই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"–(৮ ঃ ৩০)

অর্থাৎ মানুষ অজ্ঞতা ও মূর্খতা বশত: কি চিন্তা করে, আর আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত, বিজ্ঞতা ও রহস্য ঘেরা কৌশল তার কি সিদ্ধান্ত দেয় তা মানুষ মাত্রেরই ভেবে দেখার বিষয়। হিজরতের পূর্বে মক্কার কুরায়শরা যে পরিকল্পনা তৈরী করেছিল, তার পরিণাম কি হবে, তা কি তারা কখনো চিন্তা করে দেখেছিল? শেষ পর্যন্ত তাদের

জুলুম-নির্যাতনই তো তাদের সর্বনাশ ডেকে আনে। যদি তারা জুলুম-নির্যাতন না করত তাহলে হিজরতও সংঘটিত হত না। আর হিজরত সংঘটিত না হলে মক্কার কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এভাবে অঘোরে মারা পড়ত না। এটাই হচ্ছে 'কানূনে ইলাহী'—আল্লাহ্‌র গোপন কৌশল, যা মানবীয় জুলুম নির্যাতনের যাবতীয় কৌশলকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেয়।

দ্বীনের ন্যায়ানুগ নেশা

যখন কতিপয় মুসলমান নিঃস্ব অবস্থায় বদর অভিমুখে রওয়ানা হল তখন মুনাফিক ও দুর্বলচিত্ত কিছু লোক তাদের এ উদ্যোগের পিছনে কোন যৌক্তিকতা খুজে পায়নি। তাই তারা বলেছিলো, দ্বীনের নেশা এদেরকে মাতাল ও আত্মম্ভরী করে তুলেছে। তারা যদিও তিরস্কারের ছলে একথাগুলো বলেছিল, কিন্তু এক অর্থে তা অমূলকও ছিল না। নিঃসন্দেহে এটা তাঁদের দ্বীনের নেশা ছিল—কিন্তু কোন খারাপ বা অন্যায় নেশা তো ছিল না। আর এ কারণেই পবিত্র কুরআনও তার অতি প্রাঞ্জল ভাষায় মুনাফিকদের ঐ উক্তিকে সরাসরি উদ্ধৃত করেছে, তা রদ বা বাতিল করে দেয় নি। যেমন বলা হয়েছে—

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِيْنُهُمْ ط وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

"স্মরণ করুন, মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যধি আছে তারা বলে, 'এদের দ্বীন এদেরকে বিভ্রান্ত করেছে।' কেউ আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করলে আল্লাহ্ তো পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।"—(৮:৪৯)

অর্থাৎ তাদের কথা উদ্ধৃত করে উপসংহার টানা হয়েছে এই বলে যে, ' কেউ আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করলে আল্লাহ্ তো পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।'

সন্ধি ও শান্তি

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ . وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ .

"তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে ও আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবে, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তবে তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।"—(৮:৬১-৬২)

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে কী অকাট্য ভাষায়ই না শান্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই আয়াত তখনি নাযিল হয় যখন বদর যুদ্ধের চূড়ান্ত ফয়সালা মুসলমানদের বিজয়কে সবার সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিল এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপ তাঁদের ক্ষমতা দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো, শত্রু যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে তোমরা বিনা দ্বিধায় (শত্রুদের) নিয়্যতের মধ্যে যদি কোন কলুষও থাকে তবু তাদের সাথে সন্ধি স্থাপনের ক্ষেত্রে এক মুহূর্তও বিলম্ব করা উচিত নয়।

আল্লাহ্‌র বিশেষ নি'মাত

বিক্ষিপ্ত ও ছিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক মানব হৃদয়কে একই প্রেমের ডোরে বেঁধে দেওয়ার চাইতে অধিকতর কঠিন কাজ এ বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই। আর এ কাজটি তখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে যখন তা করা হয় ঐ সব লোকের মধ্যে, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহের পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছে এবং তাদের মানসিক ছাঁচগুলোর মধ্যে পরস্পর খাপ খাওয়া তথা পরস্পর সৌহার্দ সম্প্রীতি স্থাপনের কোন যোগ্যতাই আর বাকি থাকে নি।

এমনি ধরনের লোকদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)। কিন্তু তাঁর দাওয়াতের দশ বারো বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই মদীনায় এমন একটি জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হল, যারা এদিক দিয়ে ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক সৃষ্টি। তারা যতক্ষণ মুসলমান হয়নি ততক্ষণ ছিল পরস্পর হিংসাবিদ্বেষ ও প্রতিশোধ গ্রহণে যেন এক একটি জীবন্ত মূর্তি। কিন্তু যখনই তাঁরা মুসলমান হলেন তখন তাঁদের মধ্যে এমনি স্নেহ ভালবাসা ও পবিত্র মন-মানসিকতার সৃষ্টি হলো যে, তাঁদের একজন অপরজনের জন্য নিজের জানমাল সবকিছু উৎসর্গ করে দিতে মোটেই কুণ্ঠিত ছিলেন না।

প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল চরিত্র সংশোধনের একটি নবীসুলভ কর্মধারা, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। আর এরই দিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে−

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ط لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর তিনি ওদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও আপনি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেন। তিনি পরাক্রামশালী, প্রজ্ঞাময়।"−(৮:৬৩)

এ থেকে জানা গেল যে, মুসলমানদের পরস্পর স্নেহভালবাসা এমনি এক নি'মাত, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন বিশেষ অবদান হিসাবে ঘোষণা করেছেন। আক্ষেপ তাদের জন্য, যারা এই নি'মাত থেকে বঞ্চিত থেকেও নিশ্চুপ হয়ে আছে এবং মনের মধ্যে কোনরূপ অশান্তি বোধ করছে না। আজ পরস্পর সম্প্রীতি ও মিত্রতার পরিবর্তে পরস্পর বিদ্বেষ ও শত্রুতাই যেন মুসলমানদের সবচেয়ে বড় পরিচিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একেই বলে অবস্থার আমূল পরিবর্তন বা পরিস্থিতির অদ্ভূত বৈপরিত্য।

বদরের যুদ্ধবন্দী

বদর যুদ্ধে যখন শত্রুরা বন্দী হলো তখন প্রশ্ন উঠলো, এ ব্যাপারে কি করা উচিত। যেহেতু ঐ সময় মুসলমানরা অত্যন্ত অভাব অনটন ও নিঃস্ব অবস্থার মধ্যে ছিলেন; তাই সাধারণ জনমত এই ছিল যে, কয়েদীদের কাছ থেকে ফিদ্য়া (মুক্তি মূল্য) তলব করা হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা ফিদ্য়া পরিশোধ না করবে ততক্ষণ তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হবে না। কোন কোন সাহাবী এই অভিমত দেন যে, ওদেরকে হত্যা করে ফেলা উচিত। হযরত উমর(রা) ও এই অভিমতই ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-সাধারণ জনমত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কয়েদীদের কাছ থেকে ফিদ্য়া তলব করা হয়। আর যে সব কয়েদীর কাছ থেকে ফিদ্য়া পাওয়া যায়নি তাদেরকে আটকে রাখা হয়।

এই প্রেক্ষিতেই কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়−

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا صلے وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

" দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়; তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ্ চাহেন পরলোকের কল্যাণ; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।−(৮:৬৭)

অর্থাৎ পৃথিবীতে নবী এজন্য আসেন না যে, তাঁর অনুসারীরা শত্রুদের বন্দী করে রেখে তাদের কাছ থেকে মুক্তিমূল্য আদায় করতে থাকবে, বরং তাঁর আগমনের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, হক্কের দাওয়াত বা ঘোষণা প্রদান। অতএব নবীর জন্য বাঞ্ছনীয় নয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দাওয়াত দেশে দেশে প্রচারিত ও প্রসারিত না হবে ততক্ষণ

পর্যন্ত শুধুমাত্র মুক্তিমূল্যের জন্য তিনি যুদ্ধ বন্দীদেরকে আটকে রাখবেন। তোমাদের দৃষ্টি পার্থিক সম্পদের দিকে, আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য আখিরাতের পুরস্কার পসন্দ করে রেখেছেন।[২]

অত:পর নিম্নের আয়াতে বিষয়টিকে একেবারে খোলাসা করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"হে নবী! আপনাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে বলুন, আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরেকে দান করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"–(৮:৭০)

যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে সূরা মুহাম্মদ-এ চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই বলে–

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً.

"এরপর হয় অনুকম্পা, নয়ত মুক্তিপণ।"–(৪৭:৪)

অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুযায়ী হয় অনুকম্পা কর, নয়ত মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দাও।

ছয়টি জরুরী কথা

সূরা আনফালের ৪৫-৪৭ আয়াতে ছয়টি কথার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যা বিজয়ের উৎস মূল।

(১) فَاثْبُتُوا অর্থাৎ অবিচলিত থাকো। কেননা, যুদ্ধক্ষেত্রে তারাই সাফল্যের ভাগী হয়, যারা শেষ পর্যন্ত অবিচলিত থাকে।

(২) وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে। কেননা, দেহের দৃঢ়তা,অন্তরের দৃঢ়তার উপর নির্ভরশীল। আর ঐ ব্যক্তির অন্তর দৃঢ় থাকে, যে আল্লাহ্‌র উপর পুরোপুরি বিশ্বাস রাখে।

(৩) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং আনুগত্য করবে নিজেদের ইমাম বা নেতার। কেননা, আনুগত্য (শৃঙ্খলা) ছাড়া কোন দলই জয়যুক্ত হতে পারে না।

(৪) وَلَاتَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে।

(৫) وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ অর্থাৎ যত কঠিন পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হওনা কেন, ধৈর্য ধারণ কর। শেষ পর্যন্ত সেই জয়লাভ করে যে সবচাইতে অধিক ধৈর্যশীল।

(৬) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ 'তোমরা তাদের ন্যায় হবে না যারা দম্ভ ভরে ও লোক দেখাবার জন্য আপন ঘর থেকে বের হয়েছিল এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত করে।"

অর্থাৎ তোমরা ঐ কাফিরদের আচার-আচরণ গ্রহণ করো না, যারা ঈমান ও সততার স্থলে দম্ভ ও লোক দেখানোর পন্থা অবলম্বন করে। বরং তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের ভিত্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও বিশুদ্ধচিত্ততার উপর হওয়া উচিত।[৩]

টীকা ঃ

(১) বদর, মদীনা মুনাওওরা থেকে আশি মাইল দূরে অবস্থিত। বদরের নিকটেই সমুদ্র উপকূল। মাওলানার উদ্দেশ্য একথা বলা নয় যে, বাণিজ্য কাফেলার পথ মদীনা মুনাওওরার অনেক নিকটে ছিল। বরং তিনি বলতে চেয়েছেন যে, অপেক্ষাকৃত নিকটে ছিল।

(২) পূর্বাপর ঘটনা থেকে এটাই অনুমিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে এই মর্মে যে, তাদের আসল লক্ষ্য মাল বা ফিদ্য়া নয়, যাকে 'আরাযাদ্ দুনয়া' বা পার্থিব সম্পদ বলা হয়েছে, বরং তাঁদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে 'দাওয়াতে হক' এর প্রচার ও প্রসার। অন্যকথায়, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু এতটুকু বলে দিতে চান যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য মালে গনীমত, যুদ্ধবন্দী বা ফিদ্য়া নয় বরং শুধুমাত্র 'দাওয়াতে হক' ই এর উদ্দেশ্য। অবশ্য এর মাধ্যমে নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতা ও সংঘর্ষের অবসান হয়।

(৩) বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে এ উপদেশগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। আমি মূল আয়াতের অংশগুলো এখানে ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করলাম। তরজমান-এ তো মাওলানার এভাবে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, সেখানে প্রত্যেকটি আয়াতের সাথে তার টীকাও ছিল।

সন্ধি ও প্রতিরক্ষামূলক অভিযান

[বদর থেকে উহুদ পর্যন্ত]

পায্ওয়া-ই-আলকাদর

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর থেকে প্রত্যবর্তনের পর মদীনা মুনাও্ওরায় সাতদিনের বেশী অবস্থান করেন নি। এমন সময় সংবাদ পেলেন যে, বনূ সুলায়ম সম্প্রদায় মদীনা মুনাও্ওরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন এটাই সমীচীন মনে করা হলো যে, অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা উচিত। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিবা' বিন উরফাতা গিফারী (রা)-কে (কোন কোন রেওয়ায়ত অনুযায়ী ইবনে মাকতুম (রা)-কে) মদীনায় আপন প্রতিনিধি নিয়োগ করে স্বয়ং আল কাদ্রে গিয়ে পৌছেন। আল কাদ্র ছিল বনূ সুলায়মের সমবেত হওয়ার স্থান। তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)- এর আগমন-সংবাদ পেল তখন তাঁর মুকাবালা না করে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনি দিন পর্যন্ত আল কাদ্রে অবস্থান করেন। এরপর মদীনা মুরাও্ওরায় ফিরে আসেন।

গায্ওয়া-ই-সুভায়ক

আবু সুফিয়ান বদর থেকে মক্কা মুকাররমা পৌছার পর এই মর্মে শপথ নিয়েছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বদরে নিহত কুরায়শদের প্রতিশোধ না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত না অপবিত্রতার গোসল করবে, আর না মাথায় তেল দেবে। সে যতশীঘ্র সম্ভব এই প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দু'শ উষ্ট্রারোহী নিয়ে রওয়ানা হয় এবং মদীনা মুনাওওরা থেকে দশ মাইল দূরবর্তী কোন একটি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। সে তার বাহিনীকে সেখানে রেখে স্বয়ং মদীনায় গিয়ে বনূ নযীর গোত্রের হাই বিন আখতাবের দরজায় করাঘাত করে। কিন্তু কোন সাড়া পায়নি। এরপর সে সাল্লাম বিন মিকশামের ঘরে যায়। সাল্লাম ছিল বনূ নযীরের সর্দার এবং ভান্ডারী। সে আবু সুফ্য়ানের সামনে অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ খাবার পরিবেশন করে। আবু সুফ্য়ান খাবার খায়, মদ্য পান করে এবং সাল্লামের কাছ থেকে সকল গোপন কথা সংগ্রহ করে আপন সংগীদের কাছে যায় এবং তাদের নিয়ে উরায়যের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালায়। উরায়য মদীনার তিন মাইল উত্তরে কানাতের নিকটবর্তী একটি স্থান। আবূ সুফ্য়ান সেখানে কিছু গাছপালা পুড়িয়ে দেয়, জনৈক আনসারী আপন ক্ষেতের মধ্যে শুইয়ে ছিলেন, তাঁকে এবং তাঁর একজন মিত্রকে হত্যা করে, এরপর ঘাসের কয়েকটি স্তূপ এবং খড়ের তৈরী কয়েকটি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এভাবে সে তার শপথ পূরণ (?) করে সেখান থেকে মক্কা অভিমুখে দ্রুত পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এই আকস্মিক হামলার খবর পাওয়ার সাথে সাথে আবু লুবাবা বশীর বিন আবদুল মানযারকে মদীনা মুনাও্ওরায় আপন প্রতিনিধি নিয়োগ করে আবু সুফ্য়ানের পশ্চাদ্ধাবনে বের হন এবং কারকারাতুল কাদ্র পর্যন্ত এগিয়ে যান। কিন্তু আবু সুফ্য়নের নাগাল পাওয়া যায়নি। আবু সুফ্য়ানের বাহিনীর রসদ ছিল ছাতু। সে দ্রুত পালাতে গিয়ে রাস্তায় বেশ কয়েকটি বস্তা ফেলে যায়। সাহাবীগণ সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে আসেন। ছাতুকে আরবীতে বলা হয় সুভায়ক। এ কারণে ঐ গায্ওয়া 'গাযওয়া-ই-- সুভায়ক' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটা হচ্ছে হিঃ সনের যীকা'দা (মুতাবিক মে, ইং ৬২৪ সন) এর ঘটনা।

গায্ওয়া-ই-যী আম্র

গাযওয়া-ই-সুভায়ক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিঃ ২ সনের যিল হাজ্জাহ এবং হিঃ ৩ সনের মুহাররম- এই দু'মাস মদীনায় অতিবাহিত করেন। এরপর সংবাদ পান যে, মদীনা আক্রমণের জন্য উপজাতীয়

সম্প্রদায়ের লোকেরা দিয়ারে গিতফানে[১] অবস্থিত যী আমরে জড় হচ্ছে। এই সংবাদ পাওযার সাথে সাথে হি ঃ ৩ সনের সফর মাসের প্রথম দিকে (মুতাবিক আগষ্ট, ইং ৬২৪সন) তিনি দিয়ারে গিতফান অভিমুখে রওয়ানা হন এবং ঐ অঞ্চলে সম্পূর্ণ সফর মাস (মুতাবিক ২২ আগষ্ট,ইং ৬২৪ সন থেকে ২১ সেপ্টেম্বর, ইং ৬২৪ সন) কাটিয়ে দেন। কিন্তু কোন যুদ্ধ হয়নি। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন পাহাড় অভিমুখে পালিয়ে যায়। য়াকূতের মতে, এই গাযওয়া সংঘটিত হয়েছিল হিঃ ৩ সনের রাবীউল আউয়াল মাসে।

গাযওয়া-ই- বাহরান

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিঃ ৩ সনের রবীউল আউয়াল মাস মদীনা মুনাও্ওরায় অতিবাহিত করেন। এরপর মক্কার কুরায়শদের সাথে যুদ্ধ করার সংকল্প নিয়ে মদীনা মুনাও্ওরা থেকে বের হন। ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) কে মদীনা মুনাও্ওরায় আপন প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি বাহরানে গিয়ে পৌছেন। ফারআ, জেলায় অবস্থিত বাহরান ছিল হিজাযের পাথর খাদ। মদীনা মুনাও্ওরা থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় এক শ মাইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাবীউল আখির এবং জামাদিউল আউয়াল, হিঃ ৩ সনে ঐ অঞ্চলেই কাটিয়েছেন।[২] কিন্তু কোন যুদ্ধ হয়নি।

যায়দ বিন হারিছার অভিযান

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ বিন হারিছাকে একটি বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে কারওয়া[৩] অভিমুখে প্রেরণ করেন।[৪] প্রকৃত ঘটনা এই যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কার কুরায়শরা সিরিয়া অভিমুখী সাধারণ বাণিজ্যপথের পরিবর্তে সেই বাণিজ্য পথই বেছে নেয়, যা মদীনা মুনাও্ওরার পূর্ব প্রান্ত দিয়ে চলে গেছে। ঐ বাণিজ্যপথকে 'তারীকে ইরাক' বলা হত। কুরায়শরা বনী বকর বিন ওয়ায়িল গোত্রের ফুরাত বিন হাইয়ান নামীয় জনৈক ব্যক্তিকে তাদের পথ প্রদর্শক নিয়োগ করে। যায়দ বিন হারিছার অভিযানের লক্ষ্য ছিল ঐ বাণিজ্য কাফেলাকে লুণ্ঠন করা, যাতে কুরায়শরা পূর্বদিকের রাস্তা দিয়েও তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে যেতে না পারে। যায়দ বিন হারিছা কুরায়শের ঐ বাণিজ্য কাফেলাকে ধরে ফেলেন। সাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং খুব সম্ভবত: আবু সুফ্য়ানও ঐ কাফেলার সাথে ছিল। ঐ কাফেলার বেশীর ভাগ পণ্যসামগ্রী ছিল রূপা। যায়দ ঐ রূপা এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রী তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। কিন্তু কাফেলার লোকেরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। যায়দ ঐ মালসামগ্রী নিয়ে মদীনা মুনাও্ওরায় ফিরে আসেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)- এর কাছে ঐ কাফেলার খবর কিভাবে পৌছেছিল? এর উত্তর এই যে, নুয়ায়ম বিন মাসঊদ গিত্ফানী তার য়াহূদী বন্ধু কানানা বিন আবিল হাকীক নায্রীর সাথে সাক্ষাত করার জন্য মদীনায় এসেছিল। নুয়ায়ম তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে-ই আলাপ প্রসংগে কানানার কাছে কুরায়শের ঐ কাফেলার উল্লেখ করেছিল। ঠিক ঐ মুহূর্তে সেখানে একজন মুসলমানও উপস্থিত ছিলেন। তিনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ঐ সংবাদ পৌছান। এটা হচ্ছে জমাদিউল উলা, হি ঃ ৩ সনের (মুতাবিক নভেম্বর, ইং ৬২৫ সনের) ঘটনা। যায়দ বিন হারিছার সাথে এক শ সত্তর জন উষ্ট্রারোহী ছিলেন।

টীকা ঃ

(১) দিয়ারে গিতফান হচ্ছে মদীনা মুনাও্ওরা থেকে আনুমানিক তিন মনযিল (ছত্রিশ কিংবা চল্লিশ মাইল) উত্তরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম।

(২) মু'জামুল বুলদান ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা– ৩৩৪।

(৩) নাজদ অঞ্চলের একটি কূয়া, যা মদীনা মুনাও্ওরা থেকে দু'তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত।

(৪) এই অভিযান শুরু হয় রাবীউল আখির, হি ঃ ৩ সনে মুতাবিক ২১ সেপ্টেম্বর, ইং ৬২৪ সনে এবং শেষ হয় জামাদিউল উলা, হিঃ ৩ সনে মুতাবিক ১৮ নভেম্বর ইং ৬২৪ সনে।

উহুদ যুদ্ধ

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ط وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ .

"যদি (উহুদ যুদ্ধে) তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত ওদেরও (শত্রুদেরও) তো (বদর যুদ্ধে) লেগেছে। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলোর (সুদিন-দুর্দিন বা জয়-পরাজয়ের) পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ্ মুমিনদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কিছু লোককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ্ জালিমদেরকে পসন্দ করেন না।"–(৩ঃ১৪০)

উহুদ যুদ্ধ-১

মক্কার কুরায়শ কর্তৃক প্রতিশোধ গ্রহণ

বদর যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার পর কুরায়শ বাহিনী মক্কায় ফিরে যায়। তাদের অন্তরে প্রতিশোধের বহ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলছিলো এবং সে জ্বালা মেটানোর জন্য তারা সম্ভব সব রকমের পদক্ষেপ গ্রহণে পাগলপারা হয়ে উঠেছিল।

'ইবনে হিশাম' ও 'তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এর বর্ণনা অনুযায়ী, কুরায়শবাহিনী যখন বদর থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে-তখন যে বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষার জন্য তারা মক্কা থেকে বের হয়েছিলো এবং আবু জাহ্লের ফিতনাবাজী ও বাড়াবাড়ির কারণে তাদেরকে বদর প্রান্তরে মুসলমানদের হাতে চরমভাবে বিপর্যস্ত হতে হয়েছিল-সেই বাণিজ্য কাফেলার লোকেরা দারুন নাদ্ওয়ায় অবস্থান করছিলো। অতএব কুরায়শের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সেখানে আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে বললো, মুহাম্মদ আমাদের সব বাছা বাছা লোকদের তো শেষ করে দিয়েছে, এবার তুমি আমাদেরকে অর্থ সম্পদ দিয়ে সাহায্য কর, যাতে আমরা নিহতদের খুনের বদলা নিতে পারি।[১] আবু সুফ্য়ান তখন নিজের পক্ষ থেকে এবং আবদে মানাফ গোত্রের পক্ষ থেকে তাদের ঐ অনুরোধ রক্ষা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। ঐ বাণিজ্য কাফেলায় ছিল এক হাজার উট এবং পঞ্চাশ হাজার দীনারের সম্পদ। তাতে যা মুনাফা হয়েছিল তার মোট পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার দিনার। মুল পূঁজি মালিকদের ফিরিয়ে দিয়ে মুনাফা যুদ্ধ ফান্ডে প্রদান করা হয়। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ . وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ .

"আল্লাহ্র পথ থেকে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য কাফিররা তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, তারপর এটা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে।"-(৮ঃ৩৬)

যুদ্ধ-প্রস্তুতি

যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যাপারে সাফ্ওয়ান বিন উমাইয়া ছিল সবার চাইতে অগ্রণী। কবি আবু আয্যা ছিল বদর যুদ্ধের বন্দীদের অন্যতম। ফিদ্য়া দেওয়ার মত কোন সম্পদ তার কাছে ছিল না। সে অত্যন্ত বিনীতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিবেদন করে, 'আমার সন্তান সন্ততির সংখ্যা অনেক বেশী এবং আমি খুবই অভাবগ্রস্ত। এবার আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) দয়াপরবশ হয়ে তাকে ফিদ্য়া ছাড়াই মুক্ত করে দেন। উপরোক্ত কারণেই মক্কায় ফিরে যাবার পর সে কুরায়শদের ঐ যুদ্ধ-পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করতে চাচ্ছিলো না, কিন্তু সাফ'ওয়ান বিন উমাইয়া তাকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে স্বমতে টেনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এরপর এই আবু আয্যা এবং মুসাফি' বিন আবদে মানাফই বনূ কানানা গোত্রকে কুরায়শের পক্ষে টেনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জুবায়র বিন মুতয়ী'মের ওয়াহশী নামীয় একজন কাফ্রী ক্রীতাদাস ছিল। হাবশী ষ্টাইলে বর্শা নিক্ষেপে সে ছিল খুবই পারদর্শী। জুবায়র তাঁকে বললো, যদি তুমি মুহাম্মদের চাচা হামযা (রা)-কে হত্যা করতে পার তাহলে মনে করব আমার চাচা তুআ'য়মা বিন আদীর খুনের পুরোপুরি বদলা নেওয়া হয়ে গেছে। আর এর বিনিময়ে আমি তোমাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেব। হিন্দ বিনতে উতবা (আবু সুফ্য়ানের স্ত্রী)-ও আপন পিতা উতবা বিন রাবীআর খুনের বদলা নেওয়ার জন্য উতলা হয়ে উঠেছিল। তার পিতার হত্যাকারী হামযাকে হত্যা করতে পারলে সেও ওয়াহশীকে এক মহামূল্যবান পুরস্কার দেবে বলে অঙ্গীকার প্রদান করে। তাছাড়া উহুদের যুদ্ধ চলাকালে হিন্দ যখনই ওয়াহ্শীকে দেখত তখনই আবদারের সুরে বলত, আবু ওয়াসামা,[২] আমার কালিজা ঠান্ডা কর এবং তোমারও। অর্থাৎ আমার প্রতিশোধ গ্রহণের এবং সেই সাথে তোমার নিজের মুক্তিলাভের ব্যবস্থা কর।

আবু আমির রাহিবও (সে ঐ যুগে সাধারণ্যে'ফাসিক' উপাধি লাভ করেছিল) কুরায়শদের পক্ষ অবলম্বন করে। এমন কি সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য সে কুরায়শ বহিনীতে যোগ দেয় এবং প্রতিপক্ষের উপর চোরাগুপ্তা হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রস্তাবিত যুদ্ধক্ষেত্রের এখানে সেখানে গর্ত খুঁড়ে তার উপর খেজুরের ছোট ছোট ডাল সাজিয়ে রেখে হালকাভাবে মাটি দিয়ে পৃষ্ঠভাগ সমান করে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। কুরায়শ বাহিনী তার এই পরামর্শ কার্যকরও করেছিল এবং ঘটনা চক্রে একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও এধরণেরই একটি গর্তে পড়ে গিয়েছিলেন।

কুরায়শ বাহিনী

কুরায়শদের যুদ্ধ প্রস্তুতির যাবতীয় সংবাদ আপন চাচা আব্বাসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌছে গিয়েছিল। আব্বাস তখন পর্যন্ত মুসলমান না হলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কল্যাণার্থে তার জন্য সাধ্যমত যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

যাহোক, ঐ যুদ্ধে কুরায়শ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন হাজার। আহলে তাহামা এবং বনূ কানানাও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। করায়শ বাহিনীর সাথে ছিল সাত শ যোদ্ধা, দু শ ঘোড়া, তিন হাজার উট এবং পনেরো জন স্ত্রীলোক। মরহুম মাওলানা শিবলী বলেন, তৎকালীন যুদ্ধসমূহে দৃঢ়তা ও যুদ্ধস্পৃহা বজায় রাখার সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছিল অন্তঃপুর বাসিনী মহিলারা। যে যুদ্ধে মহিলারা সংগে থাকত সে যুদ্ধে আরবরা তাদের প্রাণ বাজি রেখেই লড়ত। কেননা, তারা পরাজিত হলে পর তাদের মহিলারা যে শত্রুদের হাতে নির্যাত লাঞ্ছিত হবে।[৩]

কুরায়শের যেসব মহিলা উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল

উহুদ যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর সাথে যে সব মহিলা এসেছিল তারা একাধারে যেমন ছিল সম্ভ্রান্ত, তেমনি ছিল আপন কোন না কোন নিকটাত্মীয়ের রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য একেবারে পাগলপারা। যেমন,

১। হিন্দ। সে ছিল কুরায়শ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবু সুফ্য়ানের স্ত্রী। তার পিতা উতবা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

২। উম্মে হাকীম বিনতে হারিছ। সে ছিল আবু জাহ্লের ভাতিজী এবং ইক্রামা বিন আবু জাহলের স্ত্রী। শ্বশুর আবু জাহলের বদলা নিতে যুদ্ধে এসেছিল।

৩। ফাতিমা বিনতে অলীদ। সে ছিল খালিদের বোন এবং আবু জাহলের ভাই হারিছ বিন হিশামের স্ত্রী। আবু জাহ্ল ছাড়াও পিতা অলীদের বদলা নিতে এসেছিল।

৪। বারযাহ্ বিনতে মাসউদ ছাকাফী। সে ছিল সাফ্ওয়ান বিন উমাইয়ার স্ত্রী। পিতা উমাইয়ার বদলা নিতে এসেছিল।

৬। হান্নাস। সে ছিল মুস'আব বিন উমায়র (রা)-এর পৌত্তলিক মা। সে তার পৌত্তলিক পুত্র আবু আযীযের সাথে যুদ্ধে এসেছিল।

কুরায়শ যখন যুল হুলায়ফায় অবতরণ করে তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফুযালার দুই পুত্র আনাস এবং মু'নিসকে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য পাঠান। তাঁরা ফিরে এসে খবর দেন, কুরায়শরা তাদের উট এবং ঘোড়া আল উরায়যে ছেড়ে দিয়েছিল এবং সেখানকার সব ঘাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় যাত্রা শুরু করেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুবাব বিন মুনযিরকে আরো বিস্তারিতভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠান। তিনি সোজা কুরায়শ বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন এবং তাদের জনসংখ্যার সঠিক হিসাব নিয়ে ফিরে আসেন। কুরায়শরা মদীনা মুনাওওরার উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত বি'-রে রূমা এবং গাবার মধ্যবর্তী একটি স্থানে অবস্থান নিয়েছিল। পর্যাপ্ত পানি থাকায় ঐ স্থানটি ছিল জীবজন্তু চরাবার পক্ষে খুবই উপযোগী। খন্দক যুদ্ধেও তারা এই জায়গায়ই অবস্থান নিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) শহরের মধ্যে পাহারার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করেছিলেন। সা'দ বিন মুআয, উসায়দ বিন হুযায়র এবং সা'দ বিন উবাদা (রা) অস্ত্র সজ্জিত হয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরজায় পাহারারত ছিলেন।

পরামর্শ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-উপস্থিত পরিস্থিতিতে কি করণীয় সে সম্পর্কে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। মুহাজির ও আনসারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অভিমত ছিল মদীনায় যেসব মহিলা এবং শিশু রয়েছে তাদেরকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হোক, তারপর শহরের মধ্যেই পরিখা তৈরী করে শত্রুদের মুকাবালা করা হোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা)- এর অভিমতও ছিল তাই। আশ্চর্যের কথা এই যে, আবদুল্লাহ্ বিন উবাই-এর মতও ছিল তাই, যখন তাকে তাবারীর বর্ণনানুযায়ী,প্রথম বারের পরামর্শ সভায় ডাকা হয়েছিল। কিন্তু একটি বিরাট সংখ্যক যুবক শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুর মুকাবালার উপর জোর দেয়। আর তাঁদের উদ্দীপনা ও উষ্ণ রক্তের চাহিদাও ছিল তাই। শেষ পর্যন্ত অনুমিত হচ্ছিলো যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক এই অভিমতের পক্ষেই চলে গেছেন।

সেদিন ছিল শুক্রবার। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমু'আর সালাতে ইমামতী করেন এবং জিহাদের উপর খুতবা দেন। তিনি তার খুতবায় বলেন, যতক্ষণ তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে ততক্ষণ তোমাদের প্রতি সাহায্য আসতে থাকবে। এরপর তিনি ঘরে চলে যান, বর্ম পরিধান করেন এবং অন্যান্য আসবাব-সামগ্রী সংগে নিয়ে ঘর থেকে বের হন। লোকেরা সারিবদ্ধ হয়ে তাঁর অপেক্ষা করছিলো। ঠিক ঐ মুহূর্তে সা'দ বিন মু'আয এবং উসায়দ বিন হুযায়র (রা) যুবকদের সম্বোধন করে বললেন, বাইরে গিয়ে শত্রুর মুকাবালা করার উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা তোমাদের পক্ষে উচিত হয়নি। এটাই সব চাইতে ভাল যে, তোমরা এখানো ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ছেড়ে দাও। তখন যুকরাও তাদের এই বাড়াবাড়ির জন্য লজ্জা বোধ করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন অস্ত্র সজ্জিত হয়ে ঘরের বাইরে আসেন তখন সকলেই বিনীতভাবে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আমাদের মতামত পরিত্যাগ করলাম। আপনার যা ভাল মনে হয় তাই করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জবাব দেন, নবীর জন্য এটা শোভা পায় না যে, হাতিয়ার পরিধান করে পুনরায় তা খুলে ফেলবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তার এবং তার শত্রুদের মধ্যে একটা ফয়সালা করে দেন।

প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি যতক্ষণ পরামর্শের পর্যায়ে ছিল ততক্ষণ মতামত পরিবর্তন করা যেত। যখন বিষয়টির একটা ফয়সালা হয়ে গেছে তখন মতামত পরিবর্তন করা এবং বিষয়টি সম্পর্কে পুনরায় বিচার-বিবেচনা বাঞ্ছনীয় হবে না। কেননা, এই কর্মপন্থা দৃঢ়তা ও দুঃসাহসিকতার পরিবর্তে দুর্বলতা ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে পরিণত হতে পারে।

মদীনা মুরাওওরার অধিবাসী

মদীনা মুনাওওরার পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণে ঘন খেজুর বাগান ছিল। এগুলো অতিক্রম করে এর কোন বসতি বা মহাল্লায় হামলা চালানো সহজ ব্যাপার ছিল না। কেননা, বাগানের বৃক্ষরাজি এতই ঘন ছিল যে, সেগুলোর মধ্য

দিয়ে শত্রুরা শুধুমাত্র এক একজন করেই অগ্রসর হতে পারত। আর এতে করে তারা নির্ঘাত মারা পড়ত। শুধুমাত্র উত্তর দিক থেকেই হামলা চালানো সম্ভব ছিল। আর একারণেই কুরায়শরা উত্তর এবং পশ্চিম দিকে অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

তাছাড়া সম্পূর্ণ বসতি এক জায়গায় নয় এবং পর্বত শ্রেণীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কোন কোন গোত্র নিজেদের জমি এবং বাগানবাগিচার পাশেই বসতি গড়ে তুলেছিল এবং তাতে দুর্গাকারের কিছু কিছু দোতলা দালান-কোঠাও তৈরী করে নিয়েছিল। তারা যে কোন আপদ কালীন সময়ে তাদের শিশু এবং মহিলাদেরকে ঐসব দালানের উপরের তলায় রেখে দিত এবং নিজেরা ঝামেলা মুক্ত হয়ে হামলাকারীদের মুকাবালায় যেত।

ইসলামী বাহিনী

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসরের সময় মদীনা মনুওওরা থেকে বের হন। তিনি তিনটি বর্শা চেয়ে নেন এবং তিনটি পতাকা তৈরী করেন। একটি পতাকা দেন হুবাব বিন মুনযিরকে, একটি উসায়দ বিন হুযারকে এবং তৃতীয়টি আলী বিন আবু তালিব (রা) কে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোড়ায় আরোহণ করেন এবং কাঁধে ধনুক ও হাতে বর্শা তুলে নেন। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তখন এক হাজার। আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের তিন শ লোকও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র বাহিনীতে শুধুমাত্র একশ লোক বর্ম পরিহিত ছিল। সা'দ বিন মু'আয এবং সা'দ বিন 'উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহনের আগে আগে দৌড়াচ্ছিলেন। বাকি মুজাহিদরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ডানে, বাঁয়ে এবং পেছনে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্বদিকের হাররা (কালো পাথরের উচ্চভূমি) অর্থাৎ হাররা-ই- ওয়াকিমের পার্শ্ববর্তী সেই রাস্তা ধরে চলতে পাকেন, যেদিকে বনী আবদিল আশহালের বসতি ছিল। যখন তিনি 'শাওত'[৪] নামক স্থানে পৌছেন তখন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই তার তিন শ লোক নিয়ে মুসলিম বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে চলে যায়। যাবার সময় সে এই মর্মে অভিযোগ পেশ করে যে, আমার রায় অনুযায়ী মদীনার অভ্যন্তরে থেকে শত্রুর মুকাবালা করা হয়নি।[৫] যাহোক এবার ইসলামী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সাত শ'য় গিয়ে দাঁড়ালো। সাথে ছিল মাত্র দু'টি ঘোড়া।

তাবাকাতে ইবনে সা'দ এ আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শেখাইন নামক স্থানে রাত্রি যাপন করেন।[৬] তিনি মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে পঞ্চাশজন লোকসহ পাহারায় নিযুক্ত করেন। তারা সারারাত মুসলিম বাহিনীর আশে পাশে টহল দিতে থাকেন। রাতের শেষভাগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবু খায়ছামা হারিছীকে পথপ্রদর্শক নিয়োগ করেন এবং উহুদ অভিমুখে রওয়ানা হন। আল কানতারায় পৌছার পর ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলাল (রা) কে আযান দিতে বলেন এবং সেখানেই ফজরের সালাত আদায় করেন। এরপর উহুদ পাহাড়ের সেই জায়গায় গিয়ে পৌছেন যেখানে মুসলিম বাহিনী অবস্থান নেবে বলে পূর্ব থেকেই স্থির করে রেখেছিলেন।

উহুদ পাহাড়

উহুদ পাহাড় মদীনার আনুমানিক তিন মাইল উত্তরে পূর্ব পশ্চিমে সোজা বিস্তৃত। এর দক্ষিণ প্রান্তের মাঝামাঝি স্থানে পাদুকা আকৃতির একটি বেশ প্রশস্ত ভূমি রয়েছে,। যেখান থেকে পাহাড় পিছনের দিকে চলে গেছে। এরই উল্লেখ করতে গিয়ে 'ইবনে হিশাম'-এ বলা হয়েছে,

ونزل ص الشعب من احد فى عدوة الوادى الى جبل .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-একটি উপত্যকায় অবতরণ করেন। সে জায়গাটি কানাত উপত্যকা থেকে পাহাড়ের দিকে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত।

যেখান থেকে ঢালু ভূমির সূচনা হয়েছে সেখান থেকে উহুদ পাহাড়ের সাথে সাথে কানাত উপত্যকাও প্রলম্বিত হয়েছে। কানাত উপত্যকায় বৃষ্টি হলে পানির স্রোত প্রবাহিত হয়, আর বৃষ্টি না হলে সাধারণতঃ তা শুষ্ক থাকে।

কানাত পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে উঁচু। এর একেবারে সাথেই উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে একটি ছোট টিলা আছে, যাকে 'জাবালে আইনাইন' (দু ঝরণা বিশিষ্ট পাহাড়) বলা হয়। কেননা, এখান থেকে দুটি ঝরণা বহির্গত হয়েছে। উহুদ যুদ্ধের পর এটাকে 'জবালুর রামাত' বলা হতে থাকে। কেননা, ঐ পাহাড়ের উপর মুসলিম তীরন্দাযদের মোর্চা ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদের ঐ ত্রিকোণ ভূমিকেই যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচন করেন। পেছনে তো পাহাড়ই রয়েছে। সামনের জাবালে আইনাইনের উপর পঞ্চাশজন তীরন্দাযকে মোতায়েন করা হয়। তাঁদের অধিনায়ক ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়র (রা)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)- তীরন্দাযদের কড়া নির্দেশ দেন, "আমরা জয়ী হই অথবা পরাজিত, তোমরা কোন অবস্থায়ই তোমাদের অবস্থান পরিত্যাগ করবে না, টিলার উপর অবিচল থাকবে এবং নিজেদের মোর্চা থেকে কখনো এদিক সেদিক হবে না।"

তীরন্দাযদের অবস্থানের গুরুত্ব

কুরায়শ বাহিনীর পশ্চিম দিক থেকে সারিবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসার সম্ভাবনা ছিল। কেননা, তাদের অবস্থান ছিল পশ্চিম দিকেই। অতএব শত্রুদের মুকাবালার জন্য ঐ পাদুকা সদৃশ মাঠে পশ্চিমমুখী হয়ে সারিবদ্ধ হওয়া মুলমানদের জন্য অপরিহার্য ছিল। শুধুমাত্র আশংকা ছিল এই যে, যখন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হবে তখন হয় কোন সৈন্য বাহিনী পেছন দিক থেকে মুসলমানাদের উপর হামলা করে বসবে। ফলে তাঁরা শত্রুদের দ্বারা দুদিক থেকে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বেন। এ কারণেই জাবালে 'আইনাইন'- এর তীরন্দাযদের উপর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, তাঁরা পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণকারী প্রত্যেকটি শত্রুকে প্রতিহত করবে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ করা হলে মূল মুসলিম বাহিনী শত্রু বাহিনীকে যতদূর সম্ভব পশ্চিম দিকে ঠেলে নিয়ে যেত। আর পূর্বদিকের কোন চিন্তা তাদেরকে করতে হত না। খোদা না করুন, কুরায়শ বাহিনী যদি তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মুসলমানদেরকে পিছন দিকে ঠেলে নিয়ে আসত তাহলে সে অবস্থায় জাবালে আইনাইন-এর তীরন্দাযরা তাদের সুবিধাজনক অবস্থান থেকে তীর নিক্ষেপ করে কুরায়শ বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারত। ফলে তাদের বাহিনীর উপর থেকে শত্রুদের চাপ অনায়াসে হ্রাস পেত।

মোটকথা, তীরন্দাযদের দু'টি দায়িত্ব ছিল এবং ঐ যুদ্ধে তাঁদের উভয় দায়িত্বই ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্ব দু'টি হলো ঃ

১। মুসলিম বাহিনীকে পশ্চাৎ দিকের যাবতীয় হামলা থেকে রক্ষা করা।

২। কুরায়শ বাহিনীর চাপ বৃদ্ধি পেলে তাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে সাহায্য করা।

আর দুটি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা তাদের পক্ষে তখনই সম্ভব ছিল, যখন তারা নিজেদের অবস্থানে অটল ও সুদৃঢ় থাকত। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধের পরিণাম যাই হোক না কেন, তোমরা কোন অবস্থায়ই তোমাদের অবস্থান পরিত্যাগ করবে না। 'তাবাকাত'-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল, "যদি তোমরা দেখ যে, মালে গনীমত আমাদের হস্তগত হচ্ছে তবু তোমরা আমাদের সাথে শরীক হবে না। এমনকি যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শত্রুদের দ্বারা অনবরত: নিহত হচ্ছি তবু তোমরা নিজেদের অবস্থান ছেড়ে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না।'[৭]

মোদ্দা কথা এই যে, তোমরা তোমাদের মোর্চায় অবিচল থেকে যা করতে পার করবে। কিন্তু কোন অবস্থায়ই মোর্চা ছেড়ে সাধারণ সৈন্যদের সাথে মিলিত হবে না।

কুরায়শরা যেভাবে সারিবদ্ধ হয়েছিল

কুরায়শদের সারিবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়াতে যে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, তার সার সংক্ষেপ হলো,তাদের অশ্বারোহী বাহিনীতে ছিল দু'শটি ঘোড়া। একশ ছিল মায়মানায় (ডান পার্শ্বের বাহিনীতে) এবং একশ

"হে বনূ আবদিদ্ দার! তোমরা আমাদের এই মর্মে আশ্বস্ত কর যে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, পতাকা ঊর্ধ্বে ধরে রাখবে। আর যদি তা না কর তাহলে বল, আমরা নিজেরাই এই দায়িত্ব পালন করবো।" বনূ আবদিদ্ দার পতাকা সংরক্ষণের ব্যাপারে আবু সুফ্য়ানকে পুরাপুরি আশ্বস্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাদের গোত্রের অনেক লোককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়।

বনূ আবদিদ্ দারের ধ্বংস প্রাপ্তি

মুসলান তীরন্দাযরা যখন হাওয়াযিন গোত্রের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করল তখন তালহা বিন আবী তালহা (কুরায়শের পতাকাবাহী) উচ্ছ্বাসভরে হাঁক ছাড়ল, এমন কেউ আছে কি, যে আমার সাথে মুকাবালা করবে? আলী বিন আবী তালিব (রা) এগিয়ে যান এবং তরবারি দ্বারা তার দেহে এমন প্রচন্ড আঘাত হানেন যে, তাতে তার (তালহার) মাথার খুলি বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সংগে সংগে বনি আবদিদ্ দার গোত্রের অপর ব্যক্তি এগিয়ে এসে পতাকা তুলে ধরে। এভাবে পতাকা রক্ষা করতে গিয়ে একের পর এক আবদিদ্ দারের অনেক লোক প্রাণ বিসর্জন দেয়। তালহার ভাই উছমান বিন আবী তালহাকে হযরত হামযা (রা) এবং আবু সায়ীদ বিন আবী তালহাকে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) হত্যা করেন। তালহার তিন পুত্র মুসাফিক, কিলাব এবং জুলাস একের পর এক নিহত হয়। এরপর আবদিদ্ দার গোত্রের আরত্বাব বিন আবদে শুরায়হ এবং তার এক দাস সাওয়াব প্রাণ হারায়। এক কথায় বলতে গেলে, পতাকা রক্ষা করতে গিয়ে এই গোত্রের নয়টি লোক পালাক্রমে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কুরায়শ বাহিনী শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। মুসলমানগণ সংগে সংগে তাদের পাশ্চাদ্ধাবন করে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাদের তাড়িয়ে দেয়, তারপর মালে গনীমত সংগ্রহ করতে থাকে। ঠিক ঐ মুহূর্তে 'জাবালে আইনাইন'-এর তীরন্দাযগণ তাঁদের অবস্থান ছেড়ে আসেন।

তীরন্দাযদের ভ্রান্তি

তীরন্দাযদের অধিনায়ক আবদুল্লাহ্ বিন জুবায়র তাঁর সঙ্গীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ অমান্য করবো না। তাঁর এ কথার প্রতি অন্যান্যদেরও সমর্থন ছিল। কিন্তু তাঁরা বলছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশের অর্থ এই নয় যে, শত্রুরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়ার পরও তোমরা তোমাদের অবস্থানে অবিচল থাক। যাহোক, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে চল্লিশজন তীরন্দায 'জাবালে আইনাইন' থেকে অবতরণ করে মালে গনীমত সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন এবং শুধুমাত্র দশজন তাঁদের অধিনায়কদের সাথে নিজ নিজ অবস্থানে অবিচল থাকেন। তীরন্দাযদের এই ভ্রান্তির কারণে শত্রুরা এমন একটি সূক্ষ্ম চাল চালতে সক্ষম হয়, যার ফলে মুসলমানদের একটি পরিষ্কার বিজয়, তাঁদের চরম বিপর্যয়ে রূপান্তরিত হয়।

খালিদ বিন ওলীদের হামলা

খালিদ বিন ওলীদ ছিলেন জন্মগতভাবে অসাধারণ রণনৈপুণ্যের অধিকারী। উহুদে পরাজিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন, এই পরাজয়ের ক্ষতি পূরণের পদ্ধতি এই মুহূর্তে কি শ্রেষ্ঠতম হতে পারে। অতএব তিনি সংগে সংগে আপন অশ্বারোহী বাহিনীসহ উত্তর দিক থেকে পূর্বদিকে চলে আসেন এবং জাবালে আইনাইন এবং উহুদের মধ্যবর্তী স্থান থেকে ঐ সব মুসলমানদের উপর হামলা পরিচালনা করেন, যারা পলায়নপর কুরায়শ বাহিনীকে ধাওয়া করে পশ্চিম দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সেই সাথে মালে গনীমতও সংগ্রহ করছিলেন। ইকরামা বিন আবূ জাহলও খালিদের সাথে যোগ দেয়।

এ জাতীয় হামলা রোধ করার জন্যই জাবালে আইনাইনে তীরন্দাযদের মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ঐ কড়া নির্দেশের ব্যাখ্যা এমনভাবে করলেন, যার কারণে তাঁদের নিয়্যতের উপর আঘাত করা যায় না বটে, কিন্তু সেই ক্ষতির পরিমাণ কে নির্ধারণ করতে পারবে, যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ইসলামী বাহিনী, মিল্লাতে ইসলামিয়া ও তাবলীগে ইসলামকে এবং তা হয়েছিল শুধুমাত্র তাঁদের ঐ ব্যাখ্যার কারণে। তাঁদের ঐ

ছিল মায়সারায় (বাম পার্শ্বের বাহিনীতে)। খালিদ বিন অলীদ, যিনি তখন পর্যন্ত মুসলামন হননি, মায়মানার অধিনায়কত্বে ছিলেন। আর বাম পার্শ্বের বাহিনীর অধিনায়কত্বে ছিলেন ইকরামা বিন আবু জাহল্। একশ তীরন্দাযের নেতৃত্ব প্রদান করা হয় আবদুল্লাহ্ বিন বারীআ'কে। মধ্যবর্তী বাহিনী যখন সম্মুখে অগ্রসর হল তখন তার পিছনে মহিলারা তবলা বাজাতে বাজাতে এবং গান গাইতে গাইতে যোদ্ধাদেরকে অনুপ্রাণিত করছিলো। শব্দের বিভিন্নতার সাথে তাদের গানের কলিগুলো প্রত্যেকটি ইতিহাস গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে। যেমন–

نحن بنات طارق

نمشى على النمارق

ان تقبلوا نعانق

ان تدبروا نفارق

فراق غير وامق

আমরা হচ্ছি আকাশ-তারার কন্যা,
আমরা গালিচার উপর চলাফেরা করি,
যদি তোমরা আগে বেড়ে শত্রুর মুকাবেলা কর
তাহলে আমরা তোমাদের সাথে গলাগালি করবো,
আর যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর
তাহলে আমরা তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবো।
আর আমাদের এই বিরহ হবে সেই বিরহ,
যা শুধুমাত্র একজন ঘৃণাকারিণীর হয়ে থাকে॥

কুরায়শরা তাদের পতাকা আবদুদ্ দার গোত্রের তালহা বিন আবি তালহার হাতে তুলে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-যখন তা জানতে পারেন তখন তিনি ঐ আবদুদ দার গোত্রেরই মুস'আব বিন উমায়র (রা)এর হাতে ইসলামী পতাকা তুলে দেন।

যুদ্ধের সূচনা

আবু আমির 'ফাসিক' (সত্যত্যাগী)-ই যুদ্ধের সূচনা করে। সে ছিল আওস গোত্রের লোক। আল্লাহই জানেন, কি করে তার অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে সেখানে দেখার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ ত্যাগ করে চলে যাবে। তার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ের এক দল লোকও ছিল। আনসারগণ তাকে দেখেই চীৎকার দিয়ে উঠলেন, 'হে ফাসিক, আল্লাহ্ তোকে দর্শন শক্তি থেকে বঞ্চিত করুন।'সে এবং তার সঙ্গীরা সর্বপ্রথম মুসলিম বাহিনীর উপর পাথর নিক্ষেপ করে। এরপর এই বলে ফিরে যায়, 'আমি দূরে চলে আসায় আমার সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা বিগড়ে গেছে।'

আবু সুফ্য়ান, তালহা বিন আবি তালহাকে বললো, বদর যুদ্ধেও আমাদের পতাকা আবদুদ্ দারের কাছেই ছিল। ওখানে আমাদের উপর যে অঘটন ঘটেছে তা তো বলাই বাহুল্য। মানুষ পতাকা দেখেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচল থাকে। পতাকা তার জায়গা থেকে হটে গেলে সকলেরই পদস্খলন ঘটে।

ব্যাখ্যার কারণেই তো মক্কার কুরায়শদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ শেষ হতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। আর এটা আরবদের জন্য ইসলাম গ্রহণের পথে ছিল একটি বিরাট প্রতিবন্ধক।

খালিদের হামলা এত আকস্মিক ছিল যে, তা নিমিষের মধ্যে মুসলমানদের যাবতীয় সামরিক ব্যবস্থাপনা ও কলাকৌশলকে যেন একবারে তছনছ করে দেয়। যে চল্লিশজন তীরন্দায তাঁদের অবস্থান ছেড়ে এসে ভুল করেছিল তাঁদের পরিণাম কি হয়েছিল তা বলা যাচ্ছে না, কিন্তু যে দশজন পুণ্যবান ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ বিন জুবায়র (রা) এর নেতৃত্বে নিজ নিজ অবস্থানে অবিচল ছিলেন তাঁদের সকলেই শাহাদত বরণ করেন।[৮]

বিপদ নেমে এল

যতক্ষণ পর্যন্ত জাবালে আইনাইনে তীরন্দাযগণ অবিচল ছিলেন ততক্ষণ মূল বাহিনীর মুসলমানগণ যে দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন সেদিকেই কাফিরদের মৃত্যু ঘন্টা বাজছিলো। কিন্তু খালিদের হামলা সমস্ত পরিস্থিতিকে একদম বদলে দেয়।

হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব (রা), আরত্বাত বিন আবদে শুরাহবিলকে হত্যা করে দ্রুত সাবা' বিন আবদুল উয্যার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে, হামযা (রা) এর কিছুটা অসতর্ক অবস্থায় ওয়াহ্শী জাবালে আইনাইন-এর নিকট থেকে তার দিকে বর্শা ছুঁড়ে মারে, যা তাঁর নাভির উপরে পেটের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দুই পায়ের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিনি তখন টলটলায়মান অবস্থায় মাটিতে শুয়ে পড়েন এবং সত্যের জন্যে শাহাদতের পেয়ালা পান করেন।

মুস'আব বিন 'উমায়র (রা) ইসলামী বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন। তাঁর ডান হাত কেটে গেলে তিনি বামহাতে পতাকাটি তুলে ধরেন। যখন বামহাতও কাটা পড়ল তখন পতাকাটি বুকে চেপে ধরেন। এই অবস্থায়ই আমর বিন কুমাইয়া তাঁকে শহীদ করে ফেলে। মুস'আবের আকার-আকৃতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মতই ছিল। আর এ কারণে ইবনে কুমাইয়া উচ্চস্বরে দাবী করছিলো যে, সে মুহাম্মদ (সা)কে হত্যা করে এসেছে।

আবূ আমির ফাসিক, কুফ্র ও শির্কের মধ্যবর্তী এক দু'টানা অবস্থায় ছিল। কিন্তু তার ভাগ্যবান পুত্র হানযালা (রা) প্রাণ হাতে নিয়ে সত্যের পথে যুদ্ধরত ছিলেন। হঠাৎ হানযালা (রা) আবূ সুফ্য়ানের মুখোমুখী হয়ে যান। তখন মুশরিক বাহিনীর শাদ্দাদ বিন আসওয়াদ আকস্মিকভাবে হামলা চালিয়ে হানযালা (রা)কে শহীদ না করলে ঐ দিন হানযালা (রা) এর হাতেই আবূ সুফ্য়ানকে প্রাণ দিতে হত। (সংকলক)

টীকা ঃ

(১) ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পৃষ্ঠা-৬০।
তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৩৬।

(২) ওয়াহ্শীর উপাধি।

(৩) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৩৪।

(৪) উহুদ এবং মদীনার মধ্যবর্তী দূরত্ব খুব বেশী হলে তিন মাইল হবে। তাতে ছোটবড় অনেক বসতি বা মহল্লা ছিল। তার মধ্যে একটি জায়গার নাম ছিল শওত, যা মদীনার উত্তর পূর্ব প্রান্তে 'শেখাইন' এর নিকটে অবস্থিত। ডান দিকের হায়ারার উপর বনূ আবদিল আশহালের মহল্লা, এরপর বনী হারিছার বসতি।

(৫) তাবকাতে ইবনে সা'দ-এ আছে, আবদুল্লাহ্ বিন উবাই শুক্রবার নয়, বরং শনিবার দিন সেই স্থান থেকে তার লোকদের নিয়ে চলে যায়, যে স্থানটি 'আল্ কানতাবাহ' নামে বিখ্যাত। (দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৩৯)।

(৬) তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড। এখানে পূর্বে দুর্গাকৃতির দু'টি দালান ছিল। এখন গম্বুজ বিশিষ্ট দু'টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

(৭) তাবাকাত দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৪০।

(৮) ডঃ হামীদুল্লাহ্ লিখেছেন, উহুদের পূর্বপ্রান্ত ও জাবালে আইনাইন-এর মধ্যে এখন যে দূরত্ব পরিলক্ষিত হয় তা এত বেশী যে, সেদিক দিয়ে কোন বাহিনী আক্রমণ করলে পঞ্চাশজন তীরন্দাযের পক্ষে তাদের প্রতিরোধ করা সম্ভব হত না। অতএব আমার ধারণা এই যে, খুব সম্ভবতঃ ঐ পূর্ব প্রান্তের সাথে পাহাড়ের আর একটি অংশ যুক্ত ছিল, যা গত চৌদ্দ শ বছরে ক্রমশঃ মাটির সাথে বিলীন হয়ে এখন খেজুর বাগানে পরিণত হয়েছে।

উহুদ যুদ্ধ–২

মুসলমানদের তিনটি দল

খালিদের হামলার কারণে মুসলমানদের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাতে তাঁরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের একটি ক্ষুদ্র দল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। এদের কেউ কেউ সোজা মদীনা গিয়ে পৌঁছেন, আবার কেউ কেউ যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যায়। বিভিন্ন রিওয়ায়াতে দু'টি জায়গার উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি মান্‌কা এবং অপরটি জালআ'ব। এ দু'টি জায়গা আ'ওয়াসের সন্নিকটে। আর আ'ওয়াস, মদীনা মুনাওওরা থেকে বেশ কয়েক মাইল পূর্বে অবস্থিত। দ্বিতীয় দল যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন নি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর শাহাদাতের সংবাদ তাঁদের উপর বজ্রের ন্যায় পতিত হয় এবং তাঁরা অনেকটা কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। হঠাৎ কি ঘটে গেল এবং এই মুহূর্তে কি করতে হবে তা তাঁরা ঠাহর করতে পারছিলেন না। আর তৃতীয় দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চতুর্দিকে শক্ত বেষ্টনীর সৃষ্টি করে তাঁকে শত্রুর হামলা থেকে নিরাপদ রাখার জন্য শত্রুদের উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো, যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে পতঙ্গ পাল আগুনের মধ্যে। এই দলে ছিলেন হযরত আবূ বকর, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) এবং মুহাজির ও আনসারের আরো কিছু লোক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দেহেও আঘাত লেগেছিল

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র দেহও আঘাত থেকে রক্ষা পায় নি। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের ভাই উতবা বিন আবী ওয়াক্কাস (যে তখনো ইসলাম গ্রহণ করে নি) হুযূর (সা)-এর নীচের পাটির দাঁত শহীদ করে ফেলে। তার ঐ আঘাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র মুখও যখমী হয়। আবদুল্লাহ্ বিন শিহাবের একটি আঘাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র ললাট আহত হয়। আমির বিন কুমাইয়া এত জোরে একটি পাথর নিক্ষেপ করে যে, তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র গণ্ডদেশে তাঁর শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়ি ঢুকে পড়ে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র মুখ দিয়ে যে কথাটি উচ্চারিত হয় তা হলো, "এই জাতি কি কখানো পরিত্রাণ পেতে পারে, যারা নিজেদের নবীর চেহারা রক্ত রঞ্জিত করে?" এরপর তাঁর দয়া ও করুণার সমুদ্র যেন উথলে উঠে। তিনি বলেন, "হে আল্লাহ্, আমার জাতিকে সত্যপথ প্রদর্শন কর, তারা জানে না তারা কি করছে, অথবা তাদেরকে মাফ করে দাও।"

আবূ আমির ফাসিক যে সব চোরা গুহা খুঁড়িয়ে ছিল এবং যেগুলোর কথা মুসলমানগণ ঘুণাক্ষরেও জানতেন না, তার একটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও পড়ে যান। 'আলী বিন আবী তালিব (রা) তাঁর হাত টেনে ধরেন এবং তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা) তাঁকে তুলে দাঁড় করান। আবূ উবায়দা বিন জাররাহ (রা) আপন দাঁত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর গণ্ডদেশ থেকে শিরস্ত্রানের দু'টি কড়ি একের পর এক টেনে বের করেন এবং এটা করতে গিয়ে তাঁর সম্মুখের দু'টি দাঁত ভেঙগে পড়ে। আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) এর পিতা মালিক বিন সিনান (রা) রাসূলুল্লাহ্-এর চেহারা থেকে রক্ত চুষে বের করে ফেলেন।

মানবীয় উৎসর্গের অবিস্মরণীয় ঘটনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে সামান্য কয়েকজন সাহাবী ছিলেন। খালিদের হামলার কারণে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে কুরায়শ বাহিনী পুনরায় তাদের উপর হামলা চালানোর প্রস্তুতি নেয়। তখন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এমন কে আছে, যে তার প্রাণ আল্লাহ্র রাহে উৎসর্গ করবে ? যিয়াদ বিন আস সুকুন (অপর বর্ণনা মতে, আম্মারা বিন যিয়াদ বিন আস সুকুন) নামীয় জনৈক আনসারী পাঁচ কিংবা সাতজন আনসারী সহ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এই আহ্বানে সাড়া দেন এবং যুদ্ধ করতে করতে একে একে তাঁদের সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। সবশেষে যিয়াদ বিন আস সুকুন শত্রুর আঘাতের পর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে নিয়ে আসা হলে মৃত প্রায় এই পবিত্রচেতা মুজাহিদ আপন গণ্ডদ্বয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র পদযুগলের উপর রাখেন এবং ঐ অবস্থায়ই আপন প্রভুর দরবারে গিয়ে হাযির হন। মাওলানা শিবলী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ নির্দেশ দেন, ওর লাশ আমার কাছে নিয়ে এসো।' লোকেরা তা-ই করল। তাঁর দেহে তখনো প্রাণ ছিল। তিনি তাঁর মুখ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র পদযুগলের উপর রাখেন এবং ঐ অবস্থায়ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উম্মে উমারাও [নুসায়বা বিনতে কা'ব আল মাযনিয়া (রা)] অত্যন্ত বীরত্বের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হিফাযতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তরবারি দ্বারা আমর বিন কুরাইযার দেহে বেশ কয়েকটি আঘাত করেন। কিন্তু সে দু'টি বর্ম পরিধান করেছিল বিধায় ঐ সব আঘাত থেকে রক্ষা পায় এবং প্রত্যুত্তরে উম্মে উমারার কাঁধে একটি মারাত্মক আঘাত হানে। ঐ আঘাতের চিহ্ন উম্মে উমারার দেহে আজীবন বিদ্যমান ছিল। ইনি হচ্ছেন সেই উম্মে উমারা , যার পুত্র হাবীব বিন যায়দ বিন আসিম (রা) মুসায়লামা কায্যাবকে হত্যা করেছিলেন।[১]

আবূ দুজানা (রা) তাঁর দেহকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জন্য ঢাল বানিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর দেহে একের পর এক তীর বিঁধতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা চালনীর আকার ধারণ করে। এতদ্সত্ত্বেও তিনি সামান্যমাত্র এদিক সেদিক হন নি, যাতে করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দেহে কোন আঘাত না লাগে। তালহা (রা)ও অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অনুরূপ দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (স) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) এর হাতে তীর তুলে দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন–

ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي .

"আমার মা-বাবা তোমার জন্য কুরবান হোক, তীর নিক্ষেপ করতে থাকো।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই মমতাভরা নির্দেশকে হযরত সা'দ (রা) আজীবন তাঁর গর্বের একটি কারণ বলে মনে করতেন। ইবনে কুরাইযা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর উপর একটি শক্ত আঘাত হানে। তালহা (রা) খালি হাতে ঐ আঘাত-টি প্রতিহত করেন। ফলে তাঁর হাত কেটে যায় বটে, তবে তাতে ইবনে কুরাইযার আঘাতের জোর কমে যায়। বস্তুত: রাসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ম পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। ফলে আল্লাহ্র ফযলে তিনি আঘাত থেকে রক্ষা পান।

আনাস ও ইবনে আওফ (রা)

আনাস বিন মালিক (রা) এর চাচা আনাস বিন নাযর (রা) কয়েকজন সাহাবীর কাছে গিয়ে পৌঁছেন, যারা নিরাশ হয়ে হাতের উপর হাত রেখে বসে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উমর এবং তালহা বিন উবায়দাহ্ (রা)ও ছিলেন। আনাস (রা) ওদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা এভাবে বসে আছেন কেন ? তাঁরা উত্তর দেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শহীদ হয়ে গেছেন। আনাস (রা) তখন বলেন, এরপর আপনাদের বেঁচে আর কি লাভ ? উঠুন এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে প্রাণ বিসর্জন দিন, যে জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) শাহদত বরণ করেছেন। এ কথা বলেই আনাস (রা) কাফিরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শাহাদত বরণ না করা পর্যন্ত অনবরত: যুদ্ধ করে যান। বর্ণিত আছে যে, তাঁর দেহের মধ্যে কমবেশী সত্তরটি যখম ছিল, যে কারণে তাঁর লাশ চেনা যাচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত আনাস (রা) এর সহোদর, শুধুমাত্র আংগুলের মাধ্যমে তাঁর লাশ সনাক্ত করেন।

আবদুর রহমান বিন আওফের মুখের উপর একটি পাথর এসে লাগে, যে কারণে তাঁর সামনের দাঁত ভেঙগে যায় এবং সমগ্র দেহে বিশ কিংবা তার চাইতে বেশী ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তাঁর পায়ের উপর এমন কিছু ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, যার কারণে তিনি চিরদিনের জন্য খোঁড়া হয়ে যান।

মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ

সর্ব প্রথম যে সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চিনতে পারেন, তিনি হচ্ছেন কা'ব বিন মালিক (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখামাত্র তিনি চীৎকার দিয়ে বলে উঠেন, 'মুসলমানগণ, সুসংবাদ গ্রহণ করো, এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)।' যে সব সাহাবী নিরাশ ও ভগ্ন হৃদয় হয়ে বসে ছিলেন, এই সুসংবাদ শুনার সাথে সাথে তাদের দেহের মধ্যে যেন নতুনভাবে প্রাণের সঞ্চার হয়। তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে দৌড়ে যান। এবার আবূ বকর, উমর, আলী, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, যুবায়র বিন 'আওয়াম, হারিছ বিন সাম্মাহ (রা) এবং আরো কয়েকজন সাহাবী তাঁর সংগে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি উচ্চ শিলাখণ্ডের উপর আরোহণ করেন। কুরায়শের একটি দল পাহাড়ের উপর আরোহণ করেছিল। উমর বিন খাত্তাব (রা) এবং আরো কয়েকজন সাহাবী জোর হামলা চালিয়ে তাদেরকে পাহাড় থেকে নেমে যেতে বাধ্য করেন। আলী বিন আবী তালিব (রা) তাঁর ঢালে করে উহুদের জলাশয় থেকে (জলাশয়টির নাম ছিল মেহরাস) কিছু পানি তুলে এনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেন। ঐ পানি থেকে দুর্গন্ধ আসছিল বিধায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা পান করেন নি। তবে তা দ্বারা আপন পবিত্র চেহারা থেকে রক্ত ধুয়ে নেন।

হুসায়ল ও ছাবিত (রা)

ছাবিত বিন ওয়াকশ্ এবং হুযায়ফার পিতা হুসায়ল বিন জাবির (আল ইয়ামান) ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ। তাই তাঁদেরকে মহিলা ও শিশুদের সাথে একটি দুর্গ সদৃশ ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। তাঁরা পরষ্পর আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেন, 'আমাদের আয়ু তো শেষ। এমতাবস্থায় তরবারি নিয়ে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হচ্ছি না কেন ? এতে করে হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন।

শেষ পর্যন্ত ঐ দুই প্রবীণ ব্যক্তি তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ছাবিত বিন ওয়াকশ্ তো মুশরিকদের হাতে শাহাদত বরণ করেন। কিন্তু হুসায়ল বিন জাবিরকে মুসলমানরাই ভুলবশতঃ শহীদ করে ফেলেন। কেননা তিনিও যে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পড়বেন তা তাঁরা ধারনাই করতে পারছিলেন না। অতএব তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, ইনি মক্কার কুরায়শদেরই কেউ হবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর রক্তমূল্য পরিশোধ করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু হুযায়ফা তা গ্রহণ না করে মুসলমানদেরকে মাফ করে দেন।

উসায়রাম (রা)

বনী আবদে আশহালের আমর বিন ছাবিত বিন ওয়াক্শ্, 'ইসায়রাম' নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি প্রথম প্রথম ইসলাম গ্রহণে রাজী ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন যুদ্ধের জন্য বের হন তখন উসায়রাম নিজে থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে লড়াই করতে করতে একবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আবদুল আশহালের লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের নিহতদের খুঁজতে গিয়ে সেখানে উসায়রামকে ভীষণ আহত অবস্থায় দেখতে পান। তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি এই যুদ্ধক্ষেত্রে কেন ? উসায়রাম উত্তর দেন, আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর ঈমান আনি। এরপর তলোয়ার হাতে লড়তে থাকি। এখন আমার যে অবস্থা তা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। একথা বলেই উসায়রাম শাহাদত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁর অবস্থার কথা জানতে পারেন তখন বলেন, انه من اهل الجنة -'সে জান্নাতবাসীদের একজন।'

আমর বিন জুমূহ (রা)

আমর বিন জুমূহ খোঁড়া ছিলেন। তাঁর চার বীর পুত্র উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের পিতাকে যুদ্ধে যেতে বারণ করেন। কিন্তু তিনি হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল,

আমাকে আমার ছেলেরা বাধা দিচ্ছে। কিন্তু আমার আন্তরিক কামনা এই যে, এই খোঁড়া অবস্থায়ই আমি যেন জান্নাত প্রান্তরে বিচরণ করতে থাকি।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা 'মাযূর' (অসমর্থ) করে দিয়েছেন। অতএব তোমার উপর জিহাদ ফরয নয়। এরপর তিনি (সা) আমরের পুত্রদের বলেন, তোমরা তোমাদের পিতাকে বাধা দিও না। শেষ পর্যন্ত আমর বিন জুমূহ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং শহীদ হন। তাঁর সাথে তাঁর এক পুত্র খাল্লাদ, দুই দাস–সালীম ও আবূ আয়মন এবং শ্যালক আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম (রা)ও শাহাদত বরণ করেন। আমরের স্ত্রী হিন্দ বিনতে আমর বিন হারাম, আপন স্বামী, পুত্র ও ভাইয়ের লাশ উটের পিঠে করে উহুদ থেকে মদীনায় নিয়ে আসছিলেন। কিন্তু পথে উটটি হঠাৎ বসে পড়ে এবং চেষ্টা করেও তাকে মদীনা অভিমুখে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। তাই সবগুলো লাশই পুনরায় উহুদ প্রান্তরে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে আমর বিন জুমূহ এবং আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম (রা) এর লাশ একই কবরে দাফন করা হয়।

সা'দ বিন রাবী' (রা)

সা'দ বিন রাবী' (রা) ছিলেন মদীনার সর্দারদের অন্যতম। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকালে তিনি আবদুর রহমান বিন আউফকে আপন ভাই হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ বিন রাবী'-এর খোঁজ নিতে বললে জনৈক আনসারী যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তাঁর নাম ধরে চতুর্দিকে আওয়াজ দিতে থাকেন, কিন্তু কোন সাড়া পান নি। এরপর তিনি মনস্থ করেন, এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নাম নিয়েই তাকে আওয়াজ দেওয়া যাক। যদি সা'দ এই আওয়াজ শুনতে পান তাহলে নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন। অতএব তিনি উচ্চস্বরে আওয়াজ দেন, 'সা'দ বিন রাবী কোথায় ? আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর খোঁজে পাঠিয়েছেন।' এই আওয়াজ শুনার সাথে সাথে সা'দের অর্ধমৃত দেহে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যায়। তিনি অত্যন্ত নিম্নস্বরে উত্তর দেন, 'আমি এখানে।'

আনসারী ঐ আওয়াজ অনুসরণ করে এগিয়ে যান। সা'দের তখন একেবারে অন্তিম অবস্থা। ইতিমধ্যে শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছে। আনসারী তাঁর একেবারে কাছে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনার অবস্থা জানতে চেয়েছেন। সা'দ (রা) উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে আমার সালাম নিবেদন করবে এবং বলবে, আল্লাহ্র রাসূলগণ তাঁদের অনুসারীদের আত্মত্যাগ ও বিশুদ্ধচিত্ততার কারণে যে সওয়াবের অধিকারী হন, তিনি যেন সেই সওয়াব সব রাসূলগণের চেয়ে অধিক পরিমাণে লাভ করেন। আর আমার সম্প্রদায়কে বলবে, তোমাদের দেহে প্রাণ থাকতে, আল্লাহ না করুন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর উপর যদি কোন আঘাত আসে তাহলে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে মুখ দেখাবার যোগ্য থাকবে না। কেননা তোমরা কদরের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য প্রাণ বিসর্জন দেবে বলে অঙ্গীকার করেছ। একথা বলার সাথে সাথে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর দেহে শুধু বর্শারই আঘাত ছিল বারোটি।

উবাই বিন খালফ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন প্রস্তর খণ্ডের উপর আরোহণ করেন তখন উবাই বিন খলফ তার সন্ধান পেয়ে সেখানে এসে পৌঁছে এবং উচ্চস্বরে বলতে থাকে 'যদি মুহাম্মদ বেঁচে যায় তাহলে আমি আমার এই প্রাণ রাখব না।' মুসলমানরা চাচ্ছিলেন, যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের কাউকে উবাই-এর সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দেন। কিন্তু হুযূর বলেন, ওকে আসতে দাও। সে নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার ঘাড় লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করেন। ফলে সে ঘোড়ার উপর থেকে গড় গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়। বাহ্যত: ঐ আঘাত সাধারণ মনে হলেও উবাই চীৎকার দিয়ে বলতে থাকে, قَتَلَنِيْ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ –'আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মদ আমাকে মেরে ফেলেছে।' সুতরাং মক্কা প্রত্যাবর্তনকালে সে সরফ[২] নামক স্থানে মারা যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর তরবারি

এই যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, আমি আমার তরবারিটি তার হাতেই তুলে দেব, যে এর হক্ আদায় করবে। অন্যান্য সাহাবী ছাড়াও যুবায়র বিন আওয়াম এই তরবারিটি পাওয়ার বিশেষ আকাংখী ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা আবু দুজানার হাতে তুলে দেন।

আবু দুজানার কাছে একটি লাল পট্টি থাকতো। তিনি যখন পট্টিটি মাথায় বেঁধে নিতেন তখন তাঁর মধ্যে এমন এক বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হতো যে, কোন শত্রুই তখন তাঁর সামনে অক্ষত অবস্থায় যেতে পারত না। এবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর তরবারিটি হাতে নিয়ে মাথায় পট্টি বাঁধেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা গীতি গাইতে গাইতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই অবস্থায় তিনি যেদিকেই যেতেন সেদিকেই তুমুল হৈ চৈ পড়ে যেত। আবূ দুজানা (রা) এই তরবারি দ্বারা কি কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আনজাম দেন তা স্বচক্ষে দেখার জন্য যুবায়র (রা) আবু দুজানার প্রতি তখন বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখছিলেন। আবূ দুজানা শত্রুব্যূহ প্রতি তখন বিশেষভাবে ভেদ করে সামনে অগ্রসর হতে থাকলে আবূ সুফ্য়ানের স্ত্রী হিন্দ তাঁর সামনে পড়ে। সে তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কুরায়শবাহিনীর পুরুষদেরকে উত্তেজিত করছিলো। আবূ দুজানা (রা) তরবারি দিয়ে হিন্দকে আঘাত করতে চাইলে সে চীৎকার দিয়ে উঠে এবং তাকে সাহায্য করার জন্য পুরুষদের প্রতি আহ্বান জানায় কেই তার আহ্বানে সাড়া দেয় নি। ঠিক সেই মুহূর্তে আবূ দুজানা (রা) হিন্দের মাথার উপর থেকে তাঁর তরবারিটি নীচে নামিয়ে ফেলেন। পরবর্তী সময়ে যুবায়র (রা) আব্দ দুজানাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি এভাবে তরবারি উঠিয়ে এরপর নামিয়ে ফেলেছিলে কেন? আব্দ দুজানা (রা) উত্তর দেন, আমার অন্তর সায় দেয় নি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর তরবারি চালাব একজন স্ত্রীলোকের উপর, তাও আবার সেই স্ত্রীলোক, যাকে রক্ষা করার মত একজন পুরুষও তার কাছে নেই।

যুবায়র (রা) বলেন, আমি তখন বুঝতে পারলাম, আবূ দুজানা (রা) যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর তরবারির 'হক' আদায় করছেন আমি হয়ত সেভাবে তা পারতাম না।

আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিমান

আবূ সুফ্য়ান এবং তার সঙ্গীরা যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) এর লাশ খুজে ফিরতে থাকে। এরপর আবূ সুফ্য়ান পাহাড়ে আরোহণ করে এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছে, যেখান থেকে মুসলমানগণ তার আওয়াজ শুনতে পাবেন। সে প্রথমে উচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'মুসলমানরা, তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মদ (বেঁচে– আছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, কেউ কোন উত্তর দেবে না। এরপর সে পালাক্রমে আবূ বকর ও উমর (রা) সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কেউ কোন উত্তর দেন নি। তখন আবূ সুফিয়ান বলে, 'তাহলে সবাই মারা পড়েছে। জীবিত থাকলে অবশ্যই জবাব দিত।' উমর (রা) তখন আর চুপ থাকতে পারেন নি। উচ্চ স্বরে বলে উঠেন, 'হে আল্লাহ্র দুশমন, তুই মিথ্যা বলছিস্। আমরা সবাই এখানে আছি। উত্তরে আবূ সুফীয়ান বলে, তাহলে ইবনে কুমাইয়া মিথ্যা বলেছে। কেননা আমি তোমাকে তার চাইতে অধিক সত্যবাদী মনে করি।

এরপর আবূ সুফ্য়ান তাদের বিশেষ দেবতা হাবলের নাম নিয়ে বলে, তোমার জয় হোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানরা শ্লোগান দেয়, اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ –আল্লাহু আ'লা ও আজাল্লু (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান)। আবূ সুফ্য়ান বলে উঠে–

لَنَا عُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ

"আমাদের উয্যা (দেবতা) আছে। তোমাদের তো কোন উয্যা নেই।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেন, তোমরা বলো– اَللّٰهُ مَوْلٰنَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ –আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী (মাওলা), তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

এরপর সে এই বলে সেখান থেকে প্রস্থান করে যে, আগামী বছর এই সময়ে বদর প্রান্তরে তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি রইল।

শহীদদের দাফন কাফন

কার্যত: যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তা সত্বেও মক্কার কুরায়শরা তাদের নির্দয় ও অমানুষিক আচরণ পরিত্যাগ করে নি। বিশেষ করে তারা বিখ্যাত মুসলিম ব্যক্তিদের লাশসমূহের সাথে অত্যন্ত অশিষ্ট আচরণ করে। তারা লাশগুলোকে এমনি ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে যে, সেগুলোকে সনাক্ত করা প্রায় ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে হামযা, আবদুল্লাহ্ বিন জাহশ এবং মুস'আব (রা) এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কাজে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছিল আবূ সুফ্য়ানের স্ত্রী হিন্দ। হাম্‌যা (রা) এর সহোদরা হযরত সুফিয়া (রা) ভাইয়ের শাহাদতের সংবাদ পেয়ে লাশ দেখার জন্য উহুদে আসেন। কিন্তু লাশের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফিয়া (রা) কে তা দেখা থেকে বিরত রাখেন। তখন সাফিয়া (রা) বলেন, 'আমার কাছে সব রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে এটা কোন বড় কুরবানী নয়।' যাহোক তিনি তাঁর ভাইয়ের লাশের টুকরাগুলো দেখে উচ্চারণ করেন,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ("আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী)" এবং ক্ষমার দু'আ পাঠ করে প্রত্যাবর্তন করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ প্রান্তরেই সকল শহীদগণের দাফন কাফনের ব্যবস্থা করেন। কোন কোন কবরে দু' দু'জন শহীদকে সমাহিত করা হয়। তাঁদেরকে গোসল দেওয়া হয় নি। তাঁদের জন্য ঐ সময়ে জানাযায় সালাতও আদায় করা হয়নি। মাওলানা শিবলী বলেন, 'আট বছর পর ... যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং এমন কিছু দরদভরা বাক্য উচ্চারণ করেন, যেন তিনি জীবিত ও মৃতদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন।[৩]

কাফন পরানো কালে মুস'আব বিন উমায়র (রা) এর মাথা যখন ঢাকা হত তখন পা বেরিয়ে যেত। আর যখন পা ঢাকা হত তখন মাথা বেরিয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত 'আয্‌খার' ঘাস দিয়ে তাঁর পদযুগল ঢেকে দেওয়া হয়।

পরবর্তী কালে একদা আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) এর সামনে ইফতারীর জন্য কিছু খাবার পেশ করা হয়। খাবারটি ছিল দামী ও জাঁক জমকপূর্ণ। হযরত আবদুর রহমান (রা) তা দেখার সাথে সাথে উহুদের ঐ সময়ের কথা তাঁর মনে পড়ে যায়,যখন ঘাস কেটে এনে শহীদদের দেহ ঢাকতে ছিলেন। আবদুর রহমান তখন অঝোরে কাঁদতে থাকেন এবং খাবার না খেয়েই উঠে পড়েন।

শহীদদের সংখ্যা

উহুদে শহীদের সংখ্যা সত্তর বলা হয়ে থাকে। 'আশ্ শাহিদ' গ্রন্থে এর যে সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে সংক্ষেপে তা নিম্নরূপঃ

মুহাজির	৫ জন
আনসার (খাযরাজ)	৫৪ "
আনসার (আওস)	৩৬ "
অন্যান্য গোত্রের	১৩ "
	১০৮ "

এতে সংখ্যা দাঁড়ায় সর্বমোট এক শ আট জন।[৪] কিন্তু সর্বসম্মত রায় এই যে, শহীদগণের মোট সংখ্যা চুয়াত্তর। কিন্তু আমি মনে করি, কোন কোন শহীদের নাম এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

যুদ্ধের তারিখ

উহুদ যুদ্ধের তারিখ সম্পর্কেও মতভেদ আছে। 'ইবনে হিশাম, 'জাওয়ামিউস সীরাত' ইত্যাদি গ্রন্থ অনুযায়ী, উহুদযুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫ শাওয়াল, হিঃ ৩ সন (মুতাবিক ৩১ মার্চ, ইং ৬২৫ সন)। সেদিন ছিল শনিবার। কিন্তু তাবাকাতে ইবনে সা'দ অনুযায়ী ৭ শাওয়াল হিঃ ৩ সন (মতাবিক ২৩ মার্চ ইং ৬২৫ সন) এ দিন শনিবারই ছিল।

সাধারণ অবস্থা

উহুদ যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদের জন্য ছিল খুবই দুঃখ জনক। এতে বিশেষ করে আনসারের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি শাহাদত বরণ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তাঁদের অন্তরে যে ভালবাসা ছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। এক আনসারী মহিলার কথা আপনারা একাধিক বার পড়ে থাকবেন। সাহাবা কিরাম যখন উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তখন ঐ মহিলাটি যুদ্ধের অবস্থা জানার জন্য উহুদের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। যখন তাঁকে ক্রমান্বয়ে বলা হল যে, তোমার পিতা, ভাই এবং স্বামী শাহাদত বরণ করেছেন তখন তিনি এইসব কথার কোন উত্তর না দিয়ে অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খবর কি? যখন তাঁকে বলা হলো যে, তিনি (সা) কুশলে আছেন তখন তিনি স্বস্তিভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন- كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ. -"আপনি যখন জীবিত আছেন তখন সব বিপদই নগণ্য।"

আওসের নেতা সা'দ বিন মু'আয (রা)- এর ভাই আমর বিন মু'আয (রা) উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমবেদনা জানানোর জন্য সা'দ ও আমর (রা) এর বর্ষীয়সী মাতার কাছে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সা'দ বিন মু'আয (রা) স্বয়ং তাঁর মাতাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে আসেন, যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর কাছে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ (রা) এর মাতার প্রতি তাঁর ছেলের শাহাদত উপলক্ষে সমবেদনা প্রকাশ করলে তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি যখন কুশলে রয়েছেন তখন আমাদের আর চিন্তা কি?

এরপর উহুদের শহীদগণের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে আর কী বলা যেতে পারে?

সা'দ বিন রাবী' (রা)-এর কন্যা উম্মে সা'দ একদা খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। খলীফা তখন নিজেই একটি কাপড় বিছিয়ে তার উপর উম্মে সা'দ (রা) কে বসান। উমর (রা) তখন সেখানে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, কে এই মহিলা? খলীফা জবাব দেন, ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তির কন্যা, যার মর্যাদা তোমার ও আমার চাইতে অনেক উপরে। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করেন, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খলীফা, এটা কিভাবে? আবূ বকর (রা) উত্তরে বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর যুগেই জান্নাতের পথ ধরেছেন, অথচ আমি-তুমি এখনো দুনিয়ায় রয়ে গেছি।

জয় না পরাজয় ?

অধিকাংশ লোক মনে করেন যে, উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে। আমার মতে এই ধারণা ঠিক নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তীরন্দায বাহিনীর ভুলের কারণে মুসলমানদের প্রাণের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু পরাজয় তো তাকেই বলে, যখন পরাজিতরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। উহুদ যুদ্ধে এরূপ কোন ঘটনা তো ঘটেনি। মক্কায় কুরায়শরা মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত করে সেখান থেকে বিদায় নেয় এবং পরদিন মুসলমানরা

'হামরাউল আসাদ' পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তিন দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। তাই, উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে এমন কথা বলা যায় কী করে? (সংকলক)

টীকা ঃ

(১) মুসায়লামার হত্যাকারী হচ্ছেন দু'ব্যক্তি। তাঁদের একজন ওয়াহ্শী এবং অপরজন হাবীব বিন যায়দ (রা)। খোদ ওয়াহ্শীর ভাষায়, "আমি মুসায়লামাকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলাম। একজন আনসারীও আমার সাথে এগিয়ে গেলেন। আমি মুসায়লামাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করালাম এবং তা তার দেহে বিদ্ধ হলো। ঐ আনসারীও অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেন। একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন আমাদের কার আঘাতে মুসায়লামার মৃত্যু ঘটে।" (ইবনে হিশামঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পৃষ্ঠা –৭২)।

(২) এ স্থানটি মক্কা মুকাররমা থেকে ছয় কিংবা আট মাইল দূরে অবস্থিত।

(৩) সীরাতুন্নবীঃ প্রথম খন্ডঃ পৃষ্ঠা- ৩৫৪।

(৪) আশ শাহীদ ঃ নওল কিশোর মুদ্রিতঃ পৃষ্ঠা-৫৩-৮৫।

উহুদ যুদ্ধ -৩

[মাওলানা আবুল কামাম আযাদ লিখিত]

সবর ও তাকওয়া

বদর ও উহুদ যুদ্ধের ফলাফল এটাই প্রমাণ করে যে, সবর ও তাকওয়া ছাড়া আল্লাহ্র সাহায্য কখনো পাওয়া যায় না এবং সত্যিকার সাফল্যও অর্জিত হয় না।

সবরের লক্ষ্য হচ্ছে সাহস ও দৃঢ়তার সাথে বিপদাপদের মুকাবালা করা। আর তাকওয়ার মূলকথা হচ্ছে সতর্কতা ও সাবধানতা দ্বারা নিজেকে সজীব- সতেজ রাখা। বদর যুদ্ধের সময় এ উভয় শক্তিই মুসলমানদের ছিল বলে তাঁদের অতি অল্প সংখ্যক লোক বিরাট সংখ্যক শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের একটি দল দুর্বলতা প্রদর্শন করে। সবর ও তাকওয়ার পরীক্ষায় তাঁরা উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

কয়েকটি মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানে (যেখানে উহুদ যুদ্ধের উল্লেখ আছে); কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের বিশ্লেষণ রয়েছে। যেমন ঃ

১। উহুদ যুদ্ধের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত নিয়েই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুদের মুকাবালা করা হবে। সে অনুযায়ী মুসলমানরা মদীনা থেকে বেরও হয়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে মুনাফিকরা নানা কথা বলে তাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টির প্রয়াস পায়, ফলে দুটি গোত্রের অন্তরে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। এভাবে শরু থেকেই ধৈর্য ও তাকওয়ার মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেয় এবং পরিণামে যা ঘটার তা-ই ঘটে।

২। জালিম ও কাফিরদের কুকর্ম তথা আচার-আচরণ যত শক্ত ও কঠোরই হোক না কেন, হাদী ও মুসলিহ (পথপ্রদর্শক ও সংস্কারক) দের, পথ প্রদর্শনের ব্যাপারে কখনো নিরাশ হতে নেই। বরং এই অবস্থায় আল্লাহ্র রহমত ও পুরস্কার কামনা করা ছাড়া তাঁদের অন্তরে অন্য কোন চিন্তাভাবনা থাকা উচিত নয়। কোন কিছু দেওয়ার সর্বময় ক্ষমতা আল্লাহরই। অতএব সবকিছুর পরিণাম তাঁর হাতেই ন্যস্ত করতে হবে। উহুদযুদ্ধে স্বয়ং নবী (সা) এর উপর শত্রুরা একের পর এক হামলা করে এবং তাঁকে শেষ করে ফেলতে চায়। এতদসত্বেও আল্লাহ্ এটা পছন্দ করেন নি যে, তাঁর পবিত্র অন্তরে শত্রুদের হিদায়াত ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছা বা আকাংখা থাকুক।

৩। হে 'দাওয়াতে হক'- এর অনুসারীগণ, উহুদ যুদ্ধে তোমাদের উপর যে ধাক্কা লেগেছে, তা থেকে যদি উপদেশ গ্রহণ করতে চাও তাহলে তোমরা ঐ সব ময়লা থেকে নিজেদের পবিত্র রাখো, যা তোমাদের অন্তরে

দুর্বলতার সৃষ্টি করতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই ময়লা হচ্ছে পার্থিব ধন-সম্পদের লিপ্সা। যতক্ষণ এই রোগ কারো অন্তরে থাকে ততক্ষণ সে আত্মোৎসর্গ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না।

৪। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বিশেষ ঘাটির (জাবালে আইনাইন-এর) উপর, যা ঐ যুদ্ধে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, একটি খন্ড বাহিনী মোতায়েন করে ছিলেন এবং তাঁদের বলেছিলেন, পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা কখনো এই ঘাটি পরিত্যাগ করবে না। কিন্তু যখন মুসলমানদের বিজয় সূচক হামলার সামনে শত্রুরা পালাতে শুরু করল তখন মাত্র দশ জন ছাড়া এই দলের সবাই মালে গনীমতের লোভ সংবরণ করতে না পেরে নিজেদের ঘাটি ছেড়ে চলে আসেন। শত্রুরা এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সংগে সংগে ঐ ঘাটি দিয়ে ঢুকে পেছন দিক থেকে মুসলমানদের উপর, তাঁদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে, এক প্রচন্ড হামলা চালায়। এটি ছিল এমন একটি ঘটনা, যা মুসলমানদের বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল।[১]

৫। যেহেতু ধন-সম্পদের লোভ ছিল ঘাটি পরিবর্তনকারীদের পদস্খলনের মূল কারণ, আর সুদের লেনদেন হচ্ছে ধন সম্পদের লোভ চরিতার্থ করার একটি বড় হাতিয়ার তাই বিশেষভাবে এই প্রসঙ্গে সুদের উল্লেখ করা হয়েছে। সুদের উপর সুদ ধার্য করার কারণে ঋণ গ্রহীতাদের মাথার উপর বিরাট অংকের ঋণের বোঝা চেপে ছিল। আর স্বভাবত: এ গুলোকে ছেড়ে দেওয়া ঋণ দাতাদের জন্য ছিল খুবই কষ্টকর, তাই এই মর্মে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ এল, তোমাদের অন্তর পবিত্র করার জন্য এর মধ্যে একটি বিরাট পরীক্ষা রয়েছে। সুদের উপর সুদ ধার্য করার কারণে যত বিরাট অংকের ঋণ ঋণগ্রহীতাদের উপর চাপুক না কেন, তোমরা তা একেবারে মাফ করে দাও।

৬। সর্বোপরি উহুদযুদ্ধের পরাজয়ের মূল কারণ ছিল এই যে, 'নিযাম' ও 'ইতাআ'ত' তথা শৃঙ্খলার (DISCIPLINE) মনোবৃত্তি মুসলমানদের মধ্যে পুরোপুরি সৃষ্টি হয় নি। তাই প্রয়োজন ছিল এমন একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা, যে বিষয়টি কার্যকরী করলে পর তাদের পরীক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর এটা তো পরিষ্কার কথা যে, সুদ গ্রহণের নিষিদ্ধতার চাইতে আর কোন কিছু দিয়েই এই পরীক্ষা সম্পন্ন করা যেত না। সুদ অবৈধ করে দেওয়ার কারণে ঋণদাতাদেরকে এমন একটি দাবী পরিত্যাগ করতে হল, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের একটি ন্যায্য অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছিলো। আর এটাই ছিল তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির সব চেয়ে বড় মাধ্যম। একারণেই বলা হয়েছে–

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

"তোমরা আল্লাহ্ ও রাসুলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার।" – (৩ঃ১৩২)

ইমামত (নেতৃত্ব) সম্পর্কিত কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন, উপদেশ এবং ইমামত সম্পর্কিত কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা গেল ঃ

ক) এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি আপনার অন্তরে কোমলতা এবং আপনার মেযাজে আগাগোড়া স্নেহ-ভালবাসা ঢেলে দিয়েছেন। যদি এরূপ না হত তাহলে মানুষের অন্তর এভাবে তাদের অজান্তে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হত না, যেমন এখন হয়ে থাকে।

খ) উহুদ যুদ্ধে একটি দলের পদস্খলন ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। এতদসত্ত্বেও আপনার স্নেহ । ভালবাসার দাবী হলো, আপনি ক্ষমা ও উপেক্ষার পথ অবলম্বন করবেন।

গ) আপনার নীতি এটা হওয়া উচিৎ যে, সন্ধি সম্পর্কিত হোক অথবা যুদ্ধ সম্পর্কিত, প্রত্যেকটি বিষয়ই পরষ্পর পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন করা।

ঘ) এক্ষেত্রে এটাই নিয়ম যে, প্রথমে সবার সাথে পরামর্শ করে একটা সিদ্ধান্ত নেবেন, এরপর কার্য সম্পাদনের সংকল্প গ্রহণ করবেন। পরামর্শ যথাস্থানে ও যথাসময়ে হওয়া চাই। সংকল্প গ্রহণও হওয়া চাই যথাস্থানে ও যথাসময়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত পরামর্শ গ্রহণ করা না হয় ততক্ষণ সংকল্প গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যখন পরষ্পর পরামর্শের পর একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন তখন তাতে সুদৃঢ় থাকুন। কোন অভিমান, কোন সমালোচনা এবং কোন বিরোধিতাই যেন তা থেকে আপনাকে হটিয়ে না দেয়। ইমামের জন্য এটা প্রয়োজনীয় যে, তিনি সবার সাথে পরামর্শ করবেন। আর সেই সাথে এটাও প্রয়োজনীয় যে, তিনি তাঁর সংকল্প ও সিদ্ধান্তে অবিচল থাকবেন।

মুনাফিকদের ব্যাপার

যে সব মুনাফিক খাঁটি মুসলমানদের সাথে মিলে মিশে জীবন যাপন করছিলো তাদের জন্য উহুদ যুদ্ধ ছিল একটি সিদ্ধান্তকর পরীক্ষা। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ওদের কপটতার রূপ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের প্রাথমিক পরামর্শ সভা থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত একটি মুহূর্তও এমন আসে নি যখন ওরা ফিত্‌নাবাজী থেকে বিরত ছিল। যখন সংখ্যা গরিষ্ঠমতে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুর মুকাবালা করা হবে তখন তারা লোকদেরকে এই বলে পথভ্রষ্ট করতে লাগলো যে, শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা মৃত্যুর মুখে নিজেকে ঠেলে দেওয়ারই নামান্তর। যখন ওদেরকে বলা হলো, আচ্ছা, তোমরা তাহলে শহর রক্ষায় নিয়োজিত থাক, তখন তারা নানা ধরনের টালবাহানা শুরু করে দিল। বলতে লাগলো যুদ্ধ হবে, এমনটি তো আমাদের মনে হয় নি। যদি হত তাহলে অবশ্যই প্রস্তুতি গ্রহণ করতাম। এরপর যখন কিছু লোকের দুর্বলতা ও অবাধ্যতার ফলে মুসলমানরা পরাজয়ের সম্মুখীন হলেন তখন তারা যেন ফিত্‌নাবাজী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। কখনো বলত, এসব কিছু এজন্যই হয়েছে যে, আমাদের কোন কথা মানা হয়নি। কখনো বলত, রোজ রোজ যুদ্ধ করে কি লাভ? কোন না কোনভাবে শত্রুকে রাজী করিয়ে নেওয়ার মধ্যেই তো সত্যিকার মঙ্গল। তাদের এ সব কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, কোন না কোন ভাবে মুসলমানদের অন্তরে নৈরাস্য ও হতাশার সৃষ্টি করা, যাতে করে তাঁদের কোন কাজই যেন ঠিকমত সমাধা না হয়।

উহুদের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে চলে যাবার সময় শত্রুরা বলে গিয়েছিল যে, তারা পরের বছর আবার আসবে এবং মুসলমান ও তাদের মধ্যকার বিষয়টির একটি চূড়ান্ত ফয়সালা করে যাবে। পরের বছর যখন এই সময় এল তখন মুসলমানগণ তৈরী হয়ে মদীনা থেকে বের হলেন, কিন্তু শত্রুদের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। কেননা মক্কা থেকে বের হওয়ার সাহসই তাদের হয় নি। মুসলমানগণ সেখানে কিছুদিন অপেক্ষা করে বিজয়ের মনোভাব নিয়েই মদীনায় ফিরে আসেন। কিন্তু এই সুযোগেও মুনাফিকরা শত্রুর সাথে মিলিত হয়ে নানা ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হয়। শত্রুরা চাচ্ছিলো, ভয় পাওয়ার অপবাদ তাদের উপর নয়, বরং মুসলমানদের উপরই যেন বর্তায়। আর এটা তখনই হতে পারত যখন মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করতেন। মুসলমানদের ভীতিগ্রস্ত করে তোলার জন্য তারা নানা ধরনের গুজব রটিয়ে তাঁদেরকে তাঁদের যাবতীয় উদ্যোগ আয়োজন থেকে বিরত রাখার চেষ্ট করে। পবিত্র কুরআনে এই সমস্ত বলা হয়েছে, মুনাফিকদেরকে সর্বশেষ সুযোগ দেওয়া হলো, যেন তারা তাদের কপটতাপূর্ণ আচার আচরণ থেকে বিরত হয়। অন্যথায় সেই সময় সমুপস্থিত যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের চেহারার উপর থেকে কপটতার পর্দা হটিয়ে দেবেন।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মুনাফিকদের যে মানসিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে তা যে বিশেষ কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে ছিল, তা নয়, বরং চিন্তা করলে দেখা যাবে, যে কোন জাতিগোষ্ঠীর দুর্বল ও ইতস্ততঃমনা লোকেরা সর্বদাই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে থাকে।

একটি প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম কথা

যেভাবে বদর যুদ্ধের বিজয়ের মধ্যে মুসলমানদের প্রশিক্ষণের উপাদান নিহিত ছিল, তেমনি তা নিহিত ছিল উহুদ যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়ের মধ্যেও। কেননা একজন দৌড়বিদের অনুশীলনের জন্য শুধুমাত্র এটাই যথেষ্ট নয় যে, সে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই শুধু দৌড়াতে থাকবে, বরং তার জন্য এটাও প্রয়োজন যে, সে দু একবার পড়ে গিয়ে, কিভাবে পড়ে যাওয়ার পর নিজেকে সামলে নিতে হয়, সে কৌশলও আয়ত্ব করবে। বদরের বিজয় দ্বারা উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার কল্যাণ ও উপকারিতা তুলে ধরা হয়েছিল। এরপর প্রয়োজন ছিল দুর্বলতা ও অন্যমনস্কতার ফলশ্রুতি তুলে ধরা। নিঃসন্দেহে উহুদের ঘটনা দ্বারা সে প্রয়োজনই পূরণ করা হয়েছে।

বদরের বিজয় এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রাপ্তির সুসংবাদসমূহ বহু মুসলমানের অন্তরে এক ধরনের বেপরোয়া মনোভাব ও অন্যমনস্কতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল। তাঁরা উদ্যোগ-আয়োজন তথা চেষ্টা পরিশ্রমের প্রতি কিছুটা অনীহা হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা যেন ভাবতে শুরু করেছিলেন, আমরা চেষ্টা করি আর নাই করি সর্বাবস্থায়ই আমাদের জন্য রয়েছে বিজয় আর বিজয়। প্রাথমিক বিজয় সমূহের পর এ ধরনের খামখেয়ালী মনোবৃত্তির সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এটা তো একটা ভয়ংকর অবস্থা। (কেননা এর ফলশ্রুতি হচ্ছে অহংকার ও কর্তব্যকর্মে অবহেলা। অতএব এর মূলোৎপাটন ছিল একান্ত অপরিহার্য। উহুদ যুদ্ধের বিপরীতমুখী অভিজ্ঞতা দ্বারা মুসলমানরা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি নির্ঘাত সত্য, কিন্তু তাঁর যাবতীয় কাজের ন্যায় তাঁর সাহায্য দানেরও একটা নিয়ম আছে এবং সে নিয়ম অনুযায়ী তা কার্যকরী হয়। যে সব জাতিগোষ্ঠী দুর্বলতা ও অকর্মন্যতার শিকারে পরিণত হবে, ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারবে না এবং যারা আনুগত্য ও শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে অপরিপক্ক প্রমাণিত হবে, তারা আল্লাহ্‌র সাহায্য- সহায়তা পাবার যোগ্য বিবেচিত হবে না।

বিজয় ও সাহায্য পাবার অধিকারী

যখন অধিকাংশ মুসলমান ঘাবড়ে গিয়ে পালাতে শুরু করলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর গুটি কয়েক উৎসর্গীকৃত প্রাণ অনুসারীর ব্যূহের মধ্যে দাঁড়িয়ে চীৎকার দিয়ে বলছিলেন,

إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ

"আল্লাহ্‌র বান্দারা, আমার দিকে আস, আমার দিকে আস, তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছ?"

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে–

إِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوُنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرٰكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ ط وَاللهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ .

"স্মরণ করো, তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটছিলে এবং পেছন ফিরে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না আর রাসূল তোমাদেরকে পেছন দিক হতে আহ্বান করছিলেন।" (৩ঃ ১৫৩)

যারা ঈমান ও বিশুদ্ধ চিত্ততায় সুদৃঢ় ছিলেন এবং উপস্থিত প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে সাময়িকভাবে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর আহ্বান শুনা মাত্র সজাগ হয়ে উঠেন। তাঁদের কাছে মনে হয়, যেন তাঁরা এক অচেতন অবস্থায় ছিলেন। এই অচেতন অবস্থার মধ্যে তাঁদের অন্তরের ভয়ভীতি বাকী নেই। সুতরাং তাঁরা নব বলে বলীয়ান হয়ে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালিয়ে শুধু তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করেনি বরং 'হামরাউল আসাদ'(যা মদীনা থেকে আটমাইল দূরে অবস্থিত) পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিন্তু যে সব লোক ঈমানে অপরিপক্ক তথা মুনাফিক ছিল, তারা তাদের প্রাণ বাঁচাবার চিন্তায়ই নিমগ্ন থাকে। তারা বলতে থাকে, যা কিছু ঘটেছে তাতে আমাদের অপরাধ কি? আল্লাহ্ যদি সাহায্য-সহায়তা দিতেন তাহলে কি এরূপ পরিস্থিতি দেখা দিত?

কুরআন বলে, মুনাফিকদের ঐ ধ্যান-ধারণা হচ্ছে ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগের ধ্যান-ধারণা। যাদের অন্তর ইসলামের আলোয় আলোকিত, তাঁদের অন্তরে এসব ধ্যান-ধারণার কোন স্থান নেই। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিজয় এবং সাহায্য একমাত্র আল্লাহ্‌রই হাতে। কিন্তু তিনি তা তাদেরকেই দান করেন যারা ধৈর্যশীল ও মুত্তাকী।

আসল কাজ

সত্যের শত্রুরা এ দুর্বলতা থেকে সুযোগ গ্রহণ করে তোমাদের এমন একটি রাস্তায় চালিত করতে চায়, যা তোমাদেরকে ন্যায় ও সত্যের দিকে নয়, বরং অন্যায় ও মিথ্যার দিকে নিয়ে যাবে। ওরা শত্রুদের সংখ্যাধিক্য এবং তাদের ক্ষমতার বানোয়াট কাহিনী শুনিয়ে তোমাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করে তুলতে চায়। এমতাবস্থায় যদি তোমরা সত্যের উপর অবিচলিত থাক এবং মানবীয় ক্ষমতার স্থলে আল্লাহ্‌র সর্বময় কর্তৃত্ব ও তাঁর বন্ধুত্বের উপর ভরসা রাখ তাহলে সেই সময় দূরে নয়, যখন তোমাদের ভয়ে ওদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে।

এখানে সেই মূল কথাটি বলা আমাদের উদ্দেশ্য যে, যে সব মানুষের সামনে ই'তিকাদ ও হিদায়াতের কোন পরিষ্কার ও সুদৃঢ় হাকীকত (স্বরূপ) থাকে না এবং যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের ভরসা ও উপাসনার আরো অনেক ঠিকানা বানিয়ে ফেলে, তাদের অন্তরে দৃঢ়সংকল্প ও দৃঢ়বিশ্বাসের সেই শক্তি জন্মায় না, যা সত্যের অনুসারী ও মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট। যখন ওরা এমন কোন জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, যাদের আশা ঈমান ও য়াকীনে ভরপুর তখন ওরা যতই শক্তি ও প্রতিপত্তির মালিক হোক না কেন, তাদেরকে কখনো ভীতিগ্রস্ত করে তুলতে পারবে না।

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় মুসলমানদের যে দলটি গঠিত হয়েছিল, তাদের মুকাবালায় আরবের মুশরিকদের অবস্থা ছিল ঠিক তাই। কেননা মুশরিকরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ এবং ধনসম্পদে অধিক শক্তিশালী হলেও তাদের অন্তর ছিল ঈমান ও য়াকীন থেকে বঞ্চিত। অপর দিকে মুসলমানগণ সংখ্যায় লঘিষ্ঠ ও ধন সম্পদে নিঃস্ব হলেও তাঁদের অন্তর ছিল ঈমান ও য়াকীনে ভরপুর। ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সংখ্যালঘিষ্ঠের ভয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের অন্তর কেঁপে উঠেছে এবং অতি অল্প সংখ্যক লোকের কাছে সমগ্র আরব পরাজয় বরণ করে নিয়েছে।

মুনাফিকরা তোমাদেরকে উহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, যাতে তোমরা আগামীতে শত্রুদের মুকাবালা করার সাহস না পাও। কিন্তু উহুদের মাঠে যা কিছু ঘটেছিল, তার হাকীকত কি, তা তোমরা ভালভাবেই জান। ঐ মুহূর্তেও আল্লাহ্‌র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছিল এবং শত্রুরা পশ্চাদপসরণ করেছিল। কিন্তু যখন তোমরা ঠিক যুদ্ধাবস্থায় রাসূলের নির্দেশ অমান্য করলে এবং তোমাদের একটি দল মালে গনিমত লুট করার জন্য নিজেদের ঘাটি ছেড়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ল, তখনই যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা পাল্টে গেল এবং তোমরা জয়ী হতে হতে পরাজিত হয়ে গেলে। অতএব যা কিছু ঘটেছে তা শত্রুদের ক্ষমতা ও সংখ্যাধিক্যের জন্য নয়, যার ভয় মুনাফিকরা তোমাদের দেখাচ্ছে– বরং তোমাদেরই অবাধ্যতা ও ভীরুতার কারণে। এর ফলশ্রুতি এটা হওয়া উচিৎ নয় যে, তোমরা শত্রুদের শক্তি ও সংখ্যাধিক্য দ্বারা প্রভাবিত হবে; বরং এটা হওয়া উচিৎ যে, তোমদের অন্তরে সবর ও তাকওয়ার সত্যিকার রূপ প্রস্ফুটিত হবে।

উপযোগিতা ও বিজ্ঞতা

উহুদ যুদ্ধে যে আঘাত তোমরা পেয়েছ, তা থেকে উপদেশ গ্রহণ কর এবং ভবিষ্যতে নিজেদের কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখ। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এটা হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র। আর যুদ্ধক্ষেত্রে কখনো এক দল হারে, অন্য দল জিতে। বদরযুদ্ধে ওরা তোমাদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, আর উহুদে তোমরা ওদের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হলে। কিন্তু জাতি-গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ইতিহাসে একটি দুটি যুদ্ধ ক্ষেত্রের হার-জিত কোন গুরুত্বই রাখে না। এক্ষেত্রে আসল প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো তোমাদের অন্তরের ঈমানী শক্তি। যদি তোমাদের অন্তরে প্রকৃত ঈমান থাকে তাহলে দুনিয়ার উন্নতি ও উৎকর্ষ শুধু তোমাদের জন্যই নির্ধারিত।

তাছাড়া এ ঘটনা বাহ্যত: পরাজয় বলে মনে হলেও এর অভ্যন্তরে অনেক উপযোগিতা ও বিজ্ঞতা নিহিত রয়েছে। উপরন্তু এর দ্বারা খাঁটি-মেকির পরীক্ষাও হয়ে গেছে। যারা মুনাফিক তথা অপরিপক্ক হৃদয় থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল, এই ঘটনার মাধ্যমে তাদের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়ে গেছে। তাছাড়া যুদ্ধের মধ্যে যে নাজুক ও চরম অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, এই ঘটনার মাধ্যমে মুসলমানগণ ব্যক্তিগত ভাবে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এ অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে শত্রুর মুকাবালায় তাঁদেরকে নিঃসন্দেহে আরো সাবধানী করে তুলবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, কিছু সংখ্যক মুসলমানের মনের গহীনে যে দুর্বলতা বাসা বেঁধেছিল এ আঘাতের ফলে তা চুরমার হয়ে গেছে। ফলে তাঁদের সংকল্প ও ঈমান অধিকতর মজবুত ও সুদৃঢ় হয়েছে।

টীকা ঃ

(১) সম্ভবতঃ সংক্ষেপায়নের উদ্দেশ্যে মাওলানা বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন নি। লড়াই উহুদ প্রান্তরে হয়েছিল। কুরায়শের মুখ ছিল পুর্ব দিকে আর মুসলমানদের পশ্চিম দিকে। উহুদের সামনে একটি ক্ষুদ্রাকার টিলা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ টিলার উপর কয়েকজন তীরন্দায মোতয়েন করেছিলেন, যাতে করে শত্রুরা পিছন দিক থেকে মুসলমানদের উপর হামলা করতে না পারে। মুসলমানরা কুরায়শদেরকে পরাজিত করার পর ঐ তীরন্দাযদের বেশীর ভাগ লোকই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নির্দেশের বিপরীত নিজেদের স্থান পরিত্যাগ করে চলে আসেন। খলিদ বিন ওলীদ (যিনি তখনও মুসলমান হন নি) এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে উহুদের উত্তর প্রান্ত দিয়ে পিছন দিক থেকে মুসলমানদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালান। এই আকস্মিক আক্রমণে মুসলমানরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে শুধুমাত্র প্রাণের ক্ষতির আধিক্যের কারণে সেটাকে তাঁদের পরাজয় আখ্যা দেওয়া সমীচীন হবে না।

উহুদ থেকে হুদায়বিয়া পর্যন্ত-১

গায্‌ওয়া-ই- হামরাউল আসাদ

উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৫ শাওয়াল, হিঃ ৩ সনে (মুতাবিক ৩১ মার্চ, ইং ৬২৫ সনে)। সেদিন ছিল শনিবার। যদিও কুরায়শ বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তবু আশংকা ছিল যে, তারা ফিরে এসে পুনরায় হামলা করবে। তাই রাতের বেলা মদীনা মুনাওওয়ারায় কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। পরদিন অর্থাৎ ১৬ শাওয়াল, হিঃ ৩ সন (মুতাবিক ১এপ্রিল, ইং ৬২৫ সন) রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দেন। তবে তিনি একথাও পরিষ্কার করে দেন যে, শুধুমাত্র তারাই এই অভিযানে অংশ নেবে, যারা উহুদ যুদ্ধে শরীক ছিল। অতএব উহুদ যুদ্ধের আহত ব্যক্তিরাও নিজ নিজ ক্ষতস্থানে পট্রি বেঁধে এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁদের সাথে ছিলেন। তিনি (সা) হামরাউল আসাদে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন, যা ছিল মক্কার পথে মদীনা মুনাওওরা থেকে আট মাইল দূরে। রাতের বেলা অবস্থানস্থলের বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বালানো হয়, যাতে যে কোন দর্শক মনে কর যে, এখানে একটি বিরাট বাহিনী অবস্থান করছে। বনী খুযা'আ গোত্র তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করলেও তারা মোটামুটিভাবে মুসলমানদের প্রতি ছিল সহানুভূতিশীল। মু'বাদ খুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি দেখতে পান যে, কুরায়শ বাহিনী আররাওহায় অবস্থান করছে এবং ফিরে এসে পুনরায় মুসলমানদেরকে আক্রমণ করবে কিনা সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলছে। মা'বাদ তাদেরকে বলেন, মুহাম্মদের সাথে যে বাহিনী হামরাউল আসাদে এসে অবস্থান নিয়েছে, তার মত ভয়ানক বাহিনী আমি কখনো দেখি নি। একথা শুনে কুরায়শ বাহিনী সোজা মক্কা অভিমুখে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সোম ও মঙ্গলবার দিন (১৭ ও ১৮ শাওয়াল, হিঃ ৩ সন) হামরাউল আসাদে অবস্থান করেন এবং বুধবার দিন (১৭-ই শাওয়াল) মদীনা অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন।

আবু সালামাহ (রা) এর অভিযান

যীকা'দা ও যীহাজ্জাহ্ মাস (হিঃ ৩ সন) স্বস্তিতেই কাটে। এরপর সংবাদ পাওয়া যায় যে, বনূ আসাদ গোত্রের সর্দার তুলায়হা এবং সালামাহ (তাদের পিতার নাম ছিল খুভায়লদ) তাদের গোত্রকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের ঐ ফিতনা প্রতিরোধের জন্য আবূ সালামাহ আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল আসাদ (রা) কে দেড় শ সাহাবী সহ মুহাররম, হিঃ ৪ সনে (মুতাবিক জুন, ৬২৫ সনে) প্রেরণ করেন। তিনি (সা) তাকে নির্দেশ দেন, বনু আসাদকে একত্রিত ও সংগঠিত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোন সুযোগই দেবে না। আবূ সালামাহ্ (রা) দ্রুত গতিতে বনী আসাদের এলাকায় গিয়ে পৌঁছেন। তাঁকে দেখা মাত্র বনী আসাদের লোকেরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। তখন আবূ সালামাহ (রা) তাদের উট এবং বকরী নিয়ে নিরাপদে মদীনা মুনাওওরায় প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

আবূ সালামাহ্ (রা) উহুদ যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। মলম পট্রি লাগানোর ফলে ক্ষতস্থান প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই অভিযানে দ্রুত গতিতে চলাফেরা ও অত্যধিক পরিশ্রম করার দরুন তার ক্ষতস্থানটি পুনরায়

জেগে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত এটাই এই বিশিষ্ট মুজাহিদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবূ সালামাহ (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দুধভাই।

আবদুল্লাহ্ বিন উনায়স (রা) এর কীর্তি

বনী লেহ্‌য়ান গোত্রের সর্দার সুফ্‌য়ান বিন খালিদ অত্যন্ত ফিতনাবাজ ও দুষ্টপ্রকৃতির লোক ছিল। সে সর্বদা এমন সব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত,যাতে কোন না কোন জায়গায় যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠে এবং তা থেকে সে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। শুনা গেল, সে এবার মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাধ্য হয়ে তার ফিতনাকে যে কোনভাবে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেন। উরনা ছিল সুফ্‌য়ানের বাসভূমি, যা মক্কা থেকে খুব একটা দূরে ছিল না। কুরায়শের সাথে সুফ্‌য়ানের সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর।

যাহোক সুফ্‌য়ানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুফ্‌য়ানকে দেখেছে এমন লোকের কাছ থেকে তার আকার-আকৃতি জেনে নিয়ে ৫ মুহাররম, হিঃ ৪ সন (মুতাবিক ১ জুন, ইং ৬২৫ সন) মদীনা মুনাওওরা থেকে রাওয়ানা হন। খোদ আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি সংগে শুধু একটি তরবারি নিয়ে উরনা ভূখন্ডে গিয়ে পৌছি। দেখি, সুফ্‌য়ান বিন খালিদ বিভিন্ন গোত্রের লোকদের নিয়ে কি যেন আলাপ-আলোচনা করছে। সে আমার পরিচয় জানতে চাইলো। বললাম, আমি খুযা'আ গোত্রের লোক, শুনেছি, তুমি নাকি মুহাম্মদ (সা) এর বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত বাহিনী গঠন করছ। তাই আমিও তোমার সঙ্গী হওয়ার মানসে এখানে চলে এলাম। সুফ্‌য়ান বললো, আমি অবশ্যই প্রস্তুতি নিচ্ছি। যাহোক, আমি তার মুখ থেকেই জেনে নিলাম যে, সে মুসলমানদের উপর হামলা করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

আবদুল্লাহ্ বিন উনায়স (রা) বলেন, আমি তার সাথে খোলাখুলি আলাপ আলোচনা করে তার সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি –এমন কি কোথায় সে রাত্রি যাপন করে তাও জেনে নিলাম। শেষ পর্যন্ত তার সংগীরা একে একে সেখান থেকে চলে গেল এবং রাতের বেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন আমি তরবারি নিয়ে সোজা সুফ্‌য়ানের শয়নকক্ষে ঢুকে পড়লাম এবং তাকে হত্যা করে পাহাড়ের একটি গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকলাম। সুফ্‌য়ানের লোকেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন আমাকে পেল না তখন নিরাশ হয়ে নিজ নিজ আস্তানায় ফিরে গেল। এরপর আমি শুধু রাতের বেলা পথ চলতাম এবং দিনের বেলা কোন সুবিধাজনক স্থানে লুকিয়ে থাকতাম। এভাবে চলতে চলতে আমি মদীনায় এসে পৌছি।

মদীনায় পৌছেই আমি মসজিদে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে সাক্ষাত করি। তিনি আমাকে দেখেই বলে উঠেন, তোমার চেহারা সাফল্যমন্ডিত হোক। এরপর আমি রাসুলুল্লাহ্ (সা) কে আমার অভিযানের যাবতীয় কাহিনী শুনালাম। তখন তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। সেটাই তিনি আমাকে দান করেন এবং বলেন, এটা হাতে নিয়ে জান্নাতে গমন করো।

ঐ লাঠিটি আজীবন আবদুল্লাহ বিন উনায়স (রা) এর কাছে ছিল। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে অসীয়ত করেন, যেন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ঐ লাঠিটিও তাঁর কাফনের সাথে দিয়ে দেয়। আবদুল্লাহ্ বিন উনায়স (রা) তাঁর ঐ অভিযান শেষ করে আঠারো দিন পর মুহাররম, হিঃ ৪ সন (মুতাবিক ৫ জুলাই, ইং ৬২৫ সন) মদীনা মুনাওওরায় ফিরে এসেছিলেন।

রাজী'– এর ঘটনা

আমার অনুমান মতে, বনূ লেহ্‌য়ান গোত্রের সর্দার সুফ্‌য়ান বিন খালিদ এই ঘটনার সূত্রপাত করেছিল। যখন সে শুনতে পেল যে, কুরায়শ বাহিনী উহুদ যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে এসেছে তখন সে তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য মক্কায় গিয়ে পৌছে। সেখানে সে তালহার স্ত্রী সুলাফা বিনতে সা'দকে মাতম করতে দেখে। তালহা বিন আবী

তালহা উহুদ যুদ্ধে কুরায়শ বাহিনীর পতাকাবাহী ছিল। সে, তার দুই ভাই এবং তিন পুত্র ঐ যুদ্ধে নিহত হয়। সুলাফা ওদের সবার জন্যই মাতম করছিলো। যেহেতু তার পুত্র মুসাফি' বিন তালহা, আসিম বিন সাবিত (রা)-এর তীর দ্বারা নিহত হয়েছিল তাই সে এই মর্মে শপথ করেছিল যে, সে যে করে হোক, আসিম বিন ছাবিত (রা) এর মাথার খুলিতে মদ্য পান করবে। অতএব, যে আসিম (রা) এর মাথার খুলি এনে দিতে পারবে, তাকে সে এক শ উট দেবে বলে অঙ্গীকার করে।

এ কথাটি সুফ্য়ানের লোভাতুর মনে অনবরত: আন্দোলিত হতে থাকে। তার তো দুষ্ট বুদ্ধির অভাব নেই। সে সংগে সংগে সিদ্ধান্ত নেয়, যদি কুরায়শের বিভিন্ন পরিবারের নিহতদের হত্যার প্রতিশোধ, মুসলমানদের উপর থেকে কোন না কোনভাবে নেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে কুরায়শরা নিশ্চিতভাবে এর একটা বিরাট প্রতিদান দেবে। সুফ্য়ান এজন্য যে পরিকল্পনা তৈরী করে তা হলো, কোন না কোন বাহানায় মুসলমানদের একটি দলকে ডেকে নিয়ে এসে, কুরায়শদের হাতে তাদেরকে উচ্চ থেকে উচ্চতর মূল্যে বিক্রি করা।

পরস্পর শত্রুতার কারণে খোদ বনূ লেহ্য়ান তো কোন মুসলমানকে মদীনা থেকে ডেকে পাঠাতে পারত না, তাই তারা আযল ও কারাহ সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে যড়যন্ত্র পাকিয়ে তাদেরই মাধ্যমে কিছু সংখ্যক মুসলমানকে ইসলাম শিক্ষা দানের বাহানায় মদীনা থেকে ডেকে পাঠানোর পরিকল্পনা নেয়। ইতিমধ্যে সুফ্য়ান বিন খালিদ নিহত হয়েছিল। তবু বনূ লেহ্য়ান গোত্রের লোক তাদের ঐ কর্মসূচী বহাল রাখে। কেননা তাদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। একঃ মুসলমানদেরকে কুরায়শের হাতে বিক্রি করা। দুইঃ নিজেদের সর্দারের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ।

আযল ও কারাহ্ গোত্রের প্রবঞ্চনা

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আযল ও কারাহ গোত্রের সাতজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে আসে এবং নিবেদন করেঃ আমাদের গোত্রের লোকেরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। অতএব আপনি এমন কয়েকজন লোক আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, যারা আমাদেরকে কুরআন ও ইসলামী শরীয়ত শিক্ষা দিতে পারে। যেহেতু সুলাফা বিনতে সা'দ, 'আসিম বিন ছাবিতের খুলিতে মদ্য পান করার শপথ নিয়েছিল, তাই তারা আসিম বিন ছাবিতকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে, যেন তিনিও তাদের সাথে যান। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সব সাহাবীদের প্রেরণ করেন, তাঁরা হলেনঃ

১। আসিম বিন ছাবিত বিন আবিল আকলাহ (রা)।

২। মারছাদ বিন আবিল মারছাদ আল গানভী (রা)।

৩। খালিদ বিন বাকীর আল লায়ছী (রা)।

৪। খুবায়ব বিন আদী (রা)।

৫। যায়দ বিন আদ্ দাহিনাহ্ (রা)।

৬। মাআত্তাব বিন উবায়দ (রা)।

৭। আবদুল্লাহ্ বিন তারিক (রা)।

কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দশজন সাহাবীকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র সাত জনেরই নাম পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, এই দলের অধিনায়ক ছিলেন আসিম বিন ছাবিত (রা)। আবার কারো কারো মতে, মারছাদ বিন আবী মারছাদ (রা)। এজন্য কেউ কেউ এ ঘটনাকে 'বা'ছে রাজী' আবার কেউ কেউ সারইয়া -ই- মারছাদ বিন আবী মারছাদ আল গানভী' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

আযল ও কারাহ গোত্রের লোকেরা মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার সাথে সাথে বনূ লেহ্য়ানের কাছে এই গোপন খবর পাঠায় যে, 'আমরা মুসলমানদেরকে সাথে করে নিয়ে আসছি।' এ খবর পাওয়া মাত্র বনূ লেহ্য়ানের দুশ লোক সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে এগিয়ে আসে। তাদের মধ্যে একশ জন ছিল তীরন্দায। যখন মুসলিম মুবাল্লিগ ও মুআল্লিমদের এই দলটি আসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী রাজী' নামক ঝর্ণার কাছে পৌঁছে তখন শত্রুরা তাঁদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। অগত্যা তাঁরাও নিজ নিজ অস্ত্র হাতে তুলে নেন এবং যুদ্ধ করে চারজন ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করেন। শত্রুরা কসম খেয়ে বাকি তিনজনকে এই মর্মে আশ্বস্ত করে যে, তাঁরা তাদের উপর কোন জুলুম অত্যাচার করবে না। এর উপর খুবায়ব বিন আবী যায়দ বিন আদ দাছিনা এবং আবদুল্লাহ্ বিন তারিক (রা) শত্রুদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু ঐ জালিমরা সংগে সংগে তাদেরকে বেঁধে ফেলে। আবদুল্লাহ্ বিন তারিক (রা) 'মাররায্ যাহরানে' তাঁর বন্ধন খুলে নিতে সক্ষম হন এবং তিনিও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন। তার কবর মাররায যাহরানেই রয়েছে। খুবায়ব (রা) কে হারিছের পুত্ররা এবং যায়দ (রা) কে সাফওয়ান বিন উমাইয়া খরিদ করে নেয়। হারিছ এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়ার পিতা বদরযুদ্ধে নিহত হয়েছিল বলে তাদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তার উত্তরাধিকারীরা যথাক্রমে খুবায়ব ও যায়দ (রা)কে খরিদ করে নিয়েছিল।

খুবায়ব (রা) এর শাহাদত

হারাম শরীফের বাইরে মৃত্যুদন্ড প্রদানের জন্য হযরত খুবায়ব (রা)-কে তানয়ী'মে নিয়ে যাওয়া হয়, যা হারাম শরীফের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। সেখানে খুবায়ব (রা) দু রাক'আত' নফল সালাত আদায় করেন। এরপর বলেনঃ যদি শত্রুদের এই ধারণা না হত যে, খুবায়ব মৃত্যুর ভয়ে সালাত দীর্ঘায়িত করছে তাহলে আমার মন চাচ্ছিলো, আরো দীর্ঘ সময় সালাত আদায় করতে। এরপর তিনি কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন, যার শেষ দুটি পংক্তি ছিল-

فوالله ما ارجواذامت مسلماً

على اى جنب كَانَ فى اللّٰهِ مصرعى

وذلك فى ذات الاله وان يشاء

يبارك على اوصالِ شلو ممزعى .

"আল্লাহ্র কসম, যখন আমি মুসলমান হিসাবে প্রাণ দিচ্ছি তখন আমার এই ভাবনা নেই যে, আল্লাহ্র পথে কোন্ পার্শ্বে আমি পতিত হচ্ছি এবং কিভাবে প্রাণ দিচ্ছি২। এসব কিছু শুধুমাত্র আল্লাহ্রই জন্য। যদি আল্লাহ্ চান তাহলে দেহের এই ছিন্ন ভিন্ন টুকরাগুলোর উপরও বরকত নাযিল করবেন।"

মৃত্যুদন্ড কার্যকর হওয়ার পূর্বে দুরাক'আত নফল সালাত আদায় করার এই পদ্ধতি সর্বপ্রথম হযরত খুবায়ব বিন 'আদী (রা)-ই চালু করেন।

যায়দ (রা) এর শাহাদত

যায়দ (রা)-কে মৃত্যুদন্ড প্রদানের জন্য তানয়ীমে নিয়ে যাওয়া হয়। সাফওয়ান তার গোলাম নাসতাসকে নির্দেশ দেয় যায়দ (রা)-কে হত্যা করতে। তখন আবু সুফ্য়ান যায়দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করে, সত্যিকরে বলো, এখন তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করা হলে তুমি কি এটাকে তোমার সৌভাগ্য বলে মনে করতে না? যায়দ তখন রাসূল প্রেমে বিভোর অবস্থায় জওয়াব দেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তো এটাও পসন্দ করি না যে, আমার প্রাণ রক্ষার পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র পায়ে একটি কাঁটাও বিঁধুক।

আবু সুফ্য়ানের মুখ থেকে তখন আপনা আপনি একথা বেরিয়ে আসে- "আল্লাহ্‌র কসম, মুহাম্মদ (সা) এর সঙ্গীরা তাকে যেরূপ ভালবাসে -সেরূপ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ভালবাসতে আমি কোথাও দেখি নি।"

আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর লাশের হিফাযত করলেন

কাফিররা 'আসিম বিন ছাবিত (রা) এর মাথা তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করল, যাতে তা সুলাফাকে দিয়ে এর বিনিময়ে তার কাছ থেকে একশ উট গ্রহণ করা যায়। কিন্তু অসংখ্য বোলতা কোথা থেকে উড়ে এসে ঐ পবিত্র লাশের চতুর্দিক এমনভাবে ঘিরে ফেলল যে, এরপর কেউ তার ধারে-কাছে ঘেঁষারও সাহস পেল না। এরপর প্রবল বৃষ্টি হলো এবং পানির তোড়ে ঐ লাশ কোথা থেকে কোথায় যে ভেসে গেল তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে রাজী'এর ঘটনা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। হায়! এমন পবিত্রচেতা, এমন পুণ্যবান কয়েকটি মানুষ, যারা ছিলেন সত্যিকার অর্থে মনুষ্যত্ব ও মানবতার অহংকার - তাঁরা এভাবে প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতার শিকারে পরিণত হয়ে শাহাদত বরণ করলেন। যখন শত্রুতা ও বিদ্বেষ মানুষের হৃদয়-দর্পণকে সম্পূর্ণ মলীন করে ফেলে এবং তার মন থেকে পাপ-পুণ্যের পার্থক্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়; বরং তার দৃষ্টিতে পুণ্যের চাইতে পাপই অধিকতর আকর্ষণীয় ঠেকে, শুধুমাত্র তখনই তার দিক থেকে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হতে পারে।

বি'-রে মা'উনার ঘটনা

রাজী'এর ঘটনা সফর, হিঃ ৪ সনে (মুতাবিক জুলাই ইং ৬২৫ সনে) সংঘটিত হয়েছিল। এ ধরনের বরং এর চাইতেও মারাত্মক ঘটনা ঐ একই মাসে বি'-রে মা'উনায় ঘটেছিল। বি'-রে মাউ'না বনী সালীমের মালিকানাধীন একটি কূয়ার নাম। তবে তা বনী সালিম ও বনী আমিরের এলাকার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। অবশ্য 'হাররা' বনী সালীমের অধিকতর নিকটে। তা মক্কা ও মদীনার ঐ পথে পড়ে, যেটাকে 'তারীকে শারকী' (পূর্ব প্রান্তের পথ) বলা হয়।

আবূ বারা আমির বিন মালিক কিলাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে আসে। তিনি তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। তখন আবূ বারা ইসলাম গ্রহণ করলো না এবং তা প্রত্যাখ্যানও করলো না। শুধু নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, যদি আপনার কিছু সংখ্যক সংগীকে নাজ্‌দ্‌বাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তাহলে আশা করা যায় যে, তারাও ইসলাম গ্রহণ করবে।

হুযূর (সা) তখন বলেন, নাজ্‌দ্‌বাসীদের সম্পর্কে আমি সংশয়মুক্ত নেই। আবূ বারা উত্তরে বলে, আপনি কোন চিন্তা বরবেন না, আমি এব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। কারো কারো ধারণা, ঐ সময়ে রি'ল ও যাকওয়ানের কিছু লোকও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে এসেছিল। তারাও আবেদন করেছিল যে, ইসলাম প্রচার ও ইসলাম শিক্ষার জন্য যেন কিছু লোক তাদের সাথে প্রেরণ করা হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফর, হিঃ ৪ সনে (মুতাবিক জুলাই, ইং ৬২৫ সনে) মানযার বিন আমর (রা) এর নেতৃত্বে সত্তর জন সাহাবীর একটি দল প্রেরণ করেন। হযরত মানযার বিন আমর (রা) ছিলেন হযরত উমর ফারুক (রা) এর শ্বশুর এবং হযরত আসিম বিন উমর (রা) এর মাতামহ। 'ইবনে হিশাম'[৩] ও 'জাওয়ামিউস্ সিরাত'[৪]- এর বর্ণনানুযায়ী ঐ দলে শুধুমাত্র চল্লিশ জন লোক ছিলেন।

যখন তাঁরা বি'-রে মাউ'নায় গিয়ে মিলহানকে[৫] একটি পত্রসহ বনী আমির গোত্রের সর্দার আমির বিন তুফায়লের কাছে পাঠান। কিন্তু ঐ নির্দয় লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পত্রের কোন তোয়াক্কা না করে একটি লোকের প্রতি ইংগিত করতেই সে পেছন দিক থেকে একটি বল্লম নিক্ষেপ করে এবং তার আঘাতে হারাম বিন মিলহান (রা) সংগে সংগেই শাহাদত বরণ করেন। এরপর আমির বিন তুফায়ল বনূ সুলায়ম গোত্রের উসাইয়া, রি'ল

এবং যাকওয়ান কে আহবান জানায়। ওরা তখন হৈ হল্লা করে সকল মুসলমানকে শহীদ করে ফেলে। শুধু তিন ব্যক্তি বেঁচে যান। এদের একজন হচ্ছেন কা'ব বিন যায়দ (রা)। তিনি ভীষণভাবে আহত হয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই কাফিররা মনে করেছিল, তিনি মারা গেছেন। যাহোক পরবর্তী সময়ে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন এবং খন্দক যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। বাকি দৃ'জন উট চরাবার জন্য এদিক সেদিক বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন উমাইয়া বিন আমর যামরী ও মানযার বিন মুহাম্মদ (রা)।

আরো একটি শাহাদত

শেষাক্ত দুজন আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে চিল উড়তে দেখে অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, তাঁদের সঙ্গীদেরকে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। অতএব উপস্থিত পরিস্থিতিতে কী করতে হবে সে সম্পর্কে তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেন। তাঁদের একটি অভিমত এই ছিল যে, তাড়াতাড়ি মদীনা মুনাওওরায় পৌঁছে রাসুলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করা উচিত। মানযার বিন মুহাম্মদ (রা) বলেন, আমি তো এ জায়গা থেকে পলাতে পারব না, যেখানে আমাদের অধিনায়ক মানযার বিন উমর (রা) শাহাদত বরণ করেছেন। অতএব মানযার বিন মুহাম্মদ (রা)- ও যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন। আর আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা) কে খোদ আমির বিন তুফায়ল এই বলে ছেড়ে দেয়, "আমার মায়ের এই মর্মে একটি মানত আছে যে, সে মুযার গোত্রের কোন একটি লোককে মুক্তি দান করবে।" রাজী'এর শহীদদের মত বি'-রে মাউ'নার শহীদরাও অত্যন্ত পরিত্র চেতা ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তাঁরা শুধু কুরআন শিখতেন এবং অন্যকে তা শেখাতেন। তাঁরা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে অথবা কুড়িয়ে নিয়ে আসতেন এবং সেগুলো বিক্রি করে নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতেন। ইবনে হাযাম এদের মধ্য থেকে হারিছ বিন আস সাম্মাহ, হারাম বিন মিলহান, উরওয়া বিন আসমা, দলের অধিনায়ক মানযার বিন আমর, আমির বিন ফুহায়রা (হযরত আবূ বকর (রা) এর মুক্তি প্রাপ্ত গোলাম, যিনি হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সঙ্গী ছিলেন) প্রমুখের উল্লেখ বিশেষভাবে করেছেন।[৬] আমির (রা) কে জনৈক ব্যক্তি বল্লম দ্বারা আঘাত করে যা তাঁর দেহবিদ্ধ করে বিপরীত দিকে বেরিয়ে যায়। তিনি এই বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন- فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ -"কা'বার আল্লাহ্র কসম, আমি সফলকাম হয়েছি।"

এই শব্দগুলো এতই প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিল যে, আমির (রা) এর হত্যাকারী স্বয়ং মদীনা মুনাওওরায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। (সংকলক)

টীকা ঃ

(১) আমি বনী আসাদের এলাকা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি নি। বিভিন্ন রেওয়াতে 'কাতান' নামক একটি পাহাড়ের উল্লেখ আছে, যেখান থেকে পানির ঝর্ণা নির্গত হয়েছে। ঐ পাহাড়টি 'কায়দ' জেলার অন্তর্গত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই হিসাবে আমার অনুমান এই যে, এটার অবস্থান নিশ্চয়ই নাজদের দিকে, তথা মদীনা মুনাওওরার উত্তর পূর্ব দিকে।

(২) এই পংক্তিটির মূল বচন বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে রয়েছে। সীরাতুন্নবীতে আছে (প্রথম খন্ডঃ পৃষ্ঠা -৩১৬)

وما ابالى حين اقتل مسلما
على اى شق كان لله مصرعى

ইবনে হাযামের জাওয়ামিউস সীরাতে আছে, (পৃষ্ঠা -১৭৮)

وما ابالى حين اقتل مسلما
على اى شق كان فى الله مضجعى

(৩) ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পৃষ্ঠা - ১৮৪
(৪) জাওয়ামিউস সীরাহ ঃ পৃষ্ঠা- ১৭৯
(৫) হারাম বিন মিলহান (রা) হযরত আনাস বিন মালিক (রা) এর মামা অর্থাৎ আনাস (রা) এর মাতা উম্মে সূলায়মের সহোদর ছিলেন।
(৬) জাওয়ামিউস সীরাহ ঃ পৃষ্ঠা-১০৯

উহুদ থেকে হুদায়বিয়া পর্যন্ত–২

আমর বিন উমাইয়া (রা) এর ভ্রান্তি

আমর বিন উমাইয়া যামরী মদীনা প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পথিমধ্যে দু'টি লোককে শায়িত অবস্থায় দেখতে পান। আমর মনে করলেন, এ দু'জন নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গীদের হত্যাকারী হবে। তাই তিনি তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায়ই হত্যা করে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে এ দু'জন ছিল বনী আমির গোত্রের লোক। আর বনী আমিরের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিত্রতা-চুক্তি ছিল এবং ঐ চুক্তির কারণেই তারা তাদের সর্দারের আহবানে সাড়া না দিয়ে আবূ বারা (রা) এর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করেছিল। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে ঐ দুই ব্যক্তির রক্ত পণ বনী আমিরের কাছে পাঠিয়ে দেন।

বিরাট হৃদয়বিদারক ঘটনা

এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী পঞ্চাশজন এবং অপর রিওয়ায়াত অনুযায়ী আশি জন খাঁটি মুমিনের শহীদ হওয়ার এই ঘটনা ছিল বিরাট হৃদয় বিদারক। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যারপর নেই ব্যথিত হন। মরহুম মাওলানা শিবলী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে যখন এই ঘটনার সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি অন্তরে এতই ব্যথা পান যে, সারা জীবনে কখনো এরূপ ব্যথা পাননি।

প্রতিশ্রুত গাযওয়া-ই-বদর

উহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে যাবার সময় আবূ সুফ্য়ান মুসলমানদেরকে বলেছিল, আগামী বছর এই মাসেই বদর প্রান্তরে তোমাদের সাথে মুকাবালা হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইঙ্গিতে হযরত উমর ফারূক(রা)-ও আবূ সুফ্য়ানের ঐ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। অতএব হিঃ ৪ সনের যী'কাদা মাস (ইং ৬২৬ সনের এপ্রিল মাস) নিকটবর্তী হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁর সাথে পনেরো শ যোদ্ধা ও দশটি ঘোড়া ছিল। যীকা'দার চাঁদ উঠতেই বদরে মেলা বসত এবং ব্যবসা বাণিজ্য খুব জমে উঠত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৮ যীকাদা (মুতাবিক ১২ এপ্রিল, ইং ৬২৫ সন) পর্যন্ত বদরে অবস্থান করেন। আবূ সুফ্য়ান দু'হাজার যোদ্ধা নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়েছিল। তার সংগে ঘোড়াও ছিল। কিন্তু মাররায্ যাহরানে পৌঁছার পর সে সাহস হারিয়ে ফেলে এবং বলতে শুরু করে, শস্য শ্যামল ও সবুজ সতেজ বছরেই কুরায়শদের জন্য যুদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়। কেননা তখন উটেরা সবুজ ঘাস ও গাছগাছালির পাতা খেতে পাবে, আর মানুষ উটের দুধ খেয়ে দিন গুজরান করবে। এটা তো শুষ্ক বছর। এ বছর যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। সুতরাং আবূ সুফ্য়ান মুখ রক্ষার খাতিরে এই সব কথা বলে বদর প্রান্তরে না এসেই মক্কায় ফিরে যায়। অগত্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৮ যীকা'দার পর মদীনা মুনাও্ওরায় ফিরে আসেন। এই গাযওয়াকে 'বদরে মাওয়িদ' 'বদরে ছানিয়া' অথবা 'বদরে উখরা'ও বলা হয়ে থাকে।

গাযওয়া-ই-যাতির রিকা'

কোন এক বণিক মদীনা মুনাও্ওরায় তার পণ্যদ্রব্য নিয়ে এসেছিল। তার কাছ থেকে এই মর্মে একটি সংবাদ পাওয়া যায় যে, গিতফান গোত্রের আন্মা ও ছা'লাবা কিংবা বনূ মাহারিব ও ছা'লাবা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার

জন্য সমবেত হচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উছমান (রা) কে মদীনায় আপন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে ১০ মুহাররম, হিঃ ৫ সন (মুতাবিক ১১ জুন, ইং ৬২৬ সন) নাজ্দ অভিমুখে রাওয়ানা হন। কেননা ঐ এলাকায়ই ছিল গিতফান গোত্রের বাসভূমি। তাঁর সাথে কোন কোন রিওয়ায়াত অনুযায়ী চারশ, আবার কোন কোন রিওয়াত অনুযায়ী সাতশ সাহাবী ছিলেন। তিনি ক্রমশ: অগ্রসর হয়ে যাতুর রিকায় গিয়ে পৌঁছেন। এই অভিযানের নাম 'যাতুর রিকা' কেন হল তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন–

১। 'যাতুর রিকা' হচ্ছে একটি পাহাড়, যার মধ্যে বিভিন্ন রংয়ের ভূখন্ড রয়েছে। কেননা রিকা' রুকা'- এর বহু বচন। আর রুকা ভূখন্ড অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

২। যাতুর রিকা একটি বৃক্ষের নাম।

৩। ঐ অভিযানকালে মুজাহিদদের বর্শাসমূহে তালি লাগানো ছিল বলে এই অভিযানের নাম যাতুর রিকা' রাখা হয়। কেননা রুকা তালি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

৪। ঐ অভিযানকালে পাথরের উপর দিয়ে চলতে চলতে সাহাবীদের পা ফেটে গিয়েছিল বিধায় তাঁরা তাঁদের পায়ে কাপড়ের পট্রি জড়িয়ে নিয়েছিলেন। তাই ঐ অভিযানকে যাতুর রিকা' নামে অভিহিত করা হয়।

বস্তুত: রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন গন্তব্য স্থলে পৌঁছেন তখন সেখানে স্ত্রীলোক ও শিশুছাড়া অন্য কোন জনপ্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না। কেননা পুরুষেরা পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এক এক দিকে এক একটি সন্ধানী দলকে পাঠানো হয়। তথাপি 'সালাতুল খাউফ' আদায় করা হয়, যাতে শত্রুরা ইবাদতের এই সুযোগে মুসলমানদের উপর হঠাৎ আক্রমণের প্রয়াস না পায়। প্রথম এক দল দু'রাকআত' সালাত আদায় করেন এবং অপর দল পাহারা দিতে থাকেন। এরপর অপর দল সালাত আদায় করেন এবং প্রথম দল পাহারা দিতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ২৫ মুহাররম হিঃ ৫ সন (মুতাবিক ২২ জুন, ইং ৬২৬ সন) মদীনা মুনাও্ওরায় ফিরে আসেন।

গাযওয়া-ই-দূমাতুল জান্দাল

এই মর্মে একটি খবর পাওয়া যায় যে, দূমাতুল জান্দালে বিরাট একদল লোক অবস্থান করছে এবং যে উষ্ট্রারোহীই ঐ দিক দিয়ে আসছে, তারা তার উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। উপরন্তু তারা মদীনা আক্রমণেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ২৫ রাবীউল আউয়াল হিঃ ৫ সন (মুতাবিক ২৪ আগষ্ট, ইং ৬২৬ সন) এক হাজার মুসলমানের একটি বাহিনী নিয়ে দূমাতুল জান্দাল অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি সিবা বিন উরফাতা আনসারীকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে গিয়েছিলেন। ঐ অভিযানকালে তিনি রাতের বেলা সফর করতেন এবং দিনের বেলা কোথাও আত্মগোপন করে থাকতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পূর্বেই দূমাতুল জান্দালের ঐ জনদল চতুর্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ২০ রাবীউল আউয়াল হিঃ ৫ সন (মুতাবিক ২৭ ডিসেম্বর, ইং ৬২৬ সন) মদীনা মুনাও্ওরায় ফিরে আসেন।

গাযওয়া-ই-মুরাইসী'

খুযা'আ বংশের একটি গোত্রের নাম ছিল বনুল মুসতালাক। তাদের প্রধান জলাশয় ছিল মুরাইসী'। বনুল মুসতালাকের সর্দার হারিছ বিন আবী যারার তার কর্তৃত্বাধীন আরব গোত্রসমূহকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহবান জানায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, সংবাদটি সঠিক তখন তিনি যায়দ বিন হারিছা (রা) কে মদীনায় তাঁর স্থলাবিষিক্ত নিয়োগ করে ২ শাবান, হিজরী ৫ সন (মুতাবিক ২৭ ডিসেম্বর, ইং ৬২৬ সন) বনুল মুসতালাককে যথোচিৎ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন -সংবাদ পৌঁছামাত্র হারিছ বিন আবী যাররের সঙ্গীরা তাকে ছেড়ে চলে যায়। অগত্যা সে নিজেও পলায়ন করে।

মুরাইসী জলাশয়ের ঘাটেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়। হযরত 'আইশা ও হযরত উম্মে সালমা (রা) ঐ সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলেন। শত্রুপক্ষের যে সব লোক ঐ মুহূর্তে সেখানে ছিল, তারা মুসলমানদের মুকাবালা করে। অবশ্য তাতে তাদের দশজন নিহত ও দশজন বন্দী হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কোন বন্দীকে কেনরূপ বিনিময় ছাড়াই মুক্তি দান করেন। অবশ্য কারো কারো কাছ থেকে ফিদয়া গ্রহণ করা হয়। মোটকথা, বনূ মুসতালাক গোত্রের এমন একজন স্ত্রীলোকও ছিল না, যাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এবং পরে ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

উম্মুল মুমিনীন হযরত জুভায়রিয়া (রা)

হারিছ বিন আবী যারার-এর কন্যা যুভায়রিয়াও বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। যারা তাঁকে বন্দী করেছিলেন তিনি তাঁদের সাথে 'মুকাতাবাত' (নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মুক্তিলাভের চুক্তি সম্পাদন) করে নেন। এ সংবাদ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছে তখন তিনি জুভায়রিয়াকে বলেন, যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার সম্পাদিত চুক্তির সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে তোমাকে আমার স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারি। জুভায়রিয়া তাতে সম্মতি প্রকাশ করে উম্মুল মুমিনীন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

একটি রিওয়ায়াতে আছে, হারিছ বিন আবী যারার স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)- এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার কন্যা দাসীরূপে জীবন যাপন করতে পারে না। আপনি তাকে মুক্ত করে দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এ বিষয়টি জুভায়রিয়ার হাতেই ছেড়ে দাও। তখন জুভায়রিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে থাকাকেই পসন্দ করেন এবং তাঁর সাথে পরিণয় সূত্রেও আবদ্ধ হন। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, হযরত জুভায়রিয়া (রা)-এর ফিদ্য়া তাঁর পিতাই পরিশোধ করেছিলেন।

জুভায়রিয়া (রা) এর উম্মুল মুমিনীন হওয়ার প্রথম সুফল এই দেখা দিয়েছিল যে, বনুল মুসতালাকের সব বন্দীই একযোগে মুক্তি লাভ করে। কেননা যে বংশ বা গোত্রের কোন মেয়েকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবাহ করেছিলেন, সে বংশ বা গোত্রের কোন লোক তো আর গোলাম থাকতে পারে না। হযরত 'আইশা (রা)-এর এ উক্তি অত্যন্ত সঠিক, যাতে তিনি বলেছিলেন, এমন আর কোন স্ত্রীলোক আমার দৃষ্টিতে পড়ে নি, যে তাঁর গোত্রের জন্য এরূপ কল্যাণময়ী প্রমাণিত হয়েছে, যেরূপ কল্যানময়ী প্রমাণিত হয়েছিলেন জুভায়রিয়া (রা) তাঁর গোত্র বনুল মুসতালাকের জন্য।

এই সফরে আরো কিছু ঘটনা ঘটে, যার বিস্তারিত বর্ণনার জায়গা এটা নয়। তাছাড়া এই সব গাযওয়ার তারিখ নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ উপলক্ষে আটাশ দিন মদীনা মুনাওওয়ার বাইরে ছিলেন। রমযান শরীফের চাঁদ উঠলে পর তিনি মদীনা মুনাওওয়ায় ফিরে আসেন।

একটি রিওয়ায়াতে আছে, জুভায়রিয়া (রা)-এর পিতা ফিদ্য়ার মাল নিয়ে মদীনা মুনাওওয়ায় পৌঁছেন। ঐ মালের মধ্যে কয়েকটি উটও ছিল। তিনি এর মধ্য থেকে দুটি উট আকীক উপত্যকায় লুকিয়ে রাখেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বলেন, আমি আমার মেয়ের ফিদ্য়া নিয়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, ঐ দু'টি উটের খবর কি, যেগুলোকে তুমি উপত্যকায় লুকিয়ে রেখে এসেছ? একথা শুনে হারিছ বিন যারার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং সংগে সংগে কালিমা-ই-শাহাদত পাঠ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। জুওয়রিয়া পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন হারিছের কাছে জুভায়বিয়ার বিবাহের পয়গাম পেশ করলে তিনি চারশ দিরহাম মাহ্র নির্ধারণ করে জুভায়রিয়া (রা) কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন।

গায়ওয়া-ই-বনূ লিহ্য়ান

বাকী গায্ওয়াগুলোর মধ্যে একটি গায্ওয়া বনূ লিহ্য়ানের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়। রাজী- এর দুঃখজনক ঘটনার জন্য বনূ লিহ্য়ান গোত্রই ছিল দায়ী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাবীউল আউয়াল, হিঃ ৬ সনে (মুতাবিক ২১ জুলাই,

ইং ৬২৭ সনে) মদীনা থেকে রওয়ানা হন। তাঁর সংগে ছিল দুশ যোদ্ধা ও বিশটি ঘোড়া। এই অভিযানকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতের বেলা পথ চলতেন এবং দিনের বেলা কোথাও আত্ম গোপন করে থাকতেন। এ ভাবে তিনি 'বত্‌নে গুরানে' গিয়ে পৌছেন। গুরান ও 'আসফানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচ মাইল। বতনে গুরানের মধ্যেই 'আসহাবে রাজী' (রাজী ' এর ঘটনায় শাহাদত বরণকারী সাহাবীবৃন্দ) বিশ্বঘাতকতার নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। বন্দ লিহ্‌য়ানের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন সংবাদ পেয়ে যারপর নেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দ্রুত পালিয়ে গিয়ে একেবারে পাহাড় শৃঙ্গে আশ্রয় নেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসফান পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর নেতৃত্বে একটি অশ্বারোহী বাহিনী সম্মুখের দিকেও পাঠান। কিন্তু শত্রুর নাগাল পাওয়া যায় নি। অগত্যা তিনি মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

গাযওয়া-ই-গাবাহ

গাবাহ্ মদীনা মুনাওওরা থেকে আনুমানিক আট মাইল উত্তরে অবস্থিত। সেখানকার চারণ ভূমিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উট চরতো। এক গিফারী পুরুষ ও স্ত্রী সেগুলোর তত্বাবধান করত। হঠাৎ আইনিয়া বিন হিসন, গিতফানের একটি অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে হাযির হয় এবং উট- রাখালদের হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সালামাহ বিন আকওয়া' (রা) সর্বপ্রথম এই সংবাদ পান এবং সংগে সংগে লুটেরাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। তীর নিক্ষেপে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। অনবরতঃ তীর নিক্ষেপ করে তিনি শত্রুদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও একটি বাহিনী নিয়ে সেখানে গিয়ে পৌছেন। তবে গাযওয়া-ই-পাবায় সালামাহ বিন আকওয়া'ই সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

গাযওয়া-ই-যী-কুরদ্

এই গাযওয়াকে গাযওয়া-ই-যী-কুরদ্ বলা হয়। কেননা যী-কুরদ নামক একটি ঝর্ণা থেকে ঐ আকস্মিক হামলাকারীরা পানি পান করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে পৌছে একদিন এক রাত অবস্থান করেন। এই অভিযানে দু'জন সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। তাদের একজনের নাম মুহরিয় বিন নাযলা আল আখরাম এবং অন্যজনের নাম খুব সম্ভবত: ওয়াক্কাস ছিল।

ছামামা বিন আছাল

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক প্রেরিত একটি বাহিনী নাজ্‌দের দিক থেকে বনূ হানীফার ছামামা বিন আছাল নামীয় একজন সর্দারকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এদিক দিয়ে যাবার সময় জিজ্ঞাসা করেন, ছামামা, কি সমাচার? ছামামা উত্তরে বলে, হে মুহাম্মদ (সা), যদি আমাকে হত্যা কর তাহলে একজন হত্যাযোগ্য ব্যক্তিকেই হত্যা করা হবে। আর যদি ছেড়ে দাও তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই ছেড়ে দেওয়া হবে। যদি অর্থ চাও তো বলো, অবশ্যই দিয়ে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও ছামামার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ ধরনের কথাবার্তা হয়। তৃতীয় দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ছেড়ে দেন। এরপর ছামামা একটি বৃক্ষের কাছে গেলেন গোসল করলেন এবং ফিরে এসে মুসলমান হয়ে গেলেন। তারপর নিবেদন করলেন, আল্লাহর কসম, ইতিপূর্বে আপনার চেহারার প্রতি আমি যেরূপ ঘৃণা পোষণ করতাম সেরূপ অন্য কোন চেহারার প্রতিই করতাম না। আজ আপনার চেহারা আমার কাছে যত প্রিয় তেমনি প্রিয় অন্য কোন চেহারাই নয়। ইতিপূর্বে আমার চোখে আপনার ধর্মের চাইতে খারাপ ধর্ম আর কোনটিই ছিল না, অথচ আজ আপনার ধর্ম আমার কাছে সব ধর্মের চাইতে প্রিয়।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি নিয়ে ছামামা (রা) উমরাহ পালন করে আপন জন্ম ভূমির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ইয়ামামা থেকেই মক্কায় খাদ্যদ্রব্য আমদানী হতো! ছামামা (রা) মক্কাবাসীদেরকে বলেন, এখন থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি ছাড়া ইয়ামামা থেকে একটি শস্যদানাও মক্কায় আসতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে আবেদন জানিয়ে ইয়ামামা থেকে মক্কায় খাদ্য আমদানীর পথ উন্মুক্ত রাখে।

খন্দক যুদ্ধ

খন্দক যুদ্ধ-১

কখন সংঘটিত হয়েছিল?

গাযওয়া-ই খন্দককে 'গাযওয়া-ই-আহযাব' ও বলা হয়।[১] এই যুদ্ধ হিঃ ৫ সনের শাওয়াল মাসের শেষ দিকে শুরু হয়।[২] তবে এটা কতদিন অব্যাহত ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। 'তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এর একটি বর্ণনায় আছে, শত্রুদের ঘেরাও চব্বিশ রাত্রি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[৩] অপর এক বর্ণনায় আছে, ঘেরাও-এর মধ্যে পনেরো রাত অতিবাহিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৮ যীকাদা, সোমবার দিন খন্দকে পৌঁছেন[৪] এবং বুধবার দিন খন্দক থেকে উঠে মদীনা ফিরে যান। তখন যীকাদা মাস শেষ হতে সাত দিন বাকী ছিল।[৫] অতএব বলা যায়, মূল যুদ্ধ ৮ যীকাদা, হিঃ ৫ সনে শুরু হয়ে ২৩ যীকাদা, হিঃ ৫ সনে শেষ হয়েছিল।[৬] কারো কারো মতে, খন্দক যুদ্ধ হিজরী ৪ সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এটা হিজরী সালের হিসাবে একটি মত পার্থক্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাবীউল আউয়াল মাসে মদীনা মুনওওরায় পৌঁছে ছিলেন। কেউ কেউ বছরের হিসাব করতেন এক রাবীউল আউয়াল থেকে আরেক রাবীউল আওয়াল পর্যন্ত। এই হিসাবে এটা প্রকৃতই হিজরী চতুর্থ সালে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু প্রচলিত হিসাব মতে ১ মুহাররম থেকে বছর শুরু হয়ে গিয়েছিল। অতএব এই হিসাব অনুযায়ী খন্দক যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন কারণ নেই। যে মতপার্থক্য ছিল, তা ছিল বছর শুরু করার ক্ষেত্রে দুইটি ভিন্ন গণনার মধ্যে এবং এ মতপার্থক্যটি অতি শীঘ্রই দূর হয়ে গিয়েছিল।

ঘেরাও-এর সময়কাল

ঘেরাও-এর সময়কাল নিয়ে যে মতপার্থক্য দেখা যায়, তার কারণ বাহ্যত: এই মনে হয় যে, খুব সম্ভবত: সব হামলাকারী একই দিনে অকুস্থলে পৌঁছে নি। তাদের আগমনের মধ্যে অগ্রপাশ্চ্যৎ কমবেশী ফাঁক থেকে থাকবে। আর সকলের আগমনের পরই সব দলের অধিনায়করা হামলার একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা তৈরীর জন্য একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হয়ে থাকবে। এরপর মদীনায় পৌঁছেই তারা খন্দক দেখে থাকবে। এটা তাদের কাছে ছিল শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের একটি অতি অভিনব পদ্ধতি। এমতাবস্থায় তাদের জন্য এমন কোন পদ্ধতি বের করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, যার মাধ্যমে তারা মদীনাবাসীদেরকে চরম ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদের মনের খেদ মেটাতে পারে। আমার মনে হয়, ঐ সময়েই বনূ কুরায়যাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত করার পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়ে থাকবে। কেননা খন্দকের কারণে মুসলমানদের উপর সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করার সকল পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মোটকথা, কেউ কেউ ঘেরাও-এর সময়কাল নির্ণয় করেছেন সেদিন থেকে যেদিন শত্রুপক্ষের প্রথম দলটি মদীনায় উপনীত হয়। আবার কেউ কেউ নির্ণয় করেছেন তখন থেকে, যখন সকল দল একত্রিত হয়ে যুদ্ধ শুরু করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অতএব বলা যায়, এই মতপার্থক্য প্রকৃতপক্ষে কোন মতপার্থক্যই নয়।

শেষ পর্যন্ত এটাই সঠিক মনে হয় যে, যুদ্ধ শুরু হয়েছিল শাওয়ালের শেষ দিকে এবং শেষ হয়েছিল এর চব্বিশ দিন পর। আর সেটা ছিল ২৩ যীকাদ হিজরী ৫ সন, রোজ বুধবার।

য়াহূদী ও মুশরিকদের ষড়যন্ত্র

এই যুদ্ধের মূল হোতা ছিল বনী নাযীর গোত্রের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আর তারা হচ্ছে, সাল্লাম বিন আবিল হাকীক নাযরী, হুয়াই বিন আখতাব নাযরী এবঙ কিনানা বিন আর বারী বিন আবিল হুকায়ক নায্রী। অবশ্য হাওযাহ বিন কায়স ওয়াইল এবং আবূ আম্মারী ওয়াইলীও তাদের সহযোগী ছিল।

বনী নাযীর গোত্রকে রাবীউল আউয়াল, হিঃ ৫ সনে। (মুতাবিক আগষ্ট, ইং ৬২৫ সনে) মদীনা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল এজন্য যে, তাদের অনবরত: ফিতনাবাজী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে মদীনায় মুসলমানদের জীবন ধারণ একেবারে অসহ্যকর হয়ে উঠেছিল। মদীনা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর তাদের অধিকাংশ লোক খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। কেউ কেউ আবার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। তারা যে যেখানে বসবাস করুক না কেন, মুসলমানদের প্রতি তাদের অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন যথারীতি প্রজ্বলিত থাকে। আর এ কারণেই তারা প্রথমে মক্কায় গিয়ে কুরায়শকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানায়। কুরায়শরা যেহেতু মুশরিক, তাই তারা য়াহূদীদেরকে তখন জিজ্ঞাসা করে, তোমরা তো তাহলে কিতাব। আচ্ছা এবার বলো তো, আমাদের দ্বীন শ্রেষ্ঠ, না মুহাম্মদের দীন? তখন ঐ য়াহূদীরা কুরায়শদেরকে তোষামদ করতে গিয়ে নির্দ্বিধায় জবাব দেয়, তোমাদের দ্বীন নিশ্চিতভাবে মুসলমানদের দ্বীনের চাইতে শ্রেষ্ঠ। পবিত্র কুরআনে তাদের একথার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে–

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ
وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ أَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا. أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ
لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ط وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا.

"আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল; তাবা 'জিবত' (প্রতিমা তথা আল্লাহ্ ছাড়া সব পূজ্য সত্তা) ও তাগূতে (শয়তান ও কল্পিত দেবদেবী এবং এমন সব উপায়-উপকরণ যা মানুষকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করে) বিশ্বাস করে? তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, এদেরই পথ মুমিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর। এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন এবং আল্লাহ্ যাকে লা'নত করেন আপনি কখনো তার কোন সাহায্যকারী পাবেন না।" (৪ ঃ ৫১-৫২)

যাহোক, কুরায়শদেরকে স্বমতে টেনে আনার পর ঐসব য়াহূদী গিতফান গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে যায় এবং তাদেরকেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তারা তাদেরকে বিভিন্ন প্রলোভনও দেখায়। শেষ পর্যন্ত গিতফান গোত্র যখন জানতে পারে যে, কুরায়শ এবং য়াহূদীরা সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাবে তখন তারাও তাদের সাথে যোগদান করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

এটা তো জানা কথা যে, আরবের প্রায় সকল গোত্র একত্রিত হওয়ায় নিঃসন্দেহে তারা এক বিরাট সমরশক্তি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করবে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে উন্মুক্ত মাঠে তাদের মুকাবালা করা মোটেই সহজ হবে না। এ ক্ষেত্রে আর একটি বিপদ এই ছিল যে, নাযীর গোত্রের স্বধর্মীয় বনী কুরায়যা গোত্র তখন মদীনাইয় অবস্থান করছিলো এবং তাদের এমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না যে, সুযোগ পেলে তারা মুসলমানদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

চতুর্দিকে যখন মুসলিম বিরোধী বিদ্বেষ ও শত্রুতার ঘন্টাধ্বনি শুনা যাচ্ছিলো এবং মুসলমানদেরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলীন করে দেওয়ার জন্য আকাশের ঘনঘটার ন্যায় দলে দলে শত্রুরা মদীনার দিকে ধেয়ে আসছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। শহরের পূর্বে পশ্চিম এবং

দক্ষিণ দিক থেকে শত্রু হামলার সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। কেননা ঐ তিন দিকে ঘন খেজুর বাগান ছিল, যার মধ্য দিয়ে সম্মিলিত ভাবে অগ্রসর হয়ে কোন বিরাট বাহিনীর শহর পর্যন্ত পৌঁছা মোটেই সম্ভব ছিল না। আর সম্মিলিতভাবে না এসে এক একজন করে সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হলে তাদেরকে মুসলমানরা রাস্তার মধ্যেই অনায়াসে খতম করে দিতে পারত। শুধুমাত্র উত্তর দিক থেকে আগত সম্মিলিত শত্রুবাহিনীকে প্রতিরোধ করা ছিল খুবই কঠিন। তাই পরস্পর শলা-পরামর্শের পর শত্রুর আক্রমণ থেকে সে দিকটি রক্ষার ব্যাপারে হযরত সালমান ফারসী (রা) যে প্রস্তাব পেশ করেন তা হলো, সেদিকে এমন ধরনের পরিখা (খন্দক) খনন করা, যা শত্রুরা সহজে ডিংগাতে না পারে। এই প্রতিরক্ষা পদ্ধতি অনেক পূর্ব থেকেই ইরানে প্রচলিত ছিল। যাহোক আরবে অভিনব হলেও হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বিরাট শত্রুবাহিনীর সম্মিতি আক্রমণ প্রতিরোধ করার, এটা ছিল নিঃসন্দেহে একটি অতি উত্তম ও কার্যকর পদ্ধতি। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, হামলাকারীদের কেউ কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে ঐ পরিখা ডিংগাতে পারত। তবে যারা ডিংগাত তাদেরকে অতি সহজেই খতম করা যেত, যেমন বাস্তবে করা হয়েছিল। আর সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার এই ছিল যে, পরিখা খননের ফলে শহরে নৈশ আক্রমণের কোন আশংকাই আর বাকি থাকল না। কোন কোন রিওয়ায়াত্ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ এই সময়ে শত্রুদের নৈশ আক্রমণের আশংকা প্রকাশও করেছিলেন।

খন্দক

এই লাইনগুলো যখন (ইং ১৯৬৯ সন) লেখা হচ্ছে তখন থেকে ঠিক এক হাজার তিনশ বিয়াল্লিশ বছর পূর্বে খন্দকের ঘটনা ঘটেছে। অতএব এই দীর্ঘ সময় পর ঐ খন্দকের কোন চিহ্ন কি বাকি থাকতে পারে? আর এ কারণে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে, সেটা কি পরিমাণ দীর্ঘ, কি পরিমাণ চওড়া বা কি পরিমাণ গভীর ছিল। তবে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে এ ব্যাপারে আন্দাজ-অনুমান করেছেন। যেমন–

১। দশ জনের প্রত্যেকটি দলের উপর চল্লিশ দিরা' তথা ফিট বা বিশ গজ পরিখা খননের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। মোট তিন হাজার লোক একাজে শরীক ছিলেন এবং মোট ছয়দিনে পরিখা খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।[৭]

২। প্রত্যেক দশজনের উপর বিশগজ জায়গা খনন করার দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার ভিত্তিতে ডক্টর হামীদুল্লাহর অনুমান এই যে, পরিখাটির দৈর্ঘ্য ছিল ছয় হাজার গজ-আনুমানিক সাড়ে তিন মাইল। আর যেহেতু শত্রুবাহিনীর অশ্বারোহীরা ঘোড়া ছুটিয়ে খন্দক অতিক্রম করতে সাধারণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল এবং তা করতে গিয়ে একবার এক অশ্বারোহী খন্দকের মধ্যে পতিতও হয়েছিল, তাই অনুমান করা যায় যে, খন্দকটি দশগজ চওড়া ও দশগজ গভীর হয়ে থাকবে।[৮]

৩। একটি সাম্প্রতিক অনুমান অনুযায়ী খন্দকের দৈর্ঘ্য ছিল পাঁচ হাজার দেরা' (হাত) অর্থাৎ সাড়ে সাত হাজার ফুট তথা এক মাইল সাতশ চল্লিশ গজ। আর গভীরতা ছিল সাত দেরা' বা সাড়ে দশ ফুট। এবং প্রস্থ ছিল নয় দেরা' বা সাড়ে তের ফুট।[৯] অবশ্য এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, খন্দক হাররা-ই-শারকীর সেই স্থান থেকে শুরু হয়েছিল, যাকে 'শায়খাইন' বলা হত এবং জাবালে সিলা' পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। ডক্টর হামীদুল্লাহ্ বলেন, বিভিন্ন মহল্লার বাসিন্দারা নিজেদের হিফাযতের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে আরো কয়েকটি পরিখা খনন করে সেগুলোকে মূল পরিখার সাথে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে শহরের পশ্চিম দিকেও দু'আড়াই মাইল দীর্ঘ পরিখা খনন করা হয়েছিল। তাছাড়া মদীনার কোন কোন দুর্গ সদৃশ ইমারতের চারপাশেও খন্দক খনন করা হয়েছিল। যেমন ওয়াকিদীর বর্ণনানুযায়ী, কুবায়ও কোন কোন সম্প্রদায় তাদের দুর্গ সদৃশ দালান রক্ষার জন্য কিছু কিছু পরিখা তৈরী করে নিয়েছিল।[১০]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কর্মতৎপরতা

পরিস্থিতি ছিল খুবই সঙ্কটপূর্ণ। মদীনা মুনাওওরায় ছিল তখন ভরা শীতের মওসুম। খাদ্য দ্রব্যের ছিল বিরাট ঘাটতি। তাছাড়া খন্দক খননের জন্য না ছিল কোন চাকর-ভৃত্য, আর না ছিল কোন শ্রমিক-মজুর। সত্যের পথে যে

সব মুজাহিদগণের বিরাট শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে মুখামুখি লড়ার কথা, সেই তারাই খন্দক খননের কাজে দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। কাজের গুরত্বের দিক বিবেচনা করে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বক্ষণ সেখানে হাযির ছিলেন। তাঁর জন্য খন্দক সংলগ্ন জাবালে যুবাবে একটি পৃথক তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। তিনি সাহাবীদের মতই সর্বক্ষণ মাটি খনন এবং সেই মাটি মাথায় করে বাহিরে নিক্ষেপ করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। জানা যায় যে, অনবরত: কাজের তত্ত্বাবধান, রাত্রি জাগরণ এবং অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে গিয়ে নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েন। হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) তাঁর শিয়রে গিয়ে দাঁড়ান যেন লোকজন তাঁর কাছে না আসতে পারে বা পাশ দিয়ে না যেতে পারে। এতে তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এভাবে হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও অন্যান্য সাহাবীরা কাপড়ের মধ্যে মাটি ভরে চুপি সারে সেগুলো পরিখার বাইরে নিয়ে ফেল্‌ছিলেন।

সহীহ বুখারীতে আছে, একদিন পরিখার মধ্যে এমনি শক্ত এক খন্ড মাটি বেরিয়ে পড়ে যে, তার উপর কোদাল চলছিলো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং পরিখার মধ্যে অবতরণ করেন। তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল, কেননা তিনি তিন দিন যাবত কিছুই খান নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোদাল চালালে ঐ শক্ত মাটি ঝুরঝুরে বালুকা রাশিতে পরিণত হয়।[১১]

খোঁড়া মাটি সম্ভবত: পরিখার পাশেই নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং এতে পরিখার গভীরতা নিশ্চয়ই আরো কয়েক ফুট বেড়ে গিয়েছিল।

মোটকথা, মূল পরিখা বা খন্দক, যা শহরের প্রতিরক্ষার জন্য তৈরী করা হয়েছিল তা হাররা-ই-শারকী থেকে জাবালে সিলা' পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। তাছাড়া মদীনার অধিবাসীরা আপন আপন ঘরের হিফাযতের জন্য পশ্চিম দিকে কিছু কিছু পরিখা খনন করেছিলেন। এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, ওয়াদিয়ে বুতহান, যা শহরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছিলো, তা আপন গতি পরিবর্তন করে ঐ স্থান দিয়ে অতিক্রান্ত হতে থাকে যেখান দিয়ে খন্দক খনন করা হয়েছিল।[১২]

শত্রুবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা

শত্রুবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। তবে তাদের সংখ্যা যে কমপক্ষে দশ হাজার ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।[১৩] এক রিওয়ায়াতে আছে, শত্রুবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল চব্বিশ হাজারেরও অধিক।[১৪]

ইতিহাস গ্রন্থাদিতে শত্রুবাহিনীর কিছু কিছু বিস্তারিত বিবরণও রয়েছে। যেমন ঃ

১। কুরায়শ এবং তাদের মিত্র আরবদের সংখ্যা ছিল চার হাজার। তাদের অধিনায়ক ছিল আবূ সুফ্য়ান বিন হারব। তাদের সাথে ছিল তিনশ ঘোড়া ও দেশ হাজার উট।

২। বনূ সুলায়ম মাররায যুহরানে (বর্তমান ওয়াদিয়ে ফাতিমায়) কুরায়শের সাথে মিলিত হয়। তাদের সংখ্যা ছিল সাতশ এবং অধিনায়ক ছিল সুফ্য়ান বিন আবদে শামস।

৩। ফাযারাহ (গিতফান) গোত্রের শক্ত-সমর্থ সব পুরুষই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের অধিনায়ক ছিল উয়ায়নাহ বিন হিস্‌ন এবং তাদের সংগে ছিল এক হাজার উট।

৪। বনূ মুররা গোত্রের সৈন্য সংখ্যা ছিল চারশ এবং তাদের অধিনায়ক ছিল হারিছ বিন আউফ।

৫। আশজা' গোত্রের সৈন্য সংখ্যা ছিল চারশ এবং তাদের অধিনায়ক ছিল মাসউদ রুখায়লা।

৬। বনূ আসাদ গোত্রের অধিনায়ক ছিল তালহা বিন খুভায়ল আল আসদী।[১৫]

আরো কয়েকটি গোত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের বিস্তারিত তথ্য জানা যায় নি। পরস্পর শলা-পরামর্শের পর সবগুলো দলকে মোট তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা ঃ

১। কুরায়শ এবং তাদের মিত্ররা। অধিনায়ক আবূ সুফ্য়ান বিন হারব।

২। গিত্ফান গোত্র। অধিনায়ক উয়ায়নাহ্ বিন হিসন ফাযারী।

৩। বনূ আসাদ। আধিনায়ক তালহা বিন খুভায়লদ। আবূ সুফ্য়ানকে সমগ্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মনোনীত করা হয়।

শত্রুবাহিনীর অবস্থান স্থল

এরূপ একটি বিরাট বাহিনীর কোন একটি জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না বলে তাদের জন্য দুটি অবস্থানস্থল নির্ধারণ করা হয়। কুরায়শ বাহিনী বি'-রে রূমার উত্তরে সেই জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করে, যেখানে ওয়াদিয়ে কানাত ও ওয়াদিয়ে আকীক একত্রে মিলিত হয়েছে। উহুদ যুদ্ধেও কুরায়শরা এই জায়গায়ই অবস্থান গ্রহণ করেছিল। গিতফান এবং তার মিত্ররা জাবালে উহুদের পশ্চিম পার্শ্বের সেই জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করে যেখানে ওয়াদিয়ে কানাত ও ওয়াদিয়ে বুতহান একত্রে মিলিত হয়েছে। এই জায়গার নাম ছিল 'যান্বে নাকমী'।

এভাবে দুটি বাহিনী একে অন্যের কাছাকাছি ছিল, আবার একে অন্য থেকে পৃথকও ছিল।

মানচিত্র সামনে রেখে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মদীনা মুনাওওরায় সমগ্র বসতির (বা মহল্লার) মধ্য থেকে দু'টি বসতি খন্দকের বাইরে রয়ে গিয়েছিল। একটি বসতির নাম ছিল মানাযিলে বনী হারিছা। এর অবস্থান ছিল মানাযিলে আবদুল আশহালের উত্তরে হাররা-ই-শাবকীর উপর। অপর বসতির নাম ছিল ইয়াছরিব। যার কারণে এর আশে পাশের অন্যান্য বসতিকেও বাইরের লোকেরা ইয়াছরিবই বলত। এটা ছিল জাবালে সিলা'-এর উত্তর পশ্চিম প্রান্তে এবং এখনো সেখানেই আছে। এখানে ছিল ঘন বাগবাগিচা এবং এখনো তা-ই আছে। এই বসতির উত্তর দিক দিয়ে ওয়াদিয়ে কানাত এবং পশ্চিম দিক দিয়ে ওয়াদিয়ে বুতহান চলে গেছে। এ দু'টি ওয়াদী ইয়াছবিরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে পরস্পর মিলিত হয়েছে। আবদুল কুদ্দুস আনসারী 'আছারুল মাদীনাতিল্ মুনাওওরা' নামক যে গ্রন্থটি ইং ১৯৩৫ সালে প্রকাশ করেছিলেন তাতে একটি মানচিত্র সংযুক্ত ছিল এবং ঐ মানচিত্রে মদীনার সমগ্র বসতির অবস্থান স্থল চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাতে ইয়াছরিবের অবস্থান স্থল ঠিক সেরূপ, যেরূপ উপরে বর্ণিত হয়েছে।[১৬] ইং ১৯২৫ সনে এই লেখকের, মদীনা মুনাওওরা যিয়ারতের সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন আমাকে জাবালে সিলা' থেকে ইয়াছরিবের অবস্থান ঠিক ঐ দিকেই নির্দেশ করা হয়েছিল, তবে সেদিকে যাওয়ার অবকাশ আমি তখন পাই নি।

এই সমস্ত বসতিকে এ কারণে বাইরে রাখা হয়েছিল যে, সেগুলোকে খন্দকের অন্তর্ভুক্ত করা হলে আরো অনেক আগে বেড়ে পরিখা খনন করতে হত এবং এতে খন্দকের দৈর্ঘ্য এত অধিক বেড়ে যেত যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা খনন করা সম্ভব হয়ে উঠত না। অতএব বলা যেতে পারে যে, অনুরূপ ধরনের খন্দক খনন করা হলে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখিত বসতির জন্য তা উপকারী প্রমাণিত হলেও মদীনা মুনাওওরার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে পড়ে যেত।

আমার বেশ কয়েকবার মনে হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের নিম্নের আয়াতটি সম্ভবত: ঐ বস্তিরই কোন এক দল লোককে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে, যে বস্তির নাম ছিল ইয়াছরিব এবং আজো তা সেই নামেই পরিচিত। আয়াতটি হলো–

اِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ج وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَّمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا .

"এবং ওদের একদল বলেছিল, হে ইয়াছরিববাসী, 'এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল,' এবং ওদের একদল নবীর কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিলো, 'আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত, অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য।" (৩৩ ঃ ১৩)

পরীক্ষার ভয়ানক মুহূর্ত

সেই সময়ের অবস্থা ছিল হতবুদ্ধি হওয়ার অবস্থা। এমন এক বাহিনী আক্রমণে এসেছে, যার মত বিরাট বাহিনী ইতিপূর্বে ভূখণ্ডে কখনো জমায়েত হয়নি। তাদের মুকাবালায় কেবল তিন হাজার মুজাহিদ ছিল, আর তারা প্রথমেই খন্দক খনন করতে গিয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত ছিলেন। উপরন্তু ভয়ানক ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে তাঁরা এখানে সেখানে খন্দকের পাহারায় রত, যাতে শত্রুরা কোন দিক দিয়ে মদীনার ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। তাছাড়া তাঁরা একথাও জানতে পারছিলেন না, বিদ্বেষ ও শত্রুতার এই ঝড় কতদিন পর্যন্ত মদীনাকে ঘিরে রাখবে। অপর দিকে বনূ কুরায়যাও এক ভয়ংকর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা অত্যন্ত শান্তি ও স্বস্তির সাথে মদীনার পূর্ব প্রান্তের ওয়াদিয়ে মাহযূর-এর দক্ষিণ কোণে অবস্থান করছিল এবং মদীনার প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সাথে লিখিত চুক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা এ ব্যাপারে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছিলো না, অথচ তাদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক যোদ্ধা ছিল এবং যুদ্ধ-সামগ্রীর কোন ঘাটতিও তাদের ছিল না। ঐ মুহূর্তে তারা শত্রুর সাথে যোগ দিলে পুরো ইয়াছরিব এলাকার বসতিসমূহ দারুণ বিপদের মধ্যে পতিত হত। তারা তলে তলে এজন্য তৈরীও হয়ে গিয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঠিক সেই মুহূর্তে কল্পনাতীতভাবে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়ায় তাদের সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। এ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

মোট কথা, তখন সত্যানুসারীদের জন্য সেই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, যার চিত্র পবিত্র কুরআনের ভাষায় ছিল নিম্নরূপ–

اِذْ جَاءُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا . هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا .

"যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।" (৩৩ ঃ ১০ -১১)

মুমিনের মহত্ত্ব

কিন্তু মুমিনগণের জন্য এ ধরনের অগ্নি পরীক্ষার মুহূর্তগুলো মূলত: ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার ও তা সুদৃঢ় হওয়ার মুহূর্ত হিসাবে পরিগণিত হয়। পবিত্র কুরআন বলে–

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَاوَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا . مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً . لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ .

"মুমিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, ওরা বলে উঠল, 'এটা তো তা-ই, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন।' আর এতে তাদের ঈমান ও

আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল। মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, ওদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করে নি, কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন। (৩৩ ঃ ২২ - ২৪)

যুদ্ধের অবস্থা

মোট কথা, শত্রুরা মদীনা মুনাওওরায় পৌঁছার পূর্বেই খন্দক নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। মহিলা ও শিশুদেরকে মদীনার দুর্গ সদৃশ ইমারতগুলোতে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আবদুল্লাহ্ বিন মাকতূম (রা) এর হাতে মদীনা মুনাওওরার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিন হাজার মুজাহিদ সংগে নিয়ে খন্দকের উপর সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ছিল জাবালে সালা'-এর সন্নিকটে। কেননা উত্তর পশ্চিম দিক থেকেই শত্রুদের আক্রমণের আশংকা ছিল সবচাইতে বেশী। কেননা এ দিকেই তারা অবস্থান নিয়েছিল। সাহাবা কিরাম (রা) এর বিভিন্ন দলকে খন্দকের বিভিন্ন অংশের পাহারায় নিয়োগ করা হয়। তবে খন্দক দেখার সাথে সাথে শত্রুরা তাদের সম্মিলিত আক্রমণের আশা ছেড়ে দেয় এবং কুরায়শের মধ্য থেকে আবূ সুফ্য়ান, খালিদ বিন অলীদ, আমর বিন আস, হুবায়রা বিন আবী ওয়াহয়ব এবং যিরার বিন খাত্তাব ফিহ্‌রী পালাক্রমে আপন আপন বাহিনী নিয়ে খন্দকের কাছে এসে মুসলমানদের উপর হামলা চালাতে থাকে। একদিন একদল খন্দকের কাছে আসলে অপর দিন আসত অন্য দল। তবে এই যুদ্ধ তীর নিক্ষেপ ও অগ্নিগোলা নিক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য ওয়াহশী একদিন সেই অস্ত্রও ব্যবহার করেছিল, যার আঘাতে হযরত হামযা (রা) শাহাদত বরণ করেছিলেন।

কখনো কখনো কুরায়শের কোন কোন যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে খন্দকের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করে যেত, যাতে খন্দকের কোথাও চওড়া কম দেখা গেলে ঘোড়া ছুটিয়ে সেদিক দিয়েই খন্দক অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করা যায়।

আমর বিন আব্‌দে ওয়াদ্দকে হত্যা

একদিন ইকরামা বিন আবূ জাহল্, নওফল বিন আবদুল্লাহ্, যারার বিন খাত্তাব ফিহ্‌রী, হুবায়রা বিন আবী ওয়াহাব এবং আমর বিন আবদে ওয়াদ্দ্ খন্দক ডিংগিয়ে অভ্যন্তরে চলে আসে এবং ইবনে আবদে ওয়াদ্দ্ তার সাথে মুকাবেলা করার জন্য মুসলমানদেরকে আহ্বান জানায়। সে ছিল আরবের বিখ্যাত বীরদের অন্যতম। তাকে এক হাজার অশ্বারোহীর সমতুল্য মনে করা হত। যদিও তার বয়স হয়েছিল নব্বই বছর; তবু সবাই তাকে ভয় করত। হযরত আলী (রা) তার সাথে মুকাবালার জন্য বের হন।

ইবনে আবদে ওয়াদ্দ্ বলত, যদি কোন ব্যক্তি আমার কাছে বিকল্প তিনটি কথার আবেদন জানায় তাহলে আমি এর একটি অবশ্যই মঞ্জুর করবো। হযরত আলী (রা) ঐ মুহূর্তে তার ঐ কথাটি তার দ্বারাই পুনরায় সত্যায়িত করিয়ে নেন। এরপর তিনি সর্বপ্রথম তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। ইবনে আবদে ওয়াদ্দ বলে, এটা হবে না। দ্বিতীয়বার হযরত আলী (রা) তাকে যুদ্ধ থেকে ফিরে যাবার আহ্বান জানান। এ আহ্বানও ইবনে আবদে ওয়াদ্দের মন:পূত হয় নি। তৃতীয় আবেদন তো এছাড়া আর কিছুই হতে পারত না যে, 'তুমি মুকাবালার জন্য তৈরী হয়ে যাও।' ইবনে আবদে ওয়াদ্দ তখন হেসে হেসে বলল, আমি তো কখনো কল্পনাও করতে পারি নি যে, এই আকাশের নীচে কোন ব্যক্তি আমার কাছে এই আহ্বানও জানাবে।

ইবনে আবদে ওয়াদ্দ ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে এবং জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? যখন হযরত আলী (রা) নিজের পরিচয় দেন তখন সে বলে, না, আমি তোমার সাথে লড়তে চাই না। হযরত আলী (রা) বলেন, আমি তো লড়তে চাই। আবদে ওয়াদ্দ একথা শুনে ক্রোধ ভরে তরবারি দ্বারা হযরত আলী (রা) এর মাথায় আঘাত করে। হযরত আলী (রা) ঐ আঘাত ফিরিয়ে দেন বটে, তবে তাতে ঢাল কেটে গিয়ে তার ললাটের উপর একটি ক্ষত চিহ্ন পরিষ্কার ফুটে উঠে।

মরহুম মাওলানা শিবলী বলেন, 'কামূস'-এর মধ্যে আছে, হযরত আলী (রা) কে 'যুলকার নাইন'-ও বলা হত। এটা এ কারণে যে, তাঁর ললাটের উপর দুটি ক্ষত চিহ্ন ছিল। একটি ছিল আমর বিন আবদে ওয়াদ্দ এর হাতের এবং অপরটি ছিল ইবনে মুলজিমের হাতের।[১৭] এরপর হযরত আলী (রা) আপন তরবারি দ্বারা আমর বিন আবদে ওয়াদ্দকে আঘাত করেন। এতে তার কাঁধ কেটে গিয়ে নীচে নেমে যায় এবং সে সঙ্গে সঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। তখন হযরত আলী (রা) সজোরে 'আল্লাহু আকবর' (আল্লাহ্ মহান) ধ্বনি তুলেন।

এবার যারার ও হুবায়রা আক্রমণ চালায়। কিন্তু 'যুলফিকার' [আলী (রা) এর তরবারি] যখন গর্জে উঠে তখন তারা পিছাতে থাকে। নওফল তো পালিয়ে গিয়ে খন্দকে পতিত হয়। সাহাবীরা তাকে লক্ষ্য করে অনবরত: তীর ছুড়তে থাকেন। তখন সে বলতে থাকে, ' হে মুসলমানগণ, আমি আভিজাত্যের মৃত্যু চাই, এভাবে মরতে চাই না।' হযরত আলী (রা) তার ঐ আবেদন মঞ্জুর করেন এবং খন্দকে অবতরণ করে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেন। বলা বাহুল্য, এটাই ছিল তৎকালীন আরবদের কাছে অভিজাত্যে মৃত্যু।[১৮]

টীকা ঃ

(১) এটাকে গাযওয়া-ই-খন্দক এজন্য বলা হয় যে, এই যুদ্ধে মুসলমানরা তাদের প্রতিরক্ষার জন্য খন্দক বা পরিখা খনন করেছিল। আরবদের কাছে এটি ছিল যুদ্ধের একটি অভিনব পদ্ধতি। আর আহযাব, 'যিব'- এ-র বহুবচন। হিযব অর্থ দল। যেহেতু এই যুদ্ধে আরবের অনেক গোত্র তথা অনেক দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তাই এটাকে 'গাযওয়া-ই-আহযাব' বলা হয়।

(২) ইংরেজী পঞ্জীকা অনুযায়ী ইং ৬২৩ সনের মার্চ মাসের শেষ দিকে শুরু হয়। ডাঃ হামীদুল্লাহ্ অনেক চিন্তা গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এই যুদ্ধ ইং ৬২৭ সনের মার্চ মাসের প্রথম দিকে শুরু হয়েছিল।

(৩) তাবাকাতে ইবনে সা'দ (বাইরুতে মুদ্রিত)ঃপৃষ্ঠা-৭৩।

(৪) তাবাকাত ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা -৬৭ (৩১ মার্চ, ইং ৬২৭ সন)।

(৫) তাবাকাত ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা- ৭০।

(৬) মুতাবিক ১৫ এপ্রিল, ইং ৬২৭ সন রোজ বুধবার।

(৭) তারারী এবং আরো কিছু গ্রন্থে এই তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। ডঃ হামীদুল্লাহ্ বলেন, কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী, খননের কাজ তিন সপ্তাহ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল (আহদে নবভীকে ময়দানে জঙ্গঃ পৃষ্ঠা- ২৯) আমার ধারণা, মূল পরিখার খনন কাজে তিন সপ্তাহ লাগেনি, বরং মূল পরিখা খনন করার পর শহরবাসীরা নিজেদের ঘরবাড়ীর হিফযেতের জন্যও কিছু কিছু পরিখা খনন করেছিলেন এবং মূল পরিখার সাথে এই সমস্ত পরিখা খনন করতে গিয়ে সর্বমোট সময় লেগেছিল তিন সপ্তাহ।

(৮) আহ্দে নবভীকে ময়দানে জঙ্গ পৃষ্ঠা -২৭।

(৯) ফুসূলুন মিন তারীখিল মাদীনাতিন নবভীয়াহঃ পৃষ্ঠা-২৭।

(১০) আহদে নবভীকে ময়দানে জঙ্গ।

(১১) বুখারীঃ কিতাবুল মাগাযী ঃ গাযওয়াই-খন্দক।

(১২) আহদে নবভীকে ময়দানে জঙ্গঃ পৃষ্ঠা -২৭।

(১৩) তাবাকাতে ইবনে সা'দঃ তৃতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা-৬৬।

(১৪) ফাতহুল বারীঃ বরাত–সীরাতুন্নবীঃ প্রথম খন্ডঃ পৃষ্ঠা-৬৬।

(১৫) তাবাকাতে ইবনে সা'দঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা-৬৬।

(১৬) আছারুল মদীনাতিল মুনাওওরাঃ পৃষ্ঠা-১৫৫।

(১৭) সীরাতুন্নবীঃ প্রথম খন্ডঃ পৃষ্ঠা-৩৯৩।

(১৮) সীরাতুন্নী ১ম খন্ডঃ পৃষ্ঠা- ৩৯৩।

খন্দক যুদ্ধ–২

তাবাকাতে ইবনে সা'দে আছে, ইবনে আবদে ওয়াদ্দের সঙ্গীরা তার এই অবস্থা দেখে উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে থাকে। ওরা যেহেতু ঘোড়ার পিঠে ছিল, তাই মুসলমানরা তাদেরকে ধরতে পারে নি। যুবায়র বিন আওয়াম নওফল বিন আবদুল্লাহ্‌র উপর আক্রমণ চালান এবং তরবারির একই আঘাতে তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলেন।[১]

অপর একটি বর্ণনায় আছে, নওফল বিন আবদুল্লাহ্ মাখযুমীও পালাতে থাকে। তবে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় খন্দকের মধ্যে পতিত হয়। মুজাহিদরা তখন তার উপর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকেন। সে তখন চীৎকার দিয়ে বলতে থাকে, 'এর চেয়ে আমাকে হত্যা করাই শ্রেয়।' তখন আলী (রা) খন্দকে লাফিয়ে পড়েন এবং যুলফিকারের একই আঘাতে তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলেন।

যুবায়র বিন আওয়াম ঠিক যুদ্ধের মুহূর্তে ইকরামা বিন আবূ জাহ্‌ল এবং হুবায়রাহ বিন ওয়াহবকে এমন জোর ধমক লাগান যে, তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে থাকে। তখন হুবায়রার বর্ম এবং ইকরামার বল্লম নীচে পড়ে গেলে যুবায়র (রা) সেগুলোকে উঠিয়ে নেন।[২]

'রাহমাতুল লিল আলামীন' গ্রন্থে আছে, মক্কাবাসীরা নওফলের লাশের জন্য দশ হাজার দিরহাম পেশ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, লাশ দিয়ে দাও, মূল্যের কোন প্রয়োজন নেই।[৩]

শক্ত মুকাবালা

যেদিন আমর বিন আবদে ওয়াদ্দ্ এবং নওফল বিন আবদুল্লাহ্ নিহত হয় তার পরের দিন কুরায়শ জোরপূর্বক তাদের লাশগুলো উঠিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য তারা একটি বিরাট বাহিনী খন্দকের অপর পার্শ্বে মোতায়েন করে। যে জায়গায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবস্থান করছিলেন সেদিকে কুরায়শের সৈন্য সংখ্যাও ছিল বেশী। খালিদ বিন ওয়ালীদও ঐ বাহিনীতে ছিলেন। তিনি তখন পর্যন্ত মুসলমান হন নি। মরহুম মাওলানা শিবলী বলেন, "এটি ছিল একটি কঠিন দিন। সারা দিনই লড়াই অব্যাহত থাকে। কাফিররা তাদের দিকে থেকে অনবরত: তীর ও পাথর বর্ষণ করছিলো। এক মূহূর্তের জন্যও তাতে কোন বিরতি ছিল না। এটি এমন একটি দিন, যার কথা হাদীস সমূহে উল্লেখিত আছে। একমাত্র এই দিনেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পর পর চার ওয়াক্তের সালাত কাযা হয়েছিল। কেননা অনবরতঃ তীর ও পাথর বর্ষিত হওয়ার ফলে নিজের জায়গা থেকে নাড়াচড়া করাও তাঁরপক্ষে ছিল অসম্ভব।"[৪]

মোটকথা, সন্ধা পর্যন্ত এই উত্তেজনা অব্যাহত থাকে। এরপর কুরায়শ তাদের অবস্থানে ফিরে যায় এবং মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর তাঁবুর দিকে ফিরে আসে। শুধুমাত্র উসায়দ বিন হুযায়র (রা) অন্য কয়েকজন যোদ্ধার সাথে খন্দকের পার্শ্বে অবস্থান করতে থাকেন। এই সুযোগে খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং আরো কিছু লোক খন্দকের কাছে এসে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করে দেয়। তাদের সাথে হামযা (রা) এর হত্যাকারী ওয়াহশীও ছিল। সে তার ছোট বল্লমটি তুফায়ল বিন নু'মান (রা) এর প্রতি নিক্ষেপ করে, যার ফলে তিনি শহীদ হন। তুফায়ল ছিলেন বনী সালামাহ্ গোত্রের লোক। তারপর ওয়াহশী সেখান থেকে চলে যায়।[৫]

হযরত সা'দ বিন মু'আয এর আহত হওয়া

খন্দক যুদ্ধের একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা এই যে, তাতে হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা) আহত হন এবং এটাই তাঁর ওফাতের কারণে পরিণত হয়। তিনি ছিলেন আওস গোত্রের সর্দার এবং মদীনার আনসারদের মধ্যে একজন লৌহপুরুষ।

হযরত আইশা (রা) যে দুর্গ সদৃশ ইমারতে অবস্থান করছিলেন, সেখানে হযরত সা'দের পুণ্যমতী মাতাও ছিলেন। হযরত আইশা (রা) সা'দ (রা) কে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে দেখেছিলেন। তাঁর দেহের বর্মটি এত ছোট ছিল যে, তাতে তাঁর দু'টি হাতই বাইরে থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো। এটা লক্ষ্য করে হযরত আইশা (রা), সা'দ (রা) এর মাতাকে বলেছিলেন, আহা! বর্মটি যদি এই পরিমাণ লম্বা হত, যাতে ওর দু'টি হাতও তার ভিতরে ঢাকা পড়ে যেত। দুর্ভাগ্যবশত: হাববান বিন কায়স উরফে ইবনুল আরাকাহ[৬], সা'দ (রা) এর হাতের কব্জীতে তীর নিক্ষেপ করে যাতে তাঁর 'আহকাল' (সপ্তাঙ্গ শিরা) কেটে যায়।[৭] আহত হওয়ার সাথে সাথে হযরত সা'দ (রা) দু'আ করেন, 'হে আল্লাহ্! যদি আমাদের ও কুরায়শদের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে তাহলে আমাকে জীবিত রাখ। কেননা কুরায়শের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার কাছে সর্বাধিক পসন্দনীয়। ওরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে অনেক কষ্ট দিয়েছে। আর যদি কুরায়শের সাথে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় তাহলে আমাকে 'শাহাদত' প্রদান করা। আর মৃত্যুর পূর্বে বনী কুরায়যার দিক থেকে আমার চক্ষু শীতল কর।

সা'দ (রা) এর এই দু'আ আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়ে যায়। এরপর কুরায়শ আর কোন যুদ্ধ করতে পারে নি। আর হযরত সা'দের জীবন কালেই এবং তাঁরই মধ্যস্থতায় বনূ কুরায়যার বিষয়টি ফয়সালা করা হয়। তারপর সা'দ (রা) শাহাদত বরণ করেন।[৮]

গিত্ফানের সাথে বোঝাপড়া

অবস্থা এমন সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছল যে, রাসূলুল্লাহ্ (রা) ভাবতে লাগলেন, যেহেতু আনসারদের উপর এটি একটি মহা বিপদ; অতএব এই বিপদকে কোন না কোনভাবে লাঘব করার চেষ্টা করতে হবে। এই চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে তিনি গিতফান গোত্রের সাথে এই শর্তে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে চান যে, যদি তারা এখান থেকে চলে যায় তাহলে তাদেরকে মদীনা মুনাওওয়ারার উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সম্পর্কে আনসারের দুই সর্দার- সা'দ বিন মু'আয এবং সা'দ বিন 'উবাদা (রা) এর সাথে পরামর্শ করলে তাঁরা নিবেদন করেন, 'যদি এটা আল্লাহ্র নির্দেশ হয় তাহলে এটাকে অস্বীকার করার কোন ক্ষমতা আমাদের নেই। আর যদি এটা আপনার ব্যক্তিগত অভিমত হয় তাহলে বলবো, যখন আমরা কুফ্রীর অবস্থায় ছিলাম তখনও আমাদের কাছে কেউ খিরাজ (কর) তলব করার সাহস পায় নি। এখন তো ইসলাম আমাদের ভিত্তিকে অনেক মজবুত ও সুদৃঢ় করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় হে আল্লাহ্র রাসূল, আমরা কি করে অনুরূপ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারি?

রাসুলুল্লাহ্ (সা) আনসারদের এই অপূর্ব দৃঢ়তা লক্ষ্য করে তার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখেন।

বনূ কুরায়যার অবিশ্বস্ততা

ঘেরাও এর মধ্যে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেই সঙ্কটজনক মুহূর্তটি আসে, যার জন্য গোপনে গোপনে খুব সম্ভবত: প্রথম থেকেই ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছিলো। কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, খন্দকের কারণে শত্রুদের সম্মিলিত আক্রমণের কোন সুযোগই বাকী ছিল না। আর শুধুমাত্র সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করতে পারলেই শত্রুবাহিনী তাদের বিরাট জনসংখ্যা দ্বারা কোন না কোনভাবে উপকৃত হতে পারত। এমতাবস্থায় বিকল্প পন্থা ছিল মাত্র একটি। আর তা হলো, যে য়াহূদীরা কুরায়শ, গিতফান প্রভৃতি গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে তাদেরকে একথা বলা যে, "এবার তোমরা মদীনার য়াহূদীদেরকে উদ্বুদ্ধ কর, যেন তারা মদীনার অভ্যন্তরে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। এরূপ করা হলে মুসলমানরা সেদিকে ঝুকে পড়বে এবং ঠিক তখনি আমরা দলে দলে খন্দক ডিংগিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ব। আর একমাত্র এভবেই মুসলমানদের খতম করা সম্ভব।"

যাহোক, উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হুয়াই বিন আখতাব নাযরী বনূ কুরায়যার কাছে যায়। বনূ কুরায়যার সর্দার কা'ব বিন আসাদ যখন শুনতে পেল যে, হুয়াই বিন আখতাব আসছে তখন সে তার দুর্গের দরজা বন্ধ করে

দেয় এবং হুয়াই বিন আখতাব অনেক চীৎকার করা সত্বেও তা আর খুলে দেয় নি। সে ভিতর থেকে শুধু বলে, আমি মুহাম্মদ (সা) এর সাথে যে অঙ্গীকার করেছি, তা কখনো ভঙ্গ করতে পারব না। কেননা এখনো আমি তাঁর কাছ থেকে বিশ্বস্ততা ও অঙ্গীকার পালন ছাড়া অন্য কিছু পাই নি।

শেষ পর্যন্ত হুয়াই বিন আখতাব কা'ব সম্পর্কে যখন এই দুর্নাম রটনা করতে শুরু করল যে, সে অতিথির প্রতি কার্পণ্য তথা অবহেলা প্রদর্শন করছে তখন কা'ব বাধ্য হয়ে দরজা খুলে দেয়। এবার হুয়াই বিন আখতাব তাকে বলে, আমি তোমার জন্য এ যুগের সম্মান এবং মানবসমুদ্র বয়ে নিয়ে এসেছি। কুরায়শ এবং গিতফান তাদের সর্দারদের নিয়ে এখানে এসে হাযির হয়েছে। কা'ব উত্তরে বলে, তোমরা আমার জন্য এ যুগের অপমান ও লাঞ্ছনা বয়ে নিয়ে এসেছ- এসেছ এমন মেঘমালা নিয়ে, যার পানি শেষ হয়ে গেছে। এটা গর্জে এবং বর্ষণ করে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে কিছুই নেই। হে হুয়াই, তুমি আমাকে নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। শেষ পর্যন্ত হুয়াই বিন আখতাব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কা'বকে তার অঙ্গীকার ভঙ্গে রাজী করিয়ে নেয় যে, "যদি কুরায়শ এবং গিতফান মুহাম্মদ (সা) কে খতম না করে চলে যায় তাহলে আমি তোমার এই দুর্গে এসে বসে পড়ব। তখন তোমার অবস্থা যা হবে আমার অবস্থাও তা-ই হবে।"

বিজয়ের সুসংবাদ

রাসুলুল্লাহ্ (সা) যখন এই সংবাদ পান তখন তিনি আওসের সর্দার সা'দ বিন উবাদা (রা) কে প্রকৃত অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা এবং খাওয়াত বিন জুবায়র (রা) তাঁদের সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, অবস্থা যদি ভিন্নরূপ দেখ তাহলে আকারে ইঙ্গিতে কথা বলবে, যাতে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে না যায়। ঐ চার ব্যক্তি বনী কুরায়যার সর্দার কা'ব বিন আসাদের সাথে এ বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তার মনের রং বদলে গেছে। সে এখন আর সেই কা'ব নয়, যে হুয়াই বিন আখতাবকে বলেছিল, আমি মুহাম্মদ (সা) এর কাছ থেকে বিশ্বস্ততা ও অঙ্গীকার পালন ছাড়া অন্য কিছু পাই নি। সা'দ বিন মু'আয (রা) তাকে তিরস্কারও করেন এবং তাকে তার এই দুষ্কর্মের অশুভ পরিণাম সম্পর্কেও সাবধান করে দেন। কিন্তু কা'ব অঙ্গীকার ভঙ্গের আড়ালে এ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল যে, বাইরে থেকে যে বিরাট সেনাবাহিনী এসেছে, তারা মুসলমানদেরকে খতম করে তবে ছাড়বে। ফলে যে সব য়াহূদী ইতিমধ্যে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে তারা পুনরায় মদীনায় পুনর্বাসিত হবে এবং অতীতের সেই ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যও ফিরে পাবে।

যাহোক, উল্লেখিত চার ব্যক্তি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে শুধু বলেছেন আযল ও কারাহ্ গোত্রের ন্যায় বন্দ কুরায়শও বিশ্বাসভঙ্গের উদ্যোগ নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উচ্চস্বরে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়ের সুসংবাদ দেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন যা কিছু দেখছিলেন, তা অন্যরা কি করে অনুমান করতে পারত? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বনূ কুরায়যা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কুরায়শ ও গিতফানের কোন উপকার তো করতে পারেই নি, উল্টো নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল।

নুয়ায়ম বিন মাসউদ আশজায়ী' (রা)

ঠিক ঐ মুহূর্তে নুয়ায়ম বিন মাসউদ আশজায়ী' (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করেন. হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। কিন্তু আমার গোত্র বা অন্য কোন লোক একথা জানে না। এমতাবস্থায় আপনি আমার দ্বারা যদি কোন খিদমত নিতে চান তাহলে আমি সেজন্য তৈরি আছি। এক রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নুয়ায়মকে তাঁর তীক্ষ্ম বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে শত্রুদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির পরামর্শ দেন এবং সাথে সাথে একথাও বলেন, 'যুদ্ধ সাংঘাতিক প্রতারণাকারী।' যদি অবস্থা তাই হয় তাহলে তো এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপনের কোন কারণ থাকতে পারে না। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে পরাজিত করার জন্য যে কোন ধরনের কৌশল

অবলম্বন নিষিদ্ধ নয়। কেননা শত্রুকে হত্যা করা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যাদির অন্যতম। অতএব তাদের নিয়ম শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে ভাংগন সৃষ্টি করলে তাতে দোষের কিছু থাকতে পারে না। যদিও কেউ কেউ রিওয়ায়াতের এই অংশকে 'যায়ীফ' (দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য)সাব্যস্ত করেছেন; তবু একথা সঠিক বলে মনে হয় যে, নুয়ায়ম (রা) খোদ একাজটি আনজাম দিয়েছিলেন।

এর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল এই যে, নূয়য়ম নিজে থেকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছ এসেছিলেন, তাঁকে কেউ ডেকে নিয়ে আসে নি। আর একথা কারো জানাও ছিল না যে, তিনি মুসলমান হয়ে গেছেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে যে কোন দায়িত্ব পালনে সদা-প্রস্তুত রয়েছেন। দ্বিতীয়ত: ঐ মুহূর্তে মদীনায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাতে আসল করণীয় কাজ কি, তা যে কোন ব্যক্তি অনুমান করতে পারত। অর্থাৎ যখন শহরের বাইরে একটি বিরাট শত্রুবাহিনী দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই সাথে ভিতরেও একটি শক্তিশালী দল বিরোধিতার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছে তখন একজন একনিষ্ঠ মুসলমানের বা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন মানুষের এছাড়া আর কী করণীয় হতে পারে যে, সে বাইরের ও ভিতরের শত্রুদের মধ্যে বিরোধ তথা পরস্পর ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করবে? আর নুয়ায়ম (রা) তো প্রকৃতপক্ষে এ কাজটিই করেছিলেন।

শত্রুদের মধ্যে ভাংগন সৃষ্টি

নুয়ায়ম (রা) অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সূক্ষ্মদর্শী ও বিশুদ্ধচিত্ত লোক ছিলেন। তিনি স্বয়ং চিন্তাভাবনার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে প্রথম প্রথম কাউকে অবহিতও করেন নি। শত্রুদের মধ্যে কিভাবে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করতে হবে তার একটা পরিকল্পনা তিনি পূর্ব থেকেই নির্ধারন করে নেন। প্রথমে তিনি বনূ কুরায়যার কাছে যান, যাদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত বন্ধু-সুলভ। তিনি তাদেরকে বলেন, আমি শুনতে পেলাম, তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কুরায়শ ও গিতফানের সাথে যোগ দিয়েছ। আমার মতে তোমরা এটা ভাল কর নি। কেননা কুরায়শ ও গিতফান বাইরে থেকে এসেছে। তাদের পরিবার পরিজন তাদের ঘর-বাড়ীতেই রয়েছে। এখান থেকে চলে গেলে তারা শান্তি ও স্বস্তির সাথে নিজেদের ঘরে বসবাস করবে। আর এখানে তোমাদেরকে মুহাম্মদ (সা) এবং মুসলমানদের সাথেই বসবাস করতে হবে। তোমাদের সন্তান সন্ততি এবং ধন সম্পদ এখানেই রয়েছে। তোমরা বিপদে পড়লে বাইরের লোকেরা তাদের দূর দূরান্তের আবাসভূমি থেকে তোমাদের কী সাহায্য করবে? তাছাড়া এ কথার কী নিশ্চয়তা রয়েছে যে, ওরা মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা না করে এখান থেকে চলে যাবে না? এমতাবস্থায় এটাই শ্রেয় যে, তোমরা ওদের কাছে প্রতিভূ হিসাবে কয়েকজন লোক চাও, যারা একথার জামিন হবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা) এর একটা বিহিত না হবে ততক্ষণ কুরায়শ ও গিতফান এখান থেকে চলে যাবে না।

উপস্থিত অবস্থার প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে এই কর্মপন্থাটি ছিল খুবই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত; যা বনূ কুরায়যা ইতিপূর্বে উপলব্ধি করতে পারে নি। নুয়ায়মের কথায় এবার তারা এর যৌক্তিকতা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করলো।

এরপর নুয়ায়ম কুরায়শের কাছে যান এবং তাদেরকে বলেন, বনূ কুরায়যা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের উপর এখন লজ্জাবোধ করতে শুরু করেছে । এছাড়া তাদের মনে এ আশংকাও দেখা দিয়েছে যে, তোমরা মুহাম্মদ (সা) এর একটা বিহিত না করে এখান থেকে চলে গেলে তাদের অবস্থা অত্যন্ত সংগীন হয়ে দাঁড়াবে। শেষমেষ তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, প্রতিভূ হিসাবে তোমাদের কাছ থেকে কয়েকজন লোক তলব করবে। কিন্তু আমার মতে, তাদের ঐ শর্ত কবুল করা তোমাদের জন্য সমীচীন হবে না। কেননা এটাও তো সম্ভব যে, ওরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিভূ চেয়ে নিয়ে তাদেরকে মুসলমানদেরই হাতে তুলে দেবে এবং এ ভাবে নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গের অন্তত: কিছুটা ক্ষতিপূরণ করবে। এ ধরনের কথা নুয়ায়ম (রা) তার নিজের গোত্রের কাছে গিয়েও বলেন। তার এ কৌশলটি অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়। কেননা য়াহূদী ও কুরায়শের মনে এতদিন যাবৎ যে সন্দেহ-সংশয় বিরাজ করছিলো, নুয়ায়মের কথায় তা অতি শীঘ্রই একটি নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়।

অসুবিধার উপর অসুবিধা

এবার শুক্রবাহিনী বেশ কয়েকটি অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

১। বনূ কুবায়যা যেমন কুরায়শ ও গতফানের উপর ভরসা করতে পারছিলো না, তেমনি কুরায়শ এবং গিতফানও ভরসা করতে পারছিলেন না বনূ কুরায়যার উপর।

২। শত্রু বাহিনীর বিরাট সংখ্যক লোক লশকরের জন্য রসদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা দেখা দিতে শুরু করেছিল। তারা যে সব রসদ সাথে নিয়ে এসেছিল তা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল, নয়ত শেষ হওয়ার পথে ছিল এবং আরো রসদ সংগ্রহ করা ছিল খুবই কঠিন। তারা মদীনা জয়ের যে আশা নিয়ে এসেছিল, অবস্থার প্রেক্ষিতে তা এখন একটি অনিশ্চিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৩। সম্মিলিত ভাবে আক্রমণ করে একটা চূড়ান্ত ফয়সালায় যে পৌছা যাবে, খন্দক তাদের জন্য সে পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। এর উপর আর একটি মারাত্মক অসুবিধা এই দেখা দিয়েছিল যে, যুদ্ধে বহির্গত হওয়ার জন্য যখন বনূ কুরায়যার উপর চাপ সৃষ্টি করা হল তখন তারা যামানত স্বরূপ প্রতিভূ তলব করে বসল। তার উপর এই ওযরও পেশ করল যে, আজ শনিবার এবং শনিবার যুদ্ধ করা ধর্মত: তাদের জন্য নিষিদ্ধ। অতীতে নাকি শনিবারর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন না করায় তারা ঐশী শাস্তির লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিল।

য়াহূদীরা প্রতিভূ তলব করায় নুয়াযম বিন মাসউদের কথা সত্যায়িত হয়ে গেল। অতএব তারা প্রতিভূ দিতে সরাসরি অস্বীকার করল। অপর দিকে বনূ কুরায়যার কাছে একথাটি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কুরায়শ ও গিতফান তাদেরকে ধ্বংস করে নিজেদের কাজ উদ্ধার করতে চায়; তাদের (য়াহূদীদের) প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কিছুই করতে চায় না।

ভয়ংকর ঝঞ্ঝাবায়ু

কুরায়শ ও গিতফান এমনিতেই ছিল ভগ্ন হৃদয়। বনূ কুরায়যার সাহায্য-সহায়তার উপর তাদের যে আশা ভরসা ছিল, তাও শেষ পর্যন্ত অলীক প্রমাণিত হল। এরই মধ্যে এক রাতে ভয়ানক ঝঞ্ঝাবায়ু এলো, যার কারণে তাঁদের ক্যাম্প সমূহে দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি হলো। রশি ছিড়ে গিয়ে তাদের তাঁবুগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বালু ও কংকর উড়ে এসে তাদের ও তাদের জন্তু জানোয়ারের নাক কান চোখ একেবারে অকেজো করে দিল। এটা ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শেষ মার। যার ফলে শত্রুবাহিনীর বিভিন্ন দল মদীনা মুনাও্ওরা পরিত্যাগ করে নিজ নিজ আবাসভূমির দিকে ছুটে চললো। কুরায়যার লোক, যারা তখন অস্ত্র ধারণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, নিজ নিজ দুর্গে ফিরে গেল। সম্ভবতঃ তারা একথা কল্পনাও করতে পারেনি যে, তারা এক অতি নাজুক মুহূর্তে মুসলমানদের সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, সেজন্য তাদেরকে শীঘ্রই জবাবদিহি করতে হবে।

মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার এই বিরাট অনুগ্রহের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এই বলে যে—

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ رِيحًا وَّجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ط وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا .

"হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি ওদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী, যা তোমরা দেখ নি। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ভবিষ্যদ্বাণী

বুখারীতে আছে, যখন সম্মিলিত শত্রু বাহিনী বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا –"এখন আমরাই তাদের (কুরায়শের) উপর চড়াও হবো, তারা আমাদের উপর চড়াও হতে পারবে না।"৯

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পরম কৃপাগুণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এই ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত করেছিলেন। এরপর কুরায়শের পা সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে পেছনে হটতে থাকে। তাদের কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমন খালিদ বিন ওয়ালীদ ও আমর বিন আস (রা)। এরাই পরবর্তী সময়ে মিল্লাতে ইসলামিয়ার বিশ্ববিখ্যাত সমর-অধিনায়ক রূপে পরিচিত হন। ফিলিপ হিট্টি তার 'আরবের ইতিহাসে' গ্রন্থে বলেন, "খালিদ বিন ওয়ালীদ ও আমর বিন আস (রা) ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও মিসরের যে সব অভিযানে অধিনায়কত্ব করেন, সে সব অভিযান পরিচালনা করা হয় অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে। নেপোলিয়ন, হানিবল এবং আলোকজান্ডারের অভিযানসমুহের সাথে যদি এগুলোর তুলনা করা হয় তা হলে তা (খালিদ ও আমরের অভিযান) অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট নয়, বরং উৎকৃষ্টই প্রমাণিত হবে।"১০

তাঁর ছিল অপূর্ব দূরদর্শিতা ও নুবুওয়াতের এক বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে কুরায়শরা সর্বাধিক পরিমাণ যে ক্ষমতা অর্জন করতে পারত, তা খন্দক যুদ্ধে অর্জিত হয়ে গিয়েছিল। আর এক্ষেত্রে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল বনী নাযীরের য়াহূদীরা। এই পরিমাণ ক্ষমতা পুনরায় অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা বার বার বিফলতার ফলে তাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা সম্পূর্ণ উবে গিয়েছিল হ্রাস পেয়েছিল তাদের ঐতিহ্যগত প্রভাব-প্রতিপত্তি। এমতাবস্থায় পুনরায় ক্ষমতা অর্জন করা তাদের পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। হ্যাঁ, ক্ষমতা বৃদ্ধি করার এবং কুরায়শের উপর চড়াও হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা শুধু মুসলমানদের জন্যই বাকি ছিল। আর পরবর্তী এক বছরের মধ্যে সে সম্ভাবনা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেও ছিল।

একটি ঈমান বর্ধক ঘটনা

শত্রু বাহিনীর ঘেরাও চলাকালে কত যে ঈমানবর্ধক ঘটনা ঘটেছে, তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এখানে শুধু একটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ফুফু হযরত সুফিয়া (রা) অন্যান্য মহিলাদের সাথে যে দুর্গসদৃশ ইমারতে অবস্থান করছিলেন, তা ছিল বনূ কুরায়যার বসতিসংলগ্ন। মহিলাদের দেখাশুনার জন্য হযরত হাস্সান (রা) কে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছিল। যখন বনূ কুরায়যা অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য একেবারে তৈরী হয়ে গিয়েছিল তখন হযরত সুফিয়া (রা) লক্ষ্য করেন যে, জনৈক য়াহূদী তাদের ইমারতের চারপাশে ঘুরঘুর করছে। এতে তিনি নিশ্চিত হয়ে যান যে, সে তাদের উপর আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা তৈরী করছে। তিনি তখন হাস্সানকে বলেন, তুমি একে হত্যা কর, অন্যথায় সে তার ভাই-বন্ধুর কাছে গিয়ে আমাদের যাবতীয় তথ্যাদি ফাঁস করে দেবে।

এক ধরনের মস্তিষ্ক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তখন হযরত হাস্সানের মনে ভীরুতা এমনভাবে বাসা বেঁধেছিল যে, তিনি যুদ্ধের দিকে চোখ তুলেও তাকাতে পারছিলেন না। এই প্রেক্ষিতে তিনি ওযর পেশ করে বলেন, আমি যদি এই কাজ করতে পারতাম তাহলে এখানে কেন বসে থাকতাম? সংগে সংগে হযরত সুফিয়া (রা) তাঁবুর খুঁটি উপড়ে ফেলেন এবং নীচে নেমে ঐ য়াহূদীর মাথার উপর খুঁটি দ্বারা এমন জোরে আঘাত করেন যে, তাতে তার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। হযরত সুফিয়া (রা) সেখান থেকে এসে হাস্সান (রা) কে বললেন, এর অস্ত্র এবং কাপড় চোপড় ছিনিয়ে নিয়ে এসো। হাস্সান বললেন, যেতে দিন, আমার এর কোন প্রয়োজন নেই। হযরত সুফিয়া (রা) এবার বললেন, যাও, দেহ থেকে ওর মাথা বিচ্ছিন্ন করে দুর্গের নীচে নিক্ষেপ কর, যাতে য়াহূদীরা তা দেখে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। হাস্সান (রা) তা করতেও রাজী হন নি। শেষ পর্যন্ত হযরত সুফিয়া (রা) কে সে কাজটিও আনজাম দিতে হয়েছিল।

খন্দকের শহীদ বৃন্দ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ খন্দক যুদ্ধে শহীদ হন।

১। আনাস বিন আওস	(বনী আবদিল আশ্‌হাল)
২। আবদুল্লাহ্ বিন সাহল	(”)
৩। তুফায়ল বিন নু'মান	(বনী সালামাহ বিন খাযরাজ)
৪। ছা'লাবা বিন আনামাহ্	ঐ
৫। কা'ব বিন যায়দ	(বনী দীনার বিন নাজ্জার বিন খাযরাজ)

যেহেতু 'হযরত মু'আয (রা) ও খন্দক যুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাতের ফলে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে শাহাদত বরণ করেছিলেন, তাই তিনিও নিঃসন্দেহে খন্দক যুদ্ধের শহীদদের অন্যতম। তার মৃত্যুর কাহিনী গায্ওয়া-ই-বনূ কুরায়যার শেষের দিকে বর্ণিত হবে।

খন্দক যুদ্ধে কুরায়শের তিন অথবা চারজন লোক মারা গিয়েছিল। যেমনঃ

১। মুনাব্বিহ্ বিন উছমান বা উছমান বিন মুনাব্বিহ (বনী মাখযূম)।

২। 'আমর বিন আবদে ওয়াদ্দ্ (বনী আ'মির বিন লুই)

৩। জাসাল বিন 'আমর বিন আবদে ওয়াদ্দ্ (বনী 'আমির বিন লুই)

শেষ ব্যক্তির হত্যা সম্পর্কে সকল ঐতিহাসিক একমত নন। (সংকলক)

টীকা ঃ

(১) তাবাকাতঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা-৬৬।

(২) আল মুশাহিদঃ পৃষ্ঠা- ১০৮। খন্দকে লাফ দিয়ে পতিত হওয়া থেকে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, এর গভীরতা দশ গজ অর্থাৎ ত্রিশ ফুট ছিল না, বরং তার চাইতে কম ছিল।

(৩) আল মুশাহিদ ঃ পৃষ্ঠা - ১০৮।

(৪) সীরাতুন্নবীঃ প্রথম খন্ড- ৩৯৪। মাওলানা শিবলী টীকায় লিখেছেন ঃ এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চার ওয়াক্তের সালাত কাজা হয়ে থাকলে তা একই দিনে হয়েছিল, না দৈনিক এক ওয়াক্ত করে চার দিনে। 'যারকানী'তে এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

(৫) তাবাকাতে ইবনে সা'দঃ দ্বিতীয় খন্ডঃপৃষ্ঠা- ৬৮।

(৬) হাব্বানের মায়ের উপাধি ছিল আরাকাহ্। আসল নাম কালাবাহ্ থাকলেও সে আরাকাহ্ নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। এই হিসাবে হাব্বানকেও ইবনুল আরাকাহ্ বলা হত।

(৭) আকহল ঐ শিরার নাম, যাকে হাফ্ত্ আনদাম বা সপ্তাঙ্গ শিরা বলা হয়। কেননা এর মাধ্যমে সরাসরি মাথা, বুক, পিঠ এবং উভয় হাতে ও উভয় পায়ে রক্ত সঞ্চালিত হয়।

(৮) তাবাকাত, ইবনে হিশাম, জাওয়ামিউস সীরাত ইত্যাদি।

(৯) বুখারী কিতাবুল মাগাযী।

(১০) আরবের ইতিহাস (ইংরেজী) ঃ ফিলিপ হিট্টিঃ পৃষ্ঠা -১৪২।

(১১) সীরাতুন্নবীঃ প্রথম খন্ডঃ পৃষ্ঠা-৩৯৫।

মদীনাবাসী য়াহূদীদের ইতিকথা-১

মদীনার য়াহূদী

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনা মুনাও্ওরায় য়াহূদীদের তিনটি গোত্র বাস করত। যথাঃ বনূ কায়নুকা' বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যা। এদের মধ্যে বনূ কায়নুকার' কোন কৃষিক্ষেত বা বাগ-বাগিচা ছিল না। তারা হয় ব্যবসা-বাণিজ্য করত নয়ত স্বর্ণকারের কাজ করত। তাদের বাসভূমিও বনূ না'যীর কিংবা বনূ কুরায়যার ন্যায় আরবদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। বরং তারা তাদের সাথেই একত্রে বসবাস করত।[১] অবশ্য এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, বিভিন্ন জায়গায় এদের কয়েকটি শাখা গোত্র একত্রে বসবাস করত। ডক্টর হামীদুল্লাহ্ এক জায়গায় লিখেছেন, এই সব লোক মদীনার মুসলমানদের সাথ বসবাস করত। অপর জায়গায় তিনি লিখেছেন, কায়নুকা'র বসতি এখন খোলামাঠ ছাড়া কিছু নয়।[২] এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সাড়ে তেরশ বছর পূর্বে, যেখানে বনূ কায়নুকার বাসভূমি ছিল, সেখানে এরপর কোন ঘরবাড়ী তৈরি করা হয় নি। তাই সে জায়গাটি খালি মাঠের আকারে পড়ে আছে। অপর দুটি য়াহূদি গোত্র তথা বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যার বাগ বাগিচাও ছিল এবং শস্যক্ষেত্রেও ছিল। বনূ নাযীরের আবাসভূমি ছিল মদীনার দক্ষিণ প্রান্তে। ওয়াদিয়ে মুযায়নিবের উভয় পার্শ্ব, এদের বসতি দ্বারাই বিন্যস্ত ছিল। আর ঐ বসতি সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বের একটি টিলার উপর ছিল কা'ব বিন আশরাফের দুর্গ–যার ধ্বাংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান আছে। বনূ কুরায়যার বসতি বনূ নাযীরের উত্তর প্রান্তে এবং ওয়াদিয়ে মাহযূরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত।

চারিত্রিক ও পেশাগত অবস্থা

অন্যান্য য়াহূদীদের মত মদীনা মুনাও্ওরার য়াহূদীরাও বেশ সম্পদশালী ছিল। তাদের বসতিসমূহ উত্তর দিকের বাণিজ্যিক রাজপথ সমূহের উপর দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য তাদেরকে একই সূত্রে আবদ্ধ রেখেছিল এবং এই সূত্র দ্বারা প্রত্যেকটি স্থানের য়াহূদী কমবেশী উপকৃত হত। বরং এটাও বলা যেতে পারে যে, ঐ যুগে আরব ও সিরিয়ার আন্তর্জাতিক ও আন্তঃদেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য কার্যতঃ য়াহূদীরাই নিয়ন্ত্রণ করত। সেই সাথে ঐ সব চারিত্রিক ও পেশাগত ব্যাধিসমূহও তাদের মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, যা সর্ব যুগে ও সর্বকালে প্লেগ ও কলেরার ন্যায় মানবজাতির ধ্বংস ডেকে এনেছে। যেমন সুদ খাওয়া, মিথ্যা বলা, ষড়যন্ত্র করা, ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত হুকুম -আহকাম্ রদবদল করা, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদি। হিজরত পর্যন্ত মদীনায় আরব তথা আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা য়াহূদীদের দ্বারা দারুণভাবে নিষ্পেষিত হয়েছিল। তারা য়াহূদীদের কাছ থেকে সুদী ঋণ নিত। আর সে ঋণ নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করতে না পেরে কখনো কখনো তাদেরকে নিজেদের স্ত্রীলোক এবং শিশুদেরকে পর্যন্ত ওদের (য়াহূদীদের) কাছে বন্ধক রাখতে হত। দ্বিতীয়ত: য়াহূদীরা ছিল আহলে কিতাব। জ্ঞান বিজ্ঞানের দিক দিয়ে তারা ছিল অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চাইতে অগ্রণী। যে সব আরবের শিশু সন্তান জীবিত থাকত না সে মানত করত, এবার বাচ্চা হলে তাকে য়াহূদী করে নেব। এ ধরনের প্রথা প্রচলিত হওয়ার পেছনে সম্ভবত: য়াহূদীদের হাত ছিল। তারাই অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবদেরকে অনুরূপ করার পরামর্শ দিত এবং আরবরা তাদের সে পরামর্শ নির্বিবাদে মেনে নিত। মদীনায় বেশ কিছু সংখ্যক

শিশু এমন ছিল, যারা বংশের দিক দিয়ে আরব হলেও তাদের পিতামাতার বিশ্বাসের দুর্বলতা ও কুসংস্কারের ফলে উপরোক্ত প্রথানুযায়ী য়াহূদী হয়ে গিয়েছিল।

কৃতঘ্নতা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা পৌঁছেই সেখানকার সকল গোত্র ও সকল সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে 'সাহীফা' খ্যাত নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল শহরের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং কোন মতেই তা বিঘ্নিত হতে না দেওয়া। আর বাইরে থেকে এ ধরনের কোন আশংকা দেখা দিলে সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে তার মুকাবেলা করা। এই চুক্তির মধ্যে য়াহূদীদেরকে সমমর্যাদা দেওয়া হয় এবং তাদের সমগ্র নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়। এরপর এই চুক্তির বিরোধিতা শুধু সেই করতে পারত, যে তার নিজের ও নিজের সন্তান-সন্ততির অবস্থান স্থলের শান্তি ও নিরাপত্তা চায় না, বরং সেখানে পরস্পর রক্তারক্তি ও বিশৃঙ্খলার বীজ বপন করতে চায়, কিংবা যে বহি:শত্রুর শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষকে সমর্থন করে এবং তাদেরকে সক্রিয় সাহায্য দিয়ে নিজের হাতে নিজের আবাসভূমি ধ্বংস করে ফেলতে চায়।

মূলত: য়াহূদীদের জন্মগত স্বভাবই এই ছিল যে, তারা মিথ্যা, অবিশ্বস্ততা, অঙ্গীকার ভঙ্গ প্রভৃতি দুষ্কর্ম থেকে কখনো বিরত থাকতে পারত না। সম্ভবত: প্রথম প্রথম তাদের এই ধারণা ছিল যে, মদীনা মুনাওওরায় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা লাভ করার কোনই সম্ভাবনা নেই। কেননা কুরায়শরা অবশ্যই তাদের পেছনে ধাওয়া করবে এবং শাখা প্রশাখা বিস্তারের কোন সুযোগ না দিয়ে তাদেরকে অংকুরেই বিনষ্ট করে ফেলবে। খুব সম্ভবত: এ কারণে তারা অন্যান্য স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে অংশগ্রহণ করতে কোনরূপ দ্বিধা করে নি। ইতিমধ্যে কুরায়শের দিক থেকে য়াহূদী ও মুনাফিকদের কাছে অনবরত: এই সতর্ক বার্তা আসতে থাকে যে, "তোমরা মুসলমানদেরকে শীঘ্রই খতম কর, অন্যথায় তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।" কুরায়শরা ইতিমধ্যে মুসলমানদের উপর আক্রমণও শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু বদর যুদ্ধে জনবল ও অস্ত্রবল অনেক বেশী থাকা সত্ত্বেও কুরায়শরা যখন মুসলমানদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হল তখন প্রথম বারের মত য়াহূদীরা সতর্ক হয়ে ইঠলো। তারা চিন্তা করতে লাগল, এভাবে যদি ইসলামী শক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে তাদের বংশ পরম্পরাগত যাবতীয় প্রভাব প্রতিপত্তি অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে য়াহূদীরা নিজেদেরকে মদীনা মুনাওওরার প্রশাসক এবং আওস ও খায়রাজের লোকদেরকে তাদের শাসনাধীন 'সাধারণ লোক' বলেই মনে করত।

ষড়যন্ত্র ও দুষ্টামি

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে মদীনার য়াহূদীরা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। যেমনঃ

১। তারা আওস ও খাযরাজের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধার চেষ্টা করে। কেননা এই দুই গোত্রের প্রায় সকল লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি ছিল তারাই। ইসলামপূর্ব যুগেও য়াহূদীরা এই দুই গোত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে তাদের ক্ষমতা এমনভাবে নিঃশেষ করে দিয়েছিল যে, তারা শেষ পর্যন্ত সব ব্যাপারে পুরোপুরি য়াহূদী-নির্ভর হয়ে উঠেছিল।

২। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তারা এমনি হীনমন্য হয়ে উঠেছিল যে, নিজেরা আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও মুশরিকদের মত ও পথকে ইসলামী রীতি নীতির চাইতে উৎকৃষ্ট আখ্যা দিচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো, যেন তাদের ন্যায় ও সত্যের মাপকাঠি সম্পূর্ণ বদলে গেছে এবং তাদের 'আহলে কিতাব' হওয়ার দাবী একটি অন্তঃসারশূন্য বুলি ছাড়া কিছু নয়।

৩। ইসলামের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তারা বাহ্যত: অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ইসলাম গ্রহণ করতো; কিন্তু শীঘ্রই আবার মুরতাদ হয়ে যেত, যাতে করে জনসাধারণ মনে করে যে, এই দ্বীন সত্য হলে তো এটাকে কেউ পরিত্যাগ করত না।

৪। খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র সত্তার বিরুদ্ধেও তারা নানা ষড়যন্ত্র আঁটত। এমন কি, রাসুলুল্লাহ্ (সা) রাতের বেলা যখন ঘর থেকে বের হতেন, তখন য়াহূদীদের হাতে তার প্রাণ নাশের আশংকা থাকত। এ কারণেই হযরত তালহা বিন বারা (রা) এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি অসীয়ত করেছিলেন, যদি আমি রাতের বেলা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে তোমরা এ সংবাদ দেবে না। কেননা তিনি যদি জানাযার জন্য আসেন তাহলে এটা অসম্ভব নয় যে, য়াহূদীরা তারা উপর চোরাগুপ্তা হামলা করে বসবে।

মদীনার মুনাফিকরাও- যাদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ্ বিন উবাই – য়াহূদীদের সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়ে উঠেছিল। মক্কার কুরায়শরাও এই মর্মে মুনাফিকদেরকে প্ররোচনা দিত, তোমরা আমাদের এই লোকটির (রাসূলুল্লাহর) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরো। সাথে সাথে এই মর্মে ধমকানিও দিত, "তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে, দুর্গ আছে; এতদ্সত্ত্বেও তোমরা যদি না লড় এবং আমাদেরকে মদীনায় আসতেই হয় তাহলে আমরা তোমাদের এই করবো, সেই করবো।"

বনূ কাইনুকা'

তিনটি য়াহূদী গোত্রের মধ্যে সর্বপ্রথম বনূ কাইনূকা' গোত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিরোধিতা করতে শুরু করে। ইবনে সা'দের বর্ণনা অনুযায়ী, যখন বদরযুদ্ধ শেষ হল তখন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ইতিপূর্বে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা ভঙ্গ করে। আর য়াহূদীদের মধ্যে এরাই ছিল সব চাইতে সাহসী ও রণনিপুণ জনগোষ্ঠী।[৩]

ইবনে সা'দ এটাকে শাওয়ালের ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছেন। এটা ছিল হিজরতের বিংশতিতম মাস (অর্থাৎ শাওয়াল, হিঃ ২ সন) এবং দিনটি ছিল শনিবার।[৪]

বনূ কাইনুকা' গোত্রের সাথেই মুসলমানদের প্রথম সংঘর্ষ বাধে। একজন আরব মহিলা কোন এক য়াহূদী দোকানদারের কাছ থেকে সওদা খরিদ করতে গিয়েছিল। ঐ দোকানে আরো কয়েকজন য়াহূদী বসেছিল। তাদের মধ্যে কেউ একজন ঐ মহিলার কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে তার নিম্নাংগের কাপড় এমনভাবে ঢিলা করে দেয় যে, সে সওদা নিয়ে পেছনে ফিরতেই সম্পূর্ণ উলংগ হয়ে পড়ে এবং সজোরে চীৎকার দিয়ে উঠে। তখন য়াহূদীরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে শুরু করে। জনৈক মুসলমান এই অবস্থা দেখে মহিলার সাহায্যে এগিয়ে যান। ফলে য়াহূদীদের সাথে তার সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ঐ সংঘর্ষে দোকানদার য়াহূদী নিহত হলে বাকী য়াহূদীরা ঐ মুসলমানকে শহীদ করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এই দুঃখজনক ঘটনার সবংবাদ পান তখন বনূ কাইনুকা'র নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করে অত্যন্ত সংযত ও মার্জিত ভাষায় তাদেরকে বলেন, "আপনারা যে পথ ধরেছেন তা ঠিক নয়। দুষ্টামি ছেড়ে দিন এবং আল্লাহ্কে ভয় করুন।" তখন বনূকাইনুকা'র নেতৃবৃন্দ তাদের লোকদের ঐ দুষ্কর্মের জন্য কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ না করে দম্ভভরে বলে উঠে, বদর বিজয়ের উপর গর্বিত হয়ো না। যদি আমাদের সাথে তোমাদের সংঘর্ষ বাধে তাহলে আমাদের যোদ্ধারা কেমন চিজ, তা তোমরা হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

একথা নিশ্চিত যে, তাদের প্রতি বনূ নাযীর, বনূ কুরায়যা ও মদীনার মুনাফিকদের নীরব সমর্থন রয়েছে– এ ধারণা করেই বনূ কাইনুকা' ঐ ঘটনা ঘটিয়েছিল। তাদের ভরসা ছিল, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ বেধে গেলে সমগ্র য়াহূদী ও মুনাফিক তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাধ্য হয়ে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেন, বনূ কায়নুকার দুর্গসমূহ ঘিরে ফেল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ওদের দাম্ভিকতা ও বীরত্বের নেশা সম্পূর্ণ উবে গেছে। য়াহূদী বা মুনাফিকদের একটি অঙ্গুলীও তাদের সহায়তায় উত্তোলিত হয় নি। অতএব তারা বাধ্য হয়ে একথায় রাজী হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তই দেবেন, তারা তা বিনা আপত্তিতে মেনে নেবেন। আবদুল্লাহ্ বিন উবাই, যে বাহ্যিক দিক দিয়ে মুসলমান এবং আন্তরিক দিক দিয়ে য়াহীদীদের সাহায্যকারী ছিল- রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে নিবেদন করে, ওদেরকে নির্বাসিত করে দিন। রাসূলুল্লাহ্ ঐ আবেদন মঞ্জুর করেন

এবং বনূ কাইনুকা' মদীনা মুনাওওরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে 'বালকা' অঞ্চলের 'আযরাআত' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। ওরা হয় বণিক নয়ত স্বর্ণকার ছিল। তাই যেখানে যেত সেখানেই নিজেদের কাজ-কারবার অব্যাহত রাখতে পারত। বনূ কাইনূকা গোত্রে সাত শ যোদ্ধা ছিল। তাদের মধ্যে তিনশ' জনের কাছেই ছিল লৌহ বর্ম।৫

এই ঘটনা বদর যুদ্ধের প্রায় একমাস পর সংঘটিত হয়েছিল। এ ঘটনা এবং এর পরবর্তী আরো দুটি ঘটনা সংঘটনের ক্ষেত্রে একটি অদ্ভুত মিল পরিলক্ষিত হয়। আর তা এই যে, বদর যুদ্ধের পর মদীনায় আরো দু'টি প্রকান্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তার একটি উহুদ এবং অপরটি খন্দক। বদর যুদ্ধের পর বনূ কাইনুকা' মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়, উহুদের পর বনী নাযীর এবং খন্দকের পর বনূ কুরায়যা।

কা'ব বিন আশরাফ

মদীনা মুনাওওরায়, ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে কা'ব বিন আশরাফ ছিল যেন ফিত্‌নার এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সে একটি বিরাট জনগোষ্ঠী কিংবা প্রচুর জনসংখ্যা সম্বলিত একটা গোত্রের চাইতেও কম ছিল না। তার পিতা ছিল 'তাই' গোত্রের লোক এবং বিবাহ্ করেছিল বনূ নাযীরের সর্দার আবূ রাফি সালাম বিন হুকায়মের মেয়েকে। ঐ নাযরী য়াহূদী স্ত্রীলোকেরই সন্তান ছিল কা'ব। সে বনূ নাযীরের বসতির দক্ষিণ প্রান্তের টিলার উপর একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল। সে ছিল খুবই অবস্থাসম্পন্ন। পিতার কারণে আরবদের মধ্যে এবং মাতার কারণে য়াহূদীদের মধ্যে সে অত্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। সে একজন বিখ্যাত কবিও ছিল। আর ঐ যুগে কবিদেরকে সাধারণভাবে অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হত। কা'ব শুধু বাহ্যিক প্রাচুর্যেরই অধিকারী ছিলনা, সেই সাথে ছিল চরিত্রহীন, আত্মম্ভরী এবং ইসলামের কট্টর শত্রু। য়াহূদী আলিমদেরকে সে নিয়মিত ভাতা প্রদান করত। একবার ঐ আলিমরা যখন বলল যে, মুহাম্মদ (সা) হচ্ছেন সেই নবী, যার আগমন সংবাদ য়াহূদীদের সহীফা সমূহে (আসমানী গ্রন্থাদিতে) রয়েছে; তখন সে ঐ আলিমদের ভাতা বন্ধ করে দেয়। যখন আলিমরা পুনরায় বলল যে, তদের ঐ কথাছিল ভুল, তখন কা'ব পুনরায় তাদের জন্য ভাতা জারী করে। সে মদীনা মুনাও্ওরার প্রাথমিক সন্ধি চুক্তিতে শরীক ছিল বটে, তবে প্রথম থেকেই মক্কার কুরায়শ এবং অন্যান্য ইসলাম দুশমনদের সাথে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জুড়ে রেখেছিল। বদর যুদ্ধে কুরায়শদের যে সব সর্দার নিহত হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য শোকগাঁথা রচনা করে সে চল্লিশজন সঙ্গীসাথীসহ মক্কা মুকাররমা যায় এবং সেখানে নিজের রচিত শোক গাঁথাটি আবৃত্তি করে সে নিজে কাঁদে এবং অন্যান্যদেরকেও কাঁদায়। এই সাথে সে কুরায়শদের কাছে এই মর্মে একটি অঙ্গীকার করে যে, ঐ যুদ্ধের বদলা অবশ্যই নেওয়া হবে। মক্কা মুকাররমা থেকে ফিরে এসে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিন্দা করে কয়েকটি কবিতা রচনা করে । ঐ সব কবিতা আবৃত্তি করে সে মানুষকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিরুদ্ধে ক্ষেপা্ত। সে তার কাব্যের মধ্যে অত্যন্ত অশিষ্ট ভঙ্গীতে মুসলিম মহিলাদেরও উল্লেখ করত। সত্যি বটে, প্রাচুর্য ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী কোন ব্যক্তির চারিত্রিক অনুভূতির মৃত্যু ঘটলে এবং তা থেকে আল্লাহ্‌র ভয় অন্তর্হিত হয়ে গেলে সে সকলের জন্য এক মহা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মরহুম মাওলানা শিবলী তারীখে ইয়াকুবীর বরাত দিয়ে লিখেছেন, "কা'ব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করতেও চেয়েছিল।" এই রিওয়ায়াতের সমর্থন ঐ রিওয়ায়াত থেকেও পাওয়া যায়, যা হাফিয ইবনে হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে, 'যিক্‌রে কা'ব বিন আশরাফ' শিরোনামে ইকরামার সনদে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, কা'ব রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। অপর দিকে কিছু লোক এ উদ্দেশ্যে মোতায়েন করে রেখেছিল যে, যখন তিনি (সা) আগমন করবেন তখন তাকে যেন ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হয়।৬

কা'বকে হত্যা

কা'বের এই ফিত্‌নার মূলোৎপাটন যখন অপরিহার্য হয়ে উঠে তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা) সে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন। আবূ নায়েলাহ্ মিলকান বিন সালামাহ বিন ওয়াকশ, উবাদ বিন বিশর বিন ওয়াকশ,

হারিছ বিন আওস বিন মু'আয এবং আবূ আব্‌স্ বিন জাব্‌র (রা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আবূ নায়েলাহ্ মিলকান বিন সালামাহ্ (রা) কা'বের দুধভাই ছিলেন। অনুমান করা হয় যে, সর্ব প্রথম তিনিই দিনের বেলা কা'বের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে বলেন, আমাদের সাথী [মুহাম্মদ (সা)] আমাদের কাছে সদকাহ্ চান, অথচ আমরা নিঃস্ব। দয়া করে তুমি আমাদেরকে দু'এক ওসাক (একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ) খাদ্যশস্য দান কর। কা'ব একথা শুনে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠে এবং আবূ নায়েলাহকে বলে, এখন পর্যন্ত কী-ই বা আর হয়েছে, সে দিন খুব দূরে নয় যেদিন তোমরা ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে তাকে পরিত্যাগ করবে।

আবূ নায়েলাহ ঃ যাক, যখন আমরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি তখন দেখি এর শেষ পরিণাম কি হয়। এবার বলো, ঋণ দেবে কি না।

কা'ব ঃ হ্যাঁ দেব, তবে কোন জিনিস বন্ধক রাখতে হবে।

আবূ নায়েলাহ ঃ কি জিনিস?

কা'ব ঃ তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকেই বন্ধক রাখ।[৭]

আবূ নায়েলাহ ঃ তুমি যা সুন্দর ও আকর্ষণীয় তাতে আমাদের স্ত্রীলোকদেরকে তোমার কাছে বন্ধক রাখতে ভরসা পাই না।

কা'ব ঃ তাহলে সন্তানদের বন্ধক রাখ।

আবূ নায়েলাহ ঃ এরূপ করলে তো সমগ্র আরব জুড়ে আমাদের সম্পর্কে এ বদনাম রটে যাবে যে, দু'এক ওসাক খাদ্য শস্যের জন্যও আমরা আমাদের সন্তানদের বন্ধক রাখি। অবশ্য আমার অস্ত্রগুলো বন্ধক হিসাবে রেখে দিতে পার, তবে আজকাল এগুলোর, আমাদের খুবই প্রয়োজন।[৮] কা'ব্‌তে রাজী হয়ে যায়। বানূ নায়েলাহ (রা) ফিরে গিয়ে তার সঙ্গীদের কাছে সব কিছু খুলে বলেন। সে দিন ছিল চাঁদনী রাত। এরা সবাই একসাথে কা'বের দুর্গের কাছে যান এবং তাকে ডাকেন। তখন তার স্ত্রী তাকে বাধা দিয়ে বলে, তুমি এত রাতে কোথায় যাচ্ছ? সে জবাব দেয়, আমার ভাই আবূ নায়েলাহ্ এবং মুহম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা) এসেছে।

যাহোক, দুর্গ থেকে বের হয়ে আবূ নায়েলাহ্ ও তাঁর সঙ্গীরা কা'বের সাথে পায়চারি করতে থাকেন। ঐ দিন কা'ব তার গায়ে আতর মেখেছিল, যার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল দূর দূরান্ত পর্যন্ত। মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা) তখন কা'বকে বলেন, তোমার মাথা থেকে চমৎকার সুগন্ধ আসছে। যদি অনুমতি দাও তাহলে একটু ঘ্রাণ নিই। কা'ব বলে, হ্যাঁ নিতে পার। ব্যাস, আর যায় কোথায়। মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা) কা'বের মাথা ঝাপ্‌টে ধরে সঙ্গীদের বলেন, এবার একে শেষ করে দাও। সংগীরা সাথে সাথে তরবারি চালায় এবং কা'ব চির নিদ্রায় ঢলে পড়ে।[৯] এরপর আবূ নায়েলাহ্ ও তাঁর সঙ্গীরা তার দেহ থেকে মস্তকটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। মৃত্যুকালে কা'ব এমন বিকট শব্দে চেঁচিয়ে উঠে যে, তাতে আশপাশের য়াহূদী দুর্গসমূহে আগুন প্রজ্জলিত করা হয়। তখন আবূ নায়েলাহ্, মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ এবং তাঁদের অন্যান্য সংগীরা একটি লম্বা চক্কর কেটে মদীনায় গিয়ে পৌঁছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে তাঁদের অভিযানের সাফল্যের কথা ব্যক্ত করেন।

নতুন চুক্তি

পরদিন য়াহূদীরা কা'ব হত্যার অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে হাযির হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন এক এক করে কা'বের যাবতীয় ফিত্‌নাবাজির কথা তাদের কাছে বলেন। এগুলো শুনে তারা চুপচাপ সেখান থেকে চলে যায়। একথা পরিষ্কার যে, যদি কা'বকে প্রকাশ্যে হত্যা করার চেষ্টা করা হত তাহলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ত। আর এতে প্রাণের কি পরিমাণ ক্ষতি হত তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। যাহোক, শেষ পর্যন্ত কা'ব ঠিক সেভাবেই মারা গেল, যেভাবে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রাণ হরণ করতে চেয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) য়াহূদীদের প্রতিনিধি দলের কাছে এও বলেছিলেন, এটাই খুব ভাল হবে যে, আগামীতে তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করার উদ্যোগ নাও এবং ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি থেকে দূরে থাক। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সম্মতি নিয়ে একটি নয়া চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করেন। তাতে য়াহূদীরা শান্তি ও পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে জীবন যাপন করার জন্য নতুনভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।[১০] (সংকলক)

টীকা ঃ

(১) আহদে নববীকে ময়দানে জঙ্গ ঃ পৃষ্ঠা- ৩৯।

(২) আহদে নববীকে ময়দানে জঙ্গ ঃ পৃষ্ঠা- ৪০।

(৩) তাবাকাতে কবীর ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা-২৯।

(৪) তাকাকাতে কবীর ঃ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা-২৮। একথা এখানে বলে রাখা ভাল যে, ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৫ শাওয়াল ছিল শনিবার, ১২ কিংবা ১৩ শাওয়াল নয়। এই হিসাবে ঐ দিন, ইং ৬২৪ সনের, ৭ কিংবা ৮ এপ্রিল ছিল। যদি ১৫ শাওয়াল ধরে নেওয়া হয় তাহলে এটা ছিল এপ্রিলের ১০ তারিখ।

(৫) জাওয়ামিউস সীরাহঃ ইবনে হাযাম ঃ পৃষ্ঠা-১৫৪।

(৬) সীরাতুন্নবী ঃ পৃষ্ঠা - ৩৭৪।

(৭) এ থেকে দু'টি বিষয় পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে।

একঃ কা'ব ছিল চরম লম্পট ও পাপাচারী।

দুইঃ ঐ যুগে মদীনা বাসীদের চোখে মহিলাদের আদৌ কোন মর্যাদা ছিল না। প্রয়োজন দেখা দিলে তাদেরকে যে কোন জিনিসের বিনিময়ে বন্ধক রাখা যেত। যদি এর ব্যাপক প্রচলন না থাকত তাহলে কা'ব তার মুখ দিয়ে এসব কথা বলার সাহসই পেত না।

(৮) একদিকে কিছু না কিছু বন্ধক রাখার প্রয়োজন ছিল। অপর দিকে বন্ধক রাখার বাহানায় অস্ত্রাদি নিয়ে আসার ব্যাপারে কা'বের সম্মতি আদায় করে নেওয়া হলো। এই কৌশল অবলম্বন করে আবূ নায়েলাহ অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

(৯) একটি রিওয়াতে আছে মিক্ওয়াল' (সংগীন) এর আঘাতে কাবের মৃত্যু হয়েছিল। মিক্ওয়ালিটি তার পেট দিয়ে ঢুকে কাঁধ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল।

(১০) তাবাকাতে কবীরঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা -৩৪; সুনানে আবী দাউদঃ 'কাইফা কানা ইখরাজুল য়াহূদ' অধ্যায়।

মদীনাবাসী য়াহূদীদের ইতিকথা-২

বনূ নাযীর

মুসলমানদের বিরুদ্ধে বনূ নাযীরের শত্রুতা বিদ্বেষ ও বাড়াবাড়ির প্রকাশ্য মহড়া ঠিক তখনি শুরু হয় যখন মুসলমানগণ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছিলেন উহুদ যুদ্ধে এবং সংঘটিত হয়েছিলো বি-রে মাঊনা ও রাজী'য়ের দুঃখজনক ঘটনাসমূহ। ঐ সব ঘটনায় অনেক সাহাবীকে বিনা দোষে ও বিনা উস্কানিতে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ ঐ সব ঘটনার প্রেক্ষিতে মদীনা মুনাওওরার সমগ্র ইসলাম দুশমনদের অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, এখন আর আগের মত মুসলমানদের মনে দৃঢ়তা ও উৎসাহ উদ্দীপনা বাকি নেই।

কিভাবে বনূ নাযীর ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হয়েছিল সে সম্পর্কে দুটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়।

প্রথম রিওয়ায়াত

আমর বিন উমাইয়া যামরী বি'-রে মাঊনার দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়ে যখন ফিরে আসছিলেন তখন পথিমধ্যে বনী আমির গোত্রের দু'টি লোককে দেখতে পান। এই গোত্রের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। বনী নাযীর গোত্রও ওদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। আমর মনে করলেন, এরাই সেই লোক, যারা আমার ভাইদেরকে শহীদ করেছে। অতএব সুযোগ পেতেই তিনি ঐ দুইজনকে হত্যা করে ফেলেন এবং মদীনা মুনাওওরায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করেন। হুযূর তখন রাগত স্বরে বলেন, ওরা তো আমাদের মিত্র। ওদের সর্দার আমর বিন তুফায়ল বি'-রে মাঊনার ঘটনার সাথে অবশ্যই শরীক ছিল, কিন্তু তার গোত্রের লোকেরা এ ক্ষেত্রে তাকে আদৌ অনুসরণ করে নি। এই প্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করেন, ওদের রক্ত পণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। বনূ নাযীরের জন্য রক্তপণের অংশ দেয়া অত্যাবশ্যক ছিল। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) রক্তমূল্যের ব্যবস্থা করার জন্য স্বয়ং বনূনাযীরের বসতিতে যান। ওরা বাহ্যতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে এবং সম্মানের সাথে একটি প্রাচীরের ছায়ায় বসিয়ে নিবেদন করে, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমরা এখনি রক্ত মূল্যের ব্যবস্থা করছি।" কিন্তু ঐ মুহূর্তে তারা চুপি চুপি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে চরম নির্যাতন অথবা হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা একটি লোককে একখন্ড ভারী পাথরসহ ছাদে চড়িয়ে দেয় এবং তাকে পরামর্শ দেয় যেন সে এই পাথর খন্ড একটি সুবিধাজনক মুহূর্তে রাসুলুল্লাহ্র উপর ছুঁড়ে মারে।

আমর বিন যুহাশ নাযরী উপর থেকে পাথর ছুঁড়ে মারার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সাল্লাম বিন মিশকাম তাকে বাধা দিয়ে বলে, প্রথমতঃ এটা হচ্ছে ঐ চুক্তির বরখেলাফ, যা আমাদের ও তাদের মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তুমি যে সংকল্প নিয়েছ সে সম্পর্কে সে (মুহাম্মদ) কোন না কোন ভাবে অবহিত হয়ে যাবে। সাল্লাম বিন মিশকামের কথা শেষ পর্যন্ত সঠিক প্রমাণিত হয়। যখন পাথর ছুঁড়ে মারার প্রস্তুতি চলছিলো ঠিক তখনি রাসূলুল্লাহ্ তাঁর জায়গা থেকে হঠাৎ উঠে পড়েন। লোকেরা মনে করল, কোন বিশেষ কারণে তিনি উঠেছেন, ফিরে গিয়ে পুনরায় বসবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে উঠেই সোজা মদীনায় চলে আসেন। যে সব সাহাবী তাঁর সাথে গিয়েছিলেন তাঁরাও

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সেখান থেকে চলে আসেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে তাঁর এভাবে হঠাৎ চলে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেন, য়াহূদীরা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ্ আমাকে তা জানিয়ে দেন। তাই আমি সেখান থেকে দ্রুত চলে আসি।[১]

দ্বিতীয় রিওয়ায়াত

মক্কার কুরায়শরা বনূ নাযীরকে লিখে, তোমরা মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা কর, অন্যথায় আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। বনূ নাযীর এই ধমক খেয়ে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে হত্যা করার একটি জরুরী পরিকল্পনা তৈরী করে। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে এই মর্মে একটি পয়গাম পাঠায়, আমরা আপনার ও আমাদের উলামাবৃন্দের পরস্পর মতবিনিময়ের জন্য একটি বৈঠক আহ্বান করতে চাই। এর মাধ্যমে যদি আমাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাহলে আমরা অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করবো। অতএব আপনি আপনার ত্রিশজন লোক সহ আমাদের এখানে আসুন। আমদেরও ত্রিশজন উলামা উপস্থিত থাকবেন এবং আপনার ও তাদের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হবে।

মূলতঃ তাদের এই পরিকল্পনা ছিল যে, তাদের আলিমরা ডেগার সজ্জিত হয়ে থাকবে এবং সুযোগ মত হামলা চালিয়ে রাসুলুল্লাহ্ (সা)-কে খতম করে ফেলবে। কিন্তু পূর্বাহ্নেই একজন মহিলা আপন এক আনসারী ভাইয়ের কাছে য়াহূদীদের এই গোপন পরিকল্পনাটি ফাঁস করে দেন।

বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ

এই দুই রিওয়ায়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। দুটিই আপন আপন ক্ষেত্রে সঠিক। এটা সম্ভব যে, রাসুলুল্লাহ্ (সা) রক্ত পণের ব্যাপারে বনূ নাযীরের ওখানে গিয়েছিলেন এবং ওহী মারফত তাদের বদ্‌সংকল্পের কথা জানতে পেরে দ্রুত সেখান থেকে চলে আসেন। য়াহূদীদের ঐ প্রথম পরিকল্পনা যখন ভেসে গেল তখন তারা দ্বিতীয় পরিকল্পনা তৈরী করে। আর এরূপ করাটা কট্টর ইসলাম দুশমনদের পক্ষে যে সম্ভব তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ইতিপূর্বেকার বিভিন্ন ঘটনায় বি'-রে মাউনায় যে সব সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন তাদেরকেও ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা প্রদানের জন্য ডেকে নেওয়া হয়েছিল। যাহোক য়াহূদীরা যদি বিচার বিশ্লেষণের পর ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করে তাহলে তাদের সে আবেদন কেন গ্রহণ করা হবে না? কিন্তু প্রথম বিশ্বাসঘাতকতার পর দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতকতার তথ্যও পূর্বাহ্নে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তাও ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। য়াহূদদের আবেদনের জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বলে পাঠান, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা লিখিতভাবে অঙ্গীকার না কর ততক্ষণ তোমাদেরকে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বনূ নাযীর তাতে রাজী হয় নি।

মরহুম মাওলানা শিবলী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইতিপূর্বে বনূ কুরায়যার য়াহূদীর কাছে গিয়েছিলেন এবং তাদেরকে চুক্তি নবায়ন করতে বলেছিলেন। তারা তাতে রাজীও হয়েছিল। অতএব বনী নাযীরের সামনে এই দৃষ্টান্ত বিদ্যমান ছিল যে, তাদের স্বধর্মীয় ভাইরা লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করেছে- এতদ্‌সত্ত্বেও তারা অঙ্গীকার প্রদান করতে রাজী হলো না।[২]

মরহুম মাওলানা শিবলী বলেন, এসব বিবরণ সুনানে আবূ দাউদে আছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সীরাতলেখকরা আবূ দাউদের এই রিওয়ায়াত সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর রয়েছেন।[৩]

সীরাতুন্নবীর বর্ণনা মতে, বনূ নাযীর শেষ পর্যন্ত এই পয়গাম পাঠায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেন তিনজন লোক নিয়ে আসেন। য়াহূদীরাও তিনজন আলিম নিয়ে আসবে। তারা এও বলেছিল, "যদি এই আলিমরা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে আমরাও ইসলাম গ্রহণ করবো।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের এই কথায় সম্মত হয়ে যান। পথিমধ্যে বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারেন যে, য়াহূদীরা তরবারি হাতে এমনভাবে তৈরি হয়ে আছে যে, তিনি সেখানে পৌঁছতেই তারা তাঁর উপর হামলা চালাবে।[৪]

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাম্মদ বিন মাসলামার মাধ্যমে বনূ নাযীরকে বলে পাঠান, তোমরা আমার শহর ছেড়ে চলে যাও। তোমরা আমার সাথে যে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছ তাতে আমি তোমাদেরকে কেবল দশ দিনের অবকাশ দিচ্ছি। এরপর তোমাদের মধ্যে যাকেই মদীনায় পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে।[৫]

মুনাফিক সর্দারের ভিত্তিহীন অঙ্গীকার

য়াহূদীরা মদীনা ত্যাগের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছিল। মদীনা থেকে যাতে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়া যায় সেজন্য তারা যুল জাদ্‌রে[৬] তাদের ঘনিষ্ঠ জনের কাছে এই মর্মে দূতও প্রেরণ করেছিল যে, তারা যেন অতি শীঘ্র কিছু সংখ্যক দ্রুতগামী উট ভাড়া করে নিয়ে আসে, যাতে করে সেগুলোর উপর মালপত্র চাপানো যায়। ঠিক তখনি ইবনে উবাই-এর কপটতামূলক একটি মনভুলানো কথায় বনূ নাযীরের প্রস্তুতি তৎপরতায় শৈথিল্য দেখা দিল। ইবনে উবাই তাদেরকে বলেছিল, তোমরা শহর ছেড়ে বের হয়ো না, বরং নিজ নিজ দুর্গে বসে থাক। আমার কাছে আমার স্বগোত্রীয় দুহাজার লোক রয়েছে। আমি ওদেরকে নিয়ে তোমাদের দুর্গ সমূহে চলে আসব। বনূ কুরায়যা এবং বনূ তিফানও তোমাদের সাহায্য করবে।[৭] পবিত্র কুরআনেও ঐ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا لا وَاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ .

"আপনি কি মুনাফিকদের দেখননি? ওরা, কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফ্‌রী করেছে ওদের সেই সব সঙ্গীকে বলে, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো।" (৫৯:১১)

মুনাফিকদের এই অঙ্গীকার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল। কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্য মিথ্যাবাদী।" দুনিয়ার সামনে তাদের মিথ্যাচারিতার উলংগ প্রকাশ ঘটেছিল।

য়াহূদীরা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই-এর এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে সত্য জ্ঞান করল, মদীনা থেকে বের হয়ে যেতে অস্বীকার করল এবং যে অবকাশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তা মুসলিম বিরোধিতার কাজে লাগাতে উদ্যত হলো। এ কারণে তাদেরকে ঘেরাও করাও মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠল। ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়েও য়াহূদীদের বেপরোয়াভাব অবদমিত হল না। তারা আরও পাথর নিয়ে দুর্গসমূহের ছাদে চড়ে বসলো। এই ঘেরাও পনেরো দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই সময়ের মধ্যে না আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের দু'হাজার স্বজাতি তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল, আর না বনূ কুরায়যা ও গিত্ফান তাদের পক্ষে আংগুল পর্যন্ত উঠাবার দুঃসাহস করল। শেষ পর্যন্ত বনূ নাযীরকে যাবতীয় যুদ্ধাস্ত্র ও স্থাবর সম্পতি তথা বাগ বাগিচা ও শস্যক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য মাল আসবাব সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া হলো। এই সুযোগে তারা তাদের দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেল।

বনূ নাযীরের সর্দার হুয়াই বিন আখতাব, আবূ রাফি' বিন আবুল হাকীক প্রমুখ খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। ওরাই পরে খন্দক যুদ্ধের কারণে পরিণত হয়েছিল। বনূ কুরায়যার ধ্বংসের আসল যিম্মাদারও ছিল ওরাই।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, বনূ নাযীর ছয়শ উটের একটি কাফেলা নিয়ে গান বাজনা করতে করতে মদীনা থেকে বের হয়ে যায়। তাদের স্থাবর সম্পত্তি সেই সব মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় যাদের জীবন ধারণের কোন সংস্থান ছিল না। অবশ্য পূর্বাহ্নে এ ব্যাপারে আনসারদের সম্মতি গ্রহণ করা হয়।

বনূ কুরায়যা

খন্দক যুদ্ধের পর বনূ কুরায়যার ব্যাপারটি সামনে আসে। অপরাধ প্রবণতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এরা বনূ কাইনূকা' ও বনূ নাযীরের চাইতেও বেড়ে গিয়েছিল।

১। বনূ কুরায়যা অন্যান্য সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর মত প্রথম চুক্তিতে শরীক ছিল। কিন্তু ইসলামের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করে তাদের সেই আপোষমূলক মনোবৃত্তি পরে সম্পূর্ণ বদলে যায়।

২। সহীহ্ মুসলিমের এক রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, বনূ নাযীরের ন্যায় বনূ কুরায়যাও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নাযীরকে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত করলেও বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক বনূ কুরায়যাকে মদীনায়ই থাকতে দেন। বাহ্যত: এর অর্থ এই যে, বনূ কুরায়যাও বনূ নাযীরের সঙ্গী হওয়ার জন্য প্রায় তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে যায় তখন তিনি তাদের দ্বারা পূর্বের চুক্তিটি নবায়ন করে নেন-যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য কথায় তারা নতুনভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, তারা তাদের পূর্বকৃত অঙ্গীকারে কায়েম ও সুদৃঢ় থাকবে।

৩। খন্দক যুদ্ধ চলাকালে হুয়াই বিন আখতাব যখন বনূ কুরায়যার সর্দার কা'ব বিন আসাদের সঙ্গে দেখা করে তাকে অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য প্ররোচিত করে তখন কা'ব বিন আসাদ উত্তরে বলে, "তুমি আমাকে আমার নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। আমি মুহাম্মদের কাছ থেকে অঙ্গীকার পূরণ ও সদাচরণ ছাড়া অন্য কিছু পাই নি" এটা হচ্ছে একথার খোলাখুলি স্বীকৃতি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার সাথে তার কৃত অঙ্গীকার পুরোপুরি রক্ষা করেছিলেন। এতদ্সত্ত্বেও কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্রের হামলাকারীদের অত্যধিক জনসংখ্যার বিস্তারিত খবর জানার পর বনূ কুরায়যার সর্দার কা'ব বিন আসাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্যত হয়। অথচ তার একান্ত কর্তব্য ছিল মুসলমানদের পক্ষাবলম্বন করে হামলাকারীদের সাথে যুদ্ধ করা।

৪। শান্তিকালীন সময়ের জন্য নয় বরং সংঘর্ষ ও যুদ্ধকালীন সময়ের জন্যই ছিল নিরাপত্তা চুক্তির সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় বনূ কুরায়যার সাথে কৃত এই চুক্তি কোন কাজেই আসে নি। কেননা তারা এই অবস্থায় বিরোধীদের সাথেই যোগ দেয়।

৫। পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনূ কুরায়যা বহিঃশত্রুদের সাহায্য করেছিল। যেমন বলা হয়েছে।

وَأَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ .

"কিতাবীদের মধ্যে যারা (বনূ কুরায়যা) ওদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন। (৩৩ ঃ ২৬)

অন্য কথায় বলা যায়, তাদের শক্তি যাই থাক না কেন, বনূ কুরায়যা যথারীতি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। আর যখন বহিঃশত্রু নিরাশ হয়ে তাদের অবরোধ উঠিয়ে মদীনা ছেড়ে চলে যায় তখন তারা (বনূ কুরায়যা) নিজ নিজ দুর্গের মধ্যে বসে থাকে।

৬। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন য়াহূদীদের এই বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অবহিত হন তখন তিনি আনসারের সর্দার সা'দ বিন মু'আয (রা), সা'দ বিন উবাদা (রা) এবং আরো কয়েকজনকে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য পাঠান। আওস গোত্রের সাথে বনূ কুরায়যার মধুর সম্পর্ক ছিল। যা হোক, সা'দ (রা) এবং অন্যান্যরা যখন বনূ কুরায়যার কাছে যান তখন দেখতে পান যে, বিশ্বাস ভঙ্গের ক্ষেত্রে তারা একেবারে চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাঁরা যখন বনূ কুরায়যাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন তারা পরিষ্কার জবাব দেয়, "মুহাম্মদ আবার কে? তার এবং আমাদের মধ্যে কোন অঙ্গীকার নেই।" সা'দ বিন মু'আয (রা) অবাক বিস্ময়ে তাদের এই চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও উলঙ্গ বেহায়াপনা লক্ষ্য করে অনেকটা বেশামাল হয়ে পড়েন এবং তাদেরকে বেশ কিছু কটুকথা শুনিয়ে সেখানে থেকে চলে আসেন।

অকাট্য সিদ্ধান্তের মুহূর্ত

উপরোক্ত বিষয়াদি ছাড়াও আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এ ব্যাপারটি শুধুমাত্র কয়েকজন লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি ছিল এমন একটি বিরাট বসতি ও এমন একটি জাতির ব্যাপার, যারা চতুর্দিক থেকে ছিল শত্রু পরিবেষ্টিত এবং তাদের অস্তিত্ব ছিল বিপদের সম্মুখীন। তাছাড়া সাধারণ য়াহূদীদের ন্যায় বনূ কুরায়যারও এই অভ্যাস ছিল যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃত অঙ্গীকার মেনে চলত যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছে তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিকূল মনে হত। আবার যখনই তারা দেখত যে, মুসলমানদেরকে আঘাত করার একটা ভাল সুযোগ এসে গেছে তখনই তারা অঙ্গীকারের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে মুসলমানদের চরম শত্রু হয়ে দাঁড়াত। অথচ তারা নিজেরাই প্রকাশ্যে ঘোষণা করত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছ থেকে তারা অঙ্গীকার পালন ও সদাচরণ ছাড়া অন্য কিছু পায় নি। এমন শত্রুভাবাপন্ন, বিদ্বেষী ও হিংসাপরায়ণ একটি জনগোষ্ঠীকে যদি মুসলমানদের সাথে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হত তাহলে নিঃসন্দেহে মদীনা মুনাওওরার গোটা বসতির শান্তি ও নিরাপত্তা যে কোন মুহূর্তে বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকত। মুসলমানরা যখনই বাধ্য হয়ে যুদ্ধের জন্য মদীনার বাইরে যেত তখন তাদের পরিবার-পরিজনের সাথে য়াহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা প্রায় সর্বক্ষণ লেগে থাকত। অতএব অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, য়াহূদীদের এই তৃতীয় তথা শেষ দল সম্পর্কে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

টীকা ঃ

(১) তাবাকাত ঃ দ্বিতীয় খণ্ড।

(২) সীরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৩৭৬।

(৩) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা – ৩৭৬।

(৪) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৩৭৬।

(৫) তাবাকাতে কবীর ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা-৫৭।

(৬) 'যুল জাফর' হচ্ছে একটি চারণভূমি ঃ যা কুবার দিকে (দক্ষিণ দিকে) মদীনা মুনাওওরা থেকে ছয় মাইল দূরে ছিল।

(৭) তাবাকাতে কবীর ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা-৫৭।

মদীনাবাসী য়াহূদীদের ইতিকথা–৩

বনূ কুরায়যা ঘেরাও

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুসলমান ২৩ যীকা'দা হিঃ ৫ সনে পরিখা ছেড়ে মদীনা মুনাওওরায় চলে আসেন। এই দিনই হযরত আলী (রা) এর হাতে ইসলামী পতাকা তুলে দিয়ে তাকে অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক রূপে বনূ কুরায়যার দিকে প্রেরণ করেন। সাথে সাথে এই সাধারণ ঘোষণাও দেন যে, সবাই যেন অনতিবিলম্বে বনূ কুরায়যার বসতি অভিমুখে রওয়ানা হন। এ কার্যক্রমের উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করে এও বলা হয় যে, যদি কেউ আসরের সালাত আদায় না করে থাকেন তাহলে বনূ কুরায়যার বসতির কাছে পৌছার পরই যেন তা আদায় করেন। এভাবেই বনূ কুরায়যার ঘেরাও অভিযান শুরু করে।

প্রথম প্রথম বনূ কুরায়যার গর্ব ও অহমিকা ছিল তাদের সুদৃঢ় দুর্গগুলোর উপর। কিন্তু কয়েকদিন নিশ্ছিদ্র অবরোধ কাটাবার পর তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তাদের সর্দার কা'ব বিন আসাদ তার স্বজাতীয়দের সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করে এবং বলে তোমরা এর মধ্য থেকে যেটা ভাল মনে কর সেটাই গ্রহণ কর।

১। আমরা মুহাম্মদ (সা) এর উপর ঈমান আনব এবং তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করবো। ইতিমধ্যে তোমাদের সামনে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। আমাদের আসমানী কিতাবসমূহেও এর উল্লেখ রয়েছে। যা হোক, এরূপ করা হলে তোমাদের প্রাণ, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সন্তানসন্ততি এবং তোমাদের স্ত্রীলোকেরা বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। তখন য়াহূদীরা উত্তর দেয়, আমরা তো তাওরাত ছাড়তে পারি না।

২। কা'ব তখন বলে, যদি এটা অস্বীকার কর তাহলে আমার প্রস্তাব এই যে, আমরা নিজেরাই নিজেদের সন্তান সন্ততি ও স্ত্রীলোকদেরকে হত্যা করে ফেলব, এরপর ঝাপিয়ে পড়ব মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর সংগীদের উপর। এতে আল্লাহ্ আমাদের ও মুহাম্মদ (সা) এর মধ্যে যে ফয়সালা করেন, মনে করব সেটাই আমাদের নিয়তি। মারবো নয়ত মরবো। পেছনে তো আমাদের কোন বংশধর নেই, তাই তাদের জন্য আমাদের কোন দুশ্চিন্তাও নেই। তারপর আমরা যদি জয়ী হই তাহলে আমার প্রাণের কসম খেয়ে বলছি, আল্লাহ্ আমাদেরকে পুনরায় স্ত্রীলোক ও সন্তান সন্ততি দান করবেন। য়াহূদীরা তখন বলে এই বেচারীদের হত্যা করার পর আমাদের বেঁচে থাকার মধ্যে কি কোন সার্থকতা আছে?

৩। কা'ব তখন বলে, যদি এই প্রস্তাবও তোমাদের কাছে গ্রহণীয় না হয় তাহলে আমার শেষ অভিমত হলো আজ যেহেতু 'সাবৃত' তথা শনিবার রাত, তাই অবরোধকারীরা এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে যে, য়াহূদীরা শনিবারে যুদ্ধ করবে না। এই সুযোগে তোমরা রাতের বেলা দুর্গ থেকে বের হয়ে অতর্কিতে মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়। তখন য়াহূদীরা জবাব দেয় আমরা 'সাবৃত' এর অমর্যাদা করতে পারব না।

আবূ লুবাবা (রা) এর ঘটনা

এরপর বনূ কুরায়যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে এই মর্মে আবেদন করে যে, আবূ লুবাবা (রা)-কে যেন তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কেননা তারা তাদের ব্যাপারে আবূ লুবাবা (রা) এর সাথে পরামর্শ করতে চায়। বশীর বিন আবদুল মুন্‌যির-এর ডাক নাম ছিল আবূ লুবাবা (রা)। তিনি তাঁর আসল নামের চাইতে ডাক নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। বনী আমর বিন আওফের সাথে তাঁর ভাতৃত্বের সম্বন্ধ ছিল। বনূ আমর বিন আওফ ছিল আওস গোত্রের মিত্র। আর আওস ছিল বনূ কুরায়যার মিত্র। এই মিত্রতা ছাড়াও আবূ লুবাবা (রা) এর সাথে অন্যভাবেও বণূ কুরায়যার মধুর সম্পর্ক থেকে থাকবে এবং এ কারণেই তারা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল। যাহোক, আবূ লুবাবা (রা) যখন বনূ কুরায়যার কাছে যান তখন পুরুষ, স্ত্রীলোক শিশু নির্বিশেষে সকল মানুষ তাঁর আশে পাশে এসে জড় হয়ে কাঁদতে থাকে। তারা আবূ লুবাবা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করে, আমরা কি বিনা শর্তে আনুগত্য স্বীকার করে নেব? আবূ লুবাবা (রা) ইতিবাচক জবাব দেন এবং সেই সাথে অংগুলি দিয়ে নিজের গলার দিকে ইঙ্গিত করেন, যার অর্থ এই ছিল যে, তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। এই ইঙ্গিত ইচ্ছাপূর্বক ছিল না; বরং ছিল ইখতিয়ার বহির্ভূত। মানুষ যখন অত্যধিক আবেগ-প্রবণ হয়ে পড়ে তখন সাধারণত: এ ধরনের কাণ্ড ঘটিয়ে বসে।

যা হোক, এ ধরনের একটা কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর আবূ লুবাবা (রা) মনে করলেন, এটা তার একটা 'খিয়ানত' (বিশ্বাসভঙ্গ) ছাড়া কিছু নয়। অর্থাৎ তিনি বিনা কারণেই এমন একটি বাড়াবাড়িমূলক আচরণের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুসলমানদেরকে সম্পর্কিত করে ফেলেছেন। এতে তিনি এতই লজ্জিত হয়ে পড়েন যে, সেখানে থেকে ফিরে এসে সোজা মসজিদে নববীতে চলে যান এবং মসজিদেরই একটি খুঁটির সাথে নিজেকে পেঁচিয়ে বেঁধে এই অঙ্গীকার করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র হস্ত দ্বারা এই বাঁধন না খুলবেন, ততক্ষণ এই অবস্থা থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিষয়টি জানতে পেরে বলেন, হায়, আবূ লুবাবা যদি আমার কাছে আসত এবং আমি তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।

যাহোক, আবূ লুবাবা (রা) এর স্ত্রী প্রত্যেক সালাতের সময় এসে তাঁর বাঁধন খুলে দিতেন এবং সালাত শেষ হওয়ার পরই তাঁকে পুনরায় বেঁধে রাখতেন। পূর্ণ ছয় দিন এভাবে অতিবাহিত হয়। এরপর তাঁর সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয় এরং তাঁর তাওবা আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ হাতে আবূ লুবাবা (রা) এর বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দেন।

বনূ কুরায়যার আত্মসমর্পণ

পনেরো দিন পর বনূ কুরায়যা কোনরূপ পূর্বশর্ত ছাড়াই আত্মসমর্পণ করে। এরপর বিভিন্ন বর্ণনায়, মূল বিষয়ে নয় বরং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা যায়।

১। ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী আওস গোত্রের লোকেরা দৌড়াতে দৌড়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দরবারে গিয়ে পৌছে এবং নিবেদন করে, "হে আল্লাহ্র রাসূল, বনূ কুরায়যা আমাদের মিত্র। আপনি আমাদের খাযরাজী ভাইদের মিত্র (বনূ কাইনুকা')-এর সাথে যে ব্যবহার করেছেন, তা তো আপনার চোখের সামনেই রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হবে যে, এ বিষয়টির মীমাংসার ভার আমি তোমাদেরই গোত্রের কোন লোকের হাতে ন্যস্ত করি? তারা নিবেদন করে, কেন সন্তষ্ট হব না, হে আল্লাহ্র রাসূল? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, তাহলে তোমরা সা'দ বিন মু'আজ (রা) এর সাথে সাক্ষাত কর।

কোন কোন সীরাত-রচয়িতা এভাবেই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

২। তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এ আছে, বনূ কুরায়যা, সা'দ বিন মু'আয (রা)-কে 'সালিস' নিয়োগের ব্যাপারে তাদের সম্মতি প্রকাশ করে।[১] আওস গোত্রের মুসলমানদেরকে যাদের সাথে প্রথম থেকেই তাদের মধুর সম্পর্ক ছিল, মাঝখানে টেনে নিয়ে আসে এবং তাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে একথা মানিয়ে নেয় যে, বনূ কুরায়যার ব্যাপারে সা'দ বিন মু'আয (রা)-কে 'সালিস' তথা বিচারক নিয়োগ করা হবে এবং তিনি যে ফয়সালা দেবেন আল্লাহ্‌র নবী (সা) তা মেনে নেবেন।

৩। সহীহ্ বুখারীতে আছে–

فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ .

অর্থাৎ বনূ কুরায়যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হুকুমের উপর রাজী হয়ে দুর্গসমূহ থেকে বেরিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বিষয়টি চূড়ান্ত ফয়সালার ভার সা'দ (রা) এর হাতে ন্যস্ত করেন।[২]

৪। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ (রা)-কে বলেন,

إِنَّ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ

অর্থাৎ এরা বনূ (কুরায়যা) তোমার ফয়সালার উপর রাজী হয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে।[৩]

৫। ফাতহুল বারীতে ইবনে হাজার বলেন,

وقع فى كثير من السير انهم نزلوا على حكم سعد .

অর্থাৎ সীরাতের অধিকাংশ গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, বনূ কুরায়যা প্রথমেই সা'দকে সালিস বা বিচারক নিয়োগ করতে সম্মত হয়।[৪]

হযরত সা'দ (রা) এর ফয়সালা

চাই একথা স্বীকার করা হোক যে, বনূ কুরায়যা সাদ'কে 'সালিস' (বিচারক) মেনে নিয়ে মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল অথবা একথা স্বীকার করা হোক যে, তারা কোনরূপ পূর্বশর্ত ছাড়াই অস্ত্র সংবরণ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে কোন ফয়সালার উপরই রাজী হয়ে গিয়েছিল। একথা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শেষ পর্যন্ত ঐ বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসার ভার সা'দ (রা)-এর হাতেই ন্যস্ত করেছিলেন।

সা'দ (রা) যখন থেকে আহত হন তখন থেকেই তাকে রুফায়দা (রা) এর তাঁবুতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেটা ছিল মসজিদে নববীর সন্নিকটে। রুফায়দা আসলামী (রা) বনূ নাজ্জারের একজন পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ব্যাধি-বিশেষ করে ক্ষত রোগের চিকিৎসা করতেন। এ উদ্দেশে তিনি একটি তাঁবুও স্থাপন করেছিলেন, যেখানে আজকালকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের মত রোগীদের চিকিৎসা করা হত। হযরত সা'দ (রা) এর ক্ষতও সেখানে ধীরে ধীরে সেরে উঠছিলো। আওস গোত্রের লোক হযরত সা'দ (রা) এর কাছে যান এবং তাঁকে বলেন, আমাদের মিত্রদের ক্ষেত্রে আপনি সুবিচার করবেন। এরপর তাঁকে বাহনে উঠিয়ে সেই জায়গায় নিয়ে আসা হয় যেখানে মুসলমানগণ একত্রিত হয়েছিলেন। খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সা'দ (রা) পথিমধ্যেই আপন গোত্রের লোকদের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করে বলেছিলেন, সা'দ (রা) এর সেই সময় ঘনিয়ে এসেছে, যখন সে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কোন সমালোচকেরই সমালোচনার পরোয়া করবে না।

এটা জানা কথা যে, সা'দ (রা) এর এই কথাগুলো তাঁর সমগোত্রীয়দের কাছে মোটেই আশাব্যঞ্জক ছিল না। যাহোক সা'দ (রা) যখন জনসমাবেশে পৌছেন তখন তাঁকে বলা হয়, আপনাকে সালিস মনোনীত করা হয়েছে।

এবার সা'দ (রা) প্রথমে আপন গোত্রীয়দের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি আল্লাহ্‌র সামনে এই অঙ্গীকার করছ যে, আমি যে ফয়সালা দেব তাই বহাল থাকবে? সবাই তখন ইতিবাচক জবাব দেয়। এরপর সা'দ (রা) ঐ দিকের লোকদেরকে সম্বোধন করেন, যেদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসে ছিলেন এবং পুনরায় এই একই প্রশ্ন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সম্মানার্থে তাঁকে ইঙ্গিত করে সম্বোধন না করলেও খোদ রাসূলুল্লাহ্ হ্যাঁ সূচক জবাব দেন। এরপর সা'দ (রা) যে ফয়সালা করেন, সহীহ্ বুখারীর ভাষায় তা ছিল–

"যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, স্ত্রীলোক এবং শিশুদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের সব বিষয়-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে।"[৫]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এটা শুনে বলেন, তুমি বনূ কুরায়যা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সেই হুকুম অনুযায়ী ফয়সালা করেছ, যে হুকুম এসেছে আসমান থেকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত শব্দগুলো ছিল–

لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللّٰهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ اَرْقِعَةٍ

তাওরাতের হুকুম

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বাণীর মমার্থ এই ছিল যে, এটা হচ্ছে তাওরাতেরই হুকুম। আর তাওরাত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকেই অবতীর্ণ একটি গ্রন্থ। মোটকথা, হযরত সা'দ (রা) যে ফয়সালা দিয়েছিলেন, মূলত: তাওরাতও তা সমর্থন করে। যেমন–

"যখন তুমি কোন শহরবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ওদের ওখানে গিয়ে পৌঁছবে তখন প্রথমে তাদের কাছে সন্ধির পযগাম পাঠাবে। যদি তারা সন্ধি করতে রাজী হয় এবং তাদের সিংহদ্বার তোমার জন্য খুলে দেয় তাহলে সেখানকার বাসিন্দারা তোমার অধীনস্থ প্রজা হিসাবে কর প্রদান করবে। আর যদি তারা তোমার সাথে সন্ধি না করে, বরং যুদ্ধ করতে চায় তাহলে তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে। এরপর যখন তোমার খোদা শহরটি তোমার কব্‌জায় দিয়ে দেবেন তখন তুমি সেখানকার প্রত্যেকটি পুরুষকে তরবারি দ্বারা হত্যা করবে এবং স্ত্রীলোক, শিশু, গৃহপালিত জন্তু ও সমগ্র মাল আসবাব নিজের জন্য রেখে দেবে।"[৬]

তাওরাতে আরো বলা হয়েছে–

"হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌রই নির্দেশ মোতাবেক বনী ইসরাইলকে মাদ্‌য়ানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দেন। তারা সব পুরুষকে হত্যা করে পাঁচজন বাদশাহ এবং বাউরের পুত্র বাল'আমকে খতম করে এবং স্ত্রীলোক, শিশু ও যাবতীয় মাল-আসবাব নিয়ে আসে। হযরত মূসা (আ) আপন অধিনায়কদের প্রতি ক্ষেপে গিয়ে বলেন, সব বালকদের হত্যা কর, যে সব স্ত্রীলোক পুরুষের মুখ দর্শন করেছে (পুরুষের সাথে সঙ্গম করেছে) তাদেরকে হত্যা কর এবং শুধুমাত্র কুমারী মেয়েদেরকে রেখে দাও।"[৭]

এ কারণেই হুয়াই বিন আখতাব নাযরী, যে আপন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বনূ কুরায়যার সাথে এসেছিল, হত্যার পূর্বে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল, লোকসকল, আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে নেওয়ার মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কিছু নেই। এটা আল্লাহ্‌রই এক হুকুম ছিল এবং তারই দেওয়া এই শাস্তি ছিল, যা তিনি বনী ইসরাঈলের ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন।[৮]

শাস্তি প্রসঙ্গে

ঐ সময়ের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী এটাই ছিল বনূ কুরায়যার জন্য উচিত শাস্তি। তারা কমবেশী পাঁচটি বছর একের পর এক মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, অত্যন্ত নাজুক মুহূর্তে তাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করেছিল–এমন কি অঙ্গীকারের অস্তিত্ব পর্যন্ত

অস্বীকার করেছিল। তাদের শাস্তি ছাড়া আর কী হতে পারত? ইতিপূর্বে যে য়াহূদীগোত্রকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তারা খায়বারে স্থিতিশীল হওয়ার পর কি হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনার উপর চড়াও হয়নি? আর তাদের লম্ফে-ঝম্পে কি মদীনার মাটি প্রকম্পিত হয় নি? প্রাণঘাতী শত্রুর সর্বশেষ চেষ্টাও যখন ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয় তখন তার জন্য কৃপা প্রার্থনার অর্থ এছাড়া আর কী হতে পারে যে, এই বিষধর সর্পকে পুনরায় দংশন করার অবকাশ দেওয়া? হ্যাঁ, যদি বনূ কুরায়যা ঘেরাও-এর পূর্বেই নিজদের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা করত তাহলে প্রবল সম্ভাবনা ছিল যে, তাদেরকেও মদীনা থেকে নিরাপদে বিদায় করে দেওয়া হত কিংবা অন্য কোন লঘু শাস্তি দেওয়া হত। কিন্তু তারা শুধু নিজেদের অঙ্গীকারই ভঙ্গ করে নি, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিয়েছিল। যখন সকল দিক থেকে তাদের উপর ব্যর্থতা নেমে এসেছিল তখন এর দায়-দায়িত্ব তো বিজয়ীদেরকে নয় বরং বিজিতদেরকেই বহন করতে হবে।

বনূ কুরায়যার নিহতদের সংখ্যা কত ছিল সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে, এই সংখ্যা ছয় ও সাত শ'য়ের মধ্যে। কারো কারো মতে, এই সংখ্যা তিন শ'য়ের বেশী ছিল না।

সা'দ বিন মু'আযের ওফাত

সা'দ বিন মু'আয আহত হওয়ার সাথে সাথে এই দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ্, যদি কুরায়শের সাথে আর কোন যুদ্ধ হওয়ার থাকে তাহলে আমাকে জীবিত রাখ। কেননা তাদের সাথে যুদ্ধ করা আমি পছন্দ করি। তারা তোমার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে, তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং তাঁকে তাঁর মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছে। আর যদি কোন যুদ্ধ না হয় তাহলে আমাকে শাহাদত দান কর। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বনু কুরায়যার শেষ পরিণাম দেখে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা না হয় ততক্ষণ যেন আমি না মরি।

রুফায়দা (রা) এর চিকিৎসায় হযরত সা'দ (রা) সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তাবাকাতে ইবনে সা'দে আছে, তিনি তাঁর পার্শ্বের উপর শুয়েছিলেন এমন সময় একটি বকরী তাঁর উপর দিয়ে চলে যায় এবং সেই বকরীর ক্ষুরের আঘাতে তাঁর ক্ষতস্থানটি পুনরায় জেগে উঠে। আর এটাই শেষ পর্যন্ত তাঁর ওফাতের কারণে পরিণত হয়। সা'দ (রা) এর ওফাত ছিল আনসারের সেই মহান সর্দারের ওফাত, যিনি ছিলেন ইসলামের সূচনাকাল থেকে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্র রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গের এক তুলনাহীন জীবন্ত প্রতিমূর্তি। হযরত জাবির (রা) বলেন–

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি: সা'দের মৃত্যুর কারণে আল্লাহ্র আরশ কেঁপে উঠেছিল।"

ঘেরাওয়ের তারিখ

এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, ২৩ যীকাদ হিঃ ৫ সনে বনূ কুরায়যাকে ঘেরাও করা হয় এবং তা ১৫ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অতএব বলা যেতে পারে যে, ৭ যিল হাজ্জায় (৩০ এপ্রিল, ইং ৬২৭ সন) বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালা হয়েগিয়েছিল। ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী ঘেরাও-এর সময়কাল ছিল পঁচিশ দিন।

টীকা ঃ

১। তাবাকাতে কবীর ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৭৭।

২। রাহমাতুল লিল্ আলামীন ঃ পৃষ্ঠা-১৭৩।

৩। সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুল মাগাযী।

৪। সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সায়র।

৫। সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুল মাগাযী।

৬। বাইবেলঃ দ্বিতীয় বিবরণ ঃ বিংশ অধ্যায় ঃ শ্লোক ১০-১৪।

৭। বাইবেলঃ গণনা পুস্তকঃ একত্রিশতম অধ্যায় ঃ শ্লোক ১-১৯।

৮। সীরাতুন্নবী ঃ

সুস্পষ্ট বিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বাই'আতে রিযওয়ান–১

উমরা পালনের সংকল্প

হিজরী ৬ সনের যীকা'দা মাসে রাসুলুল্লাহ্ (সা) উমরা পালনের সংকল্প নেন। হারাম শরীফে ইবাদতের ক্ষেত্রে আরবরা বছরের চারটি মাসকে পবিত্র বলে মনে করত। এর মধ্যে রজব মাসে সাধারণতঃ উমরা পালন করা হত। আর যীকা'দা, যীলহাজ্জাহ ও মুহাররম মাসে হজ, উমরা, উভয়ই পালন করা হত। উল্লেখিত চারটি পবিত্র মাসেই যুদ্ধ বিগ্রহ, হত্যা, লুটপাট, ফিতনা-ফাসাদ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। তখন দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা মক্কা মুকাররমায় আসত। তাদেরকে রাস্তাঘাটে কোন প্রকার নির্যাতন করা হত না এবং হারাম শরীফে প্রবেশ করতেও বাধা দেওয়া হত না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যীকাদা মাসটি উমরার জন্য বেছে নিয়েছিলেন এজন্য যে, এটা ছিল হারাম মাস। অন্যথায় উমরা পালনের জন্য কোন বিশেষ মাস বা বিশেষ সময়ের শর্ত ছিল না। যাহোক, ঐ উমরায় সাহাবা কিরাম (রা)-ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সঙ্গী হন। বিভিন্ন বর্ণনানুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল তের শ থেকে সতেরো শ। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, চৌদ্দ শ। 'জাওয়ামিউস্ সিয়ার'-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের সংখ্যা ছিল তের'শ ও পনেরো শ'য়ের মধ্যে।

মদীনা মুনাওওরা থেকে যাত্রা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) গোসল করে ইহ্রাম বাঁধেন, আবদুল্লাহ্ ইবন মাকতুমকে মদীনা মুনাওওরায় আপন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন এবং ১ যীকা'দা, হিজরী ৬ সনে[১] মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। ঐ দিন ছিল সোমবার।[২] রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সহধর্মিনীদের মধ্যে হযরত উম্মে সালমা (রা) তাঁর সংগে ছিলেন। কুরবানীর জন্য সত্তরটি উট সংগে নেওয়া হয়। সেগুলোর মধ্যে একটি উট ছিল আবূ জাহলের। ঐ উটের নাকে রূপার আংটি লাগানো ছিল। উটটি ছিল বদর যুদ্ধের মালে গনীমতের অন্যতম। যুল হুলায়ফা (বর্তমান আবারে আলী) পৌঁছার পর কুরবানীর রসম আদায় করা হয়। তার মধ্যে দুটি রসম ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হচ্ছে ইশআর' অর্থাৎ উটের কুঁজোয় একটি হাল্কা ক্ষতরেখা এঁকে দেওয়া। আর অপরটি হচ্ছে 'তাকলীদ' অর্থাৎ কুরবানীর জন্তুগুলোর গলায় কালাদা বা গলাবন্ধ লাগানো, যার মধ্যে লোহার না'ল থাকত। এই সমস্ত চিহ্ন দেওয়ার লক্ষ্য ছিল, যে কোন লোক দেখেই যেন বুঝতে পারে, এগুলো হচ্ছে কুরবানীর পশু, যা হারাম শরীফের জন্য মানত করা হয়ে গেছে। কেননা প্রচলিত বিধি অনুযায়ী অনুরূপ পশুকে নিয়ে কেউ কখনো টানা হেঁচড়া করত না।

যাত্রীদের মধ্যে কারো কাছেই তীর ও তরবারি ছাড়া কোন অস্ত্র ছিল না। তরবারিগুলো ছিল আবার কোষবদ্ধ। কেননা এই সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল উমরা করা–যুদ্ধের সাথে কোনভাবেই জড়িয়ে পড়া নয়। তাছাড়া উপস্থিত সময়ের চাহিদাও এই ছিল যে, কুরায়শকে সম্ভব সব উপায়ে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করা যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে হারাম শরীফ যিয়ারত করা ছাড়া মুসলমানদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

কুরায়শ কর্তৃক বাধাদানের সংকল্প

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সতর্কতামূলকভাবে বাশার বিন সুফ্য়ান আলকা'বীকে কুরায়শের হাবভাব জানার জন্য আগে ভাগেই মক্কা মুকাররমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উসফানের নিকটবর্তী হলে, বাশার বিন সুফ্য়ান মক্কা থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জানান, কুরায়শ আপনার আগমন সংবাদ পেয়ে গেছে এবং তারা আশে পাশের সবগুলো গোত্রকেই বলে দিয়েছে যে, আপনাকে তারা বাধা দান করবে। তারা নিজেরাও লোকলশ্কর নিয়ে যী-তাওয়ায়[৩] এসে অবস্থান করছে। তারা বলছে যে, আপনাকে কখনো হারাম শরীফে প্রবেশ করতে দেবে না। তারা খালিদ বিন ওয়ালদের নেতৃত্বে (যিনি তখনো মুসলমান হন নি) দু'শ যোদ্ধা সম্বলিত একটি অশ্বারোহী বাহিনীও ইতিমধ্যে 'কুরাউল্ গামীম'[৪]-এ পাঠিয়ে দিয়েছে।[৫]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বাণী

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ কুরায়শদের অমঙ্গল হোক, তাদেরকে যুদ্ধ বিগ্রহ তো ইতিমধ্যে খেয়ে ফেলেছে। যদি এ বিষয়টি আমার ও আরবদের উপর ছেড়ে দেয় তবে তাদের কোন্ ক্ষতি হয়? যদি আরবরা আমাকে শেষ করে ফেলে তবে কুরায়শের লক্ষ্য তো আপনা-আপনি পূরণ হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আরবদের উপর বিজয়ী করেন তাহলে তো ওরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করবে। আর যদি তা না করে তাহলে যতক্ষণ দেহে শক্তি আছে তারা লড়বে। এমতাবস্থায় কুরায়শের আবার কিসের চিন্তা? আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে কাজের জন্য পাঠিয়েছেন, আল্লাহ্র কসম, আমি সেজন্য অবিরাম যুদ্ধ করে যাব, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে জয়যুক্ত করেন কিংবা আমাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেন।[৬]

রাস্তা পরিবর্তন করে হুদায়বিয়ায় উপনীত

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এমন কে আছে যে, কুরায়শরা যে রাস্তায় অবস্থান করছে, সে রাস্তা বাদ দিয়ে অপর কোন রাস্তা দিয়ে আমাকে নিয়ে চলবে? আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সে আহ্বানে সাড়া দেন। তিনি ঘাটির পর ঘাটি অতিক্রম করে এমন একটি দুর্গম পাথুরে রাস্তা দিয়ে মুসলমানদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলেন, যা অতিক্রম করা ছিল খুবই দুরূহ। পথ চলা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সবাই বলো—

نَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَنَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তারই নিকট তাওবা করছি।"

বনী ইসরাঈলকে قُوْلُوْا حِطَّةٌ (বলো ক্ষমা চাই)-এই মর্মে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তার লক্ষ্যও ছিল তাই। কিন্তু তারা সে নির্দেশ পালন করে নি।

যাহোক, কুরায়শের অশ্বারোহীরা যখন জানতে পারল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্য পথ ধরে মক্কার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তখন তারাও তাদের অবস্থান ছেড়ে দ্রুত মক্কার দিকে ফিরে যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করে হুদাইবিয়ার নিকটবর্তী 'ছানিয়াতুল মারারে'[৭] গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর উট বসে পড়ে। তাকে উঠানোর অনেক চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সে উঠেনি। সম্ভবত: এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছিল যে, এখানেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অবস্থান গ্রহণ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সে ইঙ্গিত অনুযায়ী কাজ করেছিলেন।

কুরায়শের কাছে পয়গাম প্রেরণ

সর্বপ্রথম খুযা'আ গোত্রের সর্দার বুদায়ল বিন ওরাকা কয়েকজন অশ্বারোহী সহ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ খিদমতে পৌছে এবং নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রাসূল, কুরায়শরা শপথ নিয়েছে যে, তারা যুদ্ধ করেই প্রাণ দেবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বলেন, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসি নি, শুধুমাত্র তাওয়াফ ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছি। যারা আমাদের বাধা দেবে আমরা বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়ব। বুদায়ল ফিরে গিয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কুরায়শকে অবহিত করে। এরপর কুরায়শের পক্ষ থেকে মিকরায বিন হাফস্ এবং হুলায়স বিন আলকামাও আসে। বিশেষ করে হুলায়স বিন আলকামা কুরবানীর সত্তরটি উট দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয় এবং এখান থেকে ফিরে গিয়ে কুরায়শকে বলে, কা'বা শরীফের যিয়ারত ও তাওয়াফ থেকে বাধা প্রদান করার কোন অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা যদি অনুমতি না দাও তাহলে আমি সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাব। একথার উপর উরওয়া বিন মাসঊদ সাকাফী বলে, আমি নিজে গিয়ে প্রকৃত পরিস্থিতি দেখে আসছি।

উরওয়া বিন মাসঊদ

উরওয়া এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে কথাবার্তা বলে। সর্বপ্রথমে সে বলে, কুরায়শ চিতার চামড়া পরে আছে। তারা এই মর্মে শপথ নিয়েছে যে, আপনাদেরকে হারাম শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেবে না। এমতাবস্থায় আপনি যদি নিজের জাতিকে হত্যা করে বিজয় লাভ করেন তাহলে এটা কোন্ ভাল কাজের কাজ হবে? আপনি কি ইতিপূর্বে কোন আরব সম্পর্কে একথা শুনেছেন যে, সে আপন জাতিকে এভাবে ধ্বংস করেছে? আর যদি যুদ্ধের রং বদলে যায় তাহলে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর এইসব লোক, যারা আপনার সাথে রয়েছে, আপনাকে একা রেখে তারা চলে যাবে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। উরওয়ার একথা তাঁর কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকে। তিনি তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিরূপ ভালবাসি তুমি তার কী জান? আমরা তাঁকে একা রেখে চলে যাব?

উরওয়া জিজ্ঞাসা করে, ইনি কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ইব্নে আবূ কুহাফা (আবু বকর)। উরওয়া বলল, ইনি আমার একটি উপকার করেছেন, যার প্রতিদান আমি এখনো দিতে পারিনি। যদি আমার উপর তার এই ঋণ না থাকত তাহলে নিশ্চয়ই আমি তার এই তিরস্কারের জবাব দিতাম।[৮]

উরওয়ার প্রত্যাবর্তন

উরওয়া কোন মীমাংসায় পৌছতে পারে নি। সম্ভবত: এ জন্য সে আসেওনি। কিন্তু সে ছিল খুবই বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ও উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন। তাই স্বভাবত:ই এখান থেকে বেশী প্রভাবিত হয়ে সে ফিরে যায়। সে কুরায়শকে গিয়ে বলে, আমি কায়সার, কিসরা ও নাজ্জাশীর দরবারেও গিয়েছি। কিন্তু মুহাম্মদ (সা) এর সঙ্গীরা তাকে যেভাবে মান্য করে ও যেরূপ শ্রদ্ধা করে, সেরূপ মান্যতা ও শ্রদ্ধা আমি অন্য কোথাও দেখি নি। আমি এমন একটি জনদল দেখে এসেছি, যারা কোন অবস্থায়ই মুহাম্মদ (সা) কে পরিত্যাগ করবে না। এবার তোমরা যে সিদ্ধান্ত ইচ্ছা নিতে পার।

কুরায়শের দিক থেকে কোন সঠিক খবর পাওয়া যাচ্ছিলো না। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের একটি চূড়ান্ত জবাব নিয়ে আসার জন্য খিরাশ বিন উমাইয়া খুযায়ীকে কুরায়শের কাছে পাঠান। তাঁর বাহনরূপে ব্যবহারের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) খিরাশকে আপন উট (নাম ছিল ছা'লব) প্রদান করেন। কুরায়শ সেই উটকে হত্যা করে ফেলে। খিরাশকেও তারা হত্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু সম্মিলিত জনগোষ্ঠী, যারা বিভিন্ন দিক থেকে কুরায়শের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল তাদের বাধা প্রদানের ফলে খিরাশ রক্ষা পান।

কুরায়শ বাহিনীর গতিবিধি

মক্কার কুরায়শরা প্রথম থেকেই মুসলমানদের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে আসছিলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেখানে অবস্থান করছিলেন একবার তারা সেখানে একটি বাহিনীও পাঠিয়েছিল। সেই বাহিনীর সংখ্যা চল্লিশ থেকে আশি জন ছিল বলে জানা যায়। কুরায়শরা বাহিনীকে বলে দিয়েছিল, একজন দু'জন মুসলমানের দেখা পেলে তাদেরকে হত্যা করবে। কিন্তু এই পুরো বাহিনীই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। অবশ্য দয়াল নবী (সা) তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাবার অনুমতি প্রদান করেন।

এই ঘটনার প্রতি ইংগিত করেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۔

"তিনি মক্কা উপত্যকায় ওদের হস্ত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হস্ত ওদের থেকে নিবারিত করেছেন ওদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা দেখেন।" (৪৮ : ২৪)

আল্লাহ্ তা'আলা কুরায়শদের হাত এভাবে নিবারিত করেন যে, তাদের বাহিনী যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তার কিছুই করতে পারে নি। আর মুসলমানদের হাত এভাবে নিবারিত করেন যে, তাঁরা বিজয় ও আধিপত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, বিনা কারণে হামলা করে যারা অপরাধী হয়েছিল, তাদেরকে কোনরূপ শাস্তি না দিয়েই মুক্ত করে দেয়।

এই ঘটনা দ্বারা কুরায়শের কাছে একথাও প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর আগমনের উদ্দেশ্য যুদ্ধ বা রক্তারক্তি নয়, বরং শুধুমাত্র আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত ও তাওয়াফ করা।

বাই'আতে রিযওয়ান

খিরাশ বিন উমাইয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর (রা) কে পাঠাতে চান। কিন্তু হযরত উমর (রা) এই বলে ওযর পেশ করেন যে, মক্কা-মুকাররমায় আমার গোত্র তথা বনী 'আদী বিন কা'বের এমন কোন লোক নেই, যে আমার পক্ষাবলম্বন করবে। এই কারণে হযরত উছমান (রা) কে তাঁর এক আত্মীয় আবান বিন সায়ীদের নিরাপত্তাধীনে মক্কা মুকাররমায় পাঠানো হয়, যার গোত্র তখন কুরায়শের মধ্যে নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। তাঁকে পাঠানোর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কুরায়শের নেতৃস্থানীয় লোককে একথা বলে দেওয়া যে, আমাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ নয়, বরং শুধামাত্র আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত ও তাওয়াফ করা।

হযরত উছমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দেন। তারা তাঁকে বলে,তুমি নিজে তাওয়াফ করতে পার। কিন্তু তিনি (হযরত উছমান) একাকী তাওয়াফ করতে রাজী হন নি। বরং বলেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাওয়াফ করব না, যতক্ষণ না তাওয়াফ করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সঙ্গীরা। এরপর হযরত উছমান (রা)কে মক্কায় আটকে রাখা হয়। ফলে এই মর্মে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত উছমান (রা) কে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। এই সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসেছিলেন। এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি বলেন, আমরা এই জায়গা থেকে ততক্ষণ টলব না যতক্ষণ না কুরায়শের সাথে যুদ্ধ করি। তিনি এর উপর সাহাবা কিরামকে বাই'আত করারও আহ্বান জানান। উৎসর্গীকৃত প্রাণ সাহাবা কিরামের মধ্যে তখন বাই'আত করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। একজন সাহাবী তো শুধু একবার নয়, বরং তিন তিন বার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হাতে বায়'আত করেন। সেদিন বাই'আত গ্রহণ করা হয়েছিল একথার উপর যে, যদি যুদ্ধ করতে হয় তাহলে যে কোন পরিস্থিতিতে সবাই অবিচল ও সুদৃঢ় থাকবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন বাম হাতকে হযরত উছমান (রা) এর ডান হাত সাব্যস্ত করে তাঁর পক্ষ থেকেও বাই'আত গ্রহণ করেন। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا .

"মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে আপনার কাছে বাই'আত করল তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন, তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।" (৫৮ ঃ ১৮)

এ বাই'আতের সংবাদ তো গোপন থাকতে পারে না। কুরায়শরা যখন জানতে পারে তখন নিশ্চিতভাবে তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়ে থাকবে। সন্ধির প্রতি তাদেরকে অবনমিত করে তোলার ব্যাপারে এই বাই'আতও ছিল নিঃসন্দেহে একটি কার্যকর উপাদান। (সংকলক)

টীকা ঃ

১। এটা হচ্ছে তাবাকাতে ইবনে সা'দ এর বর্ণনা। ইবনে হিশাম-এর মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নুমায়লা বিন আবদুল্লাহ্ আল্ লায়ছীকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছিলেন।

২। আমাদের এখানে এটা ছিল ১৩ মার্চ, ইং ৬২৮ সন রোজ রবিবার। এই একদিনের আগ পিছু হওয়াটা কোন ধর্তব্য বিষয় হতে পারে না।

৩। কারো কারো মতে এ স্থানের নাম বুস্র।

৪। 'কুরাউল গামীম' একটি উপত্যকা, যা আসফান থেকে ৮ মাইল দক্ষিণ দিকে (মক্কা মুকাররমার দিকে) অবস্থিত।

৫। বিভিন্ন রিওয়ায়াতে আছে, খালিদ বিন ওয়ালীদ অথবা ইকরামা বিন আবূ জাহ্লকে অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়েছিল। মরহুম মাওলানা শিবলী বলেন, আবূ জাহ্লের পুত্র ইকরামাও অশ্বারোহীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৪১৩)।

৬। ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পৃষ্ঠা-৩০৮।

৭। হুদাইবিয়া হচ্ছে সেই স্থান, যাকে আজকাল শুমায়সী বলা হয়। জিদ্দা থেকে মক্কা মুকাররমা যাবার সময় এটা ঠিক হারাম শরীফ সীমান্তে পড়ে। জায়গা ঠিক পূর্বেরটাই, তবে নাম বদলে ফেলা হয়েছে। মক্কা মুকাররমা থেকে এর দূরত্ব বাইশ তেইশ কিলোমিটার-আনুমানিক চৌদ্দ মাইল। এখানে নির্মিত মীনারটি হারাম শরীফের সীমানা নির্দেশ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই স্থানেই অবস্থান করছিলেন। এখানে কুরায়শের দূত এবং প্রতিনিধিরা আসত। এখানেই বাই'আতে রিযওয়ান সম্পাদিত হয়েছিল। এখানেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল হুদাইবিয়া সন্ধি। এখানকার মসজিদে যে প্রস্তরলিপি লাগানো রয়েছে, তা পাঠ করে কোন কোন লোক এই ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছেন যে, এর নির্মাণকাল বুঝি হিঃ ১২৫৫ সন, মুতাবিক ইং ১৮৩৯ সন। প্রকৃতপক্ষে এই মসজিদ, যা 'বাই'আতে রিযওয়ান' এর জায়গায় নির্মিত হয়েছে, তার নির্মাণ কাজ সুলতান মাহমূদ ছানী উছমানী-এর যুগে শুরু হয়েছিল কিন্তু কাজ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই সুলতানের ইনতিকাল হয় এবং অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করেন সুলতান আবদুল মজীদ খান। ইনি মুহাম্মদ খান নন, বরং মুহমূদ খান-মাহমূদ খান ছানী উছমানী অথবা সুলতান মাহমূদ মুসলিহ।

৮। জাহিলিয়া যুগে উরওয়ার উপর একটি রক্তমূল্য ধার্য করা হয়েছিল। তখন হযরত আবূ বকর (রা) সাহায্য স্বরূপ তাকে দশটি যুবতী উট দিয়েছিলেন। উরওয়া, হযরত আবূ বকর (রা) এর এই উপকারের প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করেছিল।

হুদাইবিয়া সন্ধি ও বাই'আতে রিযওয়ান -২

সুহায়ল বিন আমর ও সন্ধিপত্র

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বললেন, কুরায়শরা আমার সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হোক এবং আমার ব্যাপারটি আরবদের উপর ছেড়ে দিক, এমতাবস্থায় আরবরা যদি আমার উপর বিজয় লাভ করে তাহলে তো কুরায়শের লক্ষ্য আপনাআপনি পূরণ হয়ে যাবে, আর আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে বিজয়ী করেন তাহলে তো আরবরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে- তখন কুরায়শরা সন্ধির ব্যাপারে যথাযথ আলাপ আলোচনার জন্য সুহায়ল বিন আমরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে প্রেরণ করে এবং নিম্নলিখিত শর্তাধীনে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

১। দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। লোকেরা শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন যাবন করবে এবং এই সময়ে কেউ কারো উপর হামলা করবে না।

২। মুসলমানরা এবার ফিরে যাবে, আগামী বছর আসবে এবং তিন দিন মক্কায় অবস্থান করে যিয়ারত ও তাওয়াফ করবে। তবে এই শর্তে যে, শুধু তরবারি সঙ্গে নিয়ে আসবে, সে তরবারি আবার কোষবদ্ধ থাকবে এবং কোষ থাকবে থলে ইত্যাদির মধ্যে।

৩। কুরায়শের কোন লোক যদি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মদ (সা) এর কাছে চলে যায় তাহলে কুরায়শরা তলব করার সাথে সাথে তাকে ফেরত দিতে হবে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা) এর কোন লোক যদি কুরায়শের কাছে ফিরে আসে তাহলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।

৪। দুই পক্ষ কেউ কারো সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তাদের অন্তরের ময়লা (বিদ্বেষ, শত্রুতা ইত্যাদি) অন্তরেই থাকবে; তা কখনো প্রকাশ করা যাবে না।

৫। যে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় ইচ্ছা করবে সে বা তারা মুহাম্মদ (সা) এর সাথে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে; অনুরূপভাবে যে ইচ্ছা করবে সে কুরায়শের সাথে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এমতাবস্থায় তাদেরকে উভয় পক্ষের দিক থেকে নিরাপত্তা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত মনে করা হবে।

লিপিবদ্ধ করণে বাধা-বিপত্তি

এই সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করার সময় কিছু কিছু বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়। হযরত আলী (রা) কে লিপিবদ্ধ করণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি পত্রের শিরোভাগে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' (করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে) একথাটি লিপিবদ্ধ করেন। এতে অপর পক্ষ থেকে আপত্তি উত্থাপন করা হয়। কেননা আরবদের সাধারণ রীতি এই ছিল যে, তারা অনুরূপ জায়গায় 'বিইসমিকা আল্লাহুম্মা' - একথাটি লিখত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, 'বিইসমিকা আল্লাহুম্মা'-ই লিখ। এরপর লেখা হলো, নিম্নলিখিত শর্তে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সুহায়ল বিন আমরের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেছেন। সুহায়ল তখন বলে, আমরা যদি আপনাকে 'রাসূলুল্লাহ্' বলে মেনে নিতাম তাহলে তো কোন ঝগড়াই থাকত না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ্র রাসূল। তবে এখানে 'মুহাম্মদ' বিন আবদুল্লাহ্ই লিখে দাও। অর্থাৎ, 'মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্, সুহায়ল বিন আমরের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করছেন।

আবূ জান্দালের ঘটনা

বস্তুত: সুহায়লের উভয় আপত্তিই মেনে নেওয়া হয়। কেননা এ বিষয়গুলো মৌলিক ও প্রত্যক্ষ ছিল না, বরং ছিল স্রেফ প্রাসঙ্গিক ও পরোক্ষ। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যার ফলে সাহাবা কিরামের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সুহায়ল বিন আমরের পুত্র ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এবং তাঁকে শিকল পরিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। এমতাবস্থায় তিনি কোন না কোনভাবে বন্দীশালা থেকে বের হয়ে পায়ের শিকল নিয়েই হুদায়বিয়ায় গিয়ে পৌঁছেন। সুহায়ল তার পুত্র আবূ জান্দাল (রা) কে দেখার সাথে সাথে এ দাবী করে বসে যে, সন্ধিপত্রের শর্তানুযায়ী একে ফিরিয়ে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, এখনো তো সন্ধিপত্র লেখা সম্পূর্ণ হয় নি। সুহায়ল সাথে সাথে বলে উঠে, তাহলে তো সন্ধির ব্যাপারটি নিষ্পত্তি হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, আমার খাতিরেই একে এখানে থাকার অনুমতি দাও। মিকরায বিন হাফ্স (যে সুহায়লের সাথে ছিল) বলে, ঠিক আছে, আমরা অনুমতি দিলাম। কিন্তু সুহায়ল বেঁকে বসে এবং আবূ জান্দাল (রা) কে এখানে রেখে যেতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তখন আবূ জান্দাল (রা) বলেন, মুসলমান ভাইরা, আমি এত নির্যাতন সহ্য করলাম, তোমরা কি আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে?

আবূ জান্দালের একথাটি মুসলমানদের দারুণ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়াঁয়। এতদ্ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'আবূ জান্দাল, ধৈর্য ধরণ করো, শীঘ্রই আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মুক্তির একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

হযরত উমর (রা) এর ক্রোধ

এই ঘটনায় হযরত উমর (রা) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা) এর কাছে যান এবং তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয়।

উমর (রা) ঃ আমাদের রাসূল (সা) কি আল্লাহ্ প্রেরিত নন?

আবূ বকর ঃ কেন নন?

উমর (রা) ঃ আমরা কি মুসলমান নই?

আবূ বকর ঃ কেন নই?

উমর (রা) ঃ দ্বীনের ব্যাপারে এ ধরনের অপমান কেন সহ্য করা হচ্ছে?

আবূ বকর ঃ উমর, রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর আঁচল শক্ত করে ধরো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহ্র রাসূল।

উমর (রা) ঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহ্র রাসূল।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথেও অনুরূপ কথাবার্তা হয়। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করতে পারি না।

হযরত উমর (রা) ভাবোচ্ছাসবশত: ইতিমধ্যে যে ধরনের কথাবার্তা বলেছিলেন, তাতে অত্যন্ত অনুতপ্ত হন।

শর্তসমূহের মর্মকথা

এই সন্ধির মৌলিক দিক নিয়ে সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। তবে অধিকাংশ মুসলমান যে সব শর্তের কারণে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তা ছিল এই যে, "যদি কুরায়শের কোন লোক তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মদীনায় চলে আসে তাহলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে। আর মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।" সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে, এই শর্তের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে এমন কোন জিনিস নেই, যা মুসলমানদেরকে বিচলিত করতে পারে। তবে বাহ্যিক শব্দের মধ্যে এমন একটা রেশ আছে, যার কারণে অন্তরে কিছুটা ধাক্কা লাগা স্বাভাবিক। আর এই ধাক্কার জবাবেই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর (রা) কে বলেছিলেন; আমার কাছ থেকে যে লোক চলে যাবে, সে নিঃসন্দেহে মুনাফিক। অতএব তার চলে যাওয়াই শ্রেয়। অবশ্য যে সব

মুসলমানকে আমি ফিরিয়ে দেব (তাদের ব্যাপারটি আমাদের কাছে বেদনাদায়ক হলেও) আল্লাহ্ তা'আলা শীঘ্রই তাদের জন্য একটা সুরাহা করে দেবেন।[১] এটা কি ঠিক নয় যে, যারা জেনে শুনে মদীনা মুনাওওরা থেকে মক্কা মুকাররমায় চলে আসত, তাদের হয় মস্তিষ্কে বৈকল্য ছিল, না হয় অন্তরে। অন্য কথায়, হয় তাদের মস্তিষ্ক সুস্থ বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা থেকে শূণ্য ছিল, নয়ত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা ছিল মুনাফিক। অতএব উভয় অবস্থায়ই তাদের উপর গুরুত্বারোপ করার কোন কারণ ছিল না। আর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি ঘটনাও ঘটে নি যে, কোন ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গেছে কিংবা পালিয়ে যাবার সংকল্প নিয়েছে।

বাকী রইলো মদীনা মুনাওওরা থেকে কুরায়শের তলবকৃত মানুষকে (মুসলমানকে) মক্কয় ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি। তবে এটা তো জানা কথা যে, যে সব মুসলমান মক্কায় রয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা সেখানেও ইসলাম প্রচারের সুব্যবস্থা করেছিলেন। অন্যকথায়, ঐ সব লোকেরা যেন ইসলাম প্রচারের এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিলেন। আর যারা বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন তারা মক্কা, মদীনা উভয় স্থান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক আর একটি স্থানে নিজেদের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত কুরায়শেরই সমূহ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং একমাত্র এ করাণেই কুরায়শরা এই শর্তটি রহিত করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। .... যেন এই শর্তটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে ইসলামের প্রচার ও দৃঢ়ায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং কুরায়শকে দারুনভাবে বিচলিত ও ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এখানে কেবল একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি।

মক্কায় ইসলাম প্রচার

আবূ জান্দাল (রা) সম্পর্কে মরহুম মাওলানা কাযী সুলায়মান বলেন, আবূ জান্দাল (রা) মক্কায় পৌঁছেই ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তাঁর পাহারায় যাকেই রাখা হত তিনি (আবূ জান্দাল) তার সামনে তাওহীদ ও একত্ববাদের সৌন্দর্যাবলী তুলে ধরতেন এবং আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও পরাক্রমের কথা বর্ণনা করে তাকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের উপর ঈমান আনতে বলতেন। এটা আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতার একটা বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, আবূ জান্দাল (রা) যার কাছেই ইসলাম প্রচার করতেন সেই মুসলমান হয়ে যেত। কুরায়শরা তখন সেই নওমুসলিম কেও বন্দী করে ফেলত। এরপর এই দুই বন্দী একসাথে মিলে ঐ বন্দীশালায় আরো জোরেসোরে প্রচার কার্য চালাত।

মোটকথা, এক আবূ জান্দাল (রা) কে বন্দী করে রাখার ফলে এক বছরের মধ্যে মক্কার আনুমানিক তিন শ ব্যক্তি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

এবার কুরায়শরা আক্ষেপের সুরে বলতে থাকে, এই নওমুসলিমদের ফেরত নিয়ে আসার শর্তটি আমরা কেন সন্ধিপত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম? এরপর তারা মক্কার নেতৃস্থানীয় কয়েক ব্যক্তিকে মদীনা মুনাওওরায় পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জানিয়ে দিল যে, আমরা এই শর্তটি রহিত করলাম। আপনি এই সব নওমুসলিমদের আপনার কাছেই ডেকে নিয়ে আসেন।

আবূ বাসীর (রা)

এ ক্ষেত্রে আবূ বাসীর (উতবা বিন উসায়দ) এর ঈমান বর্ধক ঘটনাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পবিত্রচেতা নওমুসলিম মক্কা থেকে মদীনায় এসে পৌঁছামাত্র, তাঁকে ফেরত নিয়ে যাবার জন্য কুরায়শরা দু'জন লোককে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে পাঠায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, আবূ বাসীর, তুমি ফিরে যাও, আমরা সন্ধি চুক্তির বরখেলাফ করতে পারব না। আবূ বাসীর নিবেদন করেন, কুরায়শের কাফিররা আমার উপর নির্যাতন চালাবে এবং আমাকে সত্য দ্বীন থেকে ফেরাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এমতাবস্থায় আপনি আমাকে ফেরত পাঠাবেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অঙ্গীকার পালন আমাদের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য নিশ্চয়ই একটা সুরাহা করে দেবেন। শেষ পর্যন্ত আবূ বাসীর (রা) কে ফেরত যেতেই হলো। কিন্তু ফেরত যাবার

সময় তিনি পথিমধ্যে কুরায়শ প্রেরিত দুটি লোকের একটিকে হত্যা করে ফেলেন এবং অপরটি কোনমতে পালিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে আপন সঙ্গী হত্যার ফরিয়াদ পেশ করে। আবূ বাসীর (রা) ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে হাযির হন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি তো আপনার অঙ্গীকার অনুযায়ী আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার মুক্তির একটি পথ করে দিয়েছেন এবং আমি তা থেকে উপকৃত হয়েছি। আমি তো এখন মদীনায় থাকছি না।

তারপর তিনি 'আয়স' চলে যান।[২] আয়স হচ্ছে মক্কা-সিরিয়া রাজপথের একটি প্রসিদ্ধ স্থান, যা সমুদ্রোপকূলের সন্নিকটে অবস্থিত। আর ডক্টর হামীদুল্লাহ্‌র মতে, এটা হচ্ছে হামরা ও বদরের মধ্যবর্তী একটি জংলী জায়গা। এরপর আবূ জান্দাল (রা) ও অন্যান্য নও মুসলিমগণ একের পর এক আবূ বাসীর (রা) এর ওখানে গিয়ে সমবেত হন এবং সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করেন। একদা আবুল আ'স বিন রাবী' বিন আবদে শাম্‌স্ -এর বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে ফিরে আসছিলো। আবূ বাসীর, আবূ জান্দাল (রা) এবং তাঁদের অন্যান্য সঙ্গীরা আবুল আ'স সম্পর্কে ভাল ভাবেই অবহিত ছিলেন। সে ছিল মক্কার অভিজাত পরিবারের সন্তান। রাসূলুল্লাহ (সা) এর কন্যা হযরত যায়নাব (রা) এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। অবশ্য ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়। আবূ বাসীর (রা) ও তাঁর সঙ্গীরা আবুল 'আসের মাল -আসবাব লুণ্ঠন করেন সত্য, তবে ঐ কাফেলার কারো উপর কোনরূপ নির্যাতন করেন নি। এমতাবস্থায় আবুল 'আস মদীনায় গিয়ে হযরত যায়নাব (রা) এর মাধ্যমে তার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে পেশ করেন। শেষ পর্যন্ত সাহাবা কিরামের পরামর্শ অনুযায়ী আবুল 'আসের মাল আসবাব তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আবূ বাসীর, আবূ জান্দাল (রা) এবং তাঁদের সঙ্গীরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)- এর এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারেন তখন তাঁরা এক এক করে আবুল 'আসের যাবতীয় মাল-আসবাব ফিরিয়ে দেন, এমনকি তাঁর উটের নাঁকাগুলো ফেরত দিতে পর্যন্ত ভুলেন নি। আবুল 'আস সবকিছু নিয়ে মক্কায় পৌছেন এবং প্রত্যেকটি লোকের অর্থকড়ি ও পণ্য সামগ্রী তাকে বুঝিয়ে দেন। এরপর মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তখন বলেন, আমি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করলে কুরায়শরা বলত যে, মানুষের মাল-আসবাব তসরুফ তথা আত্মসাৎ করেই আমি মুসলমান হয়ে গেছি।

শর্ত রহিত হলো

মরহুম মাওলানা শিবলী বলেন; কুরায়শরা বাধ্য হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)- এর কাছে এই মর্মে একটি লিপি পাঠাল যে, আমরা সন্ধি চুক্তির এই শর্তটি রহিত করলাম। এখন যে মুসলমানই চায় মদীনায় গিয়ে বসবাস করতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদের আর কোন আপত্তি নেই।[৩]

সন্ধির সাক্ষীগণ

ইবনে হিশামের মতে, মূল চুক্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) হযরত আবদুল্লা বিন সুহায়ল বিন আমর (রা) মিকরায বিন 'হাফস' হযরত মাহমূদ বিন মাসলামাহ (রা)। চুক্তিপত্রটি লিখেছিলেন হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা)। তাবাকাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ উবায়দা বিন আলজাররাহ এবং হুভায়তাব বিন আবদুল উযযাও সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেছিলেন।

বনূ খুযা'আ' ঘোষণা করে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ থাকবো। অপর দিকে বনূ বকর ঘোষণা করে, আমরা কুরায়শের মিত্ররূপে থাকবো।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানেই ঐ সব উট কুরবানী করেন, যে গুলোকে এই উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। তারপর তিনি (সা) হলক (মস্তক মুন্ডন) করেন। সাহাবা কিরামও এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে অনুসরণ করেন। তবে তাঁদের কেউ কেউ হলক করেন এবং কেউ কেউ শুধু কাস্‌র (কেশ কর্তন)।

হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর সূরা ফাতহ্ নাযিল হয়। তাতে ঐ সব নিদর্শনাদির উল্লেখ ছিল, যেগুলো প্রকাশিত হওয়ার মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল।

উমরাতুল কাযা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী যীকাদ, হিঃ ৬ সনে উমরা না করেই ফিরে গিয়েছিলেন, তাই যীকাদা, হিজরী ৭ সনে[৪] পুনরায় মক্কা আগমন করেন। তখন তাঁর সংগে দু'হাজার সাহাবী ছিলেন। তিনি কুরবানীর জন্য ষাটটি উটও সংগে নিয়ে এসেছিলেন। তাবাকাত'এর বর্ণনানুযায়ী,রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'মাররায্ যাহরানে' অবতরণ করেন। আর অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে দেন্ বাতনে ইয়াজাজে, যেখান থেকে হারাম শরীফে রক্ষিত মূর্তিসমূহ নজরে পড়ত।[৫] যেহেতু তরবারি ছাড়া অন্য কোন হাতিয়ার উমরা আদায়কালে সংগে আনার ছিল না, তাই আওস বিন খওলা আনসারকে এক শ সংগী সহ সেগুলোর হিফাযতের দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়।বাকী সব সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন। হুযুর (সা) কুস্ওয়ার উপর সওয়ার ছিলেন। এর নাঁকা ছিল আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা)-এর হাতে। এই অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাওয়াফ ও সায়ী' সম্পন্ন করেন। এরপর মারওয়ার কাছে পশু কুরবানী করেন। মক্কাবসীরা আশেপাশের পাহাড়সমূহে চলে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নির্দেশ মুতাবিক হযরত বিলাল (রা) মসজিদে হারামে আযানও দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জন্য চামড়ার তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। তাতেই তিনি মক্কা অবস্থানকালীন তিন দিন অতিবাহিত করেন।এরপর একটি দলকে তরবারিগুলো পাহারা দেওয়ার জন্য ইয়াজাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে ইতিপূর্বে মোতায়েনকৃত পাহারাদারগণ উমরা আদায় করতে পারেন। তিন দিন পূর্ণ হওয়ার পর তিনি (সা) মক্কা থেকে রওয়ানা হন এবং সারফে গিয়ে অবস্থান করেন। সারফ মক্কা থেকে আট মাইল উত্তরে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনা মুনাও্ওরায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন হজ্জের মাস এসে গিয়েছিল।

টীকা ঃ

১। আসাহ্হুস সিয়ার ঃ পৃষ্ঠা - ১৭৭।

২। মদীনা মুনাওওরা থেকে এই স্থানে পৌঁছতে চার রাত সফর করতে হয়।

৩। সীরাতুন্নবীঃ প্রথম খন্ডঃপৃষ্ঠা-৪২৪।

৫। 'ইয়াজাজ' সম্পর্কে মু'জামুল বুলদানে যা বলা হয়েছে তা হলো, এটা মক্কা মুকাররমা থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। এক উক্তি অনুযায়ী, এটা হচ্ছে সেই'স্থান, যেখানে হযরত খুবায়ব (রা) কে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এটা মসজিদে তানয়ীম থেকে দুমাইল দূরে। সেখানে পরবর্তীকলে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, যকে 'মসজিদে শাজরাহ' বলা হত। 'ইবনে হিশাম' এর টীকায় আছে, এটা মক্কার একটা জায়গার নাম, যেখান থেকে হারাম শরীফে রক্ষিত মূর্তিসমুহ নজরে পড়ত। অতএব এ জায়গাটি মক্কা থেকে বেশী দূরে না থাকারই কথা।

বিশ্বজনীন দাওয়াত ও তাবলীগের সূচনা

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۔

"হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন।" - (৫ঃ৬৭)

রাজা-বাদশাহ্ ও প্রশাসকদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত-১

বিশ্বজনীন রিসালাত

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পয়গাম শুধু আরবদের জন্য ছিল না, বরং ছিল সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا .

"বলুন, হে মানুষ, আমি তোমদের সকলের জন্য আল্লাহ্র রাসূল।"–(৭:১৫৮)

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا .

"আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।"–(৩৪:২৮)

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ .

"তিনি তাঁর রাসূলকে পথ-নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দ্বীনের উপর এটাকে জয়যুক্ত করার জন্য।"– (৪৮:২৮)

বিভিন্ন হাদীস দ্বারাও একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র বিশ্ববাসীর হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্যান্য নবীদের মুকাবালায় তার যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। এক রিওয়ায়াতে আছে– بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً –"আমি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

অপর একটি রিওয়ায়াতে আছে– بُعِثْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً –"আমি সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

আর একটি দিক

এ ব্যাপারে লক্ষ্যণীয় আর একটি দিক হলো–

১। 'দ্বীনে হক' (দ্বীনে ইসলাম) এর আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন 'রাব্বুল আলামীন' অর্থাৎ জগতসমূহের বা সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। তাঁর প্রতিপালন-বেষ্টনী সম্পূর্ণ সৃষ্টিজগতকে আপন রহমতের আঁচলে বেঁধে রেখেছে। এটা এতই বিরাট ও প্রশস্ত যে, এর পরিমাপ করতে গিয়ে আমাদের অংক শাস্ত্র ও পরিসংখ্যান বিদ্যা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রতিক মহাশূন্য সফরের পর যে সব তথ্যাদি আমাদের সামনে আসছে, তার আলোকে বলা চলে যে, সৃষ্টি জগত পরিমাপ করা তো দূরের কথা, সে সম্পর্কে কিছু বলাও এখন মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২। 'দ্বীনে হক' এর রাসূল হচ্ছেন 'রাহমাতুল লিল আলামীন' অর্থাৎ তিনি জগতসমূহের বা সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য সম্পূর্ণরূপে এক রহমত স্বরূপ।

৩। 'দ্বীনে হক' এর কিতাব অর্থাৎ কুরআন মজীদ হচ্ছে 'যিকরুল লিল আ-লামীন' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতের ওয়ায-নসীহত তথা উপদেশের উৎস।

৪। 'দ্বীনে-হক' এর কেন্দ্র অর্থাৎ কা'বা হচ্ছে' হুদাল্ লিল আ-লামীন' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণ ও হিদায়াতের পুঁজি।

মোট কথা, এই দ্বীনের (দ্বীনে ইসলামের) কোন মৌলিক দিকই এমন নয়, যা কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, বা নির্দিষ্ট মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বরং এর প্রত্যেকটি দিকই সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত বা পয়গাম বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন হওয়ার এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় দলীল।

মূল অযীফা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল এই সত্যের পয়গামের জন্য উৎসর্গীকৃত। যেহেতু তাঁর রিসালত ছিল বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন, তাই স্বাভাবিকভাবেই সে রিসালতের তাবলীগ ও প্রচারকার্যও বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ব্যাপকতর হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কুরায়শের সীমাহীন বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা, এর একেবারে সূচনাকালে এমন এক আক্ষেপজনক অবস্থার সৃষ্টি করল যে, প্রথমে মুসলমানদের বেশ বড় একটি দলকে নিজেদের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে হল, যাতে করে তাঁরা জুলুম নির্যাতনের সেই আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন, যে আগুন কুরায়শরা মক্কা ও তার আশে পাশে প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিল এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ইবাদত করতে পারেন তাঁদের সেই প্রভুর, যিনি এক এবং যার কোন শরীক নেই। এ কারণে কোন কোন সাহাবী তো আবিসিনিয়ায় বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে দেন। এমন কি একনিষ্ঠ মুমিনদের সর্বশেষ দল আবিসিনিয়া থেকে সেই সময়ে মদীনা মুনাওওরায় এসে পৌঁছে যখন হিজরতের সপ্তম বর্ষ শুরু হয়ে গেছে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এই দাওয়াত কবুল করার জন্য ইয়াছরিব বাসীদের অন্তর খুলে দেন। ফলে মুসলমানদের জন্য আর একটি নতুন আশ্রয়স্থল জোটে, যা ছিল মক্কা থেকে আড়াইশ' মাইল উত্তরে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবা কিরাম (রা) সেখানে চলে যান, যাতে করে নিজেদের মূল 'অযীফা' (কর্মসূচী) প্রশান্তির সাথে বাস্তবায়িত করতে পারেন। কুরায়শরা সেখানেও মুসলমানদের পেছন ছাড়েনি। ফলে সংঘর্ষ ও রক্তারক্তির ঘটনা অনবরত: ঘটতে থাকে। কুরায়শের এই শত্রুতা লক্ষ্য করে অন্যান্য কিছু কিছু গোত্রও মুসলমানদের নতুন কেন্দ্র মদীনা মুনাওওরার উপর হামলা পরিচালনার সংকল্প নেয়। কেননা এতে একদিকে যেমন মদীনাবাসীদের ধনসম্পদ করায়ত্ত করা যাবে, অন্যদিকে তেমনি মক্কার কুরায়শদের সামনে নিজেদের একটা ভাবমূর্তি গড়ে তোলা সম্ভব হবে। কুরায়শরা কা'বার মুতাওয়াল্লী হওয়ার দরুন আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তাদেরকে পীরমুরশিদের মর্যাদা দিত বিধায় কুরায়শদের চোখে নিজেদের একটা ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য তারা সর্বদা সচেষ্ট থাকত। কুরায়শরাও তাদেরকে এই ধরনের কাজে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহায়তা প্রদান করত।

এই সব বিপদ-আপদ ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবলীগ (প্রচার), তালীম (শিক্ষা) ও তাযকিয়াহ (পবিত্র করণ) এর কাজ বরাবর জারী রাখেন। কিন্তু এজন্য যে অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন ছিল, তা হুদায়বিয়া সন্ধির পরই মুসলমানদের করায়ত্ত হয়। কেননা এই সন্ধি অনুযায়ী কুরায়শরা দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ ক্ষান্ত দেয়। যদিও খুব শীঘ্রই তাদের দিক থেকে অঙ্গীকার ভঙ্গের ঘটনা ঘটে, তবে তা মক্কা বিজয়ের মূল ভূমিকারূপেই প্রতিপন্ন হয়। এরপর আরবের বেশীর ভাগ লোক হয় ইসলাম গ্রহণ করে, নয়ত জিযয়া প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইসলামের নিরাপত্তাধীনে চলে আসে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মুহ্‌র ও দাওয়াতনামা

হুদায়বিয়া সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের মাসেই মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওওরায় এসে পৌছেন এবং তখনই বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও প্রশাসকদের কাছে পাঠাবার জন্য কয়েকটি দাওয়াতনামা (আমন্ত্রণ লিপি) লিখান এবং সে উদ্দেশ্যে কয়েকজন পত্রবাহক বা দূতও নিয়োগ করেন। তখন সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, যদি চিঠি বা দাওয়াতনামার উপর মুহ্‌র না থাকে তাহলে রাজা-বাদশাহ্‌ বা প্রশাসকরা সেগুলোকে নির্ভরযোগ্য মনে করবে না এবং পড়বেও না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) রূপার একটি সাদামাঠা মুহ্‌র তৈরী করিয়ে নেন, যার উপর মুহাম্মদ, রাসূল, আল্লাহ্ এই তিনটি শব্দ খোদিত ছিল। সর্ব নিম্নে ছিল 'মুহাম্মদ' শব্দ, তার উপর 'রাসূল' এবং তার উপর 'আল্লাহ'।[১] রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জীবনকালে সমগ্র চিঠিপত্র এবং নির্দেশাদিতে এই মুহরই ব্যবহৃত হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পর তা হযরত আবূ বকর (রা) এর এবং আবূ বকর (রা) এর পর হযরত উমর (রা) এর কাছে হস্তান্তরিত হয়। এরপর হযরত উছমান (রা) এর কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার পর তা একটি কূয়ায় পড়ে যায় এবং অনেক তালাশ করেও তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

সর্বপ্রথম ছয়টি দাওয়াতনামা তৈরী করা হয় এবং সেগুলোকে বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহ ও প্রশাসকদের কাছে পৌছবার জন্য বার্তাবাহক (রাষ্ট্রদূত বলাই বাঞ্ছনীয়)-দের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সব দাওয়াতনামা মুহাররম, হিঃ ৭ সনে একই দিনে প্রেরণ করা হয়েছিল।[২] যেহেতু মুহাররমের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন তাই পুরোপুরি সম্ভাবনা এই যে, এই সব দাওয়াতনামা মুহাররমের প্রথম দিকেই পাঠানো হয়েছিলো।

আবিসিনিয়ার বাদশাহ্

সর্বপ্রথম চিঠিটি পাঠানো হয় আবিসিনিয়ার বাদশাহ আসমাহার নামে। তাঁর উপাধি ছিল নাজ্জাশী। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, নাজ্জাশী হচ্ছে 'নেগোশ'-এর মু'রাব (আরবায়ন)। এই চিঠি আমর বিন উমাইয়া যামরীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। এর সূচনায় ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মারয়াম (আ) এর সেই পরিচিতি পেশ করা হয়েছিল, যার সাথে ইসলামী দাওযাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। চিঠিটা ছিল নিম্নরূপ–

انی ادعوك الی اللّٰه وحده لاشریك له والموالات علی طاعته وان تتبعنی

وتؤمن بالذی جاءنی فانّی رسول الله وانی ادعوك وجنودك الی اللّٰه عز وجل

وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتی والسلام علی من اتبع الهدی–

"আমি তোমাকে সেই আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, যিনি এক, যার কোন শরীক নেই। আমি তার আনুগত্যের উপর বন্ধুত্বের দাওয়াত দিচ্ছি। তুমি আমাকে মানো এবং আমি যে শিক্ষা নিয়ে এসেছি তার উপর ঈমান আনো। আমি আল্লাহর রাসূল। আমি তোমাকে ও তোমার লোক-লশকরকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমি সত্যের পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছি এবং উপদেশ প্রদান করেছি। আমার উপদেশ গ্রহণ করো। শান্তি তার উপর, যে হিদায়াতের অনুসারী।"

কোন কোন বর্ণনানুযায়ী এই চিঠির মধ্যে আরো কিছু বাক্য ছিল। যেমন হযরত জা'ফর বিন আবি তালিবা (রা) কে ইঙ্গিত করে লিখা হয়েছিল–

"আমি তোমার কাছে আমার চাচাত ভাই জা'ফর (রা) কে পাঠিয়েছি। তার সাথে আরো কিছু সংখ্যক মুসলমান রয়েছে। ওরা যখন তোমার কাছে আসবে, ওদের আতিথেয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখো।"

কিন্তু এ ধরনের কথা তো মুহাররম, হিঃ ৭ সনের চিঠিতে থাকতে পারে না। কেননা হযরত জা'ফর (রা) ও অন্যান্য কিছুসংখ্যক মুসলমান এ থেকে প্রায় পনেরো বছর পূর্বেই অবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। এতদিন পর তাদের আতিথেয়তার জন্য নাজ্জাশীকে অনুরোধ করার সময় কি এটা? তাছাড়া হযরত জা'ফর (রা) এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী অন্যান্য মুসলমানরা আবিসিনিয়ার খবরাখবর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে প্রায়ই অবহিত করতেন।

পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঐ দাওয়াতী পত্রের যে আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এই বাক্য নেই। হ্যাঁ, এটা সম্ভব যে, হযরত জা'ফর (রা) যখন হিজরত করে আবিসিনিয়ায় যান, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাতেও নাজ্জাশীর নামে একটি চিঠি দিয়েছিলেন এবং সে চিঠিতেই উপরোক্ত বাক্যটি ছিল। নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পত্রের যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা থেকেও এ কথাটি প্রমাণিত হয়।

নাজ্জাশীর উত্তর

নাজ্জাশী বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে লিখেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, আমি আসমান-যমীনের প্রভু-পরওয়ার দিগারের কসম খেয়ে বলছি, তিনি [হযরত ঈসা (আ)] তার চাইতে এক তিল পরিমাণও অধিক কিছু নন। আপনার চাচাত ভাই এবং তাঁর সঙ্গীরা আমার নিকটজন হিসাবেই এখানে অবস্থান করছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র সত্যিকার নবী। আপনি আমার কাছে যে পয়গাম পাঠিয়েছেন, তা আমি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছি। আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র ওয়াস্তে ইসলাম কবুল করেছি এবং আপনার চাচাত ভাইয়ের হাতে বাই'আতও করেছি।

যদিও বাহ্যত: ইসলাম গ্রহণ ও বাই'আতের ব্যাপারটি সঙ্গোপনেই ঘটেছিল, কিন্তু এ ধরনের খবর তো আর গোপন থাকতে পারে না। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করায় পাদ্রীরা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায় এবং একটি বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শনেরও আয়োজন করে। এমতাবস্থায় নাজ্জাশী আসমাহাকে কিছুটা কূটকৌশলের মাধ্যমেই এ পরিস্থিতির মুকাবেলা করতে হয়। অর্থাৎ তিনি ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকেন বটে, তবে পাদ্রীদেরকে কোন না কোন ভাবে সান্ত্বনা দিয়ে ঐ বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করে দেন। যেহেতু আবিসিনিয়ার কোন নির্ভরযোগ্য এমন কি অনির্ভরযোগ্য ইতিহাসেও এ সম্পর্কিত কোন তথ্যাদি পাওয়া যায় না, তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, নাজ্জাশী আসহামা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর এ কারণেই তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর গায়েবানা জানাযার নামায পড়েছিলেন।

একটি জরুরী বিশ্লেষণ

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, আমর বিন উমাইয়া যামরীর হাতে যে দাওয়াতনামা আবিসিনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল, তা আসহামা নাজ্জাশীর নামে নয়, বরং অন্য কোন নাজ্জাশীর নামে ছিল এবং ঐ নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করে নি। খুব সম্ভবত: আসহামার মৃত্যুর পর নতুন নাজ্জাশীর নামেও একটি দাওয়াতনামা পাঠানো হয়েছিল এবং তা আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা) ই নিয়ে গিয়েছিলেন।

এটাও সম্ভব যে, পরবর্তী নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এর দ্বারা নাজ্জাশী আসহামার নামে দাওয়াত নামা পাঠানোর কিংবা তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি অস্বীকার করা যায় না। কেননা–

১। মূল দাওয়াতনামায় আসহামা বিন আবজারের নাম রয়েছে।

২। এর উত্তরে ইসলাম গ্রহণের কথা জানিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে যে পত্র এসেছিল, তা প্রেরণ করা হয়েছিল আসহামার পক্ষ থেকেই।

৩। এটা তো জানা কথা যে, আসহামার মৃত্যুর পর গায়েবানা জানাযার নামায পড়া হয়েছিল। সহীহ্ বুখারীর আল-জানায়িয অধ্যায়ে এ বিষয়টির উল্লেখ আছে। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতারা এটাকে ৮ অথবা ৯ হিজরীর ঘটনা বলে সাব্যস্ত করেছেন।

অতএব একথা মেনে নিতে কোন বাধা নেই যে, মুহাররম, হিজরী ৭ সনে যে দাওয়াত নামা পাঠানো হয়েছিল তা আসহামার নামে-ই লিখা হয়েছিল।

দ্বিতীয় পত্র

ইসলামের দাওয়াতনামা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো একটি চিঠি আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা) এর মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন। তাও আবিসিনিয়ার বাদশাহর নামে লিখা হয়েছিল এবং তাতে দুটি জরুরী কথা ছিল।

১। উম্মে হাবীবা বিনতে আবূ সুফ্য়ান (রা) এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিবাহের পয়গাম।

২। মুহাজিরদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা।

উম্মে হাবীবা বিনতে আবূ সুফ্য়ানের বিবাহ হয়েছিল উবায়দুল্লাহ্ বিন জাহাশ আসাদীর সাথে। উবায়দুল্লাহ্ ছিলেন ইসলামের জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা) এর সহোদর। উম্মে হাবীবা (রা) ও উবায়দুল্লাহ্ উভয়ই ইসলামের খাতিরে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। কিন্তু আবিসিনিয়া পৌছে উবায়দুল্লাহ্ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে উম্মে হাবীবা তার থেকে পৃথক হয়ে যান। কিছু দিন পর উবায়দুল্লাহ্র মৃত্যু হয় এবং উম্মে হাবীবা 'দ্বীনে হক' তথা ইসলামের উপরই সুদৃঢ় থাকেন। তবে একেবারে সঙ্গীহীন হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিবহের পয়গাম সম্পর্কিত চিঠি যখন নাজ্জাশীর হস্তগত হয় তখন তিনি একজন দাসীর মাধ্যমে উম্মে হাবীবা (রা) এর কাছে সে পয়গাম পাঠান। উম্মে হাবীবা (রা) অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে তা গ্রহণ করেন এবং যে দাসীটি তাঁর কাছে ঐ পয়গাম নিয়ে এসেছিল, তিনি তাকে রৌপ্যের দুটি কাঁকন ও কয়েকটি আংটি উপহার দেন। সন্ধ্যাবেলা নাজ্জাশী জা'ফর বিন আবী তালিব এবং অন্যান্য মুসলমানদের একত্রিত করে নিজেই উম্মে হাবীবার বিয়ে পড়িয়ে দেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পক্ষ থেকে উম্মে হাবীবার মাহ্র বাবদ চারশ দীনার তাঁর (উম্মে হাবীবার) উকিল খালিদ বিন সায়ীদের হাতে অর্পণ করেন।[৩] যখন এই অর্থ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) এর কাছে হস্তান্তর করা হয় তখন তিনি এ থেকে অতিরিক্ত আরো পঞ্চাশ দীনার ঐ দাসীকে দান করেন, যে তাঁর কাছে বিবাহের পয়গাম নিয়ে এসেছিল। এভাবে রামলা বিনতে আবূ সুফ্য়ান, যিনি তাঁর মেয়ে হাবীবার নাম থেকে উম্মে হাবীবা উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, উম্মুল মুমিনীন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল হিঃ ৬ সনে। কিন্তু বাহ্যত: এই হিসাবের জন্য কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সব লোক হিজরী বর্ষের সূচনা রাবীউল আউয়াল থেকে করেন তাঁদের মতে এটা হচ্ছে হিজরী ৬ সনের ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে এই বিবাহ সাধারণ হিসাব মতে হিজরী ৭ সনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বিবাহের পর উম্মে হাবীবা (রা) এর দাওয়াতে ওয়ালীমার (বৌ ভাতের) ব্যবস্থাও নাজ্জাশীই করেছিলেন।

মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা

মুহাজিরদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য জলযানের ব্যবস্থা নাজ্জাশীই করে দিয়েছিলেন। তাঁদের সাথে হযরত উম্মে হাবীবা (রা) ও মদীনা মুনাওওরায় এসে পৌছেন। কয়েকটি জলযানে নাজ্জাশী আপন পুত্র আরহাকেও আবিসিনীয় সৈন্যদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে পাঠিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সহীহ্ সালামতে মদীনায় এসে পৌছেন। ডক্টর হামীদুল্লাহ্ লিখেছেন, যখন আবিসিনিয়ার ঐ প্রতিনিধিদল মদীনায় এসে পৌছে তখন তাঁদেরকে বেশ জাঁক জমকপূর্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

আবিসিনীয় সৈন্যরা কোন কোন যুদ্ধেও মুসলমানদের সাথে অংশ গ্রহণ করেছিল। সামহুদী ‘মদীনার ইতিহাসে’ এই পর্যন্ত লিখেছেন যে, নাজ্জাশীর পুত্র হযরত আলী (রা) এর সাথে বন্ধুত্ব তথা ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন এবং আবিসিনিয়ায় ফিরে গিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করতে অস্বীকার করেন।[৪].... রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও নাজ্জাশীর জন্য কিছু উপহার প্রেরণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নাজ্জাশী পরলোক গমন করেছিলেন।[৫] ইমাম মুসলিম লিখেছেন, নাজ্জাশীর স্থলাভিষিক্ত বাদশাহের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি তাবলিগী পত্রও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এর পরিণাম কি হয়েছিল তা জানা যায় নি।[৬]

এটা হচ্ছে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত সেই চিঠি, যা সহীহ্ মুসলিমে উদ্ধৃত করা হয়েছে।[৭] [সংকলক]

টীকা ঃ

১। মুহরের আকৃতি ছিল নিম্নরূপ ঃ



২। মুহাররম, হিঃ ৭ সন–১১ মে, ইং ৬২৮ সনে আরম্ভ হয়। মরহুম কাযী সুলায়মান মানসুরপুরী ‘রাহমাতুল লিল আ-লামীন’ শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, তা ছিল হিজরী ৭ সনের মুহাররম মাসের ১ তারিখ অর্থাৎ ১১ মে, ইং ৬২৮ সন [পৃষ্ঠা-১৯৬) তিনি এ প্রসংগে ‘খাসায়িসুল কুবরা ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ইবনে আবী শায়বা কর্তৃক বর্ণিত) এর রেফারেন্সও দিয়েছেন। কিন্তু আমার এই পুস্তক দেখা হয় নি।

৩। কোন কোন রিওয়ায়াতে নয়শ দীনারের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ চার হাজার দীনারও বলেছেন। আবূ দাউদে চার হাজার দীনারের উল্লেখ আছে। যুহ্রীর রিওয়ায়াতে চল্লিশ আওকিয়ার উল্লেখ আছে। যদি চল্লিশ আওকিয়া পরিমাণ রৌপ্য ধরা হয় তাহলে সর্বমোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ষোল শ দিরহাম। কিন্তু সহীহ্ রিওয়ায়াতে চার’শ দীনারই বলা হয়েছে। [সীরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৪১৬ দ্রষ্টব্য]

৪। ওয়াফাউল ওয়াফা।

৫। আসহামা বিন আবজার।

৬। আরবী হাবশী তাআল্লুকাত ঃ পৃষ্ঠা-১৫।

৭। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবসিনিয়ার পরবর্তী বাদশাহর কাছে ইসলামের দাওয়াতনামা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করে নি। এই বাদশাহ্ আসহামা বিন আবজার নয়। বরং তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি।

রাজা-বাদশাহ্ ও প্রশাসকদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত-২

রোমের কায়সারের নামে

দ্বিতীয় পত্র রোমের কায়সার হিরাক্লিয়াসের নামে প্রেরণ করা হয়। এ জন্য দিহ্‌ইয়া বিন খলীফা আলকালবীকে পত্রবাহক বা রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যান্য পত্রাদির ন্যায় এই পত্রটিও ছিল সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত এবং সব রকম বাহ্যাড়ম্বর থেকে মুক্ত। তাতে বলা হয়েছিল—

انى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرا مرتين فان توليت فان عليك اثم السير سينون وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ .

"আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি; তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, সব রকম বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তোমার সমগ্র প্রজার পাপ তোমার ঘাড়েই চাপবে। হে কিতাবীগণ, এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকেও আল্লাহ্ ছাড়া প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম।"

দ্বিগুণ পুরস্কারের অর্থ এই যে, একটি পুরষ্কার তো খোদ ইসলাম গ্রহণের জন্য এবং অপর পুরষ্কার প্রজাদের ইসলাম গ্রহণের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে নিজেরা তো পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত হবেই, সাথে সাথে প্রজাদের পাপের বোঝাও ঘাড়ে চাপবে। এই দাওয়াতের মধ্যে যাবতীয় শির্কী আমল থেকে দূরে থাকার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর নীচের অংশটি সূরা আলে ইমরান থেকে নেওয়া হয়েছে। (আয়াত নং-৬৪)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) দিহ্‌ইয়া কালবীকে সতর্ক করে বলে দিয়েছিলেন, যেন এই চিঠি বসরার শাসকের মাধ্যমে রোমের কায়সারের সামনে পেশ করা হয়। দিহ্‌ইয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন। কায়সার ঐ সময়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে এসেছিলেন। দিহ্‌ইয়া (রা) চিঠিটি বসরার শাসক হারিছ গাসসানীর মাধ্যমে কায়সারের কাছে প্রেরণ করেন। হিরাক্লিয়াস চিঠিটি পড়ে অত্যন্ত প্রভাবিত হন। যে সব লোক আরবের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিল, তিনি তাদেরকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ঘটনাচক্রে আবূ সুফ্য়ানের একটি বাণিজ্য কাফেলা ঐ সময়ে সেখানে অবস্থান করছিলো। কায়সার, আবূ সুফ্য়ানকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখন পর্যন্ত আবূ সুফ্য়ান মক্কার কুরায়শদের নেতা ছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তার থেকে এমন কোন কথা পাওয়া যায়

নি, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ খাড়া করা যেতে পারে। এতে কায়সারের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন সত্যিকার নবী।

এরপর কায়সার, রোমান শাসক ও বিশপ যাফাতিরের মতামত জানার জন্য দিহ্ইয়া (রা) এর মাধ্যমেই তার কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করে। খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও যাফাতিরের নামে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। যাফাতির ঐ চিঠি পড়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে সত্য নবী বলে স্বীকার করে নেন। কিন্তু কায়সার পাদ্রীদের প্রবল বিরোধিতার কারণে এত ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করার মত সৎ সাহস তার হয়নি।

যাফাতিরের সাক্ষ্য

যাফাতিরের কাছে কায়সারের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চিঠি বা তার একটি নোট পৌঁছে গিয়েছিল। খোদ দিহ্ইয়া (রা) যাফাতিরের নামে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পত্রটি তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন। যাফাতির ছিলেন অত্যন্ত সদাচারী, ন্যায়বান ও সত্যবাদী। উপাসনার সময় তিনি গির্জায় গিয়ে একটি অতি জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন, "হে রোমানগণ, আমার কাছে আহ্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চিঠি এসেছে। তাতে তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্র দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আহ্মদ আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল।"

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো কিছু কথা বলে থাকবেন, কিন্তু তা কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নি এবং আমাদের কাছেও পৌঁছে নি। যাহোক যাফাতিরের ভাষণ শেষ হতে না হতেই উপস্থিত খ্রীস্টান শ্রোতারা এতই উত্তেজিত হয়ে উঠে যে, তারা যাফাতিরকে প্রহার করতে করতে একেবারে শহীদ করে ফেলে।

ইরানের শাহানশাহ খসরু পারভেযের নামে

তৃতীয় দাওয়াতনামাটি প্রেরণ করা হয় ইরানের বিখ্যাত শাহানশাহ্ খসরু পারভেযের নামে। ফরহাদ ও শিরীন প্রসঙ্গে এই শাহানশাহ ফারসী ও উর্দূ সাহিত্যে একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি হিসাবে অমর হয়ে রয়েছেন। অন্যান্য দাওয়াতনামার মত এই দাওয়াতনামার ভাষাও ছিল অত্যন্ত সরল ও সহজবোধ্য। নিম্নে হুবহু তা উদ্ধৃত করা গেল।

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس.

"করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা) এর পক্ষ থেকে পারস্যের বাদশাহ্ কিসরার নামে। সালাম তার উপর যে সত্যের অনুসারী। তুমি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের উপর ঈমান আনো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ (উপাস্য) নেই এবং আমি আল্লাহ্ তাআ'লার সেই রাসূল, যাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, ভয় প্রদর্শন করতে তাদেরকে, যারা জীবিত আছে। তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, সমগ্র বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার কর তাহলে সমগ্র মাজূসী (অগ্নি উপাসক) জাতির পাপ তোমারই ঘাড়ে চাপবে।"

এই দাওয়াতনামাটি পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা)-এর উপর ন্যস্ত করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে স্পষ্ট করে বলে দেন, তুমি এই দাওয়াতনামাটি বাহরাইনের[১] শাসকের কাছে নিয়ে যাবে এবং তারই মাধ্যমে কিসরার দরবারে পেশ করবে। আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা) অক্ষরে অক্ষরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ঐ

নির্দেশ পালন করেন। যখন দাওয়াতনামাটি খসরুর দরবারে পেশ করা হয় তখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নামটি তার নামের উপরে দেখামাত্র তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। কেননা সাসানীদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাসানী সম্রাটের নাম সর্বাবস্থায় সবকিছুর উপরে থাকা চাই। কিন্তু আরবে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চিঠিপত্রে প্রথমে প্রেরকের নাম, এরপর প্রাপকের নাম লিখা হত। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল স্বাভাবিক রীতি।

পারভেযের দুর্ভাগ্য

অতঃপর মে ইং ৬২৮ সনের ঘটনা, যখন পারভেয রোমানদের উপর অসাধারণ বিজয় লাভ করার পর পুনরায় ক্রমশ: পরাজয় বরণ করতে থাকে এবং আপন সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যাপারে দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে পতিত হয়। ১২ ডিসেম্বর, ইং ৬২৭ সনে নেনভয়ের সর্বশেষ ভয়ংকর পরাজয় তাকে যারপর নেই ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলে। এটা তো জানা কথা যে, অনুরূপ পরিস্থিতিতে যে কোন মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতিতে কিছু না কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। ফলে সে অস্থিরতায় ভুগে এবং কোন ব্যাপারেই যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। তখন তার সামনে যে ঘটনাই ঘটে, সেটাকে সে তার পরাজয় ও অসহায়তার বার্তাবহ বলেই মনে করে।

পারভেয অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাওয়াত নামাটি একেবারে ছিড়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিন্। প্রকৃতপক্ষে তা-ই ঘটেছিল। ইতিমধ্যে তো পারভেযের ভাগ্য খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর সে তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অহমিকায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চিঠিটি ছিড়ে ফেলল এবং সেই সাথে তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেল।

চিঠি ছিঁড়ে ফেলার পর পারভেয তার ইয়ামনের প্রশাসক বাযানকে নির্দেশ দিল, হিজাযের ঐ নবুওয়াতের দাবীদারকে আমার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। বাযান তখন দু'জন লোককে একটি পত্র দিয়ে মদীনা মুনাওওরায় প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল কুহরমান। রাসূলুল্লাহ্ সে চিঠি হাতে নিয়ে মুচকি হেসে বলেন, কাল আমা থেকে উত্তর নিয়ে যাবে। পরদিন ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির হলে তিনি বলেন–

"তুমি তোমার সাহেব (বাযান)-এর কাছে গিয়ে এ সংবাদ দাও যে, তার প্রভু (পারভেয) কে আমার প্রভু (আল্লাহ্ তা'আলা) হত্যা করে ফেলেছেন।"

এ ঘটনা ঘটে ১০ জমাদিউল উলা, হিজরী ৭ সনের বুধবার রাতে (মুতাবিক ১৪ সেপ্টেম্বর ইং ৬২৮ সন) তখন রাতের সাত ঘড়ি (অর্থাৎ দু'ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট) অতিবাহিত হয়েছে। যখন কোন জাতির দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে তখন তারা নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংস করে। শেরভিয়া তার পিতা খসরুকে এজন্য হত্যা করেছিল যে, সে অনবরত: পরাজিত হচ্ছিলো, অথচ কারো সাথে সন্ধি করতে রাজী হচ্ছিলো না। শেরভিয়া বাদশাহ হওয়ার সাথে সাথে রোমানদের যাবতীয় শর্ত মেনে নিয়ে তাদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হল। শেরভিয়া পিতাকে এজন্যও হত্যা করে থাকবে যে, সেনাবাহিনী ও সভাসদদের সকলেই তার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। যা হোক শেরভিয়া এবার এক এক করে তার বংশের সকল পুরুষকে হত্যা করে ফেলে, যাতে এই বংশে সাম্রাজ্যের দাবীদার অন্য কেউ না থাকে। অবশ্য দু'এক শাহযাদা কোন না কোন ভাবে তার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু এর মাত্র ছয়মাস পর পারভেযও তার যাবতীয় পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে আপনা আপনি এ দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেয়।

মিসরের প্রশাসক

চতুর্থ দাওয়াতনামা পাঠানো হয়েছিল মুকাওকাসের কাছে, যে তখন প্রধান বিশপের পদে অধিষ্ঠিত ছিল।[২] ইং ৬৩১ সনে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কায়সার নিজের পক্ষ থেকে মিসরের প্রশাসক নিয়োগ করেছিল। হাতিব বিন আবী বালতাআ নিজে থেকেই এই চিঠি মুকাওকাসের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন– بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ يَا حَاطِبُ –"হে হাতিব, আল্লাহ্ তোমাকে কল্যাণ মণ্ডিত করুন।" এই চিঠির ভাষাও ছিল রোমের কায়সারের কাছে প্রেরিত দাওয়াতনামার ভাষার অনুরূপ।

সাইয়ূতী তাঁর 'হুসনুল মুহাযারাহ' গ্রন্থে লিখেছেন, হাতিব (রা) আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছে দেখেন, মুকাওকাস নীল নদে নৌকা বিহার করছে। হাতিব (রা) ও তখন একটি নৌকা ভাড়া করেন, যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পত্রটি যত শীঘ্র সম্ভব মুকাওকাসের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। যাহোক মুকাওকাস পত্রটি পড়ে হাতিব (রা) কে জিজ্ঞাস করে, যদি তোমাদের নবী সত্য হন তাহলে আল্লাহ্র কাছে কেন এই দু'আ করেন না যে, যে সব বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে তাঁর জন্মভূমি থেকে বের করে দিয়েছে, তারা ধ্বংস হয়ে যাক?

হাতিব সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, আপনাদের বিশ্বাস মতে, য়াহূদীরা হযরত ঈসা (আ) কে শূলে চড়িয়েছিল এবং শূলের উপরই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তাহলে তিনি কেন দু'আ করে তার শত্রুদেরকে ধ্বংস করলেন না?

মুকাওকাস উত্তরে বললো, নিশ্চয়ই তুমি নিজেও বুদ্ধিমান এবং যাঁর দূত হয়ে এসেছ তিনিও বুদ্ধিমান এবং বিজ্ঞ।

এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দাওয়াতনামাটি হাতী-দাঁতের দু'টি তক্তার মধ্যে রেখে অত্যন্ত যত্নের সাথে সরকারী কোষাগারে সংরক্ষণ করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অতি সুন্দর ভঙ্গিতে তার একটি জবাবও পাঠায়। সে তাতে বলে, "আমার একথা জানা ছিল যে, একজন নবী আসবেন। কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে, তিনি সিরিয়া থেকে আবির্ভূত হবেন।" সে ঐ জবাবের সাথে দু'টি সম্ভ্রান্ত কিবতী মেয়ে, মূল্যবান পোষাক এবং একটি খচ্চর পাঠায়। এই খচ্চরই দুলদুল নামে সমধিক পরিচিত যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর হযরত আলী (রা)-এর কাছে ছিল।[৩]

দুই মেয়ের একজন ছিলেন হযরত মারিয়া (রা)। তিনি উম্মুল মুমিনীন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন এবং তারই গর্ভের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম (রা)-এর জন্ম হয়েছিল। অপরজন ছিলেন সীরান, যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাস্সানের হাতে অর্পণ করেছিলেন। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, ঐ যুগে আরবের কোথাও দুলদুলের মত খচ্চর ছিল না এবং খুব সম্ভবত: সে কারণেই মুকাওকাস সেটাকে বিশেষ উপঢৌকন হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে পাঠিয়েছিলেন।

ইয়ামামার প্রশাসক

পঞ্চম দাওয়াত নামাটি লেখা হয়েছিল ইয়ামামার প্রশাসক হওযা বিন আলীর নামে এবং তা সুলায়ত বিন কায়স বিন আমর আল আমিরী (রা) এর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। ইয়ামামা বর্তমানে সাউদী সাম্রাজ্যের একটি অংশ। এর উত্তরে নাজ্‌দ, পশ্চিমে হিজায ও ইয়ামন, দক্ষিণে আহ্‌কাফ ও রুবউল খালী, পূর্বে আম্মান, বাহরাইন ও পারশ্য উপসাগর। বাহরাইন ও ইয়ামনের মত ইয়ামামাও সামানীদের প্রভাবধীন ছিল। কিন্তু হওযা ও তার স্বগোত্রীয়রা ছিল আরব। হাওযার নামে যে দাওয়াতনামা পাঠানো হয়েছিল, তা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। তার সূচনায় বলা হয়েছিল দ্বীনে ইসলাম আরব-অনারব সর্বত্রই বিস্তার লাভ করবে এবং বিজয়ী হবে। এরপর ছিল ঐ দু'টি শব্দ, যা সাধারণভাবে সব দাওয়াতনামায়ই থাকত। যথা ঃ أَسْلِمْ تَسْلَمْ অর্থাৎ তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে সব বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে।

হাওযা চিঠিটা পড়ল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দূতের একটি অতি আকর্ষণীয় ভাষণও শুনল। ভাষণে বলা হয়েছিল, তুমি একটি বড় জাতির সর্দার। তুমি যদি একটু লক্ষ্য কর তাহলে তোমার জাতি মুমিন হওয়ার বিরাট সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠতম বস্তু তথা ইসলাম গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছি, জঘন্যতম বস্তু তথা

কুফ্র সম্পর্কে সাবধান করছি, আল্লাহ্র ইবাদত করার আদেশ দিচ্ছি এবং শয়তানের ইবাদত থেকে দূরে থাকতে বলছি।

কিন্তু হাওয়া ইসলাম গ্রহণ করে নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা বিজয়, হুনায়ন যুদ্ধ ও তায়েফ অভিযান শেষ করে মদীনায় এসে পৌঁছেন তখন সংবাদ পাওয়া যায় যে, হাওযা মৃত্যু বরণ করেছে। তার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। সামনে যথাস্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

হারিছ বিন আবী শামর গাসসানী

ষষ্ঠ দাওয়াত নামাটি শুজা বিন ওয়াহব আসাদী (রা) এর মাধ্যমে হারিছ বিন আবী শামর গাসসানীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। হারিছের কেন্দ্রস্থল ছিল দামিশ্ক্। শুজা (রা) যখন সেখানে পৌঁছেন তখন হারিছ খুবই ব্যস্ততার মধ্যে ছিল। কেননা কায়সার হিরাক্লিয়াস তখন বায়তুল মুকাদ্দাসে এসেছিলেন এবং তার রসদ সংগ্রহ ও তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হারিছের উপরই ন্যস্ত ছিল। শুজা (রা) হারিছের একজন দ্বাররক্ষীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে তুলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিস্তারিত অবস্থাদি জেনে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর দামিশকের একটি দরবারে হারিছের সামনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাওয়াতনামা পেশ করা হয়। তাতে বলা হয়েছিল, আল্লাহ্র উপর ঈমান আনো, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। (যদি ঈমান আন) তাহলে তোমার রাজ্য তোমার কাছেই থেকে যাবে।

হারিছ বলে, আমার রাজ্য আমা থেকে ছিনিয়ে নেবে এমন সাধ্য কার আছে? এরপর সে কায়সারকে লিখে, 'আমাকে অনুগ্রহপূর্বক আরবের উপর হামলা করার অনুমতি দিন।' সে একটি অশ্বারোহী বাহিনীকেও তৈরী হতে বলে। কিন্তু কায়সারের কাছ থেকে উত্তর আসে, এখন এই সংকল্প ত্যাগ কর এবং অবিলম্বে বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে হাযির হও।' তারপর হারিছ শুজা'কে একশ মিছকাল স্বর্ণ প্রদানের নির্দেশ দেয়।[৪] যে দ্বাররক্ষী গোপনে গোপনে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন তিনি ঐ উপঢৌকন ও পাথেয় শুজার (রা) হাতে অর্পণ করেন।

হারিছ হিঃ ৮ সনে মক্কা বিজয়ের বছর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আরো পত্র বাহক

হিজরী ৭ সনের মুহাররম মাসে একই সময়ে ৬ জন দূত পাঠানো হয়। এরপরও এই কর্মসূচী অব্যাহত থাকে। যেমন ঃ

১। আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা), যিনি খসরু পারভেযের নামে একটি দাওয়াতনামা নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর হাতে হরমুযানের নামেও একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল। হরমুযান ছিল ঐ অঞ্চলের প্রশাসক, যাকে আজকাল খুযিস্তান বলা হয়। সেখানকার আহওয়ায, সূস, রামহরমুয, তাসতার (বা শাসতার)[৫] প্রভৃতি শহর ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। সম্ভবত: এই অঞ্চলকেই একদা সুসিয়ানা বলা হত। হরমুযের নামে প্রেরিত পত্রও ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। হরমুযান হযরত উমর (রা) এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন।

২। একটি দাওয়াতনামা 'আলা বিন হাযরামী (রা)-এর হাতে বাহরাইনের প্রশাসক মুনযির বিন সাওয়াদ-এর নামে পাঠানো হয়েছিল। এটা হচ্ছে মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। মুনযির বিন সাওয়াদ এবং তাঁর স্বজাতীয় অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'আলা বিন হায্রামীকে ঐ অঞ্চলে যাকাত, সাদাকা এবং অমুসলিমদের

কাছ থেকে জিযিয়া আদায়ের কাজে নিয়োগ করেন। পরবর্তী সময়ে আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমেও সেখানে একটি পত্র পাঠানো হয়েছিল।

৩। একটি দাওয়াতনামা জাবাল্লা গাসসানীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। সে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে ইসলাম গ্রহণ করে। হিজরী ১৪ সনে (ইং ৬৩৬ সনের প্রথম দিকে) হজ্জ উপলক্ষে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছেন। তাওয়াফ করার সময় জাবাল্লার চাদরের একটি আঁচল ঘটনাচক্রে জনৈক আরব বেদুইনের পায়ের নীচে চাপা পড়েছিল। এতে জাবাল্লা অত্যন্ত রেগে গিয়ে বেদুইনকে একটি থাপ্পড় মারে। এ ব্যাপারে হযরত উমর (রা) এর কাছে অভিযোগ পেশ করা হলে তিনি রায় দেন যে, জাবাল্লার উপর থেকে এর বদলা নেওয়া হবে। জাবাল্লার ধারণা ছিল যে, একজন রাজপুত্রের সম্মান একজন সাধারণ বেদুইনের চাইতে অনেক উপরে, কিন্তু হযরত উমর (রা) এর এই রায় থেকে সে বুঝে নিল যে, ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বাদশাহ্-ফকীরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব সে রাতের বেলা অতি সংগোপনে মদীনা থেকে বের হয়ে সোজা সিরিয়ায় গিয়ে পৌঁছে এবং খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। এরপর সে কন্সটান্টিনোপলে চলে যায়। পরবর্তীকালে সারাজীবন সে তার ঐ আচরণের জন্য অনুশোচনার অশ্রুপাত করে কাটায়।

৪। আম্মানের প্রশাসক জীফার বিন জালান্দীর নামে হিজরী ৮ সনের যীকাদ (ইং ৬৬৩ সনের ফেব্রুয়ারী) মাসে একটি দাওয়াতনামা পাঠানো হয়। সেটি নিয়ে গিয়েছিলেন হযরত আমর বিন আস (রা)। জীফারের ভাই আবদ একজন অতি পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। উভয় ভাইই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁদের রাজ্যেও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। উভয় ভাইয়ের মধ্যে আব্দ্ই ছিলেন অধিক পুণ্যকামী ও সৌভাগ্যবান।

৫। মাসউদ বিন সা'দ (রা) এর হাতে একটি দাওয়াত নামা ফারওয়া বিন 'আমর আল জায়োমীর কাছে পাঠানো হয়। ফারওয়া ছিলেন রোমের কায়সারের পক্ষ থেকে মাআন[৬] -এর গভর্ণর। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য একটি ঘোড়া, একটি সাদা খচ্চর, একটি আরবী গাধা এবং উৎকৃষ্ট ধরনের কিছু পোষাক উপহার স্বরূপ পাঠান। তার মধ্যে একটি 'আবা' ছিল সুন্দুস (সূক্ষ্ম সবুজ রেশম)-এর যার পাড় ছিল সোনালী তারে সজ্জিত। এতে পাদ্রীদের মধ্যে দারুণ হৈচৈ পড়ে যায়। কায়সার ফারওয়া (রা) কে ইসলাম থেকে বিমুখ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সফল হন নি। এজন্য প্রথমে তাকে বন্দী করা হয়। এরপর ফেলিস্তিনের 'আফরা' নামক একটি ঝরণার কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। ফারওয়া (রা) সত্যের পথে অবিচল থেকে এই সমস্ত জুলুম-নির্যাতন অকাতরে সহ্য করে যান।

'দ্বীনে হক'-এর উপর ফারওয়া (রা) কি পরিমাণ অবিচল ও সুদৃঢ় ছিলেন, তা এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাকে যখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছিলো তখন তিনি আবৃত্তি করেছিলেন নীচের কবিতাটি–

بلغ سراة المسلمين بانني

سلم لربي اعظمي ومقامي ·

"মুসলমান নেতৃবৃন্দের কাছে আমার এ কথাটি পৌঁছিয়ে দাও যে, আল্লাহ্র পথে আমার দেহ এবং আমার সম্মান উৎসর্গীকৃত।"

আরো কয়েকটি দাওয়াত নামা

এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন জনের কাছে আরো অনেক দাওয়াতনামা পাঠানো হয়েছিল। নিম্নে কয়েকজন প্রাপকের নাম দেওয়া গেল ঃ

১। হিলাল বিন উমাইয়া (বাহরাইনের একজন দলপতি)।

২[1]। বসরার আমীর। এই দাওয়াতনামা পৌঁছাবার জন্য হারিছ বিন 'উমায়র (রা) কে মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু মূতার প্রশাসক শুরাহ্‌বিল তাঁকে পথিমধ্যে শহীদ করে ফেলে। আর একারণেই মূতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৩। দুমাতুল জন্দল-এর প্রশাসক উকায়দার।

৪। বনী কিলাব গোত্রে ও তাদের সর্দার আসবাগ বিন আমর।

৫। যূকালা' ও যূ আমর গোত্র।

৬। হামীরের প্রশাসকবৃন্দ ও তাদের বংশধর।

৭। হাদ্রামাউতের সর্দারগণ।

৮। আয্‌দ গোত্রের সর্দার।

৯। হাজারের সর্দার অলীখ্‌ত্‌।

১০। বনী হারিছা।

১১। বনী আযরা।

১২। সামাদাহ্‌ এর রাজা।

১৩। বনী ওয়ায়িলের উমারাবৃন্দ।

১৪। বনী যুহায়র।

১৫। আরবের বিভিন্ন গোত্রপতি, যাদের সংখ্যা চুয়াল্লিশ ও পঞ্চাশের মধ্যে ছিল।

এটা হচ্ছে ঐ সব দাওয়াতনামার সংক্ষিপ্ত বিবরণী, যা বিভিন্ন রিওয়ায়াতের মধ্যে সংরক্ষিত আছে। এগুলোর প্রকৃত সংখ্যা কত তা সঠিক ভাবে কে বলতে পারে?

টীকা ঃ

১। এখানে বাহরাইন অর্থ সেই দ্বীপ নয়, যা আরব উপসাগরের কাতার ও আল হাসার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং যাকে আজকাল বাহরাইন বলা হয়। বরং এর দ্বারা পারস্য সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত বর্তমান সাউদী আরবের সেই ভূখন্ডকেই বুঝাচ্ছে, যা বর্তমান আলহাস প্রদেশের একটি অংশ ছিল। এখন শুধুমাত্র দ্বীপাঞ্চলসমূহকে ঐ নামে অভিহিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর যুগে তৎকালীন বাহরাইন সাসানীদের একটি করদরাজ্য ছিল।

২। মুকাওকাস কায়সার ও কিসরার ন্যায় উপাধি বিশেষ। কোন কোন ইংরেজী ইতিহাসে তার নাম 'সাইরাস' লিখা হয়েছে। কোন কোন মুসলিম গ্রন্থকারের মতে তার নাম ছিল জুরায়হ্ বিন নাবী (রাহমাতুল লিল আলামীন ঃ পৃষ্ঠা-২০৩,

বালাগে মুবীন ঃ পৃষ্ঠা-১৪৭, উসদুল গাবাহ্)। কারো কারো মতে, সে বংশগত ভাবে রোমান ছিল, কিন্তু তার মা ছিল কিবতী। পরবর্তীকালে মিসর-বিজয়ী 'আমর বিন 'আস-এর সাথে যেসব শর্তাধীন সে সন্ধি করেছিলো, তাতে অনুমিত হয় যে, সে কিবতী ছিলো এবং রোমানদের প্রতি তার বিশেষ কোন সহানুভূতি ছিল না।

৩। কোন কোন রিওয়ায়াতে একটি গোলাম, হাজার মিছকাল স্বর্ণ ইত্যাদিরও উল্লেখ আছে। কিন্তু মুকাওকাসের পত্রে শুধু ঐ সমস্ত উপহার উপঢৌকনের উল্লেখ ছিল, যা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি।

৪। এক মিছকাল = সাড়ে চার মাশা। এই হিসাবে এশ মিছকাল = আটচল্লিশ তোলা (আনুমানিক)।

৫। আরবী ভাষায় তাস্তার এবং ফারসী ভাষায় শাসতার বলা হত।

৬। মাআন বর্তমানে জর্দানের অন্তর্ভুক্ত।

খায়বার যুদ্ধ

খায়বার যুদ্ধ

খায়বার

খায়বার, মদীনা থেকে কমবেশী একশ ষাট কিলোমিটার বা প্রায় একশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এ এই দূরত্ব আট 'বারীদ,'[১] (১ বারীদ = ১২ মাইল) অর্থাৎ ছিয়ানব্বড়াই মাইল বলা হয়েছে। এখানে সর্বত্রই লাভায় পোড়ানো পাহাড় রয়েছে। এই সব পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে সাতটি উপত্যকা। আর এই উপত্যকাগুলোতে রয়েছে প্রায় একশ ঝরণা। এছাড়া কুয়া এবং জলাশয়ও রয়েছে। সম্পূর্ণ ভূখন্ডটি অত্যন্ত সবুজ সতেজ। সেখানে খেজুর, আংগুর, বাতাবী লেবু ডুমুর ইত্যাদির বাগান রয়েছে। তাতে ফসলও খুব ভাল হয়। 'আরযুল কুরআন' শীর্ষক ভ্রমণকাহিনীতে বলা হয়েছে–

"খায়বারের প্রশস্ততা ও উর্বরা শক্তি, আমরা যা ধারণা করতাম তার চাইতে অনেক বেশী দেখতে পাই। আরব ভূখণ্ডে এটি একটি আশ্চর্য ব্যাপার যে, যেখানে লাভা পোড়ানো পাহাড়ের (হাররার) আধিক্য রয়েছে, সেখানে আধিক্য রয়েছে ঘন খেজুর বাগানেরও। মদীনা তাইয়্যিবা যেখানে দুই দিকে লাভা পোড়ানো পাহাড় শ্রেণী রয়েছে সেখানে রয়েছে প্রচুর খেজুর বাগানও।[২]

ফিতনা-ফাসাদের উৎসভূমি

খায়বারের য়াহূদীরা সম্ভবত: ঐ যুগে বসতি গড়ে তোলে, যখন তাদেরকে ফিলিস্তিন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফিদক, ওয়াদিউল কুরা এবং তাইমায়ও তাদের বসতি ছিল। তাদের তিনটি গোত্র ছিল ইয়াছরিবে, যাদের কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু খায়বারই ছিল তাদের শক্তির সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। বনু নাযীরও মদীনা মুনাও্ওরা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর খায়বারেই বসতি স্থাপন করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে উঠে। প্রথমে হাই বিন আখতাব খায়বারের নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। সে মারা গেলে পর আবূ রাফি' বিন আল্ হুকায়ক নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হয়। আবূ রাফি হচ্ছে সেই য়াহূদী, যে হিজরী ৫ সনে গিতফান, কুরায়শ প্রভৃতি গোত্রকে প্ররোচিত করে একটি বিরাট বাহিনীসহ মদীনা আক্রমণের আয়োজন করিয়েছিল এবং মদীনা অবরোধ চলাকালে বনু কুরায়যাকে অঙ্গীকার ভংগের উসকানী দিয়ে মুসলমানদের জন্য একটি অতি সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। এবার সে একটি বিরাট বাহিনীসহ মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। আর এ কারণে খায়বারের উপর হামলা চালানো মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

গিতফান ও অন্যান্য গোত্রের সাথে ষড়যন্ত্র

'রাহমাতুল লিল আলামীন' গ্রন্থে বলা হয়েছে, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর একটি মাসও অতিবাহিত হয়নি। এমনি সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানতে পারেন যে, খায়বারের য়াহূদীরা মদীনা আক্রমণের সংকল্প নিয়েছে। অন্যকথায় তারা আহযাব যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং নিজেদের হারানো সম্পদ, সম্মান ও প্রতিপত্তি ফিরে

পাবার জন্য নতুনভাবে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা বনু গিতফান গোত্রের চার হাজার বীর যেদ্ধাকেও নিজেদের পক্ষে টেনে নিয়ে এসেছিল এবং তাদেরকে এই অঙ্গীকার প্রদান করা হয়েছিল যে, যদি মদীনা বিজিত হয় তাহলে খায়রারের যাবতীয় উৎপাদনের অর্ধেক অংশ তারা সব সময় গিতফানকে দিতে থাকবে। মুসলমানরা মদীনা অবরোধের সেই কষ্ট, যা মাত্র এক বছর পূর্বে তারা (আহযাব যুদ্ধে) ভোগ করেছিল, তা এখন পর্যন্ত ভুলে যায় নি বা ভুলতে পারে নি। অতএব সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, মদীনায় নয় বরং আগে বেড়েই শত্রুদের মুকাবালা করা হবে।[৩]

মদীনা বিজয়ের শর্তে খায়বারের অর্ধেক উৎপাদন প্রদান করাটা য়াহূদীদের জন্য খুব বড় একটা ব্যাপার ছিল না। কেননা মদীনা বিজিত হলে সম্পূর্ণ অঞ্চলটি য়াহূদীদেরই দখলে এসে যেত এবং আওস ও খাযরাজকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হত। এরপর গিতফানীদেরকে খতম করে দেওয়ার ব্যাপারে যথোপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করাটা য়াহূদীদের জন্য মোটেই কঠিন হত না।

মরহুম মাওলানা শিবলী বিশদভাবে গোটা পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন–

"সাল্লাম বিন আল হুকায়ক, যে য়াহূদীদের নেতা ছিল, স্বয়ং গিতফান ও তার পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোর কাছে গিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে এবং একটি সম্মিলিত বাহিনীসহ মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয় সাল্লামের পর য়াহূদীরা আসীর বিন যারামকে (যাকে সাল্লামের পর য়াহূদীদের নেতা নির্বাচন করা হয়েছিল) তাদের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করে। আসীর স্বয়ং গিতফান ও অন্যান্য গোত্রগুলোর কাছে যায় এবং একটি বিরাট সম্মিলিত বাহিনী গড়ে তোলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা) কে খায়বারে পাঠান। সরেজমিনে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য আবদুল্লাহ্ বেশ কয়েকজন সঙ্গীসহ খায়বারে উপনীত হন এবং অত্যন্ত সংগোপনে স্বয়ং আসীরের যবানীতেই তার যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও চেষ্টা তদবীর সম্পর্কে অবহিত হন"....।

মরহুম মাওলানা শিবলী বলেন, "খায়বারের য়াহূদীরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলো। আর মদীনার মুনাফিকরা তাদেরকে মুসলমানদের যাবতীয় খবরাখবর সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত রাখছিলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) য়াহূদীদের সাথে সন্ধি চুক্তি করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা ছিল একটি অতি অবিশ্বস্ত জাতি। অপর দিকে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই তাদেরকে বলে পাঠায়, "তোমরা মুসলমানদেরকে ভয় করো না। এরা হচ্ছে মুষ্টিমেয় লোক, উপরন্তু তাদের কাছে প্রয়োজনীয় অস্ত্রপাতিও নেই।" গিতফান গোত্রের মধ্যে বনু ফাযারা ছিল একটি অতি শক্তিশালী সম্প্রদায়। তারাও মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাবার জন্য য়াহূদীদের সাথে যোগ দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাছে লিখে পাঠান, "তোমরা খায়বারবাসীদেরকে সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাক।" কিন্তু বনু ফাযারা এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করে নি।[৪]

খায়বার অভিমুখে যাত্রা

রাসুলুল্লাহ (সা) সাবা বিন উরফুতা (রা) কে[৫] মদীনা মুনাওওরায় আপন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন। সহধর্মিণীদের মধ্যে থেকে হযরত উম্মে সালমা (রা) ছিলেন। মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল ষোল শ। তার মধ্যে অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল দুই শ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলে দিয়েছিলেন, শুধু মাত্র সেই সব লোক এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে, যারা হুদায়বিয়ার বায়'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিল। কিছু সংখ্যাক মহিলা স্বত:স্ফূর্তভাবে ঐ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে দেখে বললেন, তোমরা কার আদেশে এবং কার সাথে এসেছ? তাঁরা নিবেদন করেন, আমরা আহতদের চিকিৎসার জন্য ওষুধপত্র নিয়ে এসেছি। তাছাড়া

তীরন্দাজদের হাতে আমরা তীর তুলে দেব। খায়বার বিজিত হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা) সেই মহিলাদেরকেও মালে গনিমতের অংশ দিয়েছিলেন।

এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল, মুহাররম, হিজরী ৭ সনে[৬]। তাবাকাতে ইবনে সা'দে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই অভিযান শুরু হয়েছিল জমাদিউল উলা, হিঃ ৭ সনে।[৭] সন সম্পর্কেও এক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল মুহাররম ৬ সনে[৮]; কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে যেমন বলে এসেছি, এই মতপার্থক্য শুধু হিসাবের মধ্যে। যাদের মতে, হিজরী সনের সূচনা রবিউল আউয়াল থেকে হয়েছে তাদের হিসাব অনুযায়ী এটা হচ্ছে হিজরী ষষ্ঠ বর্ষ, যা শেষ হবে সফর মাসে । আর যাদের মতে হিজরী সনের সূচনা মুহাররম থেকে (সহজবোধ্যতার দিক দিয়ে এই হিসাব অধিক গ্রহণযোগ্য) তাদের মতে এটা ছিল হিজরী সপ্তম বর্ষ।

এই যুদ্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনটি বিশেষ পতাকা তৈরী করে নিয়েছিলেন। ইতপূর্বে ছোট পতাকা ব্যবহৃত হত। তিনটি বিশেষ পতাকার একটি হুব্বাব বিন মানয়ারের, একটি সা'দ বিন উবাদার এবং একটি হযরত আলী (রা) এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। হযরত আলী (রা) এর পতাকা ছিল সাদা রংয়ের এবং তা তৈরী করা হয়েছিল হযরত আয়েশা (রা) এর চাদর দ্বারা।

গন্তব্য স্থলে অবতরণ

খায়বার অভিযানে, যাত্রাপথের মনযিলসমুহ কোন ঐতিহাসিক বিশদভাবে বর্ণনা করেন নি। তার মধ্যে একটি ইসর পাহাড়[৯] এবং অপরটি সাহবা , যা খায়বারের সন্নিকটে অবস্থিত। মুসলিম বাহিনী আসরের সময় সাহবায় গিয়ে পৌছেন । সবারই রসদ ছিল ছাতু। রাসুল্লাহ (সা) সহ মুসলিম বাহিনীর সকলেই পানির সাথে মিলিয়ে ঐ ছাতু পান করেন। এরপর মুসলিম বাহিনীর খায়বারের নিকটস্থ রাজী ' উপত্যকায় গিয়ে পৌছে, যা খায়বার ও গিতফান বসতির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এটাকেই মুসলিম বাহিনীর ঘাটি হিসাবে নির্ধারিত করা হয় । এতে বাহ্যত: একটি বড় উপকার এই হয় যে , গিতফান গোত্র খায়বার বাসিদের সাহায্যে বের হওয়া থেকে বিরত থাকে। হযরত উছমান (রা) কে এই কেন্দ্রের মুসলিম বাহিনীর অধিনায়কত্ব প্রদান করা হয়।

রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর রীতি এই ছিল যে , তিনি রাতের বেলা কারো উপর আক্রমণ চালাতেন না। রাসুলুল্লাহ (সা) নিম্নের দু আটি পড়ে শয্যা গ্রহণ করেন। প্রত্যেকটি বসতিতে প্রবেশ করার সময়ও তিনি এই দু'আ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا .

“হে আল্লাহ্,আমরা তোমার কাছে এই বসতির, বসতিবাসীর এবং যা কিছু এতে রয়েছে তার অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি।”

কোরাস সঙ্গীত

খায়বার সফরকালে রাসুলুল্লাহ্ (সা) আমির বিন আকওয়াকে (যিনি ছিলেন মাছলামা বিন আমর বিন আকওয়া-এর পিতৃব্য) বলেন, তুমি আমাদেরকে একটি কোরাস সঙ্গীত গেয়ে শুনাও। তখন আমির যে কোরাস

সঙ্গীত গেয়ে শুনিয়েছিলেন তার কয়েকটি কলি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল–

اللهم لولانت ماهتدينا

ولاتصدقنا ولا صلينا

فاغفرفداءً لك ماابقينا

والقين سكينة علينا

ان الذين قد بغوا علينا

اذا ارادوا فتنة ابينا

وثبت الاقدام ان لاقينا

ونحن على فضلك مااتفينا

"হে আল্লাহ্ ,তুমি যদি আমাদের পথ না দেখাতে, তাহলে আমরা পথ পেতাম না , দান খয়রাত করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না।

হে আল্লাহ্ , আমরা তোমার উপর উৎসর্গীকৃত। তোমার যে সব আদেশ আমরা কাজে পরিণত করতে পারি না সেগুলোকে তুমি মাফ করে দাও । আর আমাদের উপর তোমার পক্ষ থেকে প্রশান্তি দান কর।

যারা আমাদের উপর হাত বাড়িয়েছে এবং ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে আমরা তাদেরকে পরওয়া করি না।

আমরা যদি ঐ জালিমও ফিতনাবাজদের মুখোমুখি হই তাহলে তুমি আমাদেরকে অবিচলিত রাখো। আমরা তোমার ফযল ও করম তথা দান - দক্ষিণার প্রত্যাশী।"

রাসুলুল্লাহ্ (সা) এই সঙ্গীত শুনে বলে উঠেন يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (আল্লাহ্ তোমার উপর কৃপা করুন)। হযরত উমর (রা) রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর এই কথাকে আমির (রা) এর শাহদাতের একটি চিহ্ন বলে আখ্যায়িত করেন। শেষ পর্যন্ত দেখাও গেল , আমির খায়বার যুদ্ধে শাহদাত বরণ করেন। এ সম্পর্কে আমরা সামনে আলোচনা করবো।

খায়বারের দুর্গ

যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করার পূর্বে খায়বারের দুর্গসমূহের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেননা এই যুদ্ধ ছিল দুর্গ কেন্দ্রিক এবং দুর্গগুলো একের পর এক মুসলিম বাহিনীর দখলে এসেছিল। খায়বারের দুর্গের সংখ্যা, এমনকি কোন কোনটির নামের ক্ষেত্রেও মতপার্থক্য দেখা যায়। দুর্গগুলোর অবস্থান সম্পর্কেও কোন প্রামাণিক ও স্পষ্ট রিওয়ায়াত পাওয়া যায় না।

দুর্গের সংখ্যার ব্যাপারে 'ইয়াকূবী' এর বরাতে 'সীরাতুন্নবী'তে বলা হয়েছে যে, সেগুলোর সংখ্যা ছিল ছয়। যথা– (১) সালম, (২) কামূস, (৩) নাতাত, (৪) কাসারাহ, (৫) শিক ও (৬) মারবাতাহ। কামূস নামক দুর্গটি ছিল সব চাইতে মজবুত ও সুদৃঢ়। আরবের বিখ্যাত পাহ্লোয়ান মারহাব যাকে শক্তির দিক দিয়ে এক হাজার অশ্বারোহীর সমকক্ষ মনে করা হত, সে ছিল এই দুর্গের মালিক বা অধিনায়ক। ইবনে আবি হুকায়কের বংশধর, যারা মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়ে খায়বারের নেতৃত্ব লাভ করেছিলো, তারা এই দুর্গেই থাকত।[১০] আশ্চর্যের কথা এই যে; উপরে উল্লেখিত দুর্গসমূহের সাথে নায়িম দুর্গের উল্লেখ করা হয় নি। অথচ যুদ্ধের বিবরণীতে বলা হয় যে, যাহূদীরা তাদের

স্ত্রীলোকদের নায়িম দুর্গে সুরক্ষিত স্থানে নিয়ে গেল, রসদপত্র নায়িম দুর্গে জড় করল এবং সেনাবাহিনীকে নাতাত ও কামূসে রাখল।[১১]

আসাহ্হুস্ সিয়ারে আছে, খায়বারে মোট আটটি দুর্গ ছিল। নানাত, শিক এবং নায়িম – এই তিনটি দুর্গ ছিল একদিকে এবং আল কাতিবা, আল ওয়াতীহ্, আস্ সালালিম –এই তিনটি দুর্গ ছিল অপরদিকে। আর সবচেয়ে সুদৃঢ় দুর্গ ছিল কামূস, যার মালিক ছিল আবি হুকায়ক। নাতাতের সন্নিকটে সা'আদ বিন মু'আযেরও একটি দুর্গ ছিল।[১২] এটা সুস্পষ্ট যে ভৌগলিক ক্ষেত্রে 'একদিকে' ও 'অপরদিকে' -এর কোন মানেই হয় না।

তাবাকাতে ইবনে সা'দে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে– আন্ নাতাত, আস সা'আব বিন মু'আয, আন্ নায়িম, আয যুবায়র, উবাই, নায্যার, আল কামূস, আল ওয়াতীহ্ এবং আস সালালিম।[১৩]

মরহুম কাযী সুলায়মান মানসূরপুরী দুর্গের সংখ্যা দশ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি দুর্গগুলোর কিছুটা বিস্তারিত বিবরণও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ঐ দুর্গগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা ঃ

১। নায়িম, নাতাত, সা'আব বিন মু'য়ায, আয যুবায়র – এ চারটি দুর্গকে নাতাত বলা হত।

২। শিক্, নায্যার, উবাই – এই তিনটি দুর্গকে শিক বলা হত।

৩। কামূস, অতীহ, সালালিম – এই তিনটি দুর্গ কুতায়বাহ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, কোন একটি স্থানের ডান বা বাম দিক তখনই নির্ধারণ করা যেতে পারে যখন ঐ স্থানের খুঁটিনাটি সব অবস্থা চোখের সামনে থাকে। কিন্তু এখানে তো খায়বার বসতি সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি।

'আরযুল কুরআন' শীর্ষক ভ্রমণ কাহিনীতে বলা হয়েছে, খায়বার বসতি সংলগ্ন উত্তরদিকে একটি প্রান্তর দেখলাম। আমাদের বলা হল যে, এখানেই যুদ্ধ হয়েছিল। ঐ মাঠে আল বাশার নামক একটি বসতি ছিল। সেই বসতির উত্তরে ছিল নায়িম, পূর্বে ওয়াতীহ, উত্তর পশ্চিমে নাতাত ও কুতায়বাহ্, পশ্চিমে শিক্ এবং দক্ষিণ পশ্চিমে সালালিম।

এই বর্ণনা থেকে খায়বার বসতির উত্তর দিকে যে প্রান্তর রয়েছে, তাতে অবস্থিত দুর্গসমূহের অবস্থা মোটামুটি জানা যায়। কিন্তু সমগ্র বসতির পটভূমিতে ঐ সব দুর্গের কি পরিমাণ গুরুত্ব ছিল, তা তো জানা যায় না।

আমার ধারণা মতে, উপত্যকাসমূহের মধ্যকার দূরত্ব অল্প হোক অথবা অধিক – এক উপত্যকা থেকে অপর উপত্যকা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। অতএব প্রত্যেকটি উপত্যকার ক্ষেতকৃষি এবং বাগবাগিচাও ছিল পরস্পর থেকে আলাদা। আর এই পটভূমিতে বলা যেতে পারে যে, পৃথক পৃথক দুর্গও তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু এটা আমাদের অনুমান মাত্র। আর এরূপ অনুমান দ্বারা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছা যায় না।

ডক্টর হামীদুল্লাহ্র অভিমত

ডক্টর হামীদুল্লাহ্ ইসলামিক রিভিউ-এ প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধে খায়বার উপত্যকার একটি নক্সা দিয়েছেন। তাতে দেখা যায়, উত্তর-দক্ষিণে লাভাগঠিত উঁচু ভূমি (হাররাহ) রয়েছে এবং মধ্যখানে রয়েছে প্রশস্ত প্রান্তর খায়বার। খায়বারের বিভিন্ন উপত্যকার নক্সা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা হয় নি। দক্ষিণে বর্তমানে রয়েছে খায়বার পল্লী। এথেকে সামান্য উত্তর দিকে রয়েছে কাসরে মারহাব। সম্ভবতঃ এখানেই ছিল কামূস দুর্গ। বসতি থেকে পূর্বদিকে বাচিগা রয়েছে।[১৪] ডক্টর হামীদুল্লাহ্ বলেন, খায়বারের দুর্গগুলো যথারীতি তৈরী করা হয়েছিল, না এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে, সার্বজনীনভাবে তা একটি প্রতিরক্ষাচক্রের (ব্যূহের) কাজ দিত, সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক গোত্রেরই পৃথক পৃথক প্রতিরক্ষাচক্র ছিল। উল্লেখিত নক্সায় যা কিছু দেখানো হয়েছে, তা মোটামুটি পরিষ্কারই আছে। তবে আক্ষেপের বিষয় যে, এই নক্সা দ্বারা যুদ্ধের বিস্তারিত কোন অবস্থা জানা যায় না।

যুদ্ধ

সর্বপ্রথম ঐ সব দুর্গে যুদ্ধ হয় যেগুলোকে সমষ্টিগতভাবে নাতাত্ বলা হত। তাতে নাতাত ছাড়াও ছিল নায়িম, যুবায়র ও সা'আব দুর্গ। মরহুম মাওলানা শিবলী লিখেছেন, ইসলামী বাহিনী প্রথমে নায়িম দুর্গের দিকে অগ্রসর হয়।[১৫] অপর একটি রিওয়ায়াতে আছে, য়াহূদীরা তাদের পরিবার-পরিজনকে, একটি পুরাতন দুর্গে রেখে, রসদপত্র জড় করে নায়িম ও সা'আব দুর্গে এবং তাদের সেনাবাহিনী অবস্থান নেয় নাতাত দুর্গে।

য়াহূদীরা দুর্গের ভিতর থেকে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করছিল। আর মুসলমানগণ ঐ সব তীর ও পাথর উঠিয়ে উল্টো য়াহূদীদের উপর নিক্ষেপ করছিলেন। মাহমূদ বিন মাসলামা (রা) অত্যন্ত বীরত্ব সহকারে নায়িম দুর্গের উপর হামলা চালান। সেটা ছিল ভীষণ গরমের মওসুম। তাই তিনি খানিকটা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য দুর্গের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেন। তখন মারহাবের পরামর্শ অনুয়ায়ী কিনানা বিন আবিল হুকায়ক উপর থেকে একটি ভারী পাথর কিংবা চাক্কি মাহমূদ (রা)-এর মাথার উপর ফেলে দেয় এবং এই আঘাতের ফলে মাহমূদ (রা) তৃতীয় দিনে ইন্তিকাল করেন।

যাই হোক, নায়িম এবং নাতাত শীঘ্রই বিজিত হয়। এরপর শিক্ ও সা'আব মুসলমানদের অধিকারে আসে। সম্ভবতঃ সা'আব দুর্গ পদানত করতে গিয়ে 'আমির বিন আকওয়া (রা) ও মারহাবের মধ্যে মুখোমুখি যুদ্ধ হয়। মারহাব, 'আমিরের উপর তরবারি দ্বারা আঘাত করে। আমির (রা) আপন ঢাল দ্বারা তা প্রতিরোধ করে সংগে সংগে মারহাবের পা লক্ষ্য করে আপন তরবারি দ্বারা খুব জোরে আঘাত করেন। কিন্তু তরবারীছিল ছোট, তাই তা মারহাবের পায়ে না লেগে উল্টো 'আমির (রা)-এর উরুতেই এসে লাগে। যার ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন। কামূস দুর্গ পদানত করতে গিয়ে বেশ বিলম্ব ঘটে। বিশ দিন পর্যন্ত দুর্গটি অবরোধ করে রাখা হয়েছিল।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিদিন মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন। কামূস দুর্গের অবরোধ চলাকালে তিনি ভীষণ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। তাই ঐ দুর্গ পদানত করার কাজে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য তিনি কোন না কোন সাহাবীকে অধিনায়ক করে পাঠাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করেন ঃ কাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা তুলে দেব, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে চায় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাকে চান।

মরহুম মাওলানা শিবলী লিখেছেন – "ঐ রাত ছিল ভীষণ আশা ও প্রতীক্ষার রাত। সাহাবা কিরাম সারা রাত এই ব্যাকুলতায় অতিতবাহিত করেন যে, দেখা যাক এই গর্ব-মুকুট কার হাতে পৌঁছে।

ভোরবেলা হযরত আলী (রা) কে ডেকে পাঠান হয়। চোখ উঠার কারণে তিনি যুদ্ধে যেতে পারছিলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পবিত্র মুখের কিছু লালা হযরত আলী (রা) এর চোখে মেখে দেন, তাঁর জন্য দু'আ করেন এবং ইসলামী পতাকাটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলেন, তুমি অত্যন্ত বিনীতভাবে শত্রুদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করবে। যদি একটি লোকও তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তা হবে লাল উটের চাইতেও শ্রেয়।

অর্থাৎ যুদ্ধকালীন সময়েও সর্ব প্রথম ইসলামের দাওয়াত পেশ করা চাই। কেননা যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য যুদ্ধ নয়, বরং ইসলাম তথা সত্য প্রচার। যাহোক, হযরত আলী (রা) এর সাথে মুকাবালা করার জন্য সর্বপ্রথম মারহাব এগিয়ে আসে। তার গায়ে ছিল দুটি বর্ম, মাথায় ছিল দুটি পাগড়ী, কোমরে ছিল দুটি তরবারি। এক হাতে শক্ত ঢাল এবং অপর হাতে বল্লম। সে বিদ্রূপাত্মক গান গাইতে গাইতে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। তার ভাই হারিছ ইতিমধ্যে নিহত হয়েছিল। তাই সে ভ্রাতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একেবারে পাগল পারা হয়ে উঠেছিল। হযরত আলী

(রা) তার মাথায় তরবারি দ্বারা এমন জোরে আঘাত করেন যে, তাতে তার মাথা দ্বিখন্ডিত হয়ে তরবারি একেবারে দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। এরপর মারহাবের ভাই ইয়াসির মুকাবালার জন্য বেরিয়ে আসে। হযরত যুবায়র দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ইয়াসিরকেও হত্যা করেন।

মোটকথা, বিশ দিন পর কামূস দুর্গ মুসলামানদের পদানত হয়। এপর অন্যান্য দুর্গবাসীরা সন্ধি করতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, য়াহূদীরা তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে বেরিয়ে যাবে। ধন-সম্পদ ও যুদ্ধাস্ত্র সংগে নিয়ে যেতে পারবে না। যদি কেউ এই সব জিনিস লুকিয়ে রাখে তাহলে মুসলমানদের উপর তার নিরাপত্তার কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না। কিনানা বিন আবিল হুকায়ক তার অর্থসম্পদ, সোনাদানা এবং মূল্যবান অলংকারাদি উটের চামড়ার একটি থলেতে ভরে তা একটি পতিত জায়গায় লুকিয়ে রাখে। তার বন্ধুরা তাকে অনেক করে বললো, এভাবে লুকিয়ে রাখা তোমার জন্য ঠিক হবে না। বরং তুমি মুসলমানদের কাছে তোমার ব্যাপার ফাঁস করে দাও। কিন্তু সে তাতে রাজী হলো না। শেষ পর্যন্ত তার এ লুকোচুরির কথা ফাঁস হয়ে যায়। তবে এ কারণে নয় বরং মাহমূদ বিন মাসলামাহ্(রা) কে হত্যা করার কারণে তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। তাবারীতে এ বিষয়টির পরিষ্কার উল্লেখ আছে।[১৬] কিনানা, মাহমূদকে যুদ্ধের মধ্যে হত্যা করে নি, বরং এমন এক অবস্থায় উপর থেকে একটি পাথর ফেলে দিয়ে তাকে হত্যা করেছিল, যখন তিনি বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলেন।

সন্ধি স্থাপনের পর য়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে আবেদন করে এখানকার ভূসম্পত্তি আমাদের হাতে অর্পণ করুন, আমরা সব সময় এর অর্ধেক উৎপাদন আপনাদেরকে দিয়ে যাব। তাদের এই আবেদন মঞ্জুর করা হয়। এপর রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা) কে খায়বারের অর্ধেক উৎপাদন উসল করার জন্য সেখানে পাঠাতেন। আবদুল্লাহ (রা) সেখনকার উৎপাদিত ফল-ফসল দুভাগে ভাগ করে য়াহূদীদেরকে বলতেন, তোমরা এর মধ্য থেকে যে কোন একটি ভাগ নিয়ে যাও। য়াহূদীরা তার এই ন্যায়নিষ্ঠা দেখে অবাক বিস্ময়ে বলত, যমীন ও আসমান বোধ করি এই ন্যায় বিচারের জন্য টিকে আছে।[১৭]

দু'জন শহীদের কাহিনী

আসওয়াদ রা'য়ী নামীয় জনৈক ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খায়বারে য়হূদীদের মেষ চরাতেন। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে হাযির হয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়েন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদতের সৌভাগ্যও লাভ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি একটি সালাতেরও ওয়াক্ত পান নি। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সে অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছে।

অনুরূপভাবে আর একজন বেদুইন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মানুষের উট চরাতেন। তিনিও খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের পর যখন তাঁকে মালে গনীমতের অংশ দেওয়া হয় তখন তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমি এই মালে গনীমতের নয়, বরং শাহাদতের আকাংখী। তিনিও শাহাদত বরণ করেছিলেন।

কিছু ফিক্হী আহকাম

খায়বার যুদ্ধে কয়েকটি ফিক্হী আহকাম প্রচার করা হয়। যথা ঃ

১। পাঞ্জাদার পাখী হারাম।

২। হিংস্র জন্তু হারাম।

৩। গাধা ও খচ্চর হারাম।

৪। সোনা ও রূপার বিমিয় সমান সমান না হলে তা হারাম।

৫। মুতা' বিবাহ্ হারাম হওয়ার কথাও এই যুদ্ধে ঘোষণা করা হয়।

প্রাণের ক্ষতি

খায়বার যুদ্ধে তিরানব্বই জন য়াহূদী নিহত হয়, যাদের মধ্যে তাদের অনেক বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও রয়েছে। পনেরো জন মুসলমান শাহাদত বরণ করেন। তাঁদের মধ্যে 'আমির বিন আকওয়া' (রা) আকস্মিকভাবে নিজের হাতেই নিজে আহত হন এবং সে কারণে শাহাদত বরণ করেন। বাশার বিন বারা আল খাযরাজী নামক সাহাবী বিষ মেশানো গোশত খাওয়ার কারণে ইন্তিকাল করেন।

ফিদক, ওয়দিউল কুরা এবং তাইমা

খায়বারের পর ফিদ্কের য়াহূদীরাও খায়বারবাসীদের অনুরূপ শর্তে মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। কোন কোন রিওয়ায়াত অনুযায়ী তাদের কাছ থেকে অর্ধেক ভূসম্পত্তি নিয়ে নেওয়া হয় এবং অর্ধেক তাদের দখলে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে হযরত উমর (রা) যখন য়াহূদীদেরকে হিজায থেকে বহিষ্কার করেন তখন ফিদ্কের য়াহূদীদেরকে তাদের অর্ধেক ভূসম্পত্তির মূল্য প্রদান করা হয়।

এরপর মুসলমানগণ ওয়াদিউল কুরার দিকে অগ্রসর হন। সেখানে সামান্য যুদ্ধ হয়, তারপর খায়বারের অনুরূপ শর্তে সন্ধি স্থপিত হয়। তাইমার য়াহূদীরা যুদ্ধ না করেই উপরোক্ত শর্তানুযায়ী মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়।

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া (রা)

খায়বারের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে হুয়াই বিন আখবাব-এর কন্যা সাফিলাও ছিলেন। দিহ্ইয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে একটি দাসীর জন্য আবেদন করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বন্দীদের মধ্যে কোন একটি মেয়েকে বেছে নেবার অনুমতি দেন। তিনি তখন সাফিয়কে নির্বাচন করেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, সাফিয়া হচ্ছেন বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা গোত্রের সর্দারের কন্যা। আপনি ছাড়া অন্য কেউ এর উপযুক্ত নয়। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) দিহ্ইয়া (রা) কে অন্য একজন দাসী দান করেন এবং সাফিয়াকে মুক্ত করে দিয়ে তাঁর সাথে স্বয়ং পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এভাবে কুরায়যা ও নাযীরের সর্দারের কন্যা উম্মুল মুমিনীন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। মরহুম মাওলানা শিবলী ঠিকই লিখেছেন –

হযরত সাফিয়া (রা)এর প্রতি সৌজন্য ব্যবহার তাঁর মর্যাদা যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং তাঁর মনের ব্যথা দূর করার এছাড়া অন্য পথই ছিল না ----- সুন্দর আচরণ, দয়া এবং বিপদগ্রস্থের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ছাড়াও রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় দিক থেকে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন ছিল একান্ত প্রয়োজনীয় ও যথার্থ।[১৮]

জনৈক য়াহূদী স্ত্রীলোকের বিদ্বেষ

সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর সালাম বিন মিশকামের স্ত্রী যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে দাওয়াত করে এবং খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অপরিসীম সৌজন্য ও সদয়তার কারণে যায়নাবের

দাওয়াত গ্রহণ করেন। কিন্তু একটি গ্রাস মুখে নিয়েই খাবারের পাত্র থেকে হাত উঠিয়ে নেন এবং মুখের খাবারটুকুও উগলে ফেলেন। বাশার বিন বারা খাযরাজী (রা)-ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে ছিলেন। অত্যধিক শিষ্টতার কারণে তিনি তাঁর মুখের গ্রাসটি সংগে সংগে উগলে ফেলেন নি। তাই সেটা পাকস্থলীতে চলে যায় এবং সংগে সংগে দেহের মধ্যে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। এই ঘটনার তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিন তিনি ইন্তিকাল করেন। যায়নাবকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে তার অপরাধের কথা স্বীকার করে বলে, আমার ধারণা ছিল, যদি আপনি নবী হন তাহলে বিষ আপনার দেহে কোন ক্রিয়া করবে না। আর যদি নবী না হন তাহলে আপনার হাত থেকে আমরা য়াহূদীরা পরিত্রাণ পাব।

বাশার বিন বারা-এর মৃত্যুর পর যায়নাবকে কিসাসস্বরূপ মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়।

মালে গনীমত বন্টন

তাবাকাতে ইবনে সা'দে আছে, যখন খায়বার বিজিত হল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানকার ভূসম্পত্তি ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করেন। তার প্রত্যেকটি ভাগে ছিল একশটি অংশ। এর অর্ধেক (অর্থাৎ আঠারো ভাগ) রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য পৃথক করে রাখা হয়, আর বাকি অর্ধেক মুসমানদের মধ্যে বন্টন করা হয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর অংশটি এই অর্ধেক ভাগ থেকে গ্রহণ করেন।[১৭]

অন্যভাবে বলতে গেলে, আঠারো ভাগে (প্রতিভাগে একশ অংশ করে) মোট আঠারো শত অংশ হয়। তা থেকে পদাতিককে দেওয়া হয় এক অংশ ও অশ্বারোহীকে দু'অংশ করে। খায়বার যুদ্ধে মোট চৌদ্দশ পদাতিক ও দু'শ অশ্বারোহী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী তাদের মধ্যে আঠারোশ অংশ বন্টন করে দেওয়া হয়।

টীকা ঃ

১। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ১০৬।

২। আরযুল কুরআন ঃ পৃষ্ঠা ২২৮ ও ৩৩০।

৩। রাহমাতুল লিল আলামীন ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ২৫৮।

৪। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য - সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা ৪৩৮।

৫। কারো কারো মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসায়লামা বিন আবদুল্লাহ্ আল লায়ছীকে মদীনা মুনাওওরায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছিলেন (দ্রষ্টব্য) জাওয়ামিউস্ সীরাহ ঃ পৃষ্ঠা - ২১১; ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পৃষ্ঠা - ৩২৮।

৬। মুহাররম, হিঃ ৭ সনের সুচনা হয়েছিল ১১ মে, ইং ৬২৮ সনে।

৭। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ জমাদিউল উলা, হিঃ ৭ সনের সূচনা হয়েছিল ৬ সেপ্টেম্বর, ইং ৬২৮ সনে।

৮। জাওয়ামিউস্ সীরাহ ঃ পৃষ্ঠা - ২১১।

৯। 'ইবনে হিশাম' এর টীকায় আছে, ইস্‌র হচ্ছে মদীনা মুনাওওরা এবং ওয়দিউল ফার'আ এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত পাহাড়। যদি মনে করা হয় যে, এই ফার'আ হচ্ছে সেই বিখ্যাত ওয়াদিয়ে ফার'আ তাহলে ভুল করা হবে। কেননা এটা মদীনা থেকে বেশ দূরে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। আর খায়বার অভিযানের যাত্রাপথ ছিল উত্তর দিকে। যদি উত্তর দিকে ওয়াদিয়ে ফার'আ নামক কোন উপত্যকা থাকে তাহলে সেটার ফার'আ হওয়া সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। মদীনা মুনাওওরায় নিকটবর্তী একটি ছোট পল্লীর নামও ফার'আ। খুব সম্ভবত: এটার উল্লেখই এখানে করা হয়েছে।

১০। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ২৪৪।

১১। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ২৪৫।

১২। আসাহ্হুস্ সিয়ার ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১৮৪।

১৩। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ১০৬।

১৪। এই প্রবন্ধ এবং ডঃ হামীদুল্লাহ্র লেখা আরো কয়েকটি প্রবন্ধ আমি আমার প্রিয় বন্ধু ডঃ আবদুল্লাহ্ চুঘতাই এর মাধ্যমে পেয়েছি।

১৫। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ২৪৫।

১৬। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ২৪২।

১৭। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ২৪৯।

১৮। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ২৫১।

১৯। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ১১৩।

মূতা যুদ্ধ

মূতা যুদ্ধ

ঘটনাস্থল

কমবেশী এক শতাব্দী পূর্বেকার ভৌগলিক বণ্টন অনুযায়ী মূতা ছিল সিরিয়ার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ শহর। এ কারণেই আমাদের ইতিহাস গ্রন্থাদিতে কিংবা বর্তমান যুগের এইসব সীরাত গ্রন্থে, যা চার। ছয় শ' বছর পূর্বেকার ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক গ্রন্থাদির উপর ভিত্তি করে প্রণীত, তাতে মূতাকে সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি জায়গা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১] কিন্তু গত পঞ্চাশ। ষাট বছরের মধ্যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ সিরিয়ার মনিচিত্রের উপর বেশ কয়েকবার কাঁচি চালিয়েছে। তাদের এই দূরাচার থেকে উত্তর হিজাযও রক্ষা পায় নি। প্রথমে তারা ফেলিস্তিন থেকে সিরিয়াকে পৃথক করে। এরপর ফেলিস্তিনকে খন্ডবিখন্ড করে সেখানে য়াহূদীদের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, যার কারণে সমগ্র মধ্য প্রাচ্যের আকাশে ফিত্না-ফাসাদ এবং অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার ঘনঘটায় ছেয়ে আছে। একাজ করার পর তারা হেজাযের দুটি এলাকা লাকবাহ্ এবং মা'আনকে পৃথক করে তার উপর জর্দান রাষ্ট্রের ভিত্তি করেছে, যার সাথে দক্ষিণ সিরিয়াকে যুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া লেবাননকে সিরিয়া থেকে বিছিন্ন করা হয়েছে।

অতীত যুগে মূতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে নির্মিত তরবারির খ্যাতি ছিল জগত-জোড়া। এখানে নির্মিত তরবারিসমূহকে 'মাশরিফিয়াহ্' বলা হয়। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারির চাইতে অনেক উন্নত ধরনের যুদ্ধাস্ত্রের আবির্ভাব ঘটে তখন থেকেই তরবারি নির্মাণের পেশাটি শুধু মূতায় নয় বরং সর্বত্রই একটি অতীত কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। আর আজকাল তো সাধারণ মানচিত্রে মূতার নামই দৃষ্টিগোচর হয় না।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমানকালে মূতা জর্দান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই সাম্রাজ্যের একটি অঞ্চলের নাম বালকা, যা জর্দান নদীর পূর্ব প্রান্তসহ লূতসাগরের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত প্রলম্বিত। মূতা বালকার দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত। আরবের বিস্তারিত মানচিত্রসমূহে এটাকে লূত সমুদ্রের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে দেখা যায়। এটা ঐ রেল লাইনের ধারে অবস্থিত, যা মা'আন থেকে আফরাহ ও কারক্ হয়ে আম্মানের দিকে চলে গেছে। এখন এই স্থানের গুরুত্ব তরবারি নির্মাণের কারণে নয়, বরং ঐ যুদ্ধের কারণে, যাতে হযরত জা'ফর বিন আবী তালিব, হযরত যায়দ বিন হারিছা, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা) তাঁদের বেশ কিছু সংখ্যক সংগীসহ শাহাদাত বরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে একটি অতি সুন্দর মাযার নির্মিত হয়েছিল , যা মূতার দক্ষিণে অবস্থিত এবং 'আল্মাযার' নামে পরিচিত।

বাইবেলে বালকাকে 'মাওআব' এবং ইসলামী ইতিহাসে মা'আব লেখা হয়েছে। মাওআব বা মা'আব ছিল হযরত লূত (আ)-এর জৌষ্ঠ্য পুত্রের নাম। জায়গার নাম থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত লূত (আ)-এর ঐ পুত্রের বংশধরেরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল।

যুদ্ধের কারণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন গোত্রপতি, বাদশাহ্ ও প্রশাসকের কাছে যখন ইসলামের দাওয়াতনামা পাঠান তখন একটি দাওয়াতনামা হারিছ বিন উমাইর-এর হাতে বসরার প্রশাসকের কাছেও পাঠিয়েছিলেন। হযরত হারিছ (রা) যখন বলকার মধ্য দিয়ে বসরা[২] অভিমুখে যাচ্ছিলেন তখন মূতার শাসনকর্তা শুরাহবিল বিন 'আমর গাস্সানী তাঁকে

আটকে রেখে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে এবং কোথায় যাচ্ছ ? হযরত হারিছ পরিষ্কার জবাব দেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দূত বা সংবাদবাহক এবং বসরা যাচ্ছি। আল্লাহ্ই জানেন, তখন শুরাহ্বিলের অন্তরে কি এল যে, সে হযরত হারিছকে বিনা কারণে শহীদ করে ফেলল। কোন এলাকার উপর দিয়ে একজন মুসাফিরের গমনাগমন তো অপরাধের কিছু ছিল না। আর হযরত হারিছ তো পরিষ্কার বলেছিলেন যে, তিনি একজন দূত এবং কোন দূতক হত্যা করা আন্তর্জাতিক বিধি অনুযায়ী একটি প্রকাশ্য জুলুম ও বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু ছিল না। যাহোক এই অতি দুঃখজনক ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হৃদয়ে এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তিনি শুরাহ্বিলকে উচিত শিক্ষা প্রদানের জন্য অনতিবিলম্বে একটি বাহিনী গঠনের নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ মুতাবিক আল্লাহ্র পথের মুজাহিদগণ মদীনা মুনাওওরা থেকে তিন মাইল উত্তরে জারফ নামক স্থানে সমবেত হন।

অধিনায়কদের মনোনয়ন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন জারফে পৌছেন তখন সেখানে তিন হাজার মুজাহিদ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছিলো।

১। হযরত যায়দ বিন হারিছা (রা)কে সর্বাধিকনায়ক মনোনীত করা হয়।

২। তিনি নিহত হলে সর্বাধিনায়ক হবেন হযরত জা'ফর বিন আবূ তালিব (রা)।

৩। তিনি নিহত হলে সর্বাধিনায়ক হবেন আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা।

৪। তিনিও যদি নিহত হন তাহলে মুজাহিদরাই নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সর্বাধিনায়ক নির্ধারিত করবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ বিন হারিছার হাতে সাদা পতাকা তুলে দিয়ে বলেন, তুমি ঐ স্থানে যাও, যেখানে হারিছ বিন উমায়র তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শাহাদত বরণ করেছে। সেখানে যে সব লোককে পাবে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি গ্রহণ না করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'ছানিয়াতুল ভিদাহ' পর্যন্ত ইসলামী বাহিনীকে এগিয়ে দেন। এরপর তাদেরকে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসেন। এটা হচ্ছে জমাদিউল উলা, হিজরী ৮ সনের ঘটনা।[৩]

প্রতিপক্ষের বিরাট বাহিনী

মুসলিম বাহিনী যখন মদীনা মুনাওওরা থেকে রওয়ানা হল তখন শুরাহ্বিলের কাছে এ খবর পৌছে গেল। সেও সংগে সংগে এক বিরাট বাহিনী গঠন করল। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং হিরাক্লিয়াস (কায়সারে রোম) এক লাখ সৈন্যসহ মাওয়াবে[৪] বিদ্যমান ছিল এবং আর এক লক্ষ সৈন্য লাখাম, বালকীন, বাহরা, বলী প্রভৃতি গোত্র থেকে একত্রিত হয়েছিল। ইসলামী বাহিনী মা'আন পৌছে ঐ বাহিনীর সংবাদ পায়। অতএব প্রয়োজন ছিল এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করা। তাই ইসলামী বাহিনী মা'আনেই অবস্থান গ্রহণ করে। তখন মুসলিম বাহিনীর একদলের অভিমত ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বিরাট শত্রুবাহিনী সম্পর্কে অবহিত করে আরো সৈন্য পাঠাবার জন্য তার কাছে অনুরোধ করা হোক। এরপর তিনি আরো সৈন্য পাঠান কিংবা যে নির্দেশই দেন সে অনুযায়ী কাজ করা হোক। দু'রাত পর্যন্ত এ বিষয়ের উপর আলোচনা পর্যালোচনা চলে।

শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা বলেন, ভাইসব, আমরা তো শাহাদতের আকাংখা নিয়েই বের হয়েছি এবং আমাদের এ আকাংকা পূরণের স্থান তো সামনে রয়েছে। অতএব সামনে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে আমাদের ইতস্তত: করার কোন মানে হয় না। আমরা তো সংখ্যধিক্য বা ক্ষমতার উপর নির্ভর করে যুদ্ধ করি না। যদি আমরা জয়ী হই তাহলে সেটা আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে মঙ্গলজনক। আর যদি শাহাদত বরণ করি তাহলে সেটাও আমাদের জন্য এমন সম্পদ, যার আকাংখা আমরা অহরহ অন্তরে পোষণ করি।

আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার এই অভিমত শ্রবণ করার সাথে সাথে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আর অপেক্ষা না করে শত্রুদের সংখ্যা যত বেশী হোক না কেন, সে দিকে লক্ষ্য করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

যুদ্ধ

মুসলিম বাহিনী যখন মা'আনের দিকে অগ্রসর হয় তখন শত্রুবাহিনী মাশারিফে পৌঁছে গিয়েছিল। মাশারিফ ছিল মূতা থেকে সামান্য দূরে। অতএব ইসলামী বাহিনী মূতাকেই নিজেদের ঘাটি হিসাবে নির্বাচন করে। মূতার অদূরবর্তী একটি প্রশস্ত ময়দানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইসলামী বাহিনীর ডান দিকের অংশের অধিনায়কত্বে ছিলেন কুতবা বিন কাতাদা এবং বাম দিকের অংশের অধিনায়কত্বে ছিলেন আবায়া বিন মালিক আনসারী।

মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে যায়দ বিন হারিছা যথারীতি ইসলামী পতাকা নিয়ে অগ্রসর হন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে শত্রুর মুকাবালা করতে থাকেন। তাঁর উপর শত্রুরা অনবরত: বর্শা ও তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে তিনি একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শাহাদত বরণ করেন।

জা'ফর বিন আবী তালিব

এরপর জা'ফর বিন আবী তালিব পতাকা হাতে নেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হন। শত্রুর তরবারির আঘাতে তাঁর ডান হাত কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তিনি বাম হাতে পাতাকা তুলে ধরেন। এরপর বাম হাতও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তিনি বুকের সাথে পতাকাটি কোনমতে লেপটে ধরেন। মোটকথা, যতক্ষণ দেহে প্রাণ ছিল ততক্ষণ তিনি পতাকাটি ঊর্ধে তুলে ধরেন। তারপর একটি তরবারির আঘাত তাঁর কোমরে লাগে,যার ফলে তাঁর দেহ দ্বিখন্ডিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) ও এই যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, জা'ফর (রা) এর দেহে নব্বইটিরও বেশী ক্ষত ছিল। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি গণনা করে দেখেছি, শুধু তাঁর সম্মুখ দিকে পঞ্চাশটি ক্ষত ছিল। এর অর্থ হলো হযরত জা'ফর (রা) আঘাতের পর আঘাত সহ্য করতে থাকেন, কিন্তু পিছ পা হন নি।

এই দুইটি বর্ণনার মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই। কেননা প্রথম বর্ণনায় ক্ষতের যে সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে তা কেবল অনুমানের উপর ভিত্তি করে এবং দ্বিতীয় বর্ণণায় যে সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে তা বাস্তবে গণনা করে – তবে এই গণনা শেষ করা হয় নি। জা'ফরের বয়স হয়েছিল মাত্র তেত্রিশ বছর। এর মধ্যে একটি দীর্ঘ সময়কাল তিনি মুহাজির হিসেবে কাটিয়েছিলেন হাবশায়।

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা

- এরপর আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা পতাকা উঠিয়ে নেন। তিনিও অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন। তাঁর অন্তরে প্রথম থেকে শাহাদত লাভের আকাংখা ছিল। যায়দ বিন আরকাম (রা) য়াতীমী অবস্থায় হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা) -এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মূতা যুদ্ধেও তিনি তাঁর সংগে ছিলেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) রাস্তায় এমন ধরনের কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, যা থেকে বুঝা যাচ্ছিলো যে, তিনি শাহাদত লাভের ঐকান্তিক আশা পোষণ করছেন। যায়দ (রা) বলেন, আমি তাঁর ঐসব কবিতা শুনে কেঁদে উঠি। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বেত দ্বারা আমাকে প্রহার করেন এবং বলেন, হে পাপিষ্ঠ, আল্লাহ্ যদি আমাকে শাহাদত দ্বারা ভাগ্যবান করেন তাহলে তোর এতে ক্ষতির কী আছে?

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইসলামী বাহিনীকে কোনরূপ ইতস্তত: না করে যুদ্ধে অবতরণের জন্য আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা) পরামর্শ দিয়েছিলেন।

একটি বর্ণনায় আছে, ঐ সফরে পানাহারের ব্যবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। আবদুল্লাহ্ (রা)-এর চাচাত ভাই তাঁকে গোশত সম্বলিত একটি হড্ডি দিয়ে বলেন, এটা খেয়ে নিজেকে কিছুটা মজবুত করে নাও। আবদুল্লাহ্ (রা) তা থেকে সামান্য কিছু গোশত দাঁত দিয়ে ছিড়েছেন, এমন সময় শত্রুদের আওয়াজ শুনতে পান এবং সংগে সংগে হাড্ডিটি ফেলে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে যান এবং নিজেকে সম্বোধন করে বলতে থাকেন, হে আবদুল্লাহ্, তুমি কি এখনো দুনিয়াতে রয়েছ? এরপর তিনি লড়তে লড়তে শাহাদত বরণ করেন।

শেষ পর্যায়

আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা) এর শাহাদত লাভের পর যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। আর এটাই যুদ্ধের ফলাফলের ব্যাপারে মতপার্থক্যের কারণে পরিণত হয়। একের পর এক তিনজন অধিনায়কের নিয়োগ সম্পর্কিত নির্দেশ তো খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) জারী করেছিলেন এবং চতুর্থ অধিনায়কের নির্বাচনের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন মুজাহিদ বাহিনীর উপর। তাবাকাতে ইবনে সা'দে আবূ আমির থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা)-এর শহাদত লাভের পর মুসলমানগণ পরাজয় বরণ করে এদিক সেদিক ছুটতে থাকেন। মুসলমানদের এমন দুর্যোগ ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায় নি। তাঁদের মধ্যে দুজনও একত্রে ছিলেন না। এমতাবস্থায় একজন আনসারী ইসলামী পতাকা উঠিয়ে নিয়ে অত্যন্ত দ্রুতবেগে পলায়নপর মুসলিম বাহিনীর একেবারে অগ্রে চলে যান এবং পতাকা গেড়ে, উচ্চস্বরে আওয়াজ দেন, 'লোক সকল, আমার কাছে আসো।' তাঁরা এ আওয়াজ শুনতেই সব লোক তাঁকে কেন্দ্র করে একত্রিত হতে থাকে। দল যখন বেশ কিছুটা ভারী হয়ে উঠে তখন তিনি (আনসারী) পতাকাটি উড়িয়ে নিয়ে খালিদ বিন ওলীদের কাছে যান। খালিদ (রা) বলেন, আমি আপনার কাছ থেকে এই পতাকা নিতে পারি না; আপনিই এই পতাকা বহনের অধিক যোগ্য। আনসারী তখন বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তোমার জন্যই এই পতাকা উঠিয়ে নিয়ে এসেছি।

একথা শুনে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) পতাকাটি হাতে তুলে নেন। তারপর শত্রুবাহিনীর উপর হামলা চালান। তখন আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুবাহিনীকে এমনভাবে পরাস্ত করেন, যা ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায় নি।[৫]

স্থান ও কালের যাবতীয় প্রেক্ষিত এই বর্ণনাকেই সমর্থন করে। যেমন–

১। যদি শত্রুবাহিনী জয়ীই হত তাহলে এটা কি বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে, যে মুসলিম বাহিনী সংখ্যার দিক দিয়ে শত্রুবাহিনীর পঞ্চাভাগের অথবা চল্লিশ ভাগের একভাগ – তারা পরাজিত হওয়ার পর শত্রুরা কি তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করত না – এমতাবস্থায় যে, তাঁরা তাদেরই (শত্রুবাহিনীর) দেশে অবস্থান করছে।

২। এটা অবশ্যই ভেবে দেখার বিষয় যে, এমন কী কারণ থাকতে পারে, যা শত্রুবাহিনীকে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত রাখল ? আর এটা কী করেই বা সম্ভব যে, পরাজিত হওয়ার পরও সম্পূর্ণ মুসলিম বাহিনী নিরাপদে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হল ?

৩। মূতার প্রশাসক শুরাহ্‌বিল বিন আমর গাসসানী, যে আন্তর্জাতিক সমস্ত নিয়মনীতি ভংগ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূত হারিছ বিন উমায়রকে শহীদ করে ফেলেছিল, সেই শুরাহ্‌বিল এবং তার জাতি কী করে রাতারাতি এত নম্র হৃদয় ও দয়ার সাগরে পরিণত হল যে, তারা সংখ্যায় দেড় লাখ হওয়া সত্ত্বেও তিন হজার মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন করাটা একটা অমানুষিক কাজ বলে গণ্য করলো ?

পরাজয় সম্পর্কিত কিছু উক্তি

এতে সন্দেহ নেই যে, এমন কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, মুসলমানরাই সেদিন পরাজয় বরণ করেছিল। যেমন, মুসলিম বাহিনী যখন মদীনায় পৌঁছে এবং জনসাধারণ যথারীতি তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে আসে তখন একদল লোক মুসলিম বাহিনীর লোকদের উপর মাটি এবং কংকর নিক্ষেপ করতে

থাকে এবং সাথে সাথে এও বলতে থাকে, 'পলাতকের দল,তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে পালিয়ে এসেছ। কিন্তু খেদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, এরা ফেরারী (পলাতক) নয়, কাররারী (মোড় ঘুরিয়ে পুনরায় শত্রুর উপর হামলাকারী)।

মদীনাবাসীদের উপরোক্ত আচরণের কারণ এই ছিল যে, তাঁদের নিকট প্রথম প্রথম যে খবর পৌঁছেছিল তা ছিল মিথ্যা ও অবাস্তব। তাঁরা সত্যাসত্য যাচাই না করেই সে খবরের উপর নির্ভর করেছিলেন। তাছাড়া ঐ যুগে বর্তমান যুগের মত খবর সংগ্রহের কোন সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা ছিল না। লোকেরা তখন শুধুমাত্র দূত এবং সংবাদ বাহকদের কথাকেই নির্ভরযোগ্য মনে করত। কোন সংবাদ বাহক হয়ত মদীনায় এসে এমন এক সংবাদ পরিবেশন করেছিল, যা থেকে বুঝা যাচ্ছিল যে, মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে পালিয়ে এসেছে এবং সেই প্রেক্ষিতেই মদীনাবাসীরা অসৌজন্যমূলক আরচণ করেছিল। কিন্তু ঐ আচরণের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন একটি উক্তি করেন, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম বাহিনীর উপর পরাজয় বা পলায়নের যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তা সত্য নয় বরং অমূলক।

সম্ভবত: প্রথম প্রথম মদীনাবসীদের কাছে অমূলক ও বাস্তবতা-বিবর্জিত খবর পৌঁছেছিল এবঙ তাঁরা সত্যাসত্য যাচাই না করেই সে খবরটিকে সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাছাড়া ঐ যুগে তো বর্তমান যুগের ন্যায় খবর সংগ্রহের ব্যাপকতর কোন মাধ্যম ছিল না। এক্ষেত্রে সব সময় সংবাদবাহক বা সংবাদদাতাদের উপরই নির্ভর করতে হত। আর এ প্রেক্ষাপটেই মদীনাবাসী জনসাধারণ মুসলিমবাহিনী সম্পর্কে কটূক্তি করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের ঐ কটূক্তির জবাবে যে উক্তি করেন, তাতে বুঝা যয় যে, তাদের ঐ ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অমূলক।

'আসাহ্হুস্ সিয়ার' এর বর্ণনা

মরহুম মাওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী 'আসাহ্হুস্ সিয়ারে' লিখেছেন, 'ইবনে কাইয়িম বলেন, বুখারীতে আছে যে, মুসলমানরা পরাজিত হয়েছিল।[৬] কিন্তু এক্ষেত্রে সে কথাই সঠিক, যা ইবনে ইসহাক লিখেছেন। অর্থাৎ উভয় বাহিনী কোনরূপ চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়ার পূর্বেই একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। ইবনে হিশাম যুহ্‌রী থেকে বর্ণনা করেছেন, আমাদের তো এটাই মনে হয় যে, যখন খালিদকে অধিনায়ক নিযুক্ত করা হল তখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলামনদেরকেই বিজয় প্রদান করেছিলেন।[৭]

ইমাম বুখারী ও ইমাম যুহ্‌রীর বর্ণনাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হোক অথবা ইবনে ইস্‌হাকের বর্ণনাকে, কোন অবস্থায়ই মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের কথা সমর্থনযোগ্য নয়। ইবনে ইস্‌হাক বেশী থেকে বেশী এই বলেছেন যে, যুদ্ধের কোন চূড়ান্ত ফয়সালা হয় নি, এমতাবস্থায় উভয় দল পেছনে হটে যায়। যদি উভয় বাহিনীর এই পেছনে হটে যাওয়াকে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলেও তো এটা লাখ দেড় লাখ সৈন্য সম্বলিত শত্রুবাহিনীর লজ্জা ও লাঞ্ছনার কারণ হতে পারে – কোন অবস্থায়ই তিন হাজার সৈন্য সম্বলিত মুসলিম বাহিনীর লজ্জা ও অপমানের কারণ হতে পারে না। এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী তাঁদের নিজেদের দেশে নয়, বরং কয়েকশ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে শত্রুদের দেশেই তাদের একটি বিরাট বাহিনীর সাথে লড়ছে।

প্রকৃত অবস্থা

প্রকৃত ঘটনা এই মনে হয় যে, আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার শাহাদত লাভের পর মুসলমানদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে আতংকের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। এটা হচ্ছে তখনকার কথা, যখন কোন নতুন অধিনায়ক নির্বাচন করা হয় নি। যখন ছাবিত বিন আকরাম আনসারীর বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও বীরত্বের কল্যাণে খালিদ বিন ওয়ালীদের অধিনায়কত্বের উপর সবাই ঐকমত্য হয়ে গেলেন তখন খালিদ (রা) বিক্ষিপ্ত বাহিনীকে একত্রিত করে বিন্যস্ত করেন। এরপর এমন প্রবলবেগে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন যে, শত্রুরা তখন হতবুদ্ধি হয়ে নিজেদের ঘাটি পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। এটাও সম্ভব যে, মুসলামনরা হঠাৎ পশ্চাদপসরণ করে পুনরায় নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়ে হামলা করার দরুণ

শত্রুরা ধারণা করে যে, এরা সেই সৈন্য নয়, যারা কিছুক্ষণ আগে পশ্চাদপরসরণ করেছে, বরং এরা হচ্ছে সেই সজীব সতেজ বাহিনীর লোক, যারা পেছনে কোন একটি গুপ্তস্থানে লুকিয়ে ছিল; আর এটাও সম্ভব যে, এ ধরনের আরো বাহিনী এদিক সেদিক লুকিয়ে আছে এবং সুযোগ মত ওরাও আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই ভেবে শত্রুবহিনীর হতবুদ্ধি হওয়াটা ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এ কারণে তাদের পশ্চাদপসরণ করার মধ্যেও বিস্ময়ের কিছু ছিল না। অবশ্য মুসলমানরা এই অবস্থায় শত্রদের পশ্চাদ্ধাবন করে নি। কেননা তাঁদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। যদি শত্রুরা মুসলামানদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সেদিন অবহিত হতে পারত তাহলে এটা নির্ঘাত সত্যি যে, উপরোক্ত অবস্থায় তাঁদের একজনও সেদিন এই উভয় সঙ্কট থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারত না।

ইসলাম গ্রহণের পর এটাই ছিল হযরত খালিদ (রা) এর অতুলনীয় সামরিক কূটকৌশলের সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে এই বীর যোদ্ধা বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, তা ইতিহাসে গর্বের বিষয় হয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র যবানে এমনিতেই 'সাইফুল্লাহ্' (আল্লাহ্র তরবারি) উপাধিতে ভূষিত করা হয়নি। সহীহ্ বুখারীতে স্বয়ং খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মূতা যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙ্গে ছিল এবং কেবল একটি তরবারি রয়ে গিয়েছিল আমার কাছে।[৮]

মূতা যুদ্ধের শহীদবৃন্দ

ইবনে হাযামের বর্ণনা অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত সাহাবীগণ মূতা যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন।

১। যায়দ বিন হারিছা (রা) – প্রথম অধিনায়ক।

২। জা'ফর বিন আবী তালিব (রা) – দ্বিতীয় অধিনায়ক।

৩। আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা) – তৃতীয় অধিনায়ক।

৪। মাসঊদ বিন আসওয়াদ বিন হারিছা বিন নায্লা (রা)।

৫। ওহব বিন সা'দ বিন আবী সুরাহ (রা)।

৬। 'উব্বাদ বিন কায়স (রা)।

৭। হারিছ বিন নু'মান (রা)।

৮। সুরাকা বিন 'আমর (রা)।

৯। আবূ কুলায়ব (রা) [কারো কারো মতে আবূ কিলাব (রা)]

১০। জাবির বিন 'আমর (রা)। ইনি ছিলেন আবূ কুলায়ব (রা) এর সহোদর।

১১। 'আমর বিন সা'দ (রা)।

১২। 'আমির বিন সা'দ (রা)।

কোন কোন ঐতিহাসিক শহীদদের তালিকায় আরো কিছু নাম যোগ করেছেন। যেমন – হযরত হারিছ বিন 'উমায়র (রা)কে মূতার শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মতে শহীদগণের মোট সংখ্যা ছিল সতেরো।[১০]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শোক ও বিষাদ

সকল শহীদের জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমান বিষাদ ছিল। বিশেষভাবে হযরত যায়দ এবং জা'ফর (রা)-এর শাহাদত ছিল খুবই বেদনাদায়ক। যায়দ (রা) হচ্ছেন সেই মহান ব্যক্তি, যিনি পিতা ও চাচার সাথে গিয়ে নিজের খান্দানের স্যাথে জীবন যাপনের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পদতলে থাকাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে আপন পালকপুত্র বানিয়েছিলেন এবং আপন ফুফাত বোন যায়নাব (রা)-এর সথে তার বিবাহ দিয়েছিলেন। আর হযরত জা'ফর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এত ভাল ভাসতেন যে, তিনি যখন আবিসিনিয়া থেকে

মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার অভিযানে বের হয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখার জন্য তিনি যখন খায়বার পৌঁছেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনন্দের আতিশায্যে জা'ফর (রা)-এর কপালে চুমু দিয়ে বলেন, আমি বলতে পারব না কোনটি আমার কাছে অধিক আনন্দদায়ক– খায়বার বিজয়, না জা'ফরের আগমন।

টীকা ঃ

১. সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৪৬৩; আসাহ্হুসু সিয়ার ঃ পৃষ্ঠা- ২৩৫।

২. বুসরা বর্তমান সিরিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এটা হচ্ছে হেজায রেলওয়ের একটি স্টেশন। এখান থেকে একটি লাইন হায়ফা পর্যন্ত গিয়েছে। বুহায়রা রাহিব সম্পর্কিত ঘটনাটি এই স্থানেই ঘটেছিল। এটি একটি প্রাচীন বসতি। এখানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে।

৩. জমাদিউল উলা, হিঃ ৮ সন শুরু হয় ২৭ আগস্ট, ইং ৬২৯ সনে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন তারিখ জানা যায়নি।

৪. যেমন ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, মাওয়াব ঐ এলাকার নাম ছিল, যাকে বাল্‌কা বলা হত। সম্ভবত: কায়সার ঐ এলাকার কেন্দ্রস্থলে ছিল, যার নাম ছিল কীর মাওয়ার। এখন সেটাকে কিরক বলা হয়। একথাও এখানে বলে রাখা ভাল যে, দামিশ্‌ক্ বাহিনী সম্পর্কিত যাবতীয় খবরাখবর গুপ্তচর বাহিনী ও সংবাদ বাহকদের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছিল। সম্ভবত: ওরা অনুমানের ভিত্তিতে এ সংবাদ দিয়েছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শত্রু বাহিনী ইসলামী বাহিনীর চাইতে ত্রিশ চল্লিশ গুণ বেশী ছিল। তবে রোমান বাহিনীর মোট সংখ্যা কত ছিল, সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

৫. তাবাকাতে ইবনে সা'দ [বাইরূতে মুদ্রিত) ঃ দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা - ১৩০। ইবনে হিশাম-এ যে আনসারী পতাকা উঠিয়ে ছিলেন, তাঁর নাম ছাবিত বিন আক'রাম বলা হয়েছে। (ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পৃষ্ঠা- ৩৭৯) 'জাওয়ামিউস সিয়ার' থেকে উপরোক্ত কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

৬. তাবাকাতে ইবনে সা'দ -এ আরো কিছু বর্ণনা আছে। আর আবূ 'আমিরের বর্ণনা থেকেও বুঝা যায় যে, মুসলমানগণ সেদিন পরাজিত হন নি, বরং জয়ী হয়েছিলেন।

৭. আসাহ্হুস সিয়ার ঃ পৃষ্ঠা- ২৩৮।

৮. বুখারী ঃ কিতাবুল মাগাযী।

৯. জাওয়ামিউস সীরাহ্ ঃ পৃষ্ঠা - ২২২।

১০. আল মুশাহিদ ঃ মওলভী আবদুর রহমান আলী ঃ পৃষ্ঠা- ১৪৩। এই গ্রন্থে সকল শহীদের অবস্থাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

য়াহূদীবাদ, খ্রিষ্টবাদ ও ইসলাম

মাওলানার বিবরণী

য়াহূদী ও ঈসায়ী

পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবায় আরবের ঐ সব য়াহূদী ও ঈসায়ীদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভেংগে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যারা একের পর এক তাদের অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে মুসলমানদের শান্তি ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে বিরাট হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, আরবের মুশরিকদের ন্যায় ওদের বিরুদ্ধেও এখন যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যেমন–

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ
وَرَسُوْلُهُ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوْا الْجِزْيَةَ عَنْ
يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۰

"যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহে ঈমান আনে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না ও সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্য়া দেয়।" (৯:২৯)

যখন ইসলাম আত্মপ্রকাশ করে তখন হিজাযে য়াহূদীদের অনেকগুলো গোত্র বসবাস করত। কিন্তু ঈসায়ীদের তেমন কোন বসতি ছিল না। তখন ঈসায়ীরা হয় ইয়ামনে বসবাস করত, নয়ত আরব ও সিরিয়া সীমান্তে। য়াহূদীদের আচরণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা বার বার তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। কিন্তু ঈসায়ীদের অবস্থা ছিল য়াহূদীদের থেকে ভিন্ন। তাদের স্বভাবে সেই স্তব্ধতা ও কঠোরতা ছিল না, যা য়াহূদীদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। এ কারণেই ঈসায়ীরা তখন ইসলামী দাওয়াতের কথা শুনতে পায় তখন তারা এর কঠোর বিরোধিতা না করে বরং এর দিকে ধীরে ধীরে ধাবিত হতে শুরু করে। ইয়ামনের[১] ইসায়ীরা সূচনা থেকেই ইসলামের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে মুসলমানদেরক জিযিয়া প্রদান করতে স্বীকৃত হয়। এরপর ইসলাম সেখানে আপনা আপনি নিজের স্থান করে নেয়।

আরবের বাইরের ঈসায়ী

আরবের বাইরের যে সব ঈসায়ীর কাছে ইসলামের দাওয়াতনামা পৌঁছেছিল, তাদের আচরণও ছিল ইয়ামানের ঈসায়ীদের অনুরূপ। ইসলামী ইতিহাস মতে সর্বপ্রথম যে বাদশাহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ার ঈসায়ী বাদশাহ্, নেগূশ, যাকে আরবরা নাজ্জাশী বলত এবং যার সত্যপরায়ণতা ও ঈমানের দৃঢ়তার প্রশংসা খোদ আল্লাহ্ তা'আলাই করেছেন। যেমন ঃ

وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ج يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ‎.

"রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শুনে তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য আপনি তাদের চোখ অশ্রু বিগলিত দেখবেন। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যবাহীদের তালিকাভুক্ত কর।" - (৫:৮৩)

ঐ যুগের য়াহূদী এবং ঈসায়ীদের এই মতবিরোধের স্বরূপ পবিত্র কুরআনেও তুলে ধরা হয়েছে এবং তার কারণও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন–

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ج وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصٰرٰى ط ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ‎.

"অবশ্য মু'মিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে য়াহূদী ও মুশরিকদেরকেই আপনি সর্বাধিক উগ্র দেখবেন এবং যারা বলে 'আমরা খ্রীষ্টান' মানুষের মধ্যে তাদেরকেই আপনি মুমিনদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখবেন। কারণ তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী আছে, আর তারা অহংকার করে না।" –(৫:৮২)

ঈসায়ী রাষ্ট্রসমূহের যুদ্ধ ও রক্তারক্তি

কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন ইসলামের দাওয়াত খুব বিস্তার লাভ করে তখন যেসব ঈসায়ী রাষ্ট্র আরব ও সিরিয়া সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল,তারা ইসলামী আন্দোলনের এই ক্রমোন্নতিকে বরদাশ্‌ত করতে পারে নি। রোমান সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তারাও প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম যে ঘটনাটি ঘটে তাহলো হযরত হারিছ বিন 'উমায়র (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার জন্য একটি পত্র দিয়ে মূতায়[২] পাঠিয়েছিলেন। সেখানকার শাসনকর্তার নাম ছিল শুরাহবিল বিন আমর গাস্‌সানী। কোন অপরাধ বা অভিযোগ ছাড়াই সে হযরত হারিছ বিন উমায়র (রা)-কে হত্যা করিয়ে ফেলে। এই প্রকাশ্য জুলুম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য করে। তিনি হিঃ ৮ সনে একটি সেনাবাহিনী মূতা অভিমুখে প্রেরণ করেন। তখন কন্সটান্টিনোপলের সম্রাটও সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। মূতার শাসনকর্তা তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একটি বিরাট বাহিনী যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে সমবেত হয়। তথাপি মুসলমানরাই জয় লাভ করেন।

সিরীয় ও রোমানদের আক্রমণ আকাঙ্ক্ষা

এই ঘটনার পর সিরিয়ার সবগুলো গোত্রই মুসলমানদের উপর হামলা করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কন্সটান্টিনোপলের বাদশাহও তাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্যে করার প্রতিশ্রুতি দেন। অতএব এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই রাজকীয় বাহিনী সিরিয়ায় সমবেত হতে শুরু করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বয়ং মদীনা থেকে সিরিয়া অভিমুখে বহির্গত হতে হয়। এই প্রতিরক্ষা অভিযানই তাবুক যুদ্ধ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-যখন তাবুক পৌঁছেন তখন জানতে পারেন যে, মুসলমানদের এই নির্ভীক পদক্ষেপ শত্রুদের মনে ভয়ানক ভীতি সঞ্চার করছে এবং এ কারণে তারা তাদের যুদ্ধাভিযানের সংকল্প পরিত্যাগ করেছে।

সূরা তাওবার উল্লেখিত আয়াতসমূহ এই ঘটনার পরই নাযিল হয়। আর যেহেতু ঐ দিক থেকে মুসলমানদের উপর বিরাট আক্রমণের আশংকা ছিল, অপর দিকে আরবের য়াহূদীরাও রাতদিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাই আরবের মুশরিকদের মত ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাও মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

উক্ত আয়াতে 'যুদ্ধ কর' নির্দেশের উদ্দেশ্য যুদ্ধের এইরূপ অবস্থাই বুঝায়। এর অর্থ এই নয় যে, বিশ্বের সমগ্র য়াহূদী ও ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শুধু এজন্য যে, তারা য়াহূদী অথবা ঈসায়ী; যতক্ষণ না তারা ইসলামে দীক্ষিত হয় অথবা জিযিয়া প্রদান করে, যেমন ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা তাই প্রমাণিত করার অপচেষ্টা চালায়। এই অর্থ কেবল তারাই গ্রহণ করতে পারবে যারা কুরআনের শিক্ষা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর পবিত্র জীবন, সাহাবা কিরামের অবস্থা এবং ইসলামী ইতিহাস থেকে একেবারে চোখ বন্ধ করে নেয়।

যুদ্ধ করার নির্দেশের সাথে এ কথাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কেন এই সব লোক 'দাওয়াতে হক' এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করছে এবং কেন ন্যায় ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত রয়েছে। উক্ত আয়াতের প্রথমে আহ্‌লে কিতাবের নামোল্লেখ করা হয় নি; বরং তাদের চারটি সলবী (ক্রুশ সুলভ) গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো—তারা না আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখে, না আখিরাতের উপর, আর না এইসব বস্তুকে নিষিদ্ধ মনে করে যেগুলোকে আল্লাহ ও তার রাসূল নিষিদ্ধ করেছেন, আর না সত্য দ্বীনকে অনুসরণ করে। অর্থাৎ যাদের আচরণ এরূপ যে, তারা ন্যায় ও সত্যের ধার ধারে না, ওয়াদা-অঙ্গীকারের কোন পরোয়া করে না, এবং যারা সত্যানুসারীদের শত্রুতা থেকে কখনো বিরত থাকে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে বসে থাকার কি কোন উপায় আছে?

আয়াতের সারমর্ম হলো, আহ্‌লে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও তাদের অবস্থা এই যে, না আল্লাহর উপর তাদের বিশ্বাস বাকী আছে, আর না আখিরাতের উপর। তারা মুখে মুখে দাবী করে, 'আমরা মুমিন' কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি আমল এই ঘোষণা করে যে, তারা মুমিন নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু নিষিদ্ধ করেছিলেন, তা এখন তাদের জন্য নিষিদ্ধ থাকে নি। কেননা প্রথমত: তারা নিজেদের কামনা বাসনা ও রিপুর তাড়না চরিতার্থ করতে গিয়ে অনেক হারামকে হালাল করে ফেলেছে, দ্বিতীয়ঃ কোন বস্তুকে হারাম অথবা হালাল করার অধিকার তারা আল্লাহ ও রাসূলের পরিবর্তে তাদের তথাকথিত ধর্মীয় নেতাদের হাতে তুলে দিয়েছে। সর্বোপরি তারা তাদের সেই সত্য দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছে, যে দ্বীন হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) নিয়ে এসেছিলেন।

এখানে আহ্‌লে কিতাবের ঈমান বা বিশ্বাসকে সেরূপ অস্বীকার করা হয়েছে যেরূপ অস্বীকার করা হয়েছে সূরা বাকারার এই আয়াতে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ٠

"মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী' কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়।—(২:৮)

টীকা ঃ

১. এখানে ইয়ামনের ঈসায়ী বলতে নাজরানের য়াহূদীদের বুঝানো হচ্ছে। কেননা সেই যুগে নাজরান ইয়ামনেরই একটি অংশ বলে স্বীকৃত ছিল।

২. মূতায় নয় বরং বুসরায় পাঠিয়েছিলেন। মুতা ছিল বুসরারই পথে, যেখানে শুরাহবিল নিরপরাধ হারিসেকে হত্যা করিয়েছিল।

জিয্‌য়া

"(অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করবে) যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্‌য়া দেয়।" (৯:২৯)

জিয্‌য়া

পূর্ববর্তী অবস্থা

জিয্‌য়া হচ্ছে একটি ট্যাক্স বা মাশুল, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আর্বিভাবের অনেক পূর্ব থেকেই রোমান ও অন্যান্য শাসকরা বিভিন্ন অধীনস্থ ও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করত। যাদের উপর এই ট্যাক্স ধার্য করা হত তাদেরকে অপমান করার উদ্দেশ্যেই যে তা করা হত তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এমনও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, অমুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা বিরাট অংকের অর্থ বিজয়ীদের খেদমতে পেশ করতে তৈরী হয়ে যেত, কিন্তু এই অর্থকে তারা জিয্‌য়া আখ্যা দিতে রাজী ছিল না। তারা সন্তুষ্ট চিত্তে ইসলামী হুকুমত প্রদত্ত নিরাপত্তা সানন্দে কবুল করে নিত এবং এর বিনিময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতেও রাজী ছিল। কিন্তু তারা এটা মোটেই পছন্দ করত না যে, তাদেরকে 'জিয্‌য়া গুযার' (জিযিয়া করদাতা প্রজা) আখ্যায়িত করা হোক। অন্যথায়, নিরাপত্তার বিনিময়ে যে কোন ধরনের ট্যাক্স প্রদানে তাদের কোন আপত্তি ছিল না। আপত্তি ছিল শুধু ঐ ট্যাক্সকে জিয্‌য়া আখ্যা দিতে। কেননা তারা এটাকে মানহানিকর ব্যাপার বলে মনে করত। এর মুল কারণ সম্ভবত: এই ছিল যে, ইতিপূর্বে জিয্‌য়ার নামে বিভিন্ন দেশের শাসকরা যে কর আদায় করত তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল করদাতাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা।

মুসলমানদের উদ্দেশ্য কখনো এই ছিল না যে, কোন জাতি বা গোষ্ঠীকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাদের কাছ থেকে জিয্‌য়া আদায় করা হবে। তবে এই নির্দিষ্ট করের নাম জিয্‌য়া রাখা হয় এজন্য যে, নিরাপত্তা দানের বিনিময়ে ইতিপূর্বে যে কর আদায় করা হত সেটাকে জিয্‌য়াই বলা হত এবং বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তার প্রচলন ছিল।

তিনটি পন্থা

যে সব এলাকা বিজিত হচ্ছিলো কিংবা যেখানে যেখানে ইসলামী বাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল, সেখানে অমুসলিমদের সামনে থাকত তিনটি স্বাভাবিক পন্থা। এর মধ্য থেকে যে কোন একটি পন্থা তারা গ্রহণ করতে পারত। তবে যে পন্থাটি গ্রহণ করত সে প্রেক্ষিতেই তাদের সাথে আচরণ করা হত।

১। তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। এমতাবস্থায় তাদের উপর ঐ সব আদেশ নিষেধ প্রয়োগ করা হবে, যা ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসলমানের উপর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

২। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা গ্রহণ করবে। এমতাবস্থায় ঐ নিরাপত্তা দানের বিনিময়ে তাদের উপর অবশ্য-প্রদেয় কিছু পরিমাণ ট্যাক্স আরোপ করা হবে, যা তারা নিয়মিত পরিশোধ করতে থাকবে। এটাকে বহুল প্রচলিত ভাষায় জিয্‌য়া বলা হয়।

৩। উপরোক্ত দুটি পন্থাই অস্বীকার করে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরোধিতায় নেমে পড়বে। এমতাবস্থায় তাদের সাথে শত্রুতামুলক আচরণ করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়বে।

দুঃখজনক বিকৃতি

যুদ্ধাবস্থায় প্রতিপক্ষকে উপরোক্ত তিনটি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ করতে বলাটা এমন কোন পদক্ষেপ নয়, যা ন্যায়নিষ্ঠতা ও জননিরাপত্তার বিপরীত বা এমন কোন ব্যবস্থা নয়, যা শান্তিকামিতার প্রতিকূল। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শুধুমাত্র এই ছিল যে, যুদ্ধের অবস্থা এবং মারামারি ও খুনাখুনিকে শুধুমাত্র ঐ সমস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, যারা যুদ্ধ ও মুকাবালা ছাড়া আর কোন পন্থাই গ্রহণ করতে রাজী নয়। কিন্তু কেউ কেউ এই সোজা বিষয়টিকে একটি ফর্মুলার আকার দিয়ে এমন একটি ভঙ্গিতে পেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন, যাতে মনে হয় মুসলমানরা যেন নিত্যদিন অস্ত্র সজ্জিত হযে ঘর থেকে বের হত এবং রাস্তায় যে অসুমলিমকেই পেত তাকেই জিজ্ঞাসা করে, কী মিয়া, ইসলাম কবুল করবে তো? সে যদি ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করত তা হলে বলত, তাহলে জিয্য়া দাও। যদি সে (অমুসলিম) জিয্য়া দিতেও অস্বীকার করত তাহলে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিত। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। (আমরা তো আল্লাহ্রই এবং নিশ্চিতভাবে তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।)

এটা প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা কল্পকথা ছাড়া কিছু নয়। এটা হচ্ছে মূল বিষয়ের এমন একটি প্রতিচ্ছবি, ইসলামী ইতিহাসের কোথাও যার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই নিছক বিকৃতি ও অপব্যখ্যার কারণ এই যে, মূল বিষয়টিকে বুঝার চেষ্টা না করে তার এমন একটি ব্যাখ্যা গড়ে নেওয়া হয়েছে, যার সাথে দ্বীনে হক তথা ইসলামের না কোন সামঞ্জস্য রয়েছে, আর না ইসলামী ইতিহাস তা সমর্থন করে।

ইখতিয়ারের সীমা

তিনটি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার শুধুমাত্র ঐ সব ভূখন্ডের অমুসলিমদেরকে দেওয়া হত যারা যুদ্ধের আওতাধীন বলে বিবেচিত হত। তবে এই পরিস্থিতিতেও প্রকৃত অবস্থা না জেনে পাইকারীভাবে কাউকে শত্রু মনে করা অন্যায় ও অবিচার ছাড়া কিছু নয়। আর এ কারণেই এক্ষেত্রে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল তা এই যে, সকলের সামনে তিনটি পন্থা পেশ করা হবে এবং তারা এর মধ্য থেকে যে পন্থাই গ্রহণ করবে তাদের সাথে সে অনুযায়ী আচরণ করা হবে। এখানে দ্বীন গ্রহণ করার ব্যাপারে না জবরদস্তির কোন সুযোগ ছিল, না জিয্য়া আদায়ের ব্যাপারে কোন লোভলালসা ছিল, আর না কারো উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেবার খাহিশ ছিল। উল্লেখিত তিনটি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট অমুসলিমদের বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করত। তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ইসলাম গ্রহণ ছিল সাম্যের দলীল, জিয্য়া গ্রহণ ছিল নিরাপত্তার চাবিকাঠি, আর যুদ্ধ গ্রহণ ছিল সেই আচরণের দলিল, যা বাধ্য হয়েই শত্রুদের সাথে করা হত।

সত্য জ্ঞান

ইসলামী বাহিনীর এই কর্ম পদ্ধতির ফলশ্রুতিতে বেশীর ভাগ জনবসতি নির্দ্বিধায় জিয্য়া প্রদানে সম্মত হয়ে নিরাপত্তা গ্রহণ করে। ফলে যুদ্ধের গন্ডি সংকুচিত হয়ে কেবল ঐসব লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, যারা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মুকাবালার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিংবা তাদের রাজা-বাদশাহ্ বা শাসনকর্তার আদেশ পালন করতে গিয়ে যুদ্ধ ছাড়া তাদের সামনে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না।

এটা মুসলমানদের সত্য জ্ঞান ছিল। তাঁরা যুদ্ধের প্রত্যাশী ছিলেন না। কিন্তু ফিত্না-ফাসাদের মূলোৎপাটন করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার ধারাবাহিকতায় যুদ্ধ তাঁদের জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা জোর করে কাউকেই মুসলমান বানাতে পারতেন না। কেননা দ্বীনের ক্ষেত্রে জবরদস্তি জায়িয্ নয়। আর এটা তো জানা কথা যে, দ্বীন এমন কোন খাদ্য গ্রাস ছিল না, যা জবরদস্তি কারো মুখে ঠেঁসে দেওয়া হত। প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ইসলামের

শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্য ছিল। আর তা হলো মানুষের আকায়িদ ও আমাল সঠিক হোক এবং তারা ভ্রান্ত পথ ছেড়ে সরল ও সহজ পথে আসুক। আর এই লক্ষ্য তখনি অর্জিত হতে পারে যখন মানুষ তার আকায়িদ সহীহ্ ও শুদ্ধ করে তা একনিষ্ঠভাবে কাজে রূপায়িত করবে।

ইসলাম গ্রহণ

অবশ্য এটা ঠিক যে, বেশীর ভাগ লোক মুসলমানদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার এবং জনসেবামূলক কাজকর্ম দেখে ও তা থেকে প্রভাবিত হয়ে আপনা-আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। আবার কিছু লোক দীর্ঘদিন মুসলমানদের সংস্পর্শে জীবন যাপন করে নিজে থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিছু লোক তো এমনও ছিল, যারা তাদের প্রথম দিককার ধর্মেই যথারীতি কায়েম ছিল এবং মুসলমানরাও তাদের নিরাপত্তার যে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা যথারীতি পালন করে যাচ্ছিলেন। কখনো এমন কোন ঘটনা ঘটে নি যে, ধর্মের বিভিন্নতার কারণে মুসলমানরা কারো নাগরিকত্বের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন। বিশেষ করে প্রথম যুগ তথা স্বর্ণযুগের মুসলমানগণ ছিলেন এক্ষেত্রে যারপর নেই সতর্ক ও সাবধানী।

মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

প্রকাশ থাকে যে, মুসলমানরা যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা একারণেও প্রশংসনীয় ছিল যে, তাতে সর্বশ্রেণীর মানুষের বিশ্বাসের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীতে বিশ্বাস, মতামত ও কাজের স্বাধীনতার যে দৃষ্টান্ত মুসলমানরা তাঁদের সত্য দ্বীনের অনুসরণে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছিল তার দৃষ্টান্ত বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে বিরল। তাঁদের প্রদত্ত ঐ স্বাধীনতাকেই সত্যিকার অর্থে মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আখ্যা দেওয়া চলে। এটা শুধু মুখে মুখে সম্মান প্রদর্শন নয় বরং সুদৃঢ় আমলের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন। যে যুগকে ইউরোপীয়রা তাদের চরম উন্নতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির যুগ বলে আখ্যায়িত করে সে যুগেরও পরতে পরতে এমন সব ঘটনা দেখা যায় যেগুলোর মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কোন নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই।

জিয্‌য়া প্রসঙ্গে অন্যান্য জরুরী কথা মরহুম মাওলানা তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে অতি সুন্দরভাবে পেশ করেছেন। (সংকলক)।

[এখান থেকে মাওলানার প্রবন্ধ শুরু হচ্ছে]

নতি স্বীকার করে স্বহস্তে জিয্‌য়া দেওয়ার অর্থ

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে –

حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ .

অর্থাৎ (অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করবে) যে পর্যন্ত না তারা নতি স্বীকার করত: স্বহস্তে জিয্‌য়া দেয় (৯ ঃ ২৯)।"

শুধু আরবী ভাষায় নয় বরং প্রত্যেকটি ভাষায়ই এই বাগধারা চালু আছে যে, কোন বস্তু স্বহস্তে দেওয়ার অর্থ রাজী হয়ে দেওয়া বুঝায়। যেমন বলা হয়, 'তুমি নিজ হাতে উঠিয়ে যা দেবে, আমরা তাই নেব।' এর অর্থ হচ্ছে তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে যা কিছু দেবে তাই আমাদের অনেক। ঠিক আরবী ভাষায় এই বাগধারা বিদ্যমান। অতএব আয়াতে কুরআনীর অর্থ হচ্ছে তারা সন্তুষ্টচিত্তে জিয্‌য়া দিতে সম্মত হবে এমতাবস্থায় যে, তাদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার, যা মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করেছিল, তা আর বাকি থাকবে না।[১]

নাজরানের খ্রীস্টান

আরবী ভাষায় জিয্য়া[২] ঐ খিরাজ (খাজনা)কে বলা হয়, যা ভূসম্পতি থেকে উসুল করা হয়। এক কথায়, মানুষের উপর যে ট্যাক্স আরোপ করা হয় সেটাই জিয্য়া। ইরান এবং রোমেও এ ধরনের ট্যাক্স উসুল করা হত। আর আরবের যে সব এলাকা ওদের (ইরান ও রোম সাম্রাজ্যের) করদরাজ্যে পরিণত হয়েছিল, সেখানকার লোকেরাও এই ট্যাক্স সম্পর্কে অবহিত ছিল। এ কারণেই যখন নাজরানের (ইয়ামনের) খ্রীষ্টানদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে এসে হাযির হল তখন তারা নিজে থেকেই এ প্রস্তাব পেশ করল যে, আমরা মুসলমান হব না, কিন্তু আপনার বশ্যতা স্বীকার করব। অতএব আপনি আমাদের উপর জিয্য়া[২] নির্ধারণ করে দিন। সম্ভবত: জিয্য়া গ্রহণের এটাই হচ্ছে প্রথম ঘটনা, যা ইসলামের ইতিহাসে ঘটেছিল। এরপর বাহরাইনের য়াহূদী ও মাজূসী (অগ্নি উপাসক) দের কাছ থেকেও জিয্য়া গ্রহণ করা হয়।

এখানে জিয্য়া গ্রহণের যে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তার উল্লেখ য়াহূদী ও ঈসায়ীদের প্রসঙ্গে করা হলেও মূলত: এই হুকুম ঐসব অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যারা ইসলামী হুকূমতের অধীনে বসবাস করতে সম্মত হয়। প্রথম যুগ থেকে আরম্ভ করে একেবারে শেষ যুগ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে এই প্রথা জারী ছিল। খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাজূসীদের কাছ থেকে জিয্য়া গ্রহণ করেছিলেন। সাহাবীরা গ্রহণ করেছিলেন সাবীয়া (নক্ষত্রপূজারী) দের কাছ থেকে এবং উমাইয়া ও আব্বাসী খলীফারা গ্রহণ করেছিলেন সিন্ধুর হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছ থেকে।

অবশ্য আরবের অমুসলিমদের কাছ থেকে জিয্য়া গ্রহণের ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দেয়। ইমাম আবূ হানীফা ও কাযী আবূ ইউসূফ (রা)-এর মতে, জিয্য়ার উপর, ওদের সাথে কোন সন্ধি হতে পারে না। কিন্তু এ ব্যাপারে সেই মতই সঠিক বা গ্রহণযোগ্য, যা 'জামহূর' (সংখ্যাগরিষ্ঠ) উলামা গ্রহণ করেছেন। আর তা এই যে, জিয্য়া গ্রহণের ক্ষেত্রে আরব-অনারবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাহাবা কিরাম (রা) ও যে আরবের অমুসলিমদের কাছ থেকে জিয্য়া গ্রহণ করেছেন, তা সর্ববাদি সম্মত।

বাকি রইলো আরবের মুশরিকদের ব্যাপারটি। এ ব্যাপারে তো কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় নি। কেননা সূরা বারাআত (তাওবা) (যাতে জিয্য়ার বর্ণনা রয়েছে) নাযিল হওয়ার পূর্বেই আরবের সমগ্র মুসলিম ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিল, আর হিকমতে ইলাহীর সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, আরবের জাহিলিয়া যুগের শিরক ভবিষ্যতে কখনো সেখানে আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, পবিত্র কুরআনে কেন অমুসলিমদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ জারী করা হলো ? এর উত্তর এই যে, এটাই হচ্ছে ন্যায় ও সত্যের দাবী এবং সে অনুযায়ী মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থায় অমুসলিমদের উপর সেরূপ বোঝা উঠানো বাঞ্ছনীয় নয়, যেরূপ বোঝা উঠানো হবে মুসলমানদের উপর।

ইসলাম মুসলমানদের উপর সামরিক খিদমত ফরয করে দিয়েছিল। অর্থাৎ আজকালকার পরিভাষায় মুসলমানদের উপর সামরিক আইন ছিল বাধ্যতামূলক। এজন্য এটাও জরুরী ছিল যে, যে সব অমুসলিম ইসলামী হুকূমতের অধীনে নাগরিক জীবন যাপন করছে তারাও দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। কিন্তু ইসলাম, অমুসলিমদের উপর যুদ্ধ বাধ্যতামূলক করাটাকে ইসলাম-বিরোধী মনে করল। বরং ইসলাম এ বিষয়টিকে অমুসলিমদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিল এবং বললো, তোমরা যদি আপনা থেকে সন্তুষ্টচিত্তে চাও তাহলে মুসলমানদের মত সামরিক খিদমতে অংশগ্রহণ কর। আর যদি সন্তুষ্টচিত্তে অংশগ্রহণ করতে না চাও তাহলে এর বিনিময়ে বার্ষিক কিছু অর্থ প্রদান কর। এই অর্থই ছিল অমুসলিমদের জন্য জিয্য়া।

আকীদা ও আবেগের স্বাধীনতা

প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল মানুষের আকিদা ও আবেগের স্বাধীনতার এমন একটি স্বীকৃতি, যার কথা ঐ যুগের কোন জাতি কল্পনাও করতে পারবে না। যুদ্ধের জন্য বের হওয়া, নিজের প্রাণ মুঠোর মধ্যে তুলে নেওয়ারই নামান্তর।

মুসলমানরা মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য বাধ্য করতে পারে, কিন্তু অমুসলিমদেরকে এজন্য বাধ্য করার কোন অধিকার তাদের নেই।

সাহাবা কিরামের যুগে অমুসলিমদের উপর যে সমস্ত সরকারী ফরমান জারী করা হয়েছিল তাতে আমরা পরিষ্কার ভাষায় এ কথার উল্লেখ পাই যে, যে (অমুসলিম) সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে তার নিকট থেকে জিয্য়া আদায় করা হবে না, আর যে যোগদান করবে না তার কাছ থেকে আদায় করা হবে। কোন কোন ফরমানে তো এতটুকু সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি স্থায়ীভাবে যোগদান না করে – শুধু এক বছরের জন্য যোগদান করে তাহলে তার ঐ এক বছরের জিয্য়া মাফ করে দেওয়া হবে। তাবারী তার ইতিহাস গ্রন্থে এবং বালাযুরী তাঁর 'ফুতুহুল বুলদানে' এই সব ফরমানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

মুসলমানদের উপর ট্যাক্স

এতক্ষণ প্রথম কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ইসলাম মুসালমানদের উপর কয়েক ধরনের ট্যাক্স ধার্য করেছে। যাকাত প্রদান তাদের জন্য ফরয। সাধারণ সদ্কা-খয়রাতেও তাদেরকে অংশ গ্রহণ করতে হয়। যুদ্ধ লেগে গেলে তার বোঝাও তাদেরকেই বহন করতে হয়। অতএব অমুসলিমদের উপরও এ ধরনেরই বোঝা চাপানোর প্রয়োজন ছিল। কেননা স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে তাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে তো কোন পার্থক্য করা হয় নি। এত্দ সত্ত্বেও ইসলাম অমুসলিমদের উপর সে ধরনের কোন বোঝা চাপায়নি। ইসলাম, মুসলিমদের ন্যায় অমুসলিমদেরকে অধিকার প্রদান করেছে, কিন্তু মুসলিমদের ন্যায় কোন আর্থিক বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দেয় নি। উল্লেখিত যাবতীয় ট্যাক্স, যা মুসলমানদের উপর শুধুমাত্র একটি ট্যাক্স ধার্য করে, আর তা হচ্ছে জিয্য়া। এটাও আবার তাদের ক্ষেত্রে মাফ করে দেওয়া হয়েছে, যারা সামরিক খিদমত আন্জাম দিতে তৈরী থাকে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে অমুসলিমদের উপর ইসলাম সে ধরনের কোন বোঝাই চাপায় নি, অথচ ঠিক মুসলমানদের মতই তারা যাবতীয় অধিকার ভোগ করছে। এক কথায়, যদি একজন অমুসলিম যিম্মী, সামরিক খিদমত আনজাম দিতে অস্বীকার না করে (প্রকৃত পক্ষে এই খিদমত তো তার নিজের দেশকে রক্ষা করার জন্যই নিবেদিত) তাহলে সে ইসলামী রাষ্ট্রে, স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে ঠিক সেই জীবনই যাপন করবে, যা একজন মুসলমান করে থাকে। কিন্তু মুসলমানদের মত তাকে এত রকমারি ট্যাক্স আদায় করতে হবে না।

বিশ্ব-ইতিহাসে এই কর্মপদ্ধতির অনুরূপ কোন কর্মপদ্ধতি কি কোন জাতি কখনো পেশ করতে পেরেছে, না পারবে?

মোসিও লিবানের উক্তি

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে মোসিও লিবানের উক্তি হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে অমুসলিম যিম্মীদের সব ধরনেরই অধিকার ছিল, যা একটি জাতি লাভ করতে পারে। শুধুমাত্র একটি অধিকার ছিল না। আর তা হলো, কোন অমুসলিম একটি ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হতে পারত না। (সংকলক)

টীকা ঃ

১। ইমাম শাফী' (রা) 'কিতাবুল উম্ম'-এ পরিস্কার বলেছেন –

سمعت عدداً من اهل العلم يقولون الصغار ان يجرى عليهم حكم الاسلام .

আমি বেশ কয়েকজন বিজ্ঞজনের কাছে শুনেছি যে, وَهُمْ صَاغِرُوْنَ (তারা নতি স্বীকারকারী) -এর অর্থ হচ্ছে, তাদের উপর ইসলামী হুকূমতের আইন জারী হয়ে যাবে। অর্থাৎ ওরা ইসলামী হুকূমতের কানূনের সামনে নত হয়ে যাবে।

২। খোদ 'জিয্য়া' শব্দটি ইরানীদেরই তৈরী। ফারসী শব্দ 'গিয্ইয়াত' -এর আরবী রূপ হচ্ছে জিয্য়া। এ সম্পর্কে মরহুম মাওলানা শিবলী নু'মানী যা কিছু লিখেছেন তা বর্তমান কালের অত্যন্ত মূল্যবান ইসলামী পর্যালোচনাসমূহের অন্যতম।

মক্কা বিজয়–১

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا .

"নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।" (৪৮:১)

সুস্পষ্ট বিজয়

হুদায়বিয়া সন্ধি এই দিক দিয়েও একটি সুস্পষ্ট বিজয় ছিল যে, এর মাধ্যমে মুসলিম ও মুশরিকদের পরস্পর মেলামেশার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ্‌র কালাম শুনার এবং তার পবিত্র শিক্ষার চিত্তাকর্ষক আমালী নমুনা অতি নিকট থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিল। আর ঐ নমুনা বলতে যা বুঝায় তা হলো, স্বজাতির উন্নতি সাধন, শুভেচ্ছা কামনা এবং দুনিয়া-আখিরাতের সাফল্য ও শান্তি। এরপর কী করে এটা সম্ভব হতে পারে যে, প্রতিবেশীর উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না। এক কথায় বলতে গেলে, হুদায়বিয়া সন্ধিই ছিল সেই বস্তু, যা পরবর্তীকালে মক্কা বিজয়ের রাস্তা সরল ও সহজ করে দিয়েছিল।

খোদ হুদায়বিয়া সন্ধিও ছিল একটি স্পষ্ট বিজয়। কেননা ধর্মীয় ব্যাপারে, জুলুম, অত্যাচার, জবরদস্তি, বাড়াবাড়ী, খুনাখুনি এবং রক্তারক্তির সূচনা তো মক্কার কুরায়শরাই করেছিল। মানুষের ই'তিকাদ-বিশ্বাস এবং ইচ্ছা ও আকাংখার যে স্বাধীনতা রয়েছে, তা তারা স্বীকার করত না। তারা চাইত আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে শক্তির জোরে সরল পথ থেকে হটিয়ে দিতে। বদর, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধ শুধুমাত্র এ কারণে সংঘটিত হয়েছিল যে, মক্কার মুশরিকদের দৃষ্টিতে, সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করা এবং তাতে অবিচল থাকার কোন অধিকার মুসলিমদের নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর অনুসারীরা তেরো বছর পর্যন্ত মুশরিকদের হরেক রকমের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেন। শেষ পর্যন্ত মক্কায় জীবিত থাকা যখন তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল তখন তাঁরা বাড়ীঘর ও ধন সম্পদ ছেড়ে উত্তর দিকের এমন একটি জনবসতিতে এসে আশ্রয় নেয়, যা ছিল মক্কা থেকে আড়াইশ মাইল দূরে। বিরুদ্ধ পক্ষ সেখানেও তাঁদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয় নি। তাদের তীর, তাদের তরবারি এবং তাদের বর্শাসমূহ মুসলমানদের উপর অঝোরে বর্ষিত হতে থাকে। হিজরতের পরও ছয় বছর পর্যন্ত মুসলমানগণ এখানে সেখানে দারুণ হয়রানির মধ্যে দিন কাটায়। এরপর এই হুদায়বিয়ায়ই প্রথম বারের মত কুরায়শরা বাধ্য হলো অন্ততঃপক্ষে দশ বছরের জন্য মুসলমানদের সাথে একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে। উপরন্তু তারা এই প্রথম বারের মত তাদের অবস্থা (গোয়ার্তুমী) থেকে সরে দাঁড়ালো। ফলে মুসলমানরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাঁদের কাছে সত্যের দাওয়াত পেশ করার সুযোগ পেলেন। এক্ষেত্রে চিন্তাভাবনার মৌলিক বিষয় এটা ছিল না যে, হুদায়বিয়া সন্ধি যে সব শর্তের উপর সম্পাদিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কোন কোনটির শব্দাবলীর বাহ্যিক দিক কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে কি ধরনের আপত্তিকর ছিল—বরং মৌলিক বিষয় এই ছিল যে, আকীদা-বিশ্বাস ও ইচ্ছা-আকাংখার স্বাধীনতার ব্যাপারে জবরদস্তি করার অবস্থানে কারা ছিল? এবং কেন তারা এই অবস্থান থেকে সাময়িকভাবে হলেও হটে গেল? এই দিক দিয়েও হুদায়বিয়া সন্ধি ছিল নিঃসন্দেহে একটি সুস্পষ্ট বিজয়।

কুরায়শের অঙ্গীকার ভঙ্গ

প্রকৃতপক্ষে কুরায়শরা এমন একটি চক্করে পড়ে গিয়েছিল, যেখান থেকে বের হওয়ার কোন পথ তারা খুঁজে পাচ্ছিলো না। তাদের জীবিকা নির্ভর করত ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর আর ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন শান্তি ও নিরাপত্তা। একের পর এক যুদ্ধ তাদের শিরদাড়া ভেংগে দিয়েছিল। অপরদিকে কুরায়শদের এত বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও ইসলামের আওতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। মদীনা মুনাওওরায় ইসলামের অনন্য সাংগঠনিক তৎপরতা এমন একদৃশ্যের অবতারণা করেছিল, যা দেখে যে কারো পক্ষে এটা অনুমান করে নেওয়া কষ্টকর ছিল না যে, সমগ্র আরবে ইসলামের একচেটিয়া প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে আর কয়েক বছর নয়, বরং মাত্র কয়েক মাসের প্রয়োজন হতে পারে। মিথ্যা দম্ভ ও মিথ্যা অহমিকার কারণে কুরায়শদের মধ্যে সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়ার মানসিক যোগ্যতাও আর বাকি ছিল না। তারা সরাসরি মুসলমানদের মুকাবালা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখত বটে, তবে যখন তারা এমন সুযোগ পেত যে, লুকিয়ে ছাপিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা ও শত্রুতার ঝাল মেটানো যাবে তখন তারা সে সুযোগ কখনো হাতছাড়া করত না।

হুদায়বিয়া সন্ধির একটি শর্ত এও ছিল যে, আরবের গোত্রগুলো এই দুই পক্ষের (মুসলিম ও মুশরিক পক্ষের) মধ্যে থেকে যে কোন এক পক্ষের সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। আর এই শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার সাথে সাথে বনী খুযা'আ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে এবং বনূ বকর কুরায়শের সাথে মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই দুই গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে শত্রুতা চলে আসছিলো। হুদায়বিয়ার সন্ধি ঐ দুই গোত্রকে ঠিক সেভাবে বেষ্টন করেছিল যেমন বেষ্টন করেছিল মক্কার কুরায়শ এবং মুসলমানদেরকে। হুদায়বিয়া চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর আঠারো উনিশ মাস অতিবাহিত হয়েছে এমন সময় অর্থাৎ রজব কিংবা শাবান, হিঃ ৮ সনে (মুতাবিক অক্টোবর, ইং ৬২৯ সনের শেষ পক্ষ থেকে ডিসেম্বর, ইং ৬২৯ শেষ পক্ষ পর্যন্ত সময়কাল) বনূ বকরের নওফল বিন মু'আভিয়া আপন গোত্রের অনেক লোককে সাথে নিয়ে বনূ খুযা'আর উপর রাতের বেলা আকস্মিক হামলা চালায়। তখন বনূ খুযা'আ বাধ্য হয়ে 'হারাম' শরীফের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে। কেননা সেখানে কেউ কাউকে প্রহার বা হত্যা করতে পারত না। এতে হামলাকারীরা আর সম্মুখে অগ্রসর হয় নি। কিন্তু নওফল তখন বলে, "হারাম শরীফের সীমানায় ঢুকে যখন চুরি করতে তোমাদের বাধে না, তখন তোমাদেরকে হত্যা করতে কেন বাধা দিচ্ছ? এ ধরনের সুযোগ আমরা হাতছাড়া করতে পারি না।" –এই বলে সে খুযা'য়ীদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখল। শেষ পর্যন্ত খুযায়ীরা মক্কা মুকাররমায় পৌছে বুদাল বিন ওয়ারাকা এবং তার মাওলা রাফি'য়ের ঘরে আশ্রয় নেয়।

কুরায়শের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র ছাড়া বনূ বকর কখনো এরূপ আক্রমণ পরিচালনা করতে পারত না। তাবারীর বর্ণনা মতে, ইকরামা বিন আবূ জাহল, সাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং সুহায়ল বিন আমরও ছদ্মবেশে বনূ বকরের সাথে বনূ খুযা'আর উপর আক্রমণ চালিয়েছিল।[১]

কুরায়শের জন্য তিনটি পন্থা

বনূ খুযাআ গোত্রের আমর বিন সালিম পচিশজন উষ্ট্রারোহীসহ মদীনা মুনাওওরায় আসে এবং উপরোক্ত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে ফরিয়াদ জানায়। এরপর বুদায়ল বিন ওয়ারাকাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হন। এটা তো পরিষ্কার অঙ্গীকার ভঙ্গ ছাড়া আর কিছু ছিল না এবং এর জন্য প্রধানত: দায়ী ছিল কুরায়শ। হয় কুরায়শের ইংগিতে বনূ বকরের লোকেরা এই দুষ্কর্ম করেছিল, নয়ত এটা বনূ কবরেরই কোন সর্দারের চাল ছিল। যাহোক রাসূলুল্লাহ (সা) কুরায়শের কাছে একজন দূত পাঠান এবং তাদের সামনে তিনটি পন্থা পেশ করে বলেন, তোমরা এ থেকে যে কোন একটি বেছে নাও।

১। নিহতদের রক্তমূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করো।

২। বনূ বকরের মিত্রতা থেকে সরে দাঁড়াও।

৩। পরিষ্কার ঘোষণা কর যে, হুদায়বিয়া চুক্তি ভেঙ্গে গেছে।

তখন করতবা বিন উমর কুরায়শের পক্ষ থেকে বলে, তৃতীয় পন্থাই আমরা বেছে নিলাম।[২] অর্থাৎ হুদায়বিয়া চুক্তি ভেঙ্গে গেছে।

উপস্থিত পরিস্থিতি

নিজেদের সীমাহীন অহমিকা এবং ভিত্তিহীন অহংকার ও দাম্ভিকতার ফাঁদে পড়ে এর ফলাফল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার পর কুরায়শরা দারুণ দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিভাবে এই পরিস্থিতির মুকাবালা করা হবে তা তারা ঠাহর করতে পারছিল না। খন্দক যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নবভী দূরদর্শিতা দ্বারা কুরায়শের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা নিরূপণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন –

الآن نغزوهم ولا يغزوننا .

"কুরায়শরা আগামীতে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস পাবে না, বরং আমরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।"

এই পবিত্র ঘোষণার সত্যতা তখনকার পরিবেশ শতমুখে প্রকাশ করছিল। হুদায়বিয়া সন্ধি, কুরায়শের অসহায়ত্ব সমগ্র আরবে প্রকাশ করে দিয়েছিল। বনু কুরায়যা–যারা মদীনা মুনাওওয়ারায় কুরায়শদের ডান হাতের কাজ দিতে পারত – তাদের বিষয়য়টিরও একটি চূড়ান্ত ফয়সালা ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছিল। আর শুধু বনূ কুরায়যা কেন, ইতিমধ্যে খায়বারের উপরও মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল – এমনকি হিজাযে য়াহূদীদের ক্ষমতার উপর শেষ এবং মোক্ষম আঘাতও লেগে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে মূতা যুদ্ধে মাত্র তিন হাজার মুসলিম যোদ্ধার একটি ক্ষুদ্র দল মদীনা থেকে শত শত মাইল উত্তরে তাঁদের এক লক্ষ প্রতিপক্ষকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেছিল। এ সব ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরায়শের দিশেহারা হওয়াটা মোটেই অকারণ ছিল না।

অসন্তোষ নিরসনের চেষ্টা

শেষ পর্যন্ত হুদায়বিয়া চুক্তি নবায়নের জন্য কুরায়শরা আবূ সুফ্য়ানকে মদীনা মুনাওওরায় প্রেরণ করে। কেননা এটাই ছিল তাদের পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা। আবূ সুফ্য়ান মদীনায় পৌছে সর্বপ্রথম আপন কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) এর ঘরে উঠে। ঘরে প্রবেশ করেই সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পবিত্র বিছানার উপর বসতে যাচ্ছিলো; এমন সময় হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বিছানাটি গুটিয়ে নিতে নিতে বলেন, আপনি হচ্ছেন মুশরিক। অতএব এটা বাঞ্ছনীয় নয় যে, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিছানার উপর বসে পড়বেন। যাহোক আবূ সুফ্য়ান রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে তার বক্তব্য পেশ করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তার কথার কোন জবাব দেন নি। অতঃপর আবূ সুফ্য়ান ক্রমান্বয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ফারূক, হযরত আলী ও হযরত ফাতিমা (রা) এর কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু তাদের কেউই এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজী হন নি। শেষ পর্যন্ত আবূ সুফ্য়ান হযরত হাসানকে– যার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর– এব্যাপারে মধ্যস্থ বানাতে চায়। শেষ পর্যন্ত কিছুতেই কিছু হচ্ছে না দেখে সে মসজিদে নবভীতে গিয়ে এই ঘোষণা দেয় যে, আমি হুদায়বিয়া চুক্তি নবায়ন করলাম। এরপর সে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং সেখানে পৌছে মদীনায় যা যা করেছে তা বিস্তারিতভাবে সকলের কাছে বর্ণনা করে। এ থেকে সকলেই বুঝে নেয় যে, আবূ সুফ্য়ান যা করেছে, তা কোন চুক্তির নবায়ন নয় যে, এর উপর আশ্বস্ত হয়ে বসে থাকা যেতে পারে, আবার এটা যুদ্ধেরও ঘোষণা নয় যে, এর প্রেক্ষিতে পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করা যেতে পারে।

হাতিব (রা) এর ঘটনা

ইতিমধ্যে ইসলামী বাহিনী তৈরী হয়ে ১০ রমযান, হিঃ ৮ সনে (মুতাবিক ১ ফেব্রুয়ারী, ইং ৬৩০ সনে) মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়। কিন্তু এ খবর যাতে একেবারে অন্তিম সময় পর্যন্ত মক্কাবাসীদের কাছে না পৌঁছে সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পূর্ণ ব্যাপারটি গোপন রাখার চেষ্টা করছিলেন। এটা করার মধ্যে অন্যান্য উপকার ছাড়াও একটি বিরাট উপকার এই ছিল যে, কুরায়শরা হঠাৎ বিরাট এক মুসলিম বাহিনী দেখে যুদ্ধের কথা চিন্তা না করে অস্ত্র সংবরণ করতে বাধ্য হবে এবং এর ফলে হারাম শরীফ যে কোন ধরনের সংঘর্ষ বা রক্তারক্তির কলুষতা থেকে মুক্ত থাকবে।

কিন্তু হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রা) একটি চিঠি লিখে অতি সংগোপনে একটি স্ত্রীলোকের মাধ্যমে তা কুরায়শের কাছে পাঠিয়ে দেন। উক্ত চিঠিতে মুসলমানদের সামরিক প্রস্তুতির কথা ফাঁস করে দেওয়া হয়েছিল। বুখারী শরীফে ঘটনাটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা হলো, "উবায়দুল্লাহ্ ইবন আবূ রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আলী (রা) কে বলতে শুনেছি, নবী (সা) মক্কা বিজয়ের পূর্বে একদিন আমাকে এবং যুবায়র ও মিকদাদকে রওযায়ে খাখ নামক স্থানে যাবার নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা সেখানে গিয়ে দেখতে পাবে, উটের পিঠে হাওদায় বসে এক নারী (মক্কার দিকে) যাচ্ছে। তার কাছে একখানা পত্র আছে। ঐ পত্রখানা তোমরা তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে। আলী (রা) বলেন ঃ আমরা রওয়ানা হলাম, আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে দ্রুত ধাবিত হলো। আমরা রওযায়ে খাখ পৌঁছে গেলাম এবং (উটের পিঠে) হাওদায় বসা এক নারীকে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম ঃ তোমার কাছে যে পত্র আছে তা আমাদেরকে দিয়ে দাও। সে বললো, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম ঃ পত্র বের কর, অন্যথায় আমরা তোমার কাপড় খুলে তালাশ করবো। আলী (রা) বলেন ঃ তখন সে তার চুলের ঝুটির মধ্য থেকে পত্রখানা বের করে আমাদের দিল। আমরা তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে আসলাম। সবাই তার কাজে মর্মাহত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর ঈমান রাখি। আমি মুর্তাদ হইনি। আমার স্ত্রী ও সন্তানরা মক্কা মুকাররমায় রয়েছে। আমি সেখানকার লোক নই, বাইরের লোক। আমি কেবল কুরায়শের আশ্রিত। আমার পরিজনদের হিফাযতের উদ্দেশ্যে আমি কুরায়শের উপকার করতে চেয়েছিলাম। হুজুর (সা) এই অজুহাত শুনা মাত্র হাতিব (রা) কে ক্ষমা করে দেন।

হাতিব (রা) ছিলেন নিবেদিত ও মর্যাদাবান সাহাবী। বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। এরপর তাঁকে একটি দাওয়াতনামা দিয়ে মিসরের মুকাওকাসের কাছে পাঠান হয়েছিল। হযরত উমর (রা) নিবেদন করেন, যদি নির্দেশ দেন তবে আমি হাতিবের গর্দান উড়িয়ে দেই। হুজুর (সা) বললেন, উমর তুমি জান, বদর যোদ্ধাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন – তোমরা যেমন ইচ্ছা আমল কর। তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। একথা শুনে হযরত উমর (রা) এর রাগ করুণায় পর্যবসিত হল এবং বললেন – আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন।

আব্বাস (রা) ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর অপর কয়েকজন নিকটাত্মীয়

এবার হযরত আব্বাস এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, চূড়ান্ত ফয়সালার মুহূর্ত একেবারে ঘনিয়ে এসেছে। অতএব তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে হাযির হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আবূ সুফ্য়ান বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব এবং আবদুল্লাহ বিন আবী উমাইয়া মক্কা মুকাররমা থেকে বের হয়ে যান এবং আবৃওয়া গিয়ে ইসলামী বাহিনীর সাথে মিলিত হন।[৩] আবূ সুফ্য়ান ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) এর চাচাত ভাই। তিনিও হযরত হালিমা সা'দিয়ার দুধ পান করেছিলেন। এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) এর দুধ ভাইও। আবদুল্লাহ বিন আবী উমাইয়া ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) এর সৎভাই এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর ফুফু আতিকার সন্তান। হযরত উম্মুল মুমিনীনের সুপারিশে এ দুজনকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আবূ সুফ্য়ান তাঁর

পূর্ববর্তী আচরণের জন্য এতই লজ্জিত ছিলেন যে, তিনি বলতেন, যদি মার্জনা না পাই তাহলে সন্তানসন্ততি নিয়ে আরবের মরুভূমিতে চলে যাব এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় সেখানেই প্রাণ বিসর্জন করবো। মার্জনা প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে তাঁর ভালবাসা এতই প্রগাঢ় ছিল যে, তাঁর দরবারে না গিয়ে তিনি শান্তি পেতেন না, তবে অতীত আচরণের উপর অত্যাধিক লজ্জাবোধ করার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) এর দিকে চোখ তুলে কখনো তাকাতেন না, বরং নত মস্তকে তাঁর দরবারে বসে থাকতেন। খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি আশা করি যে, আবূ সুফ্য়ান (রা) আমার চচা হামাযা (রা) এর স্থলাভিষিক্ত হবেন। হুনায়ন যুদ্ধের সূচনাকালে ইসলামী বাহিনীর মধ্যে কিছু অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। তখন আবু সুফ্য়ান (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর ঘোড়ার একেবারে সাথে সাথে ছিলেন। তিনি ছিলেন সেই মুষ্টিমেয় সাহাবীদের অন্যতম, যারা প্রথম দিকে ইসলামী বাহিনীর মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেওয়ার সময়, অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

হযরত আব্বাস (রা) তাঁর পরিবার-পরিজনসহ মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং যুল হুলায়ফা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে মিলিত হন। তখন তাঁর সংগে যে সমস্ত জিনিসপত্র ছিল তা তিনি মদীনা মুনাওওরায় পাঠিয়ে দেন এবং নিজে ইসলামী বাহিনীর সাথে মক্কা অভিমুখে পুনরায় রওয়ানা হন।[৪] এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আব্বাস (রা) জাহফায়, যা রাবিগের নিকটে অবস্থিত, রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে মিলিত হন।

আবূ সুফ্য়ান বিন হারবের ইসলাম গ্রহণ

ইসলামী বাহিনী যখন মাররায যাহরানে[৫] পৌঁছল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশ মুতাবিক বাহিনীর প্রত্যেকটি প্লাটুন পৃথক পৃথক জায়গায় আগুন প্রজ্বলিত করে, যাতে দূর থেকে প্রতিপক্ষের কেউ দেখলে যেন মনে করে, এখানে যে বিরাট বাহিনী সমবেত হয়েছে তাদের সাথে যুদ্ধ করে পেরে উঠা যাবে না। অতএব, যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করাই বাঞ্ছনীয়। হযরত আব্বাস (রা) অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন এই ভেবে যে, যদি কুরায়শরা এই বাহিনীর মুকাবালা করে তাহলে তারা চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবে। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে বেশ কিছুটা অগ্রে চলে যান এই আশায় যে, যদি কাউকে পাওয়া যায় তাহলে তার মাধ্যমে কুরায়শের কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠাবেন, "তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং যে কোন শর্তে সন্ধি করে নাও।"

মক্কা মুকাররমা থেকে হাকীম ইবন হাযাম (হযরত খাদীজার ভাই পো), আবূ সুফ্য়ান বিন হারব এবং বুদায়ল ওয়ারাকা ইসলামী বাহিনীকে যাচাই করার জন্য বের হয়। তারা যখন আরাকে[৬] পৌছে তখন বিরাট জায়গা জুড়ে ইসলামী বাহিনীর প্রজ্বলিত আগুন দেখে যারপর নাই ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বুদায়ল বলল, এটি বনী খুযা'আ এর আগুন। আবূ সুফ্য়ান বলল, বনূ খুযা'আর লোক তো সামান্য; এটা ওদের আগুন হতে পারে না। ইতিমধ্যে হযরত আব্বাস (রা) সেখানে এসে পৌছেন। তিনি আবূ সুফ্য়ানকে তার আওয়াজ দ্বারা ঠিকই চিনতে পারেন। তিনি তার কাছে গিয়ে বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে এসেছেন। অতএব এবার কুরায়শের পরিত্রাণ নেই। আবূ সুফ্য়ান জিজ্ঞাসা করল, এখন কি করা যায় ? হযরত আব্বাস (রা) উত্তর দিলেন, আমার পেছনে খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে যাও। রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে পৌছে তাঁর কাছে নিরাপত্তা চাওয়া ছাড়া এখন আর তোমাদের কোন গতি নেই।

শেষ পর্যন্ত হাকীম বিন হাযাম এবং বুদায়ল মক্কায় ফিরে গেল এবং আবূ সুফ্য়ানকে হযরত আব্বাস তাঁর পেছনে বসিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে নিয়ে চললেন। যখন তাঁরা কোন আগুনের কাছে পৌছতেন তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করত, কে? এরপর যখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর খচ্চর এবং হযরত আব্বাস (রা) কে দেখতেন তখন চুপ হয়ে যেতেন। যখন তাঁরা হযরত উমর (রা) এর আগুনের কাছে পৌছলেন তখন স্বয়ং উমর (রা) তাঁদেরকে দেখার জন্য বের হলেন এবং যখন তিনি আবু সুফ্য়ানকে দেখতে পেলেন তখন বলে উঠলেন, এতো হচ্ছে আল্লাহ্‌র দুশমন আবূ সুফ্য়ান। এরপর তিনি তাকে (আবূ সুফ্য়ানকে) সম্বোধন করে বললেন, সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র, কোনরূপ শর্ত বা অঙ্গীকার ছাড়াই আজ তোমাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি। এরপর তিনি দ্রুতবেগে রাসূলুল্লাহ (সা) এর দিকে ছুটে চললেন, যাতে (আবূ সুফ্য়ানকে হত্যার ব্যাপারে) তাঁর অনুমতি নিতে পারেন। কিন্তু হযরত আব্বাস (রা)

খচ্চরকে দ্রুতবেগে ছুটিয়ে নিয়ে হযরত উমর (রা) এর আগেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে গিয়ে পৌঁছেন। হযরত উমর (রা)ও সাথে সাথে পৌঁছে যান এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে আবূ সুফ্য়ানকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত আব্বাস তখন বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি আবু সুফ্য়ানকে আশ্রয় দিয়েছি। হযরত উমর (রা) আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই হযরত আব্বাস (রা) বলে উঠলেন, যদি সে (আবূ সুফ্য়ান) বনী আদী বিন কা'ব গোত্রের (হযরত উমরের গোত্র) হত তাহলে তুমি তাকে এরূপ কথা বলতে না। হযরত উমর (রা) উত্তরে বলেন, আব্বাস, আপনি এটা কি বললেন ? আল্লাহ্র কসম, আমার কাছে আপনার ইসলাম আপন পিতা খাত্তাবের ইসলামের চাইতেও অধিক প্রিয়। কেননা আমি জানি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আপনার ইসলাম খাত্তাবের ইসলামের চাইতে অধিক প্রিয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলেন, আবূ সুফ্য়ানকে এখন নিয়ে যাও। ভোর বেলা আমার কাছে নিয়ে আসবে।

ভোর বেলা হযরত আব্বাস (রা) আবূ সুফ্য়ানকে নিয়ে হাযির হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আবু সুফ্য়ান ! আক্ষেপের কথা, এখনো কি তোমার কাছে এ সত্য ধরা পড়েনি যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবূদ (উপাস্য) নেই।

আবূ সুফ্য়ান ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন। আপনি কতই না সহনশীল ! কতইনা মহানুভব! আপনি আত্মীয়তার প্রতি কতই না সতর্ক দৃষ্টি রাখেন! এখন তো আমারও এই ধারণা যে, যদি অন্য কোন মাবূদ থাকত তাহলে অবশ্যই আমাদের সাহায্য করত।

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ হে আবূ সুফ্য়ান, খুবই আক্ষেপের কথা, তুমি এই সত্য কি এখনো হৃদয়ঙ্গম করতে পার নি যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল ?

আবূ সুফ্য়ান ঃ আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হোন। আপনি কতই না সহনশীল ! কতই না মহানুভব! আপনি আত্মীয়তার প্রতি কতই না সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু এ ব্যাপারে এখনো আমার মনে সন্দেহ রয়েছে। হযরত আব্বাস তখন বলেন, আবূ সুফ্য়ান, ইসলাম গ্রহণ করে ফেল। অন্যথায় এখনই লোকেরা তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবে।

একথা শুনতেই আবু সুফ্য়ান ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে। এরপর হযরত আব্বাস নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আবূ সুফ্য়ান গর্ব করাকে পসন্দ করে। তাই আপনি তার জন্য গর্ব করার মত একটা কিছুর ব্যবস্থা করে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলেন, যে আবূ সুফ্য়ানের ঘরে প্রবেশ করবে তার জন্য নিরাপত্তা দেওয়া হলো, যে আপন ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে তার জন্য নিরাপত্তা দেওয়া হলো, আর যে মসজিদে হারামে চলে যাবে তার জন্যও নিরাপত্তা দেয়া হলো।

টীকা ঃ

১। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ৪৬৬।

২। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ৪৬৭। মরহুম মাওলানা শিবলী লিখেছেন, যারকানী এই ঘটনাটি 'মাগাযী ইবনে আয়িদ' থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

৩। ইবনে হাযাম প্রণীত 'জাওয়ামিউস সীরাতে' আছে, তারা জাহফার নিকটবর্তী 'নায়কল ইকাব' নামক স্থানে ইসলামী বাহিনীর সাথে মিলিত হন।

৪। জাওয়ামিউস সীরাহ ঃ পৃষ্ঠা - ২২৭।

৫। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধুনা এই স্থানটি 'ওয়াদিয়ে ফাতিমা' নামে পরিচিত 'মা'জামুল বুলদান' এবং 'ওয়াফাউল ওয়াফা' গ্রন্থে এই জায়গার নাম 'মাররান' লেখা হয়েছে।

৬। এটা হচ্ছে মক্কা মুকাররমা এবং ওয়াদিয়ে ফাতিমার মধ্যবর্তী উপত্যকা। এমনও বলা হয় যে, এটা ছিল হুযায়ল গোত্রের একটি টিলা।

মক্কা বিজয়–২

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا .

"নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।" – (৪৮:১)

মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ

ইসলামী বাহিনী ২০ রমযান হিঃ ৮ সন (মুতাবিক ১১ ফেব্রুয়ারী, ইং ৬২০ সন) মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করে। ঐ দিন ছিল শুক্রবার। রাসূলুল্লাহ (সা) বলে রেখেছিলেন, ইসলামী বাহিনী যখন লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন আবূ সুফ্য়ানকে যেন একটি উপযুক্ত জায়গায় দাঁড় করিয়ে সে দৃশ্য দেখানো হয়। এর উদ্দেশ্য ইসলামী বাহিনীর জাঁকজমকের প্রদর্শনী ছিল না, বরং এর উদ্দেশ্য ছিল অন্য। আর তা হলো, আবূসুফ্য়ানের মনে যেন এ বিশ্বাস জন্মে যে, যে শক্তি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এখানে এসেছেন, তার মুকাবালা করতে যাওয়া তার জন্য মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যা হোক, আবূ সুফ্য়ানকে একটি উপযুক্ত জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। যে বাহিনীই আপন বিশেষ পতাকা বহন করে সে দিক দিয়ে অতিবাহিত হত তখন আবূ সুফ্য়ান হযরত আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাস করত, এরা কারা ? আব্বাস (রা) তখন তার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেন। আবূ সুফ্য়ান (রা) তখন পর্যন্ত একেবারে সদ্য নওমুসলিম। তাই তার দৃষ্টি তখনো শুধুমাত্র বৈষয়িক শক্তির উপরই নিবদ্ধ ছিল। আর সে ইসলামী বাহিনীর শক্তি ও প্রতিপত্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েই তাদের সম্পর্কে হযরত আব্বাসকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করত। হযরত আব্বাস তার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতেন, এগুলো নুবুওয়াতের ক্ষমতা ছাড়া কিছু নয়। আনসারদের অধিনায়কত্বের পতাকা সা'দ বিন উবাদা (রা) এর হাতে ছিল। তিনি আবূ সুফ্য়ানকে দেখা মাত্র উচ্চস্বরে বলে উঠেন,

اَلْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ اَلْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ .

"আজ তুমুল যুদ্ধের দিন। আজ কা'বাকে হালাল করা হবে।"

এটা এক ধরনের ব্যঙ্গ ছাড়া কিছু নয়, যা প্রেরণাদীপ্ত একজন 'মুজাহিদে হক' এর মুখ দিয়ে ঐ মুহূর্তে বের হয়েছিল, যখন তিনি তাঁর সামনে একজন পুরাতন অতি কট্টর শত্রুকে দেখে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন নি। সম্ভবত: এটাও হতে পারে যে, হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা) তখন পর্যন্ত আবূ সুফ্য়ানের ইসলাম গ্রহণের কথা জানতেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বিষয়টি জানতে পারেন তখন বলেন,

كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة

"সা'দ ভুল বলেছে। এটা এমন দিন, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা কা'বার ইয্যত ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করবেন এবং কা'বাকে গেলাফ পরানো হবে"।[১]

এটাও উল্লেখিত আছে যে, এরপর সা'দ (রা) এর কাছ থেকে পতাকা নিয়ে তা তাঁর পুত্র কায়স (রা) এর কাছে সোপর্দ করা হয়।

মোটকথা, আবূ সুফ্য়ান এই দৃশ্য দেখামাত্র দ্রুতবেগে মক্কা মুকাররমায় গিয়ে পৌছেন এবং কুরায়শকে ডেকে বলেন, মুহাম্মদ (সা) এসে পড়ছেন এবং তাঁর সাথে মুকাবালা করার শক্তি কারো নেই। যে আমার ঘরে এসে প্রবেশ করবে তার জন্য নিরাপত্তা থাকবে। আবূ সুফ্য়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা একথা শুনে এত রাগান্বিত হয় যে, সংগে সংগে সে তার স্বামীর গোঁফ টেনে ধরে এবং চীৎকার দিয়ে বলে, হে বনী কিনানা, এই হতভাগাকে হত্যা করো। তার চিৎকার শুনে বহু লোক সেখানে জড় হয়ে যায়। আবূ সুফ্য়ান তখন বলে, এতে কোন লাভ হবে না। মুহাম্মদের মুকাবালা কেউই করতে পারবে না। যে আমার ঘরে এসে পড়বে তার জন্য নিরাপত্তা থাকবে। লোকেরা তখন বললো, তোমার ঘরে সবার জায়গা কি করে হবে? আবূ সুফ্য়ান উত্তর দিলো, যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সেও নিরাপত্তা পাবে এবং যে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে সেও নিরাপত্তা পাবে।

মক্কা মুকররমায় প্রবেশ

রাসূলুল্লাহ (সা) কুদার দিক থেকে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন। কুদা হচ্ছে সেই টিলা, যা শহরের উচ্চভূমি তথা উত্তর দিকে অবস্থিত। এদিকেই জান্নাতে মু'আল্লার অবস্থান, যা হচ্ছে মক্কা মুকাররমার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সমাধি ভূমি। সেখানে তার জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়। যুবায়র বিন আওয়াম (রা)কে নির্দেশ দেওয়া হয়, তিনি যেন ঐ রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হন, যা ওয়াদিয়ে ফাতিমা তথা মক্কার পশ্চিম দিক থেকে এসেছে। এই রাস্তা জিদ্দার রাস্তার সাথে মিলিত হয়েছে। এরপর উত্তর ও পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে মক্কা শহরে প্রবেশ করেছে। সা'দ বিন উবাদা (রা) এর বাহিনী এই রাস্তা ধরে কুফার দিকে মোড় নিয়ে তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) এর অবস্থানস্থলে এসে পৌছেছিল। খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যেন তিনি মিসফালা অর্থাৎ মক্কা মুকাররমার নিম্নভূমি তথা দক্ষিণ দিক দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। মক্কা মুকাররমা এবং তার পারিপার্শ্বিক মানচিত্র দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলিম বাহিনী এভাবে শহরে আগত সবকয়টি রাস্তাই কবজা করে নেয়, যাতে করে রক্তারক্তির কোন সম্ভাবনা আর না থাকে। হাকীম বিন হাযামের গৃহকেও নিরাপত্তা স্থান ঘোষণা করা হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) এভাবে মক্কা শহরে প্রবেশ করেন যে, তিনি উটের উপর সওয়ার ছিলেন। তার পিছনে বসা ছিলেন যায়দ বিন হারিছার পুত্র উসামা (রা)। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বিনীত মস্তকে সূরা ফাত্হ্ তিলাওয়াত করছিলেন।

বনী ইসরাঈলের জন্য শহরে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করার হুকুম, পবিত্র কুরআনে দু'বার উল্লেখিত হয়েছে। যেমন–

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ·

"স্মরণ কর, যখন আমি বললাম, 'এই জনপদে (আরীহা) প্রবেশ কর, যথা ও যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং বলো, 'ক্ষমা চাই'। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করবো।" – (২:৫৮)

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓئٰتِكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

"স্মরণ কর, তোমাদেরকে বলা হয়েছিল, এই জনপদে বাস কর ও যথা ইচ্ছা আহার কর এবং বলো, – 'ক্ষমা চাই' এবং নতশিরে প্রবেশ কর; আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবো। আমি সৎকর্ম পরায়ণদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করবো।" – (৭:১৬১)

حطة (হিত্তাতুন) -এর অর্থ , হে প্রভু, আমাদেরকে যাবতীয় গুনাহ্ ও অপরাধ থেকে পবিত্র করো। বনী ইসরাঈলকে ফিলিস্তীনের ঐ শহরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাকে ইয়ারিহূ অথবা আরীহা বলা হত। এ শহরটি জর্দানের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। কিন্তু য়াহূদীরা ঐ নির্দেশের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করে। আজো তাদের মধ্যে আল্লাহ্র নি'মাত উপেক্ষা করার সেই ভঙ্গিই পরিদৃষ্ট হয়। আর তারই ফলশ্রুতিতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। আল্লাহর ঐ নির্দেশের একটি পরিপূর্ণ আমালী (বাস্তব) নমুনা রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন জনসমক্ষে পেশ করেছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের সঠিক ও পরিপূর্ণ নমুনা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল ছাড়া আর কার মধ্যেই বা পাওয়া যেতে পারে, যার উত্তম আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বমানবতার সামনে এক ইলাহী দর্পণ হিসাবে বিরাজ করবে।

ফিত্নাবাজদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ

রাসূলুল্লাহ (সা) এর মক্কা প্রবেশের সময় সেখানকার বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের অবস্থা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কিছু সংখ্যাক লোক ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া একেবারেই অর্থহীন। তারা চাচ্ছিলো, যেন যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় এবং শান্তি ও স্বস্তির সাথে আরম্ভ হয় ব্যবসা বাণিজ্য ও কাজ কারবার। তাদের মধ্যে একদল এমন ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিরোধিতায় প্রথম থেকেই অগ্রে অগ্রে ছিল। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছিলো। তাই এখন তারাও বিরোধিতার প্রতি আর আগ্রহী ছিল না, বরং আন্তরিকভাবে চাচ্ছিলো, যেন সব রকমের সংঘর্ষ কোন না কোনভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কিভাবে যে এটা বন্ধ হবে তা তাদের বোধগম্য হচ্ছিলো না। বেওকুফ, ঈর্ষাপনায়ণ ও অদূরদর্শী একদল লোক এমনও ছিল, যারা যে কোন পরিস্থিতিতে ফিত্নাবাজীতে লিপ্ত থাকতে চাইত। এর পরিণাম কি হবে না হবে সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপ করত না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা প্রবেশের সময়ও এই শেষোক্ত দল তাঁর বিরোধিতা থেকে সরে দাঁড়ায় নি। তারা সাধারণ লোকের মতামতের কোন পরোয়া না করে কিছু সংখ্যাক বখাটেকে নিয়ে একটি দল গঠন করে এবং তীর ধুনক নিয়ে খন্দামাহ পাহাড়ের উপর চড়ে বসে।[২] তাদের মধ্যে ইকরামা বিন আবূ জাহল, সাফওয়ান বিন উমাইয়া, সুহায়ল বিন আমর এবং হামাস বিন কায়স বিন খালিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)-এর বাহিনীর কুরয বিন জাবির আল ফিহ্রী (রা) এবং খুনায়স বিন খালিদ বিন রাবী'আ (রা)-কে যারা মূল বাহিনী থেকে কিছুটা পৃথক হয়ে অন্য রাস্তা ধরে এগোচ্ছিলেন—শহীদ করে ফেলে। হযরত খালিদ (রা) এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছামাত্র তিনি ফিরে গিয়ে ঐ ফিতনাবাজদের তেরোজনকে হত্যা করেন এবং অবশিষ্টরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়।

হামাস বিন কায়সের ঘটনা একটি রসোত্তীর্ণ কাহিনীতে পরিণত হয়। সে যখন হাতিয়ার শান দিচ্ছিলো তখন তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে কার সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছ? সে উত্তর দেয়, মুহাম্মদ (সা) এবং তার অনুসারীদের

সাথে। স্ত্রী তখন বলে, তার সামনে এসব কিছুতে কোন কাজ হবে না। সে উত্তরে আত্মশ্লাঘাপূর্ণ একটি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ঘর থেক বেরিয়ে পড়ে। এরপর যখন সে হযরত খালিদ (রা) এর তাড়া খেয়ে উর্ধশ্বাসে ঘরের দিকে ছুটে আসে তখন তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে, তোমার ঐ স্পর্ধার কি খবর ? সে তখন ছন্দবদ্ধ কয়েক পংক্তিতে তার যে অবস্থা বর্ণনা করেছিলো তা হলো –

"আহা! তুমি যদি খান্দামায় থাকতে তাহলে দেখতে,
যখন সাফওয়ান পালিয়ে গেল এবং ইকরামা পালিয়ে গেল,
আর আবূ যায়দ সুহায়ল বিন (আমর)
স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলো।
তখন মুকাবালার জন্য যে সব
তরবারি চকমকিয়ে উঠল,
সেগুলো হাত এবং মাথা কর্তন করছিলো,
যদি তুমি ঐসব দেখতে তাহলে তোমার মুখ থেকে
তিরষ্কারের একটি শব্দও বের হত না।

হারাম শরীফের পবিত্রকরণ

মূর্তিপূজারীরা হারাম শরীফের বিভিন্ন স্থানে ৩৬০টি মূর্তি সজ্জিত করে রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) হারাম শরীফে প্রবেশকালে তাঁর পবিত্র হাতে একটি ধনুক ছিল, যার অগ্রভাগ দিয়ে তিনি এক একটি মূর্তিকে মাটিতে ফেলে দিচ্ছিলেন, আর নিম্নের আয়াতটি অনবরতঃ তিলাওয়াত করছিলেন।

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا .

"সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।" – (১৭:৮১)

যে সব মূর্তি বেশ উপরে ছিল এবং হাতে নালাগ পাওয়া যাচ্ছিলো না সেগুলোকে মাটিতে ফেলে দেওয়ার জন্য তিনি হযরত আলী (রা)-কে আপন কাঁধের উপর দাঁড় করিয়ে দেন। হযরত আলী (রা) সেগুলোকে ভেংগে নীচে ফেলে দেন। এভাবে হারাম শরীফের পবিত্র করণের কাজ পরিপূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছল এবং কুরায়শের চোখে একথা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মূর্তি না কারো উপকার করতে পারে, আর না অপকার। বরং এদিক সেদিক নড়াচড়া করার ক্ষেত্রেও তারা মানুষের মুখাপেক্ষী। হারাম শরীফ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাঈল (আ) এবং ফিরিশতাদের কল্পিত ছবিসমূহও খুলে ফেলা হল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বা তাওয়াফ করেন এবং কা'বার দরজা খুলিয়ে নিয়ে ভিতরে সালাত আদায় করেন। তখন তাঁর সাথে শুধুমাত্র উসামা বিন যায়দ এবং বিলাল বিন রিবাহ্ (রা) ছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বার চাবিটি উসমান বিন তালহার হাতে সমর্পণ করেন এবং বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত এটা তোমাদের হাতেই থাকবে। সেদিন হযরত বিলাল (রা) প্রথম বারের মত সেখানে আযান দেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খুতবা

কুরায়শ মসজিদ প্রাঙ্গণে সারিবদ্ধভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি বায়তুল্লাহ্র দরজার দু'দিক দু'হাতে ধরে বলেন –

لا اله الا الله وحده لاشريك لهُ صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الا كل ماثرة او دم او مال يدعى فهوتحت قدمى هاتين الا سدانة البيت وسقاية الحجاج يا معشر قريش ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمُها بالاباء الناس من ادم وادم من تراب .

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি আপন অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, আপন বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সব বিরোধী শক্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, জাহিলিয়া যুগের সমস্ত গর্ব, সমস্ত দম্ভ ও সমস্ত রক্তমূল্য আমার এই দুই পায়ের নীচে। শুধু হারামে কা'বার 'তাওলিয়াত' (ব্যবস্থাপনা) এবং হাজীদের পানির ব্যবস্থাপনা এর ব্যতিক্রম। হে কুরায়শ, জাহিলিয়া যুগের আত্মগরিমা ও বংশ গৌরব আল্লাহ্ তা'আলা মুছে ফেলেছেন। সমগ্র মানুষ আদমের বংশধর এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।"

এরপর তিনি নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন-

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

"হে মানুষ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র কাছে অধিক মর্যদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।" - (৪৯:১৩)

রাসূলুল্লাহ (সা) এর اَلنَّاسُ مِنْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ (সমগ্র মানুষ আদমের বংশধর এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্টি) এই বাণীটি, মানুষের সাম্যের ব্যাপারে যত কথা বলা যেতে পারে, তার সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত রাখে। এর মধ্যে সাম্যের যে দলীল পেশ করা হয়েছে, তা এমনি অকাট্য যে, তাতে কোনরূপ মতবিরোধ সৃষ্টি হতে পারে না। অর্থাৎ সমগ্র মানুষ - চাই তারা কালো হোক কিংবা সাদা হোক, যে কোন জাতির হোক, যে কোন দেশের হোক, যে কোন অঞ্চলের হোক - যখন পরস্পর ভাই ভাই, তখন এই ভাইয়ে ভাইয়ে ভেদাভেদ সৃষ্টির তো কোন মানে হয় না। মানুষের মর্যাদা বর্ণ, বংশ, গোত্র, কিংবা সম্পত্তি দ্বারা নির্ণীত হয় না, বরং তা নির্ণীত হয় তাকওয়া ও সুকর্ম দ্বারা। যার মধ্যে তাকওয়া যতবেশী, মর্যাদার ক্ষেত্রে সে তত অগ্রে।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) কুরায়শকে সম্বোধন করে বলেন, আজ আমি তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করব বলে তোমারা মনে কর? সকলে এক বাক্যে উত্তর দেয়, আপনি মহানুভব, আপনি মহানুভবের সন্তান। আপনার কাছ থেকে শুধু শান্তি ও মঙ্গলেরই আশা করা যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি আজ সে কথাই বলব, যে কথা ইউসুফ (আ) তার ভাইদেরকে বলেছিলেন - لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ -"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।" اَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ -"তোমরা আজ মুক্ত।"

সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস চষে বেড়ালেও এ ধরনের মহানুভবতার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সাধারণ ক্ষমা ছিল সেই সব লোকের জন্য, যারা একুশটি বছর পর্যন্ত রাসূলূল্লাহ (সা) এবং তাঁর অনুসারীদের উপর একে একে নানা ধরনের অমানুষিক জুলুম-অত্যাচার চালিয়ে আসছিলো। তাদের তরবারি, তাদের বর্শা এবং তাদের তীর, তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের উপর অনবরত বর্ষিত হচ্ছিলো।

রাসূলূল্লাহ (সা) এর উত্তম আদর্শের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদ কী সুন্দরভাবেই না বলেছেন, "অত্যাচারিত অবস্থায় ধৈর্য, মুকাবালার সময় দৃঢ়তা, কাজকর্মে সদাশয়তা, বিজয়ী অবস্থায় ক্ষমা–এগুলো হচ্ছে মানুষের সেই অনুপম গুণাবলী, যেগুলোর সমাবেশ মুহাম্মদ (সা) ছাড়া আর কোন মানুষেরই একক জীবনে ঘটেনি। আর তাঁর এই উত্তম আদর্শই কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষের দুনিয়া আখিরাতের সাফল্যের চিরন্তন দলীল হিসাবে বিবেচিত হবে।

মক্কা মুকাররমায় সেই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যা দ্বারা রাসূলূল্লাহ (সা) এর করুণা ও মহানুভতার গুণটি অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠে।

জনৈক ব্যক্তি রাসূলূল্লাহ (সা) এর কাছে কিছু বলতে এসেছিল। কিন্তু যখন সে তাঁর সামনে এল তখন নবুওয়তের ভয়ে সে কাঁপতে লাগলো। রাসূলূল্লাহ (সা) তার এই অবস্থা দেখে বললেন,

هَوِّنْ عَلَيْكَ فَانِّىْ لَسْتُ بِمَلِكٍ اِنَّمَا اَنَا اِبْنُ اِمْرَاَةٍ قُرَيْشٍ تَاْكُلُ الْقَدِيْدُ .

"কোন পরোয়া করোনা। আমি বাদশাহ্ নই, বরং কুরায়শের এমন এক নারীর সন্তান,যে (অভাবের কারণে) শুষ্ক গোশত ভক্ষণ করত।"

কা'বার সম্মান

মক্কা বিজয়ের পরবর্তী দিন বনূ খুযা'আ গোত্রের লোকেরা হুযায়ল গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে। এ সংবাদ শুনে রাসূলূল্লাহ (সা) যে ভাষণ দেন তা হলো –

"হে মানুষ, আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন আসিমান যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই মক্কাকে 'মাকামে হুরমাত' (এমন পবিত্র জায়গা, যেখানে লড়াই ও খুনাখুনি হারাম) বলে ঘোষণা করেছেন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তা 'মাকামে হুরমাত' হিসাবে আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তার জন্য মোটেই বৈধ নয় যে, সে মক্কায় কারো রক্ত বহাবে কিংবা সেখানকার কোন গাছ কাটবে। আমার পূর্ববর্তী কোন লোকের জন্যই মক্কা হালাল হয় নি এবং আমার পরবর্তী কোন লোকের জন্যও হালাল হবে না। আমার জন্যও সাময়িকভাবে কেবল এ জন্য হালাল হয়েছে যে, মক্কাবাসীদের ওপর ক্রোধ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল। শুনে রেখ, এরপর গতকালের হুরমত পুনরায় ফিরে এসেছে। আজ যারা এখানে আছ এবং আমার কথা শুনছ তাদের উচিত ঐ সব লোকের কাছে আমার এই কথা পৌঁছিয়ে দেওয়া, যারা এখানে উপস্থিত নেই।"

তারপর তিনি বনূ খুযা'আকে সম্বোধন করে বলেন, "অনেক হত্য সংঘটিত হয়েছে। এরমধ্যে তার রক্তমূল্য আমিই পরিশোধ করবো। এরপর নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের ইখ্‌তিয়ার থাকবে– চাই তারা 'কিসাস' নেবে অথবা রক্তমুল্য।"

যাদেরকে ক্ষমা করা হয় নি

যাদেরকে সাধারণ ক্ষমার আওতাভুক্ত করা হয় নি, কারো কারো মতে তাদের সংখ্যা ছিল সতেরো। তার মধ্যে এগারোজন পুরুষ ও ছয়জন স্ত্রীলোক। কেননা এদের প্রত্যেকেই ছিল কোন না কোন ভয়ানক অপরাধে অপরাধী। যেমন ঃ

১। আবদুল উয্যা বিন খাতল্। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে সদকা আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। জনৈক আনসারীকেও তার সংগী করে দেওয়া হয়েছিল। আবদুল্লাহ ছিল অত্যন্ত কড়া মেজাযের লোক। তার সংগী কোন একটি ব্যাপারে খানিকটা শৈথিল্য প্রদর্শন করলে সে রাগত বশে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। এরপর সদকার পশুগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়। এই অপরাধের জন্য তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়।

২। সাফওয়ান বিন উমাইয়া আল জামহী। সে ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের কট্টর শত্রু। খান্দামাহ পাহাড়ে ফিত্নাবাজীতে যারা অগ্রে অগ্রে ছিল সাফওয়ান ছিল তাদের অন্যতম। মক্কা বিজয়ের পর সে ইয়ামনের দিকে পালিয়ে যায়। যখন জিদাদা গিয়ে পৌছে তখন উমায়র বিন ওয়াহ্ব রাসূলুল্লাহ (সা) এর কছে তার নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। উমায়র তখন একটি নিদর্শন প্রদানের জন্য আবেদন জানায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন আপন পাগড়িটি তাকে দান করেন। অতঃপর সাফওয়ান রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে পৌছে এবং নিবেদন করে; উমায়র বলে, আপনি নাকি আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। এটা কি সত্যি? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর দেন, হ্যাঁ সত্যি। সাফওয়ান তখন বলে, ইসলাম গ্রহণের জন্য আমাকে দু'মাসের সময় দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাকে চার মাসের সময় দেওয়া গেল। কিন্তু সাফওয়ান হুনায়ন যুদ্ধের সময়ই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ঐ যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে একশ বর্ম ধার হিসাবে দিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে ওয়ালীদ (রা) আগেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

৩। ইকরামা বিন আবূ জাহ্ল। তিনি ছিলেন ইসলামের সর্বপ্রধান শত্রুর সন্তান। মক্কা বিজয় পর্যন্ত তিনি মুসলিম বিরোধী সব কয়টি অভিযনেই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইয়ামনে পালিয়ে যান। তাঁর স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে হারিছ বিন হিশাম, যিনি আবূ জাহ্লের ভাইঝি ছিলেন, ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। একদা উম্মে হাকীম রাসূলুল্লাহ্র খিদমতে আপন স্বামীর জন্য মার্জনা ভিক্ষা করলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে মাফ করে দেন। তিনি তখন ইয়ামনে গিয়ে ইকরামাকে সাথে করে নিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে পেশ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর ইকরামা (রা) ছিলেন প্রখ্যাত মুসলিম মুজাহিদদের অন্যতম।

৪। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবী সুরাহ্। সে ছিল হযরত উছমান (রা) এর দুধ ভাই। প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাকে অহী লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এপর মুরতাদ হয়ে যায় এবং বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলে মানুষকে ইসলাম থেকে ফেরাবার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। মক্কা বিজয়ের পর সে হযরত উছমান (রা) এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তারই সুপারিশে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে (আবদুল্লাহ বিন সা'দকে) মাফ করে দেন। অবশ্য তিনি তাঁর বাকী জীবন ইসলামের সেবায়ই অতিবাহিত করেন।

৫। হুবার বিন আসওয়াদ। এ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার হাতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কন্যা হযরত যায়নাব (রা) মক্কা থেকে হিজরত করে যাবার সময় এমন একটি আঘাত পেয়েছিলেন, যার কারণে বিশেষভাবে তার স্বাস্থ্য ভেংগে পড়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর সেও লুকিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে হাযির হয়ে আপন কৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনা ও ক্ষমা ভিক্ষা করে এবং সাথে সাথে ইসলামও গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকেও ক্ষমা করে দেন।

৬। কাব বিন যুহায়র। মক্কা বিজয়ের এক বছর পর আপন ভাইয়ের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের রচিত 'বানাত সু'আদ' নামক কবিতাটি রাসূলুল্লাহ (সা) কে পড়ে শোনায়। তাতে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর অনুসারীদের উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছিলো। এ কাসীদা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) এত সন্তুষ্ট হন যে, তাঁকে আপন গায়ের চাদরটি উপহার হিসাবে প্রদান করেন।

৭। ওয়াহশী। হামযা (রা)-এর ঘাতক। এ ব্যক্তিও রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকেও মাফ করে দেন, তবে বলেন,তুমি আমার চোখের সামনে আসবেনা।

৮। আবদুল্লাহ বিন যাবআ'রিয়া। তাকেও রাসূলুল্লাহ (সা) মাফ করে দেন।

বিভিন্ন রিওয়াতে আরো তিনজনের নাম পাওয়া যায়, যারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে পৌঁছতে পারে নি এবং বাইরে থাকতেই কারো না কারো হাতে মারা পড়ে।

আরো ক্ষমা

স্ত্রীলোকদের মধ্যে আবূ সুফ্য়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের কট্টর শত্রু। এমন কি, আবূ সুফ্য়ান যখন কুরায়শকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর মুকাবালা না করার পরামর্শ দেন তখন হিন্দ রাগান্বিত হয়ে তাঁর গোঁফ টেনে ধরেছিল। সে আপন চেহারার উপর নেকাব টেনে স্ত্রীলোকদের দলভুক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আসে এবং ইসলাম গ্রহণের পর বলে, আমি হিন্দ। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকেও ক্ষমা করে দেন। মোটকথা, যাদেরকে সাধারণ ক্ষমা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাদের অপরাধ যারপর নেই কঠোর হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রায় সকলকেই ক্ষমা করে দেন। শুধুমাত্র ইবনে আখতালকে তার দ্বিমুখী অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। বাকি দু অথবা তিন জন পুরুষ রাসূলুল্লাহ (সা) এর খেদমতে হাযির হওয়ার পূর্বেই কারো না কারো হাতে নিহত হয়।

হযরত আলী (রা) এর দুধবোন উম্মে হানীর স্বামী হুবায়রা বিন আবী ওয়াহব ইয়ামনে পালিয়ে যায় এবঙ কাফির থাকা অবস্থায়ই সেখানে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

উম্মে হানী (রা) দু'জন মাখযুমীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিল হারিছ বিন হিশাম এবং অন্যজন যুবায়র বিন উমাইয়া বিন মুগীরা। হযরত আলী (রা) ওদের দুজনকেই হত্যা করতে চাচ্ছিলেন। হযরত উম্মে হানী (রা) শেষ পর্যন্ত এ ব্যপারটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলেন, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ আমিও তাকে আশ্রয় দিয়েছি এবং তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ আমিও তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। অতএব ঐ দু'জন শেষ পর্যন্ত ক্ষমা ও নিরাপত্তা লাভ করেন।

টীকা ঃ

১। বুখারী ঃ কিতাবুল মাগাযী।

২। খান্দামাহ হচ্ছে মক্কা মুকাররমার একটি বিখ্যাত পাহাড়, যা বূকাবীস পাহাড়ের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত।

ইসলামের মুজাহিদদের মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ

[মাওলানার লেখনীতে]

কুরায়শের অঙ্গীকার ভঙ্গ

মক্কার কুরায়শরা যেমন জুলুম ও বাড়াবাড়িতে ছিল অগ্রণী, তেমনি অঙ্গীকার ভঙ্গের ক্ষেত্রেও ছিল অদ্বিতীয়। তাদের সাথে মুসলমানদের শেষ ঘটনাটি ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধি। এতে একদিকে ছিল মুসলমান এবং তাদের মিত্র এবং অপরদিকে ছিল কুরায়শ ও তাদের মিত্র। মুসলমানদের মিত্র ছিল খুযা'আ গোত্র এবং কুরায়শের মিত্র ছিল বনূ বকর গোত্র। সন্ধির মৌলিক শর্ত ছিল এই যে,দশ বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষ তাদের সন্ধি ও নিরাপত্তা-চুক্তির উপর অবিচল থাকবে। কিন্তু দুবছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই বনূ বকর,বনূ খুযা'আর উপর আক্রমণ করে বসল এবং কুরায়শ এ ব্যাপারে বনূ বকরকে সাহায্য করল, এমন কি কুরায়শের সুহায়াল বিন আমর, যে হুদায়বিয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল, সেও উক্ত হামলায় অংশগ্রহণ করল। বনূ খুযা'আ কা'বা শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করল এবং আল্লাহ্র নামে নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হল। তাদের মধ্যে চল্লিশজন লোক আত্মরক্ষা করে মদীনায় গিয়ে পৌঁছল এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে বনূ বকর ও কুরায়শের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ পেশ করল।

এখন পূর্ব চুক্তির পটভূমিতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর এটা অপরিহার্য হয়ে উঠল যে, তিনি কুরায়শদের বিরুদ্ধে তাদের অঙ্গীকার ভংগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। অতএব তিনি দশ হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং কোন উল্লেখযোগ্য রক্তারক্তি ছাড়াই মক্কা জয় করতে সমর্থ হলেন।

সংস্কারের ক্রমধারা

ইসলাম ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি জিনিসের সংস্কার সাধন করেছে। শরাব (মদ) ক্রমান্বয়ে হারাম হয়েছে। সালাতের মধ্যেও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে। আরবদের যুদ্ধংদেহী মনোবৃত্তিকেও এভাবে ক্রমান্বয়ে সংস্কার করা হয়েছে। লুটপাট করা আরবদের একটি চিরাচরিত স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। তাই সাহাবীরাও হঠাৎ করে এই অভ্যাসটি ছাড়তে পারতেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সুযোগ এবং বিভিন্ন পন্থায় এই অভ্যাসটি ক্রমান্বয়ে সংশোধনের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং খায়বার যুদ্ধে এই সংশোধনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। খায়বার যুদ্ধের অনুরূপ যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটল তখন ইসলামের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী নিজের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের ঘরে এমন শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে প্রবেশ করল যে, সমগ্র আরববাসী দেখতে পেল, ইসলাম আরবের সেই (লুট পাটের) চিরাচরিত রীতিটি সম্পূর্ণ বদলে ফেলেছে।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ .

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যিনি তাদের নিকট আবৃত্তি করেন তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত, ইতিপূর্বে তো এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।" – (৬২:২)

হযরত হাতিব (রা) এর ঘটনা

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ এমন একটি ঘটনা ঘটল, যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) এর অসীম দয়া ও করুণা গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটার একটি সুবর্ণ সুযোগ এল। হাতিব (রা) একজন বদরী (বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) সাহাবী ছিলেন। তিনি গোপনে কুরায়শের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে মুসলমানরা যে কুরায়শদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, সে তথ্যটি ফাঁস করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পথিমধ্যেই তার চিঠিটি মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হাতিব (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার? তিনি জবাব দেন, আমাকে শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়া করবেন না। প্রকৃত ঘটনাটি শুনুন। কুরায়শ গোত্রের সাথে আমার গোত্রগত কোন সম্বন্ধ নেই। আমি তাদের মিত্র মাত্র। কিন্তু অনেক মুহাজির তাদের সাথে গোত্রগত সম্বন্ধ রাখেন, যার কারণে ওরা তাদের (মুহাজিরদের) মক্কায় রেখে আসা সন্তান-সন্ততির হিফাযত করতে পারে। অতএব আমি কুরায়শদের এমন একটি উপকার করতে চাইলাম, যার কারণে তারা আমার সন্তান-সন্ততির হিফাযত করবে। আমার গোপন সংবাদ পাঠানোর উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যথায় আমি মুরতাদ হইনি, বরং মুসলমানই আছি।

উক্ত ঘটনার কারণে হযরত উমর (রা) হাতিব (রা) এর উপর এত রাগান্বিত হয়েছিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে তার (হাতিবের) গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) হাতিবকে এই পটভুমিতে ক্ষমা করে দেন যে, তিনি বদরযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।[১]

প্রাথমিক যুগের এই ঘটনা থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে, ঐ সব লোকের সাথে ইসলামের আচরণ কিরূপ ছিল, যাদের কারণে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল।

রাহমাতুল লিল আলামীন

হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রা) কোনরূপ বিরোধিতামূলক উদ্দেশ্য ছাড়াই উপরোক্ত কাজটি করে থাকবেন। কিন্তু সুন্দর নিয়্যতের দ্বারা সেই বিরাট ক্ষতি কিভাবে পুরণ হতে পারে, যা এই পত্র পৌঁছার পর মুসলমানদের উপর আপতিত হতে পারত? যুদ্ধাবস্থায় আজ বড় বড় সভ্য জাতিরা যা করছে, তা তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। সামরিক গোপনীয়তা প্রকাশ এবং যুদ্ধাবস্থায় শত্রুর সাথে চিঠিপত্র আদান-প্রদান এমন একটি অপরাধ, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের রহমত, হযরত রাসূলে আকরাম (সা) এর কাছে বিরাট বিরাট মানবীয় অপরাধও এমন ছিল যেমন বিরাট সমুদ্রে একবিন্দু পানি। তাঁর দয়া ও করুণার ঘটনারাজি কেউ যদি শুনতে চায় তাহলে সারা জীবন শুনতেই থাকবে –তা কখনো শেষ হবে না। তখন হাতিব বিন আবি বালতা'আকে ক্ষমা করার ঘটনাটিও তার কাছে মনে হবে যেন তা সেই রহমত সাগরের এক বিন্দু পানি মাত্র।

সূরা মুমতাহানার শানে নুযূল

সুতরাং এই ঘটনাটি হচ্ছে সূরা মুমতাহানার শানে নুযূল। হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রা)-কে তো মাফ করে দেওয়া হলো। কিন্তু সেই সাথে ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ্‌র এই হুকুম নাযিল হল যে, যুদ্ধাবস্থায় যে মুসলমান শত্রুর সাথে সম্পর্ক রাখবে, আল্লাহ্‌র কাছে সে ঐ শত্রুদের মধ্যেই গণ্য হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ج

"হে মুমিনগণ, আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি ওদের সাথে বন্ধুত্ব করছ অথচ ওরা, তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে,তা প্রত্যাখ্যান করেছে।"-(৬০ঃ১)

ইবরাহীমী আদর্শ

এরপর মুসলমানদেরকে দ্বীনে হানীফের প্রধান দায়ী' (আহবানকারী) হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর অনুসারীদের উত্তম আদর্শ অনুসরণ করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ .

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সংগে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সংগে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহ্র উপর ঈমান আন।" – (৬০:৪)

মক্কা বিজয়ের জন্য রমযান মাস নির্বাচন

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের জন্য পবিত্র রমযান মাস নির্বাচন করেন। কেননা রমযান মাসেই তাকওয়া, পরহেযগারী ও আল্লাহ্ ভীতির সর্বাধিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সমগ্র আরববাসী ঈমান আনার জন্য শুধুমাত্র মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করছিলো। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে এর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করেন। এজন্য দশ হাজার মুজাহিদ একত্রিত হন এবং মদীনা থেকে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণিত অবস্থায়ই আল্লাহ্র পথে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন।

কুরায়শ নেতৃবৃন্দ

মক্কার কুরায়শদের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে তখন আবূ সুফ্য়ান বিন হারব, হাকীম বিন হাযাম এবং বুদায়ল বিন ওয়ারাকা সঠিক অবস্থা জানার জন্য অগ্রসর হয়। যখন তারা মাররায্ যাহরান[২] নামক স্থানে পৌঁছে তখন অনেকগুলো প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা দেখতে পায়। আবূ সুফ্য়ান তখন বলে, এটাকে তো আরফান আগুন মনে হচ্ছে। বুদায়ল বিন ওয়ারাকা উত্তরে বলে, বনূ আমর গোত্রের লোকেরা এ আগুন বিভিন্ন জায়গায় প্রজ্বলিত করে থাকবে। কিন্তু আবূ সুফ্য়ান তা মানতে রাজী হচ্ছিলো না। তারা এসব কথাবার্তা বলছিলো; এমন সময় একদল টহলদার মুসলমান সেখানে এসে পৌঁছেন এবং এইসব কুরায়শ নেতাকে বন্দী করে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সামনে নিয়ে হাযির করেন। এভাবে হঠাৎ করেই আল্লাহ্ প্রদত্ত বিজয়ের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়ে গেল।

ইসলামের মুজাহিদবৃন্দ

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কার দিকে অগ্রসর হন তখন আপন চাচা আব্বাস (রা) কে বলেন, আপনি আবূ সুফ্য়ানকে ইসলামী বাহিনীর পরাক্রমের দৃশ্যটি দেখিয়ে দিন। ইসলামী বাহিনী যখন রওয়ানা হল তখন প্রত্যেক

গোত্রের পৃথক পৃথক বাহিনী রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে চলতে লাগল। আবূ সুফ্য়ানের সম্মুখ দিয়ে একটি বাহিনী অগ্রসর হওয়ার সময় সে জিজ্ঞাসা করল, এটা কোন গোত্র? আব্বাস (রা) উত্তর দেন, গিফার গোত্র। আবূ সুফ্য়ান বলল, এদের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই। এভাবে জুহায়না, সা'দ বিন হুযায়ম, সুলায়ম প্রভৃতি গোত্র আবূ সুফ্য়ানের সম্মুখ দিক দিয়ে অগ্রসর হলো। কিন্তু আবূ সুফ্য়ান তাতে প্রভাবিত হলো না। এরপর এক বিরাট বাহিনী তার সামনে দিয়ে অতিক্রান্ত হলো, যাতে ছিল সম্পূর্ণ নতুন লোক এবং সম্পূর্ণ নতুন ভংগিতে তারা এগিয়ে যাচ্ছিলো। ওদেরকে দেখে প্রথম বারের মত আবূ সুফ্য়ানের মনে ভীতির সঞ্চার হলো। সে হযরত আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করল, এই লোকগুলো কোথাকার এবং কোন্ গোত্রের? হযরত আব্বাস উত্তর দেন, এরা আনসার।

فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ ه

"আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাকে ভালবাসবে।"– (৯৫ঃ৫৪)

সা'দ বিন উবাদার ঘটনা

সা'দ বিন উবাদা আবূ সুফ্য়ানের ভীতিগ্রস্ত অবস্থা দেখে ব্যঙ্গ করে বললেন, আজই আসল লড়াইয়ের দিন এবং আজই খানা-ই-কা'বার হুরমাতকে হালাল করা হবে।

এরপর একটি ক্ষুদ্র বাহিনী অতিক্রান্ত হলো, যে বাহিনীতে খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর পতাকা যুবায়র বিন আওয়াম (রা) এর হাতে ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ সুফ্য়ানের কাছে এলেন তখন সে সা'দ বিন উবাদার ঐ ব্যঙ্গাত্মক কথাটি তাঁর কাছে বললো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সা'দ ভুল বলেছে। আজ বরং কা'বার হৃত সম্মান নতুনভাবে ফিরিয়ে আনা হবে। আজ এটাকে গেলাফ দিয়ে ঢাকা হবে। আজকের দিন, নিরাপত্তা দানের দিন।

শহর অবরোধ

একথা বলে তিনি সূরা ফাতাহ্ পড়ে সম্মুখে অগ্রসর হন এবং হাজূন[৩] নামক স্থানে পতাকা গাঁড়ার নির্দেশ দেন।[৪] চতুর্দিক থেকে মক্কা অবরোধ করা হয়। খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) ডান দিক দিয়ে এবং যুবায়র বিন আওয়াম (রা) বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণ করেন। আবূ উবায়দা (রা) পদাতিক বাহিনী নিয়ে পৃথকভাবে আক্রমণ চালান।

এবার মক্কা ছিল চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ। মুসলিম মুজাহিদদের সামনে যে ব্যক্তিই আসত, তাকেই খতম করে ফেলা হত। ইসলামী বাহিনী সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। শুধুমাত্র হযরত খালিদ (রা) এর বাহিনীর দুব্যক্তি শাহাদত বরণ করে।[৫] কিন্তু কুরায়শের গার্বিত মাথাসমূহের একটি স্তূপ গড়ে উঠে। এমনকি আবূ সুফ্য়ান শেষ পর্যন্ত এই বলে চীৎকার দিয়ে উঠে, "কুরায়শের সবুজ সতেজ বাগান উজাড় করে ফেলা হল। আজ কুরায়শের অবসান।"

নিরাপত্তা দানের নির্দেশ

এই আক্ষেপজনক ও নৈরাশ্যভরা উক্তি, যা ইসলামের সব চাইতে বড় শত্রুর মুখদিয়ে বের হয়েছিল, তা শুনে করুণার আধার হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) এর করুণাসাগর যেন তরঙ্গয়িত হয়ে উঠল। তিনি নিরাপত্তা দানের নির্দেশ দিলেন এই বলে যে–

مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِى سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ اَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ اَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ اٰمِنٌ ٠

"যে ব্যক্তি আবূ সুফ্য়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে সে নিরাপত্তা পাবে, যে ব্যক্তি অস্ত্র সংবরণ করবে সে নিরাপত্তা পাবে, এবং যে ব্যক্তি আপন ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে সেও নিরাপত্তা পাবে।"

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই ঔদার্যপূর্ণ নির্দেশ আনসারদের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করল। তাঁরা বলতে শুরু করলেন "শেষ পর্যন্ত আপন গোত্রের লোকদের সম্পর্কে তাঁর অন্তর দয়াদ্র হয়ে উঠেছে।" যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি সবাইকে ডেকে বলেন ঃ "আমি আল্লাহ্‌র এক বান্দা এবং তাঁর রাসুল। আমি আল্লাহ্‌র পরে তোমাদের দিকেই হিজরত করেছি। আমার মৃত্যু তোমাদের মৃত্যু এবং আমার জীবন তোমাদের জীবন। তোমরা যে কুধারণা করছে সেটা সত্য, তবে এজন্য আমি ছিলাম ক্ষমার্হ।৬

অপর বর্ণনা

আবু দাউদে আছে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মাররায যাহরানে পৌঁছেন তখন ইসলামী বাহিনীর ভাবপ্রবণতা লক্ষ্য করে হযরত আব্বাস (রা) এর অন্তরে এই ধারণার সৃষ্টি হলো যে, যদি কুরায়শ রাসূলুল্লাহ (সা)এর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা না করে তাহলে তারা নির্ঘাত ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি খচ্চরের উপর আরোহণ করে ইসলামী বাহিনীর আগে চলে যান এই ভেবে যে, যদি কোন ব্যক্তিকে পেয়ে যান তাহলে তার মাধ্যমে মক্কাবাসীদেরকে এই মর্মে উদ্বুদ্ধ করবেন যে, তারা যেন অবিলম্বে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। তিনি পথিমধ্যেই আবূ সুফ্য়ান এবং বুদায়ল বিন ওয়ারাকাকে পেয়ে যান। হযরত আব্বাস (রা) তাদেরকে সংগে নিয়েই চলে আসেন এবং পরদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে আবু সুফ্য়ানকে হাযির করেন। সে সংগে সংগে ইসলাম গ্রহণ করে এবং হযরত আব্বাস (রা) এই সুযোগে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আবু সুফ্য়ান এই গৌরব অর্জন করতে চায় যে, তার ঘরকে দারুল আমান (নিরাপত্তা স্থল) ঘোষণা করা হোক। রাসূলুল্লাহ (সা) আব্বাস (রা) এর সে আবেদন মঞ্জুর করেন – বরং সেই সাথে এই মর্মে সাধারণ নির্দেশ দেন–

من دخل دار ابى سفيان فهو امن ومن القى السلاح فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن .

"যে ব্যক্তি আবূ সুফ্য়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপত্তা পাবে, যে ব্যক্তি আপন ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে সে নিরাপত্তা পাবে এবং যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে আশ্রয় নেবে সে-ও নিরাপত্তা পাবে।"

মক্কাবাসীরা রাসূল (সা) প্রদত্ত এই নিরাপত্তা থেকে পুরাপুরি সুযোগ গ্রহণ করে।

فتفرق الناس الى دورهم والى المسجد .

"তখন লোকেরা আশ্রয় গ্রহণের জন্য মসজিদুল হারাম এবং নিজ নিজ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।"৭

আর কুরায়শের সব নেতারা কা'বা ঘরের আঙ্গিনায় আশ্রয় গ্রহণ করলো।৮

জানমালের হিফাযত

হযরত উম্মে হানী (রা) একজন মুশরিককে আশ্রয় দেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে এ বিষয়টির উল্লেখ করেন। তিনি (সা) তখন বলেন, শুধু এক ব্যক্তি নয়, তুমি যাকেই আশ্রয় দিয়েছ সেই আমার নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত

হয়েছে। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ ক্ষমা ও মহানুভবতা সমগ্র মক্কাকে যেন পরিবেষ্টন করে ফেলে। ফলে ঠিক যুদ্ধাবস্থা চলা সত্ত্বেও কেউ কারো ধন-সম্পত্তি স্পর্শও করে নি। আবূ দাঊদে আছে –

عن وهب قال سالت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا ؟ قالَ لا .

"ওয়াহব বলেন, আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, মক্কা বিজয়ের দিন কি কোন ধন-সম্পদ লুট করা হয়েছিল? তিনি উত্তর দেন, না।

পথভ্রষ্টতার নিদর্শনাদি ধ্বংস করে ফেলা হলো

রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের পবিত্র হাতেই আরবের গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতার যাবতীয় নিদর্শন ধ্বংস করে ফেলেন।

دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلثامائة نصب فجعل يطعنها بعود فى يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل (ابو داؤد)

لماقدم مكة ابى ان يدخل البيت فيه الالهة فامر بها فاخرجت فاخرج صورة ابراهيم واسماعيل وفى ايديهما الازلام فقال قاتلهم الله لقد علموا ما استقيما بها قط ثم دخل البيت فكبر فى نواحى البيت (بخارى).

"রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন কা'বা শরীফে তিনশ ষাটটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি একটি কাঠ অর্থাৎ ধনুক দ্বারা সেগুলোকে ঠোকর মারতেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন –

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا .

"সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।"[৯] – (১৭:৮১)

যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় আসেন তখন তিনি কা'বা শরীফে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করতে চান নি যতক্ষণ তাতে মূর্তি বিদ্যমান ছিল। তার নির্দেশে যখন মূর্তিগুলোকে সরানো হল তখন সেগুলোর মধ্যে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ) এর মূর্তিও ছিল এবং সেগুলোর হাতে জুয়ার তীর ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি (সা) সেগুলোকে দেখে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদে ধ্বংস করুন। তারা তো ভালভাবেই জানত যে, এই দুই নবী কখনো জুয়া খেলেন নি। এরপর তিনি কা'বা শরীফে প্রবেশ করেন এবং তার প্রত্যেকটি প্রান্তে প্রান্তে আল্লাহ্র মাহাত্ম্যের 'নারা' (শ্লোগান) তোলেন।[১০]

শুধুমাত্র একটি হত্যা

শান্তি ও নিরাপত্তা ঘোষণার পর শুধুমাত্র এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। হাদীসে আছে –

جاء رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال راقتله .

"জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (সা) কে বললেন, ইবনে খতল কা'বার গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি (সা) তখন বলেন, তাকে হত্যা করে ফেল।[১১]

সীরাত প্রণেতারা আরো কয়েক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ দাউদে দুটি রিওয়ায়াত আছে, যার দ্বারা সীরাত প্রণেতাদের বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুই রিওয়ায়াতের একটি সম্পর্কে খোদ আবু দাউদ লিখে দিয়েছেন, এই রিওয়ায়াতটি আমার মনোমত নয়।[১২]

ফলাফল

মোটামুটিভাবে এই সরল সহজ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত ফলাফল বের হয়।

১। কুরায়শকে মক্কা বিজয়ের আয়োজন সম্পর্কে খবর দেওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) হাতিব বিন আবী বালতা'আকে মাফ করে দেন, অথচ বর্তমান সমরনীতি অনুযায়ী তাকে গুলি করে হত্যা করা হত।

২। সা'দ বিন উবাদা গর্বভরে অথবা ব্যঙ্গ করে আবূ সুফ্য়ানকে কা'বা শরীফ অপবিত্র করার ধমক দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কথাকে রদ (রহিত) করে দেন।

৩। মক্কা বিজয় কালে রাসূলুল্লাহ (সা) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। অথচ যাদের জন্য এই ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিল তারা ছিল ইসলামের মূল শত্রু।

৪। মক্কায় সাহাবীরা কোন জিনিস লুট করেন নি।

৫। নিরাপত্তা ঘোষণার পর শুধুমাত্র এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়,যার উপর কিসাস গ্রহণ ছিল ওয়াজিব। বাকী লোকদের হত্যা সম্পর্কিত রিওয়ায়াতগুলো অস্পষ্ট। বিশ্বের আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাস পরীক্ষা করে দেখলে, ইসলামী বাহিনী যেভাবে কোনরূপ রক্তারক্তি না করে উদার চিত্তে মক্কায় প্রবেশ করেছিল, তার দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সাহাবীদের যুগেও রাসূলুল্লাহ (সা) এর এই উদারনীতি পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়। সাহাবীরা বিজিত দেশেগুলোর সাথে যে আচরণ করেছিলেন, তাও ছিল অত্যন্ত মানবতাসুলভ।

টীকা ঃ

১। বুখারী।

২। আজকাল এ জায়গাটি 'ওয়াদিয়ে ফাতিমা' নামে পরিচিত। উটের কাফেলাসমূহের জন্য মক্কা থেকে মদীনা যাওয়ার পথে এটা হচ্ছে প্রথম মনযিল।

৩। মক্কা মুয়ায্যামার উত্তরাংশের একটি পাহড়ের নাম। এর সন্নিকটেই 'জান্নাতুল মু'আল্লা' সমাধিভূমি। এটাকে হাজুন বলা হয়।

৪। বুখারী।

৫। বুখারী।

৬। মুসলিম ঃ কিতাবুল জিহাদ।
৭। আবু দাউদ ঃ কিতাবুল জিহাদ।
৮। আবূ দাঊদ ঃ কিতাবুল জিহাদ।
৯। আবূ দাউদ ঃ কিতাবুল জিহাদ।
১০। বুখারী।
১১। বুখারী।
১২। আবূ দাউদ ঃ দ্বিতীয় খন্ড।

হুনায়ন যুদ্ধ

হুনায়ন যুদ্ধ–১

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ·

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন বহুক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে।" (৯:২৫)

হাওয়াযিন ও ছাকীফ

ইসলামের সাফল্য, যেমন মক্কার কুরায়শদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক ক্ষমতাকে খাটো করে দিচ্ছিলো তেমনি মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে দিচ্ছিলো তাদের 'তাওলিয়াতে কা'বার' (কা'বার অভিভাবকত্বের) একচেটিয়া অধিকারেরও। এ কারণে ক্ষোভে দুঃখে তারা একেবারে পাগলপারা হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য গোত্র, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সমর-পটুতা এবং অন্যান্য শক্তি-সামর্থ্যের ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল, তাদের কাছেও মুসলমানদের এই সাফল্য ছিল অসহ্যকর। তাদের ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, এ নবজাত শক্তি যদি আরবের তথা মক্কা মুকাররমার উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় তাহলে তাদের স্বাধীনতাও বিপন্ন হয়ে পড়বে। ঐ সব গোত্রগুলোর মধ্যে হাওয়াযিন ও ছাকীফের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তায়েফ এবঙ তার আশেপাশে ছিল এ দু'টি গোত্রের বাস। যখন ইসলামী শক্তির ক্রমোন্নতিতে কুরায়শরা বেশ কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল তখন হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রের সর্দাররা সমগ্র আরব সফর করে বিভিন্ন গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে শুরু করে। ইতিমধ্যে হঠাৎ মক্কা মুকাররমা মুসলমানদের দখলে চলে গেলে হাওয়াযিন ও ছাকীফ একজোট হয়ে মুসলমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। তখন তাদের এই ধারণা হয়ে থাকবে যে, মুসলমানদের পরাজিত করে তারা শুধু তাদের স্বাধীনতাকেই রক্ষা করবে না, বরং সেই সাথে কুরায়শের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারিত্ব ও সহায়-সম্পদের উপরও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। এভাবে ক্ষমতার ক্ষেত্রে তারা আরবের সমগ্র গোত্রের উপর নিজেদের স্থান করে নিতে সক্ষম হবে।

যুদ্ধ প্রস্তুটি

হাওয়াযিনের প্রধান দলপতি মালিক বিন আওফ আন নাসরী, যে ছিল ত্রিশ বছর বয়স্ক এক উদ্যমী যুবক সর্বপ্রথম মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সমগ্র উপজাতীয় গোত্র ও শাখা-গোত্রকে তার সাথে যোগদান করার আহবান জানায়। ঐ আহবানে সাড়া দিয়ে সম্পূর্ণ বনূ নাস্‌র ও বনূ জুশমের লোকেরা তার সাথে যোগদান করে। বনূ সা'দ বিন কবর এবঙ বনূ হিলালেরও কিছুলোক তার আহবানে সাড়া দেয়। অবশ্য বনূ কা'ব ও বনূ সা'দের উল্লেখযোগ্য কোন ব্যক্তি তার আহবানে সাড়া দেয় নি। ছাকীফের নেতৃস্থানীয় বক্তিদের মধ্যে কারিব বিন আসওয়াদ বিন মাসউদ এবং সেই সাথে যুল খিমার সুবায়' বিন হারিছ ও তার ভাই আহমর বিন হারিছ মালিক বিন আওফের সাথে ছিল। সে তাদের কাছ থেকে সব ব্যাপারেই পরামর্শ গ্রহণ করত। তবে মূল নেতৃত্ব ছিল তার (মালিকের) হাতেই।

বনূ জুশমের সরদার ও আরবের বিখ্যাত অশ্বারোহী দুরায়দ বিন সিম্মাকেও সংগে নেওয়া হয়েছিল– যদিও সে তখন খুব একটা কাজের লোক ছিল না। কেননা তখন তার বয়স ছিল একশ বছরের উপরে। সে চোখেও ভাল

দেখত না। তবে তার বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা এবং দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। মালিক বিন আওফ এই নির্দেশও জারী করেছিল যে, সকল লোক যেন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সংগে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসে, যাতে করে ওদের উপস্থিতির কারণে প্রত্যেকটি যোদ্ধা আরো বেশী বীরত্বের সাথে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। কিন্তু তার এই কৌশলের ফল হয়েছিল উল্টো, যেমন সামনে বর্ণনা করা হবে। যাহোক এই সব লোক আওতাস উপত্যকায় এসে পৌঁছে।

দুরায়দ বিন সিম্মাহ্

দুরায়দ বিন সিম্মাহ এসেই জিজ্ঞাসা করল, আমরা কোথায় আছি? উত্তর দেওয়া হলো, আওতাসে আছি। সে বললো, এ জায়গাটি যুদ্ধের জন্য উপযোগী। কেননা এখানকার জমি এত নরম নয় যে, তাতে যোদ্ধাদের পা ধ্বসে যাবে, আবার এত শক্ত নয় যে, তাতে পায়ের তলা জখম হবে। এরপর সে জিজ্ঞাসা করল, এটা কি ব্যাপার যে, উট চিল্লাচ্ছে, গাধা চিৎকার করছে, বকরীরা মি মি করছে এবং শিশুরা কান্নাকাটি করছে ? উত্তরে বলা হলো, মালিকের নির্দেশে ধনসম্পদ, সন্তান সন্ততি সব কিছু সংগে নিয়ে আসা হয়েছে। সে বললো, কেন? উত্তর দেওয়া হলো, এরা পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং পশ্চাদপসরণে বাধা দেবে।

দুরায়দ বললো, যুদ্ধে যদি পা টলে যায় তাহলে এসব জিনিসের দিকে কি কেউ দেখে? তখন কোন জিনিস কি তাকে রুখে রাখতে পারে? যুদ্ধে শুধু তরবারিই কাজ দেয়। যদি পরাজয় ঘটে যায় তাহলে এই ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এরপর দুরায়দ বনূ কা'ব ও বনূ কিলাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে বলা হলো, এদের কেউই আসে নি। দুরায়াদ বললো, আজ যদি সম্মান ও মর্যাদা লাভের দিন হত তাহলে কা'ব ও কিলাব কখনো অনুপস্থিত থাকত না। আমার মতে, তোমাদের সবারই তাই করা উচিত, যা কা'ব ও কিলাব্ করেছে।

দুরায়দ মালিককে বললো, হাওয়াযিনকে ভীতির মধ্যে ফেলে রেখ না। পরিবার-পরিজনকে কোন একটি সংরক্ষিত স্থানে রাখ। এরপর ঝামেলামুক্ত হয়ে যুদ্ধ করো। যদি জয়ী হও তাহলে সবাই তোমাদের সাথে এসে মলিত হবে। আর যদি পরাজিত হও তাহলে সবাই তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবে। আর যদি পরাজিত হও তাহলে অন্তত: ওরা বেঁচে থাকবে। কিন্তু মালিক, দুরায়দের অভিমত প্রত্যাখান করল এই বলে যে, তুমি একজন ভীতু বুড়ো, তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভোঁতা হয়ে গেছে।

অবস্থা পর্যবেক্ষণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হাওয়াযিন ও ছাকীফের এই যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ পান তখন আবদুল্লাহ্ বিন আবী হাদরাদ আসলামীকে ঐ সব গোত্রে পাঠিয়ে দেন এই বলে যে, তুমি ওদের মধ্যে ঢুকে পড়বে এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারে সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ব্যাপার তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে না উঠবে ততক্ষণ তুমি ওদের সঙগ ছাড়বে না। ইবনে আবী হাদরাদ শেষ পর্যন্ত সব তথ্যাদি সঠিকভাবে সংগ্রহ করে রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে এসে হাযির হন এবং যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন।

এইসব তথ্যাদি সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল এইজন্য যে, যদি যুদ্ধ ও সংঘর্ষ এড়িয়ে পরস্পর সন্ধির কোন উপায় বের হয়ে যায় তাহলে এইসব তথ্যাদি যেমন কাজে লাগবে, তেমনি যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়লেও এগুলো থেকে যথাস্থানে ও যথাসময়ে উপকৃত হওয়া যাবে।

প্রস্তুতি ও যাত্রা

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সা) হারাম শরীফের ভিতরে বসে তো আর শত্রুপক্ষের হামলার অপেক্ষা করতে পারেন না। কেননা অনুরূপ করলে হারাম শরীফের অভ্যন্তরেই রক্তারক্তির ঘটনা ঘটত, যার কারণে হারাম শরীফের

পবিত্রতা নষ্ট হত। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) এর পবিত্র অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি যতদূর সম্ভব আগে বেড়েই শত্রুদের মুকাবালা করতেন এবং তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলার উদ্যোগ নিতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ জাহলের সৎভাই আবদুল্লাহ্ বিন রাবী'আর কাছ থেকে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য ত্রিশ হাজার দিরহাম ঋণ গ্রহণ করেন।[১] সাফওয়ান বিন উমাইয়া, যে ইসলাম গ্রহণের জন্য অবকাশ নিয়েছিল, তার কাছ থেকেও একশ বর্ম ধার নেন।[২] এরপর আত্তাব বিন উসায়দকে মক্কা মুকাররমার শাসনকর্তা নিয়োগ করে ৬ শাওয়াল, হিঃ ৮ সনে[৩] (মুতাবিক ২৭ জানুয়ারী, ইং ৬৩০ সনে) সেই দিকে যাত্রা করেন, যেখানে হাওয়াযিন ও ছাকীফ সমবেত হচ্ছিলো। তিনি ১০ শাওয়াল,হিঃ ৮ সনে (মুতাবিক ২১ জানুয়ারী, ইং ৬৩০ সনে) লক্ষ্য স্থলে গিয়ে পৌছেন।[৪]

হুনায়নের অবস্থান

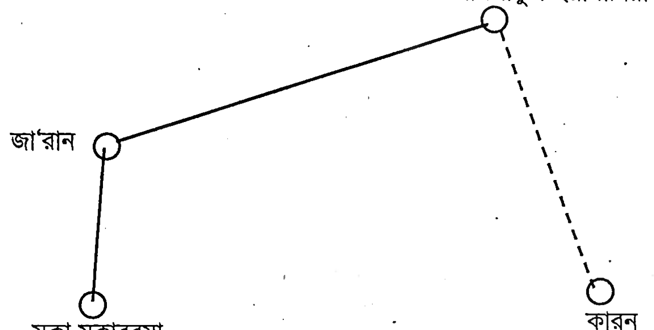
সর্বাগ্রে হুনায়নের অবস্থান নির্ণয় প্রয়োজন, যেখানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। অধিকাংশ সীরাত লেখক বলেছেন, হুনায়ন মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। কিন্তু হিজাযের এই দুটি শহরের মধ্যে যাতায়তের যত রাস্তা আছে, তার কোনটিতেই হুনায়নের অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয় না। কেউ কেউ লিখেছেন, জাহিলিয়া যুগের 'যুল মাজায' নামক বিখ্যাত বাজার আরাফাত থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত এবং এই আরাফাতের নিকট হুনায়ন এর অবস্থান। এটাকে আওতাসও বলা হয়।

আমার জানা মতে, ডক্টর হামীদুল্লাহ হচ্ছেন প্রথম মুহাক্কিক (সত্যানুসন্ধানকারী), যিনি হুনায়নের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তার লেখা থেকেই জানা যায় যে, শায়খ আরসালান বাসালামাহ্ও হুনায়নের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি এমন একটি স্থানকে হুনায়ন বলে নির্ধারণ করেছেন, যেখানে শাওয়াল, হিঃ ৮ সনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর এ কথা মেনে নেওয়া কঠিন। ডক্টর সাহেব এটাও লিখেছেন, মরহুম সুলতান আবদুল হামিদ খান হিজায রেলওয়ের জন্য যে নক্সা তৈরী করিয়েছিলেন, তাতে আওতাসের অবস্থা তায়েফের উত্তর-পূর্ব কোণে দেখানো হয়েছে। আমি ঐ নক্সা সামনে রেখে মক্কা এবং তায়েফ এবঙ সেই সাথে তায়েফ ও আওতাসের মধ্যবর্তী দূরত্ব মেপে দেখেছি। তাতে জানা গেছে যে, এই দুই স্থানের দূরত্বের অনুপাত এক এবং দুই (১:২)। অর্থাৎ মক্কা ও তায়েফের দূরত্ব যদি ষাট মাইল ধরা হয় তাহলে ডক্টর হামীদুল্লাহর নক্সায় চিহ্নিত আওতাস তায়েফ থেকে কম সে কম এক শ বিশ মাইল হওয়া উচিত। অতএব হয় এটাকে সেই আওতাস মানা যেতে পারে না, যার উল্লেখ হুনায়ন যুদ্ধে রিওয়ায়াতসমূহে রয়েছে, নয়তো এই আওতাসের অবস্থান ঠিক নয়।

অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতি

আমার মতে হুনায়নের অবস্থান নির্ণয়ের একটি যুক্তিসম্মত পদ্ধতি হলো, প্রথমে একথা নির্ণয় করা যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হুনায়ন যুদ্ধের পর কোন্ রাস্তা দিয়ে তায়েফ গিয়েছিলেন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ডক্টর হামীদুল্লাহ্ সেই জায়গাকেই হুনায়ন বলে নির্ধারণ করেছেন, যা আজ পর্যন্ত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সঠিক বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হুনায়ন যুদ্ধের পর 'নাখলাতুল ইয়ামানিয়া' যান। এরপর কারন্ ও মালীহ্ হয়ে ওয়াদিয়ে লিইয়াহ-এর 'বুহরাতুর রাগা' (বা বাহরা)-এ পৌছেন।[৫] সেখানে তিনি একদিন অবস্থান করেন, একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, সে মসজিদে সালাত আদায় করেন এবং বনূ লায়ছের একটি লোককে কিসাসের ভিত্তিতে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন। কেননা সে বনূ হুযায়ল গোত্রের একটি লোককে হত্যা করেছিল। লিইয়াহে ছিল হাওয়াযিনের সর্ববৃহৎ নেতা মালিক বিন আওফ আন নাসরী-এর দুর্গ, যা ঐ সময়ই ধ্বংস করে ফেলা হয়। সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) সেই রাস্তা ধরে নাখাব পৌছেন, যা আয্যাইয়িকাহ্ নামে

বিখ্যাত ছিল। এরপর তিনি তায়িফের সন্নিকটে অবতরণ করেন। ডক্টর হামীদুল্লাহ্ এই প্রকাশ্য পন্থা অনুযায়ী মক্কা মুকাররমা থেকে কারন্ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) এর সফরের নক্সা অংকিত করেছেন। যেমন–



অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা মুকাররামা থেকে জা'রান্না হয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে বের হন। হুনায়ন যুদ্ধ জা'রানা এবং নালাতুল ইয়ামানিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে হয়েছিল। ডক্টর হামীদুল্লাহ মক্কা মুকাররমা থেকে হুনায়নের দূরত্ব ত্রিশ ও চল্লিশ মাইলের মাঝামাঝি বলেছেন। অন্য কথায় হুনায়নকে মক্কা ও তায়েফের রাস্তা বা রাস্তাসমূহের উপর নয়, বরং মক্কা থেকে উত্তর-পূর্বে এবং তায়েফ থেকে উত্তর পশ্চিমে তালাশ করলে কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে। আক্ষেপের বিষয়, ডক্টর হামীদুল্লাহ্ স্বয়ং হুনায়ন পর্যন্ত যেতে পারেন নি। অন্যথায় এ সম্পর্কিত সঠিক দলীল প্রমাণ পাওয়া যেত।

আরো একটি পন্থা আছে – যদিও এটা খুব সুদৃঢ় নয়। ইবনে হিশামের একটি বর্ণনায় আছে, হুনায়নের দিকে চলতে চলতে একটি বিরাট ও সবুজ সতেজ বৃক্ষ কোন কোন যোদ্ধার নজরে পড়ে এবং তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল, কাফিররা যেমন 'যাতে আনওয়াত'কে[৬] পবিত্র জ্ঞানে মান্য করে, তেমনি আপনি আমাদের জন্যও একটি বৃক্ষকে মান্য করার সুযোগ দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আল্লাহ্ আকবার' (আল্লাহ্ মহান)! তোমরা আজ এমন কথা বলছ, যেমন কথা বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-কে বলেছিল। তারা বলেছিল –

اِجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ .

"তাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়ে দাও।" তখন মূসা উত্তর দিয়েছিলেন

اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ .

"তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়।" – (৭: ১৩৮)

এ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সম্ভবত: এই পথে ঐ বৃক্ষটি এখনো বিদ্যমান আছে। অতএব হুনায়ন অনুসন্ধানের এটাও একটা মাধ্যম হতে পারে।

যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে আনসার ও মুহাজির মিলে দশ হাজার যোদ্ধা ছিলেন, যারা মদীনা মুনাওওরা থেকে তাঁর সংগে এসেছিলেন। আরো দুহাজার মক্কা থেকে তাঁর সংগী হয়েছিলেন। বার হাজার যোদ্ধার বাহিনী এক বিরাট বাহিনী। বাহ্যত: এই বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করা কয়েকটি উপজাতীয় গোত্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সম্ভবত:

সেনাবাহিনীর এই আধিক্য দেখে কারো মুখ থেকে একথা বের হয়ে গিয়েছিল যে,এখন আমরা সংখ্যায় কম নই যে, কেউ আমাদের উপর জয়ী হয়ে যাবে। একথার সাক্ষ্য কুরআন মজীদেও রয়েছে।

যুদ্ধ সম্পর্কিত সমগ্র রিওয়ায়াত সামনে রেখে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যদি অনুমান করা যায় তাহলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ইসলামী বাহিনী কোন্ রাস্তা দিয়ে আসছে তা শত্রুরা জেনে গিয়েছিল। অতএব তারা ঐ রাস্তার একটি সমতল নিম্নভূমির বিভিন্ন স্থানে সুরক্ষিত গোপন ঘাটি তৈরী করে সেগুলোতে তীরন্দায বসিয়ে রাখে। ভোরের অন্ধকার তখনো কাটে নি, এমন সময় মুসলমানদের অগ্রবর্তী বাহিনীর উপর শত্রুবাহিনীর তীরন্দাযরা অনবরতর তীর বর্ষণ করতে শুরু করে। সেই অগ্রবর্তী বাহিনীতে ছিল বনূ সুলায়ম ও মক্কার 'তুলাকা' (মক্কা বিজয়ের দিন যারা ছিল মুসলমানদের অনুগ্রহের পাত্র) যারা তখন পর্যন্ত ইসলামও গ্রহণ করেনি। ইবনে হিশাম বলেন,

যখন হুনায়ন উপত্যকা সামনে এল তখন আমরা তাহামা অভিমুখী উপত্যকাসমূহের একটি নিম্নমুখী প্রশস্ত উপত্যকায় অবতরণ করতে শুরু করলাম। আমরা অবতরণ করছিলাম। শত্রুরা আমাদের আগেই উপত্যকায় এসে গিয়েছিল। ভোরের অন্ধকার তখনো কাটে নি, এমন সময় তারা প্রত্যেকটি সংকীর্ণ ঘাটি, প্রত্যেক প্রান্ত এবং প্রত্যেকটি গোপন রাস্তা থেকে আমাদের উপর হামলা চালালো। এই হামলা ছিল তাদের পূর্ব পরিকল্পিত। এজন্য তারা পুরোপুরি প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিল।[৭]

প্রথমে বনূ সালীম পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। এরপর মক্কাবাসীরাও পলায়ন করতে শুরু করে। সেই সাথে সাধারণভাবে সমগ্র বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তখন কেউই প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে দেখার পর্যায়ে ছিল না।

পবিত্র কুরআন এই অবস্থার নক্সা অতি সুন্দরভাবে অংকন করেছে। যেমন-

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ ٠

"আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন বহুক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য, কিন্তু এটা তোমাদের কোন কাজে আসে নি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।" (৯:২৫)

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ

মরহুম মাওলানা শিবলী ইসলামী বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অনেকগুলো কারণ বর্ণনা করেছেন। যেমন -

১। অগ্রবর্তী বাহিনীর বেশীর ভাগ লোক ছিল মক্কার নওমুসলিম যুবক। আর ছিল দু হাজার তুলাকা, (নযরবন্দী) যারা তখন পর্যন্ত ইসলামই গ্রহণ করে নি।

২। তীর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে হাওয়াযিন গোত্র ছিল সমগ্র আরবের মধ্যে সব চাইতে সিদ্ধহস্ত।

৩। শত্রুরা প্রথমেই যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে সেখানকার সুবিধাজনক জায়গাটি দখল করে নিয়েছিল। উপরন্তু তারা পাহাড়ের ঘাটি, গুহা এবং গোপন স্থানসমূহে তাদের তীরন্দাযদের মোতায়েন করে রেখেছিল।

৪। যুদ্ধক্ষেত্র এমনি নিম্নমুখী ছিল যে, সেখানে ঠিকমত পা জমিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছিলো না।

৫। অগ্রবর্তী বাহিনী বিশৃঙ্খল অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করায় সমগ্র বাহিনীর মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।[৮]

টীকা ঃ

১। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ৪৮৬ (মুসনাদে ইবনে হাম্বলের বরাত)।

২। ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পৃষ্ঠা - ৪৪০।

৩। আল বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া ঃ চতুর্থ খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ৩২২।

৪। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ঃ চতুর্থ খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ৩২২।

৫। নাখলাতুল ইয়ামানিয়াহ এবং কারন দুটি প্রসিদ্ধ স্থান। কারন হচ্ছে নাজদ্বাসীদের মীকাত। এটা হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে হযরত উয়ায়স কারনীর বাসস্থান ছিল। মালীহ্, বাহরাতুর রাগা, লিইয়াহ, নাখব প্রভৃতি স্থানও তায়েফের নিকটে অবস্থিত। 'সফরনামা-ই-আরযুল কুরআন' অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর যুগের তায়েফ এবং বর্তমান তায়েফ নগরীর মধ্যে দু আড়াই মাইলের দূরত্ব রয়েছে।

৬। 'যাতে আনওয়াত' একটি বৃক্ষের নাম, যার মধ্যে জাহেলিয়া যুগের আরবরা তাদের হাতিয়ার ঝুলিয়ে রাখত। এরপর পুরো দিন সেখানে অবস্থান করত এবং এ উপলক্ষে পশুও বলি দিত।

৭। ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পৃষ্ঠা - ৪৪২।

৮। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ৪৮৮।

হুনায়ন যুদ্ধ–২

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۔

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন বহুক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে।" (৯;২৫)

যে সব সাহাবী অবিচলিত ছিলেন

যে সব সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে অবিচলিত ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা এতই কম ছিল যে, তাঁদের নাম বিভিন্ন রিওয়ায়াতের মাধ্যমে ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়ে আছে। তাঁরা হচ্ছেন হযরত আবূ বকর (রা), উমর (রা), আলী (রা), আব্বাস (রা), ফযল বিন আব্বাস (রা), কুছুম বিন আব্বাস (রা), উসামা বিন যায়দ (রা),আয়মান বিন উবায়দ (রা) (উম্মে আয়মনের জেষ্ঠপুত্র), মুগীরা বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব (রা) এবং তার পুত্র জাফর এবং রাবীআহ্ (রা)। দেখা যাচ্ছে, আবূ বকর (রা) এবং উমর (রা) ছাড়া বাকী সবাই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এরই বংশের লোক। উসামা (রা) এবং আয়মন (রা) কেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরই বংশের লোক বলে গণ্য করা হত। মুগীরা বিন হারিছ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাদা খচ্চরের জিনের পেছনের অংশ শক্ত করে ধরে নীরবে তাঁর সাথে চলছিলেন। আর আব্বাস (রা) এর হাতে ছিল খচ্চরের লাগাম।

হযরত আনাস (রা)-এর মাতা উম্মে সুলায়মান (রা)-ও ছিলেন ঐ অবিচলিত ব্যক্তিবর্গের অন্যতমা। তিনি তাঁর স্বামী আবূ তালহা (রা) এর সাথে যুদ্ধে এসেছিলেন। তিনি তাঁর কটিদেশ চাদর দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে ছিলেন এবং উটের লাগাম টেনে ধরে তার নাসারন্ধ্রের মধ্যে আপন হাতের অংগুলি ঢুকিয়ে রেখেছিলেন, যাতে সে বেসামাল হয়ে না যেতে পারে। তিনি একটি খঞ্জর সাথে রেখেছিলেন, যাতে কোন মুশরিক নিকটে এলে তার পেট ফেড়ে দিতে পারেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا
ج وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ ۔

"এরপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সেনাবাহিনী অবতীর্ণ করেন, যা তোমরা দেখতে পাও নি এবং তিনি কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। আর এটাই কাফিরদের কর্মফল।" - (৯:২৬)

শত্রুদের পলায়ন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আব্বাস (রা)-কে বলেন, তুমি হাঁকিয়ে বলো –

يامعشر الانصار يامعشر اصحاب الشجرة ۔

"হে আনসারের দল, হে ঐ সব লোক, যারা হুদায়বিয়ার বৃক্ষের ছায়াতলে বায়'আত করেছিলে।" এরূপ ইবনে হিশাম থেকে বর্ণিত আছে। কিন্তু 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাঁকিয়ে যে কথা বলতে বলেছিলেন তা হলো -. يا اصحاب الشجرة -"হে বৃক্ষের ছায়াতলে বায়'আতকারীরা।"

এই আওয়াজ যার কানেই গিয়েছে সেই 'লাব্বায়কা, লাব্বায়কা' (আমি হাযির, আমি হাযির) বলে উটের মোড় ঘুরিয়ে ছুটে আসতে শুরু করেছে। যে তার উটের মোড় ঘুরাতে পারে নি, সে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে উট থেকে লাফিয়ে পড়েছে এবং উট ছেড়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দিকে ছুটে আসতে শুরু করেছে। এভাবে মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ উৎসর্গকারীদের একটি দল হুযূর (সা) এর কাছে সমবেত হয়ে যায় এবং সম্মিলিতভাবে শত্রুদের উপর এমন জোর হামলা চালায় যে,শত্রুরা তাদের মাল আসবাব ও পরিবার পরিজন সেখানে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। দুরায়াদ বিন সিম্মাহ সত্য কথাই বলেছিল, যার পা টলে যাবে তাকে কোন কিছুই রুকে রাখতে পারবে না। সত্যি সত্যি পলায়ণকালে কেউ কারো ধন সম্পদ কিংবা পরিবার-পরিজনের দিকে লক্ষ্য করল না। ফলে সব কিছুই মুসলমানদের দখলে এসে গেল।

পলায়নকারীদের মধ্যে কেউ কেউ আওতাসের দিকে আবার কেউ কেউ তায়েফের দিকে ছুটতে লাগলো। হাওয়াযিনের সর্ববৃহৎ নেতাও তাদের অন্যতম। বনূ উমায়রাহ্ নাখলার দিকে পলায়ন করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবনের ব্যবস্থা করেন।

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এর চাচা আবূ 'আমির আশ'আরী (রা) আওতাসের দিকে যেতে আদিষ্ট হন। তিনি অনেক লোককে হত্যা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সালামাহ্ বিন দুরায়দের তীরের আঘাতে ভয়ানকভাবে আহত হন এবং প্রায় সংগে সংগেই শাহাদত বরণ করেন। আবূ 'আমির (রা) মৃত্যুর পূর্বে আপন ভাতিজা আবূ মূসা আশ'আরী (রা) কে আপন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন এবং তাঁকে বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে আমার জন্য দু'আর আবেদন পেশ করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ 'আমিরের জন্য বিশেষভাবে দু'আও করেছিলেন।

দুরায়দ বিন সিম্মাহ্ও নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাখলাতুল ইয়ামানিয়াহ্,কারন, মুলায়হ, বুহরাতুর রাগা এবং লিইয়াহ হয়ে তায়েফে গিয়ে পৌছেন। মালে গনীমত হুনায়ন থেকেই জা'রানা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

হুনায়নের শহীদবৃন্দ

হুনায়ন যুদ্ধে নিম্নলিখিত সাহাবীগণ শাহাদত বরণ করেন।

১। আয়মন বিন উবায়দ (রা) – মায়ের দিক থেকে উসামা (রা) এর ভাই।

২। ইয়াযীদ বিন যাম'আ – ঘোড়া থেকে পড়ে শহীদ হন।

৩। সুরাকা বিন হারিছ – আনসারী।

৪। আবু 'আমির আশ'আরী – আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এর চচা।

করুণার নিদর্শন

এই যুদ্ধের অব্যবহিত পর একটি জায়গায় অনেক লোক জড় হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিক দিয়ে যাবার সময় বললেন, এখানে কি? নিবেদন করা হলো, খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) এর হাতে একটি স্ত্রীলোক নিহত হয়েছে এবং এখানে তার লাশ পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আপন সঙ্গীদের মধ্য থেকে কোন একজনকে নির্দেশ দিলেন, খালিদের সাথে সাক্ষাত করে বলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিশু, স্ত্রীলোক এবং পারিশ্রমিকের উপর যারা কাজ করে তাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।[১] যুদ্ধের মধ্যে হত্যা ও খুনাখুনি নিষিদ্ধ নয়। ঐ সমস্ত লোককে তো অবশ্যই হত্যা করা যায়, যারা অস্ত্র ধারণ করেছে এবং মুকাবালা করার জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে। কিন্তু স্ত্রীলোক শিশু কিংবা সেই সব মজুরকে হত্যা করা তো বৈধ হতে পারে না, যারা তাদের নিজের কাজের জন্য দায়ী নয় কিংবা

অস্ত্র ধারণ করে মুকাবালা করার যোগ্যও নয়। কেননা যুদ্ধ করা তো ইসলামের মূল লক্ষ্য নয়। কিন্তু কোন কোন সময় ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা কিংবা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ না করে উপায় থাকে না। এতদ্‌সত্ত্বেও যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এবং এর নির্দয় ব্যবহার যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করতে হবে। অন্যান্য ধর্মের নেতৃবৃন্দ, যেমন- রাহিব, পাদ্রী এবং এমন প্রত্যেকটি লোককেও ইসলাম হত্যার আওতা বহির্ভূত রেখেছে, যারা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মুকাবালা করতে আসে নি। অর্থাৎ যারা আপন কর্তব্যকর্মের আওতা থেকে বের হয়ে যুদ্ধের আওতায় আসে নি তাদেরকেও হত্যা করা যাবে না।

শাইমা বিনতে হারিছ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দুধ মা হালীমা (রা) এবং তাঁর স্বামী হারিছ বিন আবদুল উয্যার শাখা গোত্র বনূ সা'দ বিন বকর এর আওতাভুক্ত ছিল। অতএব বন্দীদের মধ্যে শাইমা বিনতে হারিছও ছিলেন অন্যতম।[২] এই শাইমা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দুধ বোন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে হাযির হয়েই বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি আপনার দুধ বোন। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি তাঁর পিঠের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে একটি দাগের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, শিশুকালে একবার আপনি আমার পিঠে দাঁত দিয়ে কামড় দিয়েছিলেন,যার চিহ্ন এখনো বাকি আছে। মরহুম মাওলানা শিবলী বলেন - .

"অত্যধিক খুশীর কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চোখ অশ্রুতে ভরে উঠে। তিনি তাঁর বসার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দেন, তাঁর সাথে স্নেহ ভালবাসার অনেক কথা বলেন, কয়েকটি উট ও বকরী দান করেন এবং বলেন, যদি তোমার মন চায় আমার ঘরে গিয়ে থাকতে পার, আর যদি নিজের ঘরে চলে যেতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই সেখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে।" শাইমা তাঁর বংশের লোকদের মায়ার টানে নিজের ঘরে চলে যেতে চান। অতএব তাঁকে সসম্মানে সেখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়।[৩]

তায়েফ অবরোধ

হুনায়ন যুদ্ধের পর তায়েফ অবরোধ করা হয় এবং সে অবরোধ বিশ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবরোধের মেয়াদ আর বাড়ানোর প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাই এই দু'আ করে অবরোধ তুলে নেন-

اللهم اهد ثقيفا وأت بهم .

"হে আল্লাহ্,তুমি ছাকীফকে হিদায়াত করো এবং তাদেরকে আমার কাছে হাযির হওয়ার তাওফিক দাও।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এই দু'আ কবুল হয়। অর্থাৎ ছাকীফ গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দরবারে পৌঁছে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। ইসলামী ইতিহাসের পতায় পাতায় ছাকীফ গোত্রের ঐসব নও-মুসলিম যুবকের অনেক বীরত্বপূর্ণ কহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে, যারা অবরোধ তুলে নেওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

তায়েফের শহীদবৃন্দ

তায়েফ অবরোধকালে যারা শাহাদত বরণ করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১। সায়ীদ বিন সায়ীদ বিন আল 'আস।

২। উরফুতা বিন খাব্বাব।

৩। আবদুল্লাহ্ বিন আবী উমাইয়া [উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর ভাই।]

৪। আবদুল্লাহ্ বিন আমির।

৫। সায়িব বিন হারিছ।

৬। আবদুল্লাহ্ বিন হারিছ (সায়িব বিন হারিছের ভাই)।
৭। জুলায়হা বিন আবদুল্লাহ্।
৮। ছাবিত বিন আল জাযা'।
৯। হারিছ বিন সাহ্‌ল।
১০। আল মুনযির বিন আবদুল্লাহ্।
১১। রুকায়ম বিন ছাবিত।
১২। বুজায়র বিন যুহায়র।

মালে গনীমতের পরিমাণ ও বন্দীদের সংখ্যা

হুনায়ন যুদ্ধে মালে গনীমতের পরিমাণ এবং বন্দীদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

স্ত্রীলোক ও শিশু	–	ছয় হাজার
উট	–	চব্বিশ হাজার
ভেড়া-বকরী	–	চল্লিশ হাজার
রৌপ্য	–	চার হাজার আওকিয়া

হাওয়াযিনের প্রতিনিধি দল

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর উমরা আদায় করেন। এপর জা'রানা যান। যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার জন্য হাওয়াযিনের যে প্রতিনিধিদলের অপেক্ষা করা হচ্ছিলো, তারা ইতিমধ্যে এসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দুধমা হালমী সায়িদা ছিলেন হাওয়াযিনেরই একটি শাখা গোত্রের লোক। তাই প্রতিনিধিদলের নেতা, ঐ দুগ্ধ সম্বন্ধের বরাত দিয়ে বলে, বন্দী স্ত্রীলোকদের মধ্যে আপনার ফুফু এবং খালারাও রয়েছে। যদি আরবের বাদশাহদের কেউ আমাদের কোন গোত্রের কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করত তাহলে তাঁর কাছ থেকেও আমরা অনেক কিছু আশা করতাম। আর আপনার কাছ থেকে তো আমরা তার চাইতেও বেশী কিছু আশা করি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, আবদুল মুত্তালিব বংশের অংশ তো আমি ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু সাধারণ তথা পাইকারী মুক্তির জন্য এই উপায় অবলম্বন করতে হবে যে, সালাতের সময় যখন সকল লোক সমবেত হবে তখন তাদের কাছে এ দরখাস্ত পেশ করতে হবে।

অতএব যুহর সালাতের পর যখন দরখাস্ত পেশ করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি তো শুধু আমার বংশের পক্ষ থেকে কথা বলার ইখতিয়ার রাখি। কিন্তু আমি সকল মুসলমানের কাছে প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে সুপারিশ করছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর একথা শুনতেই সকল মুহাজির ও আনসার নিজ নিজ অংশ ছেড়ে দেন। ফলে হাওয়াযিনের সকল স্ত্রীলোক এবং শিশুরা মুক্তি লাভ করে।

গনীমত বন্টন

গনীমতের মাল বন্টনের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামের প্রতি মক্কার নওমুসলিমদের চিত্ত আকর্ষণের জন্য তাদেরকে বড় অংশ দান করেন। তিনি আবূ সুফয়ান ও তাঁর পুত্রদেরকে তিনশ উট, হাকিম বিন হাযামকে দু'শ উট, এছাড়া আরো আট ব্যক্তিকে এক শ করে উট দান করেন। যোদ্ধাদের প্রত্যেককে চার উট এবং চল্লিশ বকরী দান করা হয়। অবশ্য সওয়ারীদেরকে এর চাইতে কিছু বেশী দান করা হয়।

আনসারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ

মক্কাবাসীদেরকে মালে গনীমত থেকে বিশেষ অংশ দান করার ব্যাপারটি কোন কোন আনসার যুবকের কাছে আপত্তিকর ঠেকে, এমন কি কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে এ সম্পর্কে অভিযোগও পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আসারদেরকে একটি তাঁবুতে একত্রিত করে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন–

এটা কি সত্য নয় যে, তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন? এটা কি সত্য নয় যে, তোমরা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলে এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করেছেন? এটা কি সত্য নয় যে, তোমরা গরীব ছিলে এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ধনী করেছেন?

আসারগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে বলছিলো, "নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, "তোমরা এর উত্তরে কেন বলছ না যে,হে মুহাম্মদ,যখন সব লোক তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছিলো, তখন কি আমরা তোমাকে সত্য বলে মেনে নেই নি? যখন তোমাকে তোমার ঘর ও মাতৃভূমি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তখন কি আমরা তোমাকে আশ্রয় দেই নি? তুমি যখন অভাবগ্রস্ত ছিলে তখন কি আমরা তোমাকে সাহায্য করি নি? আমি তোমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে বলে যাব, 'হ্যা, তোমরা সত্যি বলছ।"

"হে আনসার, তোমরা হচ্ছ আমার 'শিআর' (কাপড়ের সেই পাল্লা, যা দেহের সাথে যুক্ত থাকে) আর অন্য লোকেরা হচ্ছে 'দিছার' (কাপড়ের ঐ পাল্লা, যা শি'আরের উপর থাকে, অর্থাৎ দেহের সাথে যুক্ত থাকে না)। হে আল্লাহ্, তুমি আনসারের উপর দয়া কর, আনসারের বংশধরের উপর দয়া কর এবং বংশধরের বংশধরদের উপর দয়া কর।"

"হে আনসার, এটা কি তোমাদের পসন্দ নয় যে, অন্যান্য লোকেরা উট ও বকরী নিয়ে তাদের ঘরে ফিরে যাক, আর তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাও মুহাম্মদকে নিয়ে?"

আনসাররা তখন চীৎকার দিয়ে বলে উঠে, (অন্য কিছু নয়, বরং) "আমাদের শুধু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এরই প্রয়োজন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সংসর্গ

মূলত: কোন কোন আসারের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, (মক্কা বিজয়ের পর) এখন আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় যাবেন না, বরং মক্কায়ই থেকে যাবেন। এ কারণে তাদের মন দারুণভাব মুষড়ে পড়েছিল। আর এরই ফলশ্রুতিতে তাঁদের মুখে এমন একটি কথা এসে গিয়েছিল, যার সাথে তাদের মনের কথার কোন মিল ছিল না। কেননা তাঁরা এতদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুহাজিরদেরকে তাঁদের সবকিছু বিলিয়ে দিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় বাইরের মাল অন্যরা বেশী পেলে তাঁদের তো মনক্ষুণ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। তাঁরা যে কারণে চিন্তিত ও হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তা এই যে,তাঁদের প্রিয় নবী (সা) বুঝি আর মদীনায় যাবেন না এবং তাঁরা তাঁর পুণ্য সংসর্গ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবেন। উল্লেখিত অভিযোগে তাঁদের এই চিন্তা ও হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল মাত্র। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের অন্তরের এই কথাটি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর খুতবায় বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, সবাই সব কিছু নিয়ে যাক, কিন্তু আমি তোমাদেরই আছি ও তোমাদেরই থাকব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর একথায় আনসারদের মনের সব দুঃখ ও সব গ্লানি নিমিষের মধ্যে মুছে গিয়েছিল। কেননা তাঁরা যা ছাচ্ছিলেন (রাসূলের সংসর্গ) তা তো নিশ্চিতভাবেই পেয়ে গেছেন। অতএব এখন আর কারো বিরুদ্ধে তাঁদের কোন অভিযোগ নেই।

বলা বাহুল্য জা'রানা মালে গনীমত বন্টনের সময় চিত্ত আকর্ষণের জন্য যাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছিলেন, তারা তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সুহ্বাত ও সংসর্গে সেই স্বাদ ও সেই মোহনীয়তা মোটেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি, যা পেরেছিলেন আনসার ও মদীনায় বসবাসকারী মুহাজিররা। আর একারণেই যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা দেন যে, আমি আনসারদের সাথে আছি; তখন তাঁদের অন্তরে যে দুঃখ, ব্যথা ও হতাশা বিরাজ করছিলো, তা ধুয়েমুছে একেবারে পরিস্কার হয়ে যায় এবং তাঁরা তাঁদের অন্তরে লাভ করেন চির প্রশান্তি।

টীকা ঃ

১। ইবনে হিশাম ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পৃষ্ঠা - ৪৫৮।

২। তারীখে ইবনে হিশাম-এ শাইমার নাম হুযদা, আল ইসাবা-এ হুযামা এবং তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এ জুদামা বলা হয়েছে।

৩। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ৪৯০।

ঈলা' ও তাখ্য়ির

এ ঘটনাটি হিঃ ৯ সনের প্রথম দিকে (এপ্রিল ইং ৬৩০ সনে) তাবূক যুদ্ধের পূর্বে ঘটে । এই ক্রম ধারায় বেশ কয়েকটি ঘটনাই ঘটেছিল, যেমন মরহুম মাওলানা তাঁর মূলপ্রবন্ধে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে সেগুলোর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

আমি মূল প্রবন্ধ থেকে একটি দীর্ঘ রিওয়ায়াতের আরবী 'মতন' (বচন) বাদ দিয়েছি। কেননা মাওলানা সাহেব উক্ত রিওয়ায়াতের সারমর্ম পুথক ভাবে বর্ননা করেছেন। এমতাবস্থায় আরবী মতন এই সাথে যোগ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি নি। তবে পাঠক বর্গের বুঝার সুবিধার্থে অনেক স্থানে স্থানে উপশিরোনামের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছি। এ প্রবন্ধ টি ইং ১৯১৪ সনের 'আল হিলাল' এ পর পর চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ঈলা ও তাখ্য়ির–১

ঈসায়ী প্রভাবিত জনৈক ব্যক্তির জিজ্ঞাসা ও হাদীস অস্বীকার প্রসঙ্গ

ব্যাখ্যার জন্য অনুরোধ [গোলাম সারওয়ার শাহ্-এর পক্ষ থেকে]

হযরত মাওলানা সাহেব, আসসালামু আলাইকুম। আমার এক যুবক বন্ধু (এখন যার নাম উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি না এবং সম্ভবত: তার বংশ সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন) এখন খ্রীষ্টান মিশনারীদের ফাঁদে আটকা পড়েছে এবং ধীরে ধীরে তাকে ইসলামের দিক থেকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলা হচ্ছে। সে প্রতিদিন তার খ্রীষ্টান বন্ধুদের কাছ থেকে কোন না কোন প্রশ্ন শিখে আসে এবং আমাদের কাছে তার উত্তর চায়। লন্ডনে মুদ্রিত উর্দূ টাইপের একটি পুস্তক তাকে দেওয়া হয়েছে এবং ঐ পুস্তকটিকে তার প্রাণের রক্ষাকবচ হিসাবে সব সময় নিজের সাথে রাখে। তাতেও এ ধরনের অনেকগুলো প্রমাণ একত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আল্হামদু লিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র), আজ পর্যন্ত তার প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই দাঁতভাঙ্গা উত্তর দিয়েছি এবং আজ পর্যন্ত ঐ সব উত্তরের কোন প্রতিউত্তর সে নিয়ে আসেত পারেনি। অবশ্য সে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে, জ্ঞান ও অবগতির স্বল্পতা হেতু, আমি সেসম্পর্কে তাকে সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে পারি নি। কিন্তু যেহেতু হাদীসের বরাতের ভিত্তিতে সে আমার কাছে ঐ ঘটনাটি বর্ণনা করেছিল তাই আমি পরিস্কার বলে দিয়েছি যে, আমি শুধুমাত্র তোমার ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য যা কুরআন মজীদের ভিত্তিতে করা হবে। কেননা কুরআন মজীদই হচ্ছে আমাদের যাবতীয় ই'তিকাদ ও ইবাদতের আসল ও একমাত্র পুঁজি। হাদীসের কোন 'ইয়াকীনী দরজা' (বিশ্বাসগত আবশ্যিক-মর্যাদা) নেই। অতএব এ ব্যাপারে আমাদের কোন দায়দায়িত্বও নেই। এই সোনালী নীতিটিকে মরহুম স্যার সাইয়িদ আহমদ খান 'খুতবাতে আহমদিয়া' এবং 'তাহযীবুল আখলাক' প্রবন্ধমালায় একটি মূলনীতি হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। আমার একথার জবাবে তার খ্রীষ্টান বন্ধু তাকে এই জবাব শিখিয়ে দিয়েছে যে, কুরআন মজীদেও এর উল্লেখ রয়েছে।

ওরা হযরত রাসূল আকরাম (সা) সম্পর্কে বলেছে যে, একটি মিসরীয় স্ত্রীলোক তাঁর হস্তগত হয়েছিল এবং তিনি ওকে দাসী হিসাবে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। একদিন তিনি ওর সাথে নির্জনবাসে ছিলেন এমন সময় তাঁর একজন স্ত্রী সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং ব্যাপারটির জন্য তাঁকে খুব তিরষ্কার করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এজন্য ক্ষমা চেয়ে নেন এবং বলেন, তুমি একথাটি অন্য কোন স্ত্রীর কাছে বলবে না। কিন্তু তিনি তা বলে দেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সকল স্ত্রী থেকে এক মাস পর্যন্ত একদম আলাদা থাকেন। তিনি এজন্য এতই শোকাহত হন যে, পুরো এক মাস আপন কুটীর থেকে মোটেই বের হন নি।

সে বলে, এই ঘটনাটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে রয়েছে এবং এর উপর ভিত্তি করেই সে প্রশ্ন তুলেছে, এমন চরিত্র কি নবীদের হতে পারে? আমি আমাদের এখানকার কিছু সংখ্যাক আলিমকে জিজ্ঞাসা করেছি। তারা উত্তরে বলেন, হ্যাঁ নিঃসন্দেহে এ ধরনের ঘটনা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতেও আছে। এরপর আমি জনাব ---- কে লিখি। তিনিও এটা সত্য বলে আমাকে জানিয়েছেন। এখন আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন, -আল্লাহ্র দিকে চেয়ে আপনি আপনার সামান্য কিছু সময় ব্যয় করে আমাকে আসল ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত করুন। বরং এ উত্তরটি আপনি

'আল হিলাল'-এ প্রকাশ করুন যাতে এর মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম সমাজ আসল ব্যাপারটি জানতে সক্ষম হয় এবং বিরুদ্ধপক্ষের পাতানো ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। আমি হাদীস সম্পর্কে যে নীতি নির্ধারণ করেছি এবং আমার বিরুদ্ধ পক্ষের সামনে পেশ করেছি তা আপনি সমর্থন করেন কিনা, সে সম্পর্কেও অনুগ্রহপূর্বক লিখবেন।

উত্তর

মূল বর্ণনার বিষয়বস্তু

১. আপনি যে পুস্তকটি আপনার করুণার পাত্র বন্ধুটির হাতে দেখেছেন তা সম্ভবত: পাদ্রী ইমাদুদ্দীনের লেখা 'মীযানুল হক' ইত্যাদি ধরনের কোন পুস্তক হবে, যা লন্ডনে মুদ্রিত হয়েছিল। 'ইযালাতুল আওহাম', 'ইসতিফ্সার', 'লিসানুস্ সিদ্ক্', 'ইজহারুল হক' প্রভৃতি হচ্ছে ঐ সমস্ত পুস্তকেরই উত্তর। কিন্তু আপনি যে ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন তার সাথে ঐসব পুস্তকের কোন সম্পর্ক নেই।

২. যে ভাষায় এবং ভঙ্গিতে আপনার বন্ধু ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কাহিনী ছাড়া কিছু নয়। আপনি বিষয়টি আগাগোড়া অস্বীকার করুন এবং তার কাছে এর প্রমাণ পেশ করতে বলুন। যে উলামা বৃন্দ এ ঘটনাটি সত্য বলে আপনাকে বলেছেন, তাদের সম্পর্কে আমি এছাড়া আর কী বলতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর করুণা করুন। এ ধরনের আপন লোকের অস্তিত্ব, শত্রুদের অস্তিত্বের চাইতেও অধিক বিপজ্জনক।

فنعوذ بالله من شر الجهل والجاهلين .

"আমি মূর্খতা ও মূর্খদের অনিষ্ট হতে আল্লাহ্র শরণ নিচ্ছি।"

৩. অবশ্য বর্ণিত ঘটনাটি যদি বিবেচনায় না আনা হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে, মূল ঘটনাটি ঈলা ও তাখয়িরের কোন কোন রেওয়াতের একটি বিকৃত রূপ ছাড়া কিছু নয়। আর যে মিসরীয় দাসীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা দ্বারা মারিয়া কিবতিয়াকে বুঝানো হয়েছে। নিঃসন্দেহে 'সিয়ার ও তাফাসীর' এর মধ্যে কোন কোন রিওয়ায়াত এমন আছে, যা দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কোন কোন স্ত্রীর খাতিরে মারিয়া কিবতিয়াকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন এবং হযরত হাফসা (রা) অথবা হযরত যায়নাব (রা)-কে বলেছিলেন, তুমি এ ঘটনার কথা কাউকে বলবে না। কিন্তু তিনি তা হযরত 'আইশা (রা)-এর কাছে বলে দেন এবং এর উপর সূরা তাহ্রীমের আয়াতগুলো নাযিল হয়।

কিন্তু প্রথমত: আপনার বন্ধুর ঈসায়ী শিক্ষকের একথা বলা যে, এ ঘটনাটি কুরআন করীমেও রয়েছে একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা। কুরআন করীমে এ ধরনের কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয় নি, বরং শুধু একটি গোপন কথার উল্লেখ কর়া হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কোন না কোন স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করেছিলেন এবং স্ত্রী অন্যের কাছে তা বলে দিয়েছিলেন। এরপর এ প্রসঙ্গে যে সব রিওয়ায়াত বর্ণনা করা হয়েছে, হাদীসের নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থেই সেগুলোর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সহীহ্ গ্রন্থাদির নিকাহ, তালাক, ঈলা ও তাখ্য়িরের কোন অধ্যায়েই এগুলোর কোন বর্ণনা নেই। আর তাবারী প্রভৃতিতে এগুলোর উল্লেখ থাকাটা তার সহীহ হওয়ার কোন দলীল নয়, যতক্ষণ না হাদীসের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী তা প্রমাণিত হয়। এছাড়াও আরো অনেক কারণ বিদ্যমান আছে, যে গুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ জাতীয় রিওয়ায়াত বানোয়াট এবং অনির্ভরযোগ্য। বিষয় বিশেষজ্ঞদের অভিমতও তাই, যা আল্লাহ্ চাহে তো শীঘ্রই বর্ণনা করা হবে।

কিন্তু আপনি এই সাথে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও আদর্শিক বিষয় যথা–হাদীসকে স্বীকার অথবা অস্বীকার করার প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন, যার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করতে হলে তো একটি পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধই লিখতে হবে। অবশ্য মূল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে মোটামুটিভাবে এ সম্পর্কে কিছু বলছি।

ইসলামের উপর আপত্তি উত্থাপনকারীদের মৌলিক বিভাগ

ইসলামের শত্রু তথা বিরুদ্ধবাদীরা ইসলাম ও দায়ী'য়ে ইসলাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) সম্পর্কে যে সব আপত্তি উত্থাপন করেছেন – চাই তারা আজকের পাদ্রী ইমাদুদ্দীন, পাদ্রী ফন্ডার, স্যার উইলিয়াম মুইর, মারগোলিত প্রমুখ হোন, অথবা আজ থেকে শত শত বছর পূর্বে যারা ইসলাম সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন এবং যাদের জওয়াব ইবনে হাযাম তাঁর আল-মিলাল ওয়ান্ নিহাল' এর মধ্যে, গাযালী তাঁর তুহ্ফাতুল আরীব' এর মধ্যে, ইবনে তাইমিয়া তাঁর 'আল জাওযাবুস্ সাহীহ্' এর মধ্যে এবং আরো অনেকে তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে দিয়েছেন – তারা যে হোন, তাদেরকে দু'টি মৌলিক ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(ক) ঐসব আপত্তি, যা বিষয়কে না বুঝার কারণে কিংবা বুঝে মূল বিষয়কে ঘোলাটে করার কারণে কিংবা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে উত্থাপন করা হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত জিহাদ, তালাক ইত্যাদি সম্পর্কিত আহকাম সম্পর্কে যে সব আপত্তি উত্থাপন করা হয় কিংবা কুরআন ও পবিত্র গ্রন্থাদির বর্ণনা সমূহের মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে যা কিছু বলা হয়, সেগুলোর ভিত্তি একটি সঠিক ও প্রকৃত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিশ্চিতভাবে তা আহকামে কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু হয় এগুলো সম্পর্কে ঈর্ষাবশত: অথবা মূর্খতাবশত: ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে গেছে কিংবা জেনে শুনেই এগুলো রদ ও বাতিল করার চেষ্টা করা হয়েছে, যার অস্তিত্ব সে অস্বীকার করে না, কিন্তু যে কারণ ও যে প্রমাণের ভিত্তিতে দোষারোপ করা হয়েছে সেগুলোকে অস্বীকার করে এবং বাতিল বলেও ঘোষণা করে।

(খ) কিংবা ঐ সব আপত্তি, যার ভিত্তি না কোন ইসলামী শিক্ষার উপর, না ইসলামের সমর্থিত কোন ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত, আর না খোদ কুরআন মজীদে এগুলোর অস্তিত্ব আছে, আর না আছে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হাদীস সমূহে। এগুলোর ভিত্তি শুধুমাত্র ঐ সব বর্ণনা ও রিওয়ায়াতের উপর গড়ে উঠছে, যেগুলোকে কোন কোন মুসলমান গ্রন্থকার তাদের গ্রন্থাদির মধ্যে কোন না কোনভাবে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছেন কিংবা যেগুলোকে মুসলমানদের কাছে ব্যাপক ভিত্তিতে বর্ণনা করা হয় কিংবা যেগুলো গুজবের আকারে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন গিরনীক (সারস জাতীয় এক ধরনের জলজ পাখী)-সমূহের কাহিনী, হযরত যায়নাব (রা) এর ঘটনা ইত্যাদি কিংবা মারিয়া কিবতিয়ার এই ঘটনা যা আপনার বন্ধুর সামনে অতি বিশ্রী ও কদর্যরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই দুই জাতের আপত্তি ছাড়া আরো অনেক জাতের আপত্তি আছে, যা শুধুমাত্র অপবাদের পর্যায়েই পড়ে। যেমন সালীবী (ক্রুসেড) যুদ্ধ সমূহ চলাকালে প্রাচ্যের পাদ্রীরা মুসলমানদের উপর মূর্তিপূজার দুর্ণাম রটিয়ে দিয়েছিল এবং যেগুলো মোসিও কাস্ত্রী তার 'ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন কিংবা বর্তমানকালেও এমন ধরনের শত শত কথা ইসলামের প্রতি সম্পর্কিত করা হয়, যা ইসলামী কোন রিওয়ায়াত মোটেই সমর্থন করে না। এই সব আপত্তি শুধুমাত্র শত্রুতা, বিদ্বেষ ও মিথ্যা রটনার ফলশ্রুতি এবং এই প্রেক্ষিতে বিবেকবান আপত্তি উত্থাপনকারীরাও এগুলোকে সমর্থন করেন না। যারা এই সব আপত্তি উত্থাপন করে তাদের উদ্দেশ্য, আপত্তি উত্থাপন করা নয়; বরং প্রতিপক্ষের দুর্ণাম রটানো এবং তাদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।

সবচেয়ে ভয়ংকর আপত্তি

যারা প্রতিপক্ষের এবং আপত্তি উত্থাপনকারীদের গ্রন্থাদি সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করেছেন তারা স্বীকার করবেন যে, আপত্তিসমূহের সিংহভাগ মূলতঃ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু সেগুলোর সংখ্যা খুবই কম এবং যারা ইসলামের শত্রু, তারা ইসলামকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার ক্ষেত্রে এগুলো থেকে খুব কম সাহায্যই পেয়ে থাকে। শত শত বই পুস্তক, যা ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে বা হচ্ছে, সেগুলো একটু অধ্যয়ন করুন, সেগুলোর উপর একবার নজর বুলিয়ে নিন দেখবেন, এর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক আপত্তি আছে, যা সরাসরি কুরআন করীমের শিক্ষা কিংবা নির্ভরযোগ্য ও ব্যাপকভাবে সমর্থিত হাদীসের উপর ভিত্তি করে উত্থাপন করা হয়েছে। দেখবেন ঐ সব

বইপুস্তক শুধুমাত্র সেই সব তিরস্কার ও দোষারূপে ভর্তি, যেগুলোর ভিত্তি মুফাসসিরীনের সাধারণ রিওয়ায়াত এবং সীরাত ও মাগাযীর সাধারণ কিতাবাদির কোন কোন বর্ণনার উপর ভিত্তিশীল। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ঐ দোষারূপকারীরা যেন এ কথাটি শাস্ত্রনীতি হিসাবে মেনে নিয়েছেন যে, যে কোন মুসলমান গ্রন্থকার তার গ্রন্থে যা কিছু লিখেছেন তা যেন ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের জন্য এক একটি অকাট্য দলীল ছাড়া কিছু নয়।

ইসলামের শত্রুদের সবচেয়ে জঘন্য ধরনের ইবলিসী অপচেষ্টা এই যে, তারা 'দায়ী'য়ে ইসলাম' (ইসলামের প্রতি আহবানকারী) হযরতমুহাম্মদ মুস্তফা (সা) এর পবিত্র জীবনকে বিশ্ববাসীর সামনে এমন বিশ্রী ও কদর্যরূপে উপস্থাপন করতে চায়, যা দেখার সাথে সাথে যেন মানুষের অন্তর ঘৃণায় রি রি করে উঠে এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোন ভাল ধারণার সৃষ্টি না হয়।

এই লক্ষ্য প্রথম ধরনের কোন আপত্তি দ্বারা অর্জিত হতে পারে না। কুরআন করীমে জিহাদের নির্দেশ আছে, একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি আছে, তালাককে বৈধ বলা হয়েছে, আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক স্থানসমূহের উল্লেখ আছে, হযরত ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ) এর কা'বা নির্মাণের বিবরণ আছে, হযরত মারয়াম (আ) কে তাঁর তিরস্কারকারীগণ কর্তৃক 'ইয়া উখ্তা হারুন (হে হারূনের বোন) বলে সম্বোধন করার কথা আছে। আপত্তি উত্থাপনকারীরা এ সব বিষয়ের প্রতি কটাক্ষ করে ইসলামের ছিদ্রান্বেষণ করে, জিহাদের আহকামকে নিপীড়নমূলক আহকাম বলে আখ্যায়িত করে, একাধিক বিবাহ এবং তালাককে চারিত্রিক দিক দিয়ে দোষনীয় সাব্যস্ত করে, আদ ও সামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রমাণ চায়, হযরত ইবরাহীম (আ) যে কা'বার ভিত্তি স্থাপন করেছেন, তাওরাত থেকে তার দলীল অনুসন্ধান করে, হযরত মারয়াম (আ) এর প্রতি 'উখতে হারুন' সম্বোধন তাদের বুঝে আসে না। এতদ্সত্ত্বেও এই সব আপত্তি দ্বারা ইসলামের সৌন্দর্য ও প্রকৃষ্টতা পুরোপুরি ঢাকা পড়ে না, বরং শ্রবণকারীর জন্য এ জিনিসটি বাকী থেকে যায় যে, সে (ইসলামের) অন্যান্য হুকুম ও অন্যান্য শিক্ষা সম্পর্কে ভাল ধারণার সৃষ্টি করতে পারে কিংবা অন্যান্য কিছু কিছু ধর্মের সাথে মুকাবালা করে এ সম্পর্কে সান্ত্বনাও লাভ করতে পারে। হযরত মূসা (আ) তরবারি কাজে লাগিয়েছেন, হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান (আ) শত শত পত্নী রেখেছেন। যদি সম্বোধিত ব্যক্তিরা এই সব অভিযোগকে সঠিক বলে মেনে নেয় তবু বেশী থেকে বেশী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে যে, কুরআন করীম এবং এর পূর্ববর্তী পবিত্র গ্রন্থাদিকে একই স্তরে রাখা উচিত।

ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থা

কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের আপত্তি ও অপবাদ আপন বিদ্বেষ ও শত্রুতামূলক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেগুলোর মধ্যে ঐ জীবনেরই ছবি বিশ্রীরূপে আঁকা হয়, যে জীবন ইসলামী শিক্ষার বাহক ও প্রবর্তক এবং যার রিসালাত ও নুবুওয়াতের সত্যতার উপর কুরআন ও ইসলামের হাক্কানিয়াত (খাঁটিত্ব) নির্ভরশীল। এই ছবিটি হয় অত্যন্ত অপসন্দনীয় ও কদর্যপূর্ণ; যার ফলে কুফ্র ও পথভ্রষ্টতার শয়তান ইসলামের শত্রুদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে এবং এর আকার-আকৃতিকে আরো আকর্ষণীয় রূপে পেশ করে (আল্লাহর পানাহ্); মানবীয় অবাধ্যতা ও ঘৃণ্য আচরণের যাবতীয় কুকর্মকে এর মধ্যে একত্রিত করা হয় এবং এমন সব ফলাফল ও পরিণামকে এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়, যা মানবীয় অসৎ আচরণের একেবারে চরম পর্যায়ে পড়ে। নুবুওয়াতও রিসালাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ তো দূরের কথা, একজন ভদ্র ও সাধারণ গুণবান ব্যক্তির মধ্যেও এসব কুকর্ম ও আচরণাদির সমাবেশ ঘটতে পারে না। পবিত্র কুরআনের ভাষায় বলা যায় –

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ٠

"এভাবেই বিপথগামী হয় তারা, যারা আল্লাহ্র নির্দশনাবলীকে অস্বীকার করে।" - (৪০:৬৩)

আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় সাধারণভাবে ইসলাম সম্পর্কে যে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে রয়েছে, তা প্রধানত: এই সত্য গোপনের ও শয়তানী আচরণেরই ফলশ্রুতি। এই সব মিথ্যার বেসাতি দেখে ও অমূলক কথাবার্তা শুনে একজন সরলমনা সম্বোধিত ব্যক্তি এরূপ ইসলাম-বিদ্বেষী হয়ে উঠে যে, এর (ইসলামের) সৌন্দর্য ও প্রকৃষ্টতার ব্যাপারটি সে আর চিন্তাই করতে পারে না। ফলে তার সামনে সুধারণা ও সত্যানুসন্ধানের দরজা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়।

অতএব পকৃতপক্ষে প্রথম ধরনের আপত্তি ইসলামের জন্য ততটুকু ক্ষতিকর নয় যতটুকু ক্ষতিকারক দ্বিতীয় ধরনের আপত্তি। আজ ইসলামের শত্রুদের হাতে সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্র হচ্ছে এই সব মিথ্যা উদ্ভাবনা। কোন ধর্ম সম্পর্কে একথা বলা যে, তা তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে, শ্রবণকারীকে ততটুকু প্রভাবিত করতে পারবে না যতটুকু প্রবর্তক (নাউযুবিল্লাহ) আপন পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করতে দেখে তার প্রেমে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ওকে তালাকের মাধ্যমে ছাড়িয়ে এনে নিজেই বিবাহ করেছিলেন। এটি একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয়, যা আমি এখানে পেশ করছি। আজ পর্যন্ত এ বিষয়টির প্রতি খুব কমই দৃকপাত করা হয়েছে।

ইসলাহ ও ইজতিহাদের ফিতনা

এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রশ্ন যে, এ ধরনের আপত্তি ও অপবাদের সঠিক জবাবের পন্থা কি?

আমাদের যুগে সংস্কারক ও তাকির্কদের এমন একটি নতুন দল সৃষ্টি হয়েছে যারা নিজেদের প্রশংসনীয় সতর্কতা কাজে লাগিয়ে প্রথমে ঐ সব আপত্তি ও অপবাদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন। এরপর এগুলোর অপবিত্রতা থেকে ইসলামের আঁচল যে পবিত্র তা প্রমাণ করেছেন। তাঁদের এই চেষ্টা-চরিত্র নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তাঁরা যে জিনিসটিকে প্রতিরোধ করতে চাচ্ছিলেন সেজন্য তাদের চেষ্টা উদ্যম ছিল ঠিকই, কিন্তু সে চেষ্টাকে ফলবতী করার মত আসবাব ও উপাদান তাঁদের কাছে মোটেই ছিল না। তাঁদের মস্তিষ্ক কর্মচঞ্চল ও তাঁদের বোধশক্তি ইজ্তিহাদের তলবগার ছিল; কিন্তু তাঁদের কাছে জ্ঞান পরিমাপ করার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল না। না তারা বিষয় বিশেষজ্ঞ, আর না আসমানী ও অন্যান্য গ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখার মত ক্ষমতাবান। যেভাবে ইসলামের বিপক্ষ দল ইসলামের উপর নানা অভিযোগ উত্থাপনকালে নিজেদের মূর্খতার উপর নির্ভর করেছে; ঠিক তেমনি ইসলামের পক্ষের এই সব লোকেরাও ঐ সব অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের মনগড়া ইজতিহাদকেই যথেষ্ট বলে মনে করেছেন। যেহেতু এরা নিজেদের শক্তির কোন খবর রাখতেন না এবং শুধুমাত্র নিজেদের ব্যক্তিগত রায় ও অভিমতের উপর নির্ভরশীল ছিলেন; তাই তাঁরা বিপক্ষ দলের লম্ফঝম্প দেখে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং বিপক্ষ দলের আপত্তিকর রিওয়ায়াত ও বর্ণনার স্তূপ দেখে এমনভাবে বুদ্ধির খেই হারিয়ে ফেলেন যে, তাদের কাছে ঐ সব আপত্তি রদ বা প্রতিরোধ করার মত কোন কার্যকর শক্তি বাকি থাকে নি।

উল্লেখিত ভীতির মধ্যে তারা নিজেদেরকে একদম অক্ষম দেখতে পান এবং এছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকেনি যে, নিজেরা নিজেদের মত করে এমন কোন নীতি গড়ে নেবেন যার ভিত্তিতে, বিরুদ্ধ পক্ষ যে সমস্ত হাদীস ও রিওয়ায়াত নিজেদের দাবীর পক্ষে পেশ করেছে, সেগুলোর সত্যতাকে চোখ বন্ধ করে অস্বীকার করে বসবেন। ফলে ঐ সব অভিযোগের উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজনই আর বাকী থাকবে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তারা ঐ সব রিওয়ায়াতের মূল প্রকৃত অর্থ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করার পরিবর্তে উল্লেখিত ধরনের মুজতাহিদসুলভ নীতি উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন, যেগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করা হলে অভিযোগকারীদের ফিতনা থেকেও ইসলামের মধ্যে বড় এক ফিত্না মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। এ ধরনের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার অভিশাপ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।

হাদীস শাস্ত্রকে কমজোর মনে করার পরিণাম

যেমন তারা বিরুদ্ধ পক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তিসমূহ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে, ঐ পক্ষ হাদীস সাস্ত্রের যে বরাত দিয়েছিল সেগুলোর যথাযথ জবাব না দিয়ে সম্পূর্ণ হাদীস শাস্ত্রকেই দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বিষয় বলে ঘোষণা

করতে শুরু করলো। এমন কি তারা পরিষ্কার বলে দিল, যেহেতু বেশীর ভাগ হাদীস 'খবরে আহাদ' (যে হাদীসের কোন না কোন স্তরে মাত্র একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন) এবং 'খবরে আহাদ' দ্বারা কোন জিনিস অকাট্য হয় না; তাই হাদীস শাস্ত্রও মূলত: এমন কোন জিনিস নয় যে, সেগুলোর উপর আরোপিত প্রত্যেকটি আপত্তির জবাব দেবার দায়দায়িত্ব মুসলমানদের উপর বর্তাবে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এভাবে তারা একটি ফিত্না থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য নিজেদেরই অস্তিত্বকে এক জীবন্ত ফিত্নায় পরিণত করলেন। আর এতে শত্রুরা দ্বিগুণ আশ্কারা পেয়ে মুসলমানদের একেবারে ঘরের মধ্যে আগুন লাগাবার প্রয়াস পেল। আমার প্রিয় বন্ধুরা, এটা ইসলামকে সাহায্য করার পথ নয় বরং এমন একটি ফিত্নার সৃষ্টি, যার ভয়াবহতা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবার মত নয়।

بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ٠

"বস্তুত: এটা এক ফিত্না, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বুঝে না।" - (৩৯:৪৯)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জয়গা এটা নয়। তাই আমি বিষয়টির দিকে মোটামুটিভাবে ইঙ্গিত প্রদান করেই ক্ষ্যান্ত হব। যদি এই বেখবরদের দৃষ্টি মূল বিষয়টির প্রতি নিবদ্ধ হত তাহলে তারা বুঝতেন যে, বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ধ্বংসাত্মক ইজতিহাদের কোন প্রয়োজন নেই, বরং এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা এ সম্পর্কে অনেক পূর্ব থেকেই যে নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলোর মাধ্যমেই আমরা যাবতীয় জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারি এবং নিরসন করতে পারি সব রকম ওযর-আপত্তিরও।

পর্যালোচনার নীতি এবং সহীহ্ ও সঠিক পথ

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এসব কিছু হয়েছে মূর্খতা ও জ্ঞানহীনতার কারণে। আর এক্ষেত্রে ইসলামের বিরুদ্ধবাদী ও ইসলামপন্থীরা সমান সমান অংশীদার। আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে আপত্তি উত্থাপনকারীদের একথা বলে দেওয়া যে, কুরআন করীমের পর জ্ঞান ও বিজ্ঞতার কোন্ কোন্ উৎস আমাদের 'হুজ্জাত' (অকাট্য দলীল) হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। আর একথাও বলে দেওয়া যে, কোন গ্রন্থে কোন রিওয়ায়াত বর্ণিত হলেই তা মুসলমানদের জন্য 'হুজ্জাত' হতে পারে কিনা। আর এটাও দেখতে হবে যে, এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনেরা কোন নীতি নির্ধারণ করেছেন কি না।

প্রকৃতপক্ষে এই দু'টি প্রশ্নের জবাব আজকালকার বিভিন্নমুখী আলাপ-আলোচনা ও মত-পার্থক্যের জন্য মূলনীতি হিসাবে বিবেচিত হয়। আর যত ধরনের সমস্যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তথাকথিত সংস্কারকরা যত রকমের পদস্খলনের সম্মুখীন হন, তা এই মূলনীতির ক্ষেত্রে শৈথিল্য অথবা বাড়াবাড়ির কারণেই হয়ে থাকে।

এই দুই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, কুরআন করীমের পর পরই যাবতীয় মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে সহীহ্ হাদীসসমূহ। কোনরূপ ভয়ভীতি ও চিন্তাভাবনা ছাড়াই একথা স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে, সহীহ্ হাদীসমূহ জ্ঞান ও বিজ্ঞতার এমন একটি উৎস, যা আমাদের জন্য 'হুজ্জাত' হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। আর যেভাবে আমরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের ব্যাপারে হাদীসমূহের সত্যতায় বিশ্বাস করি, ঠিক সেভাবে বাইরের আপত্তিসমূহের ক্ষেত্রেও আমরা এগুলোর হাকীকত ও বাস্তবতাকে স্বীকার করি।

কিন্তু হাদীস হচ্ছে একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল বিষয়। এর নিয়মনীতি ও কায়দা-কানূন রয়েছে। এর সংকলন বিন্যাসের কাজ শত শত বছর যাবত জারী আছে। তাই সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার দিক দিয়ে এগুলোকে বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। যেহেতু এগুলোর ভিত্তি মানুষের রিওয়ায়াত তথা বর্ণনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই সাক্ষ্য ও বর্ণনার নিয়মনীতির ভিত্তিতে প্রয়োজন ছিল নাক্দ্ (খাঁটি-অখাঁটি পরীক্ষা করা) ও দিরায়াত (যুক্তিযুক্ততা) এর নিয়মকানূন প্রবর্তন করা এবং তা করা হয়েছেও। সমগ্র বিশ্বে হাজার বছরের চেষ্টা চরিত্র ও

অর্জিত অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করেছে এবং মানবজাতির প্রত্যেকটি গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ই জ্ঞান চর্চায় নিজেদের ভূমিকা রেখেছে। তাদের এই পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে যত বিষয়ের জ্ঞান অর্জিত হয়েছে– বিনা দ্বিধায় একথা বলা যেতে পারে যে, ইলমে হাদীসকে মার্জিত ও সুসংস্কৃত করার জন্য মানুষ যেরূপ পরিশ্রম করেছে, সেরূপ পরিশ্রম অন্য কোন বিষয়ের উপর করা হয় নি। আর এটা হচ্ছে জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সম্মানিত উম্মতে মুসলিমার এমন একটি মর্যাদা, যার মধ্যে দুনিয়ার অন্য কোন জাতি অংশীদার হতে পারে না।

অতএব এটা অপরিহার্য যে, যে হাদীসকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা হবে, তার বিশুদ্ধতা যেন এই বিষয়ের জন্য নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী যাচাই করে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যদি এরূপ করা না হয়ে থাকে তাহলে তো তা আমাদের জন্য দলীল ও হুজ্জাত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না।

একটি ব্যাপক ভ্রান্ত ধারণা

একটি ব্যাপক ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে যে, হাদীস বিষয়ের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় এবং মুহাদ্দিসদের সংকলন ও একত্রীকরণের প্রতি জনসাধারণের কোন লক্ষ্য নেই। সাধারণভাবে এটা মনে করা হয় যে, যদি তাফসীর, সিয়ার, মাগাযী ও মালাহিমের কোন গ্রন্থে ইসনাদের সাহায্যে কোন রিওয়ায়াত অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে এটাই (ইস্‌নাদের সাহায্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা) সে রিওয়ায়াতকে মেনে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অথচ এটা একটা বিষয় ভ্রান্তি খোদ মুহাদ্দিসরাও এই ভ্রান্তিকে কখনো বৈধ মনে করেন নি। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (রহ) তাঁর 'হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ্' ও অন্যান্য গ্রন্থে এ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা পূর্ববর্তী জ্ঞানীজনের যাবতীয় বই-পুস্তক থেকে আমাদেরকে বেপরোয়া করে দিয়েছে। তিনি সিহাত (সহীহ্ হওয়া), শুহরাত (বিখ্যাত হওয়া) ও কবূল (গ্রহণীয় হওয়া) এর ক্ষেত্রে হাদীস গ্রন্থাদিকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। তিনি প্রথম স্তরে রেখেছেন মু'আত্তা ইমাম মালিক এবং সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমকে, দ্বিতীয় স্তরে রেখেছেন সিহাহ্ সিত্তার বাকি চারটি গ্রন্থকে, তৃতীয় স্তরে রেখেছেন দারমী, আবূ ইয়ালা, ইবনে হামীদ ও তায়ালিসীর মুসনাদ সমূহ আর আবদুর রাজ্জাক ইবনে আবী শায়বাহ্ প্রমুখের সংকলনসমূহ। এমন কি কিছু কিছু মাওযূ হাদীসকেও এই স্তরে রাখা হয়েছে। শাহ্ সাহেব সুনানে ইবনে মাজাহ্কেও এই স্তরে রেখেছেন। কিন্তু অনেকেই তাঁর এ উদ্যোগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন।

হাদীসের অবশিষ্ট যাবতীয় কিতাব চতুর্থ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় হাকিম, ইবনে 'আদী ও খাতীবের গ্রন্থাদি এবং ইবনে জারীর তাবারী, ফিরদাউস দায়লামী,সাহিবে হুল্ইয়া আবূ নায়ীম, এবং ইবনে আসাকির প্রমুখের তাফসীর সমূহ। এই সব গ্রন্থই হচ্ছে সাধারণ তাফসীর গ্রন্থাদি, দলীলসমূহ, বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং কাহিনীসমুহের উৎস।

এই সব ব্যক্তিবর্গের লক্ষ্য ছিল, সহীহ্ কিতাব সমূহের সংকলকদের থেকে ভিন্ন। আর তাদের এই ভিন্ন লক্ষ্য থেকেই যাবতীয় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য তারাও কখনো এই দাবী করেন নি যে, যে সব হাদীস তারা উপস্থাপন করেছেন, তার সবগুলোই নির্ভরযোগ্য। তাদের লক্ষ্য ছিল শুধু হাদীসসমূহকে কোন কোন পদ্ধতিতে একত্রিত করা। সেগুলোকে যাচাই ও বাছাই করার দায়িত্ব তারা নেন নি, বরং এ দায়িত্ব তারা অন্যদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

পর্যালোচকদের অনুসরণীয় পথ

যারা হাদীস শাস্ত্রের মুহাক্কিক ও পর্যালোচক, তারা ঐসব সংকলিত হাদীসকে তখনই গ্রহণ করেছেন যখন সেগুলোকে হাদীসের নির্ধাতি উসূল ও আদর্শ অনুযায়ী যাচাই করা হয়েছে। তারা সদা সর্বদা আপন আপন উসূলের অধীনে ঐ সব হাদীস সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর তাবারীর তাফসীরে এই জাতীয় হাদীসের বিরাট সমাগম পরিলক্ষিত হয়। মারিয়া কিবতিয়া সম্পর্কিত যে সব রিওয়ায়াত পরিবর্তন পরিবর্ধনের পর তাঁর জনৈক বন্ধু তাঁকে সরবরাহ করেছিলেন, ইমাম তাবারী সেগুলোকেও সূরায়ে তাহরীমের তাফসীরের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছেন। কিন্তু আমরা দেখি যে, হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী ও হাফিয যাহ্বীর মত সর্বজন স্বীকৃত মুহাদ্দিসগণ তাঁদের গ্রন্থাদির স্থানে স্থানে এই সব রিওয়ায়াতের সমালোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। এরপর কোনটিকে যেমন গ্রহণ করেছেন তেমনি কোনটিকে আবার বর্জনও করেছেন। শুধুমাত্র 'আইনী' ও 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থ দু'টি দেখলে পর্যালোচক মুহাদ্দিসদের গ্রহণ ও বর্জনের কি অবস্থা ছিল তা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়িম (র)

হাদীস বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় সমালোচক ও পর্যালোচক। অবশ্য এজন্য স্বয়ং তাকে বিরাট সমালোচনা এমন কি ঝুকিরও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু যে সব ভাগ্যবানেরা ইমাম সাহেবের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তারা বুঝতে পারছেন, আমি এখানে কি বল্‌ছি। মিনহাজুস্‌ সুন্নাহ্‌ প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি সহীহ্‌ হাদীস গ্রন্থাদির বেশ অনেকগুলো হাদীসকে রদ (বর্জন) পর্যন্ত করেছেন।

আমাদের কাছে আল্লামা ইবনে কাইয়িমের 'যাদুল মা'আদ, এ'লামুল মু-কিয়ীন' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থাদি রয়েছে। শুধু এক জায়াগায় নয় বরং বহু জায়গায় তিনি এই সব কিতাবে বর্ণিত অনেক হাদীসকে অনায়াসে বর্জন করেছেন। শুধু এই পর্যন্ত নয়, বরং অন্যান্য রিওয়ায়াত এবং তার দিরায়াত (কিয়াস ও ইজতিহাদ) -নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী তিনি সহীহ্‌ হাদীসের কোন কোন রিওয়ায়াতেরও সমালোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে হানাফী ফকীহ্‌দের কর্মধারা একটি পরিষ্কার সাক্ষ্যরূপে বিবেচিত হতে পারে। কেননা তারা বুখারী মুসলিমের কোন কোন হাদীসকে পর্যন্ত আপন দিরায়াত ও কিয়াসের মুকাবালায় গ্রহণীয় বলে মনে করেন নি।

যাচাই-বাছাইয়ের নীতি

অতএব এটি একটি সুস্পষ্ট ও স্বীকৃত কথা যে, হাদীসমূহকে মানতে হলে সেগুলোর যাচাই বাছাইয়ের নীতিও অবশ্যই মানতে হবে এবং হাদীস-বিশেষজ্ঞরা এ নীতি সব সময় অনুসরণ করেছেন। এজন্য আর কোন সাক্ষ্য উপস্থাপনের প্রয়োজন করে না। আমি একথার উপর এজন্য জোর দিয়েছি যাতে ইসলামের বিরুদ্ধাবাদীরা এটা যেন মনে না করে যে, তাদের আপত্তিসমূহ থেকে গা বাঁচাবার জন্য এই নতুন নীতি উদ্ভাবন করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ নীতি সর্বদা বিদ্যমান আছে। আর এ কারণে আমরা যেমন আটশ বছর পূর্বে ঐ সব হাদীসকে সমর্থন করতাম যেগুলো এ বিষয়ের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী সঠিক প্রমাণিত হত, তেমনি আজো আমরা শুধু ঐ সব রিওয়ায়াতকে সমর্থন করবো, যেগুলো খোদ এই সব রিওয়ায়াতের সংকলনকারীদের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী সঠিক প্রমাণিত হবে।

এটি একটি অতি প্রকাশ্য কথা। বিশেষ করে তাফসীর, সীরাত, মাগাযী, কাসাসে আম্বিয়া-ই-সাবিকীন এবং ইসরইলীয়াত সম্পর্কে প্রথম থেকে হাদীস বিষয়ের ইমামরা এই রায় দিয়ে আসছেন। হযরত ইমাম আহ্‌মদের যুগ থেকে শুরু করে যখন তিনি ঘোষণা করেন যে–

ثلاثة كتاب ليس لها اصل المغازى والملاحم والتفسير.

"হাদীসের তিনটি অধ্যায়ের কোন আসল (মূল) নেই। আর সেগুলো হচ্ছে মাগাযী, মালাহিম ও তাফসীর।" হাদীস মুখস্তকারীদের শেষ যুগ পর্যন্ত, যখন ইবনে হাজার, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়িম এবং হাফিয যাহ্‌বী তাদের কিতাবসমূহ গ্রন্থনা করেন – সমগ্র বিষয় বিশেষজ্ঞরা এই নীতি মেনে আসছেন।

সারকথা

অতএব এ বিষয়টি ইসলামের উপর আপত্তি উত্থাপনকারীদের সামনে ভালভাবে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে এবং এর কাওয়ায়িদ তথা নীতিসমূহও তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। এরপর তাদের সাথে আলোচনায় বসতে হবে। এরূপ করলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নির্ভরযোগ্য হাদীসের সাহায্যে আমরা তাদের অভিযোগ ও আপত্তিসমূহ অনায়াসে খন্ডন করতে পারব এবং এজন্য আমাদেরকে এমন সব ইজতিহাদের আশ্রয় নিতে হবে না, যা বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ধ্বংসাত্মক।

সঠিক কর্মপন্থা

যখন আমরা হাদীস শাস্ত্রের কাওয়ায়িদ ও নিয়মাবলী অনুসরণ করেও সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারি, যা ঐ লোকেরা করে থাকেন হাদীসকে অস্বীকার করে; তখন আমাদের জন্য কি তাদের পথ অনুসরণের কোন যুক্তি থাকতে পারে? কোন যুক্তি কি থাকতে পারে হাদীসকে অস্বীকার করার, যা প্রকৃতপক্ষে আমাদের দ্বীনী ইলমের অন্যতম প্রধান উৎস।

ঈলা ও তাখ্য়ির–২

মূল আলোচনা

এতক্ষণ আপনার প্রশ্নের শুধুমাত্র সেই অংশটির জবাব দেওয়া হলো, যা আপনি হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে উত্থাপন করেছিলেন এবং যা প্রসঙ্গক্রমে ইসলাম অস্বীকারকারীদের উসূলে রদ (বাতিল) ও দিফা' (প্রতিরোধ) সম্পর্কিত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী আলোচনা ছিল। এবার আপনার মুল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

'ঈলা' এর ব্যাখ্যা

আপনার যুবক বন্ধুর খ্রীষ্টান শিক্ষক যে ঘটনাকে নিজে ঔদ্ধত্য ও শয়তানী ইচ্ছায় পরিবর্তন-পরিবর্ধনসহ পেশ করেছে, তা মূলত: রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র জীবনের সেই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, যা তাফসীর ও সীরাত গ্রন্থাদিতে 'ঈলা ও তাখ্য়ীরের বর্ণনা' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

ফিক্হ্ ও হাদীসের পরিভাষায় স্বামী স্ত্রীর সেই বিচ্ছেদকে 'ঈলা' বলা হয়, যা তালাক ছাড়াই সংঘটিত হয়। আর তা এভাবে হয় যে, স্বামী রাগত অবস্থায় কসম খেয়ে বললো, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সংগত হব না। ঈলার উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াত –

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَاءِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ج فَانْ فَاُؤْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . وَاِنْ عَزَمُوْا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

"যারা স্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার শপথ করে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। এরপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আর যদি তারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে তবে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" - (২:২২৬-৭)

মতপার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দু

উপরোক্ত আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে সব লোক ঈলা করবে অর্থাৎ আপন স্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার শপথ করবে, তাদের চারমাসের মধ্যে সংগত হওয়া উচিত। এরূপ করলে ঈলা নষ্ট হয়ে যাবে (অর্থাৎ তালাক হবে না), তবে শপথ ভংগের কাফ্ফারা দিতে হবে। এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে যে, শপথ অনুয়ায়ী চার মাসের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সংগত না হলে চার মাস অতিবাহিত হওয়া মাত্রই তালাক প্রদান ছাড়াই তালাক হয়ে যাবে কিনা। সহীহ্ হাদীস দ্বার প্রমাণিত যে, এমতাবস্থায় তালাক হবে না এবং স্ত্রী স্বামী থেকে ছাড়া পাবে না। যদি স্বামী স্ত্রীকে একেবারে ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রাখতে চায় তাহলে তাকে (স্বামীকে) বন্দী করে রাখা হবে ততক্ষণ না সে আপন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় কিংবা তালাক দিয়ে বিষয়টির একটি চূড়ান্ত ফয়সালা করে ফেলে। কিন্তু হানাফী মাযহাবের ফকীহ্দের মতে চার মাস অতিবাহিত হওয়া মাত্রই তালাক প্রদান ছাড়াই 'তালাকে বাইন' হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনে ঈলা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জীবনেও একদা ঈলার ঘটনা ঘটেছিল। তিনি (সা) এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি এক মাস পর্যন্ত তাঁর সহধর্মিণীদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। ঈলার ঘটনা দ্বারা এই ঘটনাকেই বুঝচ্ছে। আর সূরা তাহরীমের আয়াতসমূহের এটাই হচ্ছে শানে নুযূল।

এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা সহকারে সিহাহ্ সিত্তায় আছে এবং রাভী ও সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এর রূপ ছিল বিভিন্ন এবং বিভিন্ন ধরনের হুকুম এ থেকে বের হত; তাই হযরত ইমাম বুখারী (র) আপন রীতি অনুযায়ী এই হাদীসটিকে বিভিন্ন অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটা নিকাহ্, তালাক এবং ঈলা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে সূরা তাহরীমের অধীনে। কেননা এই ঘটনাই হচ্ছে সূরা তাহরীমের শানে নুযূল।

আমি উপরে উল্লেখিত যাবতীয় অধ্যায়ের হাদীসগুলোকে সম্মুখে রেখেছি। সেই সাথে সহীহ্ মুসলিম, অন্যান্য সহীহ্ গ্রন্থাদি, তাফসীরে ইমাম তাবারী, ইবনে কাছীর ও দুররে মানসূরও আমার সামনে রয়েছে। সাহীহায়ন তথা বুখারী মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থাদির মধ্য থেকে ফাহুল বারী, আইনী, নাভাভী (শারহে মুসলিম)-ও আমার সামনে রয়েছে। এই সব গ্রন্থ থেকে সম্মিলিতিভাবে যে সত্যিকার ঘটনা বেরিয়ে আসে, প্রথমে আমি তা বর্ণনা করবো। এরপর আপনার উপস্থাপিত ঘটনাকে এতদ্‌সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসহ পেশ করবো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র জীবন

যদি কোন নুবুওয়াতের দাবীদার মানুষের জীবনের অবস্থা ও ঘটনাবলী, তার সত্যতা ও পবিত্রতার জন্য মাপমাঠি হতে পারে তাহলে প্রকৃতপক্ষে এই আসমানের নীচে একটিমাত্র মানবীয় জীবন আছে, যার জীবন-চরিত ও জীবনের অবস্থাদি মাপকাঠি হিসাবে তাঁর সত্যতা ও পবিত্রতাকে অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত করে। আর সে মানবীয় জীবন হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) এর জীবন।

একদিকে তাঁর এতই প্রচন্ড প্রতাপ ছিল যে, তার আবির্ভাবের ফলে রোমান ও পারস্য-সম্রাটের সিংহাসন কেঁপে উঠেছিল, অন্যদিকে তাঁর পার্থিব জীবন এত সহজ-সরল ও জাঁকজমকহীন ছিল যে, পর পর দু'বেলা তিনি পেটভরে কখনো খান-নি বা খেতে পান নি– এমন কি দিনের পর দিন খাবার তৈরীর জন্য তাঁর ঘরে চুলা পর্যন্ত চড়ে নি। সীরাত ও হাদীস গ্রন্থাদিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে আমরা এর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না।

রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণ

সাহাবা কিরাম রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর এই অবস্থাদি দেখতেন এবং ভালবাসার আতিশয্যে তাঁরা অস্থির হয়ে যেতেন । এই প্রভাব সব চাইতে বেশী পড়েছিল তার পবিত্র সহধর্মিণীদের উপর, যারা মাহবূবে রাব্বুল আলামীনের অভাব ও দারিদ্র্যের হুজরাকে পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তবুও তারা ছিলেন মানুষ, মানবীয় অভিলাষ ও প্রয়োজন তাদেরও ছিল। আয়েশ-আরামের জিনিস না হোক, একজন চরম দরিদ্রের জীবনের জন্যও কিছু না কিছু মালপত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন। এসব চিন্তা তাদের মনে নিশ্চয়ই উদয় হয়ে থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বেশীর ভাগ সহধর্মিণী এমনি ছিলেন যে, তারা আমীর ও রয়ীসের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তাঁদের পিতামাতা তখনকার যুগে আমীর, রয়ীস এবং গোত্রপতি হিসাবে পরিগণিত হতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত সফিয়া (রা) ছিলেন খায়বারের সবচেয়ে বড় আমীর ও গোত্রপতির কন্যা। তাঁর পিতা রাজ-রাজড়াদের মত অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। হযরত উম্মে হাবীবা (রা) ছিলেন আবু সুফ্য়ানের কন্যা। আবু সুফ্য়ানকে যদি কার্যত: ঐ যুগে হিজায জামহুরিয়তের প্রেসিডেন্ট আখ্যা দেওয়া যায় তাহলেও ভুল কিছু বলা হবে না। এভাবে হযরত জুভায়রিয়া (রা) ছিলেন এক বিরাট গোত্রের রয়ীসের কন্যা। তাঁর নাম ছিল হারিছ বিন যাররার এবং তিনি

ছিলেন বনুল মুসতালাকের রয়ীস তথা সর্দার। হযরত 'আইশা ও হযরত হাফ্সা (রা) ছিলেন যথাক্রমে হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) এর কন্যা। এই দুই মহান ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে সব মাল লুটিয়ে দিয়ে যদিও নিঃস্বে পরিণত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের মর্যাদা ও পরাক্রম পার্থিব কোন রাজা বাদশাহের চেয়ে মোটেই কম ছিল না।

ব্যয়খাত বাড়িয়ে দেওয়ার দাবী

এই সব মাননীয়া মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ঘরে এসে রূহানী পরাক্রমের অধিকারী হয়ে পার্থিব শান-শওকতের কথা ভুলে গেলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা মানুষ ছিলেন এবং মানুষ হিসাবে অবশ্যই তাদের মানবীয় প্রয়োজনাদিও ছিল। নারী-স্বভাবের চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেক স্ত্রী এ ধরণাও পোষণ করে থাকবেন যে, অন্যান্যদের মুকাবালায় তাঁর অবস্থা কিছুটা ভাল ও উন্নত হোক। তাঁরা সাধারণ মুসলমান ও সাহাবীদেরকে দেখতেন যে, গনীমতের মাল ভাগে পেয়ে তাঁরা বেশ তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট রয়েছেন। অথবা তাঁরা মালে গনীমত থেকে কোন ভাগ পেতেন না। এই সব অবস্থার ফলশ্রুতিতে তাঁরা সত্যিকার অর্থে তাঁদের অভাব-অভিযোগের ব্যাপারটি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতেন এবং যে শাহানশাহ্ সমগ্র দুনিয়াকে সব কিছু দিচ্ছেন তাঁর কাছে তাদের নিজেদের জন্য কিছু না কিছু নিশ্চয়ই চাইতেন। বিশেষ করে যখন তাঁদের প্রত্যেকেই এই ভেবে গর্বিতা ছিলেন যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ্) তাঁকে ভালবাসেন। আর তাঁরা যা কিছু নিজেদের জন্য চাইতেন তা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই(রাসূলূল্লাহ্র) জন্য চাইতেন। যাহোক উম্মুল মুমিনীনদের দিক থেকে তাঁর কাছে ব্যয়খাত বৃদ্ধির তাগাদা আসতে শুরু করে। একবার সকল স্ত্রী একত্রিত হয়ে প্রশ্ন তোলেন, আমাদের অবস্থা এই দারুণ দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার মধ্যে কেমন করে কাটতে পারে বলুন? সবার প্রতি আপনার লক্ষ্য আছে, কিন্তু নিজের ঘরের প্রতি কোন লক্ষ্য নেই। আপনি আমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যও কিছু মাল সামানের ব্যবস্থা করুন।

এই দাবী যদিও সকল স্ত্রীর পক্ষ থেকে ছিল, কিন্তু দুজন স্ত্রী বিশেষভাবে এক জোট হয়ে তাঁদের দাবী পূরণের জন্য তার (রাসূলুল্লাহ্র) উপর চাপ প্রয়োগ করেন। তখন তাদের সম্পর্কে কুরআন করীমের নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়।

إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ج وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ .

"যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁজে পড়েছে– আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তবে জেনে রেখ, আল্লাহ্ই তার বন্ধু এবং জিব্রাইল ও সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও। উপরন্তু অন্যান্য ফিরিশতারাও তার সাহায্যকারী।"–(৬৬:৪)

এই আয়াতের মধ্যে إِنْ تَتُوْبَا এবং قُلُوْبُكُمَا এর মধ্যে দ্বিবচনের 'সীগা' বা 'যমীর' এসেছে। এ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, দুজন স্ত্রী এক জোট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের নামের উল্লেখ নেই। এ ব্যাপারে হাদীসের মধ্যে যে মতবিরোধ রয়েছে সামনে তার উল্লেখ করা হবে। কিন্তু সবচেয়ে বলিষ্ঠ অভিমত এই যে, ঐ দু'জন স্ত্রী ছিলেন হযরত 'আইশা ও হযরত হাফ্সা (রা)– যেমন খোদ হযরত উমর (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা, স্ত্রীদের এই দাবী অস্বাভাবিক ধরনের শক্ত ছিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মানসিক সান্ত্বনা ও সরল জীবন যাপন স্বাভাবিকভাবেই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। কেননা তাঁর জীবন রূহানিয়াত এবং বিশ্বমানবতার সংস্কার কার্যে এমনভাবে নিমগ্ন ছিল যে, তাতে পার্থিব মাল-আসবাব নিয়ে চিন্তা করার কোন অবকাশ ছিল না।

আল্লাহ্ যা বৈধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করার শানে নুযূল

এরি মধ্যে আরো একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। যদিও তা সম্পূর্ণ আলাদা ও পৃথক ঘটনা, কিন্তু ঐ সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে তা ঈলার ঘটনার মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি করে, যেমন সূরা তাহ্রীমের এই প্রাথমিক আয়াতগুলোর শানে নুযূল –

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ .

"হে নবী, আল্লাহ্ আপনার জন্য যা যা বৈধ করেছন আপনি তা নিষেধ করেছন কেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ্ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ্ তোমদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" – (৬৬:১-২)

এই আয়াতগুলো দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন কিছু জিনিস তাঁর জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন, যা আল্লাহ্ তাঁর জন্য হালাল করেছিলেন। আর এজন্য তিনি শপথও নিয়েছিলেন এবং শুধুমাত্র স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য তিনি তা করেছিলেন।

মূল ঘটনা

সেটা কোন্ বিষয় ছিল? তিনি কোন্ কথার শপথ নিয়েছিলেন? স্ত্রীদের সন্তুষ্টির সাথে এর কি সম্পর্ক ছিল? – এই সব প্রশ্নের উত্তর হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায়। আর এ সম্পর্কে এমন ধরনের কিছু কিছু রিওয়ায়াত তাফসীর ও সিয়ার গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোকে ইসলামের শত্রুরা অত্যন্ত বিশ্রী আকারে উপস্থাপন করেছে এবং যে সম্পর্কে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন।

সামনে এই সব রিওয়ায়াত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু মূল ও প্রকৃত ঘটনাটি বর্ণনা করছি। বুখারী ও মুসলিমের নিকাহ্, তালাক ও তাফসীরের অধ্যায়গুলোতে এ ঘটনাটি এমন পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে কোনই জটিলতা বা অবোধগম্যতা নেই।

ঐ সব হাদীসের সার-সংক্ষেপ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী আসরের সালাতের পর কিছু সময়ের জন্য স্ত্রীদের হুজরাগুলোতে যেতেন। একবার তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত হযরত যায়নাবের ওখানে সাধারণ নিয়মের চাইতে কিছুটা বেশী সময় কাটিয়েছিলেন। হযরত 'আইশা (রা) এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মধু এবং মিষ্টি খুবই পসন্দ। আর হযরত যায়নাব (রা)-এর কাছে কোথা থেকে কিছু মধু এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ওখানে গেলেই তিনি (যায়নাব) তাঁর সামনে কিছু মধু পেশ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা খান। এ কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে সেখানে বেশী দেরী হয়।

ঈর্ষা এবং ভালবাসার ক্ষেত্রে পরশ্রীকারতরতা নারীদের সেই স্বাভাবিক জযবা (উচ্ছ্বাস), যার সামনে কোন জয্বাই টিকে না। হযরত আইশা (রা) যখন এই মধু খাওয়ার ব্যাপারটি জানতে পারেন তখন মানবীয় দুর্বলতার কারণেই তাঁর মধ্যে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। তিনি মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বেশী সময় আপন হুজরায় ধরে রাখার জন্য হযরত যায়নাব (রা) এই কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। অতএব এটাকে ব্যর্থ করার জন্য কোন না কোন কর্মপন্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

সবার ঐক্য

হযরত 'আইশা (রা) একটি কর্মপন্থা সম্পর্কে চিন্তা করেন এবং হযরত হাফ্সা (রা)ও তাঁর সাথে যোগ দেন। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন যায়নাব (রা) এর ঘর থেকে তাঁদের ঘরে আসবেন তখন তাঁরা বলবেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনার মুখ থেকে 'মাগাফীর'-এ গন্ধ আসছে। মাগাফীর এক ধরনের বৃক্ষবিশেষ, যার ফুল থেকে মৌমাছিরা মধু আহরণ করে এবং যার ফল মানুষেরাও খায়। কিন্তু এর গন্ধ ভাল নয়।

এরপর এই সিদ্ধান্তের কথা অন্যান্য স্ত্রীদেরকেও বলা হলো এবং তাঁরাও তাতে যোগ দিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আপন অভ্যাস অনুযায়ী হযরত হাফ্যার হুজরায় আসেন তখন তিনি তাঁকে বলেন, আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, না। একথার উপর হাফ্সা (রা) বললেন, আপনার মুখ থেকে তো মাগাফীরের গন্ধ আসছে। এই একই কথা অন্যান্য স্ত্রীরাও রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলেন। এই অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শপথ নেন যে, তিনি আগামীতে মধু খাবেন না। মধু একটি হালাল খাদ্য এবং এটা না খাওয়ার শপথ গ্রহণ করা একটি হালাল বস্তুকে হারাম করারই নামান্তর। অতএব নাযিল হলো –

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۔

"হে নবী, আল্লাহ্ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন, আপনি তা নিষিদ্ধ করছেন কেন? " – ৬৬:১)

হযরত 'আইশা (রা) এর রিওয়ায়াত

খোদ হযরত 'আইশা (রা) এর রিওয়ায়াতের মাধ্যমে ইমাম বুখারী 'কিতাবুত তালাক' ও 'কিতাবুত্ তাফসীর-এ এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন–

قالت (عائشة رض) : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زنيب ابنة جحش ويمكث عندها فواطأت انا وحفصة عن اتينا دخل عليها فلتقل اكلت مغافير ؟ انى اجد ريح مغافير قال لا ولكنى كنت اشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن اعود له وقد حلفت ولا تخبرى بذالك احداً .

"হযরত 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রা) এর ওখানে মধু পান করতেন এবং (এ কারণে) দীর্ঘ সময় সেখানে বসতেন। এর উপর আমি এবং হাফসা (রা) সিদ্ধান্ত নিই যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কারো কাছে আসবেন তখন আমরা বলবো, আপনি কি 'মাগাফীর' খেয়েছেন? এর গন্ধ তো আপনার মুখ থেকে আসছে। শেষ পর্যন্ত আমরা তা-ই করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এটা শুনে বললেন, আমি তো মাগাফির খাই নি; তবে হ্যাঁ যায়নাবের ওখানে মধু খেয়েছি। এখন আমি শপথ নিচ্ছি যে, আমি আগামীতে কখনো মধু খাব না। কিন্তু তোমরা একথা কারো কাছে বলবে না।

অধিকতর বিস্তারিত রিওয়ায়াত

কিন্তু বুখারীর 'বাবুত্ তালাক' -এ সেই রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা হিশাম বিন উরওয়া তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা হযরত 'আইশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এই রিওয়ায়াতটি পূর্বে উল্লেখিত রিওয়ায়াতের চাইতে কিছুটা বিস্তারিত এবং এর কোন কোন খুটিনাটি কথাও পূর্বের রিওয়ায়াতের চাইতে ভিন্ন। যেমন তাতে হযরত যায়নাব (রা) এর স্থলে হযরত হাফসা (রা) এর ওখানে মধু খাওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং হযরত স্যাওদা (রা) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনিই মাগাফিরের গন্ধ আসার কথা বলেছিলেন। ইতিপূর্বে উল্লেখিত

রিওয়ায়াতে শুধুমাত্র হযরত 'আইশা ও হযরত হাফসা (রা) এর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য স্ত্রীদেরকেও এই খবর দেওয়া হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ দিন যার ঘরেই গেছেন তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ আসছে। এরকম হওয়াটা বিবেকও সমর্থন করে। সব স্ত্রীরাই একাকী এই কথা বলে থকবেন এবং সে কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কসম খেয়েছিলেন। কেননা শুধুমাত্র একজন স্ত্রী অনুরূপ বললে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্ভবতঃ কসম খেতেন না। আমি কিছু কিছু খন্ডকথাও ঐ রিওয়ায়াত থেকে গ্রহণ করেছি এবং সবগুলো কথার সারাংশ বলে দিয়েছি। হাফিয ইবনে হাজার 'ফাত্হুল বারী' গ্রন্থে এই মতপার্থক্য নিয়ে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় আলোচনা করেছেন এবং প্রত্যেকটি কথার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। আলোচনাটি অত্যধিক দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে বিধায় আমরা এখানে তা উদ্ধৃত করলাম না (দেখুন ফাতহুল বারী ঃ নবম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা- ২৩৯)।

নবী (সা)-এর গোপনে কথা বলার ঘটনা

এর মধ্যে আরো একটি ঘটনা ঘটে। রাসুলুল্লাহ (সা) তাঁর কোন একজন স্ত্রীকে গোপনে কিছু কথা বলেছিলেন এবং তাকে তাকীদ দিয়েছিলেন যেন তিনি ঐ কথা কারো কাছে না বলেন। কিন্তু সেই স্ত্রী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি। ফলে ঐ কথাটি অন্য একজন স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করেছেন। এ সম্বন্ধে-ই সূরা তাহরীমে নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ج فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ج فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَا ط قَالَ نَبَّاَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۔

"স্মরণ করো, নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন এরপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ, নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন তখন নবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন এবং কিছু অব্যক্ত রাখলেন। যখন নবী তা তাঁর সেই স্ত্রীকে জানালেন তখন সে বললো, কে আপনাকে এটা অবহিত করলো? নবী বললেন, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।"-(৬৬:৩)

বুখারী ও মুসলিমের সব ক'টি রিওয়ায়াত একত্রিত করলে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ (তাঁর স্ত্রীদের একজন) দ্বারা হযরত হাফসা (রা)-কে বুঝাচ্ছে। কেননা তিনিই হযরত আইশা (রা)-এর কাছে গোপন কথাটি বলে দিয়েছিলেনন। এর মধ্যে কিছু খুটিনাটি মতপার্থক্য আছে, যা নিয়ে হাফিয ইবনে হাজার বিস্তারিত আলোচনসা করেছেন। কিন্তু সব চাইতে বলিষ্ঠ অভিমত এই যে, হযরত হাফ্সা এবং হযরত 'আইশা (রা)-এর সাথে এটা সম্পর্কিত। যারা এ আলোচনাটি বিস্তারিতভাবে দেখতে চান তারা ফাতহুল বারী (নবম খণ্ড ঃ কিতাবুত তালাকঃ পৃষ্ঠা- ৩৯৯) দেখতে পারেন। আমরা এ বিষয় এর চাইতে অধিক দীর্ঘায়িত করতে চাই না। অবশ্য মূল ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ত্রিশ দিনের বিচ্ছেদ

যা হোক, ব্যয় খাত বৃদ্ধি করার জন্য সকল স্ত্রী একজোট হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রূহানী মগ্নতার উপর এই পার্থিব দাবী এমনি বেদনাদায়ক হয়ে উঠে যে, তিনি অঙ্গীকার করেন, একমাস পর্যন্ত তিনি তাঁর কোন স্ত্রীর সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখবেন না। যখন কিছুদিন এই বিচ্ছেদের উপর কেটে গেল তখন সাহাবা কিরামের মধ্যে দারুণ আতংকের সৃষ্টি হলো। তাঁদের অধিকাংশেরই এই

ধারণা হলো যে, এটা বিচিত্র নয় যে. তিনি হয়ত তাঁর সব স্ত্রীকেই তালাক দিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু রিসালাতের পরাক্রম হেতু কেউই তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার মত সাহস পাচ্ছিলেন না। এমন কি যে সব সাহাবা কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নৈকট্য প্রাপ্ত ছিলেন তাঁরাও এ ব্যাপারে ছিলেন একেবারে নীরব।

দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সময়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পায়ের নলায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এর যন্ত্রণা হেতু তিনি চলাফেরা করতে পারছিলেন না। তাই কয়েকদিন পর্যন্ত বালাখানা থেকে নেমে মসজিদেও আসতে পারেন নি। সাহাবীরা তাঁকে দেখতে আসতেন এবং তিনি তাঁদেরকে নিয়ে সেখানেই বসে বসে সালাত আদায় করতেন।

যখন এভাবে প্রায় এক সমাসের মত অতিবাহিত হল তখন সাহাবা কিরাম (রা)-এর মধ্যে অশান্তি আরো বেড়ে যায়। এই অবস্থা দেখে অধিকাংশেরই মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে. রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন এবং এখন আর তাঁদের সাথে মিলিত হবেন না।

উমর ফারুক (রা) -এর হাদীস

এই অবস্থার অবসান ঘটল কিভাবে? আর কার ভালবাসার দুঃসাহকিতায় এ অশান্তি কাটল? আর কিভাবেই বা তাখ্য়িরের আয়াত নাযিল হল? এইসব প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব ঐ বিস্তারিত ও লম্বা চওড়া রিওয়ায়াতের মধ্যেই রয়েছে, য়া হযরত উমর ফারূক (রা) থেকে সহীহ্ বুখরী ও মুসলিমে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সহীহ্ বুখারীতে এ রিওয়ায়াতটি বিভিন্ন পন্থায় বর্ণিত হয়েছে এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে এ থেকে বিভিন্ন মাসায়িল ও তত্বকথা বের করা হয়েছে। ইমাম মুসলিমও চারটি বিভিন্ন পন্থায় তালাক অধ্যায়ে এ রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন। সর্বসম্মতিক্রমে এই রিওয়ায়াতের প্রথম রাভী হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) এবং তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন উবায়দ বিন হুনায়ন, সাম্মাক আবী যুমায়ল, ইবায়দুল্লাহ্ বিন আবী সাওর প্রমুখ। এইসব রিওয়য়াতের মধ্যে উবায়দ বিন হুনায়ন (রা) এর একটি মুত্তাফাক্ আলাইহি রিওয়ায়াত আছে। উবায়দ (রা) ছিলেন হযরত আব্বাসের গোলাম।

ইমাম বুখারী 'ইলম' অধ্যায়ে উবায়দুল্লাহ্ বিন আবী সাওর-এর রিওয়ায়াতেও এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়ায়াতে খুঁটিনাটি ঘটনাসমূহ বেশ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে হযরত উমর (রা) এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরস্পর কথাবার্তার বিবরণ অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইমাম মুসলিমের রিওয়ায়াতগুলোতে কোন কোন বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। অত্যন্ত দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে আমরা 'ইল্ম' অধ্যায়ের রিওয়ায়াতটি এখানে উদ্ধৃত করতে পারছি না। তবে সবগুলো রিওয়ায়াতকে সামনে রেখে সেগুলোর সার্বিক সারকথা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এখানে বর্ণনা করছি। এতে মূল ঘটনা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সহজ সরল জীবন চরিত, স্ত্রীলোকদের অধিকার, ইসলামের প্রতি সহাবীদের ঝোঁক, আরবের স্ত্রীলোকদের অবস্থার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সাহাবীদের রাসূল প্রেম, হযরত উমর (রা) এর উচ্চ মর্যাদা, এ ধরনের অগণিত মাসায়িল ও বিষয়াদি আলোকিত হয়ে উঠবে। এই প্রেক্ষিতেও সবগুলো রিওয়ায়াতের সার্বিক ও বিস্তারিত সারকথা এখানে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে।

বিস্তারিত ও সার্বিক সারকথা

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) বলেন, আমি এক বছর পর্যন্ত এই ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম যে, হযরত উমর (রা) এর কাছে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু তাঁর কড়া ভাবমূর্তি ও অত্যধিক পরাক্রমের কারণে আমি সাহস হারিয়ে ফেলতাম। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করার মত সুযোগ হয়ে উঠত না। একবার হযরত উমর (রা) হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হন এবং সৌভাগ্যক্রমে আমিও তাঁর সংগে ছিলাম। হজ্জ সম্পাদনের পর যখন আমরা ফিরে আসছিলাম তখন রাস্তায় তাঁর সাথে আলাপ করার একটা ভাল সুযোগ পেয়ে

গেলাম। আমি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আমার অন্তরের সেই পুরাতন ইচ্ছাটা পূরণ করতে চাইলাম। আমি নিবেদন করলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই দুই স্ত্রী কারা, যারা তাঁদের দাবী পূরণ করার জন্য সম্মিলিতিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন এবং যার উল্লেখ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে করছেন- وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ –"তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর।" – (৬৬:৪)

হযরত উমর (রা) উত্তরে বলেন, 'আইশা ও হাফ্সা (রা)। আমি তখন বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমি এক বছর থেকে ঐ ইচ্ছা পোষণ করে আসছি যে, আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু আপনার পরাক্রম ও ব্যক্তিত্বের কারণে আপনার সাথে কথা বলার সাহস পাই নি।

হযরত উমর (রা) এর বর্ণনা

হযরত উমর (রা) বলেন, সেদিকে লক্ষ্য করো না। আমি যে কথা জানি তা বলতে প্রস্তুত আছি। এরপর হযরত উমর (রা) এই ঘটনার উপর একটি দীর্ঘ সুস্পষ্ট বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, জাহিলিয়া যুগে স্ত্রীলোকদের সাথে আমরা এরূপ আচরণ করতাম যে, তারা কোন অধিকারই ভোগ করতে পারত না। আমরা মনে করতাম, স্ত্রীলোকেরা কিছুই নয়। কিন্তু যখন ইসলাম এল, আল্লাহ তা'আলা তাদের অধিকার সম্পর্কে আয়াত নাযিল করলেন এবং তারা আমাদের উপর অধিকার লাভ করল; এতে আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা একদম বদলে গেল এবং তারা তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে দুঃসাহসী হয়ে উঠল।

একবারের ঘটনা, কোন কথার উপর, পূর্বঅভ্যাস অনুযায়ী আমি আমার স্ত্রীকে ধমক দিলাম এবং তার সাথে আমার কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়ে গলে। সেও ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়। উল্টো অনুরূপভাবেই শক্ত কথায় আমার কথার জবাব দিল। তখন আমি বললাম, তোমার কী হয়ে গেল যে, এভাবে আমার কথার জবাব দিচ্ছ? সে উত্তর দিল, সুবহানাল্লাহ্! তুমি এমন কে যে, তোমার কথার জবাব দেব না? তোমার মেয়ে হাফ্সা তো এভাবেই খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কথার জবাব দেয়, এমন কি কোন কোন সময় সারাদিন তাঁকে বিরক্ত রাখে।

হযরত হাফ্সা (রা) এর সাথে কথোপকথন

এটা শুনে আমি মনে মনে বললাম, আশ্চর্যের ব্যাপার! আমি সংগে সংগে সেখান থেকে উঠে হাফ্সা (হযরত উমরের মেয়ে ও রাসূলুল্লাহ্র স্ত্রী) এর কাছে গেলাম। আমি তাকে বললাম,শোনো মেয়ে, এটা কি ঠিক যে, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সাথে সওয়াল-জওয়াব কর এবং সারা দিন রাগান্বিত থাক। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর অন্যন্য স্ত্রীরাও কি এরূপ করেন? হাফ্সা উত্তর দেন, হ্যাঁ নিঃসন্দেহে আমি এরূপ করি। তখন আমার খুব রাগ হলো। আমি বললাম, তোমার উচিত আল্লাহ্র শাস্তি ও রাসূলের রোষানলকে ভয় করা। রাসূলুল্লাহ (সা) কে অসন্তুষ্ট করার অর্থ আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করা। এটা কি ব্যাপার যে,তুমি এভাবে তাঁকে বিরক্ত কর। হযরত 'আইশা (রা)-এর এরূপ কোন ব্যবহার দেখে তোমার একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসেন। আল্লাহ্র কমস, যদি আমার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর লক্ষ্য না থাকত তাহলে তিনি তোমাকে তালাকই দিয়ে দিতেন। তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে আমাকে বলবে। রাসূলুল্লাহ (সা) কে কষ্ট দাও কেন?

হযরত উম্মে সালমা (রা) এর উত্তর

এরপর আমি উম্মে সালমা (রাসূলুল্লাহ্র অপর একজন স্ত্রী)-এর কাছে গেলাম। কেননা নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তাঁকে যে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত করার সুযোগ আমার ছিল। আমি তাঁর কাছেও এই সব কথা বললাম, যা আমার মেয়ের কাছে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি তা শুনামাত্র জবাব দিলেন, "হে খাত্তাবের ছেলে, তোমার অবস্থা তো খুব আশ্চর্যজনক দেখছি। তুমি প্রত্যেকটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কর এবং শেষ

পর্যন্ত অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, তমি রাসূলুল্লাহ (সা) -এর ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছ।" তিনি এই কথাগুলো এমন জোরের সাথে বললেন যে, আমি তার কোন জবাব দিতে পারলাম না এবং চুপচাপ সেখান থেকে চলে এলাম।

এক আনসারী প্রদত্ত সংবাদ

সেই সময়ের ঘটনা। একজন আনসারী আমার প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি এবং আমি পালাক্রমে এক এক দিন রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে হাযির হতাম এবং একে অন্যকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারের যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে অবহিত রাখতাম। এটা সেই সময়ের ঘটনা, যখন প্রতি মুহূর্তে মদীনার উপর শত্রুদের হামলার আশংকা ছিল। আমার ভয় ছিল গাসসান মুলুকেরই কোন বাদশাহ মদীনা আক্রমণ করবে।

এক রাত্রে আমার আনসারী প্রতিবেশী একদম অসময়ে আমার দরজায় করাঘাত করেন এবং চীৎকার দিয়ে বলতে থাকেন, দরজা খোলো, দরজা খোলো। আমি আতংকিত হয়ে উঠলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, খবর ভাল তো? গাসসানী কি মদীনা আক্রমণ করেছে? তিনি বললেন, না; তবে এর চাইতেও বড় ঘটনা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে উপস্থিতি

আমি বললাম, এসব কিছু হাফসা ও আয়শা (রা) এর কথাবার্তার কারণে হবে, যা ওরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে করত। আমি কাপড় পরে সোজা মদীনায় গিয়ে পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের সালাতের পর বালাখানায় চলে গেলেন। মসজিদের মধ্যে লোকেরা বসেছিল এবং তারা চিন্তাগ্রস্ত ছিল। আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। বালাখানার নীচে আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাবশী গোলামকে বললাম,তুমি রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছে গিয়ে আমার কথা বলো। কিন্তু ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ পর আমি পুনরায় এলাম এবং গোলামকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছ থেকে আমার ভিতরে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে আস। তখন কোন জবাব পাওয়া গেল না। আমি তখন অধৈর্য হয়ে দিশেহারা অবস্থায় উচ্চস্বরে বলে উঠলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) মনে করেছেন, আমি আমার মেয়ে হাফসার সুপারিশের জন্য এসেছি। আল্লাহ্‌র কমস, আমি তো রাসূলুল্লাহ (সা) -এর একান্ত বাধ্য একজন গোলাম। তিনি যদি নির্দেশ দেন তাহলে আমি নিজের হাতে হাফ্‌সার গর্দান উড়িয়ে দেব।

কায়সার ও কিস্‌রা এবং হুযূর (সা)

বস্তুতঃ এবার অনুমতি পাওয়া গেল এবং বালাখানার উপরে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ একটি খালি চারপায়ার উপর শুয়ে আছেন এবং তাঁর পবিত্র দেহের উপর রশির দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তাঁর ঘরের আসবাবসামগ্রীর অবস্থা এই যে, একদিকে সামান্য কিছু যবের দানা পড়ে আছে। আর এক কোণে রয়েছে কোন একটি জন্তুর চর্ম। অপর একটি চর্ম একদিকে ঝুলে আছে।

এই অবস্থা দেখে আমার অন্তর নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ল এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন, উমর, তুমি কাঁদছ কেন? আমি নিবেদন করলাম, কাঁদার জন্য এর চাইতে বড় কথা আর কী হতে পারে? আজ কায়সার ও কিস্‌রা আয়েশ-আরামের মধ্যে মজা লুটছে এমতাবস্থায় যে, তারা আল্লাহ্‌র বন্দেগী থেকে সম্পূর্ণ গাফিল। অথচ আপনি দু'জাহানের সরদার হয়েও এমন অবস্থায় জীবন যাপন করছেন যে, ঘরের মধ্যে আরাম-আয়েশের একটি জিনিসও নেই এবং খালি চারপায়ার উপর শোয়ার কারণে আপনার পবিত্র দেহের উপর তার চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

হুযূর (সা) বলেন, হ্যাঁ এটা ঠিক। কিন্তু তুমি কি এতে রাজী নও যে, কায়সার ও কিস্‌রা দুনিয়া নিক এবং আমাদের ভাগ্যে আখিরাত থাকুক?

স্ত্রীদের সম্পর্কে আবেদন

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়ে ফেলেছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না। এটা শুনতেই আমি এই পরিমাণ আনন্দিত হলাম যে, আমার মুখ থেকে 'আল্লাহু আকবার' শ্লোগান বেরিয়ে গেল। এরপর আমি তাঁর কাছে সেই ঘটনার কথা বললাম, যা হাফ্সা ও উম্মে সালমা (রা) এর সাথে ঘটেছিল। একথা শুনে তিনি পুনরায় মুস্কি হাসলেন। শেষ পর্যন্ত আমি নিবেদন করলাম, মসজিদে লোক অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় বসে আছে। যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি তাদেরকেও এই সংবাদ দিয়ে দেই যে, আপনার তালাক দেওয়ার ঘটনাটি সম্পূর্ণ অমূলক।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত 'আইশা (রা) এর কাছে যান। 'আইশা (রা) বলেন, আপনি তো এক মাসের জন্য ঈলার অঙ্গীকার করেছিলেন। সে হিসাবে এখনো একদিন বাকী আছে। হুযুর (সা) উত্তরে বলেন, ঊনত্রিশ দিনেও তো মাস হয়ে থাকে।

কিছু ফলাফল ও শিক্ষণীয় বিষয়

এই সুদীর্ঘ হাদীস উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য ছিল ঈলা ও তাখ্য়ির সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা। কিন্তু পরোক্ষভাবে যে সব বিষয় ও মাসাআলা এ থেকে বেরিয়ে আসে, তার প্রতিও অতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত প্রদান করবো।

বুখারীর ব্যাখ্যাতারা এই হাদীস থেকে অসংখ্য তত্ত্ব ও তথ্যাদি বের করেছেন। খোদ ইমাম বুখারী এ থেকে ইলম অর্জন, পিতা-মাতার উপদেশ যাঁচাই ও প্রশ্ন, বিয়ের আহ্কাম, তালাকের আহকাম ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মাসআলা বের করেছেন এবং পৃথক পৃথক অধ্যায়ে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

১। ইসলাম পূর্ব যুগে স্ত্রীলোকদের অবস্থা কি ছিল এবং ইসলাম কিভাবে তাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করলো? হযরত উমর বলেন, আমরা ইসলাম পূর্ব যুগে মনে করতাম, আমাদের উপর স্ত্রীলোকদের কান অধিকার নেই। ইসলাম যখন তাদের অধিকারের কথা বলল তখন তা আমাদের মেনে নিতে হলো।

২। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর তাহকীক ও তথ্যানুসন্ধানের প্রতি লক্ষ্য করুন। শুধুমাত্র একটি আয়াত সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য তিনি পুরো এক বছর পর্যন্ত চেষ্টা করতে থাকতেন। এ থেকে তাফসীর সম্পর্কে তাঁর চেষ্টা সাধনার দিকটি পরিষ্কার ফুটে উঠে। একটি আয়াতের শানে নুযূল জানার জন্য যার এই অবস্থা, তিনি সম্পূর্ণ কুরআনের তত্ত্ব ও তথ্যাদি জানার জন্য কী পরিমাণ চেষ্টা করেছেন তা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

৩। আল্লাহু আকবার। খুলাফা-ই-রাশিদীন এমন সাম্যের জীবন এবং দারিদ্র্য ও সহজ সরল জীবন যাপন করতেন যে, তাদের মধ্যে কে বড় এবং কে ছোট, তা মোটেই নিরূপণ করা যেত না। এতদ্সত্ত্বেও সাহাবীরা তাঁদেরকে এমন সমীহ্ তথা ভয় করে চলতেন যে, উমর ফারূক (রা) এর সামনে খোদ সাহাবীরাও কোন কথা বলার সাহস পেতেন না।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর পবিত্র জীবন

৪। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সেই পবিত্র জীবনের নক্সা অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে, একদিকে তিনি ছিলেন দুজাহানের বাদশাহ্ এবং অন্য দিকে তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, তিনি খালি চারপায়ার উপর এমনভাবে শুতেন যে, তাতে বিছাবার মত কোন কম্বল তাঁর ছিল না।

৫। সাহাবা কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্য কিরূপ উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছিলেন যে, তাঁর সম্ভ্রম রক্ষার্থে হযরত উমর (রা) তো আপন মেয়ের মাথা উড়িয়ে দিতেই চাচ্ছিলেন। আমরা নিজেরা চিন্তা করে দেখতে পরি, অনুরূপ অবস্থায় আমাদের মন কি বলে?

৬। হযরত উমর (রা) এর উচ্চ মর্যাদার দিকটি এথেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি দরবারে রিসালাতের অত্যন্ত নৈকট্য লাভ করছিলেন। উম্মে সালমা (রা) উমর (রা) কে বললেন, তুমি সব কথায় হস্তক্ষেপ কর। এখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর পারিবারিক ব্যাপারেও কি হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছ? যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মুস্কি হাসতে থাকেন।

৭। এ থেকে এ মাসআলাটিও বেরিয়ে পড়ল যে, পিতা আপন মেয়ের ঘরে তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া যেতে পারেন। হযরত উমর (রা) হযরত হাফ্সা (রা) এর ঘরে রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুমতি ছাড়াই গিয়েছিলেন।

মদীনা মুনাওওরার অবস্থা

এ থেকে একটি গুরুত্বপুর্ণ তথ্য জানা গেল যে, ঐ সময় মদীনা কিভাবে দুশমনদের পাঞ্জার মধ্যে ছিল। সব সময়ই মদীনার উপর বহি:আক্রমণের আশংকা থাকত। এমন কি প্রতিবেশী আনসারী যখন দরজা খোলার জন্য বললেন তখন হযরত উমর (রা) বলে উঠলেন, কোন শত্রু কি মদীনার উপর হামলা করে বসেছে? এথেকে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, যারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় অবস্থানকালে স্বয়ং অন্যের উপর হামলা করতেন, তাদের কথা কত মিথ্যা ও সত্য বিরোধী।

৮। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীদের সাথে যেরূপ স্নেহ, ভালবাসা, ক্ষমা ও নম্র ব্যবহার করতেন তা ছিল তার শ্রেষ্ঠ চরিত্রেরই অভিব্যক্তি। এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদেরও উচিত, নিজেদের স্ত্রীদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করা। কেননা এই আয়না (স্ত্রীজাতি) খুবই ভঙ্গুর।

ঈলা ও তাখ্য়ির–৩

মুল বিষয়ের বিশ্লেষণ

তাখয়িরের আয়াত

মোটকথা, এরপর সূরা আহযাবের তাখয়িরের আয়াত নাযিল হল–

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً .وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا .

"হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাদের জন্য মহা-প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। – (৩৩:২৮-২৯)

দু'টি পথ

রাসূলুল্লাহ (সা) এর পুণ্যবতী স্ত্রীদের জন্য এটাই ছিল সর্বশেষ ইলাহী ফয়সালা। যেহেতু খরচ খাতের পরিমাণ বাড়ানো এবং আরাম আয়েশের আসবাপত্রের জন্য তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন এবং এই দাবীতে সকল স্ত্রীই জোটবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, এমন কি রাসূলুল্লাহ (সা) ঈলা করে একমাস পর্যন্ত তাঁদের থেকে দূরে ছিলেন – তাই আল্লাহ্ তা'আলা চাইলেন, যেন চিরদিনের জন্য তাঁদের এ ব্যাপারটির ফয়সালা হয়ে যায় এবং এ উদ্দেশ্যে দুটি পথ তাঁদের সামনে তুলে ধরা হয়। তাঁরা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে পার্থিব আয়েশ আরাম একেবারে পরিত্যাগ করবেন কিংবা পার্থিব নিয়ামত ও মজাদার জিনিসসমূহ লাভ করার জন্য আল্লাহ্র রাসূলের সাহচর্য ত্যাগ করবেন।

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়া আখিরাত উভয়ই তোমাদের সামনে রয়েছে। যদি তোমরা দুনিয়া চাও তাহলে পরিষ্কার বলে দাও আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় করে দেব। কিন্তু তোমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গ চাও তাহলে দুনিয়ার এইসব জাঁকজমক ও আড়ম্বর পরিত্যাগ কর। কেননা যারা এরূপ করে তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে বিরাট পুরস্কার ও প্রতিদান রয়েছে।

উপকারিতাসমূহ ও তাখ্য়ীরের নির্দেশ

এই হুকুম নাযিল হওয়ার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অনেক বড়বড় উপকারিতা নিহিত ছিল। এর মধ্যে ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) এর স্ত্রীদের জন্য একটি বিরাট পরীক্ষা। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববাসীকে একথা দেখানো যে, যাদেরকে আল্লাহ্র

রাসূল তাঁর জীবনের সাথে শরীক করেছেন তাঁদের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের কি অবস্থা ছিল। যদি এ ধরনের ঘটনা সমূহ না ঘটত তা হলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর স্ত্রীদের আত্মিক পবিত্রতা আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁদের ঐকান্তিক মুহাব্বত কি করে দুনিয়াবসীর সামনে প্রকাশিত হত?

যেহেতু ব্যয়খাত বাড়ানোর ব্যাপারে হযরত আইশা ও হযরত হাফ্‌সা (রা) সব চাইতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাই রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বাগ্রে হযরত 'আইশা (রা) এর কাছে যান এবং এই আয়াতের নির্দেশ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। সংগে সংগে এও বলেন যে, এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। সব চেয়ে ভাল হয়, এ ব্যাপারে আপন পিতামাতার সাথেও পরামর্শ করে নাও। হযরত 'আইশা (র) সংগে সংগে বলে উঠেন, ভালকথা, এ ব্যাপারে পরামর্শ করার কী আছে? যখন আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি পথ আমাদের জন্য খোলা রেখেছেন তখন এর উত্তর সর্বাবস্থায় একটিই হবে। দুনিয়া ও দুনিয়ার নি'মাতসমূহ আপনার সাহচর্যের সামনে কি মূল্য রাখে? আমি সব কিছু ছেড়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাহচর্য বেছে নিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সকল স্ত্রীকে অনুরূপভাবে জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁরা সকলেই এই একই উত্তর দেন।

খোদ হযরত আইশা (রা) থেকে সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে দু'টি পথ থেকে একটি পথ বেছে নেবার ইখ্তিয়ার দিলেন। আমি তখন আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের পথই বেছে নিলাম। (বুখারী: কিতাবুত তালাক)।

হযরত আইশা (রা)-এর বিস্তারিত বর্ণনা

সিহাহের অন্যান্য রিওয়ায়াতে হযরত 'আইশা (রা) এর বর্ণনা আরো বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। আমরা ঘটনা বর্ণনার সময় ঐ সব রিওয়ায়াতকেও সামনে রেখেছি। যেমন ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান থেকে এ সম্পর্কে যে রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন তাতে হযরত 'আইশা (রা) বলেন,

فبدا بى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى ذاكر لك امرا فلا عليك ان لا تعجلى حتى تستامرى ابويك قالت وقد علم ان ابوىّ لايامرانى بفراقه ثم قال ان الله قال "يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ الخ (صحيح نسائى كتاب النكاح صفحه ١٥-١ مطبوعه دهلى)

"রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে আমার সাথে আলাপ করেন। তিনি বলেন, আমি তোমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করছি। কিন্তু এর উত্তর দানের ব্যাপারে তুমি যদি তাড়াহুড়া না কর এবং তোমার পিতামাতারও অভিমতও গ্রহণ কর তবে তাতে কিছু যায় আসে না। রাসূলুল্লাহ (সা) এর একথা জানা ছিল যে, আমার পিতামাতা কখনো রাসূল (সা) থেকে আমার পৃথক হওয়াটা পসন্দ করবেন না। যাহোক এরপর তিনি তাখয়িরের আয়াত পাঠ করলেন এবং আমার সামনে দুনিয়া আখিরাতের উভয় পথ তুলে ধরলেন। আমি তখন নিবেদন করলাম, একথার জন্য কি হুযূর আমাকে আমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ করার জন্য বলেছেন? ভালকথা, এতে পরামর্শ করার কী আছে? এর উত্তর তো শুধু এই যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সংসর্গ চাই এবং চাই দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাত"।

একটি শিক্ষণীয় বিষয়

এই হুকুম শুধুমাত্র রাসূলের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্কিত হলেও এর মধ্যে কিন্তু সাধারণ লোকদের জন্যও বিরাট উপদেশ নিহিত রয়েছে। এই ঘটনা প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা এ জিনিসটি প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, দুটি জিনিস

সেই অন্তরে একত্রিত হতে পারে না, যে অন্তর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা ও সন্তুষ্টির আকাংখী। তাদের উচিত, প্রথম দৃষ্টিতেই দুনিয়া এবং দুনিয়াদারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটা হতে পারে না যে, এক দিকে আল্লাহ্ প্রেমের দাবী করা হবে এবং অন্যদিকে পার্থিব শোভা-সৌন্দর্যের পেছনে পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করা হবে। একজন ফারসী কবি কী সুন্দরই না বলেছেন!

"হক ও সাদাকত (সত্যতা) -এর ভালভাসার মধ্যেই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা নিহিত রয়েছে। এ পথে একজন মানুষ তখনই হোঁচট খাবে, যখন তার মধ্যে বিশুদ্ধচিত্ততা না থাকবে এবং একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি তার লক্ষ্যবস্তু না হবে।"

মারিয়া কিবতিয়া এবং জাল রিওয়ায়াত

সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত ঈলা ও তাখ্য়ির-এর ঘটনা আমরা এতক্ষণ বর্ণনা করলাম। এখন আমরা ঐসব রিওয়ায়াত নিয়ে আলোচনা করব যেসব রিওয়ায়াত, সহীহ রেওয়ায়াতসমূহের সাথে মিশে যাওয়ার কারণে পরিষ্কার ঘটনা ঘোলাটে ও সন্দেহজনক হয়ে পড়েছে এবং এরই একটি পরিবর্তিত ও জাল করা রিওয়ায়াত আপনার খ্রীষ্টান শিক্ষক উপস্থাপন করেছে।

সিহাহ্ সিত্তায় এসব রিওয়ায়াতের অস্তিত্ব নেই। হ্যাঁ, এগুলোকে ইবনে সা'দ, ওয়াকিদী, ইবনে জারীর তাবারী, তাবারানী, বায্যায্, হয়ছাম বিন হুলায়ব প্রমুখ আপন আপন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তাদের থেকে তা সাধারণ মুফাসসির ও সীরাত লেখকরা নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাহরীমের ঘটনার সাথে এই সব রিওয়ায়াতের সম্পর্ক রয়েছে। যদি এগুলোকে স্বীকার করেও নেওয়া হয় তবু ঈলার ঘটনার উপর এগুলোর কোন প্রভাব পড়তে পারে না। অবশ্য এটা জানা যায় যে لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ -এর শানে নুযূল এই ঘটনা ছিল। এটা ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মধুকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন, বরং মারিয়া কিবতিয়ার সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে এবং তিনি স্ত্রীদের খাতিরে একে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন।

আমরা এই রিওয়ায়াতের জন্য ইমাম তাবারীর তাফসীরই সামনে রাখতে চাই। কেননা তিনি সূরা তাহরীমের তাফসীরে তাঁর রীতি অনুযায়ী সব কয়টি রিওয়ায়াতকে একত্র করে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন–

اختلف اهل العلم فى الحلال الذى كان احله لرسوله فحرمه على نفسه ابتغاء مرضاة ازواجه فقال بعضهم كان ذلك مارية مملوكة القبطية حرمها على نفسه بيمين انه لايقربه بها طلبا بذالك رضا حفصة زوجته (تفسير طبرى جلد ٢٨ صفحة : ١٠٠)

–"আহলে ইলম' (বিজ্ঞজন)-এর মধ্যে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে যে, সেটা কোন্ কথা বা কোন্ বিষয় ছিল, যা আল্লাহ্ তা'আলা আপন রাসূলের জন্য বৈধ করেছিলেন এবং তিনি তা আপন স্ত্রীদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন? তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, সে ছিল মারিয়া কিবতিয়া নামক দাসী, যাকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। তিনি কসম খেয়েছিলেন এই মর্মে যে, তিনি কখনো তার (মারিয়ার) কাছে যাবেন না। আর তিনি এরূপ করেছিলেন আপন স্ত্রী হাফ্সা বিনতে উমর (রা) কে সন্তুষ্ট করার জন্য।"

কিন্তু ইমাম তাবারী 'কোন কোন আহলে ইল্‌মের অভিমত' বলে যেসব আহলে ইলমের অভিমত ব্যক্ত করেছেন– অধিকাংশ হাদীসের ইমাম- যেমন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সংকলকদের সামনে তাদের কী মূল্যই বা থাকতে পারে? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা এই ঘটনাকে আদৌ বর্ণনাই করেন নি।

তাবারীর বর্ণনা

বস্তুতঃ এরপর ইমাম তাবারী এই জাতীয় প্রত্যেকটি রেওয়ায়াতকেই তার গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, যা তাঁর কাছে কোন না কোনভাবে এসে পৌঁছেছে। তার বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহের সারকথা এই যে, মারিয়া কিবতিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এর এক দাসী ছিলেন। একদা হযরত হাফ্‌সা (রা) এসে দেখেন, তারই ঘরে রাসূলুল্লাহ (সা) মরিয়ার সাথে নির্জনবাসে আছেন। তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমারই ঘরে এবং আমারই পালার দিন আপনি এরূপ করলেন? রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলেন, আমি কসম খাচ্ছি যে, ভবিষ্যতে মারিয়ার সাথে কোন সম্পর্ক রাখব না। কিন্তু আমার এই কমস খাওয়ার ব্যাপারটি অন্য কোন স্ত্রীর কাছে উল্লেখ করো না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সকল স্ত্রীদের মধ্যে হযরত হাফ্‌সা ও হযরত আইশা (রা) ছিলেন একে অন্যের খুবই ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বান্ধবী। অতএব হযরত হাফ্‌সা (রা), হযরত 'আইশা (রা)-এর কাছে কথাটি ফাঁস না করে তাকতে পারেন নি। তখন নিম্নের দুই আয়াত নাযিল হয়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ج

"হে নবী আল্লাহ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন আপনি তা নিষিদ্ধ করছেন কেন"? (৬৬:১)

এবং দ্বিতীয় আয়াত

وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِىُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا ج

"স্মরণ করো, নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন।" (৬৬:৩)

অতএব রাসূলুল্লাহ (সা) যে জিনিসটি তার জন্য হারাম করেছিলেন তা ছিল এই মারিয়া কিবতিয়া; যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য হালাল করে দিলেন। আর যে গোপন কথাটি তাঁর কোন একজন স্ত্রী ফাঁস করে দিয়েছিলেন তাও তিনি কসম খেয়ে তাঁর কাছে বলেছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় অতিরিক্ত আরো কিছু কথা আছে। আর তা হলো, কসম খাওয়া ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাফ্‌সা (রা) কে এও বলেছিলেন, আমার পরে আবূ বকর (রা) ও তোমার পিতা উমর (রা) আমার খলীফা হবেন।

ইমাম তাবারী এই ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন রেওয়ায়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর এই সব রিওয়ায়াত মুহাম্মদ বিন সা'দ, হায়ছাম, ইবনে মরদভিয়া এবং তাবারানীতুন নিসা, মুসনাদ প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এর মধ্যেও আবার পরস্পর মতপার্থক্য রয়েছে এবং একই ঘটনাকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যখন এই সব রিওয়ায়াতের সনদ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় তখন মতনের (বচনের) ইখ্‌তিলাফ ও মতপার্থক্য নিয়ে আলোচনার কি কোন প্রয়োজন আছে, না থাকতে পারে?

রেওয়ায়াতের পর্যালোচনা

কিন্তু এই সব রেওয়ায়াতের নির্ভুল হওয়াকে আমরা অত্যন্ত জোরের সাথে অস্বীকার করছি এবং আমাদের কাছে এর নির্ভরযোগ্য কারণসমূহও বিদ্যমান রয়েছে। আর সংক্ষেপে তা হলো ঃ

সর্ব প্রথম ঐ বর্ণনাটি সামনে রাখুন,যা এই প্রবন্ধের এক নম্বরে, হাদীসমূহ এবং হাদীস গ্রন্থাদি সম্পর্কে আমরা লিখে এসেছি। হাদীস বিষয়ে যারা মুহাক্কিক (পর্যালোচক) এবং ইমাম তারা মুহাদ্দিসের স্তর ও মর্যাদা সম্পর্কে যথেষ্ট

স্পষ্ট ভাষায় আলোচনা করেছেন। আর এক্ষেত্রে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ (রহ) এর স্তর বিন্যাস প্রাচীন যুগের মুহাক্কিকদের অভিমতসমূহের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি। একথা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হাদীস গ্রন্থাদি চারটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরে রয়েছে সাহীহাইন, দ্বিতীয় স্তরে অন্যান্য সহীহ গ্রন্থাদি, তৃতীয় স্তরে দারমী, আবদুর রায্‌যাক, বায়হাকী, তাবারানী প্রমুখের সংকলিত গ্রন্থাদি, আর চতুর্থ স্তরে রয়েছে ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে মরদভিয়া, আবূ নায়ীম, ইবনে আসাকির প্রমুখের সংকলিত গ্রন্থাদি। প্রকাশ থাকে যে, তৃতীয় স্তরের গ্রন্থাদির মধ্যে 'সিহাত' (শুদ্ধতা)-এর কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নি; বরং সহীহ গায়র সহীহ্ সব রকমের হাদীসই তাতে রয়েছে।

সিহাত,শুহ্‌রাত ও কবুল

সিহাত, শুহ্‌রাত এবং কবূলের দিক দিয়ে উপরোক্ত স্তর বিন্যাস করা হয়েছে। 'সিহাত' এর অর্থ এই যে, এই আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার এতে সহীহ্ হাদীসসমূহ একত্রিত (সংকলিত) করার ব্যবস্থা করেছেন। আর যদি কোন হাদীস এই স্তরের না হয় তাহলে তার মধ্যে কি নুক্স্ বা দুর্বলতা রয়েছে তাও পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। 'শুহ্‌রাত' এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক যুগের হাদীস বিশেষজ্ঞরা এই গ্রন্থকে পঠন পাঠনের মধ্যে রেখেছেন এবং এর অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। আর 'কবূল' এর অর্থ এই যে, হাদীস বিষয়ের উলামা কিরাম এই গ্রন্থকে নির্ভরযোগ্য এবং মুসতানাদ হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং কেউ এটাকে অস্বীকার করেন নি।

চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন

এবার চিন্তা করে দেখুন, মারিয়া কিবতিয়ার কাহিনী যে সব রিওয়ায়াতে আছে সেগুলো প্রথম বা দ্বিতীয় স্তরের নয় বরং তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের গ্রন্থাদি থেকে নেওয়া হয়েছে। উপরন্তু প্রথম স্তরের হাদীস গ্রন্থাদি অর্থাৎ কুতুবে সিহাহ্ বিশেষ করে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়াতসমূহ ঐ সব রিওয়ায়াতের পরিষ্কার বিরোধীও বটে। আর ঐ সব রিওয়ায়াতে আয়াতে তাহরীমের যে শানে নুযূল বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে সহীহ রিওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনার কোনই সম্পর্ক নেই।

এই সবগুলো রেওয়ায়াত হচ্ছে তাবারানী, ইবনে সা'দ, ইবনে জারীর তাবারী, প্রমুখের। আর এই সব গ্রন্থকারদের সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে লিখেছি যে, এদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু রেওয়ায়াত সমূহকে একত্রিত করা এবং সব ধরনের হাদীসকে নষ্ট হতে না দিয়ে কোথাও না কোথাও ধরে রাখা। এই গ্রন্থকার তথা সংকলকরা কখনো এই দাবী করেন নি যে, তাদের রেওয়ায়াতকৃত সবগুলো হাদীসই সহীহ্। মুহাক্কিকরাও (হাদীসের পর্যালোচনাকারীরাও) তাদেরকে কখনো এই মর্যাদা দেন নি। অথবা তাবারী ও তাবারানী প্রমুখের রেওয়ায়াত শুধুমাত্র তখনই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন অন্যান্য দলীল দ্বারা এগুলোর সিহাত (শুদ্ধতা) প্রমাণিত হবে কিংবা নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী এগুলোর সনদ সঠিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। বিশেষ করে এগুলো তখন মোটেই গ্রহণীয় হবে না যখন বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য হাদীস এগুলোর বিরোধিতা করবে এবং সিহাহ্ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থাদি এগুলো সম্পর্কে নীরব থাকবে।

সহীহাইন-এর বর্ণনা

বুখারী-মুসলিমের রেওয়ায়াত,

لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ الاٰية وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلٰى بَعْضِ الاٰية .

–এও এই দুই আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে অপর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) যে জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন সে জিনিস সম্পর্কে সহীহ্ রেওয়ায়াত ও ইসনাদ দ্বারা প্রমাণিত খোদ হযরত 'আইশা (রা) এর যে উক্তি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, তা মধু ছিল– মারিয়া

কিবতিয়া নয়। ইমাম বুখারী পাঁচ ছয়টি অধ্যায়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কোথাও দেখা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মারিয়া কিবতিয়াকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় আমরা কি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ্ গ্রন্থের গ্রন্থকারদের কথা নির্ভরযোগ্য মনে না করে ওয়াকিদী, ইবনে সা'দ, তাবারানী, তাবারী প্রমুখের কথাই নির্ভরযোগ্য মনে করবো?

হাদীস বিষয়ের উসূলের মাপকাঠিতে

হাদীস বিষয়ের উসূলের মাপকাঠিতেও এ সব হাদীস টেকে না। তাবারানী,ইবনে মারদভিয়া,ইবনে জারীর প্রমুখ বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন; কিন্তু কোন পদ্ধতিতেই এ সব রেওয়ায়াতের সনদ সহীহ্ নয়। আমরা সামনে হাদীস বিষয়ক পর্যালোচকদের ব্যাখ্যা পেশ করবো।

অবশ্য শুধুমাত্র একটি মুব্হাম (অস্পষ্ট) ও মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) রেওয়ায়াত দ্বারা এই সব রেওয়ায়াতকে দৃঢ় করণের চেষ্টা করা হয়। ঐ রেওয়ায়াতের দুটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিকে কোন কোন মুহাদ্দিস সমর্থন করতে চেয়েছেন এবং এটিই একমাত্র রিওয়ায়াত, যাতে মারিয়া কিবতিয়ার গল্পটি অপেক্ষাকৃত উত্তম সনদ দ্বারা বর্ণিত বলে মনে করা হয়। আমি শুধুমাত্র এই রিওয়ায়াতের উপর আলোকপাত করবো এবং এথেকে প্রকাশিত হয়ে পড়বে যে,যখন শ্রেষ্ঠতম ও সবলতম রিওয়ায়তের এই অবস্থা তখন ঐ সব রেওয়ায়াত এবং সেগুলোর ইসনাদের কি অবস্থা হবে যেগুলোকে তাদের সংরক্ষণকারীরাও উপস্থাপনের যোগ্য মনে করেন নি।

মাসরূক ও রাক্কাশীর রিওয়ায়াত

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী 'কিতাবুত তাফসীর'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে এই সব রেওয়ায়াতের উপর আলোচনা করেছেন এবং যত ভিন্ন ভিন্ন সনদে এগুলো বর্ণিত হয়েছে তাও চোখের সামনে রেখেছেন।

واختلف فى المراد بتحريمه ففى حديث عائشة ثانى حديثى الباب انى ذلك بسبب شربه صلى اللّه عليه وسلم العسل عند زينب بنت جحش .... ووقع عند سعيد بن منصور به اسناد صحيح الى مسروق قال : حلف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لحفصة لا يقرب امة وقال هى على حرام (جلد : ٨ صحفه : ٥٠٣ مطبوعه مصر)

"যে জিনিসটি রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন তা নির্দিষ্টকরণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 'আইশা (রা) এর হাদীসের মধ্যে, যা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় হাদীস– বলা হয়েছে, এর কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) এর মধু পান, যা তিনি যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) এর ওখানে (পান) করেছিলেন। কিন্তু সায়ীদ বিন মানসূর সহীহ্ সনদের সাহায্যে, যা মাসরূক পর্যন্ত পৌঁছেছে, বর্ণনা করেছেন যে, এর কারণ ঐ কসম, যা রাসূলুল্লাহ (সা) হাফ্সার জন্য খেয়েছিলেন এই মর্মে যে, তিনি তাঁর দাসীর কাছে আর কখনো যাবেন না এবং সে তাঁর জন্য হারাম।"

হাফিয ইবনে হাজার এই সব রেওয়ায়াতের মধ্যে শুধুমাত্র একটি রেওয়ায়াতকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং সেটার সনদ সহীহ্ বলে বর্ণনা করেছেন। বাকী রেওয়ায়াতসমূহ যেগুলো তাবারানী, ইবনে মরদভিয়া, মুসনাদে হায়ছাম ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছ এবং সাধারণতঃ কুরতুবী, ওয়াহিদী প্রমুখ নিজ নিজ তাফসীরের মধ্যে যেগুলো উদ্ধৃত করেছেন সেগুলোকে শুধুমাত্র এজন্য বর্ননা করা হয়েছে যে, মাসরূক বর্ণিত হাদীসটি যখন নির্ভরযোগ্য বলে

সাব্যস্ত করা হয়েছে তখন ঐ সব রেওয়ায়াতকে দৃঢ়করণের কাজে ব্যবহারের জন্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে – যদিও রিওয়ায়াত হিসাবে এগুলোর মধ্যে কোনটির সনদই নির্ভরযোগ্য নয়। আর এ কারণেই শেষ পর্যন্ত তিনি লিখেছেন–

وهذا طرق كلها يقوى بعضه بعضا فيحتمل ان تكون الاية فى السببين معًا (جلد ٨ صفحه ٥٠٣)

"আর যাবতীয় ভিন্ন তরীকা পরস্পর পরস্পরকে শক্তি যোগায়। অতএব এ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় যে, সম্ভবতঃ সূরা তাহরীমের প্রথম আয়াত উভয় ঘটনা সম্পর্কেই এক সাথে নাযিল হয়েছে।"

এই উক্তির মধ্যে হাফিয ইবনে হাজার উভয় ঘটনার মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে আমি সমনে কিছু লিখবো। এখানে আমার শুধু এ বিষয়টি দেখানো উদ্দেশ্য যে, মারিয়া কিবতিয়া সম্পর্কে যত রিওয়ায়াত আছে তার মধ্যে শুধুমাত্র মাসরূক বর্ণিত রিওয়ায়াত দ্বারাই হাফিয ইবনে হাজার প্রভাবিত হয়েছেন। আর অন্য সনদ ও পন্থার রিওয়ায়াতগুলো শুধুমাত্র এজন্য উপস্থাপন করেছেন যে, এগুলো মাসরূক বর্ণিত হাদীসকে সমর্থনের মাধ্যমে যৎকিঞ্চিৎ শক্তিশালী করে। সুতরাং এই বিষয়ে মাসরূক বর্ণিত রিওয়ায়াতই শক্তিশালী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাফিয ইবনে কাছীরের বর্ণনা

হাফিয ইবনে কাছীরও এই রিওয়ায়াতের অপর একটি পন্থাকে তাঁর তাফসীরে সমর্থনযোগ্য বলেছেন– যদিও তিনি নিজেও সূরা তাহরীমকে এই ঘটনার শানে নুযূল হওয়াটা সমর্থন করেন কি – যেমন সামনে বর্ণনা করা হবে।

হাফিয ইবনে কাছীর সূরা তাহরীমের তাফসীরে তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী যাবতীয় ঐ সব রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন, যা ইমাম তাবারী প্রমুখ এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যেহেতু এর সনদের ব্যাপারটি তাঁর কাছে অবিদিত ছিল না তাই তিনি কোন পন্থা বা কোন সনদকেই সমর্থন করেন নি। অবশ্য যে রিওয়ায়াতটি হায়ছাম বিন হাবীব আপন মুসনাদে উদ্ধৃত করেছেন সেটিকে তিনিও উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে এর সনদ সহীহ্।

قال الهيثم فى مسنده ثنا ابو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى ثنا مسلم بن ابراهيم (الخ) عن عمر قال قال النبى صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تخبرى احدا وان ام ابراهيم علىّ حرام فقالت اتحرم ما احل الله لك؟ قال فوالله لا اقربها .... هذا اسناد صحيح ولم يخرجه احد من اصحاب الكتب الستة واختاره الحافظ الضياء المقدسى (فتح البيان جلد : ١٠ ص : ١٨)

"হাইছাম তার মাসনাদে হযরত উমর (রা) থেকে ইবনে রাক্কাশী প্রমুখের বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হাফসা (রা) কে বলেন, তুমি একথা কাউকে বলবে না। ইবরাহীমের মা (মারিয়া কিবতিয়া) আমার উপর হারাম। হাফ্সা (রা) বলেন, আপনি কি সেই জিনিসকে হারাম করবেন, যা আল্লাহ্ আ'আলা আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো তার কাছে যাব না। এই রেওয়ায়াতের সনদ সহীহ্, কিন্তু সিহাহ্ সিত্তার কোন সংকলকই এটাকে উদ্ধৃত করেন নি। অবশ্য হাফিয যিয়া মুকাদ্দাসী তার মুসতাখরাজে এটাকে গ্রহণ করেছেন।"

প্রকৃতপক্ষে এই রেওয়ায়াতও সেই মাসরূক বর্ণিত রেওয়ায়াত ছাড়া কিছু নয়; কেবল অন্য পন্থায় বর্ণিত হয়েছে এই যা। অতএব সমগ্র ঐ সব রেওয়ায়াত যেগুলোর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাফ্সা (রা) এর ঘরে মারিয়া কিবতিয়ার সাথে নির্জনবাসে ছিলেন, হযরত হাফ্সা (রা) তাতে রাগান্বিত হন, যার ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) লাজ্জিত হন এবং কসম খান ইত্যাদি ইত্যাদি, সেগুলোর মধ্যে এই একটি মাত্র রেওয়ায়াত – যার একটি পন্থাকে হাফিয ইবনে হাজার এবং অপর একটি পন্থাকে হাফিয ইবনে কাছীর সমর্থনযোগ্য বলেছেন এবং এও বলেছেন যে, এগুলো সহীহ্ সনদে বর্ণিত আছে – ছাড়া আর যত তরীকার যত রেওয়ায়াত আছে সেগুলোর উল্লেখ করাও বাহুল্য। কেননা সেগুলোর সহীহ্ হওয়া সম্পর্কে আমাদের সামনে কোন দলীল নেই।

মাসরূক ও রাক্কাশীর রেওয়ায়াতের হাকীকত

এবার আসুন, আমরা এই রেওয়ায়াতের প্রতি দৃকপাত করি এবং দেখি হাদীস বিষয়ক উসূলের দিক দিয়ে এটা কতটুকু স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য। আর মূল ঘটনার উপর এর কতটুকু প্রভাব পড়তে পারে?

সর্বপ্রথম যে জিনিসটির প্রতি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে তা এই যে, এই রিওয়ায়াতের মধ্যে না মারিয়া কিবতিয়ার উল্লেখ আছে, আর না ঘটনার ঐ সব গুরুত্বপূর্ণ অংশের উল্লেখ আছে, যা ইমাম তাবারী প্রমুখ আপন আপন রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়ায়াতে শুধুমাত্র এতটুকু বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাফ্সা (রা) কে বলেন, আমি আমার দাসীর কাছে যাব না, এজন্য কমস খাচ্ছি। অতএব এই রেওয়ায়াতটি যদি স্বীকার করেও নেওয়া হয় তবু ঘটনার অবশিষ্ট বিস্তারিত বর্ণনার জন্য শুধুমাত্র কিয়াস (অনুমান) ছাড়া হাতে আর কিছু থাকেনা।

দ্বিতীয় এই রেওয়ায়াতের প্রথম বর্ণনা ধারা, মাসরূক পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়। মাসরূক সাহাবী ছিলেন না, বরং ছিলেন তাবিয়ী (অর্থাৎ তিনি রাসূলুল্লাহ্কে দেখেন নি)। কিন্তু তিনি এই ঘটনা কোন্ সাহাবী থেকে শুনেছেন সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি। আর যে ব্যক্তি থেকে তিনি শুনেছেন তিনি কোন্ হিসাবেই বা তা বর্ণনা করেছেন তা জানা যায় নি। শুধু তার বর্ণনা পরবর্তী রাভীরা রিওয়ায়াত করেছেন মাত্র। হাদীসের পরিভাষায় এটাকে মুনকাতি' বলা হয়। অর্থাৎ এই হাদীসের বর্ণনা শিকল রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌছে নি। এ ধরনের একটি মুনকাতি' রিওয়ায়াতকে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ্ হাদীস গ্রন্থের মুত্তাসিল ও কাছীরুত তুরুক্ (বহুবিধ পন্থায় বর্ণিত) সহীহ্ রিওয়ায়াতের মুকাবালায় কি করে সমর্থন করা যেতে পারে? বলা যেতে পারে এ দু'টি হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কি সম্ভব নয়? না, এ ক্ষেত্রে তাও সম্ভব নয়। আমরা সামনে এর ব্যাখ্যা প্রদান করবো।

বাকি রইলো রিওয়ায়াতের অপর পন্থা যেটাকে হাফিয ইবনে কাছীর সমর্থনযোগ্য মনে করেছেন। এই রেওয়ায়াতও তার অভ্যন্তরে এমন ক্ষমতা রাখে না যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিম সূরা তাহরীমের শানে নুযূলে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা অস্বীকার করে অন্য একটি ঘটনাকে সেস্থলে প্রতিষ্ঠিত করবে, এমতাবস্থায় যে, সমগ্র সহীহ্ কিতাবসমূহ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমকে সমর্থন করে।

রাক্কাশীর মর্যাদা

এর সনদ বর্ণনার মধ্যে সর্বপ্রথম যে রাভী আমাদের সামনে আসেন তিনি হচ্ছেন আবূ কালাবা আবদুল মালিক বিন মুহাম্মদ আর রাক্কাশী। হাফিয ইবনে হাজার 'তাহযীব' এর মধ্যে তার আচার-আচরণ ও স্বাভাব-চরিত্রের কথা লিখেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অনেক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাকে সমর্থন করেছেন। ইবনে হিব্বান বলেছেন, তিনি ছিকাহ্দের (নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের) অন্যতম। ইবনে জারীর প্রমুখও তার স্মরণ শক্তির কথা স্বীকার করেছেন। তার সনদ বর্ণনা প্রসংগে দারাকুতনীর মত ব্যক্তির অভিমত হলো,

كثير الخطا فى الاسانيد والمتون كان يحدث من حفظه فكثرت الا وهام فى روايته .

"তিনি রেওয়ায়াতের সনদসমূহে এবং হাদীসের মূল শব্দে অনেক ভুলভ্রান্তি করে থাকেন। তার এই রীতি ছিল যে, তিনি শুধুমাত্র নিজের স্মরণ শক্তির উপর ভিত্তি করে হাদীস বর্ণনা করতেন। এ কারণে তার রেওয়ায়াতের মধ্যে অনেক স্মৃতিভ্রম পরিলক্ষিত হয়।"

এরপর এই 'তাহযীব' এর মধ্যেই দারাকুতনীর দ্বিতীয় উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা এই যে, لا يحتج بما ينفرد به . –"তিনি একাকী যে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন তা দলীল হিসাবে পরিগণিত হয় না।"

শেষ পর্যন্ত খোদ ইবনে হাজার লিখেছেন–

بلغني عن شيخنا ابى القاسم انه قال : عندى عن ابى قلابة عشرة اجزاء ما منها حديث مسلّم اما فى اسناد واما فى المتن كان يحدث من حفظه فكثرت الاوهام فيه فتامل .

অর্থাৎ সনদ, মতন (বচন) সব কিছুই তিনি তার স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করে বর্ণনা করতেন। ফলে তাতে অনেক স্মৃতিভ্রম পরিলক্ষিত হত।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন কোন মুহাদ্দিস ঐ হাদীসকে অস্বীকার করেছেন, যে হাদীসটি আবু কালাবা রাক্কাশী, আবু হুরায়রা (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি হলো –

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ

"নবী (সা) সালাতে দাঁড়ান,এমন কি তাঁর উভয় পা ফুলে যায়।"

এ কথটি হাফিয ইবনে হাজার 'তাহ্যীব' এর মধ্যে পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

এই সব আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, আবু কালাবার সনদ ও মতনে (বচনে) যে প্রচুর ভুল–ভ্রান্তি থাকে তা পর্যালোচকদের দৃষ্টিতে পরিষ্কার ধরা পড়েছে।

মারিয়ার কাহিনী ও হাদীস বিষয়ক মুহাক্কিকীন

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ ব্যাপারে সেই রেওয়ায়াত থেকে সহীহ্ অন্য কোন রিওয়ায়াতই পাওয়া যায় না, যে রেওয়ায়াতে হযরত 'আইশা (রা) থেকে শানে নুযূল বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত আইশা (রা) এর এই রেওয়ায়াতটি হাদীসের ইমাম ও মুহাক্কিকগণ নির্ভরযোগ্য হিসাবে তাঁদের গ্রন্থাদিতে উদ্ধৃত করেছেন। মুলতঃ এটাই আসল ও প্রকৃত ঘটনা এবং একমাত্র এটাই গ্রহণীয়।

রাক্কাশীর রেওয়ায়াতকে সমর্থন করা সত্ত্বেও খোদ হাফিয ইবনে কাছীর পরবর্তীতে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, -

وَالصَّحِيْحُ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ فِىْ تَحْرِيْمِهِ الْعَسَلَ كَمَا قَالَ الْبُخَارِىُّ عِنْدَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ

(ابن كثير جلد : ١٠ صفحه ١٩)

"এটাই সঠিক যে, সূরা তাহরীমের প্রথম আয়াত এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মধুকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন, যেমন ইমাম বুখারী এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন।"

এ বিষয়টি শুধু হাফিয ইবনে হাজার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং অন্যান্য সমালোচক ও পর্যালোচকরা পরিষ্কার ভাষায় লিখে দিয়েছেন যে, মারিয়া কিবতিয়ার এই ঘটনা সম্পর্কে কোন সহীহ্ রেওয়ায়াত পাওয়া যায় নি। আল্লামা

আইনী শরহে বুখারীতে এই সব রেওয়ায়াত উল্লেখ করার পর লিখেছেন,

والصحيح فى سبب نزول الاية انه فى قصة العسل لا فى قصة مارية المروى فى غير الصحيح (عينى جلد : ٩ ص : ٥٢٨)

"আর এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে সহীহ্ ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত এটাই যে, তা মধুর সাথে সম্পর্কিত এবং মারিয়া কিবতিয়ার কাহিনীর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, যা সহীহ্ গ্রন্থাদি ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হয়েছে।"

কাযী আয়াযের অভিমতও তাই। বরং যে কথা আল্লামা আইনী লিখেছেন তা প্রকৃতপক্ষে কাযী আয়াযেরই কথা। ইমাম নভভী 'শারহে সহীহ্ মুসলিম'-এ তাঁর অভিমত এই সব শব্দের মাধ্যমেই ব্যক্ত করেছেন। খোদ ইমাম নভভীর অভিমতও তাই-

ولم تات قصة مارية من طريق صحيح (نووى جلد : ١ مطبوعه مولانا احمد على مرحوم صفحة : ٤٧٩)

অর্থাৎ মারিয়া কিবতিয়ার কাহিনী কোন সহীহ্ ও শুদ্ধ পন্থায় বর্ণিত হয় নি।

এ ধরনের পরিষ্কার ও স্পষ্ট ব্যাখ্যার পর কে বলতে পারবে যে, মারিয়া কিবতিয়ার কাহিনী সহীহ্ ও শুদ্ধ। আর এটা কী করেই বা সমীচীন ও বৈধ হতে পারে যে, এমন একটি বানোয়াট কাহিনীকে ইসলাম বিদ্বেষী শত্রুরা একটি সত্যিকার ঘটনার রূপ দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে আমাদের সামনে পেশ করেছেন।

তাবূক যুদ্ধ

মুখবন্ধ–১

[সংকলক]

গায্ওয়া বা ধর্মীয় যুদ্ধের গুরুত্ব

তাবূক যুদ্ধ ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) এর পবিত্র জীবনের শেষ যুদ্ধ। বিভিন্ন কারণে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

১। সেই সময়ে দু'টি বড় সাম্রাজ্য ছিল। একটি রোমান এবং অন্যটি পারস্য। রিসালাতের যুগে এগুলোর সেরূপ মর্যদা ছিল, যেরূপ মর্যাদা আজ আমেরিকা ও রাশিয়ার। এই দুই সাম্রাজ্যের একটির সাথে মুসলিম বাহিনীর সরাসরি সংঘর্ষের এটাই ছিল প্রথম ঘটনা।

২। এজন্য ত্রিশ হাজার মুজাহিদ তৈরী হন। তাঁদের সাথে উট ছাড়াও, তাবাকাতে ইবনে সা'দের বর্ণনা অনুযায়ী দশ হাজার ঘোড়া ছিল। উটের সংখ্যা কত ছিল তার সঠিক হিসাব জনা যায় নি। আরব ভূখন্ড থেকে এই পরিমাণ যুদ্ধ সামগ্রীসহ এত বড় বাহিনী ইতিপূর্বে আর কখনো গঠিত হয় নি।

৩। সকল মুজাহিদই ছিলেন রোকার বা স্বেচ্ছাসেবী। তাঁদের মধ্যে কেউই বেতনভোগী ছিলেন না। প্রয়োজনীয় আসবাব-সামগ্রী এবং পাথেয় ছাড়াও সওয়ারী (বাহন) সমূহও স্বেচ্ছাভিত্তিক সংগৃহীত হয়েছিল।

৪। এই স্বেচ্ছাসেবীদের বিরাট মর্যাদার কথা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্র এই খাঁটি ও ভাগ্যবান বান্দাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের জানমাল এবং নিজেদের মালিকানাধীন প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহ্র রাহে অকাতরে বিলিয়ে দেবার মানসিক শক্তিদান করেছিলেন।

৫। গন্তব্যস্থান ছিল অনেক দূরে। রাস্তা ছিল দুর্গম ও বন্ধুর। মওসুমও ছিল যারপর নেই প্রতিকূল। কিন্তু ন্যায় ও সত্যের অনুসারী বান্দারা রাসূলুল্লাহ (সা) -এর আহবানে সাড়া দিতে এক মুহূর্তের জন্যও ইতস্ততঃ করেন নি।

৬। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এটা কত বড় ঈমানবর্ধক ও বিস্ময়কর ঘটনা যে, আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র রাসূল মাত্র সোয়া আট বছর পূর্বে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় মক্কা মুকাররমা থেকে বের হয়ে মদীনা মুনাওওয়ারায় এসে পৌছেছিলেন এবং অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তিনি এত বিরাট শক্তির অধিকারী হন যে, মদীনা থেকে শত শত মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে সীমান্তের সেই কায়সারের মুকাবালা করার জন্য তৈরী হয়ে গেলেন, যে কায়সার মাত্র কিছুকাল পূর্বে মহাপরাক্রমশালী পারস্য সাম্রাজ্যের উপর দারুন আঘাত হেনেছিল।

এটা যে একটা বিশেষ মানসিক ও আত্মিক প্রশিক্ষণের ফলশ্রুতি ছিল, তা কি কেউ অস্বীকার করতে পরবে?

তাবূকের অবস্থান

তাবূক, হিজাযের উত্তর সীমান্তবর্তী সেই জনপথে অবস্থিত, যা সিরিয়া থেকে মদীনা মুনাওওরা কিংবা মক্কা মুকাররমায় আগমনকারী বাণিজ্য কাফেলাসমূহের সাধারণ রাস্তা ছিল। এরপর ইসলামের আবির্ভাবের পর হজ্জ ও যিয়াররতের উদ্দেশ্যে যে সব কাফেলা আসা-যাওয়া করতে থাকে তাদেরও সাধারণ রাস্তা ছিল এটাই। বর্তমান শতাব্দির প্রারম্ভে মরহুম সুলতান আবদুল হামিদ খান যখন হিজায রেলওয়ে নির্মাণ করান তখন তাবূক ছিল এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেশন।

খোদ মরহুম মাওলানা আযাদের বর্ণনা অনুযায়ী মদীনা মুনাওওরা থেকে তাবূকের দূরত্ব ছয়শ দশ কিলোমিটার। মোটামুটি হিসাব অনুযায়ী তিনশ একাশি মাইল। 'আরযুল কুরআন' শীর্ষক ভ্রমণকাহিনীতে বলা হয়েছে, মদীনা মুনাওওরা থেকে আল আলার দূরত্ব পাঁচ শ বিশ মাইল।[১] আর আল আলা থেকে আল হিজ্‌র কিংবা মাদায়িনের দূরত্ব ত্রিশ মাইল। তাতে এও লেখা হয়েছে যে, মদীনা মুনাওওরা থেকে মাদায়িনে সালিহ্ পর্যন্ত যে রাস্তা দিয়ে আমরা ভ্রমণ করি, এটা মোটামুটিভাবে সেই রাস্তা, যে রাস্তা ধরে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবা কিরাম (রা) তাবুক যুদ্ধে গমন করেছিলেন।[২]

অর্থাৎ সাড়ে পাঁচশ মাইলের এই দুরত্বের মধ্যে মাদায়েনে সালিহ্ থেকে তাবূক পর্যন্ত দূরত্বও গিয়ে দাঁড়ায় সাড়ে ছয়শ মাইল কিংবা তার চাইতেও বেশী।

প্রাচীনকালের দূরত্ব নির্ধারণের হিসাব অনুযায়ী মদীনা মুনাওওরা এবং তাবূকের মধ্যবর্তী দূরত্ব চৌদ্দ মারহালা বলা হয়েছে। কিন্তু সাড়ে ছয়শ মাইলকে চৌদ্দ মারহালা ধরে নেওয়াটা বাহ্যতঃ খুবই কঠিন। এটা সম্ভব যে, 'সফরনামা-ই-আরযুল কুরআন' এর হিসাব ঠিক নয়, কিংবা এটা সম্ভব যে, মোটর গাড়ীর হিসাবের মিটার অনুযায়ী এই পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। সবশেষে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, কিলোমিটারকে ভুলবশত: মাইল মনে করা হয়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায় মদীনা ও মাআনের মধ্যবর্তী দূরত্ব আটশ কিলোমিটার অর্থাৎ পাঁচশ মাইল বলা হয়েছে। আর তাবূক মাআন থেকে বেশ দুরত্বে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

তাবূক অভিযানের কারণ

তাবূক অভিযানের কারণ এই ছিল যে, উত্তর দিক থেকে এই মর্মে অনবরতঃ খবর আসছিলো যে, রোমের কায়সার আরবের উপর হামলা করার জন্য অত্যন্ত জোরেশোরে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। কেননা সে মূতা যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে চায়। ঐ যুদ্ধে শুধামাত্র তিন হাজার মুসলিম মুজাহিদ কায়সার ও উপজাতীয়দের বেশ কয়েকগুণ বেশী সৈন্যকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে হটে যেতে বাধ্য করেছিল। তখন থেকে কায়সার এবং তার অধীনস্থ সীমান্তবর্তী রাজারা, যাদের মধ্যে গাসসানী ছিল সর্বাগ্রে, এই সংকল্প গ্রহণ করেছিল যে, ইসলামী শক্তিকে তার সূচনাকালেই পিষে ফেলতে হবে।

মরহুম মাওলানা শিবলী বলেন, "সিরিয়া থেকে নাবাতী বণিকরা যায়তূন তেল বিক্রি করার জন্য মদীনায় আসত। তারাই সংবাদ দিয়েছিল যে, রোমানরা সিরিয়ায় একটি বিরাট বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছে এবং ঐ বাহিনীর সকল সদস্যকে আগাম এক বছরের বেতনও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাখাম ও গাসসানের আরবরাও ঐ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবঙ তাদের অগ্রবর্তী বাহিনী বালকা পর্যন্ত এসে পৌঁছে গেছে।[৩] 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' গ্রন্থে তাবারানী থেকে একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, আরবের ঈসায়ীরা হিরাক্লিয়াসকে লিখেছিল যে, মুহাম্মদ (সা) ইন্তিকাল করেছেন এবং ভয়ানক দুর্ভিক্ষের কারণে আরবরা না খেয়ে মারা পড়ছে। এর উপর ভিত্তি করে হিরাক্লিয়াস চল্লিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করে।[৪] গাসসানীরা ইসলামী শক্তি ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত ছিল। কেননা তারা সীমান্ত অঞ্চলে থাকত। অতএব যদি তারা কায়সারকে উত্তেজিত করার জন্য তাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়ে থাকে তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কায়সার এবং গাসসানীরা আক্রমণ করবে এরূপ গুজব তৎকালীন মদীনায় সাধারণভাবে রটে গিয়েছিল। ঈলা সম্পর্কিত একটি ঘটনা থেকে এর প্রমাণ মিলে। জনৈক আনসারী হযরত উমর (রা) এর প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি এক রাত্রে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় এসে হযরত উমর (রা) এর দরজায় করাঘাত করেন। উমর (রা) দরজা খুলে দিলে পর তিনি বলেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। হযরত উমর (রা) একথা শুনতেই বলে উঠেন, গাসসানীরা কি মদীনা আক্রমণ করেছে। অথচ তখন আনসারীর মনে ছিল 'ঈলা' থেকে সৃষ্ট এই মর্মের একটি গুজব যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দরজায় করাঘাত পড়তেই হযরত উমর (রা)-এর মনে গাস্‌সানীদের আক্রমণের

ব্যাপারটি উদিত হয়। কেননা ঐ সময়ে গাসসানীরা যে কোন মুহূর্তে মদীনা আক্রমণ করবে, একথাটি সবাই বলাবলি করতেন।

প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ

যখন বিভিন্নসূত্রে এই খবরের সত্যতা প্রমাণিত হল যে, কায়সার মদীনা আক্রমণের সংকল্প নিয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সিদ্ধান্ত নেন যে, যুদ্ধ যখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তখন হিজাযের উত্তর সীমান্তেই তা সংঘটিত হওয়া উচিত। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি সুবিধা ছিল। যেমন–

১। প্রথম ধাপেই যুদ্ধকে আক্রমণকারীদের দেশে ঠেলে দেওয়া যাবে এবং নিজেদের দেশকে হত্যা ও লুটপাট থেকে সংরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে।

২। শত শত মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে প্রতি আক্রমণের জন্য সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেলে শত্রুদের অগ্রাভিযান স্বাভাবিকভাবে স্তব্ধ হয়ে পড়বে।

৩। শত্রু যখন কোন দেশে ঢুকে পড়ে তখন তারা দেশেরই ভিন্ন মতাবলম্বী কিছু লোককে নিজেদের পক্ষে টেনে নেবার চেষ্টা করে। হিজাযের উত্তরাংশের লোকেরা হয় ইসলামে নতুন প্রবেশ করেছিল এবং তাদের অন্তরে ইসলামের মর্মকথা তখনও ভালভাবে প্রবেশ করে নি, কিংবা ইসলামের দিকে তারা সবেমাত্র আকৃষ্ট হচ্ছিলো – এমতাবস্থায় শত্রুদের অগ্রাভিযান ঐ সব লোককে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করতে পারত,যারা মাত্র কিছুদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর যারা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিলো তাদেরকে ইসলামবিমুখ করে তুলতে পারত।

৪। শত্রু যখন কোন দেশের মধ্যে ঢুকে পড়ে তখন দেশবাসীদের জানমালের নিরাপত্তা সংকটের সম্মুখীন হয়। অতএব সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে গেলে সকল লোকই শান্তি ও স্বস্তি লাভ করবে। অপর দিকে শত্রুদের মনে স্বাভাবিকভাবে ভয়ভীতি ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হবে।

যাহোক, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক অভিযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ঘোষণা জারী করেন এবং সর্বস্তরের লোক– বিশেষ করে ধনবান লোকদেরকে মুজাহিদদের জন্য সওয়ারীর জন্তু সংগ্রহ এবং অন্যান্য আসবাব সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে আহবান জানান।

নানা প্রতিকূলতা

ঘটনাক্রমে তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল মুসলমানদের জন্য খুবই প্রতিকূল। গ্রীষ্ম মওসুম চলছিল। সফর ছিল দীর্ঘ এবং পথ ছিল বন্ধুর। খরার কারণে সর্বত্র দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিরাজ করছিলো। বাগানের ফল পাকা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং এরূপ অবস্থায় লোকেরা স্বভাবতই সফরে অনাগ্রহী থাকত। কিন্তু ব্যাপার ছিল জাতীয় প্রতিরক্ষার। সুতরাং এই অভিযানে বের না হলে শুধু এক মওসুমের ফসলই নষ্ট হবে না, বরং সমগ্র জাতির জানমালের নিরাপত্তাও ব্যাহত হবে। এমতাবস্থায় কয়েকজন সাহাবী অত্যন্ত বদান্যতার পরিচয় দেন। যেমন ঃ

১। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর সমগ্র মাল, এমনকি জামার বোতাম পর্যন্ত খুলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সামনে পেশ করেন। যখন নবুওতী প্রদীপের এই পতঙ্গকে জিজ্ঞাসা করা হলো, পরিবার-পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছ তখন তিনি জবাব দেন, রেখে এসেছি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা।

২। হযরত উমর (রা) তাঁর সমগ্র মাল দু'ভাগ করে এক ভাগ আল্লাহ্‌র রাহে দান করেন।

৩। হযরত উছমান (রা) আসবাব সামগ্রী বোঝাইকৃত তিনশত উট দান করেন এবং সেই সাথে নগদ দান করেন এক হাজার দীনার।[৫]

৪। হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) চল্লিশ হাজার দিরহাম দান করেন।

৫। মহিলারা প্রচুর অলংকার হাদিয়া হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে পেশ করেন।[৬]

৬। হযরত আবূ উকায়ল আনসারী সারা রাত কাঁধে-পিঠে পানি বয়ে এনে একটি ক্ষেত্রে সরবরাহ করেন এবং তার মজুরী বাবদ চার সের খেজুর পান। এর মধ্য থেকে দু'সের আপন পরিবার-পরিজনের জন্য রাখেন এবং বাকি দু'সের রাসূলুল্লাহ (সা) এর সামনে পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন নির্দেশ দেন, এই খেজুরগুলো (কল্যাণস্বরূপ) সমগ্র মালের উপর ছড়িয়ে দাও।

যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন

যে সব লোক তাবূকে অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে যায় নি, বরং পেছনে রয়ে গিয়েছিল তাঁদেরকে 'মুখাল্লাফীন' আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁদেরকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১। মুনাফিকীন। এরা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট ওজর পেশ করে যুদ্ধে না গিয়ে নিজ নিজ ঘরে বসে রয়েছিল। এরা মুসলমানদের যুদ্ধ সামগ্রীর স্বল্পতা এবং কায়সারের প্রচুর ধনসম্পদ দেখে ধরে নিয়েছিল যে, মুসলমানরা এই যুদ্ধে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। কায়সারের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির একটি প্রমাণ তাদের কাছে এই ছিল যে, সামান্য কিছুকাল পূর্বে কায়সার, পারস্য সাম্রাজ্যের উপর একটি বিরাট আঘাত হেনেছিল।

২। ঐ সব বিশুদ্ধ চিত্ত ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ নিঃস্ব মুসলমান, যাদের কোন সওয়ারী বা পাথেয়ের ব্যবস্থা ছিল না তাঁরা নিজেদের এই অসচ্ছলতা ও অসহায়তার কারণে রাতদিন রোদন করছিলেন এবং একারণে 'আল্ বাক্কাউন' (অতিশয় রোদনকারী) উপাধি লাভ করছিলেন।

৩। কিছু সংখ্যাক বিশুদ্ধ চিত্ত আনসারী, যারা আজ যাবেন কাল যাবেন বলে পরিকল্পনা তৈরী করে থাকেন এবং এরূপ করতে করতে তাঁদের সময় চলে যায়, তাঁরা আর অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। এদের উল্লেখ সামনে করা হবে।

মানুষের আধিক্য, সওয়ারীর স্বল্পতা এবং প্রয়োজনীয় আসবাব সামগ্রীর অভাবহেতু তাবূক অভিযাত্রীদেরকে 'জায়শুল উসরাত' বলা হয়। যেহেতু এই অভিযানের মধ্য দিয়ে মুনাফিকদের মুখোশ খুলে পড়েছিল এবং তারা যারপর নেই লাঞ্ছিত হয়েছিল তাই এই অভিযানকে 'গাযাওয়া-ই-ফাযিহা' ও বলা হয়। আর এ কারণে কোন কোন সাহাবী সূরা তাওবাকে সূরা ফাযিহা বলতেন।

বিশুদ্ধ-চিত্ততার ঈমানবর্ধক নমুনা

সফর ছিল খুবই দীর্ঘ। পথিমধ্যে যখন কেউ পেছনে পড়ে যেত এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সে কথা শুনতেন তখন বলতেন,ওকে ছেড়ে দাও। যদি তার মধ্যে কোন পুণ্যকামিতা থাকে তাহলে সে অবশ্যই তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবে। আর যদি তার অবস্থা অন্যরূপ হয় তাহলে ধরে নাও, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে তোমাদেরকে বাঁচিয়েছেন।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা) এর উট রাস্তার মধ্যে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ল এবং পেছনে থেকে গেল। শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় সে বসেই পড়ল এবং আর এগোতে চাইল না। উটের এই অবস্থা দেখে আবূ যর (রা) উটটিকে ছেড়ে দিয়ে যাবতীয় আসবাব সামগ্রী নিজের মাথায় তুলে নিলেন এবং বাহিনীর পদাংক অনুসরণ করে পায়ে হেটে চলতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কোন এক মনযিলে অবতরণ করলে কেউ একজন দেখল যে, এক ব্যক্তি পায়ে হেটে এগিয়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ (সা) কে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, সম্ভবতঃ সে আবূ যর হবে। শেষ পর্যন্ত দেখাও গেল তাই।

হযরত আবূ খায়ছামা (রা)-এর ঘটনা হচ্ছে এর চাইতেও বিস্ময়কর। রাসূলুল্লাহ (সা) ইতিমধ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন। সময় ঠিক দুপুর বেলা। প্রখর রৌদ্র কিরণ। হযরত আবূ খায়ছামা (রা) এর উভয় স্ত্রী পানি ছিটিয়ে তাদের

ঘর কিছুটা শীতল করেছেন। খাবারও তৈরী হয়ে গেছে। পান করার জন্য ঠাণ্ডা পানিও আনা হয়েছে। আবূ খায়ছামা (রা) এসে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। স্ত্রীদের এই আয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গ্রীষ্ম মওসুমে প্রখর সূর্যতাপে থাকবেন আর আবূ খায়ছামা স্ত্রীদের কাছে বসে পানাহার করবে, এটা কোন নায্য ব্যাপার হতে পারে না। আল্লাহ্‌র কসম, আমি কোন ঘরেই প্রবেশ করব না, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে মিলিত হই।

তিনি সওয়ারীর উট তলব করলেন এবং তখনই রওয়ানা হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইতিমধ্যে তাবূক পৌঁছে গিয়েছিলেন। কেউ একজন নিবেদন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, দূর থেকে একজন উষ্ট্রারোহী এগিয়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সে আবূ খায়ছামা হবে। নিকটে এলে দেখা গেল, তিনি আবূ খায়ছামাই। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, পেছনে থেকে যাবার দরুন তিনি একাকী শত শত মাইল দূরত্ব অতিক্রমকরে ইসলামী বাহিনীর সাথে মিলিত হয়েছিলেন।

আপাদমস্তক বিশুদ্ধচিত্ত এই মহান ব্যক্তিদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশ পালন ছিল তাঁদের জীবনের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের ঈমানের পরিপক্কতার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয় ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশ পালনের জন্য তাঁদেরকে তাগাদা দেওয়ার কোন প্রয়োজন হত না। তাঁদের অন্তরের প্রেরণাই তাঁদেরকে সে কাজে উদ্বুদ্ধ করত। (সংকলক)

টীকা ঃ

১। সফরনামা-ই-আরযুল কুরআন ঃ পৃষ্ঠা - ২১৮।

২। ঐ ঃ পৃষ্ঠা - ২২১।

৩। মূতা অভিযান প্রসংগে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, বালকা হচ্ছে বর্তমান জর্দান সাম্রাজ্যের একটি জেলা, যা জর্দান নদীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এবং লূত সমুদ্রের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

৪। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ৫১১।

৫। রাহমাতুল লিল আলামীনে আছে, হযরত উসমান নয় শ উট, একশ ঘোড়া এবং সেই সাথে নগদ এক হাজার দীনার দান করেন এবং সেজন্য তিনি 'মুজাহ্‌হিযে জায়শুল উসরা' (দুর্দিনে সেনাবাহিনীর জন্য আসবাব সামগ্রী সরবরাহকারী) উপাধি প্রাপ্ত হন। (প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ১৭৭)।

৬। আসাহ্‌হুস সিয়ার ঃ পৃষ্ঠা - ৩১৮।

মুখবন্ধ–২

হযরত আলী (রা) এর ঘটনা

রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক অভিযানে রওয়ানা হওয়ার সময় মুহাম্মদ বিন মাসলামা আনসারী-কে মদীনার কর্মকর্তা নিয়োগ করেন এবং আহলে বায়তের দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পণ করেন হযরত আলী (রা)-এর হাতে। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা মুনাওওরা থেকে তিন মাইল উত্তরে জারফে পৌঁছছেন এমনি সময়ে কোন কোন মুনাফিক গুজব রটিয়ে দেয় যে, হযরত আলী (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মন কষাকষি চলছে বলে তিনি তাঁকে পেছনে ছেড়ে চলে গেছেন। হযরত আলী (রা)-এর কানে এই গুজব পৌঁছা মাত্র তিনি হাতিয়ার তুলে নেন এবং সোজা জারফ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে গিয়ে মিলিত হন এবং নিবেদন করেন, আপনি আমাকে শিশু এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলেন, তুমি কি এটা পসন্দ কর না যে, তোমার সাথে আমার সেই সম্বন্ধ হোক, যে সম্বন্ধ হারুন (আ) এর সাথে মূসা (আ) এর ছিল।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সফর ছিল অনেক দীর্ঘ। আর এটাও জানা ছিল না যে, সীমান্ত পৌঁছার পর কী অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে এবং কতদিন সেখানে অবস্থান করতে হবে। তাই আহলে বায়তের দেখাশুনার জন্য কোন নিকটাত্মীয়কে রেখে যাওয়াই ছিল সবদিক দিয়ে সুবিধাজনক। যাহোক হযরত আলী (রা) জারফ থেকে মদীনায় ফিরে আসেন।

দিয়ারে সামূদ

তাবূক যাত্রাকালে রাস্তায় শুধুমাত্র একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। রাসূলুল্লাহ (সা) আল-হিজর (মাদায়িনে সালিহ্) অর্থাৎ দিয়ারে ছামূদে পৌঁছতেই নির্দেশ দেন, না এখানকার পানি পান করা যাবে, না এই পানি দিয়ে অযূ করা যাবে, না আটা মাড়ানো যাবে। যদি কেউ এ পানি দিয়ে আটা মাড়াই করে থাকে তাহলে সে যেন ঐ আটা উটকে খাইয়ে ফেলে। শুধুমাত্র একটি কূয়াকে এই নির্দেশের বাইরে রাখা হলো। আর তা হচ্ছে সেই কূয়া, যা হযরত সালিহ (রা) এর সময়ে ছিল এবং যা থেকে তাঁর উটনী পানি পান করত। এ কারণে ঐ কূয়াটি 'বি'-রে নাকাহ্' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ঐ স্থানটি অতিক্রম করেন তখন আপন পবিত্র চেহারার উপর পর্দা ঢেলে দেন এবং সওয়ারীকে অনবরতঃ হাঁকাতে থাকেন, যাতে ঐ জায়গাটি শীঘ্র অতিক্রম করা যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর এই রীতি ছিল যে, যে সব জায়গায় অতীতে কোন পাপিষ্ঠ জাতি আল্লাহ্র গযবের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিল, তিনি ঐ সব জায়গা অত্যন্ত দ্রুতবেগে অতিক্রম করে যেতেন। আরাফার রাস্তায় মুহাস্সার উপত্যকা পড়ে। এখানে আবরাহার হস্তিবাহিনী আল্লাহ্র আযাবে পতিত হয়েছিল। তাই এই উপত্যকা দিয়ে যাওয়া-আসার সময়ও তাড়াতাড়ি ঐ জায়গাটি অতিক্রম করা হত।

তাবূকে অবস্থান

তাবূক পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে প্রায় বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। এর মধ্যে না কায়সার ও গাসসানীর কোন বাহিনীর সন্ধান মিলে, আর না তাদের অতিক্রম প্রস্তুতি সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় যুদ্ধের কি কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে? সম্ভবতঃ সীমান্ত অঞ্চলের খ্রীষ্টান গোত্রগুলো এবং গাসসানীরা

উল্লেখিত আক্রমণ সংক্রান্ত গুজব ছড়িয়ে ছিল। এটাও হতে পারে যে, মুসলমানদের এই দুঃসাহসিক প্রতিরোধ প্রস্তুতি প্রত্যক্ষ করে শত্রুদের আক্রমণ স্পৃহা লোপ পেয়ে গিয়েছিল। কেননা মূতা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাদের সামনেই ছিল। সেই যুদ্ধে তো মাত্র তিন হাজার মুসলমান তাদের চেয়ে তেত্রিশগুণ বেশী শত্রুবাহিনীকে শেষ পর্যন্ত একেবারে দিশেহারা করে তুলেছিল। আর এবার তো মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ হাজার, উপরন্তু তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন খোদ রাসূলুল্লাহ (সা)।

যুদ্ধ তো হয় নি, কিন্তু গাসসানীদের দুষ্টমিপনা পরবর্তী সময়েও অব্যাহত থাকে। যখন কা'ব বিন মালিক এবং তাঁর দুই সঙ্গী যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ না করে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন এবং সে কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল তখন কা'বের নামে গাসসানের শাসকের একটি চিঠি আসে। তাতে লিখা ছিল, মুহাম্মদ (সা) তোমার কোন মূল্য দেন নি। অতএব তুমি আমার কাছে চলে এসো। কা'ব (রা) এই পত্রকে তাঁর জন্য আর একটি পরীক্ষা মনে করে তা পুড়িয়ে ফেলেন।

আয়লাবাসীদের জন্য আমাননামা

আয়লা নামক স্থানে অবস্থান করার সময় সেখানকার খ্রীষ্টান শাসক ইয়াহান্না বিন রূবাহ রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে হাযির হয় এবং জিযিয়া প্রদানের অঙ্গীকার করে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছ থেকে একটি আমাননামা লাভ করে।[১] আমান নামার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ-

"এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং মুহাম্মদ (স) এর পক্ষ থেকে, যিনি আল্লাহ্‌র রাসূল,ইয়াহান্না বিন রূবাহ্ এবং আয়লাবাসীদের জন্য আমাননামা (নিরাপত্তা পত্র)। সমুদ্রের মধ্যে তাদের নৌকা, জাহাজ – উপরন্তু স্থলপথে তাদের কাফেলা এবং মুসাফিররা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের যিম্মায় থাকবে। সিরিয়াবাসী, ইয়ামনবাসী বা সমুদ্রের মধ্যে যারা নৌকায় চলাচল করে তাদের মধ্যেও ঐ সব লোকেরা এই যিম্মাদারীর অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যারা তাদের কাছে থাকে। যদি এদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অঙ্গীকার চুক্তির বিরুদ্ধে কোন কাজ করে তাহলে তার মাল, তার প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। তা (মাল) ঐ ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে, যে তা নিয়ে নেবে। অবশ্য যে পানি ওদের দিকে যায় তা বন্ধ করা কিংবা যে স্থল ও জলপথে তারা চলে যেতে চায় তা বন্ধ করা বৈধ হবে না।

জারবা ও আযরাহ্‌বাসী

অনুরূপভাবে জারবা[২] ও আয্‌রাহ্‌বাসী আমাননামা লাভ করে। তাদেরকে যে সব শর্তে আমাননামা দেওয়া হয় তা হলঃ-

১। তারা রজব মাসে একশ দীনার করে প্রদান করতে থাকবে।

২। যদি মুসলমানদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি তার কৃত অপরাধের শাস্তির ভয়ে ওদের কাছে চলে যায় তাহলে তাকে মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করতে হবে।

দু'মাতুল জান্দাল

তাবুক থেকেই রাসুলুল্লাহ্ (সা) হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) কে চার শ বিশজন সওয়ার সহ দুমাতুল জান্দাল[৩] পাঠান । মদীনা মুনাওওরা থেকে এই জায়গার দুরত্ব পনেরো রাতের (সফরের সম পরিমাণ) বলে উল্লেখিত আছে। বনী কান্দাহ গোত্রের সর্দার উকায়দার বিন আব্দুল মালিক সেখানকার শাসনকর্তা ছিল। সে ছিল খ্রষ্টান ধর্মাবলম্বী। বর্ণিত আছে যে, হযরত খালিদ (রা) যখন দুমায় পৌঁছেন তখন চাঁদনী রাত ছিল এবং উকায়দার তখন শিকারে মত্ত ছিল। হযরত খালিদ (রা) তাকে আক্রমণ করে বসেন। উকায়দার ভাই খালিদ (রা) এর মুকাবালা করে মারা যান। শেষ পর্যন্ত উকায়দারের সাথে এই শর্তে আপোস হয় যে, সে দু'হাজার উট, আটশ ঘোড়া, চার শ বর্ম এবং চার শ বর্শা প্রদান করবে। এরপর হযরত খালিদ (রা) উকায়দার এবং তার অপর এক

ভাইকে সংগে নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা) এর কাছে মদিনা মুনাওওরায় এসে পৌছেন। জিযিরা প্রদানের শর্তে উকায়দারকে শুধু মুক্তি প্রদান করাই হয়নি; বরং দুমা ছাড়াও তীমার[৪] শাসন ভারও তার হাতে সোপর্দ করা হয়। এভাবে ঈলার সাথে তাবুকের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও ইয়হান্না বিন রুবাকে প্রদান করা হয়।

প্রকৃত পরিস্থিতি

দূমাতুল জান্দাল, ঈলা , জারবা এবং আয্‌রাহে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক পদত্ত আমাননামা সমুহ থেকে এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায় যে, ঐ সব এলাকায় কায়সার কিংবা গাসসানীদের কোন প্রভাব তখন অবশিষ্ট ছিল না । ফিলিপ হিট্টি লিখেছেন:

"বাইজেন্টাইনীরা সীমান্তবর্তী দুর্গসমুহের ব্যাপারে অসতর্কতা প্রদর্শন করে..............লূত সাগরের আশে পাশে কিংবা মদীনা ও গাযযার রাজপথের ধারে যে সব সিরীয় আরব গোত্র বসবাস করতো, কায়সার তাদের সেই ভাতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, যা তারা ইতিপূর্বে পেত" ।[৫]

মোটকথা, এই এলাকায় কায়সার ও গাসসানীদের প্রভাব শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাদের দ্বারা তখন আর কেউ ভীতিগ্রস্থ হত না । এর স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, ঈলা, জারবা এবং আযরাহবাসীরা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে রাসুলূল্লাহ্ (সা) এর দরবারে হাযির হয়ে তার নিকট থেকে আমাননামা লাভ করেছিল । এই সব আমাননামার কারণে হিজাযের উত্তর প্রান্তের মুসলমানদের জন্য একটি প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে উঠে।

যাত্রা ও প্রত্যাবর্তনের তারিখ

এ সম্পর্কিত যাবতীয় রিওয়ায়াতের মধ্যে আছে, রাসুলুল্লাহ (সা) হিঃ ৯ সনে[৬] তাবুকে গিয়েছিলেন। এর নির্দিষ্ট তারিখ কেউ উল্লেখ করেননি। তবে দিন ছিল বৃহস্পতিবার। তিনি (সা) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন হিঃ ৯ সনের রমজান মাসে।[৭] রাসুলুল্লাহ (সা)-এর প্রত্যাবর্তনের তারিখ কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। বিশ দিন কিংবা তার চাইতে দু'একদিন বেশী বা কম তিনি তাবূকে অবস্থান করেন। তাবূকে যেতে এবং সেখানে থেকে ফিরে আসতে আটাশ কিংবা তার চেয়ে দু' একদিন বেশি লেগে থাকবে। শৃধু এতটুকু জানা যায় যে, রাসুলুল্লাহ (সা) যখন মদীনা মুনাও্ওরার নিকটবর্তী যী-আওয়ানে পৌছেন তখন মসজিদে যিরার ধ্বংশ করে পুড়িয়ে ফেলার জন্য কিছু লোক প্রেরণ করেছিলেন।

তাবূকের অবস্থা

সফর নামা-ই- আরযুল কুরআন থেকে জানা যায় যে, তাবূকের যে স্থানে ইসলামী বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল সেখানে প্রথমে কাঠদ্বারা একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয় । সেখানেই রাসুলুল্লাহ্ (সা) সালাত আদায় করতেন। হিঃ ১২৪৫ সনে (ইং ১৮২০ সনে) একজন তুর্কী সামরিক অধিনায়ক নিজের খরচে সেখানে পাথর দ্বারা একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেন। খায়বার এবং মদীনা মুনাওওরা এই দুই স্থানের চাইতে তাবূকে অধিক পানি পাওয়া যায়। তাই এর সর্বত্রই বাগান লাগানো হচ্ছে। এভাবে রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হচ্ছে, যা তিনি তাবূকে অবস্থানকালে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তোমরা এই এলাকাকে বাগবাগিচায় ভর্তি পাবে। এখনো শহরের বসতিসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বত্র পাকা ও আধুনিক ধরনের দালান-কোঠা নির্মিত হচ্ছে। প্রথমে তাবূকের জনসংখ্যা দুতিন হাজারের বেশী ছিল না । বর্তমানে সে জনসংখ্যা বেড়ে পঁচিশ ত্রিশ হাজার ,বরং এক বর্ণনা অনুযায়ী পঞ্চাশ হাজার গিয়ে পৌছেছে।[৮]

একটি নিবেদন

সফরনাম-ই- আরযুল কুরআনে বলা হয়েছে,সেই জায়গাই মাগারিবে শুআইব, যার প্রাচীন নাম ছিল মাদইয়ান এবং যেখানে হযরত শু'আইব (আ)-এর সম্প্রদায় বসবাস করত-যদিও হযরত শু'আইবকে এই এলাকা সহ তাবূক এলাকার জন্য পাঠানো হয়েছিল। অনেক মুফাস্‌সির তাবূককেই সেই আইকা এলাকা সাব্যস্ত করেছেন, যেখানকার অধিবাসীদেরকে 'আসহাবুল আইকা' নামে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।[৯]

বাহ্যত: এই ধারনা সঠিক মনে হয় না ।'আসহাবূল আইকা' এর উল্লেখ কুরআন মজীদের চার জায়গায় এসেছে। যেমন- সূরা হিজর , সূরা শুআরা, সূরা সাদ এবং সূরা ক্বাফ-এ।

যদি তাবূক প্রকৃতই সেই জায়গা হত যেখানে 'আসহাবুল আইকা' বসবাস করত, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবশ্য অবশ্যই সেই জায়গায় অবস্থান করা পসন্দ করতেন না, যে জায়গায় লোকেরা আল্লাহর গযববের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে।সম্ভবতঃ তাবূকের আশেপাশের কোন জায়গায় আইকাবাসীদের বাসভূমি ছিল। কিন্তু তাবূককে ঐ এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। কেউ কেউ লিখেছেন, আইকা মাদ্‌য়ানের নিকটে ছিল। সম্ভবত: এটাই সঠিক।(সংকলকের লেখা এখানেই শেষ। এরপর তাবূক সম্পর্কে যা কিছু উপস্থাপন করা হবে, তা স্বয়ং মরহুম মাওলানার লেখা।)

টীকা ঃ

১। আয়লা ঐ জায়গার নাম, যাকে আজকাল আয়লাত বলা হয়। বর্তমানে ইসরাইলরা সেখানে একটি নৌবন্দর তৈরী করে নিয়েছে। জায়গাটি আকাবার সন্নিকটে অবস্থিত।

২। জারবা এবং আযরাহ মাআনের সন্নিকটে অবস্থিত পাশাপশি দুটি জায়গা । আযরাহ হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে সিফ্‌ফীন যুদ্ধের পর হযরত আলী ও হযরত মুআভিয়া (রা) এর সালিসী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৩। দু'মাতুল জান্দাল সারহান উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত । আজকাল এই স্থানকে জাওফ বলা হয়, যা উত্তর নাজদের একটি বিখ্যাত স্থান । 'দমাহ' বা 'দূমা' মূলতঃ হযরত ইসমাঈল (আ) এর একটি সন্তানের নাম ছিল । তার সন্তানেরা যে জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিল তা প্রথমে দূমাহ্ নামে পরিচিত হয়। বাইবেলের বিভিন্ন জায়গায় এর উল্লেখ আছে (যেমন যিশাইয়ঃ২৫ তম অধ্যায় ঃ শ্লোক -১৪ ,আদিপুস্তকঃ২১তম অধ্যায়ঃ শ্লোক-১১ ইত্যাদি এবং আরযুল কুরআনঃ মরহুম সাইয়িদ সুলায়মানঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্টা ৬১ এবং বাইবেল ডিকশনারী ঃ এষ্টন (ESTON): পৃষ্ঠা-২০৫)

৪। তীমাও ছিল হযরত ইসমাঈল (আ) এর এক সন্তানের নাম। এ জায়গাটি সম্ভবতঃ সে অথবা তার সন্তানেরা আবাদ করে । তাবূক থেকে একশ সত্তর মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এবং খায়বার ও তাবূকের রাজপথে তীমা অবস্থিত। তীমা থেকে আড়াই শ মাইল দূরে খায়বারের অবস্থান । বাইবেলেও বেশ কয়েকবার এই স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে।

৫। আরবের ইতিহাস (ইংরেজী) ঃ পৃষ্ঠা -১৪৩ ঃ বরাত থিওফেনস (THEOPHANES)।

৬। হিজরী নবম বর্ষ শুরু হয় ১৪ অক্টোবর ইং ৫৩০ সনে এবং শেষ হয় ১২ নভেম্বর ইং ৬৩০ সনে।

৭। নবম হিজরীর রমযান শরীফ ১২ ডিসেম্বর ইং ৬২০ সনে শুরু হয়।

৮। সফরনামা-ই-আরযুল কুরআন ঃ পৃষ্ঠা - ২৩৮ ।

৯। সফরনামা-ই-আরযুল কুরআন ঃ পৃষ্ঠা - ২৪১। সরফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'মাগায়িরে শু'আইব' তাবুক থেকে একশ পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

তাবূক যুদ্ধ-১

কায়সারের আক্রমণ সংক্রান্ত খবরাদি

তাবূক মদীনা ও দামিশকের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। হিসাব করে দেখা গেছে, আজকাল মদীনা থেকে এর দূরত্ব ছয় শ দশ কিলোমিটার।

হিজরী নবম সনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ পান যে, রোমের কায়সার অর্থাৎ কন্সটান্টিনোপলের পূর্বাঞ্চলীয় রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি, মদীনা আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছ এবং আরবের খ্রীষ্টান গোত্রগুলোও তার সাথে যোগ দিয়েছে। এই প্রথম বারের মত আরবের বাইরের একটি বিরাট শক্তিশালী সাম্রাজ্য মুসলমানদের উপর আক্রমণ করছে বিধায় সেটাকে প্রতিরোধ করার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাই করেন এবং মুসলিম বাহিনীকে তাবূক অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন।

কিন্তু একদিকে যুদ্ধযাত্রা যেমন অপরিহার্য ছিল অন্যদিকে তেমনি ঐ সময়ের যাবতীয় পরিস্থিতি ছিল মুসলমাদের প্রতিকূলে। তাঁরা মাত্র কয়েকমাস পূর্বে হুনায়ন ও তায়িফ যুদ্ধ করেছে এবং এর পূর্বে মক্কা বিজয়ের ঘটনাও ঘটেছে। এরপর হঠাৎ করেই মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আর যেহেতু তাঁদের আর্থিক সামর্থ্য ছিল সীমিত এবং তারা জীবন যাপন করছিলেন পরস্পর অংশদারিত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে। তাই অস্বচ্ছলতা তাঁদের সবাইকে একেবারে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। তার উপর ছিল গ্রীষ্মের মওসুম। ফসল কাটার সময় সমুপস্থিত। উপরন্তু এটা অভ্যন্তরীণ নয়, বরং বহির্দেশীয় সফর ছিল। এইসব অবস্থা মুসলমানদের সামনে দারুণ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা হয়ে পড়েছিলেন কিছুটা লাচার এবং অসহায়। কিন্তু যখন জাতীয় প্রতিরক্ষার মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয় তখন এ ধরনের পতিবন্ধকতা বা অসহায়ত্ব উপস্থিত দায়িত্ব পালন থেকে একটি সতর্ক জাতিকে কখনো রুখে রাখতে পারে না। তাছাড়া জাতীয় দায়িত্ব পালনের পথ কখনই কুসুমাস্তীর্ণ হয় না। এ পথে নানা বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়, সহ্য করতে হয় নানা দুঃখ-কষ্ট। তবে একথা সত্য যে, এসব বিপদাপদ হয় সাময়িক এবং এগুলো ডিংগিয়ে যে সাফল্য অর্জিত হয় তা হয় চিরস্থায়ী। কুরআন মজীদের নিম্নের আয়াতগুলোতে মুসলামানদের এই সত্যের শিক্ষাই দেয়া হয়েছে।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٠

"অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারী অবস্থায় (হালকা রণসম্ভার অথবা ভারী রণসম্ভবার নিয়ে) এবং সংগ্রাম কর আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।" - (৯:৪১)

সত্যিকার মুমিনদের উৎসর্গের নমুনা

সত্যিকার মুমিনরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এই আহবানে কিভাবে সাড়া দিয়েছিলেন এবং যাবতীয় পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কিরূপ উৎসাহ-উদদীপনা নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ত্রিশ হাজার মুসলমান রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে রওয়ানা হন। আর আল্লাহ্‌র পথে সহায়সম্পদ দান করার অবস্থা ছিল এই যে, এক দিকে বিত্তশালী হযরত উসমান গনী (রা) যেমন নয় শ উট দান করেন, অন্য দিকে তেমনি বিত্তহীন আবূ উকায়ল আনসারী (রা) সারা রাত্রি একটি কৃষিক্ষেত্রে পানি সরবরাহ করে পারিশ্রমিক স্বরূপ যেসব খেজুর পান তাই আল্লাহ্‌র রাসুলের হাতে তুলে দেন।

হযরত আবূ বকর (রা) তো তাঁর যাবতীয় ধন সম্পদ ও আসবাব-সামগ্রী দান করার জন্য নিয়ে আসেন। এমন কি তিনি তাঁর জামার বোতামগুলোও খুলে নিয়ে আসতে ভুলেন নি। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য কি রেখে এসেছ, তখন তিনি উত্তরে বলেন, তাদের জন্য রেখে এসেছি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে।

যেহেতু এই যুদ্ধের প্রস্তুতি অত্যন্ত কঠিন ও নিঃস্ব অবস্থার মধ্যে হয়েছিল তাই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাহিনী 'জায়শুল উসরত' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

প্রতিরক্ষার দায়িত্ব

সকল মুসলমানকেই প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবে কিছু সংখ্যক লোক আছে, যারা এক্ষেত্রে মাযূর (অসহায়)। অতএব তাদেরকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। পবিত্র কুরআন বলে –

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ
حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۔

"যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ তাদের (অভিযানে যোগদানে অসমর্থ হওয়ায়) কোন অপরাধ নেই, যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নেই, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৯:৯১)

সে যুগে না কোন সরকারী বাহিনী ছিল, না স্বেচ্ছাসেবকদের কোন পৃথক সংগঠন ছিল, আর না সৈন্যদের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন সরকারী ভান্ডার ছিল। তখনকার দিনে সবাই ছিল স্বেচ্ছাসেবী এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য ছিল প্রয়োজনীয় খরচ নিজেরাই বহন করা। আর সম্ভব হলে অন্যান্যদের খরচও বহন করা। অতএব বলা হয়েছে, যে সব লোক প্রকৃতপক্ষে সামর্থ্য রাখে না, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নেই। বিশেষ করে ঐ সব লোক, যাদের ঈমান ও বিশুদ্ধচিত্ততার অবস্থা ছিল এই যে, যখন তাদের সওয়ারীর কোন সংস্থান হলো না এবং আদাব ও শিষ্টাচার তাঁদেরকে এ অনুমতিও দিল না যে,তাঁরা এজন্য রাসূল (সা) এর উপর চাপ প্রয়োগ করে, অগত্যা তারা চুপচাপ রাসূলের দরবার থেকে অশ্রুবিগলিত নয়নে উঠে চলে গেলেন।

ক্রন্দনকারীগণ

কী সুন্দর কুরআনের বর্ণনা ধারা! প্রথমে নিঃস্বদের কথা উল্লেখ করার পর বিশেষভাবে পুনরায় তাদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁদের ঈমানী মুহাব্বতের ছবি এঁকে দেওয়া হয়েছে, যাতে নিফাকের মুকাবালায় ঈমানের একটা প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে একদল সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাহানা তালাশ করে এবং

অপর দল সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য যার পর নেই উদগ্রীব থাকে এবং তা করতে না পেরে অশ্রু বিগলিত নেত্রে ফিরে যায়।

তাবূক যুদ্ধে সওয়ারীর (বাহনের) সংখ্যা ছিল খুবই কম। আঠার জন মুজাহিদের ভাগে পড়েছিল একটি উট। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, সাহাবীদের একটি দল, যাদের পাথেয় সংগ্রহ করার সামর্থ্য ছিল না্া, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের জন্য সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিন। তিনি বলেন, কোথা থেকে করবো? আমি তো কোন আসবাব সামগ্রী পাচ্ছি না। একথা শুনার পর তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন। তাঁদের এই দুঃখ-ব্যথার অবস্থা এই ছিল যে, তাঁরা 'আল বাক্কায়ীন' নামে খ্যাতি লাভ করেন। যারা অনেক বেশী ক্রন্দন করে তাদেরকে 'আল বাক্কায়ীন' বলা হয় (ইবনে জারীর)। সুবহানাল্লাহ! এই সব অশ্রু যা ঈমানের অনুপ্রেরণায় প্রবাহিত হয়েছিল, যেগুলোকে এমনি মর্যদা প্রদান করা হলো যে, চিরদিনের জন্য সেগুলোর কথা আল্লাহ্‌র কিতাবে লিপিবদ্ধ রইলো। সুদীর্ঘ তেরশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর একজন মুমিন যদি এ আয়তটি পড়ে তাহলে তাদের ঐ অশ্রুমালার স্মরণে স্বয়ং তার চক্ষুও অশ্রুবিগলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[১]

কর্তব্য পালনের তাগাদা

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاءُ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۔

"যারা অভাবমুক্ত হয়েও অব্যাহতি প্রার্থনা করেছে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু আছে। তারা অন্তঃপুরবাসিনীর সাথে থাকাই পসন্দ করেছিল; আল্লাহ তাদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন,ফলে তারা বঝতে পারে না।" – (৯ঃ৯৩)

অর্থাৎ কর্তব্য পালনের মুহূর্তে স্ত্রীলোকদের সাথে ঘরে বসে থাকা এমন একটি ভীরুতার লক্ষণ, যা একজন আত্মসচেতন মানুষ কখনো মেনে নিতে পারে না। কিন্তু তারা এটাও মেনে নিল। এর কারণ এই যে, মূর্খতা ও মনুত্বহীনতা তাদেরকে একেবারে আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল। সীমাহীন কর্তব্য বিমুখতা ও আলস্যের কারণে এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, পবিত্র কুরআনে তাকে 'মোহর লাগানো' দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের একটি বর্ণনারীতি এই যে, আল্লাহ্-নির্ধারিত কানূন ও কার্যকারণ থেকে যে ফলশ্রুতি সৃষ্টি হয় সেগুলেকে সোজাসুজি আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা হয়ে থাকে। যেমন তাঁর কানূন এই যে, এই সব লোক নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনার মাধ্যমে বৃদ্ধ সর্দারদের অনুকরণ করতে শুরু করে এবং তা থেকে আর এদিক সেদিক হতে চায় না। ফলে ধীরে ধীরে তাদের বুদ্ধি-বিবেক নির্জীব হয়ে পড়ে এবং তাদের বিবেচনা শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। তখন তাদেরকে যত পরিষ্কার কথাই বলুন – তা তাদের বোধগম্য হয় না। তখন তুমি তাদের যতই মঙ্গল কামনা কর না কেন, তারা তোমার আরো বেশী বিরোধিতা করবে। কুরআন এই অবস্থার বিশ্লেষণ করেছে এই বলে যে, তাদের অন্তরের উপর মোহর মারা হয়েছে। অর্থাৎ এই অবস্থা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কানূনের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি ছাড়া কিছু নয়।

সমষ্টিগত জীবনের জন্য একটি বিপজ্জনক বস্তু

এ থেকে জানা গেল যে, দোটানায় দোদুল্যমান ও অস্থিরচিত্ত মানুষের বিদ্যমানতা সমষ্টিগত জীবনের জন্য একটি বিপজ্জনক বস্তু। বিশেষ করে যখন জাতি জীবন-মৃত্যুর সংগামে লিপ্ত থাকে তখন যতদূর সম্ভব এ ধরনের মানুষের অস্তিত্ব বরদাশ্‌ত করা উচিত নয়। আর এটাও ধারণা করা উচিত নয় যে, এরা গোষ্ঠী থেকে কেটে পড়লে

যে সাময়িক হৈ চৈ-এর সৃষ্টি হবে। যখন মানুষের মধ্যে সততা বাকি থাকে না তখন সে তার পুণ্য অর্জন ও পরহেযগারীর চিন্তাকে পাপাচারিতায় ব্যবহার করতে শুরু করে এবং এজন্য নানা বাহানা ও অজুহাত খাড়া করে। এটা হচ্ছে নিফাকের জঘন্যতম পন্থা। পবিত্র কুরআনে এদেরই স্বরূপ তুলে ধরে বলা হয়েছে–

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّىْ وَلَاتَفْتِنِّىْ ‌.

অর্থাৎ "ওরা জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য সম্ভাব্য নানা বিপদের অজুহাত তুলে সেগুলোকেই অনিবার্য বিপদ বলে আখ্যায়িত করছে।" যেমন–

১। এ গ্রীষ্ম মউসূমে হাজার হজার মানুষকে এ ধরনের একটি দূর দূরান্তের সফরে নিয়ে যাওয়া, জেনে শুনে তাদেরকে ধ্বংস করারই নামান্তর। আর এটা তো পুণ্যের কাজ নয়।

২। যেখানে যাওয়া হবে তা তো অন্যদের দেশ। অতএব সেখানে গিয়ে কত রকম বিপদের মধ্যে পড়তে হবে কে জানে।

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাবূক অভিযানের সংকল্প নেন তখন জাদ বিন কায়স নামক মুনাফিকদের জনৈক সরদার বলল, আমি স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে খুবই দুর্বল। আমার ভয় হচ্ছে, সুন্দর সুন্দর রোমান মেয়েদের দেখে আমি না আবার ফিতনায় পড়ে যাই। অতএব আমাকে ঘরে থাকার অনুমতি দিন এবং ঐ ফিতনা থেকে রক্ষা করুন।

মুনাফিকদের বিবরণ

সূরা তাওবার ৪২ নং আয়াত থেকে বর্ণনার মোড় ঐ সব মুনাফিকদের দিকেই ঘুরে গেছে, যাদের জন্য তাবূক যুদ্ধ একটি সর্বশেষ সিদ্ধান্তকারী পরীক্ষা বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এই সব আয়াতে মুনাফিকদের লোক দেখানো ও প্রদর্শনীমূলক কাজের সব রহস্য ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই সাহাবা কিরাম এই সূরাকে (সূরা তাওবাকে) 'আল ফাযিহা' নামে আখ্যায়িত করতেন। কেননা এই সূরা মুনাফিকদের সব রহস্য ফাঁস করে দিয়ে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে।

মুনাফিকদের সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের ১৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ওদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের থেকে পৃথক করে প্রতিভাত করবেন। যেমন বলা হয়েছে–

مَاكَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَااَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ .

"অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ্ মুমিনদের সেই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না।" (৩:১৭৯)

অর্থাৎ একের পর এক এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে, যার ফলে নিফাকের চেহারা সমূহ আবরণহীন হয়ে পড়ে। এই ক্রমধারার শেষ ঘটনা ছিল তাবূক যুদ্ধ।

আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, ঐ মুহূর্তে প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুন সাধারণ মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনায়ও প্রথম দিকে কিছুটা ভাটা পড়েছিল। কিন্তু মুনাফিকদের অবস্থা ছিল মৃত্যুবার্তার চাইতেও অধিক ভয়ংকর। অতএব তারা নানা হিল্লা-বাহানা শুরু করে। প্রত্যেক ব্যক্তি একটি নতুন বাহানা গড়ে নিত এবং বলত, এমনি তো যুদ্ধে যেতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, এখন অমুক কাজটি করা আমার জন্য

অনিবার্য হয়ে পড়েছে বা আমার অমুক সমস্যাটি কোন মতেই দূর হচ্ছে না। এমতাবস্থায় আপনি যে নির্দেশ দেন তা-ই শিরোধার্য। তাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, নিছক বানোয়াট কোন অসুবিধার কথা বললেও মুহাম্মদ (সা) কাউকে বাধ্য করবেন না। তিনি এত দয়ালু ও করুণাময় যে, অসুবিধার কথা শুনে নিশ্চয়ই বলে উঠবেন, যখন এত অসুবিধা তখন তোমার যাওয়ার আর প্রয়োজন নেই।

বাস্তবেও তাই ঘটল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের হিল্লা বাহানার কথা শুনতেন এবং যখন দেখতেন যে,তারা সন্তুষ্ট চিত্তে যুদ্ধে যেতে রাজী নয় তখন বলতেন, ঠিক আছে তোমাকে অব্যাহতি দেওয়া হলো।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ নতুন কথা তৈরী করে এও বললো, আমার কাছে এই মাল আছে, তা নিয়ে নিন কিন্তু যুদ্ধে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতগুলোতে সেইসব ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। বলেছেন, যদি এমন কোন ব্যাপার হত যে, তাতে উপকার পাওয়া যেত এবং এজন্য দূরদূরান্ত সফরের প্রয়োজন হত না তাহলে তারা নিফাকের আশ্রয় নিত না। বরং সংগে সংগে তোমার পেছনে চলতে শুরু করত। এমতাবস্থায় তারা বাহ্যতঃ তোমার নির্দেশ পালন করত, কিন্তু তাদের অন্তরে থাকত দুনিয়ার লোভ। উহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে তারা এমনটিই করেছে। কিন্তু এবারের ব্যাপারটি আলাদা। গন্তব্যস্থান অনেক দূরে। সফরে অনেক দুঃখকষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হবে। পার্থিব উপকার লাভের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। অতএব তারা একেবারে অসহায়ে পরিণত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অন্তত: দেখানোর জন্যও তাঁর সাথে তারা বের হতে রাজী হচ্ছে না। এটা ছিল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি সিদ্ধান্তকর পরীক্ষা। যার মাধ্যমে তাদের সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে। এভাবে যখনই কোন শক্ত পরীক্ষা সামনে এসে উপস্থিত হয় তখন মুনাফিকদের মুখোশ আপনা আপনি খুলে পড়ে।

সুরা তাওবার ৪৩ নং আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। কী চিত্তাকর্ষক ও পরিপূর্ণ ভালবাসার ভঙ্গিতে ইসলামের নবীকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, করুণা ও ক্ষমার একটি সীমা থাকা উচিত। রশি এভাবে ঢিলে করে দেওয়ার যোগ্য পাত্র ওরা (মুনাফিকরা) নয়।

মুনাফিকদের মুখ রক্ষার অপচেষ্টা

বলা হয়েছে, যখন এই সব লোক একদিকে মিথ্যা ওজর পেশ করছে এবং অন্যদিকে এটাও বলছে যে, আপনি যে হুকুম দেন তাই শিরোধার্য-তখন এটাই শ্রেয় ছিল যে, আপনি ওদেরকে পুরোপুরি পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করতেন। অর্থাৎ বলতেন, আমার নির্দেশ তো এই যে, আমার সাথেই তোমাদের চলা উচিত। তখন পরিষ্কার বুঝা যেত, তাদের মধ্যে কে তার কথায় সত্য এবং কে মিথ্যা।

সূরা তাওবার ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যাদের অন্তরে ঈমান আছে, তারা কি এরূপ একটি হুকুম মেনে নিতে কখনো ইতস্তত: করবে? তারা এই হুকুম পাওয়ার অপেক্ষাই বা করবে কেন? তাদের জন্য শুধুমাত্র এটাই যথেষ্ট যে, এবার দায়িত্ব পালনের সময় এসে গেছে। এমতাবস্থায় যার কাছে ঈমান যত প্রিয় সে হবে তার দায়িত্ব পালনে তত অগ্রণী। হুকুমের অপেক্ষা তো তারাই করে যাদের অন্তরে সত্যিকার ঈমান নেই এবং যারা সন্দেহ সংশয়ের রোগী। এরাই কোন না কোনভাবে পলায়ন করার বাহানা খুঁজে। যেহেতু এখানে মুকাবালা ছিল বাইজান্টাইনী সাম্রাজ্যের সাথে, যা প্রাচ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রোম সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করছিল– তাই মুনাফিকদের বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমানদের ধ্বংসের দিন সমুপস্থিত। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই সালুল মানুষের মনে এই বিশ্বাস দিয়েছিল যে, ইসলামের নবীকে এই সফর থেকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হবে না।

সূরা তাওবার ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তারা মনে করে যে, পেছনে থেকে যাওয়ার কারণে তারা বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, তাদের বের না হওয়াটাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হয়েছে। কেননা তারা বের হলে ফিত্না ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত। এর পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্র

মন:পূত ছিল না। অর্থাৎ আল্লাহ্ জানতেন, এবার তারা বের হবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বের না হওয়ার মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল দেখেছেন।

ঈমানী মুহাব্বত ও গায়র ঈমানী মুহাব্বত

সূরা তাওবায় বলা হয়েছে–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ .

"বলুন, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্ব-গোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যার মন্দা পড়ার আংশকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।"– (৯:৪২)

এই আয়াতটি ওয়ায-নসীহতে ভর্তি। এটা এ সম্পর্কিত একটা অকাট্য কথা যে, যদি ঈমানী মুহাব্বত ও গায়র ঈমানী মুহাব্বতের মধ্যে ঈমানী মুহাব্বতের উপরে গায়র ঈমানী তথা পার্থিব মুহাব্বত মোটেই প্রাধান্য পায় না। এখানে আটটি জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে; একটি সভ্যভব্য জীবনের যাবতীয় উপাদান এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাছাড়া যে ক্রমানুসারে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে, উপাদানগুলোর গ্রন্থির প্রাকৃতিক বিন্যাসও তাই।

বলা হয়েছে, মানুষের নাগরিক জীবনের ভালবাসার এগুলোই হচ্ছে আত্মীয়তা বন্ধন। কিন্তু যদি ঈমানী ভালবাসা এবং এই সব আত্মীয়তা বন্ধনের মধ্যে মুকাবালা হয় তাহলে যে মুমিন তার এই সব সম্পর্কের ভালবাসার কোন যাদুই কার্যকর হবে না এবং এ জাতীয় কোন উপাদানই সত্যানুসরণ থেকে তাকে রুখে রাখতে পারবে না।

চিন্তা করে দেখুন, কুরআন কী চমৎকারভাবে মানুষের স্বভাব-চরিত্রের দুর্বলতার সন্ধান বাত্লে দিয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের পথে যখন অগ্রসর হবে তখন অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে একটা বিপ্লব দেখা দেবে – চাই তা যুদ্ধ-বিগ্রহের আকারে হোক বা অন্য কোন আকারে হোক, তখন ব্যবসার মধ্যে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে এবং ধনসম্পদের ক্ষেত্রেও নানা আশংকার সূত্রপাত হবে। আর এই অবস্থা, যারা ধন সম্পদের পূজারী তাদের কাছে খুব যন্ত্রণাদায়ক ঠেকে। তারা বলে, আমাদের ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে। তারা জানে না, সত্যের পথে যদি তারা দৃঢ়তা প্রদর্শন করে তবে এতে যে ক্ষতি হবে তার পরিমাণ হবে খুব কম এবং যা লাভ হবে তার পরিমাণ হবে খুব বেশী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে যে পুরস্কার রয়েছে তা অনেক বড়।

ঈমানী মুহাব্বতের এই পরীক্ষায় সাহাবা কিরাম যেভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন তার সাক্ষ্য ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। তা পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। নিঃসন্দেহে একথা বলা যেতে পারে যে, দুনিয়ায় এমন কোন মানবগোষ্ঠী পাওয়া যাবে না যারা তাদের সমস্ত অন্তর এবং সমস্ত আত্মা দ্বারা এমন প্রেমাসক্ত হয়েছেন যেমন প্রেমাসক্ত হয়েছিলেন সাহাবা কিরাম আল্লাহ্র রাসূলের জন্য সত্য পথ অনুসরণ করতে গিয়ে। তাঁরা এই মুহাব্বতের পথে সবকিছুই কুরবান করেছেন, যা একজন মানুষ করতে পারে। এরপর তাঁরা এই পথ থেকেই সে সব কিছু পেয়েছেন যা পেয়ে কোন মানব সমাজ বা মানবগোষ্ঠী চিরধন্য হতে পারে।

টীকা ঃ

১। রোদনকারী এ সাহাবীদের সাতজনের নাম 'জাওয়ামিউস সীরাত' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাবূক যুদ্ধ–২

যে তিনজন সাহাবী পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন

তাবূক যুদ্ধের ব্যাপারে, যেখানে মুনাফিকদের এক কড়া পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল সেখানে তিনজন অতি একনিষ্ঠ এবং উঁচুস্তরের সাহাবী শুধুমাত্র সাময়িক আলস্য ও ইতস্ততার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত রয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁদেরকেও একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ঐ তিনজন সাহাবী হচ্ছেন কা'ব বিন মালিক, হিলাল বিন উমাইয়া এবং মুরারা বিন রাবী (রা)। এই তিনজনের যে অবস্থা মাওলানা সাহেব বর্ণনা করেছেন তাতে কিছু পরিবর্ধনের প্রয়োজন নেই। কেননা এতে লক্ষণীয় কোন জিনিসই বাদ দেওয়া হয় নি।

সূরা তাওবার ১১৮ নং আয়াতে এই সব লোকের তাওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, যারা তাবূক যুদ্ধে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আলস্য প্রদর্শন করেছিলেন এবং যাদের সম্পর্কে সূরা তাওবার ১০২ নং আয়াতে বলা হয়েছিল যে, ওদেরকে আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখা উচিত। কেননা দু'আ কবুলের উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তাঁদের অন্তরের ক্ষত শুকিয়ে যায় এবং তাঁরা আল্লাহ্‌র রহমত ও বদান্যতা থেকে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে। তাই এখানে এমনভাবে বর্ণনাভঙ্গি ইখতিয়ার করা হয়েছে যাতে তাদের সমস্ত দুঃখ-ব্যথার অবসান হয়। তাঁরা এই পদস্খলনের কারণে নিজেদের আসল মর্যাদা খুইয়ে বসেছিলেন। অর্থাৎ যে সব মকবুল বান্দাদের মধ্যে তাঁরা পরিগণিত হতেন তাঁদের সমাজ থেকে তাঁরা বের হয়ে গিয়েছিলেন। অতএব তাঁদের তাওবা কবূলের সুসংবাদ এমনভাবে শুনানো হল যে, প্রথমে খোদ নবী (সা) এর নাম এল, এরপর মুহাজির আনসারদের। এরপর তাঁদের সাথে ঐ সব লোকদেরও উল্লেখ করা হলো এবং আল্লাহ্‌র দয়ার দিকটি সবার জন্যই সমান রাখা হলো, যাতে ঐ সব লোকও এথেকে বাইরে পড়ে না থাকেন যারা আলস্য বশত: অপরাধ করেছিলেন। তাঁরাও যেন মনে করতে থাকেন যে, রহমত ও কবুলিয়াতের একই সারিতে তাঁরাও দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছেন।

তাওবার অর্থ ফেরা এবং প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহ্ তা'আলার, কারো প্রতি আপন রহমতের সাথে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ, যে কামিল তার রহমত ও সম্মান আরো বৃদ্ধি পেল, আর যে নাকিস বা দোষী তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করলেন এবং মাফ্ করে দিলেন।

তাওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ

এরপর বলা হয়েছে, এই তিনজন লোকেরও তাওবা কবুল হয়ে গেছে, যাদের ব্যাপারটি মুলতবী রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমরা আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা কর।' যেমন সূরা তাওবার ১০৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ্‌র হুকুমের অপেক্ষায় থাকে।' আয়াতটি হলো -

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

"এবং আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কতকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল – তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন, না ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" – (৯:১০৬)

এই তিন ব্যক্তি হচ্ছেন কা'ব বিন মালিক, হিলাল বিন উমাইয়া এবং মুরারাহ্‌ বিন রাবী' (রা)। এরা হচ্ছেন ঐ তিহাত্তরজন প্রথম যুগের আনসারদের অন্যতম, যারা আকাবা-ই-ছানিয়ার বাইআতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া হিলাল বিন উমাইয়া এবং মুরারাহ্‌ বিন রাবী' (রা) বদরযুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

এই তিন জন তাবূক যুদ্ধে শৈথিল্য বা আলস্যবশতঃ অংশগ্রহণ করেন নি। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং যারা তাতে অংশ গ্রহণ করে নি তারা নিজ নিজ ওজর পেশ করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল তখন ঐ তিনজন কোন নির্দিষ্ট ওজর পেশ করেন নি। বরং পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করেন যে, আমরা শৈথিল্য ও ব্যক্তিগত গাফলতির কারণে এই পুণ্যকাজে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত রয়েছি। তাঁদের একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র হুকুমের অপেক্ষা কর। এরপর সকল মুসলমানকে, এমনকি ঐ তিনজনের স্ত্রীকেও নির্দেশ দেওয়া হলো, যেন কেউ এদের সাথে মেলামেশা না করে এবং কোনরূপ সম্পর্ক না রাখে। অতএব তাঁরা হঠাৎ নিজেদেরকে এমন অবস্থায় পেলেন যে, মদীনা এবং মদীনার পার্শ্ববর্তী সমগ্র অধিবাসীরা তাঁদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তঁদের বন্ধু-বান্ধব এবং নিকটাত্মীয়রাও তাঁদের সালামের জবাব দিচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত যখন পূর্ণ পঞ্চাশ দিন এই অবস্থায় কেটে গেল তখন এই আয়াত নাযিল হল এবং তাদেরকে তাঁদের তাওবা কবূলের সুসংবাদ দেওয়া হলো।

কা'ব বিন মালিকের বর্ণনা

এই তিনজন সাহাবীর মধ্যে হযরত কা'ব বিন মালিক নিজের ঐ সময়কার অবস্থাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইতিপূর্বে সবগুলো যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর সাথে অংশ গ্রহণ করেছি। তাবূক যুদ্ধেও অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু একের পর এক দিন অতিবাহিত হতে লাগলো। আমি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকলাম যে, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো সামলিয়ে নিয়ে এরপর অবশ্যই বের হবো।

এমনকি আজ-কাল করতে করতেই পুরো সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তখন আমার চোখ খুললো। কিন্তু এখন তো আর করার কিছু ছিল না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী প্রথমে মসজিদে পদার্পণ করলেন। তখন যারা অভিযানে শরীক হতে পারে নি, তারা একে একে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর কাছে ওজর পেশ করতে লাগল এবং কসম খেয়ে খেয়ে নিজেদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণে চেষ্টিত হলো। ওদের সংখ্যা ছিল আশি জনের উপর। তারা যে ওজরই পেশ করেছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তা গ্রহণ করছেন এবং তাদের অন্তরের ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন আমার দিকে চাইলেন তখন আমি মিথ্যা ওযর পেশ করতে পারলাম না। বরং যা সত্য ঘটনা তাই পরিষ্কার ভাষায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর খিদমতে নিবেদন করলাম। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার বক্তব্য শুনে বললেন, ঠিক আছে, যাও অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র কোন ফয়সালা আসে। আমি লোকজনদের জিজ্ঞাসা করলাম, অন্য কারো ব্যাপারে কি অনুরূপ হুকুম রয়েছে। তারা বললো, হ্যাঁ মুরারাহ্‌ বিন রাবী' এবং হিলাল বিন উমাইয়ার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হয়েছে।

কথাবার্তা বলাও নিষেধ

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর পক্ষ থেকে নির্দেশ জারী করা হলো, যেন আমাদের তিনজনের সাথে কেউ কথা না বলে। সবাই আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। হঠাৎ করে আমাদের জন্য দুনিয়া কি থেকে কি হয়ে গেল। গতকাল আমরা যে দুনিয়ায় ছিলাম সে দুনিয়া যেন আজ সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। আমার ঐ দুই সংগী সারাদিন ঘরের

মধ্যে বসে থাকতেন। কিন্তু আমি ছিলাম একটু শক্তপ্রাণের অধিকারী। তাই এই অবস্থায়ও প্রতিদিন ঘর থেকে বের হতাম, মসজিদে যেতাম এবং জামায়াতে শরীক হতাম। এরপর মসজিদের এক কোণায় একটি আলাদা জায়গায় বসে পড়তাম। বেশীর ভাগ সময় এরূপ করতাম যে, সালাতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকটে গিয়ে সালাম নিবেদন করতাম। তারপর মনে মনে বলতাম, দেখি সালামের উত্তরে তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠে কিনা। তিনি কখনো কখনো আমার দিকে তাকাতেন, কিন্তু যখন আমার আক্ষেপভরা দৃষ্টি তাঁর দিকে উঠত তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

চাচাত ভাইয়ের উত্তর

একদিন শহর থেকে বের হয়ে আবূ কাতাদা (রা) এর বাগান পর্যন্ত যাই। সে ছিল আমার চাচাত ভাই। আমি আমার সব নিকটাত্মীয়ের মধ্যে তাকেই অধিক ভালবাসতাম। আমি তাকে সালাম করলাম। কিন্তু সে সালামের উত্তর দিল না। আমি বললাম, আবূ কাতাদা, তুমি কি জান না যে, আমি মুসলমান এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে আমি মনে প্রাণে ভালবাসি। একথা শুনেও সে আমার দিকে চোখ তুলে চাইলো না। কিন্তু ঐ কথাটি যখন আমি বার বার বললাম তখন সে শুধুমাত্র বললো, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুল ভাল জানেন। তখন আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। আমার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল।

আরো একটি পরীক্ষা

কা'ব (রা) সেখান থেকে যখন ফিরে আসছিলো তখন একজন নাবাতীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। সে যাকে পাচ্ছিলো তাকেই বলছিলো, এমন কে আছে, যে আমাকে কা'ব বিন মালিকের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে? লোকেরা আমার দিকে ইশারা করল। তখন সে গাসসানের বাদশাহ্র একটি চিঠি বের করে আমার হাতে দিল। তাতে লেখা ছিল, 'আমি জানতে পেরেছি, তোমার প্রভু তোমার সাথে কঠোর ব্যবহার করছেন, "তুমি আমার কাছে চলে এসো, আমি তোমাকে সম্মান ও মর্যাদা দেব।" ঐই চিঠি পড়ে আমি বললাম, এ আর একটি নতুন বিপদ এসে উপস্থিত হলো। আমার জন্য পেছনের এতগুলো বিপদ যেন যথেষ্ট ছিল না।

স্ত্রীদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার নির্দেশ

যখন এই অবস্থায় চল্লিশ রাত অতিবাহিত হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি এসে বললো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই নির্দেশ প্রদান করেছন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের থেকে পৃথক্ হয়ে যাও। আমি বললাম, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দেব? ঐ ব্যক্তি বললো, না, শুধুমাত্র পৃথক হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। একথার উপর আমি আমার স্ত্রীকে শ্বশুরালয়ে পাঠিয়ে দিলাম।

আরো দশ দিন পর পঞ্চাশতম রাত কেটে যখন ভোর হলো তখন আমি আমার ঘরে ছাদের উপর সালাত আদায় করে বসে ছিলাম এবং তখন আমার হুবহু ঐ অবস্থা ছিল, যার নকশা আল্লাহ্র কালামে অংকিত হয়েছে। আমার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল এবং আল্লাহ্র জমি তার যাবতীয় প্রশস্ততা সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল।

দলে দলে সবাই এসে মুবারকবাদ জানালো

হঠাৎ আমি শুনলাম, কে যেন সিলআ' পাহাড় থেকে চীৎকার দিয়ে বলছে, হে কা'ব বিন মালিক, সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার তাওবা কবুল হয়ে গেছে।

এবার লোকেরা দলে দলে আমাকে মুবারকবাদ জানাবার জন্য ছুটে এল। জনৈক ব্যক্তি ঘোড়া ছুটিয়ে আমার কাছে এসে পৌঁছল। তার কণ্ঠস্বরই ছিল সব চাইতে উঁচু। আমি মসজিদে গিয়ে হাযির হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের মধ্যে একই বন্ধনীতে উপবিষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এই অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি আনন্দিত

হতেন তখন তাঁর চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠত, যেন এক খন্ড চাঁদ। এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল বলে আমি সর্বদা তাঁর চেহারার প্রতি লক্ষ্য রাখতাম। আমি দেখলাম, এখন তার পবিত্র চেহারা চমকাচ্ছে। তিনি বললেন, হে কা'ব, আমি তোমাকে আজকের এই দিবসের অভ্যুদয়ের সুসংবাদ দিচ্ছি, যা তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিন। আমি বললাম, একথা কি আপনার পক্ষ থেকে বলছেন, না আল্লাহ্‌র ওহীর মাধ্যমে বলছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্‌র ওহীর মাধ্যমে (বুখারী ও মুসলিম)।

কয়েকটি অতি লক্ষ্যণীয় হাকীকত

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, কুরআনের কোন আয়াত তাঁকে এভাবে কাঁদাতে পারত না- যেভাবে কুরআনের একটি আয়াত এবং কা'ব বিন মালিকের রেওয়ায়াতটি। কুরআনের আয়াতটি হলো-

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَّا مَلْجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ط

"এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকেও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিসহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই।" (৯:১১৭)

এ থেকে জানা গেল যে-

১। সত্যের সেবায় আলস্য প্রদর্শন একজন মুমিনের জন্য কঠোর অপরাধ। এই অপরাধের কারণে একজন বিশুদ্ধচিত্ত ও মকবুল সাহাবীকেও এত বড় শাস্তি দেওয়া হলো যে, তাঁর সাথে সমগ্র মুসলমানের সম্পর্কচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়া হলো।

২। মুসলমানদের আনুগত্য ও যথাযথ আদেশ পালনের কি অবস্থা ছিল? যখনই একজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার হুকুম দেওয়া হলো তখন সমগ্র শহরের লোক একসাথে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লুকিয়ে ছুপিয়েও কেউ এই নির্দেশের বিরোধিতা করলেন না। এমন কি ঐ ব্যক্তির প্রিয়তম বন্ধু-বান্ধবের মনেও এই ধারণা উদিত হল না যে, মাত্র এক নিমিষের জন্য এই নির্দেশের বিরোধিতা করি কিংবা কমপক্ষে তাঁর সাথে দু একটি নম্র কথা বলি। আবূ কাতাদা(রা) এর অবস্থা তো আমরা হযরত কা'বের মুখ থেকে শুনেছি। যখন তিনি আবূ কাতাদাকে বললেন, তোমার কাছে তো এটা অজানা থাকতে পারে না যে, আমি একজন সত্যিকার মুসলমান, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলকে ভালবাসি - এতদসত্ত্বেও কেন তুমি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? তখন আবূ কাতাদা (রা) শুধুমাত্র এই উত্তর দেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন। এই তিনটি শব্দ দ্বারা সে যুগের মুসলমানদের মনমানসিকতার একটি পরিপূর্ণ ছবি ভেসে উঠে। অর্থাৎ আমি তো সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। আমি জানি যে, তুমি একজন খাঁটি মুসলমান। কিন্তু আমার জানায় কি আসে যায়? আসল ব্যাপার তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা)ই জানেন। আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশ হচ্ছে যেন তোমাদের সাথে আমরা কোন সম্পর্ক না রাখি।

৩। এই নির্দেশ পালনের জন্য ঢাক ঢোল পিটিয়ে কোন ঘোষণা দেওয়া হয় নি, এটা না মানলে কোন সরকারী কর্মচারীর ধরপাকড়েরও কোন ভয় ছিল না, এজন্য কোন আদালতেও জবাবদিহী করতে হত না - শুধুমাত্র এক ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহ্‌র) মুখ থেকে নির্দেশটি বের হওয়ার সাথে সাথে সবাই জেনে নিলেন যে, এটাই তাঁর ইচ্ছা। শুধুমাত্র তাঁর এই ইচ্ছার কথা জানাটাই তাঁদের জন্য যথেষ্ট যে, এটা অবশ্যই মানতে হবে এবং যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে।

৪। এক্ষেত্রে মুসলমানদের পরস্পর সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সবাই অত্যন্ত কঠোরভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নির্দেশ পালন করেন সত্যি, কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যে মহাবিপদে পড়েছে, এ অনুভূতি সকলের অন্তরেই জাগরূক ছিল। সবাই মনে মনে কামনা করছিলেন যেন এদের তাওবা কবুল হয়ে যায়। এরপর যখনই তাওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা হলো, তখন তাদেরকে এই সঙবাদ দেওয়ার জন্য যেন দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। তাওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ কে কার আগে দেবে এই নিয়ে সবাই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠলেন। সিলা' পাহাড় থেকে যিনি উচ্চস্বরে প্রথম এই সুসংবাদ দিয়েছিলেন, হযরত কা'ব (রা) তাঁর নাম উল্লেখ না করলেও তিনি ছিলেন হযরত আবূ ব কর সিদ্দীক (রা)।

ওজর কবূল করা হলো

সূরা তাওবার ১০০ থেকে ১০৬ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে যে সব মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা যদিও এক্ষেত্রে কর্তব্যকর্মে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু এর কারণ নিফাক ছিল না, বরং ছিল শৈথিল্য, আলস্য ও কর্মবিমুখতা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন প্রত্যেকটি লোকই সত্য কথা বলে আপন শৈথিল্যের জন্য দুঃখিত হন। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যে এজন্য লজ্জিত ও অন্তরে আঘাতপ্রাপ্ত হন নি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের তাওবা কবুল করেন। কেননা তাঁর দান ও বদান্যতার দরজা কখনো বন্ধ থাকতে পারে না। শুধুমাত্র শর্ত এই যে, আমরা যেন আমাদের অন্তরের দরজা নিজ হাতে বন্ধ করে না ফেলি।

বলা হয়েছে, তাঁরা তাঁদের অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং তাঁদের এই স্বীকারোক্তি আন্তরিক। আর যে মহা অপরাধ স্বীকারের প্রতি ঝুঁকে পড়ে তাকে আর বঞ্চনার শিকারে পরিণত হতে হয় না।

এর পূর্ববর্তী নির্দেশ এই ছিল যে, মুনাফিকদের খয়রাত কবূল করবেন না এবং তাদের ক্ষমার জন্য দু'আ করুন। এখানে বলা হয়েছে, যে সব লোক তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে, তাওবা করেছে তারা সৎপথে যা কিছু দেয় তা কবুল করে নিন এবং তাদের মঙ্গলের জন্য দু'আ করুন। আপনার দু'আ তাদের অন্তরের জন্য, যে অন্তর আক্ষেপ ও আফসোসে ক্ষতবিক্ষত – শান্তি ও স্বস্তির কারণে পরিণত হবে।

আরো বলা হয়েছে, আপনি এর মাধ্যমে তাদেরকে পাক সাফ করে দেবেন। অর্থাৎ সম্পদ থেকে খয়রাত ও যাকাত বের করা এবং তা কবুল হওয়া এমন একটি ব্যাপার, যা নাফ্সের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির কারণে পরিণত হয়। (সংকলক)

তাবূকের ভাষণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যত খুতবা বা ভাষণ প্রদান করেছেন তার মধ্যে একটি অতি গরুত্বপূর্ণ ভাষণ হলো সেই ভাষণ যা তিনি তাবূকে একটি সালাতের পরে প্রদান করছিলেন। ভাষণের বাক্যগুলো ছিল খুবই ছোট, কিন্তু প্রত্যেকটি বাক্য ছিল পুণ্যতা, পথপ্রদর্শন এবং হিকমত ও বিজ্ঞতার এক একটি সমুদ্র, যা এক একটি বিন্দুতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আমি এই ভাষণটি হাফিয ইবনে কাইয়িম-এর যাদুল মা'দ (২য় খন্ড) থেকে নিয়েছি। আমি প্রত্যেকটি বাক্যকে পৃথক পৃথক লিখেছি এজন্য যে, যাতে এগুলোর উপর গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করা হয় এবং ইল্‌মে নবুওয়াতের এই মণিমুক্তাগুলোকে মুখস্থ করে নিতে বিশেষ কোন বেগ পেতে না হয়। প্রত্যেক বক্যের সাথে তার অনুবাদ লিখে দেওয়া হয়েছে। মরহুম কাযী সুলায়মান মানসূরপুরীও ভাষণটি রাহ্‌মাতুল লিল্‌ আলামীনের প্রথম খন্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও প্রশস্তির পর রাসূল্লাহ্ (সা) বলেন–

١. فان اصدّق الحديث كتاب اللّه .

১। কথার মধ্যে সব চাইতে সত্য কথা হচ্ছে কিতাবুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র কালাম।

٢. واوثق العرى كلمة التقوى .

২। সবচেয়ে ভরসার বস্তু হচ্ছে কালিমা-ই-তাকওয়া।

٣. وخير الملل ملة ابراهيم .

৩। সব ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম হলো মিল্লাতে ইবরাহীম।

٤. وخير السنن سنة محمد ص

৪। যাবতীয় তারীকার (পন্থার) মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তরীকা হলো মুহাম্মদ (সা) এর তরীকা।

٥. واشرف الحديث ذكر اللّه

৫। সব কথার শ্রেষ্ঠ কথা হলো আল্লাহ্ যিক্‌র।

٦. واحسن القصص هذا القران .

৬। যাবতীয় বর্ণনার সুন্দরতম বর্ণনা হচ্ছে এই কুরআন মজীদ।

٧. وخير الامور عوازمها .

৭। দৃঢ় সংকল্পের কাজই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম কাজ।

٨. وشر الامور محدثاتها .

৮। বানোয়াট কথা ও বিদ'আত হচ্ছে সব চেয়ে নিকৃষ্ট বস্তু।

٩. واحسن الهدى هدى الانبياء .

৯। আম্বিয়া কিরামের হিদায়াতই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম হিদায়াত।

١٠. واشرف الموت قتل الشهداء .

১০। সত্যের পথে শহীদদের মৃত্যুই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম মৃত্যু।

١١. واعمى العمى الضلالة بعد الهدى .

১১। সবচেয়ে বড় অন্ধত্ব হচ্ছে সেই পথভ্রষ্টতা, যা হিদায়াত গ্রহণের পরও মানুষ বেছে নেয়।

١٢. وخير الاعمال ما نفع .

১২। সেটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কর্ম, যা দ্বারা মানুষ ধর্মীয়, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উপকার প্রাপ্ত হয়।

١٣. وخير الهدى ما تبع

১৩। সেটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম হিদায়াত, যার অনুসরণ করা যেতে পারে।

١٤. وشر العمى عمى القلب .

১৪। জঘন্যতম অন্ধত্ব হচ্ছে অন্তরের অন্ধত্ব।

١٥. ويد العليا خير من يد السفلى .

১৫। উপরের (দাতার) হাত নীচের (গ্রহীতার) হাতের চাইতে শ্রেষ্ঠ।

١٦. وما قل وكفى خير مما كثر والهى .

১৬। সামান্য মাল, যা প্রয়োজন মেটাবার জন্য যথেষ্ট তা ঐ অধিক মালের চাইতে শ্রেষ্ঠ, যা মানুষকে গাফিল ও কর্ম বিমুখ করে ফেলে।

١٧. وشر المعذرة حين يحضر الموت .

১৭। নিকৃষ্টতম ওজর পেশ এবং তাওবা হচ্ছে তা-ই যা প্রাণ নির্গত হওয়ার সময় করা হয়ে থাকে।

١٨. وشر الندامة يوم القيمة .

১৮। জঘন্যতম লজ্জা ও অনুতাপ হচ্ছে তাই, যা কিয়ামতের দিন হবে।

١٩. ومن الناس من لا ياتى الجمعة الا دبراً .

১৯। কোন কোন লোক জুম'আর সালাতের জন্য আসে, কিন্তু তাদের অন্তর পেছনে পড়ে থাকে।

٢٠. ومن لا يذكر الله الا هجراً .

২০। কোন কোন লোক এমন আছে, যারা আল্লাহ্‌কে কদাচিৎ স্মরণ করে।

٢١. ومن اعظم الخطايا اللسان الكذب .

২১। পাপের মধ্যে বৃহত্তম পাপ হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা।

٢٢. خير الغنى غنى النفس .

২২। আত্মার প্রাচুর্যই শ্রেষ্ঠ প্রাচুর্য।

٢٣. وخير الزاد التقوى .

২৩। মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ পাথেয় হচ্ছে তাক্ওয়া।

٢٤. ورأس الحكم مخافة اللّه عزوجل .

২৪। আল্লাহ্র ভয় হচ্ছে বুদ্ধিমানদের মাথার মুকুট।

٢٥. وخيرما وقرفى القلوب اليقين .

২৫। অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শ্রেষ্ঠতম বস্তু হচ্ছে য়াকীন বা বিশ্বাস।

٢٦. والارتياب من الكفر .

২৬। সন্দেহ-সংশয় কুফ্রের একটি শাখা।

٢٧. والنياحة من عمل الجاهلية .

২৭। মৃতের জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদা জাহিলিয়া যুগের একটি কাজ।

٢٨. والغلول من حرّجهنم .

২৮। খিয়ানত হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।

٢٩. والسكر كيى من النار .

২৯। নেশা হচ্ছে আগুনের দাগ (কালিমা)।

٣٠. والشعر من ابليس .

৩০। অশ্লীল কাব্য চর্চা শয়তানী কাজ।

٣١. والخمر جماع الاثم .

৩১। মদ হচ্ছে গুনাহ্সমূহের সমাহার।

٣٢. وشرالماكل مال اليتيم .

৩২। য়াতীমের মাল ভক্ষণ হচ্ছে জঘন্যতম খাদ্যভক্ষণ।

٣٣. والسعيد من وعظ بغيره .

৩৩। সেই ভাগ্যবান, যে অন্যের কাছ থেকে নসীহত গ্রহণ করে।

٣٤. والشقى من شقى فى بطن امه .

৩৪। প্রকৃত দুর্ভাগা সে-ই, যে তার মায়ের পেটেই দুর্ভাগা থাকে।

٣٥. وملاك العمل خواتمه .

৩৫। মানুষের আমলের পুঁজি হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠতম পরিণাম।

٣٦. وشر الرؤيا رؤياء الكذب .

৩৬। নিকৃষ্টতম স্বপ্ন হচ্ছে মিথ্যা স্বপ্ন।

٣٧. وكل ما هو ات قريب .

৩৭। যে ঘটনা ঘটবে, তার সময় নিকটবর্তী।

٣٨. وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر .

৩৮। মুমিনকে গালি দেওয়া ফিস্‌ক এবং তাকে হত্যা করা কুফ্‌র।

٣٩. واكل لحمه من معصية الله .

৩৯। মুমিনের গোশ্‌ত ভক্ষণ অর্থাৎ তার নিন্দা করা জঘন্য গুনাহের অন্যতম।

٤٠. وحرمة ماله كحرمة دمه .

৪০। মুমিনের মাল অন্যের জন্য ঠিক সেরূপ হারাম, যেরূপ হারাম রক্ত।

٤١. من لايرحم لايرحم .

৪১। যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না।

٤٢. ومن يغفر يغفر له .

৪২। যে অন্যকে ক্ষমা করে, তাকেও ক্ষমা করা হয়।

٤٣. ومن يعف يعف الله عنه .

৪৩। যে অন্যকে মার্জনা করে, আল্লাহ্ তাকে মার্জনা করেন।

٤٤. ومن يكظم الغيظ ياجره الله .

৪৪। যে রাগ হজম করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পুরস্কৃত করবেন।

٤٥. ومن يصبر على الرزية يعوضه الله

৪৫। যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরও ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ তাকে ভাল বিনিময় দান করেন।

٤٦. ومن يتبع السمعة يسمع الله

৪৬। যে-অন্যের দোষ ছড়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অপমাণিত করেন।

٤٧. ومن يصبر يضعف الله له

৪৭। যে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বহুগুণ বেশী দান করেন।

٤٨. ومن يعص الله يعذبه الله

৪৮। যে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয় আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেন।

সর্বশেষ তিনি তিনবার ইস্তিগফার পাঠ করেন। (সংকলক)

মসজিদে যিরার

মসজিদে যিরার

সূরা তাওবার নিম্নলিখিত আয়াতে মসজিদে যিরারের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ كُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا
لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ ط وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلاَّ الْحُسْنٰى ط وَاللّٰهُ
يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ لاَتَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ط لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ
اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ - فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ
اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى
شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ط وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ .
لاَيَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلاَّ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
حَكِيْمٌ .

"এবং যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফ্‌রী ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করেছে তার গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তারা অবশ্যই শপথ করবে, 'আমরা সদুদ্দেশ্যেই এটা করেছি।' আল্লাহ্ সাক্ষী, তারা তো মিথ্যাবাদী। আপনি (সালাতের উদ্দেশ্যে) এতে কখনো দাঁড়াবেন না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই স্থাপিত হয়েছে তাক্‌ওয়ার উপর, সেটাই আপনার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য। তথায় এমন লোক আছে, যারা পবিত্রতা অর্জনকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পসন্দ করেন। যে ব্যক্তি তার গৃহের ভিত্তি আল্লাহ্‌ভীতি ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সেই উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের ধ্বংসোম্মুখ কিনারায়, ফলে তা ওকে সহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয়? আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। ওদের গৃহ যা ওরা নির্মাণ করেছে তা ওদের অন্তরের সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে – যে পর্যন্ত না ওদের অন্তর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" – (৯:১০৭-১০৮)

বাইরে মসজিদ, ভিতরে দারে হারব

এই ইমারতটি মসজিদে কুবা থেকে পূর্ব দিকে সামান্য দূরত্বে নির্মাণ করা হয়েছিল। আর এটা হচ্ছে সেই সময়ের ঘটনা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোম সম্রাটের মুকাবালার জন্য তাবূক সফরের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিলেন। কেননা হামলার খবর অনবরত: আসছিলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এই সিদ্ধান্ত ছিল যে, কায়সারের সাথে যুদ্ধ হলে তারই এলাকায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। তখন হক ও সত্যের শত্রু এবং তাদের সাথে ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকদের এই বিশ্বাস

হয়ে থাকবে যে, কায়সারের মুকাবালা করতে গেলে মুসালমানদের শিরদাঁড়া ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে। অতএব প্রথম থেকেই এমন একটি কেন্দ্র নির্মাণ করা চাই, যেখানে ইসলাম বিরোধী শক্তিকে সুবিন্যস্ত করে তোলা যায় এবং তাবূক থেকে আশানুরূপ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে মদীনা মুনাওওরায় ইসলামের যা কিছু চিহ্ন বাকি রয়েছে, তা সমূলে ধ্বংস করে ফেলা যায়। উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে সম্ভবতঃ হাফিয ইবনে কাছীর এই ইমারতকে 'বাইরে মসজিদ এবং ভিতরে দারে হারব' বলে ঘোষণা করেছেন।

যাহোক যখন ইমরাত নির্মিত হয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে নিবেদন করা হল যে, এই মসজিদ সেই সব রুগ্ন ও দুর্বল লোকদের প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে, যারা জামা'আতে সালাত আদায়ের জন্য কিছু দূরে অবস্থিত মসজিদে উপস্থিত হতে পারে না, তারাই এখানে সালাত আদায় করবে। তাছাড়া বৃষ্টি বাদল ও শীতের রাতে অন্যান্য লোকেরাও এখানে তাদের ফরয সালাত আদায় করতে পারবে। অতএব হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি এই মসজিদে আসুন এবং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে অন্তত: একটি সালাতে এখানে ইমামাতী করে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এখন তো আমরা সফরের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত রয়েছি। প্রত্যাবর্তনের পর ইনশাল্লাহ্ সালাত আদায় করব।

অসৎ উদ্দেশ্যকে লোক দেখানো ও কপটতার আবরণে এমন কৌশলের সাথে ঢেকে দেওয়া হল যে, কোন ব্যক্তির পক্ষেই প্রথম দৃষ্টিপাতে আসল ব্যাপার আঁচ করা মোটেই সম্ভব ছিল না। এমন কি খোদ কুবাবাসীরা, যারা তাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিল, তাঁরাও এর বিরুদ্ধে কোন কথা বললেন না বা বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

তাবূক সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যে সব আয়াত নাযিল হয়েছিল, তা থেকে নিম্নের দুটি টুকরা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যথা –

وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ .

"তারা অবশ্যই শপথ করবে, আমরা সদুদ্দেশ্যেই এটা করেছি।" (৯:১০৭)

إِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

"ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করেছে তার গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।" (৯:১০৭)

শেষ ইঙ্গিত সম্ভবত: আবূ আমির রাহিব নাসরানীর দিকে করা হয়েছে।

আবূ আমির রাহিব

খাযরাজ গোত্রের এ লোকটি ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে একজন রাহিবে (পুরোহিতে) পরিণত হয়েছিল। সাধারণভাবে মনে করা হত যে, সে আহলে কিতাবের উলামাবৃন্দের অন্যতম। অথচ যে ব্যক্তির ইলম তাকে প্রকৃত অবস্থায় পৌঁছাতে পারে নি, তার মধ্যে সঠিক দূরদর্শীতা সৃষ্টি করতে পারেনি তার অভ্যন্তরীণ সংশোধন করতে পারে না – সেটাকে কি করে ইল্‌ম বলা যেতে পারে? প্রকৃতপক্ষে আবূ আমির আলিম ছিল না, কিন্তু তার বাহ্যিক আড়ম্বর ছিল আলিমতুল্য এবং সে চাইত যে, তার সম্মান ও মর্যাদার মুকাবালায় যেন অন্য কেউ মাথা তুলে না দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় হিজরত করার পর যেমন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই-এর নেতৃত্বের অবসান ঘটে তেমনি আবূ আমির রাহিবের ধার্মিকতা এবং দ্বীনী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার তথাকথিত দাপটও একেবারে মাটির সাথে মিশে যায়। প্রথম প্রথম তার এই ধারণা হয়ে থাকবে যে, কুরায়শের সব প্রভাবশালী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাহাবীকে তাঁদের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে, তারা নিশ্চয়ই তাঁদেরকে মদীনায়ও স্বস্তিতে টিকে থাকার সুযোগ দেবে না। কিন্তু বদর যুদ্ধের ফলাফল আবূ আমিরের এই আশাকে মরীচিকায়

পরিণত করে দিল। এরপর সে উহুদ ও খন্দক যুদ্ধ সমূহের জন্য কুরায়শ এবং অন্যান্য আরব গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকাতে থাকে। এক্ষেত্রেও যখন সে বিফল হল তখন স্বধর্মীয় সম্রাট কায়সারের সাথে গিয়ে তাকে মুসলমানদের মুকাবালায় দাঁড় করাতে চেষ্টা করল। মদীনা সুনাওওরার মুনাফিকদের সাথেও তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আর মসজিদে যিরার নির্মাণ ছিল আবূ আমির এবং মুনাফিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল।

মসজিদে যিরারের প্রতিষ্ঠাতাগণ

মসজিদে যিরারের প্রতিষ্ঠাতা ছিল ১২ জন, যেমন মাওলানার বর্ণনা থেকে বুঝা যায়। তাদের নাম ছিল নিম্নরূপঃ

১। খিযাম বিন খালিদ (সে বনী আমর বিন আওফের শাখা গোত্র বনী উবায়দ বিন যিয়াদের লোক ছিল)।

২। মু'আত্তিব বিন কুশায়র (বনী যাবায়আহ্ বিন যায়দ)।

৩। আবূ হাবীবাহ বিন আল আযআর (ঐ)।

৪। 'আব্বার বিন হুনায়ফ (বনী আমর বিন আওফ)।

৫। জারিয়া বিন 'আমির।

৬। মুজাম্মা' বিন জারিয়া।

৭। যায়দ বিন জারিয়া বিন 'আমির।

৮। নাবতাল বিন আল হারিছ (বনী যুবায়আহ)।

৯। বিজাদ বিন উছমান (ঐ)।

১০। বাহযাজ (ঐ)।

১১। ওয়াদিআহ বিন ছাবিত (বনী উমাইয়া বিন যায়দ)।

১২। ছা'লাবা বিন হাতিব।

সাধারণ তালিকা এটাই। কিন্তু ইবনে হাযাম ছালাবা বিন হাতিব সম্পর্কে পরিষ্কার লিখেছেন যে, তার নাম এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে না। কেননা তিনি বদরী (বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) ছিলেন।[১] মরহুম মাওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী এটাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি লিখেছেন যে, এই ছা'লাবা বদরী নন, বরং তিনি অন্য ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তি ও তার পিতার নামের সাথে মিল থাকার দরুণ এখানে এই সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। ছা'লাবা বিন হাতিব বদরী (রা) উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন।[২] কিন্তু শুহাদা-ই-উহুদের তালিকার মধ্যে আমি কোথাও ঐ ছা'লাবার নাম পাই নি। আর ইবনে হাযামও নিশ্চয়ই এই তথ্য সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারেন না। কেননা তিনি স্বয়ং তাঁর গ্রন্থের মধ্যে উহুদ যুদ্ধের শহীদদের তালিকা দিয়েছেন।

মসজিদে যিরার নির্মাণকারীদের তালিকায় প্রথম যে ব্যক্তির নাম আসে সে হচ্ছে খিযাম বিন খালিদ। সে তার ঘরেরই জমির একটি অংশ পৃথক করে মসজিদের জন্য দান করে। অতএব মসজিদে যিরার তার ঘরের সাথেই সংযুক্ত ছিল। জারিয়া বিন আমিরের দুই পুত্র ঘরের মূল কাজে শরীক ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা এই বলে ওজর পেশ করে, "আমরা বয়সে ছিলাম খুবই ছোট। তাই বুঝতে পারি নি, এটা কি হচ্ছে এবং কি উদ্দেশ্যে হচ্ছে। আমাদের পিতা যা করছিলেন আমরা না জেনে না শুনে তাতেই শরীক ছিলাম।" তাদের এই ওজর মেনে নেওয়া হয়। মুজাম্মা' বিন জারিয়া ছিল মসজিদে যিরারের ইমাম। কেননা সে সুন্দরভাবে কুরআন পড়তে পারত। তার অপরাধও ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যায়দ বিন জারিয়াকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের মাল থেকে একটি অংশ দিয়েছিলেন। সে সিফফীন যুদ্ধে হযরত আলী (রা) এর পক্ষে যুদ্ধ করেছিল।

মসজিদে যিরার ধ্বংস করা হলো

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাবূক থেকে ফিরে আসেন তখন উল্লেখিত আয়াতগুলো নাযিল হয়। মদীনা মুনাওওরা থেকে সামান্য দূরে যখন তিনি 'যী আদান' নামক স্থানে পৌঁছেন তখন মালিক বিন আদ দুখশাম এবং মাআন বিন আদী কিংবা তাঁর ভাই আসিম বিন আদীকে প্রেরণ করেন যেন তাঁরা মসজিদে যিরার পুড়িয়ে একেবারে ধ্বংস করে দেন। মালিক বিন আদ দুখশাম নিজের ঘরে প্রবেশ করেন। খেজুরের একটি ডাল নিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করেন। এরপর সমজিদে যিরারে গিয়ে পৌঁছেন এবং ঐ খেজুরের ডাল থেকে মসজিদে আগুন লাগিয়ে চিরতরে ধ্বংস করে ফেলেন।

এই লেখক সেপ্টেম্বর ইং ১৯৫৫ সনে মসজিদে কুবা থেকে সামান্য পূর্বদিকে মসজিদে যিরারের ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করেছে।[৩]

সূরা তাওবার ১০৭ নং আয়াতে যে মসজিদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইসলামী ইতিহাসে মসজিদে যিরার নামে যে মসজিদটিকে স্মরণ করা হয় তার সংক্ষিপ্ত অবস্থা হলো ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আসেন তখন প্রথমে কুবা নামক স্থানে অবস্থান করেন। এখানে তাঁর নির্দেশে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, যা ছিল ইসলামী যুগের প্রথম মসজিদ। কিছু সংখ্যক মুনাফিক, যাদের সংখ্যা কোন কোন রেওয়ায়াত অনুযায়ী বার বলে জানা যায় – এই মসজিদেরই নিকটে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করে। আর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবূক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করে, আপনি একদিন ওখানে এসে সালাতে ইমামতী করে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এখন তো আমি সফরে যাচ্ছি। ফিরে আসার পর দেখা যাবে। এরপর তিনি যখন তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মদীনার একেবারে নিকটে এসে পৌঁছলেন তখন উল্লেখিত আয়াতটি নাযিল হয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জানিয়ে দেন যে, এই মসজিদের নির্মাতারা কপটতার মানসিকতা নিয়ে এই মসজিদ নির্মাণ করেছে। অতএব তিনি সংগে সংগে এই মসজিদ ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দেন এবং তাঁর মদীনা পৌঁছার পূর্বেই তা ধ্বংস করে ফেলা হয়।

মুসলমানদের ক্ষতি

উল্লেখিত আয়াতে মসজিদ তৈরীর চারটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

১। 'যিরার'

অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কুবার বিশুদ্ধ চিত্ত মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত করা। কেননা মসজিদে কুবার কারণে তারা একটি বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিল। মুনাফিকরা হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে চাচ্ছে যেন কুবাবাসীদের ঐ বৈশিষ্ট্য বহাল না থাকে।

২। কুফ্‌রের প্রসার

কুফর প্রচারর লক্ষ্য অর্জন। অর্থাৎ তাদের নিজেদের যদি একটি পৃথক মসজিদ হয়ে যায় তাহলে কুবা মসজিদে যাওয়ার কোন প্রয়োজন বাকি থাকবে না। আর এভাবে সালাত ত্যাগ করার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। কেননা লোকেরা মনে করবে যে, তারা তাদের মসজিদে সালাত আদায় করে নিয়েছে। অথচ তারা তাদের ঘরে বসে থাকবে। এ থেকে জানা গেল যে, সালাত ত্যা গ করার অবস্থা এমন একটি অবস্থা, যেটাকে কুরআন কুফ্‌রীর অবস্থার সাথে তুলনা করেছে। এও জানা গেল যে, পুণ্য কাজ করে পুণ্য লাভ করাটা কর্মীর উদ্দেশ্য ও নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। অন্যথায় মসজিদ তৈরী করার মত একটি পূণ্য কাজও কুফ্‌রীর কাজে পরিণত হতে পারে।

৩। বিভেদ সৃষ্টি

মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। কেননা কুফার সকল অধিবাসী একই মসজিদে সালাত আদায় করতেন। এখন যদি তাদের নিকটেই আর একটি মসজিদ তৈরী হয়ে যায় তাহলে মসজিদের জামাআত দুভাবে বিভক্ত হয়ে যাবে। কোন কোন লোক পূর্বের মসজিদে যাবে, আবার কোন কোন লোক নতুন মসজিদে যাবে। আর যখন একটি জামাআত বাকী থাকল না তখন মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর ঐক্য, মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাতের সুযোগও আর বাকি থাকল না। আর জামাআত কায়েমের এটাই হচ্ছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

এথেকে জানা গেল যে, একটি মসজিদ যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে বিনা প্রয়োজনে তার নিকটে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ নয়। কেননা এরূপ করলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়। আর এ কারণেই সমগ্র আয়িম্মা-ই-ইসলাম এ ব্যাপারে একমত যে, প্রত্যেক শহরে জুমআর জামাআত একটিই হওয়া উচিত। হ্যাঁ যদি অধিবাসীর সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, একই মসজিদে তাদের সংকুলান হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক মসজিদে জুমআর সালাত কায়েম করা যেতে পারে। এটা যেন না হয় যে, বিনা প্রয়োজনে অনেকগুলো মসজিদ নির্মাণ করে সেগুলোতে পৃথক পৃথক জুমআর সালাত শুরু করে দেওয়া হয়।

৪। কুরআনের পরিষ্কার হুকুমের অবমাননা

আক্ষেপের বিষয় যে, মুসলমানরা কুরআনের এই পরিষ্কার হুকুমের অবমাননা করছে। শুধুমাত্র লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কিংবা তাদের ব্যবস্থাপকদের ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তারা প্রত্যেকটি গ্রাম ও প্রত্যেকটি মহল্লায় দিনের পর দিন প্রচুর সংখ্যক মসজিদ নির্মাণ করে চলেছে। যদি তাদের এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যাচাই করা যায় তাহলে এর মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক মসজিদ ঠিক 'মসজিদে যিরার' বলেই প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু এমন কেউ নেই, যে মানুষকে এই বাতিল কাজ থেকে রুখে রাখবে। বরং উলামা ও মাশয়িখবৃন্দও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিজেরাই এই সব কাজে উদ্যোগী হয়ে থাকেন এবং তাদের অনুসারীদেরকে মসজিদ তৈরীর অগণিত ছাওয়াব ও ফযীলতের কথা শুনিয়ে তাদেরকেও এ কাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি ও বিভেদ সৃষ্টির একটি বড় কারণ হচ্ছে এই অসংখ্য মসজিদের অস্তিত্ব। একই মহল্লায় চার পাঁচটি জায়গায় পৃথক পৃথক জামাআত হয়। অতি সামান্য দূরত্বের মধ্যে একাধিক জায়গায় জুমআর জামাআত কায়েম করা হয়। অনাসৃষ্টির শেষ এখানেই নয়, বরং ঈদের জামাআতসমূহও আজকাল মসজিদসমূহে অনুষ্ঠিত হতে শুরু করেছে। অথচ এটা চিরাচরিত সুন্নাতের পরিষ্কার বরখেলাফ। এদ্বারা ঈদের বিরাট জামাআতের লক্ষ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

শত্রুদের গোপন ঘাঁটি

মসজিদে যিরারের আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তাদের জন্য একটি গোপন ঘাঁটি তৈরী করে দেওয়া। অর্থাৎ ইসলামের শত্রু, যাদের সাথে এই সব লোক গোপন ষড়যন্ত্র করে থাকে তাদের জন্য একটি গোপন আড্ডাখানা তৈরী করে দেওয়া।

আবূ আমির রাহিব

বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আবূ আমির রাহিব ছিল মদীনার খাযরাজ গোত্রের একটি লোক। সে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিল। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করেন তখন কালিমা-ই-ইসলামের প্রচার ও প্রসার তার কাছে খুব অপসন্দনীয় ঠেকে। তাই সে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। প্রথমে সে মক্কার কুরায়শদের পক্ষ নেয়। এরপর কন্সটান্টিনোপলের সম্রাটের কাছে যায় এবং তাকে

মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাতে প্ররোচিত করে। কুবার কোন কোন মুনাফিক এবং তার মধ্যে দীর্ঘ দিন থেকে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। সে ওদেরকেও ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করত এবং রোমানরা যে শীঘ্রই মুসলমানদের উপর হামলা করবে সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করত। 'ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করেছে' – এই আয়াতের মধ্যে সে দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

টীকা ঃ

১। জাওয়ামিউস সীরাত ঃ পৃষ্ঠা - ২৫৪।

২। আসাহ্হুস্ সিয়ার ঃ পৃষ্ঠা - ৩৩৫।

৩। এখান পর্যন্ত যা লেখা হয়েছ তা সংকলকের পক্ষ থেকেই লেখা হয়েছে। এটাকে মাওলানার বর্ণনার ভূমিকা হিসাবে ধরা যেতে পারে।

নিফাকের হাকীকত

তাবূক যুদ্ধ ও মসজিদে 'যিরার' এর আলোচনা প্রসংগে মুনাফিকদের উল্লেখ বার বার এসেছে। তাই মরহুম মাওলানা সাহেব সূরা তাওবার টীকায় নিফাকের হাকীকত সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন প্রসঙ্গক্রমে তা এখানেও উদ্ধৃত করা গেল। (সংকলক)

নিফাকের ব্যাখ্যা

পবিত্র কুরআন কুফ্‌রের ন্যায় নিফাকের উল্লেখও স্থানে স্থানে করেছে। মুনাফিকদের কার্যকলাপ এবং স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে পাওয়া সর্বাধিক বিশ্লেষণ এই সূরার (সূরা তাওবার) মধ্রে পাওয়া যায়। অতএব নিফাকের হাকীকত কি এবং মুনাফিকদের জামাআত কি ধরনের জামাআত ছিল, তা ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা খুবই জরুরী।

পৃথিবীতে আমরা দেখি যে, 'ফিকর ও আমল' (চিন্তা ও কাজ) -এর যে কোন ক্ষেত্রে লোক হয় তিন ধরনের। প্রথম ধরনের লোক হচ্ছে কর্মতৎপর ও স্থির স্বভবের। এরা প্রত্যেকটি ভাল কথাকে বুঝে এবং তা গ্রহণ করে। এরপর কর্মতৎপর হয়ে উঠে।

দ্বিতীয় ধরনের লোক হচ্ছে দুষ্কৃতিপরায়ণ ও অসৎ স্বভাবের। এরা প্রত্যেকটি ভাল কথাকে অস্বীকার করে। কোন সরল ও সত্য কথা তাদের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। তৃতীয় ধরনের লোক হচ্ছে মধ্যম পন্থী। এরা প্রত্যেকটি কথাকে শুনতে এবং মেনে নিতে তৈরী হয়ে যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে প্রস্তুতি থাকে না। ওরা পা উঠায়, কিন্তু চলে না। আর চলতে শুরু করলে প্রথম পদক্ষেপেই নড়বড়াতে থাকে। এদের মধ্যে প্রথম দলের মত সেই কর্মতৎপরতা থাকে না যে, যে কথা মানবে তা ঠিক মত মানবে এবং তা কাজে পরিণত হবে। আর দ্বিতীয় দলের মত বেপরোয়াভাব এবং দুঃসাহস থাকে না যে, পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করবে। অতএব যদিও এরা মনে করে যে, একটি পথ তারা ধরেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় পথের কোনটির মধ্যেই তারা থাকে না। যেখান পর্যন্ত স্বীকার করার সম্পর্ক সেখানে তারা কবুলকারীদের মধ্যে থাকে, আর যেখান পর্যন্ত বিশ্বাস ও বাস্তবায়নের সম্পর্ক সেখানে তাদের অবস্থা হয় অস্বীকারকারীদের মতই।

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَا اِلٰى هٰؤُلَاءِ وَلَا اِلٰى هٰؤُلَاءِ ط

" দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে।" (৪:১৪৩)

দৃঢ়তা ও বিশ্বাস এবং সংকল্প ও আমল প্রথম দলের বৈশিষ্ট্য, অস্বীকার ও অমান্য করা দ্বিতীয় দলের বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, দোদুল্যমানতা, দোটানা অবস্থা, বেআমলী (কার্যহীনতা) ও কর্মবিমুখতা হচ্ছে তৃতীয় দলের বৈশিষ্ট্য। হুবহু এই অবস্থা ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখনেও মানবীয় স্বভাবের এই তিন অবস্থা প্রকাশ পায়। কর্মতৎপর স্বভাব একটি বিষয়কে গ্রহণ করে নেয় এবং চলতে শুরু করে। এরা হলো মু'মিন। মুফ্‌সিদ দুষ্কৃতিকারী অস্বীকার করে এবং বিরোধিতায় তৎপর হয়ে উঠে। এরা হলো কাফির। আবার কিছু লোক গ্রহণ করে নেয়, কিন্তু আসলে গ্রহণ করার আত্মা এদের মধ্যে থাকে না। এরা হচ্ছে মুনাফিক।

সর্বদা প্রকাশ লাভকারী ভ্রষ্টতা

কুরআন মজীদ কুফ্‌রের ন্যায় নিফাকী কাজকর্ম এবং তার বৈশিষ্ট্যাদিও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে। কেননা কুফ্‌রের ন্যায় নিফাকও শুধুমাত্র ওহী নাযিল হওয়ার সময়কালেরই সৃষ্ট নয়। এটা সব সময়ই প্রকাশ লাভকারী একটি ভ্রষ্টতা ছিল এবং মানুষের পথভ্রষ্টতা কোন বিশেষ যুগ বা বিশেষ বংশের সাথে নয় বরং গোটা মানজাতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।

এ ধরনের একটি সাধারণ ভ্রান্তি ছড়িয়ে রয়েছে যে, মানুষ মনে করে মুনাফিকদের দল কাফিরদের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী একটি বিশেষ দল ছিল, যারা গুপ্তচরদের ন্যায় ছদ্মবেশে মুসলমানদের সাথে ওঠাবসা করতে শুরু করেছিল। বাইরে বের হলে তারা মুসলমান হয়ে যেত। আর একাকী হলে তারা নিজেদের আসল বেশ ধারণ করত। অথচ এরূপ মনে করা কুরআন ও হাদীসের পরিষ্কার বর্ণনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। মুনাফিকরা ইসলামকে দ্বীন ও ইতিকাদ হিসাবে এমনভাবে গ্রহণ করেছিল যেভাবে গ্রহণ করে অন্যান্য মুসলমানরা।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ –"ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফির হয়েছে"। (৯:৭৪)

-এ থেকে উপরোক্ত কথা প্রমাণিত হয়। তারা নিজেরা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করত। তাদের স্ত্রীরাও তাদেরকে মুসলমান মনে করত। তাদের সন্তানরাও তাদেরকে মুসলমান মনে করত। তাদের ঘরের প্রত্যেকটি লোক বিশ্বাস করত যে, তারা মুসলামন। তারা সালাত আদায় করত, রোযা রাখত এবং ইসলামের তরীকা মতে সন্তান-সন্ততিকে প্রতিপালন করত।[১] একটি দ্বীনকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তাতে এমন কোন ব্যাপার ছিল না যা বাহ্যত: তাদের মুসলমান হওয়ার বিরোধী ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও কুরআন সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, তারা মুসলমান নয়। কেননা ইসলামের পানীয়ে ওরা চুমুক দিয়েছে বটে, কিন্তু তা তাদের গলার নীচে নামে নি। কোন শিক্ষা গ্রহণের পর য়াকীন ও আমল (বিশ্বাস ও কর্ম) -এর যে প্রাণ সৃষ্টি হওয়া চাই ওরা এথেকে বঞ্চিত ছিল। বিশুদ্ধচিত্ততা এবং সত্যতার কোন স্থান ওদের অন্তরে ছিল না। ওরা আল্লাহ্‌র কালাম শুনত। কিন্তু আমল করার জন্য নয়, বরং শুধুমাত্র শোনার জন্যই শুনত। তারা সালাত আদায় করত, কিন্তু অন্যমস্কভাবে; খয়রাত করত, কিন্তু চাপে পড়ে। তাদের অন্তরে দ্বীনের চাইতে দুনিয়ার আসক্তি ছিল বেশী। ইসলামের যে সব হুকুম তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের বিপরীত না হত তারা সেগুলোর উপর সন্তুষ্টচিত্তে আমল করত। আর যা তাদের স্বার্থের বিপরীত হত তা থেকে তারা পলায়ন করতে চাইত। যখন সুদিন আসত তখন তারা থাকত মুমিনদের প্রথম সারিতে, আর যখন আত্মোৎসর্গের সময় আসত তখন তাদেরকে একেবারে পেছনের সারিতেও দেখা যেত না। জিহাদের কথা চিন্তা করতেই তাদের আত্মা কেঁপে উঠত। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার নির্দেশ তাদের কাছে ছিল যেন মৃত্যুর পরোয়ানা। ইসলামের শত্রুদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে তারা কোনরূপ ইতস্ততঃ করত না। তারা মনে করত উভয় পক্ষের সাথে মিলে মিশে থাকার মধ্যেই মঙ্গল। কেননা যদি পালা বদল হয়ে যায় এবং শত্রুরা বিজয় লাভ করে তাহলে তাদের কাছে যাবারও একটা পথ উন্মুক্ত থাকবে।

নিফাকের বিভিন্ন অবস্থা

ঈমান ও কুফরের ন্যায় নিফাকের যাবতীয় অবস্থাও একরূপ হয় না এবং একরূপ ছিলও না। যেহেতু মূলের দিক দিয়ে এই অবস্থাও অস্বীকারেরই একটি স্বীকৃত রূপ, তাই যখন তা অগ্রসর হয় তখন অকাট্য অস্বীকৃতির দিকেই অগ্রসর হয় এবং অস্বীকৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ তার মধ্যে প্রতিভাত হতে থাকে। তবে কোথাও কম, আর কোথাও বেশী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর যুগের মুনাফিকদের নিফাকের অবস্থা একরূপ ছিল না। আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের নিফাক প্রত্যেকটি মুনাফিকের নিফাকের মত ছিল না। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُوْنَ ط وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا ط عَلَى النِّفَاقِ قف لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ .

"মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশে-পাশে আছে তাদের কেউ কেউ মুনাফিক এবঙ মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ, তারা কপটতায় সিদ্ধ। আপনি তাদেরকে জানেন না; আমি তাদেরকে জানি।" ৯:১০১)

কারো কারো নিফাকের গতিধারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এরূপ ছিল যে, তারা হিজরত থেকে বিমুখ ছিল। কারো উপর আল্লাহর পথে মাল খরচ করা ছিল কষ্টকর। কেউ কেউ জিহাদ থেকে প্রাণ বাঁচাতে চাইত। কারো জন্য সালাত কায়েম করা ছিল খুবই কষ্টকর। কেউ কেউ এমন ছিল, যারা আল্লাহ্র হুকুম ও কুরআনের আয়াতসমূহ নিয়ে হাস্য-রসিকতা করত। তারা সব সময় এই ধান্ধায় থাকত যে, যদি মুসলমানদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তাহলে যেন খোলাখুলি শত্রুদের দলে ভিড়ে যাওয়া যায়। এতদ্সত্ত্বেও একথা ঠিক যে, তারা সবাই ইসলামকে নিজেদের দ্বীন ও তরীকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল এবং নিজেদেরকে মুসলমানদেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করত। আসল ব্যাপার এমন ছিল না যে, শুধুমাত্র একটি চক্রান্তকারী দল নিজেদের আসল রূপ পরিবর্তন করে মুসলামনদের দলে এসে ভিড়েছে, অথচ তারা মুসলমানদের মধ্যে নয়।

এবার চিন্তা করে দেখুন, এখানে মুনাফিকদের কি কি আমাল ও বৈশিষ্ট্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

১। যখন সত্যের পথে ধন-প্রাণ উৎসর্গ করার সময় আসে তখন তারা নানা ধরনের হিল্লা বাহানা বের করে এবং বলে, আমাদেরকে যেন ঘরে অবস্থান করার অনুমতি দেওয়া হয়।

২। মুসলমানদের মধ্যে সব সময় ফিত্না ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। দুর্বল এবং অবুঝ মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করে। আর এদিকের কথা ওদিকে গিয়ে লাগায়।

৩। যখন কোন দলের (পক্ষের) জন্য দুঃসময় আসে তখন তারা এমনভাবে কথা বলে যে, তাতে ওদের অন্তরও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে কোন না কোন ফিত্না ও বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হত। উহুদ যুদ্ধের সময় তারা অনুরূপই করেছিল।

৪। দ্বীনদারীর ছদ্মবেশে তারা তাদের নিফাক লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং বলে, এই কাজের (দ্বীনদারীর) মধ্যে আমাদের জন্য ফিত্না রয়েছে, তাই এতে পুরাপুরি অংশগ্রহণ করতে পারি না।

৫। মুসলমানদের বিপদ তাদের জন্য কোন বিপদ নয় এবং মুসলমানদের খুশীও তাদের জন্য কোন খুশী নয়।

৬। যখন কোন গোষ্ঠীগত ব্যাপার তাদের সামনে আসে তখন তারা তাতে কোন সাহায্য করে না, বরং উল্টো নানা ধরনের ফিত্না-ফাসাদের সৃষ্টি করে। এরপর যখন কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায় তখন বলে , আমরা প্রথমেই একথা জানতাম; তাই আমরা এটাকে সমর্থন করি নি। তারপর জাতির উপর আপতিত এই বিপদকে বিপদ মনে না করে তারা অন্তরে সন্তুষ্টই হয়; এমন কি মুখেও বলে, ভালই হলো যে, সাফল্য লাভ করা যায় নি।

৭। তারা যখন সালাত আদায় করে তখন এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে যে, মনে হয় তাদের উপর এক বিরাট বোঝা চেপেছে এবং তারা চাচ্ছে, যেন সে বোঝাটি কোন না কোনভাবে তাদের পিঠের উপর থেকে খসে পড়ে।

৮। পুণ্যের পথে তারা কখনো সন্তুস্টচিত্তে খরচ করে না। কার্পণ্যই হচ্ছে তাদের সব চেয়ে বড় চিহ্ন।

৯। তারা কসম খেয়ে খেয়ে বলতে থাকে, আমাদেরকে বিরোধী পক্ষ ভেবো না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, তাদের অন্তর নিফাকে ভর্তি।

১০। তাদের অন্তর সংশয় মুক্ত নয়। তাই সব সময় তারা ভয়ে ভয়ে থাকে এবং অনেক কাজই অন্তরের চাহিদানুযায়ী করে না, বরং শুধুমাত্র গোষ্ঠীর ভয়ে করে থাকে।

১১। যেহেতু সত্যের পথে পরীক্ষার পর পরীক্ষা আসতেই থাকে এবং যেহেতু তাদের অন্তরের মধ্যে বিশ্বাস ও বিশুদ্ধচিত্ততা নেই তাই প্রায়ই উপস্থিত পরিস্থিতিতে তারা এতই শংকিত হয়ে পড়ে যে, লুকিয়ে থাকার কোন জায়গা পেলে তারা হয়ত সংগে সংগেই সেখানে গিয়েই আত্মগোপন করবে।

১২। তারা হলো স্বার্থের গোলাম। তাদের যাবতীয় সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি নির্ভর করে পৃথিবী তথা পার্থিব সম্পদের উপর। সাদাকা বন্টনের সময় তাদেরকে কিছু দান করা না হলে তারা বিগড়ে যায়।

১৩। তারা যেহেতু ঈমান ও সততা থেকে বঞ্চিত তাই তারা ন্যায় অন্যায়ের কোন পরোয়া করে না। যে করেই হোক তারা ধন সম্পদ অর্জন করতে চায়। তারা সাদাকা-খয়রাত পাবার যোগ্য নয়, কিন্তু তা পাওয়ার জন্য প্রত্যাশী।

১৪। যখন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ফয়সালা দেওয়া হয় তখন তারা এই বলে দোষারোপ করতে থাকে যে, এক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে অন্যের পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে।

১৫.। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশুদ্ধচিত্ত মুমিনদের বিশুদ্ধচিত্ততা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং তাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। এটা মুনাফিকদের কাছে অপ্রীতিকর ঠেকত। এমন কি তাদের কেউ কেউ বলত, তিনি (সা) কানে কাঁচা – অর্থাৎ যার তার কথা শুনেন এবং তা বিশ্বাসও করেন।

১৬। যখন তারা দেখে যে, তাদের কপটতাসুলভ কথা বা ব্যবহারের ফলে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তখন তারা কসম খেয়ে খেয়ে মানুষকে নিজেদের কথা বিশ্বাস দেওয়াবার চেষ্টা করে এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার প্রয়াস চালায়। কুরআন বলে – তাদের সত্য বিস্মৃতির দিকে লক্ষ্য কর, তারা আল্লাহ্র কোন পরোয়া না করে দুষ্কর্ম করে যায়, কিন্তু মানুষকে এত ভয় করে চলে যে, যখন মানুষ তাদের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায় তখন তারা তাদের তোষামদ করে এবং কসম খেয়ে খেয়ে তাদেরকে নিজেদের সম্পর্কে বিশ্বাস দেওয়াবার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের পথভ্রষ্টতার একটি অদ্ভূত বৈপরিত্য এই যে, তারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখে বলে দাবী করে এবং একথাও জানে যে, আল্লাহ্র জ্ঞানের কাছে কোন জিনিস গোপনীয় নয়, এতদ্‌সত্ত্বেও তারা হরেক রকমের অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় এবং এক মুহূর্তের জন্যও তাদের মনে এই চিন্তা উদয় হয় না যে,আমরা কি করছি। কিন্তু যখনই অন্যের চোখে তাদের গুনাহ্সমূহ ধরা পড়ে যায় তখন তাদের বুদ্ধি ও চেতনা লোপ পায় এবং তারা হাজার ধরনের চেষ্টা চালায় যেন কেউ তাদেরকে খারাপ ভাবতে শুরু না করে। এ থেকে জানা গেল যে, প্রকৃত পক্ষে তারা আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। কেননা যদি তাদের এই পরিমাণ বিশ্বাস থাকত,যে পরিমাণ বিশ্বাস তারা রাখে মানুষের অস্তিত্বের উপর, তাহলে আল্লাহ্ থেকে বেপরোয়া বা নির্ভয় থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। কুরআনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই অবস্থাই হচ্ছে নিফাকের অবস্থা।

কপটতার মাধ্যমে ধোঁকাবাজী

১৭। ধর্মের ব্যাপারে মুনাফিকরা মিথ্যা কথা বলে। কিন্তু যখন ধরা পড়ে যায় তখন বলে, আমরা রসিকতা করে একটি কথা বলে ফেলেছিলাম। সত্যিকার অর্থে এটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। কুরআন বলে, এ ধরনের ওজর পেশ একটি জঘন্যতম অপরাধ। কেননা এ থেকে জানা গেল, তোমরা আল্লাহ্, আল্লাহ্র আয়াত এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা কর।

১৮। যেভাবে মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোক সত্যের পথে একে অন্যের বন্ধু ও সাহায্যকারী, তেমনিভাবে মুনাফিকরাও কপটতার পথে একে অন্যের বন্ধু ও সাহায্যকারী।

১৯। মিথ্যাচারিতা তাদের বৈশিষ্ট্য। তারা প্রথমে একটি স্পষ্ট কথা বলবে, এরপর তা নির্দ্বিধায় অস্বীকার করবে।

২০। তাদের কারো কারো অবস্থা এই যে, তারা অঙ্গীকার করে বলে, হে আল্লাহ্, যদি তুমি আমার উপর করুণা কর তাহলে আমি তোমার পথে দান-খয়রাত করবো এবং পুণ্যজীবন যাপন করবো। কিন্তু যখন আল্লাহ তার উপর করুণা করেন তখন সে নির্দ্বিধায় কার্পণ্য করতে শুরু করে এবং আল্লাহ্র পথে কিছু দান করে না। বরং সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

২১। তাদের একটি বদ্স্বভাব এই যে, তারা নিজেরা তো কিছু করে না, কিন্তু যারা কিছু করে তাদের বিরুদ্ধে লম্বা লম্বা কথা বলতে কখনো দ্বিধা করে না। যেমন সচ্ছল লোকেরা যখন বড় বড় অংকের অর্থ আল্লাহ্র পথে দান করে তখন তারা বলতে থাকে, এই ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কিংবা কোন পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এরূপ অর্থ ব্যয় করছে। আর যখন কোন অসচ্ছল ব্যক্তি আপন উপার্জনের পয়সা থেকে দু'চারটি পয়সা আল্লাহ্র পথে দান করে তখন তারা তাকে উপহাস করে বলে, বাহ্, আল্লাহ্র পথে এটি একটি বিরাট দান বটে !

২২। সত্যের পথে দুঃখ কষ্ট সহ্য করার উপকারিতা তাদের বুদ্ধির গোচরে আসে না। তাবূক যুদ্ধের ঘটনা প্রখর গ্রীষ্মের মওসুমে সংঘটিত হয়েছিল বিধায় তারা অভিযাত্রীদের বলছিল, তোমরা এই গরমের মধ্যে কোথায় যাচ্ছ?

২৩। ঈমানের দুর্বলতা তাদেরকে পৌরুষের অনুভূতি ও আত্মসম্মানবোধ থেকে বঞ্চিত করে ফেলে। যখন মানুষ জাতি ও ধর্মের মঙ্গলার্থে প্রাণ উৎসর্গ করে তখন তারা স্ত্রীলোকদের সাথে ঘরে বসে থাকে এবং এজন্য মোটেই লজ্জাবোধ করে না।

২৪। কিছু লোক রাতদিন নিফাকের অবস্থায় থাকতে থাকতে এমনি দক্ষ ও পারদর্শী মুনাফিক হয়ে উঠে যে, তাদের মত দক্ষ মুনাফিক তুমি কোথাও দেখতে পাবে না এবং তাদের সাথে কথার মারপ্যাচেও তুমি পেরে উঠতে পারবে না।

২৫। কোন কোন লোক ধর্মের বেশে এমন সব পন্থা বের করে যার দ্বারা মুসলিম জামাআতের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। যেমন তারা একটি মসজিদ নির্মাণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে নিবেদন করল, যদি আপনি এখানে সালাতে ইমামতী করেন তাহলে তা আমাদের জন্য মঙ্গল ও সৌভাগ্যের কারণ হবে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে তাদের সমভাবাপন্ন লোকদের একত্রিত হওয়ার একটি কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং এখানে বসে বসে মুসলিম ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরানো।

২৬। এমন কোন বছর অতিবাহিত হয় নি যখন তাদেরকে পরীক্ষা করার বা সতর্ক করার কোন না কোন ঘটনার উদ্ভব হয় নি, কিন্তু তাদের অমনোযোগিতা ও অন্যমনস্কতার অবস্থা ছিল এই যে, এত কিছু সত্ত্বেও না তারা তাওবা করত, আর না উপদেশ গ্রহণ করত।

অন্যান্য পন্থায় মুনাফিকদের আমাল বা কাজকর্ম

সূরা আলে ইমরান, নিসা, আনফাল, আহযাব, মুহাম্মদ, ফাত্হ, হাদীদ, মুজাদালাহ এবং হাশরেও মুনাফিকদের আমাল এবং বৈশিষ্ট্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। 'মুনাফিকুন' শীর্ষক একটি সম্পূর্ণ সূরাই ওদের অবস্থার উপর নাযিল হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত সূরাগুলো একবার অধ্যয়ন করা যেতে পারে। একথা স্মরণ রাখা চাই যে, সূরা বাকারায় আয়াত ৮ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী, কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়। এবং এর পরবর্তী আয়াত সমূহে যে সব লোকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তাতে মুনাফিকদের এই জামাআত উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে য়াহূদী ও খ্রীষ্টান যারা আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপনের দাবী করত কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঈমানের রূহ তাদের মধ্যে বাকী ছিল না। মূলত তাদের এই অবস্থাও নিফাকের অবস্থা যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত সত্যকে প্রত্যাখান করার পর ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। কিন্তু উক্ত আয়াত দ্বারা মদীনার মুনাফিক উদ্দেশ্য নয়।

নিফাকের বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কিত হাদীস

এখান থেকে একথাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ঐ সব হাদীসের ভাবার্থ কি, যেগুলোর মধ্যে নিফাকের চরিত্রাদি বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ (بخارى) ولو صلى وصام وزعم انه مسلم (مسلم)

অর্থাৎ চারটি চরিত্র (স্বভাব) আছে ঃ যার মধ্যে এই চারটি চরিত্র থাকবে সে হবে নিখাদ মুনাফিক। যার মধ্যে এই চারটি চরিত্রের একটি থাকবে তার মধ্যে নিফাকের একটি চরিত্র রয়েছে (বুখারী)। – যদিও সে সালাত আদায় করে, রোযা রাখে এবং ধারণা করে যে সে মুসলিম (মুসলিম)।

এরপর (হাদীসে) ঐ সমস্ত স্বভাবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা একজন মুমিনের মধ্যে না থাকা উচিত। যেমন, আমানতে খিয়ানত করা, মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, রাগান্বিত হয়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা। অতএব জানা গেল, নিফাক এমন কোন অবস্থা নয়, যা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর যুগে প্রকাশ লাভ করেছিল। আর না মুনাফিকদের দল এমন কোন দল ছিল, যারা শুধু গোপনে গোপনে কাফিরদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করত। বরং এটা (নিফাক) হচ্ছে ঈমান ও আমলের দুর্বলতার একটি অধিকতর কঠিন অবস্থা। এটা যেমন সেই যুগে ছিল তেমনি সবযুগেই আছে এবং থাকবে।

আজ বেশীর ভাগ মুসলমান যদি নিজেদের ঈমান ও আমলের পর্যালোচনা করে তাহলে তারা জেনে যাবে যে, নিফাকের হাকীকত জানার জন্য অন্য কারো দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। বরং তারা যদি নিজেদের দিকে তাকায় তাহলে নিফাকের হাকীতক ও স্বরূপ তাদের চোখে ধরা পড়ে।

আকায়িদ ও আমালের তিনটি অবস্থা

কুরআন মানুষের আকায়িদ ও আমালের তিনটি অবস্থা ঘোষণা করেছে। যথা, ঈমান, কুফ্র ও নিফাক। প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব জগতের প্রত্যেকটি প্রান্তে মোট তিনটি অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। হয় তাকভীন (অস্তিত্বমূলক) -এর অবস্থা হবে, নয়ত ইফ্সাদ (ধ্বংসমুলক) এর অবস্থা, নয়ত এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা। স্বয়ং নিজের অস্তিত্বকেই দেখে নিন। হয় তা জীবন, নয়ত মৃত্যু, নয়ত ব্যাধি। ব্যধিকে না জীবনের সঠিক অবস্থা বলা যেতে পারে, আর না মৃত্যুর অবস্থা বলা যেতে পারে। এটা হচ্ছে জীবন-মৃত্যুর মধ্যবর্তী অবস্থা। কিন্তু এর অভিমুখিতা মৃত্যুরই দিকে। রূহ এবং হৃদয়েরও এই অবস্থা। ঈমান হচ্ছে জীবন, মৃত্যু হচ্ছে কুফ্র এবং নিফাক হচ্ছে ব্যাধি।

এ স্থানটি 'মা'আরিফে কুরআনী' এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্যতম।

'রাযূ আনহু' ('তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি প্রসন্ন') এর ব্যাখ্যা

আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট

সূরা তাওবায় বলা হয়েছে–

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট।"–(৯ঃ১০০)

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট'। এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য–যে দিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি।

অর্থাৎ এখানে 'তারাও তাতে সন্তুষ্ট'–এর উপর কেন গুরুত্ব আরোপ করা হলো? এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি প্রসন্ন। কেননা, তাদের আমাল (কাজকর্ম) আল্লাহ্‌র প্রসন্নতার জন্যই ছিল। একথা বিশেষভাবে কেন বলা হলো যে, তারাও তাতে সন্তুষ্ট। এ জন্য যে, তাদের ঈমান ও বিশুদ্ধ চিত্ততার প্রকৃত রূপ ও মর্যাদা এছাড়া প্রকাশ লাভ করতে পারত না।

দু' অবস্থা

মানুষ যখন কখনো কোন লক্ষ্য অর্জনের পথে চলতে শুরু করে এবং বিপদ-আপদে আক্রান্ত হয় তখন দুটি অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিছু লোক উদ্যমশীল ও বিপদের মুকাবালা করে। কিন্তু তাদের মুকাবালা মুকাবালার পর্যায়েই থাকে। এমন হয় না যে, বিপদ-আপদ তাদের জন্য বিপদ আপদরূপে থাকে না, বরং তা সুখ-সম্পদে পরিণত হয়। কেননা বিপদ তো বিপদই। তবে সাহসী লোকেরা কোনরূপ দ্বিধা না করে বিপদের তিক্ততা গলাধঃকরণ করে ফেলে। তবে তারা এই তিক্ততার বিস্বাদ অবশ্যই অনুভব করে। কিন্তু কিছু লোক এমন আছে যাদেরকে শুধু সাহসী নয় বরং-এর চাইতেও কিছু বেশী বলা উচিত। এদের মধ্যে শুধু সাহস ও উদ্যম নয় বরং প্রেম ও আসক্তির অবস্থাও সৃষ্টি হয়। তারা বিপদকে বিপদ মনে করে লড়ে না, বরং স্বস্তি ও সুখের ন্যায় সেগুলো থেকে স্বাদ ও আনন্দ লাভ করে। প্রেমের পথের প্রত্যেকটি বিপদ তাদের জন্য আরাম ও আয়েশের একটি নতুন স্বাদে পরিণত হয়। যদি এই পথে তাদেরকে কাঁটার উপর পতিত হতে হয় তো কাঁটার আঘাত তাদেরকে সেই পরিমাণ আনন্দ দেয়, যে পরিমাণ আনন্দ অন্যরা ফুলশয্যায় লুটোপুটি খেয়েও পায় না। এমন কি এই পথের বিপদ-আপদ যত বেশী বাড়তে থাকে তাদের অন্তরে তত বেশী আনন্দ বৃদ্ধি লাভ করে। তাদের অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল রয়েছে যে, যার পথে আমরা এসব কিছুর সম্মুখীন হচ্ছি তিনি আমাদের এই অবস্থা সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন। এই বিশ্বাস তাদের অন্তরে এমন এক প্রেরণার সৃষ্টি করে যে, এর মত্ততার কারণে তাদের মনে কোন কষ্ট অনুভূত হয় না। একথা শুনতে খুবই

বিস্ময়কর মনে হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তত বিস্ময়কর নয়। বরং এটা মানুষের জীবনের মামুলী ঘটনারই অন্তর্ভুক্ত। প্রেম ও ভালবাসার স্থান তো অনেক উপরে। আসক্তির অবস্থাও তো এ থেকে খালি নয়।

প্রথম অগ্রগামীদের ঈমানী মুহাব্বত

প্রথম অগ্রগামীদের ঈমানী মুহাব্বতের অবস্থা এই ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি, যে তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী অধ্যয়ন করবে সে দ্বিধাহীন চিত্তে একথা স্বীকার করবে যে, তাঁরা সত্য পথের বিপদ আপদ শুধুমাত্র সহ্যই করেন নি বরং অন্তরের আনন্দ এবং আত্মার পুরাপুরি সন্তুষ্টির সাথে নিজেদের সম্পূর্ণ জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যে সব লোক প্রথম দাওয়াতে ঈমান এনেছিল তাঁদের রাতদিনের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা এবং আত্মোৎসর্গের মধ্যে সম্পূর্ণ তেইশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এই সম্পূর্ণ সময়কালের মধ্যে কোথাও এমন ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় নি যে, বিপদাপদের তিক্ততা তাঁদের চেহারাকে বিগড়ে দিয়েছে। তাঁরা এমন আগ্রহ ও অনুপ্রেরণার সাথে তাঁদের ধনসম্পদ ও উপাদান-সামগ্রী উৎসর্গ করেছেন, যেন বিশ্বজাহানের সমগ্র আনন্দ ও আরাম-আয়েশ তাঁদের সামনে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। আর যখন প্রাণ উসর্গ করার সময় এসেছে তখন তাঁরা আনন্দের আতিশয্যে এমনভাবে তাঁদের গর্দান কাটিয়ে দিয়েছেন, যেন জীবনের সবচেয়ে বড় খুশী তাঁদের জীবনের মধ্যে নয় বরং মৃত্যুর মধ্যেই ছিল। তাঁদের মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যক লোক এমনও ছিলেন, যারা এত আয়ু পান নি যে, ইসলামের দুঃসময়ের সাথে তার সুময়ও দেখে যাওয়ার অবকাশ পেয়েছেন এবং আদী বিন হাতিম (রা) -এর মত বলতে পেরেছেন, আমি ঐ সব লোকের অন্যতম যারা কিসরার (বিজয়ী বেশে) উন্মুক্ত করেছিল।[২] বরং তাঁরা বলতে পেরেছেন – এ দুনিয়াতে থেকে আমরা সেই জগতে গিয়েছি যে, আমাদের থেকে সন্তুষ্ট চিত্তে কেউ দুনিয়া ছেড়ে যায় নি।

বদর ও উহুদের শহীদবৃন্দ

বদর ও উহুদের শহীদদের অবস্থা অধ্যয়ন করুন। ঈমান আনার পর যা কিছু তাঁদের উপর দিয়ে ঘটে গেছে তা তাদের দিন রাত্রির বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্ট ছাড়া কিছু ছিল না। এরপর ইসলামের বিজয়-আনন্দে শরীক হওয়া তো দূরের কথা, শত্রুদের তরবারির আঘাতে তাঁদেরকে একের পর এক অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। এরপরও চিন্তা করে দেখুন, তাঁদের অন্তরের সন্তুষ্টির কি অবস্থা ছিল? আরাম-আয়েশের বিছানায়ও এত শান্তি ও স্বস্তির সাথে কেউ প্রাণ দিতে পারে নি, যেভাবে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রের বালুকাময় ভূমিতে ঢলে পড়ে হাসিমুখে তাঁদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। উহুদ যুদ্ধে সা'দ বিন রাবী'কে লোকেরা দেখল, তিনি ভীষণ আহত অবস্থায় পড়ে আছেন এবং তাঁর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তখন তাঁকে বলা হলো, কোন ওসীয়ত থাকলে বলুন। তিনি তখন বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) কে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দেবে এবং আমার জাতিকে বলবে, তারা যেন আল্লাহ্র পথে প্রাণ বিসর্জন দিতে থাকে। আম্মারা বিন যিয়াদ (রা) এরও শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর শিয়রে গিয়ে দাঁড়ান এবং বলেন, তোমার কোন বাসনা থাকলে বলো। আম্মারা তখন আপন ক্ষত বিক্ষত দেহ একটু টেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর আরো নিকটবর্তী হন এবং আপন মাথা তাঁর পবিত্র পায়ের উপর ঠেকিয়ে বলেন, যদি আমার কোন বাসনা থেকে থেকে তাহ্লে তা ছিল এটাই।

মহিলাদের অবস্থা

মহিলাদের অবস্থা এই ছিল যে, একই সময়ে তাঁদের কাছে তাঁদের স্বামী, ভাই ও পিতার শাহাদতের সংবাদ পৌঁছানো হত। তখন তাঁরা বলতেন, তা তো শুনলাম; কিন্তু বলো, আল্লাহ্র রাসূলের অবস্থা কি? এরপর যখনই তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র চেহারা দেখতে পেতেন তখন আনন্দের আতিশয্যে উচ্চস্বরে বলে উঠতেন, 'যদি আপনি কুশলে ও নিরাপদে থাকেন তাহলে দুনিয়ায় সমগ্র বিপদ আমাদের জন্য মধু-মিশ্রির গ্রাস ছাড়া কিছু নয়।

হুনায়ন যুদ্ধের মালে গনীমত

ইসলামী ইতিহাসে হুনায়ন যুদ্ধই হচ্ছে প্রথম যুদ্ধ, যার মধ্যে প্রচুর মালে গনীমত হস্তগত হয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, ঐ যুদ্ধে চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজার বকরী এবং চার হাজার আওকিয়া রৌপ্য গনীমত হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল। এটা ছিল এমন মুহূর্ত যখন প্রথম অগ্রগামীরা (اَلسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ) এ থেকে প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে মক্কার সেই সব লোককে প্রাধান্য দিলেন, যারা মক্কা বিজয়ের পর নতুন নতুন ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ফলে মদীনার আনসারদের ভাগে কিছু পড়ল না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর লক্ষ্য ছিল নওমুসলিমদের চিত্ত আকর্ষণ করা। এই অবস্থা দেখে মদীনার কোন কোন নওজোয়ানের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হলো যে, মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে তো আমরা যুদ্ধ করলাম, কিন্তু আজ মালে গনীমতের অংশ তারাই পেয়ে যাচ্ছে। একথা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুনলেন তখন তিনি আনসারদেরকে একত্রিত করে বললেন–

اَلَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيْرِ وَتَذْهَبُوْنَ بِالنَّبِيِّ اِلٰى رِحَالِكُمْ.

" তোমাদের মনতুষ্টির জন্য একথা কি যথেষ্ট নয় যে, মানুষ এখান থেকে বকরী ও উটের মালে গনীমতের অংশ নিয়ে যাবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নবীকে সংগে নিয়ে তোমাদের ঘরে ফিরে যাবে।"

তখন আনসার সমস্বরে বলে উঠেন–

رَضِيْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَضِيْنَا

"আমরা সন্তুষ্ট , হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা এতেই সন্তুষ্ট (বুখারী, মুসলিম)।"

এরপর চিন্তা করুন আয়াতের ঐ অংশটি সম্পর্কে, যাতে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ

"এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে।"

অর্থাৎ যারা নিষ্ঠার সাথে প্রথম অগ্রগামীদের অনুসরণ করেছিল তারাও এখানে কী বিরাট মর্যাদরই না অধিকারী হয়েছিল। বিশ্বে সম্ভবতঃ কোন স্ত্রীলোকের অন্তরে আপন প্রিয়জনের জন্য তেমনি ভালভাসা সৃষ্টি হয় নি যেমন জাহিলিয়া যুগের বিখ্যাত মহিলা কবি খানসার অন্তরে হয়েছিল। সে যে শোকগীতি আপন ভাই 'সাখার' এর শোকে গেয়েছিল সমগ্র বিশ্বের কাব্য সাহিত্যে নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। সে গেয়েছিল –

يذكرنى طلوع الشمس صخرا　　　واذكره بكل غروب شمس

"প্রত্যেক প্রভাতে সূর্যের অভ্যুদয় সাখারের স্মরণকে জীবন্ত করে দেয় এবং এমন কোন সন্ধ্যা আমার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয় নি, যখন সাখারের স্মরণ আমার সামনে এসে হাযির হয় নি।" কিন্তু ঈমান আনার পর এই খানসার মানসিক অবস্থা এমনভাবে বদলে গেল যে, কাদিসিয়া যুদ্ধে একে একে তাঁর সবগুলো ছেলে শাহাদত বরণ করল। সর্বশেষ ছেলেও যখন শাহাদত বরণ করলেন, তখন তিনি উচ্চস্বরে বলে উঠেন –

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَكْرَمَنِىْ بِشَهَادَتِهِمْ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমার ছেলেদের শাহাদত দ্বারা আমাকে সম্মানিত করেছেন।"

'অতএব তারাও তাতে সন্তুষ্ট' – একথা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এদিকে যে, তাঁদেরকে আল্লাহ্ ও তার কালিমা-ই-হকের পথে যা কিছুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁরা সেগুলোকে শুধু সহ্যই করে নি, বরং পরিপূর্ণ ঈমানী মুহাব্বতের কারণে তাতে সন্তুষ্ট এবং আনন্দিতও ছিল। আর এটাই হচ্ছে তাঁদের সেই মন-মানসিকতা ও আন্তরিক অবস্থা, যার কারণে তাঁরা ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পেরেছিলেন।

টীকা ঃ

১। আবদুল্লাহ্ বিন উবাই মুনাফিকদের নেতা ছিল। কিন্তু তার পুত্র মুনাফিক ছিলেন না, বরং একজন বিশুদ্ধচিত্ত মুসলমান ছিলেন। আরো অনেক ক্ষেত্রে এই অবস্থা বিরাজমান ছিল।

২। আদী বিন হাতিম থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা বলেছিলেন, নিশ্চয়ই এমন দিন আসবে যে, তোমরা ইরানের কিসরার ভান্ডার বিজয়ী বেশে উন্মুক্ত করবে। আদী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী নিজের চোখে পূর্ণ হতে দেখেছি। কেননা আমি ঐ সমস্ত লোকের অন্যতম, যারা কিসরার ভান্ডার উন্মুক্ত করেছিল।

'পয়গামে হক' (সত্যের বাণী)-এর অলৌকিক ফলশ্রুতি

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۔

"এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।" – (১১০:২)

'পয়গামে হক'-এর অলৌকিক ফলশ্রুতি-১

ইসলামের আওতার বিস্তৃতি

ইসলাম প্রচারই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য। যে সব আমন্ত্রণ পত্র ও দূত প্রেরণের উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে তা ছাড়াও এ দায়িত্বকে পরিপূর্ণতায় পৌছাবার জন্য বিভিন্ন গোত্র ও জনগোষ্ঠীর লোকেরা হয় আপনা আপনি নিজেদেরকে তাবলীগের জন্য উৎসর্গ করেন, নয়ত স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন গোষ্ঠীর এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য দায়ী' (আহবানকারী) নিযুক্ত করেন। এভাবে আরবে অতিশীঘ্র ইসলামের প্রসার ঘটে। এর একটা মোটামুটি অনুমান এভাবেও করা যেতে পারে য, বদর যুদ্ধে, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে প্রাণ উৎসর্গকারীর সংখ্যা তিন শ এর চাইতে সামান্য বেশী ছিল, সেখানে উহুদ যুদ্ধে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সাত শ'য়ে এবং খন্দক যুদ্ধে তিন হাজারে। হুদায়বিয়া অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র উমরা করা। তখন সাহাবা কিরামের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক পনেরো শ, উমরাতুল কাযার সময় দু'হাজার, মক্কা বিজয় উপলক্ষে দশ হাজার এবং তাবূক অভিযানে ত্রিশ হাজার। এটা ছিল ইসলামের আওতা বৃদ্ধির ফলশ্রুতির স্পষ্ট প্রমাণ।

কুরায়শের কারণে প্রতিবন্ধকতা

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সাধারণ আরবদের জন্য ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা মক্কার কুরায়শদের শক্ত বিরোধিতার কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়াতে আছে –

كانت العرب تلوم باسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فانه ان ظهر عليهم فهو نبى صادق فلما كانت وقعة اهل الفتح بادر كل قوم باسلامهم .

"আরবরা ইসলাম গ্রহণের জন্য মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করছিলো। তারা বলত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিষয়টি প্রথমে মিটমাট হয়ে যাক। যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সম্প্রদায়ের উপর জয়ী হন তাহলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, তিনি সত্য নবী। তাই দেখা যায়, যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটে তখন আরবের প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের লোকেরা যত শীঘ্র সম্ভব ইসলাম গ্রহণের প্রতি প্রলুব্ধ হয়।"

সাধারণ আরবদের উপর কুরায়শদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। কা'বার খিদমতের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকার দরুণ আরবরা তাদেরকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখত। আরবরা বংশ পরম্পরায় কুরায়শদের ধর্মীয় নেতৃত্ব মেনে আসছিল। সেই সুবাদে অন্যান্য সাধারণ ব্যাপারেও তারা কুরায়শদেরকেই নেতা বলে মানত। মক্কা বিজয় এই সব বিরাট প্রতিবন্ধকতা সমূহকে একেবারে তছনছ করে ফেলে এবং যে কালো পর্দা, ইসলামের আসমানী আলোকে সাধারণ মানুষের চোখ থেকে আড়াল করে রেখেছিল তা একদম ছিন্নভিন্ন হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়।

এরপর একের পর এক যুদ্ধ ও সংঘর্ষের কারণে মানুষের মন-মস্তিষ্ক প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পাগলপারা হয়ে উঠেছিল। তাদের বিবেকবুদ্ধি ও চিন্তাদর্শনকে ছেয়ে ফেলেছিল শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষের ঘনঘটা। কিন্তু হুদায়বিয়া

সন্ধির পর শত্রুতার আকাশ ধূলা-ময়লা থেকে পবিত্র হয়ে যায়। যখন পরস্পর মেলামেশা শুরু হলো তখন বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যে ইসলাম সম্পর্কে কথাবার্তা শুনত,অথচ নির্দ্বিধায় ও নিশ্চিন্তে ইসলাম কবুল করত না। অতএব হুদায়বিয়া সন্ধি ছিল যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর আসল মিশনের সফলতার জন্য একটি অত্যন্ত বিরাট ও অনুকূল মোড়। এই মোড় ঘোরার সাথে সাথেই ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করতে শুরু করে।

দায়ীদের (আহবায়কদের) ব্যবস্থাপনা

মক্কা বিজয় পর্যন্ত বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীর দিক থেকে নানা ধরনের আশংকা ছিল। রাজী' এবং বি'-রে মাউনার দুঃখজনক ঘটনাসমূহ ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। অতএব কোন গোত্র কিংবা গোষ্ঠী কিংবা বসতি সম্পর্কে এটা বলা যেতে পারত না যে, তারা কখনো নিজে থেকে কিংবা কুরায়শের উস্কানী থেকে ইসলামের দায়ীদের সাথে সেই আচরণ করবে না, যে নির্দয় আচরণ করা হয়েছিল রাজী' এবং বি'-রে মাউনায়। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর সাধারণতঃ এই অবস্থা বাকি থাকে নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেখনে যেখানে বাঞ্ছনীয় মনে করতেন দায়ী' নিয়োগ করতেন। তাদের হিফাযতের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল পাঠাতেন। এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তারা কোন গোত্র বা গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধ করবে, বরং এর উদ্দেশ্য ছিল তাদের মাধ্যমে ঈমান ও ইসলামের হিফাযতের দায়িত্ব আনজাম দেওয়া হবে। যেমন হযরত আলী (রা) কে যখন মাযহিজ গোত্রে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হয় এবং তিনি সেখানে গিয় ঐ গোত্রের একটি দলকে ইসলামের দাওয়াত দেন তখন তারা তাঁর উপর অনবরত: পাথর বর্ষণ করতে থাকে। হযরত আলী (রা) আপন সংগীদেরকে সারিবদ্ধ করে যখন মুকাবালার প্রস্তুতি নেন তখন মাযহিজের লোকেরা পলায়ন করে। কিন্তু পলায়ন কারীদের পশ্চাদ্ধাবন করা হয় নি। কেননা ঐ প্রস্তুতির উদ্দেশ্য যুদ্ধ নয় বরং আত্মরক্ষা ছিল। এভাবে আমর বিন 'আস (রা) কে ইসলম প্রচারের জন্য বাল্লী গোত্রে পাঠানো হয়েছিল। কেননা ঐ গোত্র ছিল তাঁর মাতামহীর গোষ্ঠী। জাযাম গোত্রের জলাশয়ে পৌঁছার পর 'আমর বিন আস (রা) এর মনে শত্রুদের হামলা সম্পর্কে আশংকার সৃষ্টি হয়। এই সংবাদ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে পৌঁছে তখন আবূ উবায়দা বিন আল জাররাহ (রা) কেঁ একটি বাহিনী সহ প্রেরণ করা হয়।[১] বাল্লী, জাযাম প্রভৃতি গোত্র আরব ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করত। কিন্তু এরূপ ঘটনা বাস্তবে খুব কমই ঘটে। বরং বেশীর ভাগ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী সন্তুষ্ট চিত্তেই ইসলাম গ্রহণ করে।

দায়ী' (আহবানকারী)দের একটি তালিকা

'সীরাতুন্নবী' গ্রন্থে ইসলামের দায়ীগণের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে, যাদেরকে ইয়ামনের বিভিন্ন এলাকা এবং হাদ্রামাউত, বাহরাইন প্রভৃতি দেশে পাঠানো হয়েছিল।

১। মুহাজির বিন আবী উমাইয়া [উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা (রা) এর ভাই]। তাঁকে ইয়ামনের সান'আয় পাঠানো হয়েছিল।

২। যিয়াদ বিন লাবীদ (রা) তাঁকে হাদ্রামাউতে পাঠানো হয়েছিল।

৩। খালিদ বিন সায়ীদ (রা)। তাঁকেও ইয়ামনের সান'আয় পাঠানো হয়েছিল।

৪। 'আদী বিন হাতিম (র)। তাঁকে ইয়ামনের তাঈ গোত্রে পাঠানো হয়েছিল।

৫। আবূ মূসা আশ'আরী (রা)। তাঁকে ইয়ামনের যুবায়দ ও আদনে পাঠানো হয়েছিল।

৬। মুআয বিন জাবাল (রা)। তাঁকে ইয়ামনের জান্দে পাঠানো হয়েছিল।

৭। জারীর বিন আবদুল্লাহ্ আল রাজলী (রা)। তাঁকে ইয়ামনের যালকালা' হামীরী গোত্রে পাঠানো হয়েছিল।

৮। আলী বিন আবী তালিব (রা)। তাঁকে হামদান, জুযায়মা ও মাযজিহ্ গোত্রে পাঠানো হয়েছিল।

৯। মুগীরা বিন শু'বা (রা)। তাঁকে নাজরানে পাঠানো হয়েছিল।

১০। খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)। তাঁকে মদীনার আশে পাশে পাঠানো হয়েছিল।

১১। 'আলা বিন হযরামী (রা)। তাঁকে বাহরাইনে পাঠানো হয়েছিল।

১২। 'আমর বিন 'আস (রা)। তাঁকে আম্মানে পাঠানো হয়েছিল।[২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক নিযুক্ত দায়ীদের এই তালিকা শুধুমাত্র একথা প্রমাণের জন্য পেশ করা হয়েছে যে, ইসলামের তাবলীগ ও প্রচার সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে এবং ব্যাপকভাবে অব্যাহত ছিল। এই তালিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এ ধরনের কত আহবানকারীকে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছিলেন তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

আবূ যর গিফারী (রা)

এরপর এটাও জানা কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার রহমতে সত্যপথ প্রাপ্ত হয়, সেও স্বয়ং একজন দায়ী'তে পরিণত হয়। তাছাড়া কোন কোন গোত্রের সর্দাররা তাঁদের জীবন ইসলাম প্রচারের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

আবূ জর গিফারী (রা) একেবারে সূচনা কালেই ইসলামরূপী বিরাট নি'মাত লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন এবং ইসলাম প্রকাশ করার কারণে কুরায়শদের হাতে তিনি যারপর নেই নির্যাতিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গোত্রের কাছে পৌঁছে তাবলীগ শুরু করে দেন এবং শীঘ্রই তাঁর গোত্রের প্রায় অর্ধেক লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। অবশিষ্ট লোকেরা বললো, আমরা তখনি ইসলাম গ্রহণ করব যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করবেন। অতএব হিজরতের পর বাকী লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। সুতরাং বলা চলে যে, গিফার গোত্রকে ইসলামের বিশ্বজননীন উপকারে উপকৃত করার ক্ষেত্রে হযরত আবূ যর গিফারী (রা) এর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আসলাম গিফার গোত্রের নিকটেই ছিল। তারাও মুসলমান হয়ে যায়। এভাবে জাহনিয়া গোত্রও প্রাথমিক যুগে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। আশজা' গোত্র কুফ্রীর অবস্থায় মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে। এরপর তারাও মুসলমান হয়ে যায়। (সংকলক)

তুফায়ল বিন 'আমর দূসী (রা)

তুফায়ল বিন 'আমর দূসী (রা) এর ঠিক এই একই অবস্থা ছিল। তিনি নুবুওয়াতের দশম বর্ষে মক্কা মুকাররমায় আসেন। তিনি ছিলেন একাধারে একটি গোত্রের সর্দার, একজন অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও একজন নামকরা কবি। এ কারণে মক্কাবাসীরা তাদের বাসস্থান থেকে শহরের বাইরে বের হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। তুফায়লের নিজের বর্ণনামতে, "অভ্যর্থনকারীরা আমাকে বিশেষভাবে তাগিদ দেয়, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে যেয়ো না। সে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বিসংবাদের সৃষ্টি করে। সে আমাদের মাঝে ইতিমধ্যে নানা অনাসৃষ্টির সূত্রপাত করেছে। তুমি যদি তার সাথে মিলিত হও তাহলে তোমার গোত্রের অবস্থাও হবে আমাদেরই মত।"

তুফায়ল (রা) বলেন, আমি তাদের এই উপদেশ পুরোপুরি মেনে চলি। এমন কি যখন আমি হারাম শরীফে যেতাম তখন আমার কানের মধ্যে তূলা ভরে নিতাম, যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কোন শব্দ আমার কানে না ঢুকে। একদিন আমি একদম ভোরবেলা হারাম শরীফে যাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন সেখানে সালাত আদায় করছিলেন। তাঁর আওয়াজ কানে পৌঁছতেই আমার অন্তরের উপর একটি বিরাট প্রভাব পড়ল। আমি তাঁর কাছ থেকে যা কিছু শুনলাম তা ছিল একটি অতি বিস্ময়কর কালাম (কথা)। তখন আমি নিজেই নিজেকে দোষারূপ করে বললাম, ভাল খারাপের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা তো আমার আছে। অতএব তাঁর কথা শুনব না কেন? অগত্যা আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হারাম শরীফ থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাঁর পিছু নিলাম। এরপর আমাকে লোকেরা যে পথভ্রষ্ট করে রেখেছিল সে কাহিনী আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে শুনালাম এবং নিবেদন

করলাম, আমাকে আপনার কথা শুনান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আমাকে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে শুনান এবং আমি তা শুনে সংগে সংগে ইসলাম গ্রহণ করি।

বিদায় গ্রহণ কালে তুফায়ল তাঁর গোত্রের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে হিদায়াতের দরখাস্ত করেন। তিনি ঘরে ফিরে যাবার পর তাঁর নিকটাত্মীয়রা ইসলাম গ্রহণ করলেও তাঁর গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচার আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নি। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে হাযির হন। তাঁর গোত্রের ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। তাই তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে বদ্-দু'আর দরখাস্ত করেন। হুযূর (সা) তখন বলেন, হে আল্লাহ্, দূস সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন কর। সংগে সংগে তিনি তুফায়লকেও বলেন, মানুষকে ধর্মের দিকে আহবান কর। তাদের সাথে নম্র ও ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ কর।

এরপর তিনি তাঁর গোত্রের মধ্যে প্রচার কার্য চালালে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়।

টীকা ঃ

১। সীরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ৩৩।

২। সীরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা - ২২।

ইসলামের আওতা বিস্তৃতির মানচিত্র

[মানচিত্রটি Concise Encyclepaedia of Arab civilization থেকে গৃহীত হয়েছে]

নির্দেশনা ঃ

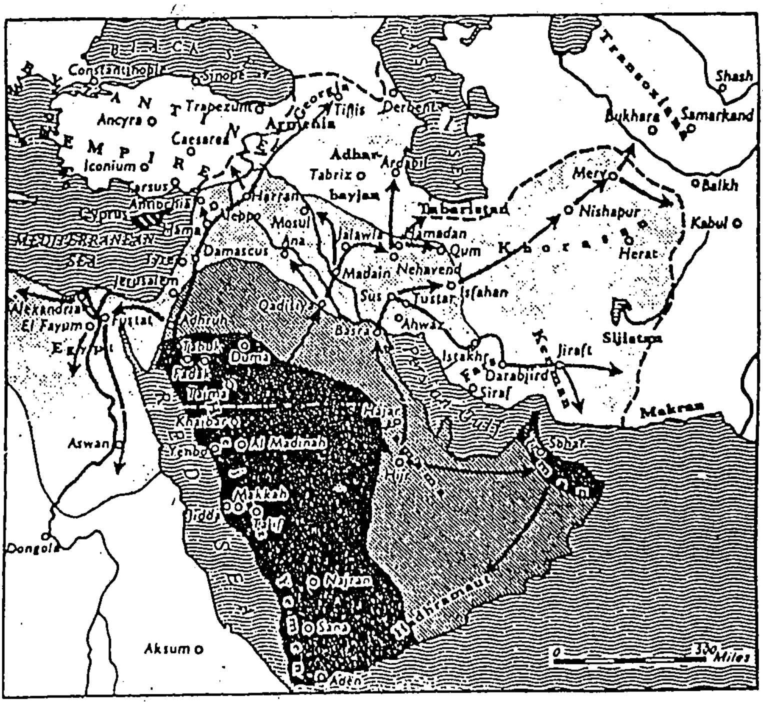
* আরবের ঐ অংশ যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর যুগে ইসলামের আওতাভুক্ত হয়েছিল।

* আরবের ঐ অংশ যা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এর খিলাফত আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

* ইরান, সিরিয়া ও মিসরের ঐ অংশ যা হযরত উমর (রা) এর খিলাফত আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

* ঐ সমস্ত এলাকা, যা হযরত উসমান (রা) এর খিলাফত আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বনূ উমাইয়া শাসনামলে ইসলামী সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত উত্তর ও পশ্চিম ভারত পশ্চিম সীমান্ত সম্পূর্ণ উত্তর আফ্রিকা হয়ে স্পেনের একটি বিরাট অংশ এবং সেই সাথে ফ্রান্সের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের কিছু অংশেও বিস্তার লাভ করেছিল।



نقشه عرب



دمشق
بادية الشام
عمان
اردن
بغداد
كربلاء
النجف الاشرف
البصرة
الكويت
سكاكه
الجوف
النفود الكبرى
تبوك
تيماء
العلا
الوجه
جبل شمر
حائل
المدينة المنورة
ينبع
رابغ
مكة المكرمة
جدة
الطائف
القنفذة
نجران
صعدة
صنعاء
الحديدة
اليمن
تعز
المكلا
حضرموت
مهرة
ظفار
احقاف
الربع الخالي
المملكة العربية السعودية
رياض
الدوحة
الشارقة
مسقط
عمان

‘পয়গামে হক’ এর অলৌকিক ফলশ্রুতি -২

কুরআন মজীদের প্রভাব

কোন কোন সময় কুরআন মজীদের কোন একটি আয়াত শুনে কারো কারো অন্তরে এমন প্রভাব পড়ত যে, সে বিনা দ্বিধায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিত। তুফায়ল বিন আমর দূসী (রা) কুরআনের কয়েকটি আয়াত শুনে নিজেই নিজেকে দোষারোপ করেছিলেন এই বলে যে, “পথভ্রষ্টকারীদের কথা বিশ্বাস করে তুমি অকারণে আপন কানের মধ্যে তূলা ঠেসে রেখেছিলে।” এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, যা সমগ্র দূস সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণের কারণে পরিণত হয়।

জুবায়র বিন মুতয়িম বদর যুদ্ধের বন্দীদের ফিদিয়া পরিশোধ করে তাদেরকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছিলেন। মদীনায় তার অবস্থানকালে একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন মজীদের নিম্নের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করছিলেন ঃ

أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ ط أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۔

“ওরা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না ওরা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি ওরা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং ওরা তো অবিশ্বাসী।” – (৫২:৩৫-৩৬) জুবায়র (রা) এর ভাষায় – “এ আয়াতগুলো শুনতেই আমার অন্তরের মধ্যে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং আমি সংগে সংগে ইসলাম গ্রহণ করি।” একারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধবন্দী অথবা বহিরাগত অমুসলিম মেহমানদের সম্পর্কে বলতেন, ওদের এমন জায়গায় থাকতে দাও যেখানে থেকে ওরা কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পায়।

যিমাদ বিন ছা‘লাবা

যিমাদ বিন ছা‘লাবা আযদ গোত্রের সর্দার এবং জাহিলিয়া যুগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বন্ধু ছিলেন। তিনি মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিরুদ্ধবাদীদের কাছ থেকে শুনতে পেলেন যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ্) উম্মাদ হয়ে গেছেন। যিমাদ ঝাড়-ফুঁক করতেন। তাই নিজের ঝাড়-ফুঁকের বুজুর্গী প্রদর্শনের জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খেদমতে হাযির হন এবং তাকে বলেন, “আসুন আমি আপনার চিকিৎসা করবো।” রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন,

الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ۔

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য এবং আমি তাঁরই সাহায্য চাই। যাকে আল্লাহ্ হেদায়াত করেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য

দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল।"

যিমাদের উপর এই কথাগুলো এতই প্রভাব বিস্তার করল যে, তিনি নিবেদন করলেন, আপনি আপনার একথাগুলো পুনরায় বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা পুনরাবৃত্তি করলেন। যিমাদ বললেন, আর একবার বলুন। তৃতীয়বার শোনার পর বললেন, আমি গণকদের কথা, যাদুকরদের কথা এবং কবিদের (শ্লোক) গাঁথাও শুনেছি। কিন্তু এমন সুন্দর কথা তো আজ পর্যন্ত শুনি নি। এরপর তিনি নিজে থেকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে বায়আত করলেন এবং যে গোত্রের তিনি সর্দার ছিলেন সেই গোত্রের পক্ষ থেকেও বায়আত করলেন।[১]

মোটকথা, এমন অনেক উদাহরণ মিলে যে,একই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ অনেক বড় বড় জনগোষ্ঠীর হিদায়াতের কারণে পরিণত হয়েছে। এমন উদাহরণও মিলে যে, মানুষের অন্তর ও মস্তিষ্ক এমনভাবে লোহা বা পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল যে, তাতে কোন কিছুরই প্রভাব পড়ত না। কিন্তু না প্রথম উদাহরণগুলো তাবলীগ ও প্রচারের পথে শৈথিল্য প্রদর্শনের কারণে পরিণত হয়েছিল, আর না শেষ উদাহরণগুলো সাহস ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে নৈরাশ্য ও নির্জীবতার সৃষ্টি করেছিল। প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে 'আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন' – আল্লাহ্‌র এই আদেশের হক তিনি (সা) এমনভাবে আদায় করেছেন, যেটাকে আমরা হক আদায়ের একটি বাস্তবরূপ আখ্যায়িত করতে পারি।

অনুকূল কারণ ও উদাহরণসমূহ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কিছু কিছু কারণ ও উপাদান তাবলীগ ও প্রচারের সাফল্যের পথে বেশ অননুকূল ও সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়েছিল। যেমন–

১। চরম উৎসাহ-অনুপ্রেরণা থাকা সত্ত্বেও মক্কার কুরায়শরা প্রতিপদে পরাজিত হতে থাকে, যার কারণে তাদের ইয্যত ও সম্মান আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত হতে থাকে। তাদের প্রত্যেকটি উদ্যোগ বিফল হতে থাকে। অপর দিকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা শক্তি ও আত্মত্যাগের প্রেরণা উহুদ যুদ্ধের আঘাতের মত চরম আঘাত খেয়েও দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২। হুদায়বিয়া সন্ধির পর মোটামুটি সকলের মনেই এ বিশ্বাস জন্মাল যে, কুরায়শ এমন একটা কার্তুজ, যা বের হয়ে গেছে এবং এমন একটা কামান, যার গোলাবারূদ শেষ হয়ে গেছে। সূর্যকিরণ বরফাবৃত বেলাভূমির বরফ গলাতে শুরু করে দিয়েছিল। আর মক্কা বিজয়ের পর সে বরফ গলে একেবারে পানিতে পরিণত হয় গিয়েছিল। অতএব নিকট ও দুরের লোকেরা দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথবা স্বইচ্ছায় ইসলামের আশ্রয়প্রার্থী হওয়ার ঐকান্তিক বাসনা পোষণ করছিলো।

৩। মরহুম মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান বলেন, মক্কায় রোম ও পারস্যের যুদ্ধ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা ঠিক বদরযুদ্ধে বিজয় লাভের মুহূর্তে লাভ করে এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সাত বছর পর রোমানরা পারস্যের উপর সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করে। এই বিরাট মুজিযার ফলশ্রুতি এই হয়েছিল যে, আরবের এক বিরাট জনগোষ্ঠী বিনা বাক্য ব্যয়ে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে নেয়।[২]

বিস্ময়কর মু'জিযা

এই তাবলীগ ও প্রচারের আলোকোজ্জ্বল ফলশ্রুতির কিছু ঝিলিক ঐ অধ্যায়ে আপনাদের দৃষ্টিগোচর হবে – যেখানে বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধি দলের, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দবারে পৌঁছার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এখানে আমরা ধর্মীয় গ্রন্থাদি এবং ইতিহাসসমূহে সত্যের দায়ী' তথা আবানকারীদের যে সমস্ত কাহিনী সংরক্ষিত আছে তার মধ্যে এমন কোন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান নেই যে, কোন দায়ী'র জীবনকালে তার নিয়ে আসা পয়গাম এমন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে, যেভাবে প্রচারিত হয়েছিল হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক নিয়ে আসা সত্যের পয়গাম। এরপর একথাও নির্ঘাত সত্য যে, কোন দেশের অধিবাসীরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত নিয়ম শৃঙ্খলার দিক

দিয়ে এত বেশী পশ্চাৎগামী তথা নিকৃষ্ট পর্যায়ের ছিল না– যেমন পশ্চাৎগামী ও নিকৃষ্ট পর্যায়ের ছিল ইসলামের অভ্যুদয়কালে আরব জাতি। কিন্তু হিজরতের সূচনা থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ওফাত পর্যন্ত এই জাতির অবস্থার মধ্যে যে বিস্ময়কর বিপ্লব সাধিত হয় তার দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসের কোথাও পাওয়া যাবে না।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ

"হে মুমিনগণ, রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করেন, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দেবে।" (৮:২৪)

মরহুম মাওলানা আযাদ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দাওয়াত ছিল সর্বোৎকৃষ্ট মনুষ্যত্বের দ্রুত অভ্যুদয় ও স্থিতি গ্রহণের দাওয়াত।

চিন্তা করে দেখুন, এই দাওয়াত, সমসাময়িক কালের সমগ্র মৃত জনগোষ্ঠীকে কিভাবে তাদের কবরসমূহ থেকে উঠিয়ে জীবনের প্রান্তরে প্রান্তরে সঞ্জীবিত করে ছেড়ে দিয়েছিল। মৃতকে জীবিত করার, এর চাইতে আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে যে, আরবের উষ্ট্র রাখালদের মধ্য থেকে আবূ বকর, উমর, আলী, 'আইশা, খালিদ, ইবনে ওয়াক্কাস, ইবনে 'আস (রা) -এর মত বিশ্ববিশ্রুত জ্ঞানী, সেনাপতি, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়কের অভ্যুদয় ঘটেছে? এর চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার আর কী হতে পারে যে, মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিশ্বের সব চাইতে জঘন্য চরিত্রের একটি জনগোষ্ঠী একটি সর্বাধিক সভ্য ও ভব্য জাতিতে পরিণত হয়েছে?

আজকের অবস্থা

আপনি আজকালকার সাধারণ অবস্থার প্রতি একটু তাকান। একটি প্রতিভাবান বালক পনর ষোল বছরের মধ্যে শিক্ষা শেষ করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যদি উচ্চ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয় তাহলে তাকে একাডেমীতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরপর কাজ শেখার জন্য তাকে কারো সাহচর্যে রাখা হয়। এই সব স্তর অতিক্রম করার পর তাকে কোন জেলায় শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজে নিয়োগ করা হয়। ইংরেজ আমলে ছোট ছোট জেলার কাজও বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর সংশ্লিষ্ট অফিসারদের হাতে অর্পণ করা হত। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা নির্ঘাত সত্য যে, ঐ অফিসাররা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সমপরিমাণ সন্তোষজনকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হত না। আজকের অবস্থাও এর চাইতে উন্নতর বলে মনে হয় না।

প্রথম যুগের মুসলমান

এবার প্রথম যুগের মুসলমানদের অবস্থার উপর একবার দৃষ্টিপাত করুন। তাদের বেশীর ভাগই উটের রাখালী কিংবা সাদামাঠা ধরনের কৃষিকাজ কিংবা ব্যবসাবাণিজ্য করত এবং এই অবস্থায়ই তারা কুরআন মজীদের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁরা কুরআন মজীদ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর উপদেশাবলী থেকে উপকৃত হতে থাকেন। এরপর হঠাৎ করেই তাদেরকে একই সময়ে এশিয়ান-রোমান এবং সাসানী সাম্রাজ্যের মুকাবেলা করতে হয়। তখনকার যুগে ঐ দুই সাম্রাজ্যের পরাক্রম মর্যাদা ঠিক সেরূপ ছিল, যেরূপ আছে আজকের বিশ্বে রাশিয়া ও আমেরিকার। যুদ্ধ বিগ্রহ হোক অথবা অভ্যন্তরীণ নিয়ম শৃঙ্খলা হোক সরকারী অফিস সংক্রান্ত হোক অথবা মানবকল্যাণ সম্পর্কিত হোক – কোন ব্যক্তি কি অস্বীকার করতে পারবে যে, তাঁরা (মুসলমনরা) যেভাবে অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে তাদের দায়িত্ব আনজাম দিয়েছিলেন তার কোন উদাহরণ কি তাঁদের যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত কোথাও পরিদৃষ্ট হয়েছে, না এর পূর্বে কোন যুগে কোথাও পরিদৃষ্ট হয়েছিল? অথচ অবস্থা এই যে, তাঁরা কুরআন

মজীদ ছাড়া কিছুই পড়েন নি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সুন্নাত ছাড়া তাঁদের সামনে কোন আদর্শ ছিল না। তাঁরা কোন সামরিক কেন্দ্রে কিংবা ব্যবস্থাপনা একাডেমীতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পান নি; কিন্তু ঐ সময়কার সবচাইতে উন্নত ও অগ্রসর সাম্রাজ্যের অত্যন্ত উর্বর এলাকাসমূহের প্রশাসনব্যবস্থা যখন তাঁদের হাতে ন্যস্ত হয় তখন তাঁরা তা এমনভাবে পরিচালনা করেন যে, দর্শকদের চোখে তা একটি অতি অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ব্যাপার বলেই মনে হতে থাকে।

ভালমন্দের মধ্যে পার্থক্য

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوْا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا .

" হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন।" (৮:২৯)

মরহুম মাওলানা আযাদ বলেন– "আরবের বেদুইনরা, যাদের সমগ্র জীবন উট চরানোর মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল, হঠাৎ করে ইরানী এবং রোমানদের মত উন্নত সভ্য জাতিসমূহের ভাগ্যের মালিক হয়ে বসল এবং ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের এমন একটি ক্ষমতা তাঁদের কব্জায় এসে গেল যে, তাঁরা যা কিছু করতেন তা হত সততা ও ন্যায় বিচারমূলক এবং যেভাবে করতেন তা হত সৌভাগ্যপূর্ণ ও মঙ্গলময়।"৩

ফিলিপ হিট্টির স্বীকারোক্তির গোড়ার কথা

ফিলিপ হিট্টি তার 'হিস্ট্রি অব দ্যা এরাব'-এ লিখেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংশে এই মর্মে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করার দুঃসাহস দেখাত যে, মাত্র দশ বছরের মধ্যে আরবের সম্পূর্ণ সভ্যতা বিবর্জিত এবং অপরিচিত ভূখন্ডে এমন একটি অদৃশ্য শক্তির অভ্যুদয় ঘটবে, যা ঐ সময়কার উভয় বিশ্বশক্তিকে তছনছ করে দেবে – অর্থৎ এক দিকে সাসানীদের সমগ্র সাম্রাজ্য হস্তগত করে নিবে এবং অন্যদিকে বাইজেন্টাইনীদের শ্রেষ্ঠতম প্রদেশগুলোর উপরও নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করবে, তাহলে এতে সন্দেহ নেই যে, তাকে একটি পাগল বলেই আখ্যায়িত করা হত। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ঘটেছিল তাই। মুহাম্মদ (সা) এর ওফাতের পর আরবের অনুর্বর ও কঠিন শুষ্ক ভূখন্ড, যেন যাদুর লাঠির পরশে এমন সব বীর-বহাদুরের প্রতিপালন কেন্দ্রে পরিণত হল, সংখ্যা ও গুণাবলীর দিক দিয়ে অন্য কোন জায়গায় যাদের বিদ্যমানতা খুবই কঠিন। ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও মিসরে খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং আমর বিন আস (রা) এর অভিযানসমূহ যেরূপ পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছিল, যদি তাঁদের ঐ অভিযানসমূহকে নেপোলিয়ন, হানিবল কিংবা আলেকজান্ডারের অভিযানসমূহের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে তাঁরাই (মুসলমানরাই) শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী বলে সাব্যস্ত হবে।"৪

এটা হচ্ছে একজন খ্রীষ্টানের উক্তি, যিনি মূলত: সিরিয়ার অধিবাসী, কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে আমেরিকায় বসবাস করছেন। বিভিন্ন আরবী উৎস পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর যে অভিমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোনরূপ কাটচাট না করে তিনি তা সর্বসমক্ষে পেশ করে দিয়েছেন। নেপোলিয়ান, হানিবল এবং আলেকজান্ডার প্রাচীন ও নবীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জেনারেল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তারা দীর্ঘদিন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের পর নিজেদের স্বাভাবিক যোগ্যতাকে ঝালাই করেছিলেন। কিন্তু খালিদ ও 'আমর বিন 'আস (রা) এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপাদান কি

কিতাব ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু ছিল? ন্যায় ও সত্যের এই দু'টি উৎস শুধু তাঁদের মানসিক ও দৈহিক যোগ্যতাই নয় বরং তাঁদের চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক যোগ্যতাকেও আপাদ মস্তক আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছিল। (সংকলক)

টীকা ঃ

১। সীরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-১৪।

২। সীরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-১৭১। মরহুম সাইয়িদ সাহেব এ প্রসংগে তিরমিযী ঃ তাফসীরে সূরা রূম-এর বরাত দিয়েছেন।

৩। তরজমানুল কুরআন ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৬১।

৪। হিস্ট্রি অব দ্যা এরাব ঃ হিট্টি ঃ পৃষ্ঠা-১৪২।

প্রতিনিধি দলের আগমন–১

يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۔

"দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করবে।" (১১০:২)

প্রতিনিধি দলের আগমন-বছর

ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে কিংবা ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আগমন ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল। যেমন মুযায়না গোত্রের চর শ লোক রজব, হিঃ ৫ সনে (মুতাবিক নভেম্বর ও ডিসেম্বর ইং ৬২২ সনে) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এসেছিল।[১] কিন্তু হিজরতের নবম বর্ষে প্রচুর সংখ্যক প্রতিনিধি দল মদীনায় এসেছিল বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র জীবন চরিতে ঐ বছরটি 'আমে উফূদ' (প্রতিনিধিদলের আগমন বছর) নামে পরিচিত হয়ে উঠে, যেমন আমরা ইতপূর্বে আলোচনা করেছি। মক্কা বিজয়ের পর আরবের সমগ্র ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ শক্তি, গোত্র কিংবা গোষ্ঠীগুলোর কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, এখন তাদের মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। অতএব তাদের সামনে মাত্র দুটি রাস্তা খোলা আছে। যেমনঃ

১। ইসলাম গ্রহণ এবং এর যাবতীয় আদেশ নির্দেশ পালন।

২। কেন্দ্রীয় ইসলামী শক্তির সাথে সন্ধি স্থাপন এবং তাদের নিরাপত্তার উপর নির্ভর করা।

অতএব সমগ্র গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা হয় ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দরবারে উপস্থিত হয়, নয়ত মদীনা মুনাওওরায় পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা জিযিয়া প্রদানের শর্তে নিজেদেরকে ইসলামী শক্তির হিফাযতে সোপর্দ করে।

প্রতিনিধি দলের সংখ্যা

প্রতিনিধিদলের সঠিক সংখ্যা বর্ণনা করা কঠিন। তাবাকাতে ইবনে সা'দে সত্তরেরও অধিক প্রতিনিধিদলের উল্লেখ পৃথক পৃথকভাবে করা হয়েছে। সীরাতে শামীতে এর সংখ্যা একশ চার পর্যন্ত বলা হয়েছে। যদিও গবেষক ও পর্যালোচকবৃন্দ এক্ষেত্রে কোথাও কোথাও দুর্বল রেওয়ায়াতের আশ্রয় নিয়েছেন[২], কিন্তু দেশের বিস্তৃতি, গোত্রসমূহ এবং তাদের অধীনস্থ পরোক্ষ শাখা সমূহের প্রতিনিধিদলের বিচ্ছিন্নভাবে আগমণ, যাদের উল্লেখ রেওয়ায়াতসমূহে করা হয়েছে – তাদের ছাড়াও অপরাপর যত গোত্র কিংবা জনগোষ্ঠী ছিল তারা সম্ভবত: আরবের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সাথে যোগাযোগ না করে নিজেদেরই অবস্থার উপর কায়েম ছিল, কিংবা তখন পর্যন্ত বিশ্ব মানবতার এই বিস্ময়কর কোন প্রভাব তাদের উপর মোটেই পড়ে নি – সত্তর কিংবা এক শ চারটি প্রতিনিধি দলের আগমনের উল্লেখ দ্বারা যার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। খুব সম্ভত: বাকি গোত্র এবং জনগোষ্ঠীর ইসলাম গ্রহণের কথা, হয়ত কোন কারণে

উল্লেখ করা হয় নি কিংবা তাদের প্রতি দায়ী পাঠানো হয়েছিল এবং ইসলাম গ্রহণের পর ঐ সব গোত্র কিংবা জনগোষ্ঠী চুপচাপ ঐ গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী অভিযান সমূহের সাথে আপনা আপনি নিজেদের সম্পৃক্ত করে নিয়েছিল, যে সব অভিযান ব্যাপক আকারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ওফাতের পর পরিচালিত হয়েছিল।

মোটকথা, এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, আরব-অধিবাসীদের বিরাট একটি অংশ ইসলামের আওতায় এসে গিয়েছিল। যদি একান্তই কিছু লোক বাকি থেকে গিয়ে থাকে তাহলে 'মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও।' (اَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ)

এই নীতির ভিত্তিতে তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে য়াহূদী এবং খ্রীষ্টানদেরকেও দুটি কারণে বের করে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম কারণ হলো, আরব উপদ্বীপে শুধুমাত্র একটি ধর্ম বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ হলো, এই সব লোকেরা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে যারপর নেই মেতে উঠেছিল। এই বিষয়ের শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি, দলীল এবং উপকারিতার উপর মরহুম মাওলানা আযাদ 'মাসআলা-ই-খিলাফত ওয়া জাযীরাতুল আরব' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৩]

বর্ণনার আওতা

এটা জানা কথা যে, এই সব প্রতিনিধিদলের বিস্তারিত বর্ণনা না কোথাও পাওয়া যায়, আর না এখানে সবিস্তারে তা বর্ণনা করা সম্ভব। হাফিয ইবনে কাইয়িম (র) চৌত্রিশটি প্রতিনিধিদলের অবস্থা বর্ণনা করেছেন।[৪] সীরাতুন্নবী গ্রন্থে শুধুমাত্র সতোরো এবং আঠারোটি প্রতিনিধিদলের মধ্যে এই বর্ণনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তার মধ্যে আবার কোন কোন্টির শুধুমাত্র নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[৫] 'রাহমাতুল লিল আলামীন' গ্রন্থে চব্বিশটি প্রতিনিধিদলের উল্লেখ করা হয়েছে।[৬] 'আসাহ্হুস্ সিয়ার' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে উনত্রিশ কিংবা ত্রিশটি প্রতিনিধি দলের।[৭]

একথাও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই যে, বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শুধুমাত্র ঐ সব প্রতিনিধিদলের উল্লেখ করা যেতে পারে, যাদের দ্বারা সীরাতে তাইয়িবাহ্ কিংবা ইসলামের কোন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে জানা যায়, কিংবা বিভিন্ন গোত্র ও জনগোষ্ঠীর অবস্থা ও আচার আচরণ এমনভাবে চোখের সামনে ভেসে উঠে – যাতে অনুমিত হতে পারে, ইসলাম প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে আরবের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্র চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে কোন্ পর্যায়ে ছিল এবং কি ধরনের অমূলক মন-মানসিকতার মধ্যে তাদের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হচ্ছিলো, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর শিক্ষাদান ও পবিত্রকরণের পর অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাঁরা মানবীয় উৎকৃষ্টতা ও প্রকৃষ্টতার কী উচ্চ স্তরেই না পৌঁছে গিয়েছিলেন। এমন কি বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, না তাঁদের পূর্বে কোন জাতি, জাতি হিসাবে এরূপ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে পেরেছে, আর না তাঁদের পর গত চৌদ্দশ বছরের মধ্যে কোন জাতির পক্ষে তাঁদের সমপর্যায়ে বা সমমর্যাদায় পৌঁছার সৌভাগ্য হয়েছে। জেনে রাখা ভাল যে, ঐ সব অসংখ্য মুসলিম রাষ্ট্র এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে সব রাষ্ট্রের অতুলনীয় জাঁক জমক ও প্রবল পরাক্রম আজো দুনিয়াবাসীর অন্তরকে বিস্ময়াবিভূত করে যদিও সেগুলোর মধ্যেও ইসলামী শিক্ষার অসংখ্য গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে শুধুমাত্র ঐ বিশেষ জাতির, যারা নবুওয়াত সূর্য থেকে তাঁদের সামর্থ অনুযায়ী নূরানী কিরণ লাভ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বকে আলোকিত করার জন্য বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার ন্যায় জলে স্থলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

মুযায়নার প্রতিনিধি দল

সর্বপ্রথমে যে প্রতিনিধিদলের উল্লেখ করা হয়েছে তারা ছিল মুযায়না গোত্রের প্রতিনিধিল। এই গোত্র ছিল মুযার (বিন নায্যার বিন মা'আদ বিন আদনান) কাবীলার একটি শাখা। মুযার পর্যন্ত পৌঁছে এর বংশলতিকা কুরায়শের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। মদীনা মুনাওওরা এবং ওয়াদিয়ে কুরার মাধ্যবর্তী স্থানে এদের বসতি ছিল।[৮] নু'মান

বিন মুকাররিন এই কাবীলারই লোক ছিলেন, যিনি মক্কা বিজয়কালে আপন কাবীলার পতাকাবাহী ছিলেন।[৯] পরবর্তী সময়ে তিনি ইস্পাহান জয় করেন। এই প্রতিনিধিদলের সদস্য সংখ্যা ছিল চারশ। তারা হিঃ ৫ সনে মদীনা মুওনাওওরায় এসেছিল।[১০]

জানা যায় যে, প্রথমে খুযায়ী বিন আবদে নুহাম দশ জন লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নু'মান বিন মুকাররিনও ছিলেন। এরপর সম্পূর্ণ গোত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। যখন এই গোত্রের লোকেরা জানতে পারল যে, হিজরত করা জরুরী তখনই তাঁদের চারশ লোকের প্রতিনিধি দল মদীনায় এসে হাযির হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন –

أَنْتُمْ مُهَاجِرُوْنَ حَيْثُ مَاكُنْتُمْ فَارْجِعُوْا إِلَى أَمْوَالِكُمْ .

" তোমরা যেখানে থাক সেখানেই মুহাজির বলে পরিগণিত হবে। অতএব তোমরা নিজেদের সহায় সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে ফিরে যাও।"[১১] তারা যখন ফিরে যেতে থাকে তখন হযরত উমর (রা) তাদেরকে পাথেয় স্বরূপ খেজুর দান করেন।

বনূ সা'দ বিন বকর

এরা ছিল হাওয়াযিন গোত্রের একটি শাখা। তারা রজব, হিঃ ৫ সনে – অর্থাৎ যে বছর মুযায়নার প্রতিনিধি দল এসেছিল তখন নিজেদের পক্ষ থেকে যিমাম বিন ছা'লাবাকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দরবারে প্রেরণ করেছিল। বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে হাযির ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি উটের ওপর সওয়ার হয়ে এল। সে উটটিকে মসজিদের আঙ্গিনায় বসিয়ে বেঁধে রাখল। এরপর লোকদের জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা) কে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমরা তাঁর দিকে ইঙ্গিত করলাম। ঐ ব্যক্তি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলল, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান, আমি আপনার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করবো এবং কিছুটা কড়া ভাষায়ই করবো। আপনি এতে অসন্তুষ্ট হবেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করতে পার।

আগন্তুক ঃ আমি আপনার প্রতিপালক এবং আপনার পূর্ববর্তী লোকদের প্রতিপালকের শপথ করে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য পাঠিয়েছেন?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঃ হ্যাঁ, এর উপর আল্লাহ্ সাক্ষী।

আগন্তুক ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে হুকুম দিয়েছেন যে, দিনরাত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঃ হ্যাঁ, এর উপর আল্লাহ্ সাক্ষী।

আগন্তুক আমি আপনাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে হুকুম দিয়েছেন যে, বছরে এই এক মাস (রমযান মাস) রোযা রাখতে হবে?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঃ হ্যাঁ, এর উপর আল্লাহ্ সাক্ষী।

আগন্তুক ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে এই হুকুম দিয়েছেন যে, আপনি আমাদের ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করবেন এবং গরীবদের মধ্যে তা বন্টন করে দেবেন?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঃ হ্যাঁ, এর উপর আল্লাহ্ সাক্ষী।

একথা শুনে আগন্তুক বললো, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন আমি তার উপর ঈমান আনলাম। আমি আমার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আপনার কাছে দূত হিসাবে এসেছি। আমার নাম যিমাম বিন ছা'লাবা (রা) এবং আমি বনূ সাদ বিন বকর গোত্রের লোক।[১২]

এই রেওয়ায়াত বুখারীর বিভিন্ন অধ্যায়ে এসেছে। যিমাম বিন ছা'লাবা আরো বলেন, যা কিছু আপনি আমাকে বলেছেন, আমি তাতে না সামান্য পরিমাণ বেশী করব, আর না কম করবো। তিনি যখন এই সব কথা বলে চলে গেলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যদি সে সত্য কথা বলে থাকে তাহলে সে মুক্তি পেয়ে গেছে।

যিমাম তাঁর গোত্রের কাছে পৌঁছার পর সর্ব প্রথমে মূর্তির নিন্দা শুরু করেন। এরপর সেগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেন এবং ঐ দিনই সন্ধ্যার আগে আগে বনূ সা'দ বিন বকরের সমগ্র পুরুষ ও মহিলা ইস্‌লামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। সংগে সংগে মসজদিও নির্মিত হয়ে যায় এবং সালাতের জন্য আযান দেওয়া শুরু হয়।

কোন কোন ব্যক্তি এটাকে হিঃ ৯ সনের ঘটনা বলেছেন। কিন্তু তাবাকাতে ইবনে সা'দে আছে, যিমামা বিন ছা'লাবা রজব হিঃ ৫ সনে মদীনা মুনাও্ওরা পৌঁছেন। প্রশ্নোত্তরে এখানে হজ্জের উল্লেখ নেই। এটা নিশ্চয় এ কারণে যে, এর অনেক পরে হজ্জ ফরয হয়। তাছাড়া আরবরা তো হজ্জ ও উমরা সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত ছিল। কুরায়শরা এই দুইটির নিয়ম কানূন পরির্বন করে থাকলেও হজ্জ ফরয হওয়ার পর নিশ্চয়ই সেটা সম্পূর্ণ নতুন নিয়মে করা হয়েছিল।

আবদুল কায়স

আবদুল কায়স ছিল বাহরাইনের একটি বিরাট আদনানী কাবীলা। সীরাতুন্নবীতে বলা হয়েছে, এখানে ইসলামের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল অনেক পূর্বেই। সর্বপ্রথম এই গোত্রের তের জন লোক হিজরী ৫ সনে কিংবা এর কিছু আগে-পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিমদতে হাযির হয়েছিল।[১৩]

তাবাকাতে ইবনে সা'দ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহারাইনবাসীদের কাছে লিখেছিলেন, যেন তাদের মধ্য থেকে বিশজন লোক প্রতিনিধি হিসাবে আসে। তাদের নেতা ছিলন আবদুল্লাহ্ বিন আওফ আল আশাজ্জ্।[১৪] ঐ প্রতিনিধিদলের সাথে আশাজ্জের ভাতিজা মুনকিয বিন হাইয়ান এবং সেই সাথে জারূদ বিন আল 'আলাও ছিল, যারা ছিল ধর্মত: খ্রীষ্টান।

আসল ঘটনা এই যে, মুনকিয বিন হাইয়ান জাহিলিয়া যুগে হিজ্‌র (বাহরাইন) এর পণ্য সামগ্রী ইয়াছরিবে নিয়ে আসতেন। হিজরতের পরে তিনি পণ্য সামগ্রী নিয়ে এসেছিলেন এবং কোন একটি জায়গায় উপবিষ্ট ছিলেন। তার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? তিনি নিবেদন করেন, আমি মুনকিয বিন হাইয়ান। সেই সাথে তিনি নিজের গোত্রেরও উল্লেখ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার গোত্রের এক এক করে প্রত্যেকটি নেতৃস্থানীয় লোকের নাম নিয়ে তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার বাণিজ্য সফরের সুবাদে বাহরাইনের নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে খুব ভালভাবে পরিচিত ছিলেন। যাহোক শেষ পর্যন্ত তিনি মুনকিযকে ইসলামের দাওয়া দেন। সংগে সংগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কুরআন মজীদের কিছু সূরাও শিখে নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেশে ফিরে যাবার সময় মুনকিযের হাতে একটি পত্রও দেন। পত্রটি লেখা হয়েছিল আবদুল কায়সের নামে। মুনকিয দেশে ফিরে যাবার পর যথারীতি সালাত আদায় করতেন। কিন্তু তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা কারো কাছে প্রকাশ করেন নি। তাঁর স্ত্রী, যে ছিল আশাজ্জের কন্যা – আপন পিতার কাছে স্বামীর অযূ এবং সালাতের কথা উল্লেখ করেন। তখন আশাজ্জ মুনকিযের সাথে সাক্ষাত করেন এবঙ তাঁর অন্তরেও ইসলামের প্রতি কিছুটা আসক্তি জন্মে।

যাহোক, আবদুল কায়সের প্রতিনিধিদল মক্কা বিজয়ের বছর (হিঃ ৮ সনে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে এসে হাযির হয় এবং নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার এবং আমাদের মধ্যে মুযার গোত্রের আবাসভূমি রয়েছে। তাই আমরা হারাম মাসসমূহ ছাড়া আপনার খিদমতে হাযির হতে পারব না।[১৫] অতএব আপনি আমাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় বিস্তারিত হুকুম-আহকাম বলে দিন, যার উপর আমরা নিজরাও আমল করতে পারি এবং আমাদের

স্বগোত্রকেও আমল করার জন্য বলতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, তোমাদেরকে চারটি কথার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং চারটি কথা থেকে নিষেধ করা হচ্ছে।

নির্দেশাবলী ও নিষেধসমূহ

নির্দেশাবলী হচ্ছে–

১. এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। অর্থাৎ সাক্ষ্য দাও যে,আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূল।

২. সালাত কায়েম কর।

৩. রোজা রাখ।

৪. যাকাত এবং মালে গনীমত থেকে এক পঞ্চমাংশ দান কর।

আর নিষেধসমূহ হচ্ছে–

১. লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি পাত্র বিশেষ ব্যবহার করা।

২. মাটির সবুজ পাত্র ব্যবহার করা।

৩. কাঠের পাত্র বিশেষ ব্যবহার করা।

৪. তৈলাক্ত পাত্র বিশেষ ব্যবহার করা।

আবদুল কায়স গোত্রের ওখানে মদ তৈরির জন্য উল্লেখিত চার ধরনের পাত্র ব্যবহার করা হত। রাসূলুল্লাহ (সা)মদ্য পান থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে তাদের জন্য এসব পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, যেগুলো মদ্য তৈরির কাজে ব্যবহৃত হত।

আবদুল্লাহ বিন আওফ বা আশাজ্জ

রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে আশাজ্জ কে? স্বয়ং আশাজ্জ নিবেদন করলেন, আমি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, মানুষের দু'টি অতি ক্ষুদ্র বস্তুর প্রয়োজন হয়। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো জিহবা এবং অন্যটি অন্তর। এরপর বললেন, হে আবদুল্লাহ, তোমার এমন দুটি গুণ আছে, যা আল্লাহ্র কাছে খুবই প্রিয় । তার মধ্যে একটি হলো স্থৈর্য এবং অন্যটি সঙ্গমবোধ। আবদুল্লাহ্ নিবেদন করলেন, এগুণগুলো কি আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, না জন্মগতভাবেই ছিল? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটা তোমাদের মধ্যে জন্মগত ভাবেই ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাথে সাক্ষ্যাৎকারী প্রত্যেকটি ব্যক্তির অঙ্গ ভঙ্গির উপর লক্ষ্য রাখতেন এবং তা থেকে তাদের স্বভাব চরিত্র ও আচার-আচরণ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা করে নিতেন। আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দলে বিশজন লোক ছিলেন। সবাই সওয়ারী থেকে অবতরণ করেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়। কিন্তু আবদুল্লাহ্ বিন আশাজ্জ বেশ ধীর স্থিরভাবে নিজের উটটি বাঁধেন, হাত মুখ ধৌত করেন, পরনের কাপড় ঠিক ঠাক করেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হন। বায়আতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা নিজেদের ছাড়া তোমাদের কাওমের পক্ষ থেকেও কি বায়আত করছ? তখন সবাই ইতিবাচক জবাব দিলেন। কিন্তু আশাজ্জ নিবেদন করলেন, আমরা নিজেদের দায়িত্ব নিতে পারি। কাওমকে দাওয়াত দেওয়া হবে। যদি তারা না মানে তাহলে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে কি করে প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, হ্যাঁ এটাই ঠিক কথা। তাঁর এই সব কথা এবং ভাবভঙ্গি থেকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, আশাজ্জের স্বভাবের মধ্যে স্থৈর্য্য ও সঙ্গমবোধ রয়েছে।

উপহার

জারূদ বিন আল' আলা খ্রীস্টান ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মনে হয়, আবদুল কায়স গোত্রের জারূদের স্বধর্মীয় আরো কিছু লোক ছিল। এ কারণেই মরহুম কাযী সুলায়মান লিখেছেন যে, আরো কিছু সংখ্যক ঈসায়ীও ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন।[১৬]

ঐ সব লোককে রামলা বিনতে হারিছের ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা সেখানে দশ দিন অবস্থান করেন। বিদায় গ্রহণ কালে তাঁদের সবাইকে উপহার প্রদান করা হয়। আবদুল্লাহ্ আল আশাজ্জ সবচেয়ে বেশী উপহার লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁকে সাড়ে বারো আউকিয়া রৌপ্য দেওয়া হয়েছিল। বারো আউকিয়া রৌপ্যর পরিমাণ প্রায় আধ সের।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর আরবের কোন কোন অংশে 'ইরতিদাদ' (ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া)-এর ঝড় উঠে। তখন এতে কোন কোন গোত্রের পদশ্খলন ঘটে। কিন্তু আবদে কায়স গোত্র সব সময়ই ইসলামের উপর অবিচলিত থাকে। (সংকলক)

টীকা ঃ

১. তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা– ২৯১।

২. সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা- ৩৪।

৩. মাসআলাই খিলাফত ও জাযীরাতুল আবর ঃ জাযীরাতুল আরব ও বিলাদে ইসলামিয়া অধ্যায়।

৪. যাদুল মা'আদ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড।

৫. সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পৃষ্ঠা- ২১২।

৬. রাহমাতুল লিল আলামীন ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা- ২১২।

৭. আসাহ্হুস্ সিয়ার ঃ পৃষ্ঠা - ৪০৫।

৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য উমর বিন কাহ্হালা লিখিত (পৃষ্ঠা-১০৮৩) 'মু'জামুল কাবায়িলুল আরব' দ্রষ্টব্য।

৯. তাবাকাতে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের পর মুযাইনার পতাকা খাযয়ী বিন আবদে নুহামের হাতে সোপর্দ করা হয়েছিল। (দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা- ২৯২)।

১০. ক্যালেন্ডার বর্ষ অনুযায়ী রজব, হিঃ ৫ সন শুরু হয়েছিল ২৬ নভেম্বর হিঃ ৬২৬ সনে।

১১. তাবাকাত ঃ প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা - ২৯১।

১২. বুখারী ঃ কিতাবুল ইল্ম।

১৩. সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পৃষ্ঠা-৫০।

১৪. আবদুল্লাহ বিন আওফকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আশাজ্জ উপাধি দিয়েছিলেন। কেননা তাঁর চেহারার মধ্যে কিছু দাগ ছিল।

১৫. সম্ভবত: তারা হিঃ ৮ সনের যীকা'দা কিংবা যীলহাজ্জাহ মাসে এসেছিলেন এবং হিঃ ৯ সনের মুহাররম মাসে ফিরে গিয়েছিলেন।

১৬. রাহমাতুল লিল আলামীন ঃ পৃষ্ঠা-২০২।

প্রতিনিধিদলের আগমন–২

"আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।"

দূস

তুফায়ল বিন আমর এবং দূস গোত্রের উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। তুফায়ল (রা) এর কারণেই এই গোত্র ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়। হিঃ ৭ সনে তুফায়ল (রা) আপন গোত্রের প্রায় আশি জন লোক নিয়ে মদীনা মুনাওওরায় আসেন এবং এখানে অবস্থান করতে থাকেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)ও তাঁদের সাথে মদীনা মুনাওওরায় এসেছিলেন। তাঁদের সকলের মনস্কামনা এই ছিল যে, তাঁরা তাঁদের সকলের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্‌র রাসূলের সংসর্গে কাটাবেন, যাতে করে তিনি (রা) তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অনুযায়ী অধিক থেকে অধিকতর দ্বীনী খিদমত আনজাম দিতে পারেন। তুফায়ল ইয়ামামা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাতেই শাহাদত বরণ করেন। ঐ যুদ্ধে মিথ্যা নবী মুসায়লামা কায্যাব নিহত হয়েছিল। তুফায়লের পুণ্যবান পুত্র আমর বিন তুফায়ল ইয়ারমূক যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন।

ছাকীফ

পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফের অবরোধ উঠিয়ে নেওয়ার পর দু'আ করেছিলেন, اَللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا وَأْتِ بِهِمْ –"হে আল্লাহ্, ছাকীফকে পথ প্রদর্শন কর এবং তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।" এবার এই দু'আ কবুল হওয়ার কাহিনী শুনুন।

উরওয়া বিন মাসঊদ ছাকীফী (রা), ছাকীফ গোত্রের একজন বড় সর্দার ছিলেন। তাঁরই মাধ্যমে হুদায়বিয়া সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিল। আর তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর পুত্র নওমুসলিম আবূ জান্দালকে ফেরত না দিলে, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি বানচাল করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফের অবরোধ উঠিয়ে জা'রানা থেকে মদীনা মুনাওওরা অভিমুখে রওয়ানা হন তখন উরওয়া বিন মাসঊদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। সংগে সংগে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছাকীফ গোত্রের দাম্ভিকতা এবং মূর্খতাসূচক একগুঁয়েমি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি (সা) বলেন, এমন যেন না হয় যে, ঐ সব লোক তোমাদেরকে হত্যা করে ফেলে। উরওয়া (রা) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার সম্প্রদায় আমাকে এমনভাবে ভালবাসে যেমন ভালবাসে পিতামাতা তাদের একমাত্র সন্তানকে। অতএব উরওয়া (রা) তাঁর ঘরে পৌঁছেই তাঁর স্বজাতিকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং নিজেও যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন সেকথা তাদের কাছে প্রকাশ করে দেন। তখন তাঁর স্বজাতীয়রা তাদের এই প্রিয় সর্দারকে অনেক গালমন্দ করল। একদিন উরওয়া তাঁর বালাখানার উপর আযান দেন। তখন ছাকীফের লোকেরা ক্রোধান্বিত হয়ে তার দিকে ধাওয়া করে। বনূ মালিক গোত্রের আওস বিন মালিক নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে, যা তাঁর বক্ষে বিদীর্ণ হয় এবং অনবরত: রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। তখন কিছু লোক বনী মালিক গোত্রের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু উরওয়া (র)

বলেন, আমি খুনীকে মাফ করে দিলাম, যাতে তোমাদের সাথে তাদের একটা আপোষ-মীমাংসা হয়ে যায়। আল্লাহ্ আমাকে শাহাদত দ্বারা সম্মানিত করেছেন। তিনি এই মর্মে শেষ ওসীয়ত করেন যে, আমাকে ঐ সব মুসলমানের পাশে দাফন করবে, যারা তায়েফ অবরোধ চলাকালে শাহাদত বরণ করেছিলন।

আহ্‌মাস গোত্রের রয়ীসের পদক্ষেপ

মরহুম সাইয়িদ সুলায়মান বলেন, আহমাস গোত্রের রয়ীস সাকার বিন আয়লা যখন শুনেন য, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফ অবরোধ করে রেখেছেন তখন তিনি কয়েকজন সওয়ারসহ তায়িফ অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু তার সেখানে পৌছার আগেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানকার অবরোধ তুলে চলে এসেছিলেন।

সাখার অঙ্গীকার করেন 'যতক্ষণ পর্যন্ত তায়িফবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বশ্যতা স্বীকার না করবে ততক্ষণ আমি দুর্গের অবরোধ তুলে নেব না'। শেষপর্যন্ত তায়েফবাসীরা বশ্যতা স্বীকার করল। তখন সাখার, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি (সা) সকল লোককে মসজিদে একত্রিত করে আহ্‌মাসের জন্য অন্ততঃ দশ বার দু'আ করেন।[১]

কিছুদিন পর তায়েফবাসীরা এই মর্মে পরস্পর পরামর্শ করেঃ আরবের সব গোত্রই তো ইসলাম গ্রহণ করেছে। এমতাবস্থায় আমরা একাকী বিরোধিতা করতে থাকলে এর পরিণাম ভাল হবে না। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, কয়েকজন প্রতিনিধিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দরবারে পাঠানো হবে। এটা উরওয়া বিন মাসউদ (রা) এরই বিশুদ্ধচিত্ততার ফল যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই যে সাকীফ গোত্রের জন্য, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে হাযির হওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল এবং তিনি তাঁর শাহাদতের মাধ্যমে তায়েফবাসীদের মধ্যে যে মিত্রতার বন্ধন গড়ে তুলেছিলেন তাতে তায়েফবাসীরা কোনরূপ রক্তপাত ছাড়াই এক জোট হয়ে শেষ পর্যন্ত ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন।

প্রতিনিধিদল

যাহোক আবদিয়া লায়লের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যখন তায়েফে পৌছেছিলেন তখন এই আবদিয়া লায়লই ছিল ছাকীফের সেই নেতা, যে তাঁর আহবানের জবাবে অত্যন্ত রূঢ় কথা বলেছিল। কারো কারো মতে, প্রতিনিধি দলে সত্তর জন লোক ছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে সঠিক অভিমত এই যে, প্রতিনিধি দলের লোক সংখ্যা ছিল উনিশ।

সাহাবা কিরামের এই রীতি ছিল যে, তাঁরা পালাক্রমে সরকারী উট চরাতেন। যেদিন ছাকীফের প্রতিনিধি দল মদীনায় পৌছে সেদিন মুগিরা বিন শু'বা (র) এর উট চরাবার পালা ছিল এবং তিনি শহরের বাইরের সেই রাস্তায় অবস্থান করছিলেন,যা দক্ষিণ দিক থেকে মদীনা মুনাওওরা অভিমুখে এসেছিল । তিনি দূর থেকে নিজের স্বগোত্রীয়দের আসতে দেখে এত সন্তুষ্ট হন যে, সে সুসংবাদ প্রদানের জন্য দ্রুত রাসূলুল্লাহ্ (সা)- এর দরবার অভিমুখে রওয়ারা হন। পথিমধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) এর সাথে দেখা হলে তিনি এই সুসংবাদ দেন। তখন আবূ বকর (রা) মুগীরা (রা) কে কসম দিয়ে বলেন,তুমি আমাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এই সংবাদ পৌছায়ে দাও। মুগীরা (রা) তখন তাঁর স্বগোত্রীয়দেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে কিভাবে হাযির হতে হবে তার প্রয়োজনীয় আদব কায়দা শিক্ষা দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ মুতাবিক তায়েফ বাসীদের জন্য মসজিদের আঙ্গিনায় তাঁবু স্থাপন করা হয়,যাতে তারা সালাত ও খুতবাসমুহে পঠিত কুরআর মজিদ শ্রবণ করার সুযোগ পায়। খালিদ বিন সায়ীদ বিন আস (রা) এর উপর তাদের অতিথ্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

তায়েফবাসীরা সালাত এবং খুতবাসমূহের মধ্যে কুরআন মজীদও শুনতে থাকেন এবং সেই সাথে মুসলমানদের ইবাদতের পদ্ধতি দেখেও তারা ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত হতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও মাঝে মধ্যে তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। শেষ পর্যন্ত তারা আগ্রহ সহকারে ইসলাম গ্রহণে রাজী হন।

শর্তসমূহ

তবে তাঁরা ইসলাম গ্রহণের উপর কয়েকটি শর্ত পেশ করে । যেমন-

১। আমাদের বেশীর ভাগ লোক বাণিজ্য ব্যপদেশে বিদেশে অবস্থান করেন। অতএব তাদেরকে ব্যভিচারের অনুমতি দিতে হবে।

২। আমাদের সম্প্রদায়ের যাবতীয় কাজকারবার সুদের উপর চলে। অতএব সুদের লেনদেন যেন আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা না হয় ।

৩। আমাদের এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে আংগুর উৎপাদিত হয়। আর আংগুরের তৈরী শরাব হচ্ছে আমাদের একটি বিশেষ পণ্যদ্রব্য। অতএব শরাবের ব্যবসা করতেও যেন আমাদের অনুমতি প্রদান করা হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)তাদের তিনটি শর্তই বাতিল করে দেন এবং কুরআন মজীদে এগুলোর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে যে সব আয়াত রয়েছে সেগুলো তাদরকে তেলাওয়াত করে শুনান। শেষ পর্যন্ত প্রতিনিধি দল বললো, আমাদের রাব্বাহ্ (দেবী) 'লাত' সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বলেন, তাকে ভেংগে ফেলা হবে? তখন তারা বলে উঠে, যদি আমাদের দেবী জানতে পারে যে, আপনি এই চান তাহলে সে আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে।

হযরত উমর (রা) এটা শুনে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন নি। তিনি বলে উঠেন, তোমরা কি এতটুকুও বুঝ না যে, 'লাত' একটি পথর ছাড়া কিছু নয়? প্রতিনিধিদলের যে লোকটি উক্ত কথা বলেছিল, সে কিছুটা ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠে, উমর, আমরা তোমার সাথে কথা বলতে আসি নি।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, যখন কুসংস্কার মানুষের মন-মস্তিষ্ক দখল করে বসে তখন তার বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পায়। হযরত ইবরাহীম (আ) এই গুঢ় রহস্যটি আপন জাতির সামনে প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের সব কয়টি মূর্তিকেই ভেংগে চূরমার করে ফেলেছিলেন। অক্ষত রেখেছিলেন শুধুমাত্র বড় মূর্তিটিকে। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এই কান্ড কি আপনি করেছেন? তখন তিনি বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের বড় দেবতাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, সে এ সম্পর্কে কি বলে? এ কথা শুনতেই পূজারীদের মাথা দারুণ লজ্জায় ঝুকে পড়েছিল এবং উত্তরে তারা শুধু এতটুকু বলেছিল, তুমি তো ভালভাবেই জান যে, এই সব মূর্তি কথা বলে না। হযরত ইবরাহীম (আ) বলেন–

أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَالاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلاَيَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ .

"তবে কি তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। ধিক্ তোমাদেরকে এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদেরকে। তবে কি তোমরা বুঝবে না।" (২১:৬৬-৬৭)

ছাকীফের প্রতিনিধিদল মুসলমান হয়ে গিয়েছিল বটে, তবে ইসলাম তাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে পারে নি। তাই তারা বলে উঠেছিল, আমরা তো আমাদের উপাস্যকে ভেংগে ফেলতে পারি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, আমরা আমাদেরই লোক পাঠিয়ে সেগুলোকে ভেংগে ফেলার ব্যবস্থা করবো। এরপর মুগীরা বিন শু'বা এবং আবূ সুফ্ইয়ান (রা) একাজের জন্য আদিষ্ট হন।

সালাত, যাকাত ও জিহাদ

ছাকীফের প্রতিনিধি দল সালাত যাকাত এবং জিহাদ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যও আবেদন পেশ করে। কিন্তু সালাত থেকে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায়ই তো ছিল না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত অবশ্যই

আদায় করতে হত। এক বছর পর শুধু স্বচ্ছল লোকদেরকে যাকাত প্রদান করতে হত। আর জিহাদ সাধারণত: 'ফরযে কিফায়া'। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে তা 'ফরযে আইনে' পরিণত হয়। জিহাদ প্রতিদিন করতে হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে প্রমাণিত হয়েছিল। কেননা ঈমান আনার পর ছাকীফ গোত্র যাকাত প্রদান করতে শুরু করে এবং জিহাদেও উল্লেখযোগ্য হারে অংশ নেয় – যার অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রবেশের দরজা যে নওজোয়ান সেনাপতির কল্যাণময় করাঘাতে উন্মোচিত হয়েছিল তিনি ছিলেন ছাকীফ গোত্রেরই এক কৃতি সন্তান, যার বিশ্ববিশ্রুত নাম ছিল মুহাম্মদ বিন কাসিম। আজ পাক ভারতে কমবেশী ষোল সতেরো কোটি (বর্তমানে ইং ১৯৯৪ সনে দ্বিগুণের চাইতেও বেশ)ী মুসলমান রয়েছে, অথচ এখানে কোন যুগেই সরকারীভাবে ইসলাম প্রচারের কোন নিয়মিত ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি।

উক্ত প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্যে উছমান বিন আবুল আছ ছিলেন বয়সের দিক দিয়ে সর্বকনিষ্ঠ। প্রথম থেকেই ইসলামের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। তাই তিনি আপন সংগী সাথীদের থেকে পৃথক হয়ে কুরআন মজীদ এবং শরীয়তের নির্দেশাবলী শিখতে থাকেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকেই ছাকীফ গোত্রের ইমাম নিয়োগ করেন।

একটি চমৎকার কৌশল

ছাকীফের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা দেশে ফিরে যাবার সময় পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে, তাদের সম্প্রদায় হচ্ছে মূর্খ, একগুয়ে এবং অত্যন্ত জেদী। অতএব তাদের কাছে পৌঁছেই যদি প্রতিনিধিদলের ইসলাম গ্রহণের কথা বলা হয় তাহলে তাদের ক্ষেপে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এতে গোটা পরিস্থিতিটাই বিগড়ে যেতে পারে। উরওয়া (রা) ছিলেন তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় সর্দার। কিন্তু তাকে হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করে নি। অতএব এটাই সমীচীন হবে যে, যাওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে প্রতিনিধি দলের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত না করা, বরং ধীরে ধীরে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি অনুরক্ত করে তোলা।

অতএব তায়েফ পৌঁছে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা তাঁদের জাতিকে বললেন, আমরা তো এমন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করে এসেছি, যিনি বিভিন্ন কাজ করার নির্দেশ দেন। যেমন ঃ মূর্তিসমূহ ভেংগে ফেলা, সুদী লেনদেন পরিত্যাগ করা, মদ এবং ব্যভিচারকে হারাম মনে করা। লোকেরা তখন বললো, আমরা কি করে এসব কথা মেনে নিতে পারি? প্রতিনিধি দল উত্তরে বললো, তাহলে তো যুদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অতএব তোমরা অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা কর এবং দুর্গসমূহ সংস্কার কর। তৃতীয় দিন লোকেরা নিজে থেকেই বললো, আমরা মুহাম্মদ (সা) এর সাথে কিভাবে লড়বো? – সমগ্র আরব তো তার বাধ্য ও অনুগত। একথা শুনে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বললো, তাহলে আর একটি মাত্র পথ আছে। আর তা হলো, তিনি যা বলছেন তা গ্রহণ করে ফেল। সাথে সাথে তারা এও বললো, তাকওয়া, অঙ্গীকার পালন, সততা এবং দয়া ও করুণার ক্ষেত্রে আমরা মুহাম্মদ (সা) কে একজন সর্বোচ্চ পর্যায়ের লোক হিসাবে পেয়েছি এবং এই সফরের মাধ্যমে আমরা বেশ কল্যাণমন্ডিত হয়েছি। তাঁদের একথা শুনে সম্পূর্ণ সম্প্রদায় এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে।

'লাত' দেবীকে ধ্বংস

ইতিমধ্যে লাতকে ধ্বংসকারীরাও তায়েফে এসে পৌঁছেন। পুরুষদের অনুপাতে ছাকীফের স্ত্রীলোকেরা অধিকতর দুর্বল বিশ্বাসী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। 'লাত'কে ধ্বংস করার সময় তারা পুরুষদেরকে এই বলে তিরস্কার করতে থাকে, তোমরা যুদ্ধ ছাড়াই দেবীকে এভাবে চুপচাপ শত্রুদের হাতে সোপর্দ করে দিচ্ছ? তাদের অধিকতর রাগান্বিত হওয়ার কারণ এও হতে পারে যে, 'দেবী' (স্ত্রীলিংগ) হওয়ার কারণে লাতের প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্বমূলক আসক্তি ছিল কিছুটা বেশী।

ছাকীফের শুধু স্ত্রীলোকদের নয় বরং পুরুষদের মধ্যেও প্রধানত: এই বিশ্বাস ছিল যে, লাত ধ্বংসকারীরা নিজেরাই ধ্বংস হযে যাবে। মুগীরা (রা) লাতকে প্রথমে তাঁর তীরের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে মূর্তির পরিবর্তে তিনিই মাটিতে পতিত হন। এতে সবার বিশ্বাস হয়ে যায় যে, লাতই মুগীরা (রা)কে আঘাত করেছে। কিন্তু মুগীরা (রা) নিমিষের মধ্যে উঠে দাঁড়ান এবং শুধু লাতকে নয় বরং তার সমগ্র আস্তানাটিকে ভেংগে চুরমার করে দেন। তখন কেউ বললো, বুতখানার ভিত্তি যে উপড়ে ফেলবে তাকে 'লাত' নিশ্চয়ই খতম করে দেবে। মুগীরা (রা) একথা শুনার সাথে সাথে বুতখানার ভিত্তিও একেবারে সমূলে উৎপাটন করে ফেলেন।

এই মন্দিরের জন্য উৎসর্গীকৃত যে সব মাল সেখানে পাওয়া যায় তার কিছু অংশ দিয়ে উরওয়া বিন মাসউদ (রা) এবং তার ভাই আসওয়াদের ঋণ পরিশোধ করা হয়। অবশিষ্ট মাল যোগ্য লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়।

তাঈ গোত্র

তাঈয়ের দু'জন সর্দার ছিল। একজন যায়দুল খায়র এবং অপরজন আদী বিন হাতিম। যায়দুল খায়র একজন শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী হিসাবে 'যায়দুল গায়' উপাধিতে ভূষিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে 'যায়দুল খায়র' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং এও বলেন, আমার কাছে আরবের এমন কোন ব্যক্তির উল্লেখ করা হয় নি,যার মধ্যে, তার সম্পর্কে বর্ণিত গুণাবলী, আমি অন্তত: কিছুটাও কম পাইনি – শুধুমাত্র 'যায়দুল খায়র' ছাড়া। কেননা আমি তার মধ্যে তার সম্পর্কে বর্ণিত গুণাবলী কম নয়, বরং বেশীই পেয়েছি।

ঐ প্রতিনিধিদলের মধ্যে মোট পনেরোজন লোক ছিলেন। যায়দুল খায়র (রা)-ই ছিলেন তাদের নেতা। তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

তারা যখন বিদায় গ্রহণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের প্রত্যেককে পাঁচ আওকিয়া করে এবং যায়দুল খায়রকে সাড়ে বারো আওকিয়া রৌপ্য উপহার দেন। তিনি (সা) তাকে একটি জায়গীরও প্রদান করেন এবং সে সম্পর্কে একটি ফরমানও লিখে দেন। যায়দ (রা) ফিরে যাবার সময় ফারওয়া নামক স্থানে ইনতিকাল করেন।

আদী বিন হাতিম

আদী বিন হাতিম খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা) কে দু'শ অশ্বারোহীসহ তাঈ গোত্রের 'ফুলুস' মূর্তি ধ্বংস করার জন্য পাঠান তখন আদী পালিয়ে সিরিয়া চলে যায়। তার বোন অর্থাৎ হাতিমের কন্যা বন্দী হয়ে মদীনা মুনাওওরা আসে। তাকে মসজিদে নবভীর দরজার কাছে একটি চাঁদোয়ার মধ্যে রাখা হয়। সে খুব সুন্দরী এবং মিষ্টভাষী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নিকট দিয়ে যাবার সময় সে নিবেদন করলো–

هَلَكَ الْوَالِدُ وَغَابَ الْوَافِدُ فَامْنُنْ عَلَيَّ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ

"(আমার) পিতা মৃত্যু বরণ করেছেন, (আমাকে) মুক্তকারী অদৃশ্য হয়ে গেছে, আপনি আমার উপর দয়া করুন, আল্লাহ আপনার উপর দয়া করবেন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন জিজ্ঞাসা করেন, তোমার মুক্তকারী কে? সে নিবেদন করল, আদী বিন হাতিম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে?

এরপর তিনি (সা) বলেন, আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম, কিন্তু যাবার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। যখন তোমার জাতির এমন কোন নির্ভরযোগ্য লোক আসবে, যে তোমাকে তোমার জন্মভূমিতে পৌছিয়ে দেবে তখন চলে যেও এবং সেখানে পৌছে আমাকে সংবাদ দিও।

হাতিমের কন্যা বলে, 'আমার ইচ্ছা ছিল ভাইয়ের কাছে সিরিয়ায় চলে যাওয়া। যখন কুযাআ গোত্রের একটি দল মদীনায় আসল তখন আমি তাদের সাথে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি উপহার স্বরূপ আমাকে পরনের কিছু কাপড় দেন, আমার সওয়ারীর ব্যবস্থা করেন এবং পথ খরচাও দেন। অতএব আমি আমার ভাইয়ের কাছে সিরিয়ায় গিয়ে পৌছি।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দরবারে আদীর উপস্থিতি

হাতিমের কন্যা সিরিয়ায় পৌছেই তার ভাই আদীকে সম্বোধন করে বললো, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী হে জালিম, তুই তো পরিবার বর্গকে সওয়ারীতে উঠিয়ে নিয়ে চলে এসেছিস এবং পেছনে ফেলে এসেছিস,পিতার ঐ সব জিনিস, যেগুলো সংরক্ষণ করা ছিল তোর জন্য অপরিহার্য। আদীও বিনা দ্বিধায় স্বীকার করল, 'সত্যি আমি তা-ই করেছি, যা তুই বলছিস্।

এরপর আদী রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করল। বোন উত্তর দিল, আমার অভিমত এই যে, তুমি এখনি গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করো। যদি তিনি নবী হন তাহলে যে তার দিকে আগে অগ্রসর হবে সেই অধিক মর্যাদার অধিকারী হবে। আর যদি তিনি বাদশাহ হন তাহলে তার কল্যাণময় সংস্পর্শে তোমাকে কখনো লাঞ্ছনা উঠাতে হবে না। তুমি তা-ই থাকবে যা এখন আছ।

আদী বোনের এই পরামর্শ গ্রহণ করে। সে মদীনায় পৌছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে হাযির হয় এবঙ তাঁকে সালাম নিবেদন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? সে নিবেদন করে, আদী বিন হাতিম। আদীর বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন দ্রুত আপন জায়গা থেকে উঠে আমাকে নিয়ে তাঁর গৃহ অভিমুখে রওয়ানা হন। রাস্তায় এক বৃদ্ধার সাথে তাঁর দেখা হয়। বৃদ্ধা অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কাছে নিজের প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে থাকে, আর তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা শুনতে থাকেন। তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, তিনি বাদশাহ্ নন।

ঘরে পৌছে বসার জন্য তিনি আমার দিকে একটি চামড়ার গদী এগিয়ে দিলেন। গদীটি ছিল পাতাভর্তি। তিনি বললেন, এর উপর বস এবং তিনি নিজে মেঝেতে বসে পড়লেন। আদী অনেক করে বললেন, আপনি গদীর উপর বসুন। তিনি বললেন, না, তুমিই এই গদীর উপর বসবে। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আদী তুমি কি রাকূসী নও?[২]

আমি নিবেদন করলাম, আপনি ঠিকই বলেছেন।

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তোমার জাতির নিকট থেকে চৌথ (কর) আদায় কর না?

আমি নিবেদন করলাম, করি।

তিনি বললেন, এটা তো তোমার ধর্মের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

আদী বললেন, আমার বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি প্রকৃতই নবী।

শেষ পর্যন্ত তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাকে কিছু কথা বললেন। যেমন—

১। সেই সময় দূরে নয়, যখন মুসলমানেরা এত বিপুল পরিমাণ ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে যে, দাতা দানের অর্থ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু কোন গ্রহীতাকে খুঁজে পাবে না।

২। সেই দিন দূরে নয়,যখন একজন বৃদ্ধা কাদিসিয়া থেকে আপন উটের উপর সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হবে এবং রাস্তায় তার কোন কিছুর ভয় থাকবে না।

৩। সেই দিন দূরে নয়, যখন তোমরা শুনতে পাবে যে, মুসলমানরা বাবিলের শুভ্র প্রাসাদ জয় করে ফেলেছে।

যাহোক আদী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এই সব ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর জীবন কালেই কার্যকর হতে দেখেন।

বনূ হানীফা

বনূ হানীফার সর্দার ছামামা বিন আছাল (রা) এর মাধ্যমে বনূ হানীফা গোত্রে ইসলাম প্রচারিত হয়। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর একটি বাহিনী বনূ হানীফার জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। কেউ জানত না সেই ব্যক্তি কে? যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন তিনি বললেন, এ তো ছামামা বিন আছাল। এরপর তিনি ছামামার কাছে খাবার পাঠান এবং একটি দুগ্ধবতী গাভী তার জন্য বরাদ্দ করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখনই ছামামার নিকট দিয়ে যেতেন তখন তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। ছামামা উত্তরে বলতেন, একথা ছাড়ুন, যদি ফিদিয়া চান তাহলে যত ইচ্ছা নিয়ে নিন। তৃতীয় দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন, ছামামাকে ছেড়ে দাও। ছামামা মুক্তি পেয়ে বাকী'-এর দিকে যান। সেখানে গিয়ে গোসল করেন এবং ফিরে এসে মুসলমান হয়ে যান। এরপর মক্কা মুকাররমা গিয়ে উমরা করেন এবং কুরায়শকে বলেন, আগামীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অনুমতি ছাড়া কোন খাদ্য মক্কা এসে পৌঁছবে না। মক্কাবাসীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইয়ামামার খাদ্যের উপরই নির্ভরশীল ছিল। তাই তারা বাধ্য হয়ে ছামামাকে তার সংকল্প থেকে বিরত রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরোধ করে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নির্দেশ অনুযায়ী ইয়ামামা থেকে নিয়মিত খাদ্য আসতে থাকে।

প্রতিনিধি দল

হিঃ ৯ সনে(ইং ৬৩০ সনে) বনূ হানীফার একটি প্রতিনিধি দল আসে। তার সদস্য সংখ্যা ছিল উনিশ। তাদের রামলা বিনতে হারিছের ঘরে থাকতে দেওয়া হয়। বেশীর ভাগ প্রতিনিধি দলকে এই ঘরেই থাকতে দেওয়া হত। তাবাকাতের বর্ণনানুযায়ী, তাদের আতিথ্যের জন্য কখনো গোশত-রুটি, কখনো দুধরুটি, কখনো ঘি-রুটি, আবার কখনো খেজুর দেওয়া হত।

মুসায়লামা বিন আল হাবীব (কায্যাব)-ও ঐ প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু প্রতিনিধিদল তাকে উটের সেবিকা ও উটের দেখাশুনার কাজে নিয়োজিত রাখত। বিদায় গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ আওকিয়া রৌপ্য উপহার দেন। প্রতিনিধিরা নিবেদন করল, আমাদের একজন সঙ্গী সেবিকা এবং উট দেখাশুনার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জন্যও পাঁচ আওকিয়া রৌপ্য উপহার স্বরূপ দান করেন এবং বলেন, সেবিকা ও উট সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে তার মর্যাদা তোমাদের চাইতে কমে যায় নি।

এই সেই মুসায়লামা, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ওফাতের পর নুবুওয়াতের দাবী করেছিল। কিন্তু ছামামা বিন আছাল সর্বাবস্থায় ইসলামের উপর সুদৃঢ় ছিলেন। মুসায়লামা হযরত আবু কবর (রা) এ খিলাফতকালে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন অযুর উচ্ছিষ্ট এক মশক পানি প্রতিনিধিদলের হাতে অর্পণ করেন এবং বলেন, তোমাদের ওখানে যে গির্জা রয়েছে তা ভেংগে ফেলে সে জায়গাটি এই পানি দিয়ে ধুয়ে নেবে এবং সখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে।

টীকা ঃ

১। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পৃষ্ঠা - ৪৩ (আবূ দাউদের রেওয়ায়াত অনুযায়ী)

২। 'রাকূসী' এমন একটি সম্প্রদায়ের নাম, যাদের ধর্মমত ছিল 'মাসীহিয়াত' (খ্রীষ্টধর্ম) ও 'সাবিয়াত' (তারকা পূজা) এর মাঝামাঝি।

প্রতিনিধি দলের আগমন -৩

"আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।"

আয্‌দ

আয্‌দ গোত্রের প্রতিনিধিদলে সাত সদস্য ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁদের আচার-আচরণে ও কথাবার্তায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, তোমরা কে? তাঁরা নিবেন করেন, আমরা মুমিন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, প্রত্যেকটি কথার একটি হাকীকত (গূঢ়তত্ব) আছে, তোমাদের কথা অর্থাৎ ঈমানের হাকীকত কি? তাঁরা নিবেদন করেন, ঐ পাঁচটি কথা, যেগুলোর উপর বিশ্বাস করার জন্য আপনার প্রেরিত মুবাল্লিগরা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তাঁরা পাঁচটি কথার উপর আমল করার জন্য আমাদেরকে বলেছেন। আর ঐ পাঁচটি কথা, যার উপর আমরা প্রথম থেকে আমল করে আসছি।

১। ঈমান ও বিশ্বাসের কথাসমূহ ঃ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান, আল্লাহ্‌র ফিরিশতাদের উপর ঈমান, আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের উপর ঈমান, আল্লাহ্‌র রাসূলগণের উপর ঈমান, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান।

২। আমলের কথাসমূহ ঃ কালিমা-ই-তাওহীদ বলা (আল্লাহ্‌ যে এক ও অদ্বিতীয়, তা স্বীকার করা), পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা রাখা, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা – যার রাহা খরচ বহনের সামর্থ্য রয়েছে।

৩। যে সব কথার উপর আমরা পূর্ব থেকে আমল করে আসছি ঃ তৃপ্তি পাওয়ার পর আল্লাহ্‌র শুকুর আদায় করা, বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা, পরীক্ষার সম্মুখীন হলে সততার উপর দৃঢ় থাকা, শত্রুকে খারাপ কথা না বলা। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন বলেন, আমি তোমাদেরকে আরো পাঁচটি কথা বলে দিচ্ছি, যাতে তোমাদের বিশটি চরিত্র (নীতিকথা) পূর্ণ হয়।

(ক) যে সব জিনিস খাবে না সেগুলোকে একত্রিত (সংগ্রহ) করবে না।

(খ) সেই ঘর তৈরী করবে না, যে ঘরে তুমি থাক না।

(গ) ঐ জিনিসের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে না, যেগুলো তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে।

(ঘ) আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার দিকে তোমাকে ফিরে যেতে হবে এবং যার সম্মুখে তোমাকে হাযির হতে হবে।

(ঙ) ঐ সব জিনিসের প্রতি আসক্তি রাখ, যা আখিরাতে তোমাদের কাজে আসবে, যেখানে তোমাদের চিরদিন থাকতে হবে।

তুজীব

তুজীব ছিল বনূ কিন্‌দা গোত্রের একটি শাখাগোত্র। এই গোত্রের লোকেরা হাদ্রামাউতের মধ্যবর্তী স্থানে থাকত। তাদের একটি প্রতিনিধিদলও হিঃ ৯ সনে (যাকে প্রতিনিধি আগমনের বছর বলা হত) মদীনায় আসে। ঐ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল তেরো। তাঁরা তাদের যাকাতের মালও সংগে করে নিয়ে এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)

বলেন, এই মাল তোমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং নিজেদের গরীব-মিসকীনদের মধ্যেই তা বন্টন করো। তাঁরা নিবেদন করেন,হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গরীব-মিস্‌কীনদের মধ্যে বন্টন করার পর যা অবশিষ্ট রয়েছে তা-ই আমরা আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁদের এই উত্তর শুনে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আরবের কোন সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধিদল এমনভাবে আসে নি, যেভাবে তুজীবের প্রতিনিধিদল এসেছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন বলেন, সৎপথ প্রদর্শন আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ার। আল্লাহ্‌র তা'আলা যার জন্য কল্যাণের ইচ্ছা করেন তার অন্তর ঈমানের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।

এরপর প্রতিনিধিদলের লোকেরা 'দ্বীন' সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেগুলোর উত্তর লিখিয়ে নিয়ে তা তাদের হাতে তুলে দেন (যাতে সেগুলেতে কখনো কোন ভুলত্রুটির উদ্ভব না হয়)। বিদায়কালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আপন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাদের জন্য পথ খরচা দেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কেউ বাকি থেকে যায় নি তো? তাঁরা নিবেদন করেন, একটি নওজোয়ান বাকি রয়েছ,যে বয়সে আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং যাকে আমরা আমাদের সওয়ারী এবং মালপত্র দেখাশুনার জন্য রেখে এসেছি।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকেও ডেকে পাঠান। সে এসে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার জন্য মাগফিরাতের (পরিত্রাণের) দু'আ করুন। আপনি আল্লাহ্‌কে বলুন, যেন তিনি আমার উপর দয়া করেন এবং আমার অন্তরকে ধনী করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দু'আ করেন –

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاجْعَلْ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ

" হে আল্লাহ্‌,তাকে ক্ষমা করে দাও, তাকে কৃপা কর এবং তার অন্তরকে ধনী করে দাও।"

বিদায় হজ্জে ঐ সম্প্রদায়ের কিছু লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর পুনরায় সাক্ষাত হয়। হুযূর (সা) তাদের কাছে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তারা উত্তরে বলে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এমন অল্পে তুষ্ট লোক না আমরা কখনো দেখেছি, আর না তার কথা কখনো শুনেছি। যদি কেউ তার সামনে সমগ্র দুনিয়া ভাগ করে দেয় তবু সে ওদিকে চোখ তুলে তাকাবে না।

বনূ তামীম

বনূ তামীম গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন আকরা' বিন হাবিস, উয়ায়না বিন হাসান, আতারুদ বিন হাজিব, যাবারকান বিন বদর প্রমুখ। প্রতিনিধিদলের সদস্য সংখ্যা সত্তর, আশি অথবা নব্বই বলা হয়েছে। এই সব লোক মদীনা মুনাওওরায় পৌঁছার পূর্বেই বিলাল যুহরের আযান দিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর মসজিদে আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। তখন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা নীরবে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর অপেক্ষা করার পরিবর্তে তাঁকে উচ্চ স্বরে হাঁকতে থাকে, 'হে মুহাম্মদ, বাইরে এসো।'

তাদের এই আচরণকে উপলক্ষ করে নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ .

"যারা ঘরের পেছন হতে আপনাকে উচ্চ স্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।"-(৪৯:৪)

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মসজিদে আগমন করেন। সালাতের পর বনূ তামীমের প্রতিনিধিদল বলে, আমরা আপনার সাথে 'মুফাখারা' (আপন আপন গর্ব প্রকাশে প্রতিদ্বন্দিতা) করার জন্য এসেছি। সর্ব প্রথম তাদের বক্তা আতারুদ বিন হাজিব একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে আপন জাতির ফযীলত ও প্রকৃষ্টতা বর্ণনা করে। সে এমনি বিখ্যাত বক্তা ছিল যে, আকর্ষণীয় বক্তৃতা প্রদানের জন্য সে বাদশাহ্‌ নওশেওয়ানের দরবারেও পুরস্কৃত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশে ছাবিত বিন কায়স আতারুদের প্রত্যুত্তরে বক্তৃতা দেন। এরপর তামীম গোত্রের কবি যাবারকান

বিন বদর স্বরচিত কাসীদা আবৃত্তি করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার প্রত্যুত্তরে হাস্‌সান (রা) কে কবিতা আবৃত্তি করতে বলেন। বনূ তামীম গোত্রের আকরা' বিন হাবিস ঐ বক্তৃতা বা কাব্য সভার 'হাকাম' বা বিচারক ছিলেন। তিনি বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তা এবং কবি আমাদের বক্তা ও কবির চাইতে শ্রেষ্ঠ। একথার উপর সমগ্র প্রতিনিধিদল এক যোগে ইসলাম গ্রহণ করে। এই হচ্ছে বনূ তামীমের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী।

বনূ সুলায়ম

বনূ সুলায়ম গোত্র নাজদে বসবাস করত। তাদের কোন কোন শাখা গোত্রের বাসভূমি খায়বার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা তাদের মূর্তির সংগদান এবং সেটাকে দেখাশুনার জন্য মাভী বিন আবদুল উযযা নামীয় জনৈক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে রেখেছিল। মাভী একদিন দেখল যে, দুটি শেয়াল মূর্তির উপর প্রস্রাব করছে, যেমন কুকুররা চলতে চলতে পা উঠিয়ে এখানে সেখানে প্রস্রাব করে থাকে। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতেই মাভী বলে উঠল–

ارب يبول الثعلبان برأسه

لقد ذلّ من بالت عليه الثعالب •

"সে কি কখনো প্রভু হতে পারে, যার মাথার উপর শেয়ালেরা প্রস্রাব করে?
সে অবশ্যই লাঞ্ছিত; যার মাথার উপর শেয়ালেরা প্রস্রাব করে।"

এই বলে সে মূর্তিকে ভেংগে ফেলে সোজা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এসে হাযির হল। সম্ভবত: সে প্রকৃত ঘটনাও রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে শুনিয়ে থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নাম জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিল, মাভী বিন আবদুল উযযা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, তুমি হচ্ছ রাশিদ বিন আবদে রাব্বিহী। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে এক খন্ড জমি দান করেছিলেন, যাতে 'আইনুর রাসূল' নামক একটি ঝর্ণা ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি নীতি ছিল এই যে, যে নামের অর্থ ভাল ছিল না, তিনি সে নাম বদলে ফেলতেন। যেমন একদা জুহায়না গোত্রের একটি প্রতিনিধল এল। তিনি (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কারা? ওরা নিবেদন করল, বনী গাইয়ান (গাইয়ান অর্থ অবাধ্যতা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, তোমরা গাইয়ান নও, বরং 'রাশিদান' (রাশিদান অর্থ সৎপথ প্রাপ্ত ব্যক্তিবৃন্দ) ঐ সব লোকের উপত্যকার নাম ছিল গাওয়া অর্থাৎ পথভ্রষ্টতা। তিনি (সা) ঐ উপত্যকার নাম রাখেন রুশদ।

বনূ সুলায়মের হিদায়াত প্রাপ্তির মাধ্যম ছিলেন কায়স বিন নুসায়বাহ্। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী সমূহ শুনে নিজে থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আপন সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলেন, আমি রোমান ও পার্শীদের কথাবার্তা, আরবের কবিদের কাব্য, ভবিষ্যৎ বক্তাদের ভবিষ্যৎবাণী এবং হিজর গোত্রের বক্তার বক্তৃতাও শুনেছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণীসমূহের সাথে এর কোনটির তুলনা হতে পারে না। তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে নিজ নিজ হিস্‌সা গ্রহণ কর। অতএব মক্কা বিজয় উপলক্ষে বনূ সুলায়মের এক হাজার লোক 'কুদায়দ' নামক স্থানে[১] তাঁর সাথে মিলিত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিবেদন করেন, আমাদেরকে অগ্রবর্তী বাহিনীতে রাখুন এবং এমন পতাকা দিন যার রং লাল হয়।

নাজরান

আমার মতে, নাজরানের প্রতিনিধিদল সম্পর্কে মরহুম কাযী সুলায়মান মানসূরপুরীর কথাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে, নাজরানের প্রতিনিধিদল দু'বার মদীনা মুরাওওরায় এসেছিল। বিস্তারিত বিবরণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বিভিন্ন এলাকার অধিবাসীদের কাছে ইসলামের দাওয়াতনামা পাঠান তখন একটি

দাওয়াতনামা নাজরানীদের কাছেও প্রেরণ করা হয়। নাজরানী বিশপ কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলেই তিন ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন, যারা খ্রীষ্টান ছিল না, কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও ন্যায়নিষ্ঠ বলে তাদেরকে সবাই মান্য করত। তারা হচ্ছে হামদান বিন শুরাহ্‌বিল বিন ওয়াদা'আহ্, হামীরের আবদুল্লাহ্ বিন শুরাহবিল এবং বনূ হারিছ বিন কা'বের জাব্বার বিন কায়স। এই তিনজন পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চিঠি পড়ল, কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারল না। তখন বিশপ সমগ্র খ্রীষ্টান অধিবাসীদেরকে ডেকে পাঠিয়ে চিঠিটি পড়ে শুনালেন এবং এ সম্পর্কে তাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলেন। চিন্তাভাবনার পর এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, শুরাহ্‌বিল বিন ওয়াদা 'আই, আবদুল্লাহ্ বিন শুরাহ্‌বিল এবং জাব্বার বিন কায়সকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে মদীনা মুনাওওরায় পাঠানো হবে এবং তারা সেখানে গিয়ে যে সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে করবেন সে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবে।

তারা মদীনা মুনাও্ওরায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথাবার্তা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কিত কুরআন মজীদের আয়াতগুলো পড়ে শুনালেন।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত তারা জিযিয়া প্রদান করতে সম্মত হয়। তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির দফাগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১। নাজরানবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিরাপত্তা পাবে।

২। তাদের প্রাণ, ধর্ম, যমীন এবং সহায় সম্পদের অবস্থা ও অধিকারের মধ্যে কোন পরিবর্তন করা হবে না। আর এই দফাগুলো উপস্থিত, অনুপস্থিত, নেতৃস্থানীয়, সাধারণ-সকল লোকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

৩। না তাদের কাছ থেকে বিনামূল্যে শ্রম গ্রহণ করা হবে, না উশুর (এক দশমাংশ ফসল)। উপরন্তু তাদের এলাকা দিয়ে কোন সেনাবাহিনী যাতায়াত করবে না।

বিশপের প্রতিনিধিদল

প্রথম প্রতিনিধিদল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)- এর ফরমান নিয়ে যখন নাজরানে ফিরে গেল তখন বিশপের চাচাত ভাই আবু আলকামা বাশার বিন মুআভিয়া একথা জানতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)ই হচ্ছেন প্রতিশ্রুত নবী–রাস্তা থেকেই পুনরায় মদীনায় ফিরে যান এবং খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে ইসলামের বায়আত করে সেখানেই থেকে যান। তারপর কোন একটি যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

এরপর বিশপ এবং নাজরানের বড় বড় কর্মকর্তারা ষাটজন লোকের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে মদীনামুনাও্ওরা এসে হাযির হন। তাদের মধ্যে চব্বিশজন ছিলেন বিখ্যাত সর্দার। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে খ্রীষ্টীয় পন্থায়ই পবিত্র মসজিদে নববীর মধ্যেই ইবাদত করার অনুমতি প্রদান করেন। তাদের সাথে বিভিন্ন সময়ে আলাপআলোচনাও চলে। সূরা আলে ইমরানের বিভিন্ন আয়াত এই সময়েই নাযিল হয়। মরহুম কাযী সুলায়মান লিখেছেন, প্রথম প্রতিধিদলকে মুবাহালার জন্যও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই অধমের ধারণা এই যে, ওদেরকে মুবাহালার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। কেননা, ওরা ঈসায়ীই ছিল না –যদিও ছিল ঈসায়ীদের নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা। বিশপ এবং তার প্রতিনিধিদলকেই মুবাহালার জন্য আহবান জানানো হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তারা মুবাহালা করতে সম্মত হয়নি। ইতিপূর্বে তো তারা জিযিয়া প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এবার তারা গির্জাসমূহ এবং পাদ্রীদের সম্পর্কে একটি নতুন ফরমান লাভ করে, যার গুরুত্বপূর্ণ দফাগুলো ছিল ঃ

১। প্রধান বিশপ, সেই সাথে অন্যান্য বিশপ, কাহিন, রাহিব প্রমুখ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের নিরাপত্তা লাভ করবে।

২। গির্জার ছোটবড় কোন পদাধিকারী ব্যক্তিকে বদলী করা যাবে না, কারো অধিকার ও ইখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না এবং তার বর্তমান অবস্থা এবং অধিকারেও কোন পরিবর্তন আনা যাবে না।

৩। শর্ত এই যে, তারা প্রজা সাধারণের শুভাকাংখী থাকবে। না স্বয়ং তারা জুলুম করবে, আর না কোন জুলুম কারীকে সমর্থন করবে।

সীরাতুন্নবীতে আছে, নাজরানে ঈসায়ীদের একটি বিরাট গির্জা ছিল, যাকে ওরা কাবা বলত এবং হারামে কাবার মতই এর মর্যাদা দিত। সেখানে বড় বড় ধর্মীয় নেতারা থাকতেন......... যে ব্যক্তি এর সীমার (হারামের) মধ্যে ঢুকে পড়ত সে নিরাপত্তা লাভ করত। তাদের ঐ কা'বা-এর জন্য ওয়াকফকৃত সম্পত্তির বার্ষিক আয় ছিল দু' লক্ষ।[২]

বনূ আসাদ

বনূ আসাদ ছিল একটি বিরাট আদনানী গোত্র। এর অনেকগুলো শাখা প্রশাখা ছিল। 'মু' জামুল কাবায়িলিল্ আরব'এর বর্ণনা মতে, এই গোত্রটি নাজ্দ ও তাঈ কাবীলার প্রতিবেশে বসবাস করত। ইয়ামন থেকে বের হয়ে এরা আজা ও সালমা এলাকা একেবারে ছেয়ে ফেলে; অবশ্য ইসলাম পরবর্তী যুগে তারা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র হিজায এলাকায়। এই প্রতিনিধিদলের সদস্য-সংখ্যা ছিল দশ। তাদের মধ্যে হাযরামী বিন আমির, যাবার বিন আল আযূর, ওয়াবিসা বিন মা'বদ এবং তালহা বিন খুভায়লদ ছিল অন্যতম। এই প্রতিনিধিদলটি হিঃ ৯ সনের প্রথম দিকে এসেছিল।

হাযরামী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিবেদন করে, আমরা অত্যন্ত অন্ধকার রাত্রে এবং ভয়ানক দুর্ভিক্ষের মধ্যে এসেছি-এমতাবস্থায় যে, আপনি আমাদের কাছে কোন সেনাবাহিনী পাঠাননি। পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটি তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ط قُلْ لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ م بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ
عَلَيْكُمْ أَنْ هَدٰكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

'ওরা আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলো, তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে বলে মনে করো না। বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"-(৪৯:১৭)

খাওলানের প্রতিনিধিদল

খাওলান গোত্র ছিল কাহতানীদের একটি শাখা। তাদের পূর্বপুরুষের নাম ছিল খাওলান বিন আমর। খাওলানের দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল শাবান, হিঃ ১০ সনে মদীনায় আসে।[৩] তারা ইসলাম গ্রহণ করেই এসেছিল এবং আপন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রতিনিধিত্বের অধিকারও লাভ করেছিল। তাদের দেবতার নাম ছিল আ'মে 'আনাস'। তারা এর উদ্দেশ্যে প্রচুর সংখ্যক পশু বলি দিত। স্বয়ং প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বলে, একদা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। আমরা তা নিবারণের জন্য ধনসম্পদ একত্রিত করে তা দিয়ে এক শটি ষাঁড় ক্রয় করি। আমরা এই সবগুলো ষাঁড় একই দিনে 'আমে আনাস' এর জন্য বলি দিই এবং সেগুলোর গোশত হিংস্র পশুদের ভোগের জন্য মূর্তির কাছেই রেখে আসি। তারা আরো বলে, আমাদের সম্প্রদায় নিজেদের গৃহপালিত পশু এবং ক্ষেতকৃষির একটি অংশ আমে আনাসের জন্য। কিন্তু আবহাওয়ার পতিকূলতার কারণে 'আমে আনাস' এর অংশ যদি নষ্ট হয়ে যেত তাহলে আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত অংশটি 'আমে আনাস'এর জন্য পুনঃনির্ধারণ করা হত, কিন্তু 'আমে আনাস' এর অংশটি কখনো আল্লাহ্র জন্য পুনঃনির্ধারণ করা হত না।

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টিকেই তুলে ধরা হয়েছে। যেমন–

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَاكَانَ لِشُرَكَائِهِمْ ط فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ج وَمَاكَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ

"আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে থেকে তারা আল্লাহ্র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহ্র জন্য এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্য। যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহ্র কাছে পৌঁছায় না এবং যা আল্লাহ্র অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়; তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট।"–(৬ঃ১৩৬)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিনিধিদলকে দ্বীনের ফারায়িয সমূহ শিক্ষা দেন। বিশেষ করে তাদেরকে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করার উপদেশ দেন।

১। প্রতিশ্রুতি পালন।

২। আমানত ফিরিয়ে দেওয়া।

৩। প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

৪। কারো উপর জুলুম না করা। কেননা, জুলুম কিয়ামতের দিন জালিমের জন্য তার সর্বনাশের কারণে পরিণত হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই প্রতিনিধিদলের সদস্যদেরকেও পাথেয় দান করেন।

মাহারিবের প্রতিনিধিদল

মাহারিব গোত্র ছিল কায়স বিন আয়লানের একটি শাখা গোত্র। এই গোত্রের প্রতিনিধিদল হিঃ ১০ সনে মদীনায় এসেছিল। তাদের সদস্য সংখ্যা ছিল দশ। বিলাল (রা)-কে তাদের আতিথ্যে নিয়োজিত করা হয়। একদিন এরা জুহর থেকে আসর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন প্রতিনিধিদলের এক লোকের প্রতি বেশ মনোযোগ সহকারে তাকাতে থাকেন। এরপর বলেন, আমি তোমাকে কোথাও দেখেছি। সে নিবেদন করে; হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি উকাযের মেলায় আপনার সাথে অত্যন্ত খারাপ ভঙ্গিতে কথা বলেছিলাম এবং আপনার বাণী সমূহকে অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। ঐ সময়ে যত লোক আমার সাথে ছিল তারা সকলেই মারা গেছে। আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার জীবিত রেখেছেন এবং আমি আপনাকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সে আরো নিবেদন করে; হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে মাফ করে দেন এবং যে দুর্ব্যবহার আমি আপনার সাথে করেছি তাও মার্জনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, ইসলাম ঐসব গুনাহ্কে মুছে ফেলে যা কুফ্রীর অবস্থায় হয়েছে।

বিভিন্ন প্রতিনিধিদল

অন্যান্য প্রতিনিধিদলের কিছু বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

১। সূদা গোত্রের প্রতিনিধিদল ঃ এই গোত্রটি কাহতানী কাবীলার অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে যিয়াদ বিন হারিছ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিই তাঁর গোত্রের পনেরো সদস্যের প্রতিনিধিদলটি নিয়ে এসেছিলেন। এই গোত্রের কূয়াসমূহের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাতটি কংকর দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' উচ্চারণ করে এদের এক একটিকে এক একটি কূয়ায় নিক্ষেপ করবে। ফলে ঐসব কূয়ার মধ্যে এত পানি বৃদ্ধি পায় যে, সেগুলোর গভীরতা কত তা পরবর্তীকালে কারো পক্ষে টাহর করা সম্ভব হত না।

২। আশ'আরিয়ীনঃ এটা ছিল ইয়ামেনের একটি সম্ভ্রান্ত গোত্র। হিঃ ৭সনে তেরিপন আশ'আরী হিজরতের সংকল্প নিয়ে জাহাজে আরোহণ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বাতাস জাহাজটিকে আবিসিনিয়া উপকূলে পৌঁছিয়ে দেয়। সেখান থেকে এই লোকেরা হযরত জা'ফর বিন আবী তালিব (রা)-এর সাথে মদীনায় গিয়ে পৌঁছেন। আবু মূসা আশ'আরী তাদের সাথেই এসেছিলেন।

৩। আমর বিন মা'দীকারব দশজন লোক সংগে নিয়ে যুবায়দ থেকে মদীনায় আসেন। ইরতেদাদের ফিতনায় এরাও পতিত হয়েছিলেন এবং পরে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৪। এদের ছাড়াও হামাদান, কান্‌দা, হাদ্রামাউত, আল জাবাল্লা, মাহ্‌রা হামীর, জা'ফী, বাহিলা, গাসসালন, ছা'লাবা, মুররা, ফাযারাহ্‌, কিলাব, কিনানা, আমির বিন সা'সাহ্‌ এবং মাযহিজের বিভিন্ন শাখা গোত্র এবং আশাজা 'বকর ও তাগবিন, শায়যান, মুরাদ, সাদিফ, স'আদ, হুযায়ম, বাল্লী, বাহ্‌রা, উযরা, সালামান, কাল্‌ব, জারম, খাছ'আম, জুযাম প্রভৃতি গোত্রের পক্ষ থেকেও প্রতিনিধিদল আসে।

উদ্দেশ্যপূর্ণ হলো

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে পূর্ণ হলো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আরব উপদ্বীপকে পৌত্তলিকতা, ধর্মহীনতা, বিশৃঙ্খলা, পাশবিকতা ও মূর্খতার ভয়ংকর অন্ধকার ছেয়ে রেখে ছিল। মানবতা ও মনুষত্বের সর্বপ্রকার ঘৃণিত ব্যাধি অত্যন্ত কদাকার রূপে এই ভূখন্ডে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পবিত্রকরণের বদৌলতে শুধুমাত্র তেইশ বছরের এক সংক্ষিপ্ত সময়ে এ ভূখন্ডটি ন্যায় ও সত্যের একটি পীঠস্থানে পরিণত হয়। আর এখানে এমন একটি জাতির আবির্ভাব ঘটে, যারা দ্বীনের মশাল নিয়ে জন্মভূমি থেকে বের হয় এবং তার আলোকে চতুর্দিক আলোকিত করে তোলে। মাত্র বিশ বছরের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, এই জাতির চাইতে একটি যোগ্যতর ও মহান জাতি আকাশের চন্দ্রসূর্য কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। এই জাতি তাদের প্রত্যেকটি কাজে ছিল অসাধারণ এবং প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গিতে ছিল অতুলনীয়। তাদের উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা মানব জাতিকে সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র মহান স্রষ্টা ও মহান প্রতিপালক আল্লাহ্‌ তা'আলার দাসত্বে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন, হরেক রকম কৃত্রিম ও বানোয়াট ভেদ-বৈষম্যকে মুছে ফেলে তারা শুধুমাত্র তাক্‌ওয়াকে মানুষের সৎকর্মের মাপকাঠিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তারা চাচ্ছিলো, সাদা-কালো, প্রাচ্য-প্রতীচ্য এবং আরব-অনারবকে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে। কেননা, তারা সকলেই আদমের সন্তান। সকলে একই পরিবারের সদস্য। যেসব প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা মানুষের মনমস্তিষ্ককে লৌহ শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছিল তা যেন ইসলামের যাদুর কাঠির পরশে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল এবং আরবের উষ্ট্রচালকরা এমন একটি সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করল, যা ছিল এই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা এবং এর মধ্যে ছিল মানব জাতির সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান নিহিত। আল্লামা ইকবাল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ঐ অনুসারীদের সত্যভিযানকে কী সুন্দর ভাবেই প্রকাশ করেছেন–যার সারমর্ম হলো,

'আমরা (মুসলমানরা) পাহাড়ে, পর্বতে, সমুদ্রে, মরুভূমিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছি এবং আমাদের অভিযানকে সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। (সংকলক)

টীকা ঃ

১। মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওওরার রাজপথের পার্শ্ববর্তী একটি প্রসিদ্ধ স্থান, যা মক্কা মুকাররমার অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থিত।

২। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ডঃ পৃষ্ঠা-৪৭ ।

৩। শাবান, হিঃ দশ সনের সূচনা নভেম্বর, ইং ৬৩১ সনে হয়েছিল।

ইসলামী সেনাবাহিনীর বিজয় বন্যা–১

যুদ্ধের সংস্কারমূলক কর্মকান্ড

إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ .

"রাজা-বাদশাহ্‌রা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং তথাকার মর্যদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে; এরাও এরূপই করবে।" (২৭:৩৪)

সামরিক আক্রমণ

সেনাবাহিনী যখন বন্যার আকারে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হয় তখন তাদের মধ্যে রাগ, উন্মাদনা, উচ্ছ্বাস, শত্রুতা, প্রতিশোধ স্পৃহা এবং দাম্ভিকতার ঢেউ উত্থিত হতে থাকে। প্রাচীন সামরিক কাহিনী, বরং দেশীয় ইতিহাসের মধ্যে যুদ্ধের যে সব উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যাওয়ার অভিযোগ করা হয় সেগুলোকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই সব ঝড়ঝঞ্ঝা উদ্‌গীরণকারী তরঙ্গসমূহ আপন আঁচলে লুকিয়ে ফেলেছে। সমুদ্রের তুমুল ঝড়ের তরঙ্গসমূহ যখন আছড়ে পড়ে তখন এর চরম পরিণামের কথা ঐ সব লোক জানতে পারে না, যারা সন্ধ্যার সময় সমুদ্র উপকূলে এজন্য জড় হয় যে, উপকূলের নিত্য নৈমিত্তিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করে কিছু না কিছু মানসিক সুখ উপভোগ করবে। তুমুল ঝড়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র ঐ সব লোকেরাই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারে সর্বনাশা ঝড়ের তুমুল বেগ ও বন্যার প্রবল আঘাত যাদের ঘরের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়।

ইরান ও বাবিলের ধ্বংসাবশেষ

গ্রীক বাহিনীর উন্মাদনা মূলক ও ভয়ংকর সৈন্য সমাবেশ ও উন্মত্ত পদচারণার কাহিনী সিকান্দারনামার পৃষ্ঠাগুলোতে যদিও চুম্বকের ন্যায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু এ শিক্ষামূলক কাহিনী, শুধুমাত্র ইরানের ধ্বংসাবশেষই মানবজাতিকে শুনাতে পারে। নিজামী এই কাহিনী শুনেছিলেন এবং ইরানী ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তিনি তা প্রত্যক্ষও করেছিলেন।

বিশ্বে এখনো যুদ্ধ ও সংঘর্ষ অবিরাম চলছে। সেনাবাহিনী আবেগ ও দাম্ভিকতার মধ্যে ঘনঘটার ন্যায় এখনো প্রতিপক্ষের ভূখন্ডের দিকে এগিয়ে আসে। তারা বজ্রের ন্যায় হুঙকার ছাড়ে এবং বন্যার ন্যায় অগ্রসর হয়। বিংশ শতাব্দির যুদ্ধ সমূহে যদিও প্রাচীন যুগের ভয়ংকর দৃশ্য ও পাশবিক পদ্ধতিতে কর্তিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্নকৃত মানুষের হাত পা ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সেরূপ উলংগ আকারে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না – তা সত্ত্বেও এই 'সভ্য' মানবগোষ্ঠীর বন্যা যখন কোন শহরের উপর আছড়ে পড়ে তখন ইরান ও বাবিলের ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য পুনরায় চোখের সামনে ভেসে উঠে এবং এর বর্বরতার কাছে প্রাচীন বর্বরতাও যেন হার মানে।

আরবদের বিজয় বন্যা

দুনিয়ার প্রথম ও শেষ-এর মধ্যেও একটি স্তর থাকে, যার অনুপাত উভয় প্রান্তের মধ্যভাগে রাখলেই আসল ব্যাপারটি সঠিকভাবে অনুমান করা যেতে পারে। অতীত জাতিসমূহের কীর্তিকাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাস, বাবিল এবং ইরানের চার দেওয়াল ঠিকভাবেই শুনেছে। বর্তমান যুগের সমর-কৌশলের কাহিনী এবং সেনাবাহিনীর কর্মকান্ডের দৃশ্য লেছার (১) ও নামূরের (২) দুর্গসমূহের শীর্ষচূড়া থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের ভাষা কোন যুগেই স্তব্ধ থাকে নি। প্রাচীনযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে এমন একটি যুগও অতিবাহিত হয়েছে, যে যুগে একটি অজ্ঞাত-অপরিচিত জাতি আরব-মরুভূমি থেকে উত্থিত হয়ে বন্যার ন্যায় অগ্রসর হয় এবং উত্তাল তরঙ্গ রাজির ন্যায় সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ব, এই বন্যা প্রবাহের মধ্যেও জুলুম ও নৃশংসতার ছবি দেখতে চেয়েছে; কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তা দেখতে পায় নি। বিশ্ববাসী দেখেছে যে, এই জাতি বিভিন্ন শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, বিভিন্ন দুর্গ অবরোধ করেছে, বিরাট পর্বতসমশত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়েছে। অথচ না কারো একটি কুঁড়ে ঘর ধ্বংস করেছে, আর না কোন সভ্যতার নিদর্শন ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলেছে। তারা বিজয় উচ্ছ্বাস নিয়ে বন্যার ন্যায় অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু যখন কোন বিজিত দেশে প্রবেশ করেছে তখন স্রোতহীন জলের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বিশ্ববাসী তাঁদের এই অদ্ভুত বৈপরিত্য প্রত্যক্ষ করেছে এবং বার বার বিস্ময়াভিভূত হয়েছে। এর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ইবনে খালদূন বলেছেন, ঐ জাতির অভিযান, বুদ্ধি ও দর্শনের সাথে রূহানিয়াত বা আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণও ঘটেছিল। এখানে এ সম্পর্কে আলোচনা বাহুল্য মাত্র। তবে যদি আমরা ইতিহাস-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতার এই অভিমতকে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করি তাহলে এতে বিশ্বমানবতার কল্যাণ বৈ অকল্যাণ হবে না।

শ্রেষ্ঠতম মানবীয় উদ্দেশ্যাবলী

বিশ্বে যখন কোন সেনাবাহিনী বিজয় উচ্ছ্বাস নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে রওয়ানা হয় তখন তাদের অন্তরকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উত্তপ্ত করে তোলা হয়। বিউগল ও ঢোল-তবলার কর্ণবিদারক ধ্বনি তাদেরকে স্বাগতম জানায়। সেনানায়কদের গরম গরম কথা ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাণী তাদেরকে বিদায় সম্বর্ধনা জানায়। জাতীয় পতাকা হেলিয়ে দুলিয়ে তাদের রোষাণলে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়। তাদের কাছ থেকে দেশপ্রেম ও দেশ অর্চনার শপথ গ্রহণ করা হয়। তাদেরকে অতীত কালের জাতীয় বীরদের বীরত্বগাঁথা একে একে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। আর এই সব জিনিসই তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাষাণ, নির্দয় ও পাশব চরিত্রের অধিকারী করে তোলে। এমতাবস্থায় যখন তারা কোন শহরের উপর আক্রমণ চালায় তখন সেটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।

কিন্তু ইসলামী বাহিনীর অবস্থা ছিল সমগ্র বিশ্বের সেনাবাহিনী থেকে ভিন্ন। তাঁদের সামরিক ব্যবস্থাপনার সাথে অন্য সব ব্যবস্থাপনার বিশেষ কোন মিল ছিল না। বিউগল ও ঢোল তবলার ধ্বনি কিংবা অনলবর্ষী বক্তৃতা না তাদের উত্তেজিত করে তুলতো, আর না দেশমাতৃকার উপাসনামূলক গান তাদেরকে শোনানো হত। না তাদেরকে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হত, আর না আরবের কথা–আরবের প্রাচীন বীরত্বগাথা গেয়ে তাঁদের রক্তকে উষ্ণ করে তোলা হত।

তাঁরা ন্যায় ও সত্যের প্রেমে মজে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে গাত্রোত্থান করেছিলেন এবং বংশগত ও ভৌগলিক জাতীয়তার অগণিত রাষ্ট্রীয় ও বংশগত লক্ষ্যসমূহের স্থলে শুধুমাত্র একটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্যকেই সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছিলেন।

لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا .

"যাতে আল্লাহ্‌র কথাই হয় সর্বোপরি।"

তাঁরা শুধুমাত্র একটি চারিত্রিক কর্মপন্থা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। আর তা হলো–

اُغْزُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُغْزُوْا وَلَا تَغُلُّوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تُمَثِّلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا (صحيح مسلم)

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا (صحيح مسلم)

"তোমরা আল্লাহ্‌র পথে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে লড়বে। খিয়ানত করবে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, কারো হাত-পা-নাক-কান কাটবে না এবং শিশুদের হত্যা করবে না (মুসলিম)।"

'কাজকে সহজ করে দাও, কঠিন করো না, মানুষকে স্বস্তি দাও, বিজিতদেরকে শংকিত ও আতংকিত করে তোলো না।" (মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী–

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ (ابوداؤد كتاب الجهاد)

"আমি তোমাদের দ্বীনকে, তোমাদের আমানতকে এবং তোমাদের ফলাফল ও আমলকে আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করে তোমাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য বিদায় জানাচ্ছি" (আবু দাঊদ ঃ কিতাবুল জিহাদ)।

اِنطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله! لاتقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولاصغيرًا ولا امرأة ولاتغلوا وضمّوا غنائمكم واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين .

"আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আল্লাহ্‌র জন্য এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুগত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাও। বৃদ্ধ, শিশু, অল্প বয়স্ক কিশোর-কিশোরী এবং স্ত্রীলোকদেরকে কখনো হত্যা করো না। খিয়ানত করো না। সকলে সমবেতভাবে মালে গনীমত একত্রিত করো। মানুষের সাথে পুণ্য আচরণ করো, সৎকর্ম করো, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।" (আবু দাঊদ ঃ কিতাবুল জিহাদ)

প্রধান সেনাপতির আনুগত্যের লক্ষ্য

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত নির্দেশাবলী নিজেদের ভেতরে নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক শক্তি রাখে। কিন্তু প্রধান সেনাপতির নির্দেশাবলীর আনুগত্য ঐ শক্তিকে আরো বেশী বাড়িয়ে দেয়। তাই প্রধান সেনাপতির আনুগত্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। এই আনুগত্যের উদ্দেশ্য সেনানায়কের প্রভাব ও পরাক্রমকে কায়েম ও বহাল রাখা ছিল না, বরং এর উদ্দেশ্য ছিল ঐ ফিত্‌না-ফাসাদের মূলোচ্ছেদ, যা সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সাধারণত: আল্লাহ্‌র যমীনে বিস্তার লাভ করে থাকে।

ومن غزا فخرًا اورياءً وسمعة وعصى الامام وافسد فى الارض فانه لم يرجع بالكفاف (ابو داؤد ، كتاب الجهاد)

"যে ব্যক্তি দর্প করার জন্য কিংবা সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জনের জন্য লড়বে, ইমামের (অধিনায়কের) অবাধ্য হবে

এবং যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে সে জিহাদের সওয়াব থেকে খালি হাতে ঘরে ফিরে আসবে" (আবু দাউদ ঃ কিতাবুল জিহাদ)।

শুধু পুণ্যের ক্ষেত্রে আনুগত্য

এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, যখন কোন অধিনায়ক শুধুমাত্র নিজের ক্ষমতা প্রকাশের জন্য মুজাহিদদেরকে কোন নির্দেশ দিয়েছেন তখন বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য তার বিরোধীতা করেছে। আর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এই খবর পৌঁছেছে তখন তিনি তাঁদের ঐ আচরণকে ন্যায় ও সঠিক আখ্যা দিয়েছেন।

একদা জনৈক অধিনায়ক আগুন প্রজ্বলিত করেন এবং সেনাবাহিনীকে তার মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। তখন বাহিনীর এক অংশ সে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে চাইলো। কিন্তু অন্যরা তা অস্বীকার করলো এবং বললো, আমরা তো আগুন থেকেই পালিয়ে এখানে এসেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন, "যদি ঐ সব লোক ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মধ্যে পা রাখত তাহলে তারা সর্বদা আগুনের (জাহান্নামের) মধ্যেই থাকত। আনুগত্য গুনাহের কাজের মধ্যে নয়, বরং শুধুমাত্র পুণ্যকাজের মধ্যে" (আবু দাউদ ঃ কিতাবুল জিহাদ)

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ .

"আল্লাহ্র না-ফরমানী করে বান্দার আনুগত্য করতে নেই।"

আরবের পারিপার্শ্বিকতা

এই সব চারিত্রিক নির্দেশ এবং নৈতিক আনুগত্য যদিও প্রত্যেকটি মুজাহিদের জীবনাদর্শে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু যে জাতি আরবের জাহিলিয়া যুগের পাশবিক পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছিল এবং পরবর্তী যুগে যারা আরব ভূমিতে নিজেদের অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল এবং চতুর্দিকের হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার মধ্যেও কোন সহায়সম্পদ ছাড়াই রাতদিন সত্যের সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তারা কি করে অল্প সময়ের মধ্যে এত যোগ্য, এত বিজ্ঞ ও এত সভ্য হয়ে গেল, তা নিশ্চয়ই ভাববার বিষয়। দু:খের বিষয় এই যে, তাদের এই যোগ্যতা, বিজ্ঞতা এবং সভ্যতা ও ভব্যতার কথা স্বীকার না করে বরং তাদের সমালোচনা করা হয়। ইসলামের আবির্ভাবের অনেক পরে কোন কোন মুসলিম রাজা-বাদ্শার আমলে যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যাচার-নিপীড়নের দু'একটি ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। কিন্তু যে, নুবুওয়াত-আমল ও খিলাফতে রাশিদার আমল আরবের পাশবিক পারিপার্শ্বিকতাকে পরিবর্তন করে এক সত্যিকার মানবিক পারিপার্শ্বিকতা প্রতিষ্ঠা করেছিল সে নুবুওয়াত ও খিলাফত আমল যেসব রকমের অমানবিক ও কলুষতাপূর্ণ কাজকর্ম থেকে পবিত্র ছিল, তা আজ অমুসলিম ঐতিহাসিক এবং সমাজবিদ্রাও একবাক্যে স্বীকার করছেন।

উত্তম আদর্শ

এক যুদ্ধে কোন এক স্ত্রীলোকের লাশ পাওয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাধারণভাবে স্ত্রীলোক ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন (আবু দাউদ)। কোন একটি যুদ্ধ সফরে যখন সাহাবীগণ ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তখন তাঁরা এদিক সেদিক থেকে কয়েকটি বকরী লুণ্ঠন করে নিয়ে এলেন এবং যবাহ্ করে সেগুলোর গোশত্ ডেকচিতে চড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এই সংবাদ পান তখন বর্শা দ্বারা ডেকচিগুলো উল্টিয়ে দেন এবং বলেন, "লুণ্ঠনকৃত মাল মৃত পশুপাখীর চাইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠ (হালাল) নয়।" (আবু দাউদ)

সেনাবাহিনীর জন্য এই বিশেষ নির্দেশ ছিল যে, যদি রাস্তায় কোন দুগ্ধবতী পশু পাওয়া যায় তাহলে সেটাকে দোহন করার কোন অনুমতি নেই। কিন্তু কেউ যদি চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে পতিত হয় এবং ঐ পশুর মালিক

সেখানে হাযির থাকে তাহলে তার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় তিন বার এজন্য উচ্চস্বরে আওয়াজ দিতে হবে (আবু দাউদ ঃ কিতাবুল জিহাদ)।

টীকা ঃ

১। লেছার হচ্ছে বেলজিয়ামের একটি শহর। জার্মান সীমান্ত থেকে এর দূরত্ব ব্রাসেল্‌সের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মাত্র দশ মাইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতার কোন পরোয়া না করে এর উপর হামলা চালায়। কেননা, বেলজিয়াম হয়ে ফ্রান্সের উপর হামলা জালানো সহজ ছিল। লেছারের উপর আক্রমণ চালানো হয় আগষ্ট ৫, ইং ১৯১৪ সনে। মাত্র দশ দিনের মধ্যে এই শহরের শেষ দুর্গটিও জার্মানদের হস্তগত হয়। এই প্রবন্ধ প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালেই লেখা হয়েছিল।

২। নামূর হচ্ছে বেলজিয়ামেরই একটি শহর। এটা ব্রাসেলস থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। লেছারের পর জার্মানরা এই শহরের উপর হামলা চালায় এবং ঠিক দশ দিনের মাথায় তা দখল করে ফেলে।

ইসলামী সেনাবাহিনীর বিজয় বন্যা-২

যুদ্ধের সংস্কারকমূলক কর্মকান্ড

সৈন্যের স্বল্পতার মধ্যে একটি উপকারিতা

উল্লেখিত নির্দেশাবলী বাধা-নিষেধ ছাড়াও মুসলিম বাহিনীর মুজাহিদদের কর্মোদ্দীপনার আরো কারণ ছিল। রাজ্য বিজয়ের জন্য যেসব বাহিনী প্রেরণ করা হয় তাদের সংখ্যা সাধারণত: অনেক বেশী থাকে। তারা পঙ্গপালের মত চারদিকে এত ব্যাপক ও বিস্তৃত আকারে অগ্রসর হতে থাকে যে, তাদের খন্ড বাহিনীর তত্ত্বাবধান করা সম্পূর্ণ অবম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু ইসলামী বাহিনীর অবস্থা ছিল এর ঠিক বিপরীত। ন্যায়ের জন্য আদেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ, সালাত কায়েম করা এবং যাকাত দানের জন্য তাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল। একারণে তাঁদের রূহানী (আধ্যাত্মিক) পাল্লা যতভারী ছিল, তাঁদের মাদ্দিয়াতের (জড় জীবনের) ওজন ছিল তত হাল্কা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর যুদ্ধে মুজাহিদদের এই সংখ্যা স্বল্পতা দেখে আল্লাহ্র গায়রাত ও রাহমাতকে উজ্জীবিত করতে গিয়ে এই আক্ষেপজনক শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিলেন–

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَاءُ لَاتُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ (مسلم جلد ٢ ص ٦٥)

"হে প্রভু! তুমি কি এই চাও যে, পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার এই কয়েকটি মাত্র লোক অবশিষ্ট না থাকুক।"

বদর যুদ্ধে মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল শুধু তিন'শ তের। ইসলামী বাহিনীর সবচেয়ে বড় সমাবেশ হয়েছিল মক্কা বিজয়কালে।[১] কিন্তু তাদের সংখ্যাও দশ হাজারের বেশী ছিল না (মুসলিম)। অতএব সংখ্যাল্পতার কারণে একটি সীমিত বাহিনীর চারিত্রিক নিয়ন্ত্রণ তথা দেখাশুনা অপেক্ষাকৃত সহজেই করা যেতে পারে।

লুটপাটের নিষিদ্ধতা

সেনাবাহিনীর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত থাকে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে যায়–গন্তব্য স্থানে পৌঁছার পর ঠিক সেরূপ বিশৃঙ্খল ও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে। আর এই অবস্থা তখনই হয় যখন তারা খাওয়া দাওয়া করে এবং এদিক সেদিক স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করে। সেনাবাহিনী এই অবস্থায়ই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জুলুম, বাড়াবাড়ি ও লুটপাট করে থাকে। কোন একটি যুদ্ধে মুজাহিদরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং লুটপাট করতে চায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তা জানতে পারেন তখন বলেন,

مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا اَوْقَطَعَ طَرِيْقًا فَلَاجِهَادَلَهُ (بخارى جزء ٥ ص ١٤٦)

"যে ব্যক্তি মানযিল (অবতরণ ক্ষেত্র) ঘিরে ফেলেছে, (অন্যের জন্য জায়গা রাখেনি) এবং ডাকাতি করেছে তার জিহাদ জিহাদ নয়" (বুখারী)।

এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ার নিষিদ্ধতা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেনা বাহিনীকে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়তে নিষেধ করেছেন এই বলে যে–

ان تفرقكم فى هذه الشعاب والاودية انما ذالكم الشيطان .

"এই সব ঘাঁটি ও টিলা সমূহের মধ্যে তোমাদের ছড়িয়ে পড়াটা শয়তানী কাজ ছাড়া কিছু নয়।"

শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণের প্রতিচ্ছবি

এরপর বাহিনীর শৃঙ্খলা ও বিন্যাসের মধ্যে যে উন্নতি সাধিত হয় তা এই রিওয়াতের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

فلم ينزل بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض حتى يقال ثوبت عليهم ثوب لعمهم (ابوداؤد)

"এরপর যখন তিনি (সা) কোথাও অবতরণ করতেন তখন মুজাহিদদের একে অন্যের সাথে এভাবে একত্রে মিলেমিশে থাকতেন যে, যদি তাঁদের উপর একটি চাদর প্রলম্বিত করে দেওয়া হত তাহলে তারা সবাই তার নীচে এসে যেতেন" (আবু দাঊদ)।

বিশ্ব আজ নিয়ম-শৃঙ্খলা ও কায়দা-কানূনের ক্ষেত্রে এতই উন্নতি করেছে যে, তৎকালীন নিয়ম শৃঙ্খলাকে আজ বাহ্যত: বিশৃঙ্খলা বলেই মনে হয়। কিন্তু আজও কি এমন একটি সুশৃঙ্খল সুউন্নত সেনাবাহিনী বের করা যাবে, যারা বিজয় লাভের অবস্থায়ই এই পরিমাণ সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত থাকে যে, তাদের অধিনায়কদের আদেশ ছাড়া আপন অবস্থানস্থল থেকে মোটেই এদিক সেদিক হয় না।

ইসলামের নিযাম ও চারিত্রিক সজীবতা

কিন্তু এই সতর্কবাণীর সাথে অন্যএক শক্তিও ছিল, যা ইসলামী বাহিনীকে ভারসাম্য ও সঠিক পথ থেকে সামনে অগ্রসর হতে দেয়নি। ইসলাম কোন জবরদস্তিমূলক আইন কিংবা ক্ষমতা-নির্ভর আহ্কামের সমাহার নয়। এর নিযামে তালীম সামগ্রিকভাবে আখলাকী রূহ তথা চারিত্রিক সজীবতায় পূর্ণ। যেসব আহ্কামকে আমরা ইসলামের সহজ সরল কানূন (আইন) বলে থাকি, সেটাও চারিত্রিক রংয়ের মিশ্রণ থেকে খালি নয়। একারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামী মুজাহিদ বাহিনীকে শুধুমাত্র চারিত্রিক শক্তি দ্বারাই এইসব হুকুমের মান্যকারী করতে চাইতেন। জিহাদের সফরে যখন কোথাও একটি ছোট্ট নসীহত করার সুযোগ আসত তিনি সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে মুজাহিদদেরকে স্নেহ, ভালবাসা, নম্রতা এবং দয়া ও করুণার শিক্ষা দিতেন।

বাস্তব উদাহরণ

একটি জিহাদের সফরে জনৈক সাহাবী কোন পাখীর দু'টি ছানা ধরে নিয়ে আসেন। পাখীটি যখন তার ছানাদের এই অবস্থা দেখল তখন সে স্নেহের আতিশয্যে আপন ছানাদের মাথার উপর চক্কর কাটতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি বলেন, কে এই পাখীর অন্তরটি দুঃখভারাক্রান্ত করে তুলেছে? এর ছানাদের ছেড়ে দাও। এরপর অন্যদিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি দেখতে পান, কে একজন মাঠের ভিতর পিপড়ার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, এই পিপড়াদের বাসাটি কে জ্বালিয়েছে? সাহাবা কিরাম নিবেদন করলেন, কোন বিশেষ লোক এটা করে নি। আমরা সবাই মিলে এটাকে ধ্বংস করে ফেলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আগুনের শাস্তি শুধুমাত্র আল্লাহ্ই দিতে পারেন।[২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যক্তিগত কর্মপদ্ধতি ছিল এর চাইতেও অধিক প্রভাবসম্পন্ন। য়াহূদীরা তাঁকে বিষ দিয়েছিল, কিন্তু তিনি এর কোন বদলা নেন নি। জনৈক কাফির ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর উপর আক্রমণ করতে চেয়েছিল। তিনি তখন জেগে যান। ফলে তার হামলা ব্যর্থ হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি এজন্য তাকে কোন শাস্তি দেননি।

হিদায়াতকারীর জন্য কর্মপন্থা

একেবারে বিপন্ন অবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ দিয়ে প্রতিশোধমূলক কোন বাক্য বের হয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা সেজন্যও তাঁকে সতর্ক করে দিতেন। উহুদ যুদ্ধে যখন তাঁর পবিত্র চেহারার উপর পাথরের আঘাত লেগেছিল এবং তাতে তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয়ে গিয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন–

كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ .

"সেই জাতি কেমন করে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে, যারা তাদের নবীকেই আহত করে ফেলেছে।"

এর সতর্কবাণী হিসাবে তাঁর উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।"– ৩

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْيُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ .

"তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন–এই বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই, কারণ তারা জালিম।"–(৩ ঃ ১২৮)

উপেক্ষার উপর কঠোর সতর্কবাণী

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সাথে শরীক থাকতেন, উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে তাতে মুজাহিদরা কোন অবস্থায়ই সদাচার ও মানবাধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারতেন না। যেসব যুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব কোন অধিনায়কের হাতে ন্যস্ত থাকত, সেসব যুদ্ধেও মুজাহিদরা চারিত্রিক আইন-কানূন লংঘন করতেন না। একদা রাসূলুল্লাহ্ আছআম গোত্রের প্রতি একটি বাহিনী পাঠিয়ে ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠল তখন কয়েকজন লোক নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য কিংবা একারণে যে, তারা সত্যিকার মুসলমান ছিল, সিজদায় পড়ে যায়। তখন সমগ্র বাহিনী ওদের দিকে অগ্রসর হয় এবং সিজদাবনত অবস্থায় তাদেরকে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে যখন এ সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন তিনি তাদের অর্ধেক 'দিয়াত' (রক্তমূল্য) প্রদানের ব্যবস্থা করেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'হাবাকাত' গোত্রের প্রতি একটি লোককে পাঠিয়েছিলেন। সৈন্যরা আক্রমণ চালিয়ে একটি লোককে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল.... সে তখন কালিমা-ই-আওহীদ পড়তে শুরু করে। কিন্তু মুজাহিদদের তরবারি তাকে রেহাই দেয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এই খবর জানতে পারেন তখন বলেন, কিয়ামতের দিন এই খুনের যিম্মাদার কে হবে? উসামা বিন যায়দ (রা) বলেন, সে সত্যিকার অর্থে মুসলমান হয়নি, শুধুমাত্র প্রাণ বাঁচানোর জন্য কালিমা উচ্চারণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন রাগতস্বরে বলেন, তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে?

বাহিনী-অধিনায়কদের কর্মপদ্ধতি

মুসলিম বাহিনীর অধিনায়করাও ঐ নীতি কঠোরভাবে পালন করতেন। একারণে তাঁরা সেনাবাহিনীর মামুলী ধরণের পাশবিক আচরণকেও সহ্য করতে পারতেন না। একদল সেনাবাহিনী আবদুর রহমান বিন সামুরার নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিল। মালে গনীমত হিসাবে যখন একটি হাতী তাদের হস্তগত হল তখন প্রত্যেকটি লোক সেটাকে নিজেরই কবজায় নিয়ে যেতে চাইল। আবদুর রমহান (রা) এই অবস্থা দেখে সকলকে সম্বোধন করে একটি বক্তৃতা

দান করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ধরণের ডাকাতি থেকে নিষেধ করেছেন। অতএব সবাই মালে গনীমত একত্রিত করে সবার মধ্যে তা সমানভাবে ভাগ করে নেন।[৪]

ইসলামের সমষ্টিগত রূপের মূলনীতি

সাহাবীদের মধ্যে কোন কোন মান্যবর ব্যক্তি এমন ছিলেন, যারা খোদ আমীর বা অধিনায়কদের আপত্তিকর কাজের সমালোচনা করতেও মোটেই দ্বিধাবোধ করতেন না। আর ইসলামের সমষ্টিগত রূপের মূল নীতিই হচ্ছে এই আমর বিল মারূফ বা সত্যের আদেশ। একদা আবদুর রহমান বিন খালিদ বিন ওয়ালীদ চারজন কাফিরকে হাত পা বেঁধে হত্যা করেছিলেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা)-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ধরণের পাশবিক হত্যাকান্ড থেকে নিষেধ করেছেন। অতএব আবদুর রহমান বিন খালিদ ঐ চার ব্যক্তির পরিবর্তে চারটি ক্রীতদাসকে মুক্তি দান করেন।[৫]

চারিত্রিক প্রকৃষ্টতা

উপরোক্ত নিয়মনীতি মুসলমানদেরকে এতই চরিত্রবান, বিশ্বস্ত ও পবিত্র স্বভাবের করে তুলেছিল যে, এর সত্যতা বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়। হযরত মিকদাদ (রা) একদা প্রকৃতির ডাকে বাইরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখতে পান যে, একটি ইঁদুর গর্ত থেকে স্বর্ণমুদ্রা বের করে এনে বাইরে রাখছে। এভাবে সে ক্রমান্বয়ে আঠারোটি আশারাফী বের করে আনল। হযরত মিকদাদ (রা) সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আশারাফীগুলো মিকদাদ (রা)-এর হাতে অর্পণ করে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার এই মালে বরকত দিন।[৬]

একদা হযরত সুভায়দ, হযরত যায়দ বিন সুহান এবং হযরত সুলায়মান বিন রাবী'আ জিহাদের উদ্দেশ্যে একসংগে রওয়ানা হন। রাস্তার মধ্যে একটি কড়ি পড়েছিল। সুভায়দ (রা) তা উঠিয়ে নেন। তখন উভয় সাথীই তাঁকে বাধা দেন। কিন্তু তিনি বলেন, আমি এটাকে তার মালিকের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করবো। যদি সফল না হই তাহলে স্বয়ং এ থেকে উপকৃত হব। জিহাদ থেকে ফেরার পর তিনি হজ্জ করতে যান। হজ্জ সম্পাদন করে মদীনায় আসেন এবং হযরত উবাই বিন কা'ব (রা)-এর কাছে এই কড়ির ঘটনাটি বর্ণনা করেন। হযরত উবাই (রা) তখন বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে একবার এক শ দীনার পেয়েছিলাম। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এলাম তখন তিনি বললেন, এর মালিককে তালাশ কর। আমি তিন চার বছর পর্যন্ত খুঁজলাম, কিন্তু তার কোন সন্ধান পেলাম না। এরপর আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, দীনারগুলো গুণে নিয়ে থলে-সমেত রেখে দাও। যদি মালিক আসে তাহলে তাকে দিয়ে দেবে, অন্যথায় তা তোমার নিজের কাজে আসবে।[৭]

প্রাচীন সভ্যতার কীর্তিসমূহ

প্রাচীন, আধুনিক-উভয় সভ্যতার দৃশ্যই আপনাদের সামনে রয়েছে। রোম ও ইরান যুগের চাইতে প্রাচীন সভ্যতার যুগ আর কী হতে পারে? সিরিয়া, ইরান এবং কার্থেজে রোমান সভ্যতা কী জাঁকজমকের সাথে প্রবেশ করেছিল, তা আপনারা দেখেছেন। আলেকজান্ডার ইরানের অলিগলি পুড়িয়ে দিয়েছিল। ইরানীরা বাবিলে প্রবেশ করে যেভাবে রক্ত বন্যা বইয়েছিল, যেভাবে লাশের স্তূপ রচনা করেছিল এবং ইমারতসমূহ ভেংগে চুরমার করে যেভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল তা বিশ্ববাসীর অজানা নয়। টারীটাইসের বিজয়ী বাহিনী যখন জেরুজালেমে

প্রবেশ করেছিল তখন তারা যেন মানুষ ছিল না-ছিল এক একটা জ্যান্ত জংলী পশু এবং হা করা একটা ভয়ংকর অজগর, যারা সমগ্র বসতির একটি প্রান্তও তাদের হিংস্র আক্রমণ থেকে বাদ দেয়নি। পবিত্র কুরআনের ভাষায়-

فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ط

"ওরা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সব ধ্বংস করেছিল।"-(১৭ঃ৫)

আধুনিক সভ্যতার বৃহৎ পরিবার

ওরা ছিল প্রাচীন সভ্যতার সব চাইতে শ্রেষ্ঠ সন্তান। কিন্তু আজ ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার সর্ববৃহৎ পরিবারটিও আমাদের সামনে রয়েছে। আসল বিষয় কি, আমরা বলতে পারব না। স্বয়ং ইউরোপ আমাদের কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, বেলজিয়াম বিজেতারা যখন সেখানকার বসতিসমূহের উপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয় তখন লোভাইনের বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়,[৮] র‍্যামসের পবিত্র উপাসনালয়টি ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়[৯], এবং ব্রাসেলস ও এন্টোরাপের অধিবাসীরা যারপর নেই আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠে।[১০] যে পাশবিক কাহিনী ইরানের ধ্বংসাবশেষ, বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রাচীর সমূহ, কার্থেজের ধ্বংসস্তূপ এবং বাবিলের লয়প্রাপ্ত কীর্তিসমূহ ইতিপূর্বে আমাদের শুনাত, আজ কয়েক হাজার বছর পর কান পাতলে আমরা অবিকল সেই কাহিনীই বেলজিয়ামের কাছ থেকে শুনতে পারি।

যুদ্ধের সুদৃঢ় ও চিরন্তন তত্ব

যুদ্ধের সুদৃঢ় ও চিরন্তন তত্বের দিকে ইংগিত করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً ج وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ

"রাজা-বাদশাহ্‌রা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন ওকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে; এরাও এরূপই করবে।"-(২৭ঃ৩৪)

মুসলমানদের অবস্থা

আপনারা সমগ্র প্রাচীন জাতিসমূহের বিজিত দেশসমূহে প্রবেশের যে দৃশ্য অবলোকন করেছেন এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির দাবীদার বিশ্বের সর্ববৃহৎ জাতি (জার্মান) সম্পর্কে যা কিছু আপনাদের শোনানো হয়েছে, তা তো আপনাদের সামনেই রয়েছে। এবার আসুন, আমরা দেখি, সেই জাতির অবস্থা কি, যারা আজ বিশ্বের বিজিত ও পরাধীন দেশসমূহে বসবাস করছে। এমন একদিন ছিল, যখন জলস্থলের বিরাট বিরাট অংশে তাদের জয়ের বাঁধভাঙ্গা বন্যা প্রবাহিত হত। (লেখক এখানে বিশ্ব মুসলিমের বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের অবস্থা বর্ণনা করেছেন-অনুবাদক)।

টীকা ঃ

১। এর অর্থ এই যে, মক্কা বিজয়কালীন সমাবেশই ছিল সবচাইতে বৃহৎ। আর আরব ভূখন্ড এত বড় একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি। পরবর্তীকালে তাবূক যুদ্ধের জন্য ত্রিশ হাজার মুজাহিদ তৈরী হয়েছিল। তবে ইসলামী বাহিনী তাদের প্রতিপক্ষের অনুপাতে সব সময় সাধারণত: কমই ছিল। কাদিসিয়া ও নেহাবন্দই শুধু নয়; স্পেন ও হিন্দুস্তান বিজয়কালেও মুসলমানদের এই একই অবস্থা ছিল।

২। আবূ দাউদ ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ কিতাবুল জিহাদ। এখানে বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, পিঁপড়াদের ঘর কেউ জেনে শুনে জ্বালিয়ে দেয়নি। বরং খাবার রান্না করার জন্য একটি জায়গায় চুলা তৈরী করা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সেখানে পিঁপড়াদের একটি বাসা বেরিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ প্রদানের সাথে সাথে সেখানে থেকে চুলা সরিয়ে ফেলা হয়।

৩। এই আয়াতের টীকার মাওলানা বলেছেন, এখানে পরোক্ষভাবে একথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জালিম ও কাফিরদের কুকর্ম যতই কঠোর হোক না কেন, একজন হিদায়াতকারী ও সংস্কারককে না তাদের হিদায়াত থেকে নিরাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়, আর না তাদের জন্য দয়া ও করুণা ভিক্ষা ছাড়া অন্য কিছু করা উচিত (তরজমান ঃ ১ম খন্ড)

৪। আবূ দাউদ ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা-৩৫৪ ঃ কিতাবুল জিহাদ।

৫। আবূ দাউদ ঃ তৃতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা)–১৩ ঃ কিতাবুল জিহাদ।

৬। আবূ দাউদ ঃতৃতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা–১০ ঃ কিতাবুল জিহাদ।

৭। সহীহ্ মুসলিম ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা–৫৯ ঃ কিতাবুল লুকতাহ্।

৮। LOVAIN হচ্ছে বেলজিয়ামের একটি শহর। ইং ১৪৩৩ সনে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীটি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ইং ১৯১৪ সনে জার্মানরা তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে সকল বইপুস্তক পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। আমেরিকার সাহায্যে এরপর লাইব্রেরীটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে–যদিও পুড়ে যাওয়া অনেক অতুলনীয় গ্রন্থ ও পান্ডুলিপি কোথাও পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও এই শহরটিকে পুনরায় ধ্বংস করা হয় এবং পরবর্তীকালে নির্মিত লাইব্রেরীটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভীষণভাবে।

৯। REIMS হচ্ছে ফ্রান্সের একটি বিখ্যাত শহর। ঐ শহরের প্রসিদ্ধ গির্জার নির্মাণকাজ শেষ হয় ইং ১৪২৮ সালে এবং ইং ১৯১৪ সালে জার্মানরা গোলার আঘাতে সেটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

১০। ব্রাসেলস হচ্ছে বেলজিয়ামের রাজধানী এবং এন্টোরাপ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর।

হজ্জ

হজ্জের দিন প্রসংগে

রোগের চিকিৎসা

দুনিয়ার রোগসমূহ সর্বদা একই রকমের ছিল। অতএব সেগুলোর চিকিৎসাও মুলত: একই রকমের হওয়া চাই। যখনই কোন রোগের প্রার্দুভাব হয়েছে তখন সে রোগ নিরাময়ের জন্য যে জিনিসের সন্ধান করা হয়েছে, আজো আমরা সে জিনিসেরই সন্ধান করবো। জিনিস মূলত: একই, যা বরাবর সন্ধান করা হয়েছে। আমরা আজ তা-ই সন্ধান করবো।

হযরত নূহ্ (আ)

আজ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে এই ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহ্রই এক অতি একনিষ্ঠ বান্দা তাঁকে (আল্লাহ্কে) অতি আর্তস্বরে আহবান জানিয়ে বলেছিলেন ঃ

رَبِّ إِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلاً وَّنَهَارًا . فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِىْ إِلاَّ فِرَارًا . وَإِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا أَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوْا اسْتِكْبَارًا . ثُمَّ إِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا . ثُمَّ إِنِّىْ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا .

"হে আমার প্রতিপালক, আমি তো আমার সম্প্রদায়কে রাতদিন আহবান করছি, কিন্তু আমার আহবান ওদের পলায়ন-প্রবণবতাই বৃদ্ধি করেছে। আমি যখনই ওদেরকে আহবান করি যাতে তুমি ওদেরকে ক্ষমা কর, ওরা কানে আংগুলি দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদেরকে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অত:পর আমি ওদেরকে আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে পরে আমি সোচ্চার প্রচার করেছি।"-(৭১ ঃ৫-৯)

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗ إِلاَّ خَسَارًا .

"নূহ বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রাদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের, যার ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।-(৭১ ঃ২১)

সুতরাং তিনিও তাঁর সম্প্রাদায়কে এই একই বস্তু সন্ধানের কথা বলেছিলেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)

যখন কাল্ডার দেবালয়ে একজন সম্মানিত যুবক সৎকার্যের নির্দেশ ও অসৎ কার্যে নিষেধের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যখন তিনি তাঁর হাতে ছুরি তুলে নিয়েছিলেন এবং আপন প্রিয় সন্তানকে আল্লাহ্ প্রেমের মত্ততায় একজন কট্টর শত্রুর মত যমীনের উপর আছড়ে ফেলেছিলেন, যখন তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে গিয়ে আপন সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ্র দ্বীন অনুসরণ করার ওসীয়ত করেছিলেন তখন বলেছিলেন–

يٰبَنِىَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ .

"হে পুত্রগণ! আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে (ইসলামকে) মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যু বরণ করো না।"–(২ ঃ১৩২)

তাহলে তিনিও (ইবরাহীমও) ঐ বস্তুর সন্ধান করেছিলেন এবং পেয়েছিলেন।

হযরত ইউসূফ (আ)

ফিরআওনী সাম্রাজ্যের অধীনস্থ একটি কারাগারে কিনআনের বন্দী আল্লাহ্‌র দ্বীনের ওয়ায করেছিলেন এবং যখন তিনি তার সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاءُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ .

" হে কারা সংগীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতকগুলো নামের ইবাদত করছ, যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ, এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্‌ পাঠান নি। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন–অন্য কারো ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত; এটাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।" –(১২ ঃ৩৯-৪০)

অতএব তার দৃষ্টিও ঐ দিকেই ছিল এবং তিনি ঐ জিনিসেরই খোঁজে ছিলেন, যে জিনিসের সন্ধান তিনি তাদেরকে দিচ্ছিলেন।

হযরত মূসা (আ)

'তুওয়া' উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বের পবিত্রভূমি ("شاطى الوادى" "البقعة المباركة" "الايمن")-এ মহান রাখাল যখন সিনাই পাহাড়ের পার্শ্ব থেকে– اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ –(আমিই আল্লাহ্‌, জগত সমূহের প্রতিপালক)-এই প্রিয় বাণী দ্বারা সম্বোধিত হলেন, এবং যখন তিনি একটি জালিম ও অত্যাচারী সাম্রাজ্যের দাসত্ব থেকে মজলুম একদল মানুষকে মুক্ত করার জন্য সে সাম্রাজ্যের সর্বাধিনায়কের সামনে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে একা দাঁড়িয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন–

رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ .

"আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত, কে তাঁর নিকট হতে পথনির্দেশ এনেছে এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। জালিমরা সফলকাম হবে না।"–(২৮ঃ৩৭)

–তখন তিনিও ঐ জিনিসেরই সন্ধান ঘোষণা করছিলেন এবং সেটা ছিল ঐ সন্ধান,যা তাঁকে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।

হযরত ঈসা (আ)

'নাসিরাহ'–এর অধিবাসী সেই ইসরাঈলী যুবক, যিনি পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঈসরাঈলী যুগের পরিসমাপ্তি ও ঈসমাঈলী প্রারম্ভের কথা ঘোষণা প্রদানের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন।[২] এবং যখন তিনি আপন

যাত্রা শুরু করার পূর্বে একটি উদ্যান প্রান্তে আপন অজ্ঞ ও নির্বোধ সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন–

يَبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ م بَعْدِىْ اسْمُهُ اَحْمَدُ ط

"হে বনী ইরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে 'আহ্‌মদ' নামে যে রাসূল আসবে আমি তাঁর সুসংবাদ দাতা।"–(৬১ঃ৬)

–তাও ছিল এই সন্ধানী উপত্যকার একটি সফল পদাচারণা এবং এটাই ছিল সেই মূল্যবান মুক্তা যার সন্ধানে তাঁর বুদ্ধিহীন সঙ্গীরা ব্যাকুল হয়ে উঠুক, তা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)

এরপর আবির্ভূত হন আল্লাহ্‌র বিরাট নি'মাতের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, কিতাব (কুরআন) ও হিকমাতের ((প্রজ্ঞার) শিক্ষক, মানব জাতির আত্মাকে পবিত্রকারী, সরল সহজ পথের দিশারী 'তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত'–এই সম্বোধনে সম্বোধিত মহান ব্যক্তিসত্তা, যার আগমন কামনা করে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) হিজাযের প্রান্তরে তাদের মহান প্রভু আল্লাহকে সম্বোধন করে বিনীত আবেদন জানিয়েছেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

"হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে তাদের কাছে এক রাসূল প্রেরণ করো, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের কাছে আবৃত্তি করবে; তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"–(২ ঃ১২৯)

মোটকথা, যখন সেই প্রতিশ্রুত আগমনকারী এলেন এবং আল্লাহ্‌র চিরন্তন হুকূমত ও জালালের (পরিক্রমের) সিংহাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যমীনকে শেষবারের মত বিন্যস্ত ও সজ্জিত করা হলো এবং এই বলে আল্লাহ্‌র শেষ ফরমান ঘোষণা করা হলো–

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَالاِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ م وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ .

"কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত (৩ ঃ ৮৫)।"–তখন তিনিও (প্রতিশ্রুত আমনকারী) ও তারই সন্ধানে বের হন যার সন্ধানে সবাই বেরিয়ে ছিলেন। অবশ্য তিনি (নবী) তাঁর জন্য বিচলিত হওয়ার পূর্বে স্বয়ং তিনিই (আল্লাহ্ই) বিচলিত হয়ে তাঁকে গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। . وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدٰى –"তিনি আপনাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, এরপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।"–(৯৩ ঃ৭)

বিশ্বের অবস্থা

দুনিয়ার আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তার সত্যতার সৌন্দর্য ঝরে পড়েছিল এবং ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল তার হিদায়াতের চেহারা। সেই ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি, যা আদম সন্তানেরা আল্লাহ্‌র সাথে করেছিল–মহান নবীদের সামনে, তাদের পবিত্র পয়গাসমূহ শুনে এবং সেগুলো আবার এক একটি করে ভেংগে ফেলছিল ও বঞ্চিত হচ্ছিলো আল্লাহ্‌র

রহমত ও করুণা থেকে। আল্লাহ্‌র চিরন্তন সৌন্দর্য যাতে সন্ধানকারীদের নাগালের মধ্যে থাকে সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলা আপন সৌন্দর্যের উপর থেকে যেসব পর্দা উঠিয়ে দিয়েছিলেন সেগুলো প্রলম্বিত হয়ে তার সৌন্দর্যকে পুনরায় ঢেকে দিয়েছিল–যার কারণে তাঁর ও তাঁর বান্দাদের মধ্যকার সম্বন্ধ অটুট ছিল না।

হাঁ, দুনিয়াতে কেউ ছিল না, যে তাঁর সন্ধান করে, এমন পা ছিল না, যে তাঁর দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়, এমন চোখ ছিল না, যে তাঁর জন্য অশ্রুসিক্ত হয়, এমন অন্তর ছিল না, যে তাঁর জন্য উদাস হয় এবং এমন আত্মা ছিল না, যে তাঁকে ভালবাসে। মোটকথা, তাঁরই দুনিয়া তাঁর সম্পর্কে অবহিত ছিল না এবং তাঁরই বান্দা তাঁর কোন পরোয়া করত না। প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তর মরে গিয়েছিল, আল্লাহ্‌র ফিতরাতের (প্রকৃতির) সত্যিকার রূপ তার অবাধ্যতা ও আনানুগত্যের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। চুতুর্দিকে ছিল পথভ্রষ্টতা ও বাড়াবাড়ির বন্যা, যা জলেস্থলে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল এবং যার অভ্যন্তরে ভেসে বেড়াচ্ছিলো আল্লাহ্‌র রাসূলদের নির্মিত ইমারতসমূহ। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ ٠

"মানুষের কৃতকর্মের দরুণ সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে।"–(৩০ ৪১)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যখন এই অবস্থা ছিল তখন দুনিয়া বিগড়ে গিয়ে পুনরায় গড়ে উঠে, মনুষ্যত্ব মরে গিয়ে পুনরায় জীবিত হয় এবং আল্লাহ্ তাঁর চেহারা থেকে পুনরায় পর্দা উঠিয়ে নেন। সেই বস্তু,যা সিরিয়ার প্রান্তরসমূহ এবং জেরুজালেমের হায়কালের স্তম্ভসমূহ আটকে রেখেছিল, তা পুনরায় ফিরে এল, যাতে হিজাযের মরুপ্রান্তরকে পুনরায় সোহাগ করতে পারে এবং আপন মুহাব্বত ও প্রেমের রহস্য উদঘাটনের জন্য একটি নতুন জাতি নির্বাচন করতে পারে। ফলে বিশ্ব, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে জিনিসকে ভুলে বসেছিল পুনরায় তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল এবং মানুষ তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে হাতছাড়া করার পর পুনরায় তা ফিরে পেল।

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ٠ يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٠

"আল্লাহ্‌র নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এর দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"–(৫ ঃ১৫-১৬)

মোটকথা, দুনিয়ার হিদায়াত ও কল্যাণের জীবন আগাগোড়া সন্ধান আর সন্ধান ছাড়া কিছু নয়। মানুষ প্রত্যেকটি যুগে এ জিনিসটি হারিয়েছে। এরপর পত্যেকটি যুগে এর সন্ধানে বের হয়েছে। যখন সে কখনো পতিত হয়েছে তখন এটাকে হারিয়েই পতিত হয়েছে, আর যখন কখনো উত্থিত হয়েছে তখন এর সন্ধানেই আড়মোড় দিয়ে উত্থিত হয়েছে। এর হিদায়াত কারীরা যখন কখনো তাকে জাগিয়েছে তখন এই জিনিসের জন্যই জাগিয়েছে। আর যখন কখনো এর হাত ধরেছে তখন এর সন্ধানে বের হওয়ার জন্যই তা করেছে। তার এই সন্ধান সব সময়ই সফল হয়েছে। আর যখন সে কখনো একে আহবান করেছে, সাড়া পেয়েছে। পানি পেতে কখনো দেরী হয়নি, অবশ্য এজন্য তৃষ্ণার প্রমাণ সব সময়ই চাওয়া হয়েছে।

জামাআত

কিন্তু এই বিরাট বিপ্লব, যা মনুষ্যত্বের আকারে ঘটেছিল, যা দুনিয়াকে একদম বদলে দিয়েছিল এবং যে প্রিয় বস্তুটিকে সে ভুলে বসেছিল, তার সন্ধানে আত্মনিবেদিত হয়ে পুনরায় প্রকাশ লাভ করেছিল, তা ছিল কোন্ জিনিসের ফলশ্রুতি?

নিশ্চিতভাবে তা ছিল আল্লাহ্‌র আওয়াজ– কিন্তু তা কাদের ভেতর থেকে উত্থিত হয়েছিল? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তা ছিল আল্লাহ্‌র জামাল ও সৌন্দর্যের প্রকাশ্য একটি দৃশ্য, কিন্তু এই ঔজ্জ্বল্যের রবি কার চেহারার উপর চমকে ছিল? নিশ্চয় তাদের চেহারায়, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط

"তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে।"–(৪৮:২৯)

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা ছিল একটি জামা'আত (দল)। আর বিশ্ব-সংস্কারের ইতিহাসে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেকটি বিপ্লব ও সংস্কারের দাওয়াত, সর্বপ্রথমে একটি জামা'আত বা দল সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ্‌র দাওয়াত যদি একটি বীজ হয় তাহলে তার গাছের প্রথম শাখা হচ্ছে জামা'আত। বিশ্বে যখন কখনো সংস্কারমূলক পরিবর্তন হয়েছে, তখন শুধু শিক্ষা দ্বারা তা হয়নি বরং সেই জামা'আতের কর্ম-প্রচেষ্টার মাধ্যমে হয়েছে, যারা ছিল এই সব শিক্ষার রূপায়ণকারী ও সংরক্ষক। ঐসব আওয়াজ, যা শুধুমাত্র মুখ থেকে উঠে, তা হাওয়ার জমাটবাঁধা পৃষ্ঠের তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু অন্তরসমূহের মধ্যে তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে না। কান তা শুনে, কিন্তু অন্তর সেগুলোর সামনে নত হয় না।

এ কারণেই দুনিয়ায় যখন কখনো ন্যায় ও সত্যের সংস্কারকদের আবির্ভাব ঘটেছে–চাই সে আর্বিভাব নবী ও রাসূলদের হোক, যারা এক্ষেত্রে হচ্ছেন আসল বা মূল, অথবা সে আবির্ভাব তাঁদের অনুসারী ও সংস্কারকদের হোক, যারা তাঁদের অনুসারী ও সংস্কারকদের হোক, যারা হচ্ছেন এক্ষেত্রে শাখা বা ছায়াতুল্য– সর্বদা তাঁদের প্রথম কাজ এই ছিল যে, তাঁরা তাঁদের শিক্ষা ও দাওয়াতের নমুনা একটি জামা'আতের আকারে পেশ করেছেন। এরপর এই ভিত্তি যত মজবুত ও শক্ত হতে পেরেছে ততই দৃঢ়তা পেয়েছে পরবর্তী সংস্কারকর্মসমূহ।

আম্বিয়া কিরামের উদাহরণ

হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে–

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ .

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"–(৬০ :৪)

وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ –যারা তার সংগী ও অনুসারী ছিল,–অর্থাৎ এই সংগীরাই নুবুওয়াতের সংস্কার ও আমানতের এই দাওয়াত বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে-যা যুগে যুগে আম্বিয়া কিরাম দুনিয়ায় নিয়ে আসেন।

হযরত নূহ (আ) যখন নৌকায় আরোহণ করেন তখন সত্তর জন লোক তাঁর সাথে ছিল। হযরত মূসা (আ)-এর সংগী হয়েছিল প্রথমে খোদ বনী ইসরাঈলের-ই সামান্য সংখ্যক লোক। হযরত ঈসা (আ) তাঁর সমগ্র জীবনে বারো জন ব্যক্তি সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ গুলোই ছিল সেই জামা'আত বা দল, যারা লক্ষকোটি অন্তরকে অনুগত করেছিল এবং বিশ্বের বড় বড় অংশকে নিজেদের সংস্কারকর্ম ও দাওয়াতের সামনে অবনত পেয়েছিল।

কেননা, তারা ছিলেন দাওয়াত ও সংস্কারকর্মীর দল, যাদের কাজকর্মের মধ্যে ঐসব শিক্ষার নমুনা ছিল। আর একথা সত্য যে, মুখের ডাক বৃথা যেতে পারে, কিন্তু আমাল বা কাজকর্মের ডাক কখনো বৃথা যেতে পারে না, বরং তার একটা প্রত্যুত্তর অবশ্যই পাওয়া যায়।

দুনিয়ার অন্ধকারে ঔজ্জ্বল্য

বিশ্ব-সংস্কারের এই শেষ আর্বিভাব-যা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে তার পুরাতন নামে (ইসলাম নামে) উপস্থাপন করেছে–তাও দুনিয়ায় এজন্য ঘটেছিল, যাতে একটি জামা'আতের জন্ম দেয় এবং তা দিয়েছিলও। একটাই ছিল সেই জামা'আত, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন কাজের জন্য নির্বাচন করেছিলেন এবং তাঁদের অন্তরকে আপন সৌন্দর্য ও গুণাবলীর ঠিকানায় পরিণত করেছিলেন।

আল্লাহ্-প্রেমের সেই পবিত্র আগুন, যার জন্য নূহ (আ) কাঠ বাছাই করেছিলেন, ইবরাহীম (আ) আপন কুরবানীর আঁচল দ্বারা যার বেগ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ 'ওয়াদিয়ে আয়মন'–এ প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত বূ-কুবায়স পাহাড়ের গুহা সমূহে 'সিরাজাম মুনীরা' (উজ্জ্বল প্রদীপ) রূপে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এবং যার শিখাসমূহের সাহায্যে ঐ আল্লাহ্‌র দল তাদের অন্তরের আংগিঠি (জ্বলন্ত অংগার রাখার পাত্র) সমূহ প্রজ্জ্বলিত করেছিল। আর ঐ আংগিঠিসমূহ সংখ্যায় ব্যাপক ও বিরাট। সেগুলো থেকে দাওয়াত ও সংস্কারের অসংখ্য ও অগণিত প্রদ্বীপ প্রজ্জ্বলিত হয়, যার এক একটি বিশ্বের বড় বড় ভূখন্ডে এবং মানুষের বিরাট বিরাট বসতিতে বিশ্ব উজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে আলো বিকিরণ করতে থাকে।

এটাই ছিল সেই আল্লাহ্‌র আলো, যা তার জামা'আতের মাধ্যমে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল এবং যেটাকে আল্লাহ্ তা'আলা 'নুরুল্লাহ্' উপাধিতে আখ্যায়িত করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِؤُا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۔

"ওরা আল্লাহ্‌র নূর ফুঁৎকারে নিভাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করবে।"–(৬১ ঃ ৮)

আকাশের বাদশাহী

আমি এই জামা'আত দ্বারা ইসলামী ইতিহাসের সেই প্রথম দিককার জামা'আতের কথা বলতে চাচ্ছি, যারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গীদের ন্যায় মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গ দিয়েছিলেন এবং নুবুওয়াতের কার্যাবলীর অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে নবুওতের কল্যাণ ও বৈশিষ্ট্যাদি সৃষ্টি করেছিলেন–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّاۤءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط ۔

"মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল, তার সহচরগণ, কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকূ ও সিজাদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখ মন্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে।"–(৪৮ঃ২৯)

এটাই ছিল সেই জামা'আত, যার ইলাহী কাজকারবারকে হযরত ঈসা (আ)'আকাশের বাদশাহ' আখ্যা দিয়েছেন। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এই জামা'আতই দুনিয়াকে শয়তানী শক্তির অধীনতা থেকে মুক্ত করবে এবং তারই ন্যায় ও সত্য ভিত্তিক আমালের মাধ্যমে বিশ্বে আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা এমন একটা বীজ, যা বপন করার সময় যদিও তুচ্ছ ও অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু বৃদ্ধি পাওয়ার পর একটি বিরাট ও প্রশস্ত মহীরূহে পরিণত হবে। এ কারণেই হযরত ঈসা (আ) এটাকে উপমা দিয়ে বর্ণনা করেছেন–

'আসমানের বাদশাহী ঐ সর্ষে দানার মত, যেটাকে কোন একজন লোক তার ক্ষেত্রের মধ্যে বপণ করল। বীজের মধ্যে এটাই হচ্ছে সব চাইতে ক্ষুদ্র। কিন্তু যখন তা অংকুরিত হয় তখন সব তরকারীর চাইতে বড় হয় এবং এমন গাছ হয় যে, শূন্যের পাখীরা তার ডালের উপর রাতের বেলা আশ্রয় নেয় (মথিঃ এয়োদশ অধ্যায় ঃ শ্লোক-৩২)।"

পবিত্র কুরআনেও এই উপমার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এই বলে যে-

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ .

"তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইনজীলেও।"-(৪৮ঃ২৯)

অর্থাৎ এটাই হচ্ছে জামা'আত, যাকে তাওরাত ও ইনজীলে বীজ ও তা থেকে অংকুরিত চারাগাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

যার মূল সুদৃঢ় ও শাখা-প্রশাখা উর্ধে বিস্তৃত

দেখুন, আসমানের বাদশাহীর এই যে বীজ বপণ করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা কি পরিমাণ তুচ্ছ ছিল?- ছিল একটি অতি তুচ্ছ দল, যার না পার্থিব আসবাব-সামগ্রী ছিল, না ছিল কোন পার্থিব রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি। না তাঁদের কাছে যুদ্ধ সামগ্রী ছিল, না ছিল কোন সশস্ত্র বাহিনী। তাঁরা ছিলেন কয়েকজন ফকীর ও নিঃস্ব, যারা এলাহী দাওয়াতের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র ডাক শুনে তাঁর সন্ধানে বেরিয়েছিলেন ও আসমানী নি'মাত লাভের স্বার্থে ধরার অধিবাসীদের সাথে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তাঁরা ভয়ংকর দেহের অধিকারী ছিলেন না। তাঁদের কাছে রক্তক্ষয়ী অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, কিন্তু তাঁদের চোখে ছিল সত্যতার অশ্রু। তাঁরা আল্লাহ্‌র শিক্ষাকে তাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র বানিয়েছিলেন। তাঁরা এধরনের প্রত্যেকটি শব্দকে তাঁদের আমাল তথা কাজকর্মের মধ্যে সংরক্ষণ করেছিলেন, যে শব্দ বেরিয়েছিল আল্লাহ্‌র পবিত্র নবীর মুখ থেকে। তাঁদের মুখ নীরব থাকত, কিন্তু তাঁদের কাজকর্ম কথা বলত। তাঁরা এই 'উত্তম আদর্শ' এর জীবনকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করেছিলেন। তাঁরা যদিও মানুষ ছিলেন, কিন্তু নিজেদের প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে আল্লাহ্ সুলভ একটি ইলাহী জাল্‌ওয়ার অধিকারী ছিলেন। তাঁরা শুধু শিক্ষা নয় বরং একটি বাস্তব নমুনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং আসমানের বাদশাহীর সেই পবিত্র বীজ, যার আহবান এসেছিল সিরিয়ার প্রান্তর সমূহে, তা হিজাযের মরুপ্রান্তরে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। আর অল্প দিন অতিবাহিত হতে না হতেই একটি সবুজ সতেজ বিরাট বৃক্ষ আপন ডালপালা দ্বারা ভূমন্ডলকে ঢেকে ফেলেছিল। শূন্যের পাখীরা তার ডালে ডালে বাসা তৈরী করেছিল এবং মাটির প্রাণীরা তার ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল।

اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ . تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ م بِاِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ .

'উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখাপ্রশাখা উর্ধে বিস্তৃত, যা প্রত্যেক মওসুমে তার ফল দান করে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।"-(১৪ঃ২৪-২৫)

ঘরের সন্ধান, না ঘরবাসীর সন্ধান?

স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহ্ স্থান ও কাল থেকে পবিত্র। তিনি যখন দুনিয়ায় আসেন তখন নিজের অবস্থানের জন্য ঘর চান। আর তাঁর একাজের জন্য পৃথিবীর জাঁক-জমকপূর্ণ বসতিসমূহ, পাহাড়ের গগনভেদী শৃঙ্গসমূহ, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গসমূহ এবং বিরাট বিরাট প্রান্তরসমূহ একদম বেকার ও অর্থহীন। বাদশাহের শৌর্যবীর্য

প্রকাশকারী সিংহাসনসমূহ ও মণিমুক্তা ভর্তি ভান্ডারসমূহ, বড় বড় গম্বুজ ও স্তম্ভ সম্বলিত বিরাট আকার-আয়তনের প্রাসাদসমূহ তাঁর ঘর হতে পারে না। অতএব তাঁর জন্য এমন ঘর সৃষ্টি করতে হবে, যা জামাল ও সৌন্দর্য এবং চিরন্তন অনুপমতার আবাসে পরিণত হতে পারে। তুমি যখন তাঁর সন্ধানে বের হতে চাইবে তখন নিজের সন্ধানেই আগে বের হবে। 'তাঁকে পাওয়া যায় না'–এ অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বে নিজে যে নিজে থেকে হারিয়ে গেছ সেজন্য ক্রন্দন কর। তাঁর ভালবাসার অন্ত:পুরের দরজা সব সময়ই উম্মুক্ত। তাঁর মিলনস্থলের দরজায় কোন দ্বাররক্ষী নেই। তিনি আপন সন্ধানকারীদের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত অপেক্ষমান রয়েছেন। কিন্তু তোমাদের সমস্ত বঞ্চনা এর মধ্যেই নিহিত যে, তোমাদের কাছে এমন ঘর নেই, যা তাঁর তথা তাঁর ভালবাসার অবতরণস্থলে পরিণত হতে পারে।

তাঁর বসার জন্য স্বর্ণ রৌপ্যের প্রাসাদ কিংবা মণিমুক্তাখচিত সন্দুল ও আবলুস কাঠের সিংহাসনের প্রয়োজন নেই। বরং তিনি ঐসব অন্তর চান, যেগুলোর মধ্যে তাঁর ভালবাসার ক্ষতের রক্তকণা ঝরছে। তাঁর জন্য বিত্তহীন ও মৃত্তিকা-সজ্জায় শয়নকারীদের এমন একটি জামা'আত প্রয়োজন, যাদের অন্তরের ভাংগাটুটা ঘরই তাঁর প্রসাদ তথা অবতরণক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। এই ভাংগা অন্তরকে তাঁর বাসস্থানের জন্য নির্বাচন করেছেন। এই ঘর ছাড়া অন্য কোন স্থান পসন্দ নয়।

لَاوسعنى ارضى ولاسمائى ولكن يسعنى قلب عبدى المؤمن .

"আমার আসমানে ও আমার যমীনে আমার সংকুলান হয় না, কিন্তু আমার মুমিন বান্দার অন্তরে আমার সংকুলান হয়।"

انا عند المنكسرة قلوبهم .

"ভগ্নহৃদয়ধারীদের কাছেই আমি থাকি।"

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰت وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً .

"আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বত মালার প্রতি এই আমানত অর্পণ করেছিলাম, ওরা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং ওতে শংকিত হল, কিন্তু মানুষ ওটা বহন করল, সে তো অতিশয় জালিম, অতিশয় অজ্ঞ।"–(৩৩:৭২)

এ সম্পর্কে মাওলানা জামী যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো–

فَلَوْلَم يكن للانسان قوة هذه الظلومية والجهولية، لماحمل تلك الامانة العَظِيْمِ الالِهيَّةِ .

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে জুলুম (অদূরদর্শিতা) ও অজ্ঞতা না থাকলে সে আল্লাহ্‌র এই বিরাট আমানত বহন করতে যেত না।

অন্তরসমূহ পরিবর্তন কর

অতএব দুনিয়ায় যদি চির বিদ্যমান মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার কোন ঘর হতে পারে তবে তা হতে পারে মানুষের অন্তর সমূহের প্রেম-ভালবাসার সেই জায়গাটিতে, যে জায়গাটি শুধুমাত্র তাঁর বসবাসের জন্য সে পূর্ব থেকেই সজ্জিত করে রেখেছে এবং এর সৌন্দর্য ও পবিত্রতা যাতে অটুট ও বহাল থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি

রেখেছে। দুনিয়ার অন্যান্য ঘরের ন্যায় এই ঘরকে সজ্জিত করার জন্য না রেশমী পর্দার প্রয়োজন, আর না ঝাড়বাতি ও কার্পেটের। এটাকে সজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি বস্তুর প্রয়োজন, আর তা হলো 'দরদে দিল' তথা প্রেম ভালবাসার ক্ষত,যা থেকে ঝরে পড়া রক্তের ছাপ সবসময় তার দেওয়ালকে রঞ্জিত তথা সজ্জিত রাখে।

অতএব যদি তুমি তাঁকে পেতে চাও তাহলে একটি জামা'আত সৃষ্টি কর, যাতে সে জামা'আত হয় তাঁর পরাক্রম ও পবিত্রার বাসস্থান। যদি তোমাদের কাছে ঘর না থাকে তাহলে বাসকারীর সন্ধানে কেন ঘুরে মরছ? অতএব বাসকারীর আগে বাসস্থানের কথা চিন্তা করো।

বিপ্লব সহজ ব্যাপার নয়

দুনিয়ার মধ্যে পরিবর্তন আনা সহজ ব্যাপার নয়। একটি ঘরের দেওয়াল কিংবা জানালা বদলাতে গেলে কত মাল-সামানের প্রয়োজন পড়ে? অতএব যারা ধরাপৃষ্ঠের বড় বড় ভূখন্ডের এবং মানুষের বিরাট বিরাট বসতির আমাল (কাজকর্মের ধারা) ও ইতিকাদাত (ধারণা-বিশ্বাস) বদলাতে চান, তাদের চিন্তা করা চাই যে, তাদের উদ্দেশ্য কত কঠিন ও আয়াসসাধ্য। দুনিয়ায় সাম্রাজ্যসমূহের পরিবর্তন এবং রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে জড়বাদ বা বস্তুতান্ত্রিক বিপ্লব সর্বদা সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু এ জাতীয় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর একটি বিপ্লবের জন্যও কতইনা মূল্য দিতে হয়। দিনের পর দিন চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-তদবীর করতে হয়, ভান্ডারের পর ভান্ডার খরচ করতে হয় এবং কোটি কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এরপর সেনাসমূদ্রে তুফান উঠে। কোটি কোটি দামী যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রসস্ত্র সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করা হয়। তারপর অসংখ্য মানুষ তাদের প্রাণ উৎসর্গ করে, মানুষের রক্ত নদী প্রবাহিত হয়, স্ত্রীলোকেরা বিধবা হয়, শিশুরা য়াতীম হয় এবং মাতাপিতা জীবন্ত সমাধিস্থ হয়ে যায়। এত কিছু হওয়ার পরই একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় বিপ্লব পূর্ণতায় গিয়ে পৌছে।

তারপরও তা নিশ্চিত নয়। কোন কোন সময় হাজার চেষ্টা এবং শতাব্দীর আশা-আকাংখাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যখন বস্তুতান্ত্রিক বিপ্লবের এই অবস্থা, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব রাজ্যের সিংহাসন এবং মানব বংশের বসতিসমূহকে পরিবর্তন করা–তখন সেই আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিপ্লব, যা ধরাপৃষ্ঠ এবং মানুষের দেহকে নয়; বরং তাদের আত্মা ও অন্তরকে পাল্টে দিতে চায় এবং কোটি কোটি মানুষের আমাল ও আচার-আচরণের মধ্যে পরিবর্তন আনতে চায়, সে বিপ্লবের জন্য কি শুধু মানবীয় শক্তি, চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং চারিত্রিক ও ধর্মীয় কয়েকটি নীতিই যথেষ্ট হতে পারে?

তুমি নিজেই একবার তোমার অন্তরকে পরীক্ষা করে নাও, যে অন্তরের উপর তোমার পূর্ণক্ষমতা রয়েছে। দেখ, তুমি তার মধ্যে ও তার আমালের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনও সহজে আনতে পার কি না?

অতএব যখন তুমি অন্তর পরিবর্তনের উপরও ক্ষমতা রাখ না, যে অন্তরের উপর তোমার কর্তৃত্ব রয়েছে তখন ঐসব কোটি কোটি অন্তরের মধ্যে তুমি কী করে পরিবর্তন আনবে, যেগুলোর উপর তোমার নয়, বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রতিপালিত সুদৃঢ় ইতিকাদ-বিশ্বাস ও আমালের বিপথগামী হুকুমাত ও নাফসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

আত্মা ও মনের পরিবর্তন সাধন

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানুষ দেহসমূহকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারে, কিন্তু অন্তর সমূহকে বদলাতে পারে না। জলস্থলের মানচিত্র সে বদলাতে পারে; কিন্তু আত্মা ও মনের একটি প্রান্তও সে বদলাতে পারে না। সে শিক্ষাদান করতে পারে, 'সংস্কার সংস্কার' বলে হাঁক ডাকও ছাড়তে পারে, কিন্তু না সে সংস্কারের বীজ তার আঁচলে রয়েছে, আর না সে বীজকে অংকুরিত ও প্রস্ফুটিত করে তোলার ক্ষমতা সে রাখে। এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ঐ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ, যিনি মানুষের অন্তর এবং তাদের অবস্থা পরিবর্তন করার সর্বসময় ক্ষমতা রাখেন।

অতএব যদি তুমি মানুষের অন্তরে পরিবর্তন আনতে চাও এবং তাদের আত্মার মধ্যে বিপ্লব সাধন করতে চাও তাহলে স্মরণ রাখবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি স্রেফ একজন মানুষ, ততক্ষণ তা পারবে না। কেননা, মানুষ এরূপ করতে পারে না; এটা করার ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, এটা যদি তুমি নিজের মধ্যে ইসলামী শক্তি সৃষ্টি করতে পার, যদি তুমি নিজের জামাআতের মধ্যে ঐ সর্বশক্তিমানের ঘর বানাতে পার তাহলে তোমার আওয়াজের স্থলে তোমার ভেতর থেকে তাঁরই আওয়াজ বের হতে থাকবে। তোমার চোখ হয়ে যাবে তার চোখ, তোমার কাজ কারবার পরিণত হবে একদম তাঁরই কাজ-কারবারে, যিনি সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী এবং যিনি পরাজয় ও বিফলতার সর্বপ্রকার কালিমা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

আল্লাহ্র হাত প্রয়োজন

এরপর যিনি সবকিছুর মালিক তিনি যখন তোমার মধ্যে থাকবেন তখন তাঁর মালিকানার প্রত্যেকটি জিনিসের উপর তোমার ক্ষমতাও প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন তোমার ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই ক্ষমতা হবে। তখন তোমার দাওয়াতের আওয়াজ এমন এক বিপ্লবের বন্যা নিয়ে আসবে, যা দুনিয়ার কোন শক্তিই রুখতে পারবে না। তখন তোমার মুখ দিয়ে যা কিছু বের হবে তা অন্তর ও আত্মা সমূহের উপর অংকিত হয়ে যাবে। এরপর না যমীনের পানি এটাকে ধুয়ে ফেলতে পারবে, না আসমানের বৃষ্টি এটাকে মুছে ফেলতে পারবে। তখন তোমার শিক্ষা বীজ ও ফল উভয়টিকেই তোমার সংগে নিয়ে আসবে। তখন তুমি নীরব থাকলেও তোমার নীরবতার এক একটি আমলের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ লক্ষ লক্ষ প্রাণ নিজেদের উৎসর্গ করবার জন্য তোমার দিকে ছুটে আসবে। তোমার চোখ থেকে যখন ইলাহী শিখার স্ফুলিঙ্গ বের হবে তখন দুনিয়ায় এমন কার চোখ আছে, যা তাতে আকৃষ্ট হবে না? যখন তোমার মুখ দিয়ে আল্লাহ্র যবানের দাওয়াতের আওয়াজ উঠবে তখন এমন কোন্ সৃষ্টি আছে, যা তা না শুনে পারবে?

তখন তুমি যে দিকে মাথা উঠাবে অন্তরে এবং আত্মাসমূহকে বিনীত ও অবনত দেখতে পাবে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র হাত তোমা থেকে প্রকাশ লাভ করে দেশ ও জাতিসমূহকে বদলে দেবে। তুমি একটি বিশ্বকে বদলাতে চাও, তোমার সামনে বহু শতাব্দী-প্রাচীন একটি ইমারত রয়েছে-তুমি সেটাকে একদম ভেংগে ফেলে তার জায়গায় একটি নতুন ইমারত বানাতে চাও, কিন্তু এজন্য তোমার হাত ও বহুর শক্তি যথেষ্ট নয়–এমতাবস্থায় যতক্ষণ না তোমার হাতের মধ্যে আল্লাহ্র হাত প্রকাশিত হবে ততক্ষণ তুমি উপরোক্ত পরিবর্তন ও ভাংগাগড়ার কাজ আনজাম দিতে সক্ষম হবে না।

আরো কিছু বিশ্লেষণ

একজন মূর্খ ও একজন বিজ্ঞের মধ্যে কোন দৃশ্য দেখার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা আছে তা চিন্তা ও ভাবনার ক্ষেত্রে। তুমি কি কখনো লক্ষ্য করেছ যে, আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র শিক্ষা ও পবিত্র আওয়াজ সমূহের কোন প্রভাব আমাদের উপর নেই? এটা কি করে হয় যে, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর সংকল্প আমাদের অন্তরে আছে, উত্তম থেকে অধিকতর উত্তম কল্পনা আমাদের চিন্তায় আছে। পবিত্র থেকে পবিত্রতর শিক্ষা আমাদের মুখে আছে, কিন্তু না সংকল্পগুলো গ্রহণের ক্ষমতা আছে,না কল্পনাকে কাজে রূপদান আছে আর না শিক্ষায় কোন প্রভাব আছে। যে বিশ্বের বড় বড় ভূখন্ডকে শুধুমাত্র একটি যবানের দাওয়াত প্রকম্পিত ও ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল, আজ সেই দুনিয়ায় বড় বড় জামা'আতের শত আওয়াজও একটি প্রাণের জমাট প্রান্তরে কোন সাড়া জাগাতে পারছে না? এই ইসলামের দাওয়াতের আওয়াজ, এই কিতাব ও হিদায়াতের সংস্কারের আওয়াজ তখনো ছিল যখন এর এক একজন দায়ী 'এক একটি অঞ্চল প্রভাবাতিন্নী করেছিলেন। আর আজো তাই আছে; কিন্তু নিজের মধ্যে জ্বালা অনুভূত হচ্ছে না। অতএব যেখানে নিজেরাই প্রভাবিত নয় সেখানে তারা অন্যকে প্রভাবিত করবে কী ভাবে?

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বিশ্বের বিপ্লব ও পরিবর্তন সর্বদা আমলের আওয়াজের কাছে নতি স্বীকার করে। শুধু মুখের কথা দ্বারা কখনো কোন বিপ্লব আসতে পারে না। প্রত্যেক শিক্ষার জন্য আসল বস্তু হলো তার নমুনা। আর

যতক্ষণ পর্যন্ত সংস্কারক নিজের মধ্যে নিজের সংস্কারের নমুনা সৃষ্টি না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার শিক্ষা অন্তর সমূহের গ্রহণীয়তা ও আত্মাসমূহের আনুগত্য থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। আগুন যখন জ্বলে তখন সর্বপ্রথম তার প্রজ্জ্বলন কারীকে তার উষ্ণতা দান করে। যদি তোমার মধ্যে আগুন বিদ্যমান থাকে তাহলে এর তাপ ও উষ্ণতা সর্বপ্রথম নিজেকে দেখাও। এরপর অন্যকে এর উষ্ণতার দাওয়াত দাও। যদি তোমার মধ্যে আগুন থেকে থাকে তাহলে এটা যেখানে থাকুক এবং যেভাবে থাকুক, তার উষ্ণতা আপনা আপনি সবদিকে ছড়িয়ে পড়বে। কেননা, উষ্ণতা তো অগ্নিশিখা থেকে বের হয়, বরফের শিলাখন্ড থেকে কখনো তা সৃষ্টি হয় না। ইসলাম সাহাবা কিরামের একটি জামা'আত সৃষ্টি করেছিল, যারা ইসলামী শিক্ষার একটি সঠিকতর আমালী আদর্শ নিজেদের মধ্যে রাখতেন, আর তাঁদের প্রত্যেক ব্যক্তি এই সুন্দর আদর্শের বলেই এক একটি বিশ্ব জয়ের ক্ষমতা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে নিয়ে ছিলেন। তাঁদের আমাল ও কাজকর্মের মধ্যে ইলাহী শিক্ষার পবিত্র দীপাধার প্রজ্জ্বলিত ছিল। এজন্য তাঁরা যে খানেই যেতেন সেখানেই আপন প্রভাব প্রতিপত্তির একটি অগ্নিকুন্ড সংগে নিয়ে যেতেন।[৩]

টীকা ঃ

১। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ)।

২। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)।

৩। এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, বাহ্যত: হজ্জের সাথে এই প্রবন্ধের কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃপক্ষে মরহুম মাওলানা হজ্জের ভূমিকা স্বরূপ এই প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি এক সাথে কয়েকটি কাজ সম্পাদন করতেন। ইসলামী সংগঠনও তাঁর লক্ষ্য বস্তু ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি হজ্জকে ইসলামী মিল্লাতের আন্তর্জাতিক সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করতেন। তাঁর এ প্রবন্ধ রচনার আসল উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়টি দেখানো যে, ইসলামী জীবন মূলত: একটি জামা'আতী জীবন ছাড়া কিছু করতে নয়। সম্ভবত: এই প্রবন্ধকে তিনি আরো একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে হজ্জের সাথে সংযুক্ত করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু সেটা তিনি আর পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে এ আলোচনা হজ্জেরই একটি ভূমিকা। অতএব এরও যে একক একটা গুরুত্ব আছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। –সংকলক

হজ্জ ফরয হওয়ার ইতিহাস

যদিও আরবরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সামগ্রিক হিদায়াতের শিক্ষাকে একদম ভুলে বসেছিল। কিন্তু কাবা ঘর নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি সমগ্র বিশ্বকে যে সাধারণ ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার প্রতিধ্বনি এখানো আরবের প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে ভেসে আসছিল।

وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْاً وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ . وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ،

"এবং স্মরণ করো, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখ তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা দাঁড়ায়, রুকূ করে ও সিজ্‌দা করে। আর মানুষের কাছে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে ও সব রকমের ক্ষীণকায় উটসমূহের পিঠে, তারা আসবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।"–(২২:২৬-২৭)

জাহিলিয়া যুগের বিদ'আত ও নব উদ্ভাবিত প্রথাসমূহ

কিন্তু যখন সত্যের সাথে মিথ্যা মিশে যায় তখন তা অত্যন্ত ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। আরববাসীরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুরাতন সুন্নাতকে জীবিত রেখেছিল সত্য, কিন্তু এর সাথে বিদ'আত ও নব উদ্ভাবিত প্রথাসমূহ মিশ্রিত করে তার আসল রূপকে একদম বদলে ফেলেছিল।

১। আল্লাহ্ তা'আলার আপন ঘরে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, কাউকে আল্লাহ্র শরীক বানাবে না। (اَنْ لَاتُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا)

কিন্তু পরে আল্লাহ্র এই ঘর তিন শ দেবতার (মূর্তির) অবস্থানস্থলে পরিণত হয়ে যায়। এবং সেগুলোকেই কেন্দ্র করে তাওয়াফ করা হত।

২। আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জের এই লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন যে, পার্থিব উপকার লাভের সাথে সাথে আল্লাহ্র যিক্র কায়েম করা হবে, কিন্তু পরে শুধু পিতা তথা পূর্বপুরুষের গৌরব গাঁথা সেখানে গীত হত।

৩। হজ্জের একটি উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য সমগ্র আরব বরং সমগ্র বিশ্বকে এর সাধারণ দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল এবং সকলকে লেবাসে-পোষাকেও এক করে দেওয়া হয়েছিল।[১] কিন্তু কুরায়শের আভিজাত্যের অহংকার তাদের জন্য এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেছিল, যা ছিল সাম্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন, আরবরা আরাফাতের মাঠে অবস্থান করত, কিন্তু কুরায়শ মুযদালাফার বাইরে বের হত না এবং বলত, আমরা হলাম

৪। কুরায়শ ছাড়া আরবের সকল স্ত্রী পুরুষ উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করত। শুধুমাত্র তারাই কাপড় পরিধান করে তাওয়াফ করতে পারত, যাদেরকে কুরায়শের দিক থেকে কাপড় দেওয়া হত। কুরায়শ এটাকেও তাদের আভিজাত্য প্রকাশের একটা মাধ্যম করে নিয়েছিল।

৫। উমরা যদিও ছিল হজ্জের একটি ভূমিকা বা অংশ, কিন্তু আরবরা হজ্জের মওসুমে উমরা করাকে শক্ত গুনাহের কাজ মনে করত এবং বলত, যখন হাজীদের সওয়ারীর পিঠের ঘা শুকিয়ে যাবে এবং সফরের মাস অতিক্রান্ত হবে শুধুমাত্র তখনই উমরা জায়িয হতে পারে।

৬। হজ্জের সমগ্র আহ্কাম ও আরকানে য়াহূদী বৈরাগ্যের সেই বিশ্বজনীন ব্যধি ছড়িয়ে পড়েছিল। নিজের ঘর থেকে পায়ে হেটে গিয়ে হজ্জ সম্পাদনের মানত করা, যতক্ষণ পর্যন্ত হজ্জ সম্পন্ন না হয় একদম নীরব থাকা, কুরবানীর উটসমূহের উপর কোন অবস্থায়ই সওয়ার না হওয়া, নাকের মধ্যে নাঁকা পরে পশুদের মত কাবা শরীফ তাওয়াফ করা, হজ্জের সময়ে দরজার দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ না করা বরং পেছনের দিক দিয়ে প্রাচীর ডিংগিয়ে প্রবেশ করা এবং ঘর-দরজায় কুরবানীর পশুর রক্তের ছাপ লাগানো আরবদের একটি সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছিল।

ইসলামের আবির্ভাব ও হজ্জের পবিত্রকরণ

ইসলাম প্রকৃপক্ষে দ্বীনে ইবরাহীমের হাকীকতের সম্পূরক ছিল। তাই প্রথম থেকেই তা সেই হারানো হাকীকতের নবায়ন ও জীবন্ত করণে নিয়োজিত হয়ে গিয়েছিল, যার ছাচ হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা তৈরী করেছিলেন। ইসলামী আকায়িদ ও ইবাদাতের সমষ্টি হচ্ছে শুধুমাত্র তাওহীদ, সালাত সিয়াম, যাকাত এবং হজ্জ। কিন্তু এই সব রুকনের মধ্যে হজ্জই হচ্ছে এমন একটি রুকন, যার দ্বারা উপরোক্ত সব রুকনের মিশ্রিতরূপ পরিপূর্ণ হয়। অর্থাৎ সবগুলো রুকন হজ্জের মধ্যে একত্রিত হয়ে গেছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামকে শুধুমাত্র কা'বা শরীফের সাথে মু'আল্লাক (সম্পর্কিত) করে দিয়েছেন–

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَىْءٍ ز وَّأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

"আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর প্রভুর ইবাদত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। সব কিছু তাঁরই। আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্থন কারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।"–(২৭:৯১)

হজ্জ ও ইসলাম

এ কারণেই পবিত্র কুরআন প্রত্যেকটি জায়গায়ই হজ্জের সাথে ইসলামের উল্লেখ করেছে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত করে–

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَارَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ط فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهُ اَسْلِمُوْا ط وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ .

"আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদের জীবনোপকরণ স্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলোর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, সুতরাং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে।"–(২২:৩৪)

জালিমদের বঞ্চনা

ইসলাম ছিল আল্লাহ্ তা'আলার একটি ফিত্‌রী মু'আহাদাহ্ তথা প্রকৃতিগত চুক্তি। মানুষের বাড়াবাড়িমূলক চুক্তি ভঙ্গের প্রবণতা সেটাকে ভেংগে খান খান করে দিয়েছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) এর অনাগত সন্তানদেরকে প্রথম দিনেই এর ফলশ্রুতি সমুহ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন–

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ط قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ذ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ۔

" এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আ) কে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলো সে পূর্ণ করেছিল, আল্লাহ্ বললেন, 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করছি।' সে বলল, আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।" –(২ঃ ১২৪)

উম্মতে মুসলিমাহ

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) কে যেসব কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং যার ভিত্তিতে তাদেরকে দুনিয়ার নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল সেগুলো ছিল ইসলামের প্রাথমিক অংশসমূহ–অর্থাৎ তাওহীদে ইলাহী, 'নাফস্ ও জায্‌বাত' এর কুরবানী, সালাতে ইলাহী কায়েম করা এবং মারিফাতে 'দ্বীনে ফিতরত' (স্বভাব- ধর্ম)-এর পরীক্ষাসমূহ। যদিও তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক হতভাগা এই সব রুকন পরিত্যাগ করে নিজেদের উপর জুলুম করেছিল এবং উত্তরাধিকারিত্বের সেই পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল (قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِيْنَ), কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর সত্তার মধ্যে অপর একটি উম্মত লুকিয়েছিল যার জন্য স্বয়ং তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করেছিলেন। কুরআনের ভাষায়– اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا ۔

"ইবরাহীম ছিল এক অনুগত উম্মত।" অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) বাহ্যত: একজন ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁর রূহানী ও ইলাহী কর্মতৎপরতার অভ্যন্তরে একটি সম্পূর্ণ অনুগত ও বাধ্য জাতি নিহিত ছিল।

হজ্জের অংশ সমূহ

তখন উম্মতে মুসলিমার আবির্ভাবের সময় এসে গিয়েছিল এবং ঐ পবিত্রকারী প্রতিশ্রুত নবী হেরাগুহার অন্ধকার কোণ থেকে বের হয়ে সাধারণ মানুষের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাতে ঐ অন্ধকারের মধ্যে স্বয়ং তিনি যে আলো দেখেছিলেন তা সম্পূর্ণ বিশ্বকে দেখিয়ে দিতে পারেন।

يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ط ۔

"তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন।"–(২ঃ২৫৭)

قَدْجَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۔

"আল্লাহ্‌র নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে।"–(৫ঃ১৫)

তাওহীদ ও সালাত

তিনি যখন সবার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হলেন তখন সর্বপ্রথম আপন পিতার মৌরসী ঘরকে জালিমদের হাত থেকে ফেরত নিতে চাইলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ন্যায় একের পর এক কয়েকটি আধ্যাত্মিক স্তর অতিক্রম করার প্রয়োজন ছিল। তিনি ঐসব স্তর ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করতে শুরু করেন। তিনি হেরা গুহা থেকে

বের হওয়ার সাথে সাথে তাওহীদের আওয়াজ তোলেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিল তার প্রথম শর্তই ছিল- أَنْ لَا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا -"তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করো না।"

এরপর তিনি সালাতে সাফ্ (লাইন) প্রতিষ্ঠা করেন। আর তা এজন্য যে, এই ঘর শুধুমাত্র আল্লাহ্র সামনে মাথা নতকারীদের জন্যই তৈরী করা হয়েছিল।

وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

"এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং রুকূ ও সিজদা কারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।"-(২ঃ১২৫)

তিনি রোযার শিক্ষা দেন। কেননা, এটা হচ্ছে হজ্জের শর্তসমূহের পরিপূরক।

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ط.

"এরপর যে কেউ এই মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়।"-(২ঃ১৯৭)

রোযা

রোযার হাকীকত এই যে, তা মানুষকে পরনিন্দা, ফিস্ক, ঝগড়াঝাটি, আত্ম স্বার্থপরতা ইত্যাদি জঘন্য কাজ থেকে বিরত রাখে।

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ ط

"এরপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে সঙ্গত হয়ো না।"-(২ঃ১৮৭)

যাকাত

তিনি যাকাতও ফরয করেছেন। কেননা, এটাও হজ্জের একটা গুরত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে ছিল।

فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ.

"এরপর তোমরা ওটা থেকে খাও এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে খাওয়াও।"-(২২ঃ২৮)

মক্কা বিজয়

এভাবে যখন উম্মতে মুসলিমার আধ্যাত্মিক ছাচ হয়ে গেল তখন তিনি নিজের মত এটাও সাধারণের দৃষ্টিতে নিয়ে আসতে চাইলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি উমরার প্রস্তুতি নিলেন এবং চৌদ্দ পনেরো শ' লোকের একটি জামা'আতের সাথে রওয়ানা হলেন, যাতে প্রথম বারের মত আপন পিতৃপুরুষের ঘরটি আক্ষেপের দৃষ্টি মেলে একবার দেখে আসতে পারেন। কিন্তু হিদায়াতের এই কাফেলাকে পথিমধ্যে হুদায়বিয়া নামক স্থানে বাধা প্রদান করা হয়। পরবর্তী বছর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী কা'বা যিয়ারতের অনুমতি পেলে তিনি মক্কায় অবস্থান করে চলে আসেন।

হুদায়বিয়া সন্ধি রাস্তার সমগ্র উচু নিচু স্থান সমান করে দিয়েছিল। কেবল কা'বাঘরে পাথরের একটি স্তূপ রয়ে গিয়েছিল। মক্কাবিজয় তা সমান করে দিল।

دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلثمائة نصب فجعل يطعنها بعود فى يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا (صحيحين)

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন যখন কা'বা শরীফে প্রবেশ করেন তখন তাঁর আশেপাশে তিন শ টি মূর্তি পরিদৃষ্ট হয়। তিনি সেগুলোতে তাঁর হাতের একটি কাঠ দিয়ে ঠোক্র মারছিলেন এবং নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন– جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا .

"সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।"–(১৭:৮১)

হজ্জের ফরযিয়াত

এবার মাঠ ছিল একেবারে পরিস্কার। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার মত একটি কংকরও আর রাস্তায় ছিল না। পিতা যে অবস্থায় ঘরটি রেখে গিয়েছিলেন পুত্র সে অবস্থায়ই তা দখল করেন। সমগ্র আরববাসী মক্কা-বিজয়কে ইসলাম ও কুফ্রের সত্যতার মাপকাঠি হিসাবে সাব্যস্ত করেছিল। যখন মক্কা বিজিত হল তখন মানুষ দলে দলে ইসলামে দাখিল হতে শুরু করে। এবার বিশ্ববাসীর সামনে এই নতুন আন্দোলনের রূপ পরিপূর্ণভাবে তুলে ধারার সময় এসে গিয়েছিল। এরপর পুনরায় সেই সাধারণ দাওয়াতের কাজ শুরু করা হয়, যার মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ) সমগ্র বিশ্বে একটি আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সেই কাজের পুরোপুরি বাস্তবায়ন ছিল নবীয়ে উম্মী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নির্ভরশীল।

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ـ

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হাজ্জ্ব করা তার অবশ্য কর্তব্য।"–(৩:৯৭)

হজ্জের পরিপূর্ণতা

সমগ্র আরববাসী তাঁর এই আহবানে সাড়া দিল। হাজার হাজার লোক তাঁর কাছে এসে জড় হলো, আরবরা হজ্জের রুকনসমূহের মধ্যে যেসব বিদ'আত ও নব-উদ্ভাবিত জিনিস ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তিনি একটি একটি করে সেগুলো দূর করেন। পিতৃপুরুষের কীর্তিগাথার পরিবর্তে এবার আল্লাহ্র তাওহীদের আওয়াজ বুলন্দ হল।

فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْاَشَدَّ ذِكْرًا .

"আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে।"–(২:২০০)

কুরায়শের বৈশিষ্ট্যাদির অবসান

এতদিন যাবত অন্যায়ভাবে প্রচলিত কুরায়শের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলা হয় এবং সমগ্র আরববাসীর ন্যায় আরাফার একটি প্রান্তে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

"এরপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেই স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, বস্তুত: আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"−(২:১৯৯)

উলঙ্গ দেহে তাওয়াফ নিষিদ্ধ

আরবদের একটি জঘন্যতম রীতি এই ছিল যে, তারা উলঙ্গ দেহে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করত। স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ দেহে তাওয়াফ করাটা ছিল পুরুষদের চাইতে জঘন্য ধরণের লজ্জাস্কর ব্যাপার। কিন্তু তিনি এক বছর আগেই তা নিষিদ্ধ করে দেন।

ان اباهريرة اخبره ان ابابكرا الصديق رضي الله عنه بعثه فى الحجة التى امره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحرفى رهط يوذن فى الناس ، الا لايحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان (بخارى)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবু বকর (রা) কে হজ্জের আমীর মনোনীত করেছিলেন এবং তিনি আমাকে এক দল লোকের সাথে প্রেরণ করেন এ ঘোষণা প্রদান করতে যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক কিংবা উলঙ্গ অবস্থায় কোন মানুষ হজ্জ কিংবা তাওয়াফ করতে পারবে না।" বুখারী।

বিভিন্ন প্রকার বিদা'আতের মূলোৎপাটন

হজ্জের মওসুমে যারা উমরা করত তাদেরকে ফাসিক ও ফাজির আখ্যা দেওয়া হত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বিদায় হজ্জে উমরার ইহরাম বাঁধেন এবং সাহাবা কিরাম (সা) কেও উমরা করার নির্দেশ দেন। পায়ে হেঁটে এবং নীরব থেকে হজ্জ করাও নিষিদ্ধ করা হয়। কুরবানীর পশুর উপর সওয়ার হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। নাকে নাঁকা লাগিয়ে তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ করা হয়। তাছাড়া দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়।

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى، وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

"পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ তাক্ওয়া অবলম্বন করলে। সুতরাং তোমরা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"−(২:১৮৯)

কুরবানীর হাকীকত

কুরবানীর হাকীকত ব্যাখ্যা করা হয় এবং বলা হয় যে, এটা প্রাণোৎসর্গ তথা মন-প্রাণ-আত্মাকে বিলিয়ে দেওয়ার একটি পন্থা মাত্র। কুরবানীর গোশ্ত কিংবা রক্ত আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছায় না যে, এর ছাপ মেরে দেওয়ালসমূহকে রঞ্জিত করতে হবে। আল্লাহ্ শুধুমাত্র বিশুদ্ধ নিয়ত এবং পাক পবিত্র অন্তরমূহকে দেখেন।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَادِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۔

"আল্লাহ্র নিকট পৌঁছায় না ওদের গোশ্ত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাক্ওয়া।"-(২২:৩৭)

মোটকথা, ছাল যখন খসে পড়ল তখন শুধুমাত্র বিশুদ্ধ মস্তিস্ক থেকে গেল। এবার মক্কা উপত্যকায় নতুন ও প্রাচীন দু'টি দৃশ্য পরিদৃষ্ট হল। একদিকে যমযম কূপের পরিস্কার পৃষ্ঠভাগ তরঙ্গায়িত হচ্ছিলো এবং অন্যদিকে জাতীয় জীবনে মুখরিত হয়ে উঠেছিল একটি নব আন্দোলন।

সাধারণ ঘোষণা এবং বিদায় হজ্জ

কিন্তু বিশ্ব তখন পর্যন্ত এই বিরাট সমাবেশের হাকীকত সম্পর্কে অনবহিত ছিল। ইসলামের ২৩ বছর জীবনের উজানভাটা সমগ্র আরব ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছিল; কিন্তু কেউ জানত না যে, ইসলামের ঐতিহাসিক জীবন কি কি ফলাফলকে অন্তর্ভুক্ত রাখে এবং মুসলমনদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কুরবানী, উৎসর্গ এবং আত্মার সর্ববৃহৎ লক্ষ্য কি ছিল। এবার সেটা বিশ্লেষণের সময় এসে গিয়েছিল।

হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা ঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কালে এই দু'আ-ই করেছিলেন-

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط .

স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক, এটাকে নিরাপদ শহর করো, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান করো।"-(২:১২৬)

হযরত ইবরাহীম (আ) ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)

যখন তিনি এই দু'আ করেছিলেন তখন সমগ্র বিশ্ব ফিত্না ও ফাসাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা উধাও হয়ে গিয়েছিল। দুনিয়ার ইয্যত ও সম্মান ছিল সংকটের সম্মখীন। দুর্বল ও শক্তিহীনদের অধিকার পদদলিত করা হয়েছিল। বিচারালয় ছিল পরিত্যক্ত। মানুষের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যাবতীয় পুণ্যকর্ম কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। ভূপৃষ্ঠে এমন কোন জায়গা ছিল না, যা জুলুম ও কুফরীর অন্ধকারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়নি।

এজন্য তিনি বাসযোগ্য দুনিয়ার নাপাক অংশসমূহ পরিত্যাগ করে 'ওয়াদিয়ে গায়রে যীযারয়ীন' (وَادِىْ غَيْرِذِىْ زَرْعٍ-অনুর্বর উপত্যকা তথা মক্কা)-এ বসতি গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে তিনি একটি শান্তির ঘর নির্মাণ করেছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বকে আপোষ ও শান্তির দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর পুণ্যবান বংশধরদের কাছ থেকে এই শান্তির ঘর ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। অতএব এটাকে উদ্ধার করার জন্য পূর্ণ দশটি বছর, তাঁর সন্তানকেও পিতার ন্যায় সংগ্রামের ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করতে হয়।[২] মক্কা বিজয় যখন তার শান্তি ও নিরাপত্তাস্থল তথা কা'বা শরীফ তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিল তখন তিনি তাতে প্রবেশ করে সমগ্র বিশ্বকে 'বিলুপ্ত সত্যের প্রত্যাবর্তন'-এর সুসংবাদ প্রদান করেন। তিনি উটের উপর সওয়ার হয়ে বের হন এবং সমগ্র বিশ্বকে ন্যায় ও শান্তির সুসংবাদ শুনান।

বিদায় হজ্জের ভাষণ-

ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا- الا ان كل شئ من امرالجاهلية تحت قدمى موضوع ودماء الجاهلية موضوعة واول دم اضعه دماءنا دم ابن ربيعة وربا الجاهلية

موضوعة واول ربا اضع ربانا رباء عباس بن عبد الملك ، اللهم اشهد ثلاث مرات (ابوداؤد : جلد- ١، ص-٢٦ كتاب الحج)

যেভাবে তোমরা আজকের দিন (হজ্জের দিন), এই মাস (হজ্জের মাস) ও এই পবিত্র শহর (মক্কা মুকাররমা)-এর প্রতি হুরমাত তথা সম্মান প্রদর্শন কর, ঠিক সেভাবে তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের সম্পদও তোমাদের উপর হারাম। ভালভাবে শুনে রেখ, জাহিলিয়া যুগের সমগ্র খারাপ রসম ও রেওয়াজ আজ আমি আমার দু'পায়ে মাড়িয়ে দিলাম। বিশেষ করে জাহিলিয়া যুগের প্রতিশোধ ও রক্তমূল্য গ্রহণের রীতি একদম মুছে ফেলা হল। আমি সর্বপ্রথম আমাদের ইবনে রাবীআর[৩] রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ পরিত্যাগ করলাম। জাহিলিয়া যুগের সুদ গ্রহণের পদ্ধতিও বাতিল ঘোষণা করা হল। আর আমি সর্বপ্রথম স্বয়ং আপন চাচা আব্বাস বিন আবদূল মুত্তালিবের সুদ পরিত্যাগ করলাম। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক, আমি তোমার পয়গাম তোমার বান্দাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি।

দ্বীনের পরিপূর্ণতা

এবার সত্য পুনর্জীবিত হয়ে আপন মূল কেন্দ্রে চলে এল এবং পিতা দুনিয়ার পথ প্রদর্শনের জন্য যে কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা পুত্রের আধ্যাত্মিক সফরের শেষ মনযিল হিসাবে সাব্যস্ত হলো এবং এই কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছার পর ইসলামও পরিপূর্ণতা লাভ করলো। আর তা এজন্য যে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে শান্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিয়েছিলেন এবং আসমানী ফিরিশতাও তাঁকে তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌছার সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"–(৫ঃ৩)

আরো কিছু কথা

সূরা হাজ্জের টীকায় বলা হয়েছে, বাহ্যত: মনে হয় যে, অত্র সূরার ২৬ থেকে ২৭ নং আয়াত পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তার সবই সেই নির্দেশের বর্ণনা যা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেয়া হয়েছিল। তবে তাফসীরকারকগণ শেষ অংশটুকে সরাসরি সম্বোধন বলেছেন। যা হোক উভয় অবস্থার যাবতীয় ব্যাখ্যা একথারই বিশ্লেষণ যে, جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَنِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ –"যা আমি করেছি স্থানীয় ও বাইরের সবার জন্য সমান।"–(২২:২৫)

আর এজন্যই হজ্জ ও কুরবানীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব দূরের ও কাছের লোকেরা আসতে থাকবে এবং সংগে থাকবে তাদের কুরবানীর পশু। এখন যদি মক্কার কুরায়শদের এ অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয় যে,তারা এখানে যাকে ইচ্ছা আসতে দেবে এবং যাকে ইচ্ছা আসতে দেবে না তাহলে একা'বা কা'বাই থাকবে না এবং হজ্জও হজ্জ থাকবে না।

কুরবানির হাকীকত কী, তা আংশিক বর্ননা করা হয়েছে। সূরা হাজ্জের ২৭ও ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর গোশত্ তোমরা নিজেরাও খাও আর গরীবদের খেতে দাও। অর্থাৎ এর দ্বারা পশুর রক্ত প্রবাহিত করা উদ্দেশ্য নয়, যেমন সাধারণ মানুষ মনে করে থাকে, তারা মনে করে এর গোশত খাওয়াই উদ্দেশ্য । আলোচ্য সূরায় ৩৭ নং

আয়াতে পরিস্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, প্রকৃত ইবাদত হচ্ছে তোমাদের অন্তরের তাক্ওয়া, কুরবানীর গোশ্ত ও রক্ত নয়।

পৌত্তলিক সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে কুরবানীর রীতি এভাবে প্রচলিত ছিল যে, তারা মনে করে বসেছিল মানুষের ন্যায় দেবতাদেরও নৈবেদ্যের প্রয়োজন। আর জন্তুদের রক্তপাত করলে দেবতাদের রোষানল দমিত হয়। কিন্তু কুরআন বলেছে, না আল্লাহ্ পর্যন্ত গোশতের নৈবেদ্য পৌঁছতে পারে, আর না তিনি রক্তপাতের প্রত্যাশী। প্রকুতপক্ষে যে জিনিষটি তাঁর কাছে গ্রহণীয় হতে পারে তা হচ্ছে অন্তরের পুণ্যতা ও পবিত্রতা।

টীকা ঃ

১। এর দ্বারা ইহরামের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। কেননা হজ্জ সম্পাদন কালে (ইহরাম বাধাঁ অবস্থায়) সকলে একই পোষাক পরিধান করে। অর্থাৎ দু'টি মাত্র চাঁদর- একটি ওড়নার জন্য অপরটি পরার জন্য। তখন সবার মাথা উলঙ্গ থাকে।

২। রাসুলূল্লাহ্ (সা) কাবাকে পবিত্র করার জন্য মক্কা মুকাররমা পরিত্যাগ করে মদীনায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে ছিলেন। এখানে একথারই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

৩। ইবনে রাবী'আ বিন আল হারিস, যাকে হুযায়ল হত্যা করেছিল।

হজ্জের উদ্দেশ্যাবলী

ইবাদত ও আমালের লক্ষ্য

বিশ্বের সমগ্র ধর্মের মধ্যে ইসলামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, সে তার সমগ্র ইবাদাত ও আমালের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে এবং তা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে দিয়েছে। সালাতের লক্ষ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই বলে যে,

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط .

"সালাত কায়েম কর। সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকার্য হতে।" –(২৯:৪৫)

সিয়ামের লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

"হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার।" – (২:১৮৩)

যাকাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا .

"ওদের সম্পদ হতে সাদকা (যাকাত) গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি ওদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন।" –(৯ ঃ ১০২)

হাদীস দ্বারা বিষয়টিকে আরো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন–

اَلصَّدَقَةُ اَوْسَاخُ الْمُسْلِمِيْنَ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ اِلٰى فُقَرَائِهِمْ .

"সাদকা হচ্ছে মুসলামানদের অন্তরের ময়লা। এটাকে বিত্তশালীদের কাছে থেকে গ্রহণ করে বিত্তহীনদেরকে প্রদান করা হয়েছে।"

অনুরুপভাবে হজ্জের লক্ষ্য তথা উপকারীতা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ .

"যাতে তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে ।

হজ্জ ও ব্যবসা বাণিজ্য

উপরোক্ত আয়াতে যে সব উপকারীতাকে হজ্জের লক্ষ্য সাবস্ত করা হয়েছে তা দ্বারা, সমষ্টিগত ও অর্থনৈতিক উপকারিতাকে বুঝাচ্ছে। আর এটা (অর্থনৈতিক উপকারিতা) হচ্ছে হজ্জের এমন একটি লক্ষ্য, যেটাকে সাহাবা কিরাম দ্বীনী লক্ষ্যের প্রতিবন্ধক, মনে করে যখন একেবারে পরিত্যাগ করতে চাচ্ছিলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ ط .

" তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে (বাণিজ্য করতে) তোমাদের কোন পাপ নেই।"–(২ঃ১৯৮)

পবিত্র কুরআনের সাধারণ সম্বোধন ভঙ্গি এই যে,তার লক্ষে খন্ডিত বিষয়ের উপর নয়, বরং অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিয়য়ের উপর নিবদ্ধ থাকে। এই ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা যে ধরণের বাণিজ্যকে হজ্জের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন এবং এজন্য উৎসাহ উদ্দীপনা দান করেছেন তা ছিল আরবের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন। আরবরা যদিও একটি যাযাবর ও অসভ্য জাতি ছিল– তা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদি তাদেরকে সভ্যতার একটি বিরাট শাখা অর্থাৎ বাণিজ্যর প্রতি প্রারম্ভিক যুগ থেকেই ঝুকিয়ে দিয়েছিলো। কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া প্রভৃতি দেশে পণ্য সামগ্রী নিয়ে যেত। ফলে সেখানকার লোকদের সাথে তারা একটি বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলো। খোদ মক্কার নিকটে উকায, যুল মাজায প্রভৃতি অনেক হাটবাজার ছিল এবং সেগুলো হজ্জের মওসুমে এক একটি বিরাট মেলায় পরিণত হত। অতএব আরবদেরকে বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট করার খুব একটা প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ইসলাম বিশ্বব্যাপী যে নাগরিক জীবন সুষ্টি করতে চাচ্ছিলো তার অনুপাতে উকায , যুল মাজান্না এবং যুল মাজাযের বিরত্ব ও ব্যাপকতা যথেষ্ট ছিল না। ইসলাম বিশ্বের সমগ্র সভ্য জাতি সমুহের ন্যায় আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যর একটি পৃথক ধারা ক্বায়েম করতে চাচ্ছিলো। কেননা সে যে অচিরেই সূর্যের ন্যায় হিজাযের পাহাড়সমুহ থেকে উদিত হয়ে সমগ্র জলে স্থলে বিস্তার লাভ করবে।

এরপব উক্ত আয়াতে যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উপকারিতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তদ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে একটি ব্যাপকতর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যর সূচনা হবে। অন্যথায় আরবরা সেধরণের বাণিজ্য করত তা তো সর্বাবস্থায়ই কায়েম রাখা যেতো। অবশ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি শান্তি স্থাপন, ন্যায় বিচারের বিস্তার এবং সাধারণ জনসমাবেশের উপর ছিল নির্ভরশীল। এজন্যই যখন পরিপূর্ণ 'আমন' (শান্তি) ও ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং হজ্জ (দ্বীনের) রাস্তার সকল ধরনের উচুনীচু সমতল করে দিল তখনই আল্লাহ্ তা'আলা মুসলামানদেরকে সভ্যতার এই বিরাট উপকারিতার প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করলেন।

সর্বোচ্চ লক্ষ্যসমূহ

এই ব্যাখ্যা -বিশ্লেষন ছাড়াও কুরআন মজীদের আরো একটি সম্বোধন ভঙ্গি আছে, যা শুধু বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক রাখে। কুরআন মজীদের সাধারণ বর্ণনা ভঙ্গি এই যে, সে যে ভাবার্থকে সাধারণভাবে হৃদয়ঙ্গম করাতে চায়, বা যে ভাবার্থ অন্তত:পক্ষে প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ঙ্গম হতে পারে সেটাকে সে খোলাখুলি ভাষায় প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু যে সূক্ষ্ম ভাবার্খ সাধারণ মানুষের হৃদয়ঙ্গম হয় না সেগুলোকে শুধুমাত্র আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করে।

হজ্জের লক্ষ্যাদির মধ্যে বাণিজ্য এমন একটি বিষয় ছিল, যার সম্পর্ক ছিল প্রত্যেকটি ব্যক্তির সাথে এবং এর উপকারিতা সাধারণভাবে যে কোন ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গ হতে পারত। এজন্য আল্লাহ্ ত'আলা এটাকে অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হজ্জের আরো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল, যেটাকে যদিও খোলাখুলি ভাবে বর্ণনা করা হয় নি , কিন্তু প্রতিটি পদে পদে তার দিকে এত বেশী করে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, যদি এই সকল আয়াতকে একত্রিত করা হয় তাহলে এগুলো দিয়েই বেশ কয়েক পৃষ্ঠা ভর্তি হয়ে যাবে।

আল্লাহ্‌র হাকীকত ও মারিফাতসমুহ প্রকাশে কুরআন মজীদ সাধারণত: এধনেরই সম্বোধন বেছে নিয়েছে যার দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্লেষিত না হওয়া সত্ত্বেও হাকীকতের চেহারা একদম প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। সফর মূলতঃ মানবীয় উন্নতির যাবতীয় স্তরকে অন্তর্ভুক্ত রাখে। এর মাধ্যমে মানুষ বাণিজ্যও করতে পারে, জ্ঞানার্জনও করতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষ ধর্ম তথা ন্যায়-সত্যা প্রচারের দায়িত্বও আনজাম দিতে পারে। সর্বোপরি সমগ্র বিশ্বের হিদায়াত ও ইসলাহ্ , সংস্কার ও সংশোধন, জুলুম-অত্যাচার প্রতিরোধ, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ তথা অনেক গুরুত্বপুর্ণ কাজ আন্‌জাম দেওয়ার জন্যও সফরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন।

উম্মতে মুসলিমাহ্

কিন্তু এই সব বিষয়েরও পূর্বে যাবতীয় উন্নতির ভিত্তি স্বরূপ একটি বিশেষ উম্মতে মুসলিমাহ্ ‘হিযবুল্লাহ্’ তথা আল্লাহ্‌র দল সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে সুসংগঠিত ও সুদৃঢ় করার প্রয়োজন ছিল।

হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) হজ্জের প্রথম লক্ষ্য এটাকেই সাব্যস্থ্ করেছিলেন।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا - إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

“হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আম্মাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত কর । আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” – (২ঃ ১২৮)

কিন্তু যে ছাঁচে কাওমিয়াত তথা জাতীয়তার অবয়ব তৈরী হয়, তার মধ্যে দু'টি শক্তি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে কাজ করে। আর সেগুলো হচ্ছে আবহাওয়া ও মাহযাব (ধর্ম)।

আবহাওয়া ও মাযহাব

আবহাওয়া এবং ভৌগলিক ও স্বাভাবিক সীমারেখা যদিও জাতীয়তার যাবতীয় অংশকে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পরিবেষ্টন করে, কিন্তু এগুলোর প্রভাব–বলয়ে অন্য কোন জাতি প্রবেশ করতে পারে না । ইউরোপ ও হিন্দুস্তানের প্রাচীন জাতীয়তা বিশ্বের শুধুমাত্র একটি সীমিত অংশে প্রতিপালিত ও বর্ধিত হয়েছে এবং আবহাওয়ার প্রভাব এগুলোকে দুনিয়ার অন্যসব জাতি থেকে একদম পুথক করে দিয়েছে। কিন্তু মাযহাবের প্রভাব বলয় অতান্ত ব্যাপক হয়ে থাকে। সে একটি সীমিত ভূখন্ডে তার কর্ম সমাধা করে না । বরং দুনিয়ার প্রত্যেকটি অংশকে নিজের কোলে স্থান দেয়। আবাহাওয়ার ঘূর্ণিবাত্যার সংঘর্ষ আপন উপকুলে কোন বিজাতীয় লোকদের আসতে দেয় না। কিন্তু মাযহাবের করুনামেঘ আপন ছায়ায় সমগ্র দুনিয়াকে গ্রহণ করে। হযরত ইবরাহীম (আ) যে বিরটি জাতির অবায়ব গড়ে তুলেছিলেন তার উপাদান শুধুমাত্র মাযহাব ছিল। তার রূহানী গঠনের জন্য আবহাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না । জামা'আত কায়েম হওয়ার পর যদিও তা একটি অনুভূত বৈষয়িক আকারে পরিদৃষ্ট হয়, কিন্ত প্রকুতপক্ষে তার গঠনতান্ত্রিক নিযাম(ব্যবস্থাপনা) সম্পূর্ণ রূহানী পদ্ধতিতে বিন্যাসিত হয়, যাকে শুধুমাত্র কল্পনা এবং সাধারণ অর্থে শুধুমাত্র মাস্তিকজাত শক্তিসমুহের ঐক্য ও সম্মিলন বিন্যাস্ত করে।

ঐক্য সৃষ্টির উপাদান

এর ভিত্তিতে এই জাতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই হযরত ইবরাহীম (আ) ধর্মীয় ঐক্য সুষ্টির একটি উপাদান নির্ধারণ এবং তা সুদৃঢ় করেছেন।

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ‎.‎ وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ط يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ‎.‎

"তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর' সে বলেছিল, জগতসমুহের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।'এবং ইবরাহীম ও য়াকূব এই সম্বন্ধে তাদের পুত্রদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, হে পুত্রগণ আল্লাহ্‌তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে(ইসলামকে) মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যু বরণ করো না।" -(২ঃ ১৩১-৩২)

প্রথম সৃষ্টি

জামাআত সাধারণত: আপন আকায়িদ সমূহের বাস্তবায়ন দুনিয়ার প্রশস্ত অঙ্গনে দেখতে চায় এবং এর মাধ্যমে নিজেদের জাতীয়তার প্রাচীন পছন্দনীয় যুগকে সজীব করে তোলে। এজন্য তারা এই নতুন সৃষ্ট জাতীয়তার প্রকাশ ও পরিপূর্ণতার জন্য একটি অত্যন্ত পবিত্র ও প্রশস্ত বাসাও তৈরী করে।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ‎.‎

"স্মরণ কর যখন ইবহাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের প্রাচীর তুলছিল তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক. আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।" -(২ঃ১২৭)

এটা শুধু ইটপাথরের ঘর ছিল না , বরং ছিল একটি রূহানী জামা'আতের অবয়বের উপাদানরাজি। তাই যখন তা তৈরী হয়ে গেল তখন তারা সেই জামাআত সৃষ্টির জন্য দু'আ' করেন–

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص ‎.‎

" হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত কর।" -(২ঃ১২৮)

এবার সেই জাতি সৃষ্টি হয়ে গেল এবং হযরত ইবরাহিম (আ) আপন শেষ অসীয়তের মাধ্যমে এই রূহানী উপাদানটি তাদের কাছে সমর্পণ করেন।

وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ط يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ‎.‎

"এবং ইবরাহীম ও ইয়াকুব এই বলেছিল, হে পুত্রগণ,আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে (ইসলামকে) মনোনিত করেছেন । সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যু বরণ করো না।"-(২ঃ১৩২)

اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ لا اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ ط قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ‎.‎

"য়াকূবের কাছে যখন মৃত্যু এসেছিল; সে যখন পুত্রদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে? তারা তখন বলেছিল, 'আমরা আপনার ইলাহ্-এর ও আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইস্হাকের ইলাহ্-এরই ইবাদত করব। তিনি একমাত্র ইলাহ্ এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী।"–(২:১৩৩)

অপরিবর্তনীয় নিদর্শন সমূহ

যদিও এই জামা'আত দুনিয়ায় বিদ্যমান ছিল না এবং কালচক্র এর নিদর্শন সমূহকে প্রভাবহীন করে ফেলেছিল– تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ . –"সেই উম্মত অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের, তোমরা যা অর্জন কর তা তোমাদের।"–(২:১৪১)-কিন্তু এর প্রতিপালন ও প্রতিবর্ধনের প্রাচীন যুগ তখনো কালচক্রের হস্তক্ষেপ থেকে বেঁচে ছিল এবং বেশ কিছু সংখ্যক পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন ছিল তখনো অম্লান। এর অভ্যন্তরে তখন পর্যন্ত যমযম কূপ তরঙ্গায়িত হচ্ছিলো, সাফা মারওয়ার চূড়া তখনো শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। ইসমাঈলের কুরবানীস্থল তখনো মাযহাবের উষ্ণ রক্তে ছিল রঞ্জিত। 'হাজারে আসয়াদ' তখনো তাওয়াফকারীদের চুম্বনস্থল ছিল। 'মাশাইরে ইবরাহীম' তখন পর্যন্ত কায়েম ছিল। আরাফাতের সীমার মধ্যে তখনো কোন পরির্তন করা হয়নি। মোটকথা, এর ভিতরে আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুই ছিল,–অতএব এতে অন্য কিছুর নয় বরং অভাব ছিল শুধুমাত্র তাঁরই বিশ্বব্যাপৃত সৌন্দর্যের।

ইবরাহীমী দু'আর শেষ ফলশ্রুতি

এ কারণেই এর নবায়ন এবং এর মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেবার জন্য দীর্ঘকাল পর হযরত ইবরাহীম (আ)–এর দু'আর শেষ ফলশ্রুতি প্রকাশিত হল। তিনি কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়ে দু'আ করছিলেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

" হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করো, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের কাছে আবৃত্তি করবে; তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" – (২:১২৯)

অবশেষে তাঁর আবির্ভাব ঘটলে রাহমাতুল্ লিল্ আলামীন ও খাতামুল মুরসালীনরূপে, ঠিক যেভাবে দু'আ করেছিলেন হযরত ইবরাহীন (আ)।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ .

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।" – (৬২:২)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাব

অতএব তিনি যে জাতি সৃষ্টি করে রেখেছিলেন তাদের মধ্য থেকে একজন নবী আবির্ভূত হলেন। তিনি এই ঘরের ভেতরে সর্বপ্রথম আল্লাহ্কে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। কিন্তু তিনি আড়াল হয়েছেন ইট পাথরের স্তূপের নীচে। মক্কা বিজয় সেই স্তূপকে যখন হটিয়ে দিল তখন আল্লাহ্র নূরে হারাম শরীফের ঝাড়বাতি পুনরায় প্রজ্জ্বলিত

হল। ঐ জাতি, যার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) দু'আ করেছিলেন– এই নবীর [মুহাম্মদ (সা)-এর] সংসর্গগুণে তারা পুরাপুরি পবিত্রকারী ও প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। এবার একটি কেন্দ্রে একত্রিত করে তাদের মাযহাবী প্রেরণাকে প্রজ্জ্বলিত করার কাজ শুধু বাকি ছিল। অতএব তাদেরকে কা'বা ঘরের ভেতরে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো এবং এর পবিত্র প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলোর নবায়ন ও সঞ্জীবিতকরণ দ্বারা তাদের মাযহাবী প্রেরণাকে পোক্ত ও সুদৃঢ় করে দেওয়া হলো।

নবী (সা) কখনো তাদেরকে বলেন–

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ج فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ط وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ـ

"সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেউ কা'বা ঘরের হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে এই দু'টির মধ্যে যাতায়াত করলে তার কোন পাপ নেই এবং কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকার্য করলে আল্লাহ্‌ পুরস্কারদাতা ও সর্বজ্ঞ।" – (২:১৫৮)

আবার কখনো তাদেরকে 'মাশ'আরে হারাম' স্মরণ করিয়ে দেন –

فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

"যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন 'আশ'আরুল হারাম' (আরাফাত ও মিনার মধ্যবর্তী মুযদালিফা নামক উপত্যকায় অবস্থিত পাহাড়কে 'মাশআরুল হারাম' বলা হয়) -এর নিকট পৌঁছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে।" – (২:১৯৮)

কা'বাঘর ছিল বিশ্বের সব চাইতে পুরাতন নিদর্শন। এবার এক এক করে তার প্রত্যেকটি নিদর্শনকে সঞ্জীবিত করা হয়। فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ –"এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইবরাহীম।" – (৩:৯৭)

কিন্তু যে সব লোক আল্লাহ্‌র পথে সুদৃঢ় থাকে তাদের পদচিহ্ন মানুষের সিজদাস্থল হওয়ার যোগ্য ছিল। তাই নির্দেশ দেওয়া হলো – وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِمَ مُصَلاًّ –"তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো।" –(২:১২৫)

রূহানী নির্দশনসমূহ

জড় নিদর্শনসমূহ পরিদর্শন শুধুমাত্র ভ্রমণ ও স্ফূর্তির জন্য করা হয়। কিন্তু রূহানী নিদর্শনসমূহ দ্বারা শুধুমাত্র অন্তরের চক্ষু সমূহই দৃষ্টি লাভ করতে পারে। এজন্য রূহানী নিদর্শনসমূহের প্রতি শিষ্টতা প্রদর্শনকে তাক্‌ওয়া ও উপদেশ গ্রহণের দলীল হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ـ

" কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাকওয়া সঞ্জাত" – (৯২২:৩২)

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এই পবিত্র নিদর্শনসমূহের রূহানী প্রভাবকে অন্তরসমূহের সাথে মিশিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি মানুষকে বিশেষভাবে এগুলোর দিকে আকৃষ্ট করতে থাকেন। খুব মনোযোগের সাথে দেখ এবং উপদেশ গ্রহণ করো। কেননা,

هذه مشاعر ابيكم ابراهيم

"এগুলো হচ্ছে তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ) এর নিদর্শন।"

নি'মাত পরিপূর্ণকরণ

যখন ইসলাম এই নব সৃষ্ট জাতির অস্তিত্বকে পরিপূর্ণ করে দিল এবং কা'বা ঘরের ঐ সব পবিত্র নির্দশনাদির আধ্যাত্মিকতা, এর জাতীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করে দিল তখন পুনরায় মিল্লাতে ইবরাহীমীর বিস্মৃত পন্থাকে দেখিয়ে দেওয়া হলো।

فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণ কর, সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" – (৩:৯৫)

এবার সমগ্র আরব, একটি সরল সোজা রেখাকে নিজেদের কেন্দ্রস্থল বানিয়ে নিল এবং পুরাতন রেখাকে ভুল অক্ষরের ন্যায় মুছে ফেলল। যখন এসব কিছু হয়ে গেল তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম ও ইসমাঈলের সবচেয়ে বড় ইহ্সান (দান) কে পুর্ণ করে দিলেন।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পুর্ণাংগ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।" – (৫:৩)

ঈদ এবং শরীয়তকে পরিপূর্ণ করণ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۔

ভূমিকা

অগ্নিস্ফূলিঙ্গ আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু যখন তা ফেটে পড়ে তখন সমগ্র দুনিয়াকে ঢেকে ফেলে। বর্ধনশক্তি মাটির অণু-পরমাণুতে নিহিত থাকে। কিন্তু যখন বসন্তঋতু আসে তখন তার মধ্যে এমনি উদগীরণ আসে যে, তার জন্য যমীনের অভ্যন্তরভাগ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। পানির গড়িয়ে পড়ার শক্তি মেঘের একটি টুকরার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। কিন্তু যখন তা বর্ষে তখন পরিব্যাপ্ত হয়ে স্থলজলকে একাকার করে দেয়। বিজলী প্রবাহ বিশ্বের প্রত্যেকটি অণুপরমাণুতে রয়েছে। কিন্তু যখন তা তরঙ্গায়িত হয় তখন কুদরতের কারখানার প্রতিটি অংশের মধ্যে হঠাৎ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। তরঙ্গ সমুদ্রের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু যখন তা জাগে ও উপর দিকে উত্থিত হয় তখন সমুদ্রের মধ্যে মহা আলোড়নের সৃষ্টি করে।

ইসলাম

ইসলামও ছিল এ ধরনেরই একটি অগ্নিস্ফূলিঙ্গ, একটি বর্ধন শক্তি, আবে হায়াতের প্রবাহমান একটি ঝর্ণা, আলোড়নসৃষ্টিকারী বিদ্যুতের একটি প্রবাহ এবং দ্রুত সম্প্রসারণশীল একটি হিদায়াত-তরঙ্গ,যা উড়ে এসে মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার বাগানে আগুন লাগিয়ে দিল, ফিত্‌না ফাসাদের জগতে প্রতিষ্ঠা করল শান্তি ও নিরাপত্তা এবং মূলোৎপাটন করল কুফ্‌র ও শির্‌কের।

ইসলামের সীমাহীন পরিব্যাপ্তি

এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, এই বর্ধনশক্তি, এই বিদ্যুৎ এবং এই তরঙ্গ হেরা গুহায় লুকিয়ে ছিল। একটি মহান রাতে সে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সীমাহীন ভূখন্ড ও একটি অনাবাদ ভূগোলক। সে সম্প্রসারিত হতে চাইল, কিন্তু কুফরীর বেলাভূমি তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠল।

এবার ইসলাম দুনিয়ার অন্যান্য অংশে সম্প্রসারিত হলো। কেননা সংকুচিত হওয়া ছিল তার জন্য প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আর প্রকৃতির বিরোধিতা করা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে আহবান করারই নামান্তর।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ط قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ط قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ط فَاُولٰئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَائَتْ مَصِيْرًا ۔ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ

وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّ لاَ يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً ۔ فَأُولٰئِكَ عَسَى
اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوْ عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۔ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ
فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّ سَعَةً ط وَّ مَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۔

"যারা নিজেদের উপর জুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফিরিশতারা বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় অবস্থায় ছিলাম,' তারা বলে, 'দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে?' এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর ওটা কত মন্দ আবাস। তবে যে সব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না, আল্লাহ্ হয়ত তাদের পাপ মোচনকারী ক্ষমাশীল। কেউ আল্লাহ্র পথে হিজরত করলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে এবং কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজ ঘর হতে মুহাজির হয়ে বের হলে এবং তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্র উপর। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৪:৯৭-১০০)

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে হিজরত করবে সে দুনিয়ায় প্রাচুর্য, পরিত্রাণ এবং সাফল্য পাবে। আর যে ব্যক্তি আপন ঘর হতে বের হয়ে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের দিকে হিজরত করে এবং রাস্তার মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ যে, তার প্রতিদান আল্লাহ্র উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আরো পরিব্যাপ্তি

ইসলাম দুনিয়ায় প্রসারিত ও পরিব্যপ্ত হলো এবং আবিসিনিয়া ও মদীনার অধিবাসীরা এর ছায়াতলে আশ্রয় নিল। বদর ও হুনায়ন, এর জন্য আপন আঁচল খালি করে দিল। বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীরের সবুজ সতেজ বাগানসমূহ এর জন্য নিজের জায়গাকে সজ্জিত ও বিন্যস্ত করল। খায়বারের খেজুর বাগানসমূহ একে নিজেদের ছায়ায় বসাল। এদত্সত্ত্বেও সে আরো বেশী সম্প্রসারিত হওয়ার পথ খুঁজতে লাগলো এবং নিজেকে আরো পরিব্যাপ্ত করার জন্য আন্দোলিত হয়ে উঠলো।

শরীয়ত-প্রাসাদের শেষ ইট

শরীয়ত প্রসাদের শেষ ইট ঐ অভাবকে পূরণ করে দিয়েছিল, যার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্র দ্বীনের বিরাট ইমারত, সমগ্র দুনিয়ার কাছে বিশ্রী ঠেক্ছিলো।

ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم قال انّ مثلى ومثل الانبياء من قبلى
كَمَثَلِ رَجُلٍ بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضِعَ لَبِنَةٍ من زاوية فَجَعَلَ
النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ به و يَعْجَبُوْنَ له و يقولون هلاّ وُضِعَت هذه اللبِنَةُ قال فانا
اللَّبِنَةُ وَانَا خَاتِمُ النَّبِيّنَ ۔

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার এবং পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে অত্যন্ত সুদৃশ্য একটি ঘর নির্মাণ করেছে, কিন্তু এর কোন একটি কোণায় একটি ইট লাগানো বাকী রয়ে গেছে। এরপর লোকেরা ঘরে ফিরে দেখল এবং খুব সন্তুষ্ট হল; এবং তারা বলাবলি করতে লাগলো, কেন এই টি লাগানো হয় নি? জেনে রেখ, আমি সেই ইট। আর এ কারণেই আমি খাতামুল আম্বিয়া (শেষ নবী)।" – বুখারী।

শরীয়তে ইসলামিয়া এই অভাব পূরণ করে দিয়েছিল, কিন্তু গোটা বিশ্বকে তা দেখানো এখনো বাকি ছিল। বিদায় হজ্জে আল্লাহ্ তা'আলা এই ইমারতকে তার পরিপূর্ণ অবয়বের মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং সমগ্র দুনিয়া কা'বা ঘরের তাওয়াফ করে দেখে নিয়েছে যে, এখন একটি ইটের জায়গাও আর খালি নেই।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।" – (৫:৩)

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অংশসমূহ

পবিত্র কুরআনের অভ্যন্তরীণ এবং রূহানী দিকের ন্যায় ঐ সব কাহিনী এবং ঘটনাও কম গুরুত্ব রাখে না যেগুলোর প্রেক্ষিতে এর পবিত্র সূরা ও আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে। ইটও গারা (ঠাসানো মাটি) নি:সন্দেহে দেওয়ালের অপরিহার্য অংশ। কিন্তু এগুলো দ্বারা সেই শুভ্রতার আকর্ষণের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে না – যা যদিও দেওয়ালের পৃষ্ঠদেশ, কিন্তু তা ঘর এবং ঘরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রমকারীকে নিজের দিকে অনেক বেশী আকৃষ্ট করছে।

আল্লাহ্র দ্বীনও একটি ইমারত, যার নির্মাণ কাজ আদি থেকে শুরু হয়েছে এবং খতমে নুবুওয়াতের শেষ ইট এটাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। এজন্য এটাও অন্যান্য ইমারতের ন্যায় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অংশসমূহ দ্বারা গঠিত। প্রথম প্রকারের অংশগুলো এর দৃঢ়ায়ন ও সংগঠনের কাজ করেছে এবং দ্বিতীয় প্রকারের অংশসমূহ এর রং ও শোভা-সৌন্দর্য প্রকাশ করেছে।

কা'বা পরিবর্তনের আকাংখা

ইসলাম কখনো এ অভিযোগ করে নি যে, এর অংশসমূহ পূর্ণ করা হচ্ছে না। তবে সে সর্বদা এগুলো প্রকাশ করার আকাংখা করেছে। মক্কায় শুধুমাত্র দু'রাক'আত সালাত ফরয করা হয়েছিল। সাহাবা কিরাম তাতেই তুষ্ট ছিলেন। অবশ্য তাঁদের এ আকাংখা ছিল যে, যেন স্বাধীনভাবে এই সংক্ষিপ্ত ইবাদত সম্পন্ন করার সুয়োগ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরযসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা কখনো করেন নি, কিন্তু কিবলা পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে আসমানী ওহী নাযিলের পথে তাকিয়ে থাকতেন।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ

"আকাশের দিকে আপনার বার বার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করি।"–(২:১৪৪)

কেননা, কিবলাই ছিল দ্বীনে ইসলামের শক্তি ও গতির সর্বপ্রথম কেন্দ্র ও সর্বশেষ বহিঃপ্রকাশ। এ কারণেই দাওয়াতে ইবরাহীমীর পরিপূর্ণকারী মুহাম্মদ (সা) অত্যন্ত ব্যাকুলতার সাথে এর পরিবর্তনের অপেক্ষা তথা আকাংখা করতেন।

পরিপূর্ণ প্রকাশ

মূল হাকীকতের দিক দিয়ে ইসলাম ছিল বিশ্বের সমগ্র ধর্মের দীপ্তি ও প্রভা। ধর্মসমূহের যাবতীয় প্রাথমিক ও মৌলিক অংশসমূহ প্রথম থেকেই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সে (ইসলাম) শুধু সেগুলোকে প্রজ্জ্বলিত ও প্রতিভাত করে দিয়েছিল মাত্র।

ইসলামের হৃদয় প্রকৃতপক্ষে মক্কায়ই গঠিত হয়ে গিয়েছিল। মদীনায় এসে তার অংশসমূহও পরিপূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু এটা ছিল একটা আবরণহীন সৌন্দর্য, যা বিশ্বের সামনে প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত হতে চাচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত বিদায় হজ্জ তাকে উদ্ভাসিত করে দিল। ফলে সমগ্র বিশ্ব তার দীপ্তিমান চেহারাটি দেখার সুযোগ পেল।

আরাফাতের মাঠে ইসলামের হাকীকতের এই পূর্ণ প্রকাশের ঘোষণা দেওয়া হলো–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

ইসলামের লক্ষ্য

ইসলাম দুনিয়ার সামনে প্রকাশিত হয়ে বা নিজের চেহারা দেখিয়ে চলে যেতে চাচ্ছিলো না। সে চাচ্ছিলো পরিপূর্ণ বিজয়–অর্থাৎ সে এমন একটি বিরাট ইলাহী খিলাফতের ভিত্তি স্থাপন করতে চাচ্ছিলো, যা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে, ইলাহী নিদর্শনসমূহের হিফাযত করবে, বিশ্বকে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম দেবে, সাম্যের শিক্ষা প্রদান করবে, পুরাতন শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ মুছে ফেলে নতুনভাবে প্রেম-ভালবাসার ভিত্তি স্থাপন করবে এবং বিশ্বকে কাজ কারবারের সঠিক আদর্শ বাত্‌লে দেবে। ইসলাম এমন একটি হুকূমত চাচ্ছিলো, যা মানুষের যাবতীয় আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ও কাজ-কারবারকে অন্তর্ভুক্ত রাখবে। এই ইমারতের ভিত্তি যদিও মক্কায় স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু তার দ্বারোদ্ঘাটন করা হয় বিদায়হজ্জে। এ কারণে দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দানের একটি ঘোষণাও এই সময়ে দেওয়া হয়।

আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রথম থেকেই দীপ্তিমান ছিল। আজ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পরিপূর্ণ দীপ্তি ও পরিপূর্ণ মর্যদা দান করলেন এবং তার উপর নিজের পসন্দের মোহর লাগিয়ে দিলেন এই বলে যে–

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

"এবং আমি ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"

সৎকর্মপরায়ণ জাতি এবং রাষ্ট্র

বিশ্বের কোন মাযহাবের আহবায়ক, বিশ্বের কোন সৎকর্মপরায়ণ জাতি, বিশ্বের কোন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূল–রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে সার্বিকভাবে সাফল্য লাভ করতে পারেন না। তাই দেখা যায়, বিশ্বে যখনই কোন সৎকর্মপরায়ণ জাতির অভ্যুদয় ঘটেছে এবং তারা পুণ্য বিস্তার ও সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধের দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেননি ততক্ষণ তাদের ধর্ম আল্লাহ্‌র শেষ মর্জি মুতাবিক প্রতিষ্ঠিতও হয়নি। খোদ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ .

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব (খিলাফত) দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী।"-(২৪ঃ৫৫)

পরিপূর্ণকরণের ব্যাখ্যা

আল্লাহ্ তা'আলার এই প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মক্কায় একটি জাতি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম ইখতিয়ার করে, তাই আল্লাহ্ তা'আলা যমীনের প্রতিনিধিত্ব দান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য যে দ্বীন নির্বাচন করেছিলেন মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত তা সুদৃঢ় হয়নি। মক্কা বিজয়ই তাকে সুদৃঢ় করে দিল। মদীনায় অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)- সমগ্র আরবের শিরকী শক্তির শির দাঁড়া ভেংগে দিয়েছিলো। শুধুমাত্র মক্কাবাসীরা নিজেদের আসল অবস্থার উপর কায়েম ছিল। সেই সময়ে ইসলামের যদি কোন ভয় থেকে থাকে তাহলে তা ছিল ঐ কেন্দ্রীয় শক্তির। মক্কা বিজয় এই শক্তিকে পর্যুদস্ত করে দিল। এরপর ভয় স্থলাভিষিক্ত হল শান্তি ও নিরাপত্তার। এই শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং আল্লাহ্র বান্দাকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্যই থাকা। মক্কা বিজয়ের দিন যখন তিন শ ষাটটি মূর্তিকে ভেংগে ফেলা হল এবং এই মর্মে আওয়াজ বুলন্দ করা হলো যে, 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে' (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ) তখন 'তাওহীদে ইলাহী'-এর জন্য ময়দান একদম পরিস্কার হয়ে গেল। বিদায় হজ্জের পূর্বেই ঘোষণা দেওয়া হয়ে গেল যে, কোন মুশরিক আর কা'বা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। এটাই ছিল দ্বীনে ইলাহীর পরিপূর্ণতা, এটাই ছিল সাধারণ বিজয়, এটাই ছিল পরিপূর্ণ প্রকাশ, আর এটাই ছিল প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করেছিলেন এই বলে যে-

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ۙ

"তিনিই পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন, অপর সব দীনের উপর তাকে জয়যুক্ত করার জন্য।-(৯ঃ৩৩)

উক্ত প্রতিশ্রুতি যখন পূর্ণ হল তখন উম্মতকে নিম্নোক্ত মহা সুসংবাদটি শুনানো হলো ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

ঈদের গণ উৎসব

উপরোক্ত আয়াত জুম'আর দিন আরাফাতের ময়দানে নাযিল হয়েছিল এবং এটাকে আল্লাহ্র এমন একটা দান মনে করা হলো যে, জনৈক য়াহূদী হযরত উমর (রা) কে আক্ষেপ করে বলেছিল, যদি এমন একটি আয়াত আমাদের মাযহাবে নাযিল হত তাহলে আমরা তার নাযিল হওয়ার স্মরণে ঈদ উদযাপন করতাম। হযরত উমর (রা) উত্তরে বলেন, আমাদের এটাকে স্মরণীয় করে রাখার প্রয়োজন হয়নি। কেননা, এই আয়াত ঐ দিন নাযিল হয় যখন আল্লাহ্র বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাহ আরাফাতের মাঠে তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান ছিলেন। অতএব চিরকালের জন্য এইদিন আমাদের সাধারণ উৎসবের দিনে পরিণত হয়েছে। আর এটাই ছিল আল্লাহ্র মর্জি।

ঈদের হাকীকত

এই মহাসুসংবাদ ঈদের হাকীকতকেও পরিষ্কার করে দিয়েছে। ঈদ শুধু আনন্দ ভ্রমণ, হাসিখুশী ও খেলা তামাশার মাধ্যমে নয় বরং তা হচ্ছে শরীয়ত পরিপূর্ণকরণের একটি কেন্দ্রবিন্দু, খিলাফতে ইলাহীর পরাক্রমের একটি বহিঃপ্রকাশ, তাওহীদ ও একত্ববাদের উৎস এবং বিশুদ্ধ নিয়্যত এবং পবিত্র অন্তর সমূহের একটি প্রদর্শনীরস্থল।

এর মাধ্যমে প্রত্যেকটি জাতির মাযহাবী প্রেরণা নির্ণয় করা যেতে পারে। যদি এটা তার আসল অবস্থার উপর কায়েম থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, মাযহাব তার পরিপূর্ণ শক্তির সাথে জীবিত আছে। যদি তা মিটে যায় কিংবা বিদ'আত ও হাস্যরসিকতা এর মূল উদ্দেশ্যকে ঢেকে দেয় তাহলে বিশ্বাস করে নিতে হবে যে, এর মধ্যে মাযহাবের যে প্রদীপ তা নিভে যাচ্ছে।

প্রকাশ ও বিজয়ের রূপ

এ কারণেই ইসলামের মধ্যে যেদিন থেকে শক্তি পরিবর্ধনের সূচনা হয়েছে সেদিন থেকে ঈদকে এর প্রকাশের মাধ্যম করা হয়েছে। মদীনায় শুধুমাত্র ঈদুল ফিতরের মাধ্যমে বিশ্বকে ইলামের পরিব্যাপ্তির একটি দৃশ্য দেখানো যেত। কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমগ্র দুনিয়ার জন্য রহমত ও করুণার একটি ঝর্ণা, যা উথলে উঠতে চাচ্ছিলো।

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"–(২১ঃ১০৭)

তিনি আরাফাতের ময়দানে উথলে উঠলেন এবং বিস্তৃত তরঙ্গসমূহের চাদরে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ঢেকে নিলেন। ফলে দুনিয়া ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং প্রকাশ ও বিজয়ের পরিব্যাপ্ত রূপ অবলোকন করল।

ঈদের রূপ

অতএব ঈদ যদি ইসলামের নিদর্শনসমূহকে কায়েম রাখে, মাযহাবী আত্মাকে জীবিত করে, মাযহাবের আমালী কীর্তিকলাপ দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করে, প্রেমের প্রতিশ্রুতি ও আল্লাহ্র অঙ্গীকারের নবায়ন করে, সমগ্র উম্মতকে একটি নিযামের মধ্যে বাঁধে, বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের মধ্যে দূতালীর কাজ করে তাহলে তা নিঃসন্দেহে প্রকৃত ঈদ এবং হজ্জ ও তাওয়াফ-অন্যথায় তা কেবল খেজুরের এক আঁটি, যা একটি সুন্নাতকে জীবিতকরণের উদ্দেশ্যে খেয়ে আমরা নিক্ষেপ করে থাকি।

নুবুওয়াত সূর্যের অস্তগমন

ইসলামের মহোৎসব–ঈদের সাথে তার প্রথম দাওয়াতের যুগ শেষ হয়ে গেল। স্বয়ং ঐ আয়াত যা মাযহাবের পরিপূর্ণতার ঘোষণা দিয়েছিল–তা ছিল এর ভূমিকা ও মুখবন্ধস্বরূপ, যদিও এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর অধিকাংশ সাহাবীই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু যারা এই হাকীকত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন যে, 'দায়ী'য়ে হক' (সত্যের আহবায়ক)–এর জীবনের সর্বশেষ লক্ষ্য (ইসলামের পরিপূর্ণতা) অর্জিত হয়ে গেছে–তারা পূর্বাপর বিষয় চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন এবং তাদের চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভরে উঠে। সত্যি সত্যি এই ঘটনার এক বছর পরই নুবুওয়াত-রবি আল্লাহ্র রহমেতর কোলে অস্তগমন করেন। আল্লা হুম্মা সাল্লি ও সাল্লিম আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মদ।[১]

টীকা ঃ

১। 'এক বছর পরই' সম্ভবত: বলা হয়েছে এজন্য যে, বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় হিঃ ১০ সনে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয় রাবীউল আউয়াল, হিঃ ১১ সনে। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়েছিল বিদায় হজ্জের পর, তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে।

এই হাকীকতও ভুলে গেলে চলবে না যে, ইসলামের প্রথম ঈদ অর্থাৎ ঈদুল ফিত্‌র হচ্ছে কুরআন নাযিল হওয়ার ঈদ। কেননা, কুরআন মজীদ নাযিল হতে শুরু করেছিল রমযান মাসেই। আর দ্বিতীয় ঈদ অর্থাৎ ঈদুল আযহা হচ্ছে আল্লাহ্‌র দ্বীন ও আল্লাহ্‌র নি'মাতের পরিপূর্ণতা লাভের ঈদ। উভয়ের সম্পর্ক রয়েছে শুধুমাত্র কুরআনের সাথে। একটির সম্পর্ক কুরআনের সূচনার সাথে এবং অন্যটির সম্পর্ক কুরআনের পরিসমাপ্তির সাথে। মোটকথা, দুনিয়া-আখিরাতের সমগ্র বরকত ও কল্যাণ এবং হিদায়াত ও সাফল্য কেবল কুরআন মজীদ অনুযায়ী বিশুদ্ধ চিত্তে আমল করার উপর নির্ভরশীল। অতএব উভয় ঈদের প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষ দৃষ্টি শুধুমাত্র কুরআনের উপর নিবদ্ধ থাকা চাই। কেননা,দু'টি ঈদ-ই হচ্ছে কুরআন মজীদের দু'টি উৎসব।

ওফাত

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত–১

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ

"আপনি তো মরণশীল এবং ওরাও মরণশীল।"–(৩৯:৩০)

ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার চিহ্নাদি

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ইসলাম প্রচার, নাফ্সমূহ পবিত্রকরণ এবং দ্বীন ও শরীয়তকে পরিপূর্ণ করণ। যখন এই সব উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল তখন দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায় গ্রহণের চিহ্নাদি ফুটে উঠতে লাগল। এক্ষেত্রেও সবচাইতে পরিস্কার চিহ্ন ছিল সূরা নাস্রের অবতরণ। তাতে পরিস্কার ভাষায় বলা হলো–

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا .
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا .

"যখন আসবে আল্লাহর্ সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তিনি তো তাওবা কবুলকারী।"–(১১০:১-৩)

সহীহ্ বুখারীতে আছে, হযরত উমর (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে– إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ –সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেন, এটা হচ্ছে ওফাত (-এর ইংগিত), যা আল্লাহ্ তা'আলা (পূর্বাহ্নে) তাঁকে দিয়েছিলেন।[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইবাদাত, তাস্বীহ ও তাহ্লীল -এর মধ্যে আগেও কোন কমতি ছিল না। এবার সেগুলোর মাত্রা আরো বেড়ে গেল। প্রত্যেক বছর রমযান মাসে দশদিন ই'তিকাফ করা তাঁর অভ্যাস ছিল; কিন্তু এবার তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করলেন। যেমন হাদীসে আছে–

فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ إِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا

"যে বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয় সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন।[২]

অনুরূপভাবে তিনি প্রত্যেক বছর রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর যবান থেকে এ পর্যন্ত নাযিলকৃত সবটুকু কুরআন মজীদ একবার শুনতেন, কিন্তু জীবনের শেষ বছরে তিনি সমগ্র কুরআন মজীদ দু'বার শুনেন।

বিদায় হজ্জ ও 'গাদীর খাম'-এর ভাষণ

বিদায় হজ্জে তিনি যে খুতবা দিয়েছিলেন তাতে এমন কিছু শব্দ ছিল, যার দ্বারা পরিস্কার জানা যায় যে, দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায় আসন্ন−যদিও তখন তাঁর সম্বোধিত ব্যক্তিরা তা পরিস্কারভাবে বুঝতে পারেন নি। যেমন তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন−

১। সম্ভবত: এই হজ্জের পর আমার আর হজ্জ করার সুযোগ হবে না।

২। আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তোমরা কি জবাব দেবে? তখন উপস্থিত লোকেরা নিবেদন করেন: আপনি আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং রিসালতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জবাবে বলেন: হে আল্লাহ্, আপনি সাক্ষী থাকুন।

'গাদীরে খাম'−এর খুতবায় তিনি বলেন,

ايها الناس انما انا بشر يوشك ان ياتينى رسول ربّى فاجب ———

"লোকসকল, আমিও মানুষ। সম্ভবত: আমার কাছে আমার প্রভুর দূত (অর্থাৎ মৃত্যুর ফিরিশতা) এসে পড়বে এবং তাকে আমার গ্রহণ করতে হবে।"

উপরোক্ত বাণী সমূহ থেকে এটাই পরিস্কার বুঝা যায় যে, স্থায়ী জগতের সফরের সময় ঘনিয়ে আসছিল।

উহুদের শহীদবৃন্দ

উহুদের শহীদবৃন্দের জানাযার নামায পড়া হয়নি। ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্বে, সফর মাসে তিনি উহুদ প্রান্তরে যান এবং যুদ্ধের শহীদগণের জানাযার নামায ঠিক সেভাবে পড়েন যেভাবে একজন মৃতের নামায পড়া হয়ে থাকে। তিনি শহীদগণের কাছ থেকে এমনভাবে বিদায় নেন যেমন একজন মৃত্যুযাত্রী আপন জীবিত আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন, اِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ −"আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি।' এরপর নিম্নের ভাষণ দেন−

"আমি তোমাদের আগে হাওযের কাছে যাচ্ছি, যাতে তোমাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে সাক্ষ্য দিই। আল্লাহ্‌র কসম, এই মুহূর্তে আমি হাওযটিকে আমার সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি। আমাকে যমীনের ভান্ডার সমূহের চাবি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার মোটেই এই ভয় নেই যে, আমার পরে তোমরা শির্‌ক করবে। কিন্তু আমার এই ভয় আছে যে, তোমরা দুনিয়া নিয়ে মত্ত হয়ে পড়বে এবং পরস্পরের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করবে। এর পরিণাম হতে পারে যে, তোমরাও ঠিক সেভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে।"

বাকী' বাসীদের[৩] জন্য দু'আ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আবু মুভায়বাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মধ্যরাতে বলেন, হে আবু মুভায়বাহ্! বাকী'বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তুমিও আমার সাথে চল। তিনি রওয়ানা হন এবং আমিও তাঁর সাথে চলতে থাকি। তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাকীবাসীদের জন্য দু'আ করেন। এরপর বলেন−

"হে আবু মুভায়বাহ্! একদিকে আমার সামনে সমগ্র বিশ্বের ভান্ডারসমূহ, চিরস্থায়ী জীবন এবং জান্নাত পেশ করা হয়। অপর দিকে রাখা হয় মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ এবং জান্নাত। আমাকে বলা হয়, এ দু'টির মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ কর। আবু মুভায়বাহ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন, আপনি সমগ্র বিশ্বের ভান্ডারসমূহ ও চিরস্থায়ী জীবনের সাথে জান্নাতকে গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, হে আবু মুভায়বাহ্! আমি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত এবং জান্নাতই বেছে নিয়েছি।[৪]

মহান ভাষণ

এরপর তিনি একটি ভাষণ (খুতবা) দান করেন। এটাকে তাঁর সুস্থ অবস্থার সর্বশেষ খুতবা মনে করা হয়। তাতে তিনি বলেন,

"মুসলমানগ, মারহাবা আল্লাহ্ তোমাদেরকে আপন রহমতের ছায়ায় রাখুন, তোমাদের মনের নৈরাশ্য দূর করুন, তোমাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হোন, তোমাদেরকে উচ্চ সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা দিন। আমি তোমাদেরকে তাক্ওয়ার ওসীয়ত করছি। আমি আল্লাহ্কেই তোমাদের উত্তরাধিকারী বানাচ্ছি, তাঁরই ভয় প্রদর্শন করছি। কেননা, আমি হচ্ছি প্রকাশ্য সতর্ককারী। দেখ, আল্লাহ্র বসতিসমূহে এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যে কখনো ঔদ্ধত্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করো না। আল্লাহ্ আমাকে এবং তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন-

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ .

"এটা আখিরাতের সেই আবাস, যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য, যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।"-(২৮:৮৩)

এরপর বলেন, "উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?"-(৩৯:৬০)[৫]

সবশেষে বলেন, "তোমাদের সকলের উপর আমার সালাম এবং সালাম ওদের উপর যারা ইসলামের মাধ্যমে আমার বায়'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

রোগের সূচনা হওয়ার একদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উসামা বিন যায়দ (রা) কে সেনাপতি নিয়োগ করে রোমানদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। এটাই ছিল সেই বাহিনী, যাকে মূতার যুদ্ধে, নিহত যায়দ ও অন্যান্য শহীদগণের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল।

রোগের সূচনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগের সূচনা হয় ১৮ কিংবা ১৯ সফর বুধবার।[৬] কোন কোন রিওয়ায়াত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগের সূচনা হয় রোববারে। কেউ কেউ আবার শনিবারের কথাও উল্লেখ করেছেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগ ভোগের সময়কালের মধ্যেও মত-পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ বাহ্যত: এই যে, প্রথম প্রথম তাঁর রোগের কথা শুধুমাত্র তারাই জানতে পারেন, যারা ছিলেন তাঁর নিকটতর। অন্যান্যরা এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। যখন রোগ বেড়ে গেল তখন সবাই জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসুস্থ। এই প্রেক্ষিতে বিভিন্নজন বিভিন্ন দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগের সূচনা হয়েছিল বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব এই মত-পার্থক্যকে বিস্ময়কর কিছু মনে করা উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে সকলের রিওয়াত (বর্ণনা)-ই সংগৃহীত হয়েছে। প্রথম যুগের রাবীদের এটি একটি অতুলনীয় বিশ্বস্ততা ছাড়া কিছু নয় যে, তাঁরা যে কোন বিষয় সম্পর্কে তাই বলেছেন, যা তাঁদের অবগতিতে এসেছে। এতদ্সত্ত্বেও সংগৃহীত রিওয়ায়াতগুলো সামনে রেখে সঠিক ঘটনা কি ছিল তা অনুমান করতে মোটেই কষ্ট হয় না।

এটাও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ঐ দিন প্রথম রোগাক্রান্ত হন যেদিন তাঁর অবস্থানের পালা হযরত মায়মুনা (রা)-এর ঘরে ছিল। রোগ ক্রমশ: বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার সাথে যোগ হয় দুর্বলতা। এতদ্সত্ত্বেও তিনি সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যেতেন, ইমামতী করতেন এবং তাঁর সহধর্মিণীদের ঘরেও পালাক্রমে অবস্থান করতেন। শেষ পর্যন্ত ২৪ কিংবা ২৫ সফর সোমবার দিন তাঁর দুর্বলতা এত বৃদ্ধি পায় এবং অসুখ এত বেড়ে যায় যে, অন্যের সাহায্য ছাড়া তিনি আর চলতে পারতেন না।

পবিত্র সহধর্মিণীগণের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ

মরহুম মওলানা শিবলী বলেন,

"রোগ যখন বেড়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্যান্য সহধর্মিণীগণের কাছ থেকে এই মর্মে অনুমতি গ্রহণ করেন যে, তিনি এখন থেকে হযরত আঈশা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করবেন। তিনি আপন চারিত্রিক মাধুর্যতাবশত: পরিষ্কার এবং প্রকাশ্য ভাষায় অনুমতি গ্রহণ করেন নি। বরং আপন সহধর্মিণীদের জিজ্ঞাসা করেন, কাল কার ঘরে থাকব? পরদিন (সোমবার) হযরত 'আঈশা' (রা)-এর ঘরে অবস্থানের পালা ছিল। পবিত্র সহধর্মিণীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মরযী বুঝে নিবেদন করেন আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবস্থান করুন।"[৭]

ইবনে সা'দ সহীহ্ রিওয়ায়াতের মাধ্যমে একথা উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত ফাতিমা যুহ্‌রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে এই অনুমতি গ্রহণ করছিলেন।[৮]

এসব কথা স্ব স্ব স্থানে ঠিক। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা আমাদের চিন্তায় কখনো আসতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সহধর্মিণীদের, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুরবস্থা এবং তাঁর কষ্টের প্রতি খুব একটা সহানুভূতি ছিল না (আল্লাহ্‌র পানাহ!) কিংবা তাঁদের কেউই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র চাহিদা পূরণে কিংবা কষ্ট লাঘবে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আশানুরূপ সচেষ্ট ছিলেন না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সহধর্মিণীগণের সকলেই বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে শুধুমাত্র তাঁর একটি ইঙ্গিতের জন্যই সদা-অক্ষেপমান থাকতেন।

এরপর এ তত্ত্ব কথাটিও ভুলে গেলে চলবে না যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এমন সব ব্যবস্থাদি হচ্ছিলো, যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র দেহটি সেই বিশ্রামস্থলে গিয়ে পৌঁছে, যেখানে তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে বলে পূর্বেই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। কোন নবীরই শেষ বিশ্রামস্থল সম্পর্কে কেউ একথা নির্দিষ্ট করে বলতে পারবে না যে, তা এখানে বা ওখানে রয়েছে। এ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তা শুধুমাত্র অনুমানের উপর ভিত্তি করে। শুধুমাত্র মুহাম্মদ (সা)-এর শেষ বিশ্রামস্থলই হচ্ছে এমন একটি পবিত্র জায়গা, যার সঠিক ও সুনির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে কারো মনে কোন সন্দেহ নেই।

যাহোক, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সোমবার দিন (২৪ অথবা ২৫ সফর) এই অবস্থায়–এক পাশে হযরত আলী (রা) এবং অন্য পাশে হযরত আব্বাস (রা)-এর উপর ভর করে হযরত 'আঈশা' (রা)-এর ঘরে গিয়ে পৌঁছেন। তাঁর দেহের সম্পূর্ণ ভার বাহ্যত: ঐ দুই জনের উপর ছিল। তাঁর পবিত্র পা দু'টি তখন হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে এগোচ্ছিলো।

রোগের অবস্থা

তখন তাঁর গায়ে ছিল সাংঘাতিক জ্বর। হযরত উমর, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) এবং আরো কয়েকজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, অত্যধিক উষ্ণতার কারণে তারা কেউই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গায়ে তাদের হাত রাখতে পারছিলেন না। তিনি (সা) একটি মোটা চাদর উড়ে ছিলেন। সেই চাদরের উপরেও উষ্ণতা অনুভূত হচ্ছিলো। আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার খুব জ্বর? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার গায়ে এত জ্বর হয়, যত জ্বর তোমাদের দুজন লোকের গায়ে হয়। আবদুল্লাহ্ (রা) তখন নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার পুরস্কারও দ্বিগুণ হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, দুনিয়ায় এমন কোন মুসলমান নেই, যে রোগ বা অন্য কোন কারণে কষ্ট পায় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপ এমনভাবে হ্রাস করেন না, যেমনভাবে শীত মওসূমে গাছের পাতাসমূহ ঝরতে থাকে এবং হ্রাস পেতে থাকে।[৯]

এই অবস্থা থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যেতে থাকেন। বুধবার দিন যে শেষ সালাত-এ তিনি মসজিদে ইমামতী করেছিলেন, তা ছিল মাগরিবের সালাত। তিনি তাতে সূরা 'আল মুরসালাত'

তিলাওয়াত করেছিলেন। মরহুম কাযী সুলায়মান বলেন, এই সূরার শেষ আয়াতটি পবিত্র কুরআনের 'জালালাত' তথা পরাক্রম প্রকাশ করে। আয়াতটি হলো- فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَه يُؤْمِنُوْنَ . -"সুতরাং ওরা আল কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস করবে?"-(৭৭:৫০)

'রফীকে 'আলা'-এর জন্য যাচ্না

হযরত 'আঈশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)- যখন কোন রোগে আক্রান্ত হতেন তখন বিভিন্ন দু'আ পড়তেন তার মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আটি অন্যতম, এই দু'আ পড়ে তিনি তাঁর পবিত্র দেহের উপর হাত বুলিয়ে নিতেন। দু'আ-টি হলো-

اذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء لا شافى الا انت ، اشف شفاء لا يغادر سقما

"হে মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর করে দাও। রোগ নিরাময় শুধুমাত্র তোমার হাতে। তুমি ছাড়া আর কোন নিরাময়কারী নেই। তুমি আমাকে এমনভাবে নিরাময় কর যেন কোন রোগ বাকি না থাকে।"

কঠিন রোগের প্রেক্ষিতে হযরত আঈশা সিদ্দিকা (রা) এই দু'আ পড়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হাত তাঁর দেহের উপর বুলিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু তিনি হযরত 'আঈশা (রা)-এর হাত থেকে নিজের হাতটি ছাড়িয়ে নিয়ে নিম্নোক্ত দু'আটি করেন- اَللّٰهُمَّ الاَعْلٰى جَنَّتُ الْخُلْدِ -"হে মহান আল্লাহ্! আমাকে চিরস্থায়ী জান্নাত দান করুন।"

এই দু'আর শব্দ সমূহের মধ্যে সামান্য মতপার্থক্য আছে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা কিছু বলেছিলেন, তাতেও কিছুটা মত-পার্থক্য আছে। কিন্তু তাতে উপরে যা বর্ণিত হয়েছে তার মূল লক্ষ্যে কোন পার্থক্য দেখা দেয় না। বিভিন্ন রিওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি দু'আ করেছিলেন-

১। اسئل الله الرفيق الاعلى والاسعد

"আমি আল্লাহ্র কাছে মহান ও মহা ভাগ্যবান সংগী চাই।"

২। الحقنى بالرفيق ، الحقنى بالرفيق

"আমাকে আমার সংগীর (বন্ধুর) সাথে মিলিয়ে দাও, আমাকে আমার সংগীর সাথে মিলিয়ে দাও।"

৩। اللهم اغفرلى وارحمنى والحقنى فى الرفيق الاعلى

" হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর দয়া কর এবং আমাকে মহান সংগীর সাথে মিলিয়ে দাও।"

উপরোক্ত বাক্যগুলো থেকে একথা পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, রফীকে 'আলা' তথা মহান সংগীর যাচনা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমগ্র পরিচ্ছন্ন অন্তর একেবারে দখল করে নিয়েছিল।

হযরত আবু বকর (রা)-এর ইমামতী

বুধবার দিন ঈশার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করেন, সালাত কি হয়ে গেছে? তখন নিবেদন করা হয়, সবাই মসজিদে আপনার অপেক্ষা করছেন। মরহুম মাওলানা শিবলী বলেন-

"একটি লগন (জলাধার) ভরে নিয়ে তিনি গোসল করেন। এরপর দাঁড়াতে চান, কিন্তু চেতনা হারিয়ে ফেলেন। চেতনা যখন ফিরে পান তখন জিজ্ঞাসা করেন, সালাত হয়ে গেছে? উত্তর দেওয়া হয়, সবাই মসজিদে আপনার অপেক্ষা করছেন। তিনি পুনরায় গোসল করেন এবং যখন দাঁড়াতে চান তখন তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন। চেতনা যখন ফিরে পান তখন জিজ্ঞাসা করেন, সালাত হয়ে গেছে? লোকেরা ঐ একই জবাব দেয়। তৃতীয়বার তিনি দেহের উপর পানি ঢালেন এবং দাঁড়াতে চান। কিন্তু এবারও চেতনা হারিয়ে ফেলেন। যখন পুনরায় চেতনা ফিরে পান তখন হযরত আবু বকর (রা)-কেই সালাত পড়াবার নির্দেশ দেন।[১০]

হযরত 'আঈশা' (রা) তখন এই বলে ওযর পেশ করেন যে, আবু বকর (রা) হচ্ছেন খুবই কোমল হৃদয়। অতএব আপনার জায়গায় তিনি কি দাঁড়াতে পারবেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় হযরত আবু বকর (রা) কেই সালাত পড়াবার নির্দেশ দেন।

একথা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। হযরত আবু বকর (রা) প্রকৃত পক্ষেই ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তাঁর ভালবাসার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না।

শুধুমাত্র হযরত 'আইশা (রা)-ই নন, বরং সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জায়গায় দাঁড়ানো, হযরত আবু বকর (রা)-এর জন্য এক অসহনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে। হযরত আবু বকর (রা)-এর পক্ষ থেকে ওযর পেশ করার আরো একটি প্রেক্ষাপট ছিল, যা খোদ হযরত 'আঈশা (রা) পরবর্তী সময়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত আবু বকর (রা)-এর ইমামতির ব্যাপারে আমার ওযর পেশ করার বড় কারণ এই ছিল যে, আমি ভাব্‌ছিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর মানুষ কি কখনো এই ব্যক্তিকে ভালবাসবে, যে তাঁর জায়গায় দাঁড়িয়েছিল? অর্থাৎ লোক তাঁকে অপয়াই বলে মনে করবে।[১১]

যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা)-এর সালাত পড়াবার নির্দেশ নিয়ে মসজিদে এসেছিলেন তিনি আবু বকর (রা) কে দেখতে না পেয়ে হযরত উমর (রা) কে বললেন, আপনি সালাত পড়িয়ে দিন। হযরত উমর (রা) এজন্য তৈরী হয়ে যান এই ভেবে যে, এটা খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এরই নির্দেশ হবে। এক রিওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু বকর (রা) খোদ হযরত উমর (রা) কে বলে দিয়েছিলেন, আপনিই সালাত পড়ান। হযরত উমর (রা)-এর গলার স্বর ছিল উঁচু। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তার তাকবীরের আওয়াজ শুনেন তখন বলে উঠেন, না, না, ইবনে আবী কুহাফা (আবু বকর) ই সালাত পড়াবেন।

হযরত আবু বকর (রা)এর ইমামতির সূচনা

এব্যাপারেও সামান্য মত-পার্থক্য আছে যে, আবু বকর (রা)-এর ইমামতির সূচনা, বুধবার দিনগত রাত্রের ঈশার সালাত থেকে হয়েছিল, না বৃস্পতিবার দিনগত রাতের ঈশার সালাত থেকে? অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র জীবনকালে সতেরো ওয়াক্ত সালাত পড়িয়েছিলেন, না একুশ ওয়াক্ত? এ ব্যাপারে মরহুম মাওলানা হাকীম আবদুর রঊফ ছানাপুরী তাঁর 'আসাহ্‌হুস্ সিয়ার' গ্রন্থে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সোমবার দিন ফজরের সালাতের সময় (অর্থাৎ তাঁর ওফাতের দিন) হুজরার পর্দা উঠিয়ে মসজিদের দিকে তাকিয়েছিলেন। হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিন দিন পর এই দিনই হুযূর (সা)-এর নূরানী চেহারা সাহাবীদের নযরে পড়েছিল। কেননা, হুযূর (সা) বৃহস্পতিবার যুহরের সালাতে শরীক হয়েছিলেন। এরপর শুক্র, শনি ও রবিবার বাইরে আসেননি। আল্লামা যারকানী দিমইয়াতী থেকে বর্ণনা করেছেন,হযরত আবু বকর (রা) সতেরো ওয়াক্ত সালাতের ইমামতি করেছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। সিহাহের রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, ঈশার ওয়াক্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) কে ইমামতির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর যুহরের সালাতের সময় তিনি (সা) স্বয়ং মসজিদে আসেন। তাহলে

এই ঈশা নিঃসন্দেহে এর পূর্ববর্তী অর্থাৎ সোমবারের ফজর পর্যন্ত (বৃহস্পতিবারের যুহর যাদ দিয়ে) একুশ ওয়াক্তের সালাত হয়, যেগুলোর ইমামতী হুযূর (সা)-এর জীবিতকালে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) করেছিলেন।[১২]

সীরাতুন্নবীর বর্ণনা

'সীরাতুন্নবী'এর বর্ণনাও একথাটি সমর্থন করে। যদিও তার একটি জায়গায় বলা হয়েছে, হযরত আনাস (রা)-এর রর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিন দিন সালাত পড়ান নি। এ সময় হযরত আবু বকর (রা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে সালাত পড়িয়েছিলেন।

এই স্থলাভিষিক্তর সূচনা হয় জুম'আর রাতের ঈশার সালাত থেকে এবং সমাপ্তি হয় রোববারের ফজরের সালাতে।[১৩]

এতদসত্ত্বেও মরহুম মাওলানার লেখা থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর স্থলাভিষিক্তর সূচনা অন্তত:পক্ষে বৃহস্পতিবার দিন, আর সমাপ্তি রাতের ঈশার সালাত থেকে হয়েছিল।[১৪] যেমন–

১। তিনি 'মারযুল মাওত' (মৃত্যুকালীন রোগ)-এর ভাষণের দিন বৃহস্পতিবার (বাদ সালাতে ফজর) নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু কোন্ দিন যুহরের ওয়াক্তে এই ঘটনা ঘটেছিল তাঁর কোন পরিস্কার উল্লেখ রিওয়ায়াত সমূহের মধ্যে নেই। কিন্তু সহীহ্ মুসলিমে হযরত জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু বকর সম্পর্কে তিনি (সা) যে কথাগুলো বলেছিলেন, তা বলেছিলেন তাঁর ওফাতের পাঁচদিন পূর্বে। অতএব 'মারযুল মাওত' এর ভাষণ হচ্ছে তাঁর ওফাতের পাঁচ দিন পূর্বের বৃহস্পতিবারের ঘটনা। হাফিয ইবনে হাজার (রহ) ও 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তই দিয়েছেন।

যখন হযরত আবু বকর (রা) বৃহস্পতিবারের যুহরের সালাত পড়াচ্ছিলেন; তখন তাঁর স্থলাভিষিক্তির মেয়াদ কমপক্ষে বুধবার দিবাগত রাতের ঈশার সালাত শুরু হয়ে গিয়েছিল।

মরহুম কাযী সুলায়মানের মতে এখানে একথাও মানা যেতে পারে যে, হুযূর (সা)-এর ওফাতের দুই কিংবা একদিন পূর্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে গিয়েছিলেন।[১৫] আর এটা ছিল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর স্থলাভিষিক্তির সময়। এভাবে আরো কিছু কিছু হাদীস ও রিওয়াতের মধ্যে পরস্পর মত-পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। (সংকলক)

টীকা ঃ

১। বুখারী ঃ কিতাবুল মানাকিব।

২। বুখারী ঃ কিতাবুল ই'তিকাফ।

৩। বাকী' হচ্ছে মদীনা মুনাওওরার বিখ্যাত কবরস্থান, যা শহরের পূর্ব প্রান্তের প্রাচীরের কাছে অবস্থিত।

৪। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা–২০৪

৫। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা–২৫৬

৬। কারো কারো মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগের সূচনা হয় ২৯ সফর। তাদের মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয় ১২ ই রাবীউল আউয়ালে। এ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে শুধুমাত্র এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, কয়েকটি সর্বসম্মত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ১ রাবীউল আউয়াল রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেন-যেমন মরহুম মাওলানা শিবলী বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে একথা প্রমাণ করেছেন। যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগভোগের সময়কাল তেরো দিন

ধরা হয় (বেশীর ভাগ রিওয়ায়াত একথা সমর্থন করে) তাহলে একথা মেনে নিতে হবে যে, ১৮ অথবা ১৯ তারিখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগের সূচনা হয়েছিল।

৭। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা-১৭২।

৮। সীরাতুন্নবী ঃ টীকা ঃ পৃষ্ঠা-১৭২।

৯। তাবাকাত ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা-২০৮।

১০। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা-১৭৩।

যে লগনের (জলাধারের) উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছিল পাথরের তৈরী এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা) ছিলেন তার মালিক।

১১। সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুল মাগাযী।

১২। আসাহ্হুস্ সিয়ার ঃ পৃষ্ঠা-৫৩৩।

১৩। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা-১৭৩ (টীকা)।

১৪। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা-১৭৫।

১৫। রাহ্মাতুল লিল্ আলামীন ঃ পৃষ্ঠা-৩২০।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত–২

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ٠

মসজিদে আগমন

বৃহস্পতিবার দিন যুহরের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুটা সুস্থতাবোধ করেন। তখন তিনি তাঁর উপর সাত মশক পানি ঢেলে দেওয়ার জন্য বলেন।[১] 'আসাহ্হুস্ সিয়ার'-এর মধ্যে আছে, আমার উপর সাত মশক পানি ভাসিয়ে দাও, যার রিবাত যেন ঢিলা না হয়– অর্থাৎ মশক যেন পূর্ণ হয়, এমন যেন না হয় যে, তা থেকে কিছু পানি পড়ে গেছে।[২]

'রাহমাতুল লিল আলামীন' গ্রন্থে আছে, হুযূর (সা) পাথরের জলাধারে বসে সাতটি কূয়ার সাত মশক পানি নিজের মাথার ঢালিয়ে নেন।[৩]

এরপর তিনি হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা)-এর উপর ভর দিয়ে মসজিদে আগমন করেন। হযরত আবু বকর তখন সালাত পড়াচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন টের পেয়ে তিনি পেছনে চলে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইঙ্গিতে তাকে স্বস্থানে থাকতে বলেন এবং তার পাশে বসেই সালাত পড়ান অর্থাৎ তাঁকে দেখে আবু বকর (রা) এবং আবু বকর (রা) কে দেখে আন্যান্য মুসল্লীরা সালাত আদায় করতে থাকেন।[৪]

এই সালাতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-একটি ভাষণ দেন, যেটাকে সাধারণভাবে তাঁর শেষ ভাষণ মনে করা হয়। কেননা, এরপর তিনি আর মসজিদে আসতে পারেন নি। এটাকে 'মারাযুল মাওত' (মৃত্যুকালীন)-এর ভাষণও বলা হয়। কেননা, তিনি সেই রোগের মধ্যেই দুনিয়া থেকে ইন্তিকাল করেন। এই ভাষণের মধ্যে এমন অনেক বিষয় বস্তু রয়েছে, যার মধ্য থেকে কিছু কিছু পৃথকভাবে বর্ণনা হয়ে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও এই ধারণা বলবৎ যে,তিনি (সা) ঐ সব বিষয়ের উল্লেখ একই ভাষণের মধ্যে করেছিলেন।

আখিরাতকে চয়ন

আবু সায়ীদ খুদরী (রা)-এর রিওয়াত অনুযায়ী নিম্নোক্ত শব্দগুলো দ্বারা খুতবার সূচনা করা হয়।

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার নি'মাতসমূহ ও আল্লাহ্র কাছে যা আছে তার যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেন। কিন্তু সে তা-ই গ্রহণ করে, যা আল্লাহ্র কাছে রয়েছে (অর্থাৎ আখিরাত)।"

একথা শুনতেই হযরত আবু বকর (রা) বলে উঠেন, আমার মা-বাবা আপনার উপর কুরবান হোন। এরপর তার চোখ দিয়ে আপনা-আপনি অশ্রু ঝরতে থাকে। আবু সায়ীদ (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, একথার উপর আবার ক্রন্দন কেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো শুধু একটি বান্দার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে জানতে পারলাম, আবু বকর (রা) আমাদের সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী ও দূরদর্শী ছিলেন। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে,

রাসূলুল্লাহ্ (সা)- ই হচ্ছেন সেই বান্দা, যিনি দুনিয়ার নি'মাতসমূহ ছেড়ে তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা আল্লাহ্র কাছে রয়েছে। অর্থাৎ তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন।

সংসর্গ ও সম্পদের ঋণ স্বীকার

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবু বকর (রা) কে কাঁদতে নিষেধ করে বলেন, তুমি তোমার নিজের উপর দয়া কর। এরপর উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বলেন, আমি সমগ্র মানুষের চাইতে আবু বকর (রা)-এর সম্পদ ও সংসর্গের কাছে অধিক ঋণী। যদি এই উম্মতের মধ্য থেকে আমি কাউকে 'খলীল' (বন্ধু) বানাতাম তাহলে আবু বকর (রা) কেই বানাতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার সম্বন্ধই যথেষ্ট। দেখ, আবু বকর (রা) -এর দরজা বা জানালা ছাড়া আর কারো দরজা বা জানালা মসজিদের দিকে রাখা যাবে না।

তাবাকাতে ইবনে সা'দে আছে, হযরত আব্বাস (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কেন হল যে, আপনি কিছু লোকের জন্য দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং কিছু লোকের জন্য দরজা খোলা রাখার অনুমতি দিলেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বলেনঃ না আমি আপন হুকুমে খোলা রেখেছি, আর না আপন হুকুমে বন্ধ করেছি। অর্থাৎ যা কিছু করেছি আল্লাহ্র হুকুমেই করেছি। এই দরজা কিংবা জানালা বাহ্যত: এই উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল যে, সালাতের জন্য মসজিদে আসা এবং সালাতের পর ফিরে যাওয়া অধিকতর সহজ হয়। যেহেতু ঘর মসজিদের সাথে সংলগ্ন ছিল তাই সাহাবা কিরাম (রা) দরজা কিংবা জানালা দিয়ে মসজিদে ঢুকে যেতেন। অনুরূপভাবে মসজিদ থেকে ফিরেও যেতেন। তারা বের হয়ে কিছু জায়গা ঘুরে মসজিদে প্রবেশের মূল দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকবেন, এরপর এই দরজা দিয়েই আবার বের হবেন।

হযরত আবু বকর (রা)-এর ঘর প্রসংগে

কেউ কেউ বলেছেন, হযরত আবু বকর (রা)-এর কোন ঘর মসজিদের কাছে ছিল না। বরং তার ঘর ছিল 'সুখ'-এ, যা শহরতলীর দিকে মদীনা মুনাওওরা থেকে এক মাইল দূরে ছিল। কিন্তু এটা ছিল তার শ্বশুর বাড়ী। আর অপর ঘরটি ছিল মসজিদ সংলগ্ন,যার দরজা বা জানালা মসজিদের দিকে ছিল। এটা ছিল মসজিদে নবভীর পশ্চিম দিকে। হযরত আবু বকর মদীনায় আগত বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের খরচ নির্বাহের জন্য তা চার হাজার দিরহামে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে যখন মসজিদে নবভীর সম্প্রসারণ করা হয় তখন সম্ভবত: এই ঘরটি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সাউদী আরবের শাসক সুলতান আবদুল আযীয আলে সাউদ কর্তৃক মসজিদ-সম্প্রসারণ করার পূর্বে সুলতান আবদুল মজীদ খান উছমানী (ইং ১৮৩৯ থেকে ১৮৬১ সন) অত্যন্ত ব্যাপক আকারে তা সম্প্রসারণ করিয়েছিলেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত নির্দেশটি খুব সুন্দর অক্ষরে লিখিয়ে নিয়ে তা অতীতের স্মৃতি রক্ষার্থে মসজিদের সাথে সেঁটে দেন। সাউদী সম্প্রসারণ কালে মসজিদের জন্য তিনটি দরজা খোলা হয়। তার মধ্যে একটি ছিল 'বাবুস্ সিদ্দীক' এবং তা ছিল ঠিক সেই জায়াগায় যেখানে হযরত আবু বকর (রা)-এর ঘর অথবা দরজা কিংবা জানালা ছিল।

কবর সমূহকে সিজদার জায়গা বানানো নিষিদ্ধ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সহধর্মিণীদের মধ্যে হযরত উম্মে হাবীবা, হযরত উম্মে সালমা এবং হযরত সাওদা (রা) প্রথম হিজরতকালে আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা 'মারিয়া' নামক একটি গির্জা দেখেছিলেন, যা সম্ভবত: হযরত মারয়াম (আ)-এর নামে নির্মিত হয়েছিল। একদা ঐ গির্জার কারুকাজ, তাতে রক্ষিত ছবিসমূহ এবং অংকিত বিভিন্ন নকশার উল্লেখ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে করা হলে তিনি বলেন, ঐ সব লোকের মধ্যে কোন পুণ্যবান ব্যক্তি জন্মালে তারা তার কবরকে উপাসনালয় বানিয়ে নিত এবং সেখানে বিভিন্ন ছবি ও নকশা ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করত। اولئك شرار الخلق عند الله . –"ওরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।"[৫]

তিনি বৃহস্পতিবারের ভাষণে বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা নবী এবং সৎকর্মপরায়ণদের কবর সমূহকে উপাসনালয় বানিয়ে নিত। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে ইবাদতগাহ্ (উপাসনালয়) বানাবে না। এ থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।

'মারযুল মাউতে' সম্ভবত: তিনি নিম্নের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। যেমন :

১। হে আল্লাহ্! য়াহূদীদেরকে ধ্বংস কর। ওরা তাদের নবীদের কবরসমূহকে ইবাদতগাহ্ বানিয়েছে।[৬]

২। হে আল্লাহ্! য়াহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে ধ্বংস কর। ওরা তাদের নবীদের কবর সমূহকে সিজদাস্থল বানিয়েছে। আরবে যেন এই দুই ধর্ম আর অবশিষ্ট না থাকে।[৭]

৩। হে আল্লাহ্! আমার কবরকে উপাসানালয়ে পরিণত করো না। ঐ জাতি আল্লাহ্র ভয়ানক ক্রোধের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে, যারা নিজেদের নবীদের কবরসমূহকে উপাসনালয়ে পরিণত করেছে।[৮]

উসামা বিন যায়দ (রা)-এর অধিনায়কত্ব

রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোগাক্রান্ত হওয়ার একদিন পূর্বে উসামা বিন যায়দ (রা)-এর অধিনায়কত্বে একটি বাহিনীকে বালকা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন,যাতে তাঁরা মুতা যুদ্ধের শহীদদের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ঐ শহীদদের মধ্যে উসামা (রা)-এর পিতা যায়দ বিন হারিছা (রা)-ও ছিলেন। কোন কোন মুনাফিক তখন বলতে লাগলো, যে বাহিনীতে অনেক বিশিষ্ট ও মান্যবর লোক রয়েছেন, সে বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়েছে একটি কচি যুবককে। একথা শুনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন, 'লোক সকল! উসমার বাহিনীকে রওয়ানা করে দাও। যদি এখন তোমরা উসামার অধিনায়কত্বে আপত্তি উত্থাপন কর তবে তার পিতার অধিনায়কত্বেও আপত্তি উত্থাপন করেছিল। অথচ উসামা অধিনায়ক হওয়ার জন্য তেমনি যোগ্য যেমন যোগ্য তার পিতা।[৯]

সহীহ্ বুখারীর রিওয়ায়য়াত অনুযায়ী তিনি এও বলেছিলেন, আর সে (যায়দ বিন হারিছ) ছিল আমার প্রিয়তম ব্যক্তিদের অন্যতম। আর উসামাও সেই ব্যক্তিদের অন্যতম যাদেরকে আমি সব চাইতে বেশী ভালবাসি।[১০]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভালবাসার মাপকাঠি তাক্ওয়া ও সৎকর্ম ছাড়া আর কী হতে পারে? এটা কি যায়দ (রা)-এর সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার সুস্পষ্ট নিদর্শন নয় যে, তিনি তাঁর বাবা, চাচা ও পরিবার পরিজনের ভালবাসা ও সংসর্গকে অনায়াসে উৎসর্গ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভালবাসা ও সংসর্গকে বেছে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, পুত্র ও সকল লোকের চাইতে অধিকতর প্রিয় হই।" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাহিনীতে যে ঈমানী মাপকাঠি নির্ধা-রণ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে হযরত যায়দ (রা) তাঁর উপরোক্ত আচরণ দ্বারা এর বাস্তব নমুনা কি পেশ করেন নি? এবিষয়টিও এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক কালীন ক্রীতদাস যায়দ (রা) কে অধিনায়ক নিযুক্ত করে মানবীয় সাম্যের কী চরম দৃষ্টান্ত-ই না পেশ করেছিলেন। আর যায়দ (রা)-এর মধ্যে যে অধিনায়কত্বের পুরোপুরি যোগ্যতা ছিল তা এ থেকে কি পরিস্কার প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মূতা যুদ্ধ ছাড়াও তাঁকে অন্তত: আরো সাতটি অভিযানের অধিনায়ক নিয়োগ করেছিলেন এবং সেগুলোতে যায়দ (রা) তাঁর যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ নমুনাও পেশ করেছিলেন? মূতা যুদ্ধে অধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সকলের আগেই শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এটা কি আল্লাহ্র রাহে তাঁর প্রাণ উৎসর্গের শ্রেষ্ঠ নমুনা নয়?

উসামা (রা)-এর বাহিনী মদীনা মুরাও্ওরা থেকে রওয়ানা হয়ে যখন চার মাইল দূরবর্তী জুরফ নামক স্থানে গিয়ে পৌছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগ বৃদ্ধি বাহিনী মুলতবীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাহিনীটি সেখান থেকে মদীনায় ফিরে আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথে ঐ বাহিনীকে মুতা অভিমুখে প্রেরণ করেন। যখন হযরত আবু বকর (রা) কে বলা হলো, মদীনা

মুনাওওরায়ই তো এখন সেনাবাহিনীর সব চাইতে বেশী প্রয়োজন তখন তিনি নির্দ্বিধায় জবাব দেন, "ইবনে কুহাফার এই অধিকার নেই যে, সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক নিয়োগকৃত বাহিনীকে রুখে রাখবে।"

আনসারদের জন্য ওসীয়ত

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগ যখন বেড়ে গেল তখন আনসারগণ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। হযরত আবু বকর ও আব্বাস (রা) একদিন আনসারদের একটি মজলিসে গিয়েছিলেন। সেখানে দেখতে পান যে, তাঁরা সবাই ক্রন্দন করছেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা জবাব দিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর 'সুহ্বাত' (সংসর্গ) সমূহের কথা যখন মনে পড়ে তখন আমাদের চোখ আপনা-আপনি অশ্রুপ্লাবিত হয়ে উঠে। একথাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানে গিয়ে পৌঁছে। এরপর ফযল বিন আব্বাস এবং আলী বিন আবি তালিব (রা)ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি ভাষণ দেন। তিনি তাতে বলেন, '(হে মুজাহিদগণ!) আমি এখন আনসারদের সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য তোমাদেরকে ওসীয়ত করছি। ওরা তোমাদের পূর্বে মদীনাকে নিজেদের বাসভূমি করেছে এবং ঈমানকে নিজেদের জন্য বাধ্যতামুলক করে নিয়েছে। ওরা কি নিজেদের সম্পদের মধ্যে তোমাদেরকে শরীক করে নি? ওরা কি নিজেদের ঘরসমূহ তোমাদের জন্য বিস্তৃত করে নি। অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও ওরা কি নিজেদের উপর তোমাদেরকে প্রাধান্য দেয়নি?[১১]

তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এ আনসারদের সম্পর্কে বেশ কয়েকটি রিওয়ায়াত রয়েছে। যেমন–

১। আমি আনসারদের ওখানেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। তোমরা তাদের এই দানের যথার্থ মর্যাদা প্রদান করবে এবং তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেবে।[১২]

২। আনসাররা আমার উত্তরাধিকার, আমার সম্পদ। লোকেরা কমও হয়, আবার বেশীও হয়। তাদের দানের কথা তোমরা স্মরণ রাখবে এবং তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেবে।

৩। লোক সকল! অন্যান্য মানুষেরা বাড়তে থাকবে এবং আনসাররা কমতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা হবে সে পরিমাণ, যে পরিমাণ লবণ থাকে খাবারের মধ্যে। অতএব তোমাদের মধে যে শাসক হবে, সে যেন তাদের ইহ্সানের কথা স্মরণ রাখে এবং তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেয়।[১৩]

৪। কসম ঐ সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের সকলের প্রতি আমার ভালবাসা রয়েছে। আনসারদের যিম্মায় যা কিছু করণীয় ছিল, তা বাকি রয়ে গেছে। তাদের এই অবদানের জন্য তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে এবং তাদের ভুলত্রুটি মাফ করে দেবে।[১৪]

৫। স্বয়ং আনসারদের সম্বোধন করে তিনি বলেন, হে আনসার! আমার পরে তোমরা দুঃখকষ্টে অস্থির হয়ে উঠবে। তারা নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রাসূল! এমতাবস্থায় আপনি আমদেরকে কী করার হুকুম দেন? তিনি বলেন, আমি হুকুম দিচ্ছি, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনের যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের সাথে গিয়ে মিলিত হও।[১৫]

দুনিয়ায় চিরদিন কেউ থাকে না

আসাহ্হুস্ সিয়ারে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, লোক সকল! আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা আমার মৃত্যু সম্পর্কে ভয় কর। কিন্তু যত নবী প্রেরিত হয়েছেন তাদের মধ্যে কি কেউ চিরদিন জীবিত রয়েছেন? আমি আল্লাহ্র সাথে মিলিত হচ্ছি, তোমরাও আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবে। এরপর বলেন, আমি ওসীয়ত করছি, প্রাথমিক হিজরত কারীদের সাথে তোমরা ভাল ব্যবহার করবে। আমি আরো ওসীয়ত করছি তোমরা পরস্পরে ভাল ব্যবহার করবে।

এরপর তিনি সূরা আল 'আসর তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, সব কাজ আল্লাহ্র হুকুমে চলে। যে কাজ বিলম্বে করার সে কাজে তাড়াহুড়া করো না। কারো তাড়াহুড়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাজ তাড়াতাড়ি করে দেন না।[১৬]

বদলা গ্রহণের সাধারণ অনুমতি

সম্ভবত; এই খুতবারই একটি অংশ তাবাকাতে নিম্নভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"তোমাদের কারো কারো হক আমার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আমিও একজন মানুষ। যদি আমা কর্তৃক কারো সম্মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তাহলে সে যেন আমার সম্মান থেকে তার বদলা গ্রহণ করে। আমার দ্বারা কোন ব্যক্তির দেহ কষ্ট পেয়ে থাকলে সে যেন আমার দেহ থেকে তার বদলা গ্রহণ করে। আমা কর্তৃক যদি কোন ব্যক্তির সম্পদ ক্ষতি হয়ে থাকে সে ক্ষতি পূরণ করে নেয়। জেনে রেখ, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আমাকে অধিক ভালবাসে, যার উপরোক্ত হক সমূহের কোন হক পাওনা থেকে থাকলে সে তা আমার কাছ থেকে আদায় করে নেয় অথবা আমাকে মাফ করে দেয়-যাতে আমি আমার প্রভুর সাথে এমনভাবে মিলিত হই যে, আমার উপর কারো কোন পাওনা নেই। কোন ব্যক্তি যেন এরূপ মনে না করে যে, বদলা গ্রহণ করলে তার প্রতি আমার শত্রুতা বা ক্রোধের আশংকা রয়েছে। কেননা, এ দু'টি বিষয় (শত্রুতা ও ক্রোধ) আমার স্বভাবেই নেই।[১৭]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত ভাষণের পর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার কাছে একজন ভিক্ষুক এসেছিল। তাকে তিনটি দিরহাম দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বল-লেন, হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ। হে ফযল (ইবনে আব্বাস)! তুমি ওকে ঐ দিরহামগুলো ফেরত দাও।

কেননা, ব্যক্তির অন্তরে যেন এই প্রশ্ন না জাগে যে, এ ধরণের একটি সুযোগ পেয়ে ঐ ব্যক্তি কি তিন দিরহামের এই সামান্য পরিমাণ অর্থও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে চেয়ে নিলেন, অনুরূপ প্রশ্ন জাগটা এক্ষেত্রে সমীচীন নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংসর্গ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পবিত্র করণের কল্যাণে সাহাবা কিরামের স্বভাব এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রত্যেকটি কথাকে কাজে পরিণত করে সেটা বিশ্ব মানবের সামনে একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরতে যারপর নেই সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের কেউই নিজের অন্তরে কোন কথা লুকিয়ে রাখতে অভ্যস্থ ছিলেন না-চাই সে কথা যতই কম গুরুত্বপূর্ণ হোক। যে পবিত্র আত্মাগণ নিজেদের সব কিছু বিনা দ্বিধায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য কুরবান করে দিয়েছিলেন তাঁদের রাসূল-প্রেমের পরিমাণ আমাদের মত লোক কি করে নির্ধারণ করতে পারে? তাঁদের জীবন কুরবানীর মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। সাহাবা কিরামই ছিলেন সেই মহান ব্যক্তিবৃন্দ, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রত্যেকটি নির্দেশ ও প্রত্যেকটি কথা কাজে পরিণত করে দেখাতেন। মনে রাখতে হবে, যে ব্যক্তি তিনটি দিরহাম চেয়ে নিয়েছিলেন তিনিও ছিলেন ঐ মহান ব্যক্তিদের একজন।

এখানে আরেকটি দিক বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন এতই পবিত্র ও নিষ্কলুষ ছিল যে, চল্লিশ বছরের সাধারণ জীবন ও তেইশ বছরের নুবুওয়াত জীবন অতিক্রম করে ওফাতের পাঁচদিন পূর্বে যখন তিনি তাঁর কাছ থেকে যাবতীয় হকের (পাওনার) বদলা গ্রহণের জন্য সাধারণ ঘোষণা দেন তখন দেখা যায় যে, তাঁর যিম্মায় অন্যের মাত্র তিনটি দিরহাম পাওনা আছে-আর তাও নিজের জন্য নয় বরং একজন ভিক্ষুককে দান করার জন্য তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। এমতাবস্থায় এই দিরহামের কথা ভুলে যাওয়াটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। এটাও যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি বিশেষ মু'জিযা ছিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

একজন লোক দাঁড়িয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি অত্যন্ত কৃপণ ও কাপুরুষ এবং সারাদিন শুয়ে থাকি। আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন যেন আমার এ অভ্যাসগুলো দূর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জন্য দু'আ করেন।

জনৈক স্ত্রীলোক নিজের সম্পর্কে কিছু নিবেদন করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আঈশার ঘরে আস। সেখানে তিনি আপন পবিত্র লাঠিটি ঐ স্ত্রীলোকের মাথার উপর রাখেন। সেই স্ত্রীলোক দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বেশী বেশী সিজ্দা করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সিজ্দাকে দীর্ঘায়িত করো। কেননা, সিজ্দার অবস্থায়ই আল্লাহ্ বান্দার সবচেয়ে নিকটতর হন।

হালাল ও হারামের ব্যাপার

মরহুম মাওলানা শিবলী বলেন, ইসলাম ও অন্যান্য মাযহাবের মধ্যে একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম পার্থক্য এই যে, ইসলাম শরীয়তের যাবতীয় হুকুমের প্রণেতা ও আদেশদাতা, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে মনে করে। নবীর শুধুমাত্র এতটুকু দায়িত্ব যে, তিনি আপন কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র হুকুমসমূহ বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন। যেহেতু অন্যান্য মাযহাবে এ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা শিরক্ ও কুফুরের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল এবং তার কুফল প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হালাল ও হারামকে যেন আমার দিকে সম্পর্কিত করা না হয়। আমি শুধুমাত্র ঐ জিনিসকে হালাল করেছি, যেটাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবের মধ্যে হালাল করেছেন এবং শুধুমাত্র ঐ জিনিসকে হারাম করেছি, যেটাকে আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন।[১৮]

হযরত আঈশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কোন জিনিসকে আমার দিকে সম্পর্কিত করে বলো না যে, আমি সেটাকে হালাল অথবা হারাম করেছি। আমি তো শুধুমাত্র সেই জিনিসকে হালাল করেছি, যেটাকে আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন এবং সেই জিনিসকে হারাম করেছি যেটাকে আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন।[১৯]

প্রতিদান ও শাস্তির ভিত্তি

মানুষের ব্যক্তিগত কাজকর্মই হচ্ছে তার প্রতিদান ও শাস্তির ভিত্তি। এর সাথে অন্য কোন কিছুর সম্বন্ধ বা সম্পর্ক নেই। পবিত্র কুরআনের মূলনীতি হচ্ছে–

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۔

"প্রত্যেকে আপন কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না।"–(৬:১৬৪)

উক্ত আয়াতের শেষাংশ সূরা বানী ইস্‌রাঈল আয়াত–১৫, সূরা ফাতির আয়াত–১৮,সূরা যুমার আয়াত–৭-এ উল্লেখিত হয়েছে। এরপর সূরা নাজ্‌ম-এ আল্লাহ্ বলেন–

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۔ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۔

"ওটা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না, আর এই যে, মানুষ তাই পায়, যা সে করে।"–(৫৩:৩৮-২৩৯)

কোন মানুষ–চাই সে যত পবিত্র ও মর্যাদা সম্পন্ন হোক, কিংবা যত সম্ভ্রান্ত বংশের সাথে সম্পর্কিত হোক, তার পরিত্রাণের মাধ্যম তার নিজের পুণ্যকর্ম এবং তাক্‌ওয়া ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,

" হে আল্লাহ্র রাসূলের কন্যা ফাতিমা! হে আল্লাহ্র রাসূলের ফুফু সাফিয়া! তোমরা আল্লাহ্র জন্য কিছু কর। আমি তোমাদের উভয়কে কোন ব্যাপারেই আল্লাহ্ থেকে রক্ষা করতে পারব না।"[২০]

তিনি আরো বলেন,

"হে আবদে মানাফের বংশধরগণ! আমি তোমাদেরকে কোন ব্যাপারেই আল্লাহ্ থেকে বাঁচাতে পারব না। হে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব! আমি তোমাদের কোন ব্যাপারেই আল্লাহ্ থেকে বাঁচাতে পারব না। দুনিয়ায় আমার কাছে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও।[২১] (কিন্তু আখিরাতে শুধু তোমাদের পুণ্য কর্মই কাজে আসবে, অন্য কিছু নয়।"

এই আহবান ছিল পুণ্যকর্মের,স্বয়ং তাঁর বংশধরদের প্রতি আর বাকি সকলের প্রতিও ছিল এটা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ আহবান। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং আপন নিকটাত্মীয়, বরং আপন কন্যার কাছে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, আখিরাতের ব্যাপারটি শুধুমাত্র তাদের নিজ নিজ আমলের উপর নির্ভরশীল তখন আমাদের জন্য কি পুণ্যকর্ম ছাড়া পরিত্রাণ লাভের অন্য কোন পথ আছে বা থাকতে পারে?

জরুরী নিবেদন

আমি এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিভিন্ন বাণী, যা তিনি তাঁর 'মারযুল মাওতা'কালীন সময়ে দিয়েছিলেন এমনভাবে একত্র করে দিয়েছি যে, বাহ্যত: এগুলোকে তাঁর একই ভাষণের বিভিন্ন অংশ বলে মনে হচ্ছে। আসলে তিনি হয়ত এভাবে এবং এই ক্রমানুসারে তাঁর ভাষণ দেন নি এবং তা এভাবে লিপিবদ্ধ কোন বই-পুস্তকেও আমাদের নজরে পড়েনি। অবশ্য এটা ঠিক যে, এই সব বাণী তাঁর ঐ সময়কারই, যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং এগুলোর সমগ্রের কিংবা অধিকাংশেরই সম্পর্ক রয়েছে তাঁর বৃহস্পতিবারের খুতবার সাথে। বৃহস্পতিবারের পরও হুযূর (সা) মসজিদে আগমন করেছিলেন বলে কেউ কেউ বলেছেন। আমার এ জরুরী নিবেদন শুধু এজন্য যে, এ ব্যাপারে কারো যেন কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়।

কিরতাসের ঘটনা

সেই সময়কার একটি ঘটনা এমনও আছে, যা কিরতাস বা কাগজের ঘটনা নামে খ্যাত। মনে হয় এ ঘটনাও বৃহস্পতিবারেই ঘটেছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ঘটনাটি ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ একবার সাহাবীদের বলেন, কাগজকলম নিয়ে আস আমি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিস লিখে দিয়ে যাব যে, এরপর তোমরা আর পথভ্রষ্ট হবে না।

যেসব সাহাবী তখন উপস্থিত ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাঁদের কারো কারো এই ধারণা হয়েছিল যে, এখন তিনি ভয়ানক অসুস্থ। অতএব এই অবস্থায় তাঁকে কষ্ট দেওয়া সমীচীন নয়। আবার কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশ পালনার্থে কাগজ দিতে চাচ্ছিলেন। বিভিন্ন আঙ্গিকে এ বিষয়ের উপর অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। আমি এখানে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। এখানে শুধু এতটুকুই জেনে নেওয়া যথেষ্ট যে, এই ঘটনার পাঁচদিন পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেন। এই সময়কার কিছু কিছু রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলোতে কাগজ চাওয়ার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সত্যি যদি কোন জরুরী কথা বলার ছিল তবে সে কথা বলেননি এবং লিখানও নি।

ইবনে আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত

এক্ষেত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এরও একটি রিওয়ায়াত আছে, যা সহীহ্ বুখারীর কয়েক জায়গায়, শব্দের বিভিন্নতার সাথে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আমরা 'তাবাকাত' থেকে এর কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

'ইবনে আব্বাস (রা) বৃহস্পতিবারের উল্লেখ করে কাঁদতে থাকেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুখ সাংঘাতিক বেড়ে যায়। তিনি তখন বলেন, দোয়াত-কাগজ নিয়ে আস, আমি তোমাদেরকে এমন একটি ফরমান লিখে দেব যে, তোমরা আর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কষ্ট দেখে উপস্থিত জনগণের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হলো।

অর্থাৎ এই মুহূর্তে তাঁর জন্য দোয়াত-কাগজের ব্যবস্থা করা ঠিক হবে কি-না। অথচ ঐ অবস্থায় হুযূর (সা)-এর সামনে মতবিরোধ করাটা বাঞ্ছনীয় ছিল না। যখন দ্বিতীয়বার তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। কেননা, আমি যে অবস্থায় আছি তা ঐ জিনিসের চাইতে শ্রেষ্ঠ, যার দিকে তোমরা আমাকে আহ্বান করছ।

আমি তোমাদেরকে তিনটি ওসীয়ত করছি–

১। মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও।

২। প্রতিনিধিদলকে ঠিক সেরূপ যত্ন করবে যেরূপ আমি করতাম।

তৃতীয় ওসীয়ত সম্পর্কে বর্ণনাকারী (রাভী) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) ঐ সময় তা বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু আমার তা মনে থাকেনি। কিংবা রাসূলুল্লাহ্ (সা) (তৃতীয় ওসীয়ত না করে) নীরব হয়ে গিয়েছিলেন।[২২]

মরহুম মাওলানা হাকীম আবদুর রাঊফ দানাপুরী বলেন, কোন কোন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এটা ছিল উসামা (রা)-এর বাহিনী সম্পর্কিত কোন নির্দেশ। কারো কারো বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, হুযূর (সা)-এর তৃতীয় নির্দেশটি ছিল, 'আমার কবরকে তোমরা উপাসনালয়ে পরিণত করো না।'[২৩]

'তাবাকাত'-এর রিওয়ায়াত

তাবাকাতে ইবনে সা'দে এ প্রসংগে কয়েকটি রিওয়ায়াত আছে। যেমন তার একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগের সূচনা ঐ দিন হয় যেদিন তিনি হযরত মায়মূনা (রা)-এর ওখানে অবস্থান করছিলেন। যখন তিনি হযরত আঈশা (রা)-এর ঘরে এসে পৌঁছেন তখন তার দারুণ মাথা ব্যাথা ছিল। ঘটনা চক্রে হযরত আ'ঈশা (রা) ঐ দিন মাথা ব্যাথায় আক্রান্ত ছিলেন এবং বলেছিলেন, হায় আমার মাথা (وا رأساه) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, তুমি 'হায় আমার মাথা' বলো না। বরং আমিই 'হায় আমার মাথা' বলার অধিক যোগ্য। আমি মনস্থ করেছি যে, কারো মাধ্যমে তোমার বাবা এবং ভাইকে ডেকে পাঠাবো, নিজের কাজ পুর্ণ করে নেব এবং নিজের প্রতিশ্রুতিকে সৃদৃঢ় করে ফেলব–যাতে কোন লালসাকারী এর মধ্যে লালসা না করে, কোন উক্তিকারী কোন উক্তি না করে এবং উচ্চাকাংখী কোন উচ্চআকাংখা না করে। অত:পর বলেন–

. كلا يابى اللّه ويدفع المؤمنون اويدفع اللّهُ ويابى المؤمنون وقال بعضهم فى حديثه : ويابى اللّه الا ابى بكر .

"এর কোনই প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্ও তা অস্বীকার করবেন এবং মুমিনরাও তা রদ করে দেবে। (কিংবা তিনি বলেন) আল্লাহ্ও রদ করে দেবেন এবং মুমিনরাও অস্বীকার করবে। কোন কোন রাভী (বর্ণনাকারী) তার রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেছেন: আল্লাহ্ আবু বকর ছাড়া (অন্য সবাইকে) অস্বীকার করবেন।[২৪] (সংকলক)

টীকা ঃ

১। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ডঃ পৃষ্ঠা–১৭৫।
২। আসাস্‌হুস্ সিয়ারঃ পৃষ্ঠা–৫১৩।
৩। রাহ্‌মাতুল লিল্ আলামীনঃ পৃষ্ঠা–৩১৮।
৪। সীরাতুন্নবী ঃ পৃষ্ঠা–১৭৫।
৫। তাবাকাতে ইবনে সা'দঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা–২৩৯। সহীহ্ বুখারীতে একথার সাথে 'কিয়ামতের দিন'–ও যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ ওরা কিয়ামতের-দিন হবে আল্লাহ্‌র নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।
৬। তাবাকাতে ইবেন সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা–২৪০।
৭। তাবাকাতে ইবেন সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা–২৪০।
৮। তাবাকাতে ইবেন সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা–২৪১।
৯। তাবাকাতে ইবেন সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা–২৪৯।
১০। সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুল মানাকিব ।
১১। আসাহ্‌হুস্ সিয়ার ঃ পৃষ্ঠা–৫২৭।
১২। তাবাকাত ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা–২৫১।
১৩। তাবাকাতে ইবেন সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা–২৪০।
১৪। তাবাকাতে ইবেন সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা–২৪০।
১৫। তাবাকাত ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা–২৫৩।
১৬। আসাহ্‌হুস সিয়ার ঃ পৃষ্ঠা–৫২৬।
১৭। তাবাকাত ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা–২৫৫।
১৮। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা–১৭৭।
১৯। তাবাকাতে ইবেন সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা–১৫৬।
২০। তাবাকাতে ইবেন সা'দ ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা–২৫২।
২১। তাবাকাতে ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা–২১৯।
২২। রাহমাতুল্ লিল আলামীনঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা–২১৯।
২৩। আসাহ্‌হুস্ সিয়ার ঃ পৃষ্ঠা–৫২৫।
২৪। তাবাকাত ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা–২২৫।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত-৩

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۔

অত্যধিক রোগবৃদ্ধি

বৃহস্পতিবার দিন খুতবা দানের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে চলে আসেন। এরপর অত্যধিক রোগ বৃদ্ধি ও দুর্বলতার কারণে তিনি আর বাইরে বের হতে পারেন নি-যদিও এরপরও কেউ কেউ তাঁর মসজিদে যাওয়ার কথা বলেছেন। যা হোক তাঁর দুর্বলতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অবশ্য এই অবস্থায়ই তাঁর পবিত্র মুখে সত্যের দাওয়াতের বিভিন্ন অংশ জারী ছিল। যেমন ঃ

১। য়াহূদ ও খ্রীষ্টানদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হোক, তারা তাদের নবীদের কবরকে উপাসনালয়ে পরিণত করেছে।

২। দাসদাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তাদেরকে কাপড় পরাও, পেট ভরে খাওয়াও এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করো।

৩। সাবধান! আল্লাহ্ সম্পর্কে সুধারণা না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুবরণ না করে।

ওফাতের একদিন পূর্বে

ওফাতের একদিন পূর্বে অর্থাৎ রবিবার দিন তিনি তাঁর সকল দাসকে মুক্ত করে দেন। কোন কোন রিওয়ায়াত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো কোন দাসকে কার্যত: দাস হিসাবে রাখেন নি। এক কথায় বলতে গেলে, তিনি প্রথম দিনই তাঁদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। অবশ্য রীতি অনুযায়ী তাদের কারো কারো মুক্তির ঘোষণা প্রদান সমীচীন মনে করা হয় নি। তাঁর ঘরে ঘটনাক্রমে ছয় অথবা সাতটি দীনার রয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর সমগ্র অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানদেরকে দান করে ফেলেন। তখন তাঁর একটি লৌহবর্ম তিরিশ যবের বিনিময়ে জনৈক য়াহূদীর কাছে বন্ধক ছিল। মরহুম কাযী সুলায়মান বলেছেন, এক সা-এর ওজন হচ্ছে দু'সের সাড়ে তিন ছটাক। এই হিসাবে বন্ধককৃত বর্মের বিনিময়ে যে যব গ্রহণ করা হয়েছিল তার পরিমাণ হচ্ছে এক মণ ছাব্বিশ সের নয় ছটাক। সেদিন প্রদীপ জ্বালাবার তৈল ঘরে ছিল না। হযরত আঈশা (রা) কোন এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে কিছু তৈল নিয়ে আসেন এবং তা দিয়ে সেই রাতে মহানবীর পবিত্র গৃহ আলোকিত করা হয়, যে রাতে তিনি এই দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেন।

অচেতন অবস্থায় ওষুধ খাওয়ানো

সেবাকারীদের কারো কোরো সন্দেহ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রা) আবিসিনিয়া থেকে নিউমোনিয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি শিখে এসেছিলেন। সে পদ্ধতি

অনুযায়ী আওদে হিন্দী, কুসাম, যায়তুন তৈল ইত্যাদি মিশ্রিত করে একটি ঔষুধ তৈরী করা হত। তাঁরা এই ঔষধই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে খাওয়াতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি তা খেতে অস্বীকার করেন। তখন সেবাকারীগণ মনে করলেন, সচরাচর রোগীরা তিক্ত ঔষুধ খেতে অস্বীকার করে, অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাই করেছেন। ঘটনাচক্রে ঐ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অচেতন হয়ে পড়েন। সেবাকারীগণ এই অবস্থার সুযোগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে নিউমোনিয়া রোগের ঔষুধ খাইয়ে দেয়। চেতনা ফিরে পাবার পর যখন তিনি ঔষুধ খাওয়ার ব্যাপারটি বুঝতে পারেন তখন বলেন, তোমাদেরকে এভাবে ঔষুধ খাওয়াবার পরামর্শ কে দিয়েছে? নিবেদন করা হলো, হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এটা হচ্ছে সেই চিকিৎসা পদ্ধতি, যা আবিসিনিয়া থেকে আমদানী করা হয়েছে। তোমরা মনে করছ, আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর নিউমোনিয়া চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু (জেনে রেখ) আল্লাহ্র ইচ্ছা এটা নয় যে, তা আমার উপর জয়ী হয়ে যাক।

সাথে সাথে তিনি এই নির্দেশও দেন ঃ আমার চাচা (আব্বাস) ছাড়া ঘরে যত লোক আছে, তাদের সবাইকে যেন এই ঔষুধ খাওয়ানো হয়। তাঁর এই নির্দেশটি কার্যকর করা হয়েছিল।

সোমবার ফজরের সালাত

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগ কখনো অনেকটা বেড়ে যাচ্ছিলো, আবার কখনো কিছুটা হ্রাস পাচ্ছিলো। মরহুম মাওলানা শিবলী ওফাতের দিন সোমবারের ফজরের সালাতের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেন, সেদিন তাঁর শারীরিক অবস্থা বাহ্যত: কিছুটা ভাল ছিল। তাঁর পবিত্র হুজরা ছিল মসজিদ সংলগ্ন। তিনি পর্দা উঠিয়ে দেখেন, লোকেরা ফজরের সালাত আদায় করছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি আনন্দে হেসে উঠেন। লোকেরা তাঁর এ অবস্থা ঠাহর করে ধারণা করে বসেন যে, তিনি বাইরে (অর্থাৎ মসজিদে) আসতে চাচ্ছেন।

তাঁরা তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেন এবং তাঁদের সালাত প্রায় টুটে যাবার উপক্রম হয়। [হযরত আবু বকর (রা), যার ইমামতীতে সালাত হচ্ছিলো পেছনে হটে যেতে চান]। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইঙ্গিতে তাঁকে প্রতিহত করেন এবং পুনরায় হুজরা শরীফে ঢুকে পর্দা ফেলে দেন। (সহীহ্ মুসলিমে আছে, তিনি তখন এত দুর্বল ছিলেন যে, পর্দাটিও ঠিকমত ফেলতে পারেন নি)। এটা ছিল সর্বশেষ সুযোগ যে, সাহাবা কিরাম তাঁর নুরানী চেহারা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, তাঁর চেহারা তখন বইয়ের পাতার মত (অর্থাৎ সাদা) হয়ে গিয়েছিল।[১]

এ উদ্ধৃতির কিছু কিছু শব্দ থেকে অনুমিত হয় যে, হুযূর (সা) পবিত্র হুজরা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এ সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। তবে সহীহ্ বুখারীর একটি রিওয়ায়াতে আছে, হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে দেখে বের হয়েছিলেন। পরে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন- اصبح بحمد اللّه بارئًا . -"আলহামদু লিল্লাহ্, তিনি ভালই আছেন।"[২]

হযরত আবু বকর (রা) সালাত পড়াবার পর হুযূর (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়ে 'সুখ'-এ (যেখানে তাঁর ঘর ছিল) চলে যান।

হযরত আব্বাস (রা) ঐ দিন কিংবা এর একদিন পূর্বে হযরত আলী (রা)-এর সাথে কথা প্রসংগে বলে ফেলেছিলেন-

وانى واللّه لارى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتوفى من وجعه هذا-

انى لاعرف وجوه بنى عبد المطلب عندالموت .

"আল্লাহ্র কসম, আমি দেখছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই রোগে শীঘ্রই ইন্তিকাল করবেন। আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের চেহারা দেখেই বুঝে নিতে পারি, মৃত্যু আসন্ন।"[৩]

হযরত ফাতিমা (রা)-এর সাথে গোপন কথাবার্তা

সোমবার দিনটি যত বাড়তে লাগল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কষ্টও তত বৃদ্ধি পেয়ে চললো। তিনি বার বার অচেতন হতে থাকেন। হযরত আঈশা (রা) বলেন, ফাতিমা (রা) এলেন। তাঁর চলার ভঙ্গিটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এরই মত। তাঁকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'স্বাগতম, আমার প্রিয় কন্যা। তিনি তাঁকে তাঁর ডান অথবা বাম পাশে (বর্ণনাকারীর মনে নেই) বসালেন। এরপর তাঁর সাথে চুপি চুপি কিছু কথা বললেন। সেকথা শুনেই ফাতিমা (রা) কাঁদতে লাগলেন। এরপর তিনি (সা) পুনরায় তাঁর কানে চুপি চুপি কিছু কথা বললেন। সেকথা শুনে ফাতিমা (রা) হাসতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর ফাতিমা (রা) বলেন, প্রথমে আমাকে চুপি চুপি বলেছিলেন, আমার ধারণা এই রোগেই আমার ইন্তিকাল হবে। একথা শুনামাত্র আপনা-আপনি আমার ক্রন্দন আসে। এরপর আব্বা আমাকে এই কথা বলেন যে, আমার পরিবারের মধ্যে তুমি প্রথমে আমার সাথে মিলবে। সাথে সাথে এই সুসংবাদ দেন যে, মারয়াম বিনতে ইমরানের পর আমিই জান্নাতের স্ত্রীলোকদের সর্দার হব। একথা শুনে আমি আনন্দে হেসে উঠি।[৪]

একটি রিওয়ায়াতে আছে, হুযূর (সা)-এর কষ্ট দেখে হযরত ফাতিমা (রা) তাঁর বক্ষ জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। হুযূর (সা) তখন বলেন, প্রিয় কন্যা, কেঁদোনা, আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন' (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী) বলবে। এটাই প্রত্যেকটি মানুষের জন্য শান্তি ও স্বস্তির মাধ্যম। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার জন্যও? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমার জন্যও।

সাক্‌রাতুল মাওত

যখন স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পানি ভর্তি একটি পেয়ালা তাঁর কাছে রাখতে বলেন। তিনি তাতে হাত ডুবাতেন, ভেজা হাত আপন পবিত্র চেহারার উপর বুলিয়ে নিতেন। তখন তাঁর পবিত্র মুখে ধীর ধীরে একথাগুলো জারি ছিল- لا اله الا الله ان للموت سكرات . -"আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। নিশ্চয় মৃত্যুর জন্য যন্ত্রণা রয়েছে।"

অপর এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি বলছিলেন- اللهم اعنى على كرب الموت . -"হে আল্লাহ্! মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে আমাকে সাহায্য করো।"[৫]

আপন চেহারার উপর ভেজা হাত বুলানো ছাড়াও তিনি কখনো তাঁর এক পা ছড়িয়ে দিতেন। এরপর তা গুটিয়ে নিয়ে অন্য পা ছড়িয়ে দিতেন। এভাবে কখনো আপন চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে নিতেন, আবার কখনো চাদর সরিয়ে ফেলতেন। এগুলো ছিল তাঁর অধিকতর যন্ত্রণারই চিহ্ন। হযরত ফাতিমা (রা) এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলে উঠেন, وا كرب اباه . -(হায় আমার আব্বার অস্বস্তি!) হুযূর (সা) তখন বলেন, আজকের পর তোমার আব্বা আর অচেতন হবেন না।

মিস্‌ওয়াক

ওফাতের কিছু পুর্বে আবদুর রহমান বিন আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহকে দেখতে আসেন। তখন তাঁর হাতে একটি তাজা মিস্‌ওয়াক ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আঈশা (রা)-এর কোলে মাথা রেখে শুইয়ে ছিলেন। তিনি

(আঈশা) বলেন, আমি লক্ষ্য করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চক্ষু মিস্ওয়াকের উপর নিবদ্ধ রয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর মিস্ওয়াক করার ইচ্ছা আছে।

অতএব আমি আমার মুখে মিস্ওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে তাঁকে দিলাম। এরপর আমি বরাবর তাঁকে যেভাবে মিস্ওয়াক করতে দেখতাম তিনি এটা দিয়ে তার চাইতেও সুন্দরভাবে মিস্ওয়াক করলেন। মিস্ওয়াকটি তাঁর হাতেই থাকল যতক্ষণ না তা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল কিংবা তাঁর হাত তা থেকে পৃথক হয়ে গেল।

হযরত আঈশা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর দুনিয়ার শেষ এবং আখিরাতের প্রথম দিনে আল্লাহ্ আমার এবং তাঁর মুখের লালাকে একত্র করে দিয়েছিলেন।[৬]

অন্তিম মুহূর্ত

ত্রিপ্রহরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর পবিত্র বক্ষে মড় মড় শব্দ অনুভূত হতে লাগলো। ঠিক ঐ মুহূর্তে তাঁর পবিত্র ঠোঁট নেড়ে উঠল। শুনা গেল, তিনি বলছেন, الصلواة الصلواة وما ملكت ايمانكم . –"সালাত এবং তোমাদের দাস-দাসী!"

এরপর তিনি অংগুলি দিয়ে উপরের দিকে ইশারা করলেন এবং তিনবার বললেন, بل الرفيق الاعلى –"ব্যস, এখন আর কেউ নয়, শুধুমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর প্রয়োজন।"

তৃতীয়বার এই শব্দসমূহ উচ্চারণ করার পর তাঁর হাত ঝুলে পড়ে, চক্ষু প্রসারিত হয়ে ছাদের দিকে নিবদ্ধ হয় এবং তাঁর পবিত্র রূহ আল্লাহ্ ত'আলার সাথে গিয়ে মিলিত হয়।[৭]

হযরত আঈশা (রা) বলেন, আল্লাহ্র পুরস্কারসমূহের একটি পুরস্কার আমি এই পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমারই কোলে, আমার ঘরে এবং আমারই পালার দিন ইন্তিকাল করেন।[৮] তাঁকে আমার কোল থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। আমি এই অবস্থায়ও তাঁকে ছাড়িনি। শেষ পর্যন্ত আমার কোল থেকে উঠিয়ে নিয়ে তাঁকে গোসল করানো হয়। এরপর আমি একটি বালিশ নিয়ে গিয়ে তাঁর মাথার নীচে রেখে দিই, এরপর তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেই এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকের সাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করতে থাকি।[৯] সহীহ্ বুখারীতে হযরত আ'ঈশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে,

حضره القبض وراسه على فخذ عائشة غُشى عليه فلما افاق شخص بصره نحوسقف البيت ثم قال اللّهم فى الرفيق الاعلى فقلت اذًا لايجاورنا

"যখন আত্মা কবয্ করার মুহূর্ত উপস্থিত হল তখন তিনি তাঁর পবিত্র মস্তকটি হযরত আ'ঈশা (রা) -এর উরুর উপর রাখলেন। এই অবস্থায়ই তিনি অচেতন হয়ে গেলেন। যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন তাঁর চোখ উপরের ছাদের দিকে নিবদ্ধ হল এবং তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ্! রাফীকে 'আলার (সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর) মধ্যে।' তখন আমি (আ'ঈশা) বললেন, তিনি আর আমাদের সাথে থাকতে চান না।

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمدوبارك وسلم .

" হে আল্লাহ্, কৃপা কর আমাদের নেতা ও আমাদের মাওলা মুহাম্মদের উপর এবং আমাদের নেতা ও আমাদের মাওলা মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনের উপর এবং বর্ষণ কর শান্তি ও কল্যাণ।"

রাবীউল আউয়াল, হিঃ ১১ সন, সোমবার দিন ত্রিপ্রহরে তিনি দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেন। তখন তাঁর বয়স ছিল আটদিন কম তেষট্টি বছর।

ওফাতের তারিখ

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, তিনি ১২ রাবীউল আউয়াল জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং ঐদিন ইন্তিকালও করেছেন। কিন্তু বিষয়টি পর্যালোচনা করার পর জানা যায় যে, এ দুটি তারিখের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বর্তমান যুগে সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি ৯ রাবীউল আউয়াল, হস্তীবর্ষে (যে বছর আবরাহা হস্তীবাহিনী নিয়ে এসে কাবা আক্রমণ করতে চাচ্ছিলো) জন্ম গ্রহণ করেন। এমন কি মরহুম কাযী সুলায়মান মানসুরপুরী তাঁর রাহ্মাতুল লিল আলামীন গ্রন্থে এটাকে সঠিক ধরে নিয়ে সেই সাথে খ্রীষ্টীয় ও বিক্রমী সালের তারিখ সমূহের উল্লেখও করেছেন। কিন্তু কাযী সাহেব এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১২ রাবীউল আউয়াল ইন্তিকাল করেন। এ সম্পর্কে মাওলানা শিবলী যা কিছু লিখে দিয়েছেন তাতে এখন পর্যন্ত কোন ধরণের পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। আর মরহুম শিবলী শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেটাই্ সঠিক বলে মনে হয়। মাওলানার অভিমত সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হলো।

কয়েকটি ব্যাপারে হাদীস ও সিয়ার বিশেষজ্ঞরা একমত যে–

(ক) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের বছর হচ্ছে ১১ হিজরী।

(খ) তিনি হিজরী ১১ সনে ইন্তিকাল করেন।

(গ) সে মাস ছিল রাবীউল আউয়াল।

(ঘ) তা ছিল ১ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে।

(ঙ) আর ঐ দিন ছিল সোমবার।

এরপর এ ব্যাপারেও সকলেই একমত যে, বিদায় হজ্জের দিন, অর্থাৎ ৯ যিল হাজ্জাহ্ হিঃ ১০ সন ছিল (আরফায় উকূফ করার দিন ছিল) শুক্রবার। আর ঐদিন থেকে ওফাত পর্যন্ত সময়কাল ছিল ৮১ দিন।

হিসাবের বিভিন্ন পন্থা

এবার বিভিন্ন পন্থায় হিসাব করে দেখা যেতে পারে।

১। যিল হাজ্জাহ্, মুহাররম, সফর–এই তিন মাসের প্রত্যেকটিকে ত্রিশ দিনের ধরে নিলে (অনুরূপ ঘটনা সাধারণভাবে ঘটেনা, তবু ঘটেছে বলে ধরে নিলে) ৬ এবং ১৩ রাবীউল আউয়াল সোমবার হবে।

২। যিল হাজ্জাহ, মুহাররম, সফর–এই তিন মাসের প্রত্যেকটি উনত্রিশ দিনের ধরে নিলে (অনুরূপ ঘটনা সাধারণভাবে ঘটে না,তবু ঘটেছে বলে ধরে নিলে) ২ এবং ৯ রাবীউল আউয়াল সোমবার হবে।

বাকি সম্ভবপর ঘটনার পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া গেল।

পন্থা	সোমবার	সোমবার	সোমবার
যিল হাজ্জাহ ৩০ মহাররম ও সফর ২৯	১	৮	১৫
যিল হাজ্জাহ ও মুহাররম ২৯, সফর ৩০	১	৮	১৫
যিল হাজ্জা ২৯, মুহাররম ৩০, সফর ২৯	১	৮	১৫
যিল হাজ্জাহ ৩০, মুহাররম ২৯, সফর ৩০	৭	১৪	২১
যিল হাজ্জাহ ৩০, মুহাররম ৩০, সফর ২৯	৭	১৪	২১
যিল হাজ্জাহ ২৯, মুহাররম ও সফর ৩০	৫	১৪	২১

উপরোক্ত পন্থাগুলোর মাধ্যমে এ তথ্যটি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে যে, শুধুমাত্র ১ বারীউল আউয়াল পন্থাটিই সহীহ্ এবং স্বীকার্য হতে পারে।

টীকা ঃ

১। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা-১৭৯। উদ্ধৃতির মধ্যে বন্ধনীর ভিতরে যে বাক্যগুলো রয়েছে, তা মরহুম মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মানের।

২। সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুল মাগাযী।

৩। ঐ।

৪। তাবাকাত ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা-২৪৭। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) এর রেওয়ায়াত অনুযায়ী, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ফাতিমা (রা) কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

৫। ঐ।

৬। তাবাকাত ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-২৪১।

৭। সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা-১৮১।

৮। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-২৬২।

৯। ঐ।

কাফন-দাফন

বিপদের উপর বিপদ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের কারণে সাহাবা কিরামের উপর– হুযূরের নিকটাত্মীয়রাও ছিলেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত এবং তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের উপর যে কিয়ামত পতিত হয়েছিল, শব্দের ভাষায় তার সঠিক নক্‌শা অংকন অসম্ভব। আমাদের সামনে এ সম্পর্কিত রেওয়ায়াতের বেশ বড় একটি সংকলন রয়েছে, যার দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে যে, এই আকস্মিক আঘাত কোন কোন সাহাবীকে যার পর নেই চিন্তিত ও শোকাভিভূত করে ফেলেছিল। তাঁরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না, হঠাৎ এ কি অবস্থার সৃষ্টি হলো? এটাকে কি ধরনের ঘটনাই বা মনে করতে হবে? কোন কোন রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন কোন নিকটজনের মানসিক অবস্থার বিবরণ রয়েছে। এমন সব কাব্য কবিতারও বিরাট সংগ্রহ রয়েছে, যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্মরণে রচিত হয়েছিল। অতএব একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এ সময়ে যে শোক ও দুঃখের দৃশ্য প্রতিভাত হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক এবং যারপর নেই হৃদয়বিদারক।

এটাও জানা কথা যে, এ বিরাট দুঃখজনক ঘটনার উপর দিয়ে চৌদ্দ শ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সেই দুনিয়া বদলে গিয়ে কি থেকে কি হয়ে গেছে, যে দুনিয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর তেষট্টি বছরের পবিত্র জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি একটি পাশবিক পরিবেশকে বদলে দিয়ে সেখানে ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং অসভ্য বর্বর একটি জনগোষ্ঠীকে একটি ন্যায় ও সত্যপ্রিয় জাতিতে পরিণত করেছিলেন যার সদৃশ একটি জাতি পূর্বেও সৃষ্টি হয় নি এবং পরেও হবে না এবং হতে পারেও না। আমরা যদি এই তথ্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে অবহিত হতে পারি তাহলে এগুলোকে সঠিকভাবে সজ্জিত-বিন্যস্ত করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার হবে না।

প্রকাশ্য হাকীকতসমূহ

এতদ্‌সত্ত্বেও এমন সব প্রকাশ্য-হাকীকত রয়েছে, যেগুলোকে কোন ব্যক্তি যেমন অস্বীকার করতে পারবে না তেমনি তাতে দ্বিমতও পোষণ করতে পারবে না–তবে এই শর্তে যে, সে যেন ন্যায়বিচার ও ন্যায়নিষ্ঠা থেকে পুরাপুরি বঞ্চিত না থাকে।

১। যে সব ব্যক্তিবর্গের অবস্থা ও জীবন কথা ইতিহাসের সংরক্ষণাগারে বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মধ্যে এরূপ এমন একজনকেও উপস্থাপন করা যাবে না, যার সাথে মানুষের-একটি বিরাট দলের এমন ভালবাসা ছিল, যেমন ভালবাসা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাহাবা কিরামের।

২। সাহাবা কিরাম তাঁদের প্রিয় নবীর চারপাশে নিজেদের জানমাল উৎসর্গের যে বিস্ময়কর চক্ররেখা টেনে দিয়েছিলেন, সেরূপ বিস্ময়কর ত্যাগ ও কুরবানীর চক্ররেখা বিশ্বের অন্য কোন মানুষের ক্ষেত্রে কি কখনো পরিলক্ষিত হয়েছে, না হতে পারে?

৩। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাহাবা কিরাম যে কিরূপ ভালবাসতেন তার উদাহরণ হচ্ছে তাঁরা নিজেরাই। এরূপ ভালবাসার দৃশ্য সূর্য-চন্দ্র-তারকা পূর্বেও কখনো দেখে নি এবং পরেও কখনো দেখবে না।

৪। পার্থিব সম্পদ ও শান-শওকত হাসিলের জন্য বিশ্বের অসংখ্য লোক বাদশাহ্, সমরাধিনায়ক, দিগ্বিজয়ী, বীর-বরং ডাকাতদের সাথে পর্যন্ত সুসম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং ঐ সমস্ত বিষয়ের বিবরণে ইতিহাস গ্রন্থাদি পরিপূর্ণ। কিন্তু সাহাবা কিরামের সামনে কোন পার্থিব সম্পদ বা শান-শওকত ছিল না। বরং যে সামান্য পরিমাণ ধন দৌলত তাঁদের কাছে ছিল সেটাকে উৎসর্গ করা তাঁরা অবশ্য কর্তব্য মনে করতেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল কালিমা-ই-হক এর আওয়াজ বুলন্দ করা, যাতে করে এর মাধ্যমে মানুষের ইহ-পরকালের শান্তি ও মুক্তির পথ খোলাসা হয়ে যায়। এই লক্ষ্য হাসিলের জন্য তাঁরা নিজেদের সব কিছু নির্দ্বিধায় কুরবান করে দিয়েছেন। কোন প্রকার অভাব-অভিযোগ বা বিপদ-আপদ তাঁদেরকে তাঁদের লক্ষ্য অর্জন থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে নি। আর শেষ পর্যন্ত তাঁরা যে তাঁদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছিলেন তার সাক্ষী এই আসমান-যমীন।

৫। সাহাবা কিরাম এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নেতৃত্বে প্রতিপক্ষের আঘাতের পর আঘাত সহ্য করেছেন, ধন-সম্পদ লুটিয়ে দিয়েছেন, এমন কি এপথে নিজেদের মাথা কাটিয়ে দিয়েছেন। আর এসব কিছু তাঁরা কোনরূপ জোর-জবরদস্তির কারণে কিংবা চাপ প্রয়োগের ফলে করেননি, বরং তাঁরা তা করেছেন স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে, উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে যেরূপ ভালবাসতেন তার দৃষ্টান্ত বিশ্বজগতের কোথাও অতীতে পাওয়া যায় নি এবং ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টান্ত ছিলেন তাঁরা নিজরাই।

৬। সাহাবা কিরামের সামনে ঈমানের সেই তুলাদণ্ড ছিল, যা তাঁদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন,

والذى نفسى بيده لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين .

"কসম এই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, পুত্র এবং সমগ্র দুনিয়ার লোকের চাইতে অধিকতর প্রিয় হই।" (বুখারী ঃ কিতাবুল ঈমান)

সাহাবা কিরামের কেউই এই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা বা ত্যাগ-স্বীকারের ক্ষেত্রে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয় বা দ্বিধাদন্দ্বের শিকারে পরিণত হননি। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ওফাত তাঁদের সামনে যে করুণ পরিস্থির সৃষ্টি করেছিল, তা নিঃসন্দেহে আমাদের কল্পনা-বহির্ভূত।

এই দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার আর একটি দিক আছে। আমাদের এবং প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্যে চৌদ্দশ বছরের একটি কাল্-প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ইসলামের বেশীর ভাগ হাকীকত একটি একটি করে খুইয়ে বসেছি। যদি আমরা আমাদের ইসলামিয়াতের দাবীকে একটি পাল্লায় রাখি এবং সে অনুযায়ী আমাদের আমলের সম্পদকে অপর পাল্লায় রাখি তাহলে উভয় পাল্লার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা পাওয়ার কোন আশা কি আমরা রাখতে পারি? হাকায়িক বা বাস্তবতার জগতে মুখের দাবীর কী মূল্যই বা থাকতে পারে? আসল বস্তু হলো আমল। আর আমাদের আমলের যে করুণ অবস্থা তা তো মুখ ফুটে বলা যায় না। এতদ্সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম যখন আমরা শুনতে পাই তখন আমাদের অন্তর আন্দোলিত হয়, লাফিয়ে উঠে। আমাদের জ্ঞানী-মূর্খ, আলিম-জাহিল সকলের মুখে দরূদ ও সালাম জারী হয়ে যায় এবং আমরা আমাদের সবকিছু তাঁর নামের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে কুরবান করার জন্য তৈরী হয়ে যাই।

এবার চিন্তা করে দেখুন, আমাদের মত অজ্ঞ ও বেআমলরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে যখন এত ভালবাসি তখন তাঁকে ভালবাসার ক্ষেত্রে ঐ পবিত্র জনগোষ্ঠীর কী অবস্থা ও কী মনমানসিকতা ছিল, যারা রহমত ও করুণার জীবন্ত প্রতিমূর্তি, মাহবূবে খোদা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) এর স্নেহভালবাসার পবিত্র ছায়ায় দিনের পর দিন এবং রাতের পর রাত অতিবাহিত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন? এমতাবস্থায় আমরা কি অনুমান করতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ওফাত তাঁদের উপর কি ভয়ানক বিপদ ডেকে নিয়ে এসেছিল?

কোন রেওয়ায়াতে, ঐ মুহূর্তে হযরত উমর (রা) এর কী অবস্থা হয়েছিল তা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

১। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ওফাতের পর হযরত উমর এবং হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা) ভেতরে আসার অনুমতি চান। এরপর তাঁরা উভয়ে ভেতরে ঢুকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র চেহারা থেকে চাদর সরান। তখন হযরত উমর (রা) এই বলে চীৎকার দিয়ে উঠেন–

واغشيا ! ماشد غشى رسول الله صلى الله عليه وسلم

"হায়রে অচৈতন্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ অচৈতন্য কত ভীষণ।"[১]

২। ফিরে যাবার সময় যখন তাঁরা দরজা পর্যন্ত যান তখন মুগীরা (রা) বলেন, উমর, আল্লাহ্র কসম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেছে। হযরত উমর বলে উঠেন, তুমি মিথ্যাবাদী, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ওফাত হয় নি, তুমি হচ্ছ এমন ব্যক্তি, যে ফিত্নার শিকারে পরিণত হয়।[২]

৩। ইকরামা (রা) বর্ণনা করেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ওফাত হলো তখন লোকেরা বললো, তাঁর আত্মার মি'রাজ হয়েছে, যেমন হযরত মূসা (আ) এর আত্মার মি'রাজ হয়েছিল। হযরত উমর (রা) ও তাই বলতেন।[৩]

৪। আনাস বিন মালিক (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ওফাত হয় তখন লোকেরা কাঁদতে থাকে। এমনি মুহূর্তে উমর (রা) ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, আমি কারো একথা শুনতে রাজী নই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেছেন। এবং তাঁকে সাময়িকভাবে ডেকে পাঠানো হয়েছে। যেমন হযরত মূসা (আ) কে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। এবং তিনি তখন তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে চল্লিশ দিন অদৃশ্য ছিলেন।[৪]

এগুলো তাবাকাতে ইবনে সা'দের রেওয়ায়াত। এ সব ঘটনার উপর বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা ভালবাসার আধিক্য কোন কোন সময় কারো কারো জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে থাকে। যে চোখ মাহবূ (সা)-এর পবিত্র সৌন্দর্য দেখতে অভ্যস্ত ছিল, যে কান মাহবূব (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত বাণী সমূহ বরাবর অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনত। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ج

"হে মুমিনগণ, রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন, যা তোমাদের (রূহানী মৃত্যুর অবস্থা থেকে বের করে) প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেবে। –তাদের সাথে যখন হঠাৎ তাঁদের মাহবূব (সা) এর বিরহ ঘটে গেল তখন তাঁদের হুশ ঠিক রাখা সত্যি একটি কঠিন ব্যাপারে পরিণত হল। তাঁদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা) কে চয়ন করে রেখেছিলেন; যদিও তিনি ছিলেন সব চাইতে কোমল হৃদয় ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ভালবাসার ক্ষেত্রেও তাঁদের স্থান ছিল অনেক উপরে। উপরন্তু তাঁরা এও জানতেন যে, যে জিনিস দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, সে

জিনিসটির হিফাযত ও সংরক্ষণ এবং প্রচার ও প্রসার সর্বাধিক অগ্রগণ্য। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর পথ প্রদর্শন সবার জন্য আলো সরবরাহ করে এবং হক ও সত্য পথের যাত্রীরা একের পর এক ঐসব মান্যিল অতিক্রম করতে থাকেন, যা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার বেযামন্দী এবং তাঁদের পবিত্র রাসূল (সা) এর সন্তুষ্টির কারণ।

হযরত ফাতিমা (রা)-এর শোক

সমগ্র নিকটাত্মীয় ও সাহাবা কিরামের অবস্থা ছিল অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক। কিন্তু হযরত ফাতিমা (রা) এ দুঃখজনক ঘটনার কারণে যেরূপ ব্যথিত ও শোকাহত হয়ে উঠেছিলেন, তার সাথে অন্য কারো অবস্থার তুলনা করা চলে না। তাঁর পবিত্র মুখে তখন উচ্চারিত হচ্ছিলো নিম্নোক্ত শব্দগুলো।

হায়! আমার প্রিয় আব্বা, মহান প্রভুর দাওয়াত কবুল করে নিয়েছেন।

হায়! আমার প্রিয় আব্বা, জান্নাতুল ফিরদাউসকে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছেন।

হায়, প্রিয় আব্বা, আমি জিবরীল (আ) কে আপনার ওফাতের খবর শুনাই।[৫]

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দাফন সম্পন্ন হলো তখন হযরত ফাতিমা (রা) আনাস বিন মালিক (রা) কে সম্বোধন করে বলেন, হে আনাস, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দেহের উপর মাটি ফেলাটা কি তুমি খুশি মনে গ্রহণ করেছ? [৬]

আবূ জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ওফাতের পর কোন ব্যক্তিই হযরত ফাতিমা (রা)-কে কখনো হাসতে দেখে নি, শুধুমাত্র তাঁর পবিত্র মুখের কিনারাটি সামান্য পরিমাণ উন্মুক্ত হওয়া ছাড়া।[৭]

নিম্নের পংক্তি দু'টি হযরত ফাতিমা (রা) কর্তৃক রচিত বলে বলা হয়ে থাকে–

صُبَّت علیّ مَصَائبٌ لو انها

صبّت على الايام صرن لياليا

ماذا على من شمّ تربت احمدا

ان لايشمّ مدى الزّمان غواليا

"আমার উপর এমনি ধরনের বিপদরাশি এসে পতিত হয়েছে যে, এগুলো যদি কোন দিনের উপর পতিত হত তাহলে সে দিন রাতে পরিণত হত।"

"যে কেউ আহ্মদ (সা) এর পবিত্র মাটি (দেহ) শুঁকেছে তার কর্তব্য কি? তার কর্তব্য হচ্ছে জীবনভর অন্য কোন সুগন্ধ না শুকা।"

হযরত আইশা (রা) এর ক্রন্দনাবস্থা

হযরত আইশা (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অন্যান্য সহ ধর্মিনীদের যে করুণ অবস্থা সেদিন দাঁড়িয়েছিল, তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। সেদিন হযরত আয়েশা (রা) এর মুখ ছিল শুধুমাত্র নুবুওয়াতের বৈশিষ্ট্যাদি বর্ণনায় উৎসর্গীকৃত।

"হায়! এ নবী যিনি ঐশ্বর্যের উপর দারিদ্র্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, যিনি ধনদৌলত উপেক্ষা করে কৃচ্ছ্রতার জীবন বেছে নিয়েছিলেন, হায়! ঐ দ্বীনদরদী রাসূল, যিনি তাঁর গুনাহ্গার উম্মতের চিন্তায় পূর্ণ একটি রাতও স্বস্তিতে ঘুমান নি।

হায়! ঐ মহান চরিত্রের অধিকারী, যিনি অনবরতঃ তাঁর নাফসের সাথে সংগ্রামরত ছিলেন, হায়! ঐ বিশ্ব জগতের রহমত, যার বদান্যতার দরজা গরীব ও নিঃস্বদের জন্য সর্বদা খোলা থাকত, যাঁর করুণাময় অন্তর এবং পবিত্র হৃদয় শত্রুদের জুলুম-নির্যাতন কখনো ধূলি ধূসরিত (মলীন) হয় নি।

হায়! ঐ নবী, যাঁর মোতি সদৃশ দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, এতদসত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেছিলেন। যাঁর নূরানী ললাট আহত করা হয়েছিল-এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর করুনা ও মার্জনা গুণটি হাতছাড়া করেন নি।"

হযরত আবূ বকর (রা) এর দৃঢ়তা

ওফাতের হৃদয় বিদারক ঘটনা সকলের চেতনা ও অনুভূতির উপর বজ্রের ন্যায় পতিত হয়েছিল। কারো বুদ্ধিতে আসছিলো না, এখন কি হবে এবং আগামীতে কি হওয়া উচিত। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ফজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর শারীরিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল দেখে 'সুখ' [জায়গার নাম) চলে গিয়েছিলেন। ওফাতের সংবাদ শুনে যখন ফিরে আসেন তখন মসজিদ ও হযরত আয়েশা (রা) এর হুজরার মধ্যে যেন কিয়ামত ঘটে যাচ্ছিলো। অত্যন্ত কোমলহৃদয় হওয়া সত্ত্বেও তখন হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন দৃঢ়তার পাহাড় সদৃশ। কেননা তখন সর্বপ্রথম কাজ ছিল, সেই মহামূল্যবান সম্পদের হিফাযত ও সংরক্ষণ, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উম্মতের জন্য রেখে গিয়েছিলেন।

এ সম্বন্ধে বিভিন্ন রিওয়ায়াত আছে, যার সারকথা এই যে, তিনি তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। লোকেরা বলল, আজ তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন, তোমরা ঠিকই বলছ। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর (রা) হুজরা মুবারকে প্রবেশ করে প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র চেহারা থেকে চাদর সরান এবং বলেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্রই এবং নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী)। এরপর বলেন, আল্লাহ্র কসম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ওফাত হয়ে গেছে।

এরপর তিনি তাঁর মাথার দিক থেকে সরে যান এবং বলেন, হায় নবী! মুখ নীচু করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চেহারা চুম্বন করেন। এরপর বলেন, হায় বন্ধু! তারপর মুখ নীচু করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ললাটে চুমো খান। এরপর চাদর দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মুখ ঢেকে দিয়ে বাইরে চলে যান।

এক রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র চেহারা উন্মুক্ত করে তাতে তিনি চুমো খান এবং কেঁদে উঠেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেন, আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন, আল্লাহ্র কসম, আপনার উপর আল্লাহ্ দুটি মৃত্যু কখনো একত্রিত করবেন না। যে মৃত্যু আপনার ললাটে লেখা হয়েছিল, তার স্বাদ আপনি ভোগ করেছেন। চিরদিনের মত মৃত্যু আর কখনো আপনার আঁচল ছুঁইতে পারবে না।

অপর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এও বলেন, আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন, আপনার জীবন ছিল কত পবিত্র এবং মৃত্যুও কত পবিত্র।

মসজিদে ভাষণ দান

এরপর হযরত আবূ বকর (রা) মসজিদে যান এবং দেখেন হযরত উমর (রা) ঐ সব কথা বলছেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, উমর, চুপ কর। এরপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা ও প্রশান্তি বর্ণনা করার পর সর্বপ্রথম কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ

"আপনি তো মরণশীল এবং ওরাও মরণশীল।" (৩৯ : ৩০)

এরপর বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা) এর ইবাদত করত সে জেনে রাখুক মুহাম্মদ (সা) ইন্তিকাল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত করে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ জীবিত এবং তিনি কখনো মরবেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط أَفَإِئْنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى أَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ .

"মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র; তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি তিনি মারা যান অথবা তিনি নিহত হন তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করবে না; বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।"

এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ সবার অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেছেন। যাদের ধারণায় ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন যেমন মুগীরা বিন শু'বা, আব্বাস (রা) তাঁরাও উক্ত ভাষণের পর দৃঢ় বিশ্বাসের স্তরে পৌছেন। কেউ কেউ বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আবূ বকর (রা) এই আয়াত না পড়েছিলেন, ততক্ষণ কেউ অনুভব করতে পারেন নি যে, আয়াতটি নাযিল হয়েছে। হযরত উমর (রা) এই আয়াত শুনে বলেন, আমার পা ভেঙ্গে গেছে, দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি আমার থাকেনি। আমার বিশ্বাস হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সত্যি এ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।[৮]

কাফন-দাফন

ইবনে সা'দের রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একথা বলেছিলেন, আমার নিকটাত্মীয়রা আমাকে গোসল করাবে এবং তারাই আমাকে কবরে নামাবে।[৯]

প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য যে, তার জীবনের সর্বশেষ অনুষ্ঠানাদি স্বাভাবিকভাবে তার নিকটাত্মীয়রাই সম্পন্ন করবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত নির্দেশের মধ্যে একটি বিশেষ হিকমত নিহিত ছিলো। যদি তিনি এটা না বলতেন তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিই উপরোক্ত কাজে অংশগ্রহণ করতে চাইতো। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে গোসল করানো এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির মধ্যে যে অশেষ বরকত ও কল্যাণ ছিল তা তো আর কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। আর কে এমন আছে যে, এই সব কল্যাণ ও বরকতের ভাগী হতে চায় না? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় গিয়ে পৌছেন তখন প্রত্যেকটি গোত্র এবং প্রত্যেকটি মহল্লা আন্তরিকভাবে কামনা করছিলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের ওখানেই অবস্থান করবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন যে, তিনি তাঁর পিতামহের (নানাবাড়িতে) অবস্থান করবেন। সুতরাং এ ব্যাপারে অন্য কেউ কোন ধরনের আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন নি। এ কারণেই আনসারগণ যখন একথার উপর জোর দিলেন যে, তাঁরাও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সর্বশেষ অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ করবেন তখন হযরত আবু বকর (রা) বলেন, এ ব্যাপারে (হুযূরের নিকটাত্মীয়গণ ছাড়া) অন্য কারো কোন অধিকার নেই।

যাহোক, মঙ্গলবার দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে গোসল করানো হয়। এ কাজে অংশ গ্রহণ করেন হযরত আলী ও ফযল বিন আব্বাস (রা)। হযরত উসামা বিন যায়দ (রা) পর্দা ধরে রেখেছিলেন। হযরত আব্বাস (রা) ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম শাকরান (রা) পানি বয়ে নিয়ে আসছিলেন। ইমাম ইবন হায্ম এই পর্যায়ে কুছাম বিন আব্বাসের নামও উল্লেখ করেছেন।[১০] হযরত আলী (রা) আওস বিন খাওলা আন্‌সারী (রা) কেও ভিতরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আওস (রা) ছিলেন একজন বদরী সাহাবী।

গোসলের পর তিনটি সুতী চাদর দ্বারা তাঁর কাফন দেওয়া হয়। ঐ চাদরগুলো ছিল ইয়ামনের সাহূল নামক স্থানের তৈরী।

মাকবারা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কবর কোথায় দেওয়া হবে, এ ব্যাপারে যখন সাহাবা কিরামের মধ্যে শলাপরামর্শ শুরু হল তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, নবীকে সেখানেই দাফন করা হয় যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রূহ কব্য করেছেন। অতএব সে অনুযায়ী হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরের যে অংশে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়েছে, বিছানা সরিয়ে নিয়ে সেখানেই তাঁর কবরের ব্যবস্থা করা হয়। মদীনা মুনাওওরায় কবর খননে সর্বাধিক পারদর্শী ছিলেন দু'ব্যক্তি। তাঁদের একজন ছিলেন আবূ উবায়দা বিন আল জাররাহ (রা) এবং অপর জন আবূ তালহা আনসারী (রা)। আবূ উবায়দা বিন আল জাররাহ্ (রা) মক্কাবাসীদের রীতি অনুযায়ী সিন্দুকী কবর খুড়তেন। আর আবূ তালহা (রা) মদীনাবাসীদের রীতি অনুযায়ী লেহ্দী (বগলী) কবর খুঁড়তেন। তাঁদের উভয়ের কাছে খবর পাঠানো হয় এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যিনি আগে এসে পৌছবেন তাঁকেই কবর খননের কাজে লাগানো হবে। ঘটনাচক্রে আবূ তালহা প্রথমে এসে পৌছেন এবং লেহ্দী কবর খনন করেন। যেহেতু যমীনে কিছুটা আদ্রতা অনুভূত হচ্ছিলো তাই শাকরান (রা), রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিছানা বা ঐ চাদর, যা তিনি গায়ে দিতেন, কবরের মধ্যে বিছিয়ে দেন।

হুজরার অভ্যন্তরে কবর রাখার ফলে আর একটি বিশেষ উপকার এই হয় যে, সেখানে ঢুকে আবেগ-উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে কারো পক্ষে ইসলামের রীতি-বহির্ভূত কোন কাজ করা মোটেই সম্ভব ছিল না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ওফাতের ৪৬ বছর ৫ মাস ১৭ দিন পর হযরত আয়েশা (রা) এর ওফাত হয় (১৭ রমযান, হিঃ ৫৭ সন মুতাবিক ২৩ জুলাই, ইং ৬৭৭ সন)। এই সম্পূর্ণ সময়কালের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা) এর অনুমতি না নিয়ে কোন ব্যক্তি ভিতরে আসতে পারতেন না, বাইরে দাঁড়িয়েই দু'আ করে চলে যেতেন।

জানাযা ও দাফন

রাসূলুল্লাহ (সা) এর জানাযা, হুজরার বাইরে করা সম্ভব ছিল না। আর হুজরার মধ্যেও এই পরিমাণ জায়গা ছিল না যে, ইমামের সাথে জানাযার সালাত আদায় করা হবে। শুধুমাত্র দশজন লোক সেখানে দাঁড়াতে পারত। অতএব এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, প্রথমে পুরুষরা ক্রমান্বয়ে পৃথক পৃথকভাবে সালাত আদায় করবে। অতঃপর মহিলা এবং শিশুদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে।

তাবাকাতে ইবনে সা'দে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, গোসল করানো ও কাফন পরানোর পর আমার জানাযা কবরের কিনারায় রেখে দেবে এবং কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে যাবে। কেননা আমার জানাযার সালাত অন্যান্য ফিরিশতাদের সাথে সর্বপ্রথম আদায় করবেন জিবারঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল এবং আযরাঈল (আ)। এরপর তোমরা এক এক করে ভিতরে আসবে এবং আমার উপর দরূদ ও সালাম

পাঠ করবে। প্রথমে আমার জানাযার সালাত পড়বে আমার নিকটাত্মীয় পুরুষরা, এরপর স্ত্রীলোকেরা। তারপর অন্য লোকেরা।[১১] এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে দাফন করতে দেরী হয়েছিল।

কবরের মধ্যে হযরত আলী, ফযল বিন আব্বাস, উসামা বিন যায়দ এবং আওস বিন খাওলী আনসারী (রা) অবতরণ করেন। বুধবার দিন গত রাত্রে (যা আরবদের কাছে বৃহস্পতিবার বলে গণ্য) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দাফন কার্য সম্পন্ন হয়।

সবার পরে যিনি কবর ত্যাগ করেছিলেন

মুগীরা বিন শু'বা (রা) শেষ মুহূর্তে আপন আংটিটি জ্ঞাতসারেই কবরের মধ্যে ফেলে দেন। সাথে সাথে এও বলেন, হুযুর (সা) এর পবিত্র পায়ের দিকে কাজের কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে, এটাকে শুধ্রে দেওয়া প্রয়োজন। অতএব মুগীরা (রা)-কেই বলা হলো, তুমি তোমার আংটিটি বের করে নিয়ে আস এবং এই ত্রুটিও শুধ্রে দাও। কবরে নেমে ঐ কাজ সেরে মুগীরা (রা) বলেন, এবার মাটি ঢালা শুরু কর। যখন মাটি মুগীরা (রা)-এর পায়ের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছে গেল তখন তিনি বেরিয়ে আসেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সর্বাধিক সময় ব্যয় করেছি এবং সকলের পরে হুযুর (সা) থেকে পৃথক হয়েছি।[১২] (সংকলক)

টীকা ঃ

১। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-২৬৭।

২। ঐ।

৩। ঐ।

৪। ঐ।

৫। সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুল মাগাযী।

৬। ঐ।

৭। ঐ।

৮। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-২৭।

৯। ঐ।

১০। জাওয়ামিউস্ সীরাহ্ ঃ পৃষ্ঠা-২০৫।

১১। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-২৫৭।

১২। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-৩০২।

মুহাম্মদী আদর্শ

গুণাবলী ও আচার ব্যবহার

গঠন মুবারক

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর গঠনাকৃতি ছিল মধ্যম ধরনের এবং মানানসই। তাঁর অবয়ব ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। গায়ের রং ছিল লালিমা মিশ্রিত শুভ্র- অধিক শুভ্রও নয়, আবার অধিক তামাটেও নয়। ললাট ছিল প্রশস্ত, ভ্রূ ছিল পরস্পর সংযুক্ত এবং চোখ ছিল দীর্ঘাকৃতির। চেহারা মুবারক ছিল পাতলা, গোশ্ত ভরা ছিল না, তবে ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও সুশ্রী। মুখ ছিল প্রশস্ত। দাঁতগুলো ঠাসাঠাসি ছিল না। ঘাড় ছিল লম্বা, মাথা ছিল বড় এবং বক্ষ ছিল প্রশস্ত। হালকা ধরনের একটি কেশরেখা বক্ষদেশ থেকে নাভী পর্যন্ত ছিল প্রলম্বিত। মাথার চুল না অধিক কোঁকড়া ছিল, আর না অধিক সোজা। চোখ ছিল কালো ও লাজনম্র এবং চোখের পলকগুলো ছিল বড় বড়। কাঁধ ছিল গোশ্ত ভরা এবং কাঁধের হাড়গুলো ছিল বড় বড়। কাঁধে এবং হাতের (কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত) পৃষ্ঠদেশে চুল ছিল। হাতের তলা ছিল গোশতভরা এবং প্রশস্ত। বাহুদ্বয় ছিল লম্বা এবং পায়ের গোড়ালি ছিল নাজুক ও হালকা। পায়ের তলা ভিতর দিক থেকে এরূপ শূন্য ছিল যে, তার নীচ দিয়ে পানি বেরিয়ে যেত।[১]

যখন তিনি খুশী থাকতেন তখন তাঁর চেহারায় একটি বিশেষ ধরনের আভা ফুটে উঠত। মনে হত যেন তা চাঁদের টুকরা। সাহাবা কিরাম (রা) তাঁর চেহারা দেখেই তাঁর খুশীর পরিমাণ আঁচ করে নিতে পারতেন।[২] তাঁর ঘামের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের সুঘ্রাণ ছিল। যখন ঘাম বের হত তখন মনে হত যেন তাঁর চেহারায় মোতি ঝুলছে।

হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি এমন কোন রেশম বা রেশমী বস্ত্র স্পর্শ করি নি, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতের তালুর চাইতে অধিক নরম ছিল এবং আমি এমন কোন সুগন্ধির ও ঘ্রাণ নিই নি, যার সুঘ্রাণ ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সুঘ্রাণের চাইতে শ্রেয়।[৩]

রুব্বায় বিনতে মুআভ্ভিয একদা আম্মার বিন ইয়াসিরের পৌত্রকে বলেছিলেন, যদি তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে দেখতে তাহলে মনে করতে যেন সূর্য উদিত হয়েছে। জাবির বিন সামুরাহ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি লম্বা ঢিলা বহির্বাস (জুব্বাহ) পরে শুয়েছিলেন। আমি কখনো চাঁদের দিকে তাকাতাম, আবার কখনো তাঁর দিকে। শেষ পর্যন্ত আমি এটাই বুঝলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) চাঁদের চাইতেও অধিক সুন্দর।

স্মরণ থাকে যে, এগুলো হচ্ছে ঐ সব মহান ব্যক্তিদের বর্ণনা, যারা ছিলেন সত্যতা ও বিশ্বস্ততার যেন এক একটি চিত্র।

পোশাক-পরিচ্ছদ

চাদর, জামা এবং লুঙ্গি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাধারণ পোশাক। তিনি কখনো পাজামা ব্যবহার করেন নি। মোজা পরার অভ্যাস ছিল না। একদা আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী উপহার স্বরূপ তাঁর কাছে এক জোড়া কালো

মোজা পাঠিয়েছিলেন, যা ছিল বাহ্যতঃ চর্মের। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেটি ব্যবহার করেন। পাগড়ী প্রধানতঃ কালো রংয়ের হত। পাগড়ীর নীচে তিনি টুপী পরতেন। টুপি মাথার সাথে মিশে থাকত। পাগড়ীর শম্‌লা (পশ্চাৎদিকের ঝুলন্ত অংশ) কখনো কাঁধের উপর, আবার কখনো দু কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে থাকত। কোন কোন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি কখনো কখনো উৎকৃষ্ট জাতের পোশাকও পরতেন। এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ঐ পোশাক তিনি উপহারস্বরূপ পেয়েছিলেন এবং তা পরেছিলেন এ জন্য যে, যাতে উৎকৃষ্ট পোশাক পরার বৈধতা সম্পর্কে কারো মনে কোন সন্দেহ না থাকে। অন্যথায় পার্থিব আয়েশ-আরামের সামগ্রী পরিহার করার প্রতিই ঝোঁক ছিল।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পোশাক কখনো ভাঁজ করে রাখা হয় নি। অর্থাৎ তাঁর শুধুমাত্র এক জোড়া কাপড় থাকত, যা ধুইয়ে ধুইয়ে অনবরত: পরতেন। যদি এক জোড়ার চাইতে বেশী কাপড় থাকত তাহ্-লে অতিরিক্ত জোড়াটি তিনি নিশ্চয়ই ভাঁজ করে রাখতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মাত্র কয়েকটি জিনিস ছাড়া অন্য কিছুর উপর আদম-সন্তানের কোন হক (অধিকার) নেই। আর সেগুলো হচ্ছে থাকার জন্য ঘর, পরার জন্য কাপড়, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সাধারণ রুটি এবং পিপাসা নিবারণের জন্য পানি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে পোশাক পরে ইন্‌তিকাল করেন তার উপর-নীচ উভয় দিকই ছিল তালি মারা।

তবে হ্যাঁ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি কখনো ময়লা পোশাক পরেন নি।

পোশাক উৎকৃষ্ট ধরনের হোক কিংবা মামুলী ধরনের, তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়, যাতে কারো সাথে একত্রে বসলে এই অপরিচ্ছন্নতা তার অসন্তুষ্টি বা অস্বস্তির কারণে পরিণত না হয়।

পানাহার

পার্থিব সুখ সম্পদের প্রতি প্রকৃতিগতভাবে অনীহা থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো জাঁকজমকপূর্ণ ও মজাদার খাবার খান নি। অবশ্য কয়েকটি জিনিস তাঁর কাছে পছন্দনীয় ছিল। যেমন সিরকা, মধু, হালুয়া, যায়তূন তেল। লাউ খুবই পছন্দ করতেন। ঘি এবং পনীরের সাথে খেজুর মিশিয়ে 'হায়স' নামক একটি খাবার তৈরী করা হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে খাবারটিও পছন্দ করতেন। তিনি দুম্বা, মোরগ, খাসি, বকরী, ভেড়া, উট, জংলী গাধা ও খোরগোশের গোশ্‌ত এবং মাছ খেয়েছেন। তিনি সামনের পায়ের গোশত এ জন্য পছন্দ করতেন যে, তা খুব তাড়াতাড়ি গলে যেত। ঠান্ডা পানিও ছিল তাঁর কাছে খুবই পছন্দনীয়। কোন কোন সময় তিনি কিসমিস, খেজুর কিংবা আংগুর পানিতে ভিজিয়ে রাখতেন এবং সে পানি পান করতেন। পাতলা শসাও তিনি খেয়েছেন, যা উপহার স্বরূপ তাঁর কাছে এসেছিল।

খাবার যে ধরনেরই আসুক না কেন, পছন্দ হলে তিনি তা খেয়ে নিতেন এবং পছন্দ না হলে খেতেন না। তবে নিজের অপছন্দের কথা কখনো প্রকাশ করতেন না। তিনি টেবিলের উপর খাবার খেয়েছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তৎকালীন অনারব দেশসমূহে বারকোশের (TRAY) উপর খাওয়ার যে প্রচলন ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা পছন্দ করতেন না। বারকোশকেও এক ধরনের টেবিল মনে করা যেতে পারে। তা মাটি থেকে সামান্য উঁচু ছিল। অহংকারের চিহ্ন মনে করে রাসূলুল্লাহ (সা) এটাও পছন্দ করেন নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ডান হাতের তিন আঙ্গুলি দিয়ে খেতেন। তিনি গোশ্‌ত ছুরি দিয়ে কেটে খেয়েছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪] গন্ধযুক্ত দ্রব্যাদি যেমন–পেয়াজ, রসুন, মূলা ইত্যাদি তাঁর কাছে অপছন্দনীয় ছিল। সহীহ্ বুখারীতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুন-পেঁয়াজ খেয়েছে, সে যেন আমার কাছে কিংবা আমার মসজিদে না আসে। মাওলানা শিবলী নু'মানী মুসলিম, নাসায়ী এবং ইবনে মাজার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফত আমলে একদা ভাষণ

দিতে গিয়ে বলেন, তোমরা রসুন ও পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে এসে পড়, অথচ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে দেখেছি, কোন ব্যক্তি এই সব জিনিস খেয়ে মসজিদে এলে তিনি তার সম্পর্কে নির্দেশ দিতেন, একে মসজিদ থেকে বের করে 'বাকী' পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও।[৫]

পছন্দ-অপছন্দের কথা বাদ দিয়ে এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পরিবার-পরিজনসহ প্রায়ই উপোষ থাকতেন। জা'মি' তিরমিযীতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর পরিবার পরিজন একাধারে কয়েকটি রাত পর্যন্ত উপোষ থাকতেন। কেননা রাতের বেলা তাঁদের খাদ্যের সংস্থান হত না।[৬] তাছাড়া একাধারে দুদু'টি মাস চলে যেত অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে চুলা জ্বালানো হত না। তিনি এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা শুধু পানি এবং খেজুর খেয়েই এ দিনগুলো কাটিয়ে দিতেন। অবশ্য প্রতিবেশীরা কখনো কখনো বকরীর দুধ পাঠিয়ে দিতেন এবং তাঁরা তা পান করতেন।[৭] কখনো কখনো তাঁরা বিশুদ্ধ দুধ পান করতেন, আবার কখনো কখনো তাতে পানি মিশিয়ে নিতেন।

হযরত 'আয়েশা (রা) বলেন, মদীনায় উপনীত হওয়ার পর থেকে একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো একসাথে দু'বেলা পেট ভরে রুটি খান নি।[৮]

কথাবার্তা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথাবার্তা ছিল অত্যন্ত মিষ্ট ও চিত্তাকর্ষক। তিনি থেমে থেমে কথা বলতেন। ফলে তাঁর প্রত্যেকটি উক্তি আলাদা আলাদা শোনাত। যে কথার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করতে চাইতেন সে কথাটি বার বার উচ্চারণ করতেন। কথা বলার সময় তাঁর দৃষ্টি প্রায়ই আকাশের দিকে নিবদ্ধ থাকত। তাঁর গলার স্বর ছিল উঁচু। তিনি অনাবশ্যক কোন কথা বলতেন না। হাত দিয়ে যখন কিছু ইঙ্গিত করতে চাইতেন তখন পুরো হাতই উঠাতেন। কোন কথার উপর যখন বিস্ময় প্রকাশ করতেন তখন হাতের তলার দিক পাল্টে দিতেন। ভাষণ দানকালে কখনো কখনো এক হাত অন্য হাতের উপর রাখতেন। খুশীর অবস্থা দেখা দিলে তাঁর চোখগুলো নিম্নগামী হয়ে যেত। তিনি খুব কমই হাসতেন। যখন হাসতেন মুস্কি হাসতেন। তিনি কখনো এমন জোরে হাসেন নি, যাতে তাঁর মাড়ির দাঁত বেরিয়ে যেত।[৮]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রত্যেকটি কথাই সংরক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কেননা তাঁর প্রত্যেকটি কথাই ছিল দ্বীনের একটা না একটা অংশ। এক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, তিনি এমন ভঙ্গিতে কথা বলতেন যে, তা সংরক্ষণ করা ছিল খুবই সহজ। হুযূর আকরাম (সা) এর কথা বলার উদ্দেশ্য যেমন এই ছিল যে, এর দ্বারা শ্রোতারা উপকৃত হবে—তেমনি এ উদ্দেশ্যও ছিল যে, উপস্থিত যারা একথাগুলো শুনছে তারা তা সংরক্ষণ করবে এবং ঐ সব লোকের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে, যারা অনুপস্থিত রয়েছে। যারা ভবিষ্যৎ বংশধর তাঁরাও এই অনুপস্থিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কথার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। তাঁর কথার প্রভাব এতই গভীর ও ব্যাপক ছিল যে, তাঁর বিরোধীরাও সে প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারত না। তাই মুখরক্ষার জন্য তাদেরকে বাধ্য হয়ে বলতে হত, এগুলো কথা নয় বরং যাদু।

পবিত্র জীবন

হযরত আলী বলেন, হুযূরে আকরাম (সা) এর জীবন ছিল তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ ইবাদতের জন্য, দ্বিতীয় ভাগ সাধারণ মানুষের জন্য এবং তৃতীয় ভাগ নিজের জন্য। যে ভাগটি ছিল সাধারণ মানুষের জন্য, প্রকৃতপক্ষে তাও ছিল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ভাগটি ছিল তাঁর নিজের জন্য, সম্ভবত: তার পরিমাণ ছিল

সবচাইতে কম। উপরন্তু এটাকেও ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করতে হবে। কেননা এর দ্বারাও একজন পুণ্যবান বান্দার জীবন পদ্ধতি কি হবে এবং কিভাবে তা অতিবাহিত করা হবে তা হাতে কলমে দেখানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অভ্যাস ছিল এই যে, ফজরের সালাত শেষ করে তিনি মসজিদেই অবস্থান করতেন। লোকেরা তখন তাঁকে ঘিরে ধরত। সে মজলিসে তিনি ওয়ায-নসীহত করতেন, অন্যের স্বপ্নের 'তাবীর? [ব্যাখ্যা] বলে দিতেন এবং নিজে কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে তারও বর্ণনা দিতেন। তাছাড়া পরস্পর খোশালাপও চলত এবং কবিতা আবৃত্তিও হত। এভাবে সূর্য কিছুটা উপরে উঠে গেলে তিনি চার কিংবা আট রাকাত চাশ্‌তের সালাত আদায় করতেন। এরপর হুজরা মুবারকে চলে যেতেন। ঘরে পৌঁছার পর নিজের কোন কাপড় ছিড়ে গিয়ে থাকলে তা সেলাই করে নিতেন, জুতা ছিড়ে গিয়ে থাকলে তা মেরামত করতেন, বকরী দোহাতেন, ভৃত্যকে তার কাজে সাহায্য করতেন এবং স্বয়ং বাজারে গিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে আসতেন। পথে ছোট বড় যাকেই পেতেন সালাম করতেন। এক্ষেত্রে গোলাম-প্রভুর মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। কোন সাধারণ মানুষও খাবারের দাওয়াত করলে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তা গ্রহণ করতেন। তখন যে খাবারই সামনে আসত খেয়ে নিতেন। আপন খাদিমের সাথে বসেই তিনি খাবার খেতেন। আটা মাড়ানোর কাজেও তিনি ভৃত্যকে সাহায্য করতেন। এমন কি ঘর ঝাড়ু দেওয়ার কাজটিও তিনি নিজেই করে নিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসরের সালাতের পর কিছু কিছু সময়ের জন্য তাঁর প্রত্যেক সহধর্মিণীর কাছে যেতেন। এরপর যে সহধর্মিণীর কাছে ঐ রাত কাঠানোর দিন নির্ধারিত থাকত, তাঁর কাছে চলে যেতেন। সেখানে অন্যান্য সহধর্মিণীরাও একত্রিত হতেন। ইশা পর্যন্ত অনুরূপ বৈঠক চলত। ইশার পর তিনি আরাম করতেন। তখন অন্যান্য সহধর্মিণীরাও যার যার ঘরে চলে যেতেন। ইশার সালাতের পর রাসূলুল্লাহ (সা) কথাবার্তা বলা পছন্দ করতেন না।

নিদ্রা

নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন মজীদের কোন একটি সূরা অবশ্যই তিলাওয়াত করতেন। এরপর এ দু'আ করতেন— اللهم باسمك اموت واحيى –"হে আল্লাহ্, তোমার নাম নিয়েই মৃত্যু বরণ করি এবং তোমার নাম নিয়েই জীবিত হই।"

এখানে নিদ্রাকেই মৃত্যু আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এরপর যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন এ দু'আ পড়তেন ঃ

الحمد لِلّهِ الَّذِى احيانا بعد مااماتنا واليه النشور ·

"সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন (অর্থাৎ প্রথমে নিদ্রামগ্ন করেছেন, এরপর জাগরিত করেছেন), আর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয়ে সকলকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

তিনি কখনো সাধারণ শয্যার উপর, কখনো চামড়ার উপর, কখনো চাটাইয়ের উপর, আবার কখনো মাটির উপর শুতেন। সব সময় ডান পাশে শুতেন এবং ডান হাত গালের নীচে রাখতেন। প্রথম প্রথম তিনি এত সালাত আদায় করতেন যে, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পাগুলো ফুলে উঠত। তখন পর্যন্ত তাঁর জন্য রাত্রি জাগরণ ছিল ফরয। এরপর যখন রাত্রি জাগরণ তাঁর জন্য নফল করে দেওয়া হল তখন তিনি রাত্রে এগারো রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আট রাকআত পরস্পর সংযুক্ত এবং সেগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র শেষে কা'দা করতেন (বসতেন)। এরপর আর এক রাকআত পড়ে বসতেন। শেষমেষ দুরাক'আত পড়ে নিতেন। বয়স যখন অধিক হয়ে গেল তখন তিনি এর মধ্য থেকে দু'রাক'আত কমিয়ে দেন।

আবূ দাঊদে হযরত 'আয়েশা (রা) থেকে এই মর্মে একটি রেওয়ায়াত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'ইশার সালাতের পর ঘরে এসে চার রাক'আত সালাত আদায় করে শুতেন। তাঁর মিস্ওয়াক এবং ওযূর জন্য পানি রেখে দেওয়া হত। রাতের বেলা উঠে তিনি প্রথমে মিস্ওয়াক করতেন, এরপর ওযূ করে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। ৯

পবিত্র খুৎবা

শুক্রবার দিন লোকেরা মসজিদে সমবেত হলে পর তিনি সেখানে যেতেন। প্রথমে সবাইকে সালাম করতেন। এরপর মিম্বরে আরোহণ করতেন। মিম্বরে আরোহণ করার পর উপস্থিত সকলের প্রতি তাকাতেন এবং পুনরায় সালাম করতেন। আযানের পর খুৎবা দিতে শুরু করতেন। খুৎবা হত খুবই সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ। আল্লাহ্র প্রশংসা ও প্রশস্তির মাধ্যমে খুৎবার সূচনা করা হত। তিনি বলতেন, সালাতে বিনয় প্রকাশ এবং খুৎবায় সংক্ষিপ্তকরণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। যতদিন মসজিদে মিম্বর তৈরী হয় নি ততদিন খুৎবা দান কালে তাঁর হাতে একটি লাঠি থাকত। যখন মিম্বর তৈরী হয়ে গেল তখন লাঠির আর প্রয়োজন থাকে নি।

জিহাদের ময়দানে যখন ভাষণ দিতেন তখন ধনুকের উপর হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতে তরবারি নিয়ে ভাষণ দান করতেন-এ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি কোত্থেকে হল তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। হাফিয ইবনে কাইয়িম যথার্থই বলেছেন, এটা মূর্খদের উক্তি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভাষণদান কালে তরবারি হাতে নিয়ে মিম্বরের উপর দাঁড়াতেন। আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, এই সব উক্তিকে অবলম্বন করেই কোন কোন মসজিদে তরবারি হাতে নিয়ে ভাষণ দান করাকে সুন্নাত মনে করা হয়, অথচ এগুলো যে নেহাত ভিত্তিহীন উক্তি, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

সফর

প্রধানতঃ হজ্জ, উমরাহ ও জিহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সফরের প্রয়োজন হত। বৃহস্পতিবারে সফরের সূচনা করতে তিনি পছন্দ করতেন, সবসময়ই খুব ভোরে রওয়ানা হতেন। সওয়ারী সামনে আসার সাথে সাথে আল্লাহ্র নাম নিয়ে রিকাবে (পাদানে) পা রাখতেন। সওয়ার হওয়ার পর তিনবার 'তাকবীর' (আল্লাহ্ আকবার) বলতেন। এরপর নিম্নের আয়াতটি তিলাওত করতেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

"পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।" (৪৩ ঃ ১৩-১৪)

এরপর নিম্নের দু'আটি করতেন–

اللّٰم انا نسئلك فى سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ماترضى اللهم هون علينا واطوعنا بعده اللهم انت الصاحب فى السفر والخليفة فى الاهل اللهم انى اعوذبك من وعثاءلسفر وكابة المنقلب و سوء المنظر فى الاهل والمال .

"হে আল্লাহ্, এই সফরে আমি তোমা থেকে পুণ্য, পরহেযগারী এবং এমন আমলের আবেদন করছি, যা তোমার কাছে পছন্দনীয়। হে আল্লাহ্, তুমি এই সফরকে সহজ করে দাও এবং আমাদেরকে এর দূরত্ব অতিক্রম করার শক্তি দাও। হে আল্লাহ্, এই সফরে একমাত্র তুমিই আমাদের সঙ্গী এবং আমাদের পরিবার-পরিজনের দেখাশুনার জন্য তুমিই একমাত্র প্রতিনিধি। হে আল্লাহ্, আমি তোমার শরণ নিচ্ছি এই সফর এবং সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের দুঃখকষ্ট, বিপদ-আপদ এবং ঘরের ও বাইরের ন্যাক্কারজনক দৃশ্যাবলী থেকে। ১০

তিনি যে বসতিতেই অবতরণ করতেন কিংবা যে মন্‌যিলেই উপনীত হতেন, নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন–

اللهم انا نسئلك خير هذه القرية وخير اهلها وخير مافيها ونعوذبك من شر اهلها وشر مافيها .

"হে আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে এই বসতির, এই বসতিবাসীর এবং যা কিছু এর মধ্যে রয়েছে তার মঙ্গল কামনা করছি এবং বসতির ও বসতিবাসীর অপকারিতা এবং যা কিছু এর মধ্যে রয়েছে তার অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

জিহাদ

জিহাদে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি কি করতেন তা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, তিনি সমগ্র বাহিনীকে সম্বোধন করে বলতেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আল্লাহ্‌র পথে সেসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য। কিন্তু খিয়ানত করো না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না, নিহতদের নাক-কান কেটো না; যা জাহিলিয়া যুগে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল এবং শিশুদের হত্যা করো না।

কোন কোন বাহিনী যখন জিহাদে রওয়ানা হত তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলতেন, "আমি তোমাদের ফরয কর্তব্য ও দায়িত্ব), তোমাদের আমানত এবং তোমাদের আমলের (কার্যকলাপের) পরিণাম আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করছি।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতের বেলা শত্রুর উপর হামলা করতেন না। সকাল বেলা হামলা করে না থাকলে মধ্যাহ্নে সূর্য ঢলে পড়ার পর হামলা করতেন। যেখানে বিজয় লাভ করতেন সেখানে নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার জন্য কমপক্ষে তিন দিন অবস্থান করতেন। যখন কোন জিহাদের বিজয় সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছত তিনি সঙ্গে সঙ্গে সিজদা-ই- শুকরানা আদায় করতেন। আর নিজে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে থাকলে তখন নিম্নের দু'আটি করতেন–

اللهم انت عضدى ونصيرى بك احول بك اصول وبك اقاتل

"হে আল্লাহ্, তুমি আমার বাহুবলে, তুমি আমার সাহায্যকারী, তোমার সাহায্য নিয়েই আমি প্রতিরোধ করি, তোমার উপর নির্ভর করেই আমি হামলা করি এবং তোমার আশ্রয়েই আমি যুদ্ধ করি।"

রোগীদের সাথে দেখাসাক্ষাত ও সমবেদনা জ্ঞাপন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অভ্যাস ছিল রোগীদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা। তিনি প্রত্যেক রোগীর কপালে ও নাড়িতে হাত রাখতেন, তাকে সান্ত্বনা দিতেন এবং তার আরোগ্য কামনা করতেন। কোন রোগীর মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে–এ সংবাদ শুনামাত্র তিনি ছুটে গিয়ে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। কারো মৃত্যু সংবাদ শুনলে তার

জানাযার সালাতে শরীক হতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কষ্ট হবে একথা চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত কারো 'সকরাত' (মৃত্যুযন্ত্রণা) সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হত না। হযরত সা'দ বিন মু'আযের ভাই উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তার মা তখনো জীবিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কাছে গিয়ে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কষ্ট হবে একথা চিন্তা করে হযরত সা'দ (রা) স্বয়ং তাঁর মাকে নিয়ে হুযূর (সা)-এর দরবারে আসেন। হুযূর (সা) অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁর প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

দেখা-সাক্ষাত

কারো সাথে দেখা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে তাকে সালাম ও তার সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করতেন। কোন ব্যক্তি তাঁর কাছে চুপি চুপি কিছু বলতে চাইলে যতক্ষণ না তার কথা শেষ হত তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না। অনুরূপভাবে মুসাফাহার পর যতক্ষণ অপরপক্ষ হাত না ছাড়ত তিনি তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিতেন না। যখন কোথাও অন্যদের সাথে একত্রে বসতেন তখন তাঁর হাঁটু অন্যদের হাঁটু থেকে অগ্রে থাকত না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দরবারে এই রীতি ছিল যে, যখন কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন তখন প্রথমে আগন্তুক সালাম করতেন। এরপর তাঁর সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করতেন। কেউ এই রীতি ভঙ্গ করলে তিনি বলতেন, একে অনুমতি চাওয়ার নিয়ম শিখিয়ে দাও।

একদা হযরত জাবির (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসেন এবং দরজায় করাঘাত করেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কে? জাবির (রা) উত্তরে বলেন, আমি। তখন হুযূর (সা) বলেন, 'আমি 'আমি' এটা কোন পদ্ধতি,? নাম বলা চাই।[১১] এর অর্থ সবার গলার স্বরতো সব সময় চেনা যায় না। অতএব অন্যকে দুটানা অবস্থায় না রেখে নিজের নাম বলে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কারো সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তার দরজার ডান অথবা বাম পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন, 'আসসালামু আলাইকুম' (তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) এরপর ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইতেন। দরজার ডান অথবা বাম পাশে দাঁড়াতেন এজন্য যে, ঠিক মুখোমুখি দাঁড়ালে হয়ত অজান্তেই ঐ গৃহবাসীদের উপর তাঁর নজর পড়ে যাবে। ভিতর থেকে অনুমতি না আসলে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসতেন।

একদা তিনি হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা)-এর ঘরে যান এবং যথারীতি 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' [তোমাদের উপর আল্লাহ্র শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক] বলেন। হযরত সা'দ (রা) এমন মিনমিন সুরে সে সালামের জবাব দেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কানে তা পৌঁছে নি। তখন সা'দ (রা)-এর পুত্র পিতাকে বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে ভিতরে আসার অনুমতি দিচ্ছেন না কেন? সা'দ উত্তরে বলেন, তুমি চুপ করো, হুযূর (সা) যত বেশী বার সালাম করবেন আমরা তত বেশী মঙ্গলের অধিকারী হব। হুযূর (সা) তাঁর অভ্যাস মত তিনবার সালাম করে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন সা'দ (রা) দৌড়ে গিয়ে তাঁর খিদমতে হাযির হন এবং নিবেদন করেন, হুযূর, আস্তে আস্তে এজন্য জবাব দিচ্ছিলাম যাতে আপনি বার বার আমাদের সালাম (শান্তি কামনা) করেন।[১২] (সংকলক)

টীকা ঃ

(১) (ক) সীরাতুন্নবী (খ) বুখারী ঃ কিতাবুল মানাকিব।

(২) বুখারী ঃ কিতাবুল মানাকিব।

(৩) বুখারী ইত্যাদি।

(৪) সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুল আতইমা; সীরাতুন্নবী।

(৫) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

(৬) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

(৭) বুখারী।

(৮) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

(৯) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

(১০) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

(১১) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

(১২) ঐ।

মহান চরিত্র–১

আল্লাহ্‌র কিতাবের সাক্ষ্য

মনুষ্য জগতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন অনুপম চরিত্রের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। যার সত্তাকে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাঁর মর্যাদা এ ছাড়া আর কি হতে পারত? এর প্রথম সাক্ষী হচ্ছে পবিত্র কুরআন–

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۔

(১) "(হে রাসূল) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত (৬৮ ঃ ৪)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۔

(২) "আল্লাহ্‌র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন, যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়ত।" (৩ ঃ ১৫৯)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۔

(৩) "তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে,তা তার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি দয়াদ্র ও পরম দয়ালু।" (৯ ঃ ১২৮)

হুযূর (সা) এর উক্তি

এক্ষেত্রে হুযূর (সা) এর উক্তিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,

بعثت لاتمم حسن الاخلاق

(১) "আমি সচ্চরিত্রে পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

انما بعثت لاتمم مارمكارم الاخلاق

(২) "আমি এজন্য প্রেরিত হয়েছি, যাতে অনুপম চরিত্রকে তার পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দিই।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির সংবাদ যখন আবূ যর গিফারী (রা)-এর কানে পৌঁছল তখন তিনি এ বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য আপন ভাইকে মক্কা প্রেরণ করেন। আবূ যর (রা)-এর ভাই মক্কা থেকে ফিরে গিয়ে যে শব্দাবলীর সাহায্যে এ বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেছিলেন সে শব্দগুলো ছিল–

وائه يامر بمكارم الاخلاق

"আমি দেখেছি, তিনি [মুহাম্মদ (সা)] উত্তম চরিত্রের নির্দেশ দিয়ে থাকেন।"

এটা হচ্ছে নুবুওয়াতের একেবারে প্রথম দিককার ঘটনা। সেই যুগেও যে উল্লেখযোগ্য গুণটি তাঁর মধ্যে দেখা যেত, তা ছিল তাঁর মহান চরিত্র।

হযরত আলী (রা) এর উক্তি

ইমাম হুসাইন (রা) হযরত আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বলেছিলেন–

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী, কোমলহৃদয় এবং দয়ালু। তিনি কর্কশ স্বভাব কিংবা সংকীর্ণমনা ছিলেন। কোন খারাপ কথা কখনো তাঁর মুখ দিয়ে বের হত না। তিনি ছিদ্রান্বেষীও ছিলেন না। অন্যের জন্য বিরক্তিকর হতে পারে এমন কোন কাজ তিনি করতেন না। কোন কথা তাঁর পছন্দ না হলে তিনি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। তিনটি জিনিস থেকে তিনি সব সময় নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন।সেগুলো হলো (ক) তর্কবিতর্ক (খ) প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা বলা এবং (গ) অনর্থক কথার পেছনে লেগে থাকা।

অন্যদের সম্পর্কেও তিনটি বিষয়ে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যেমন (ক) কাউকে তিনি মন্দ বলতেন না, (খ) কারো ছিদ্রান্বেষণ করতেন না এবং (গ) কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাতেন না। তিনি শুধুমাত্র সে কথা বলতেন বা সে কাজ করতেন, যা থেকে কোন না কোনভাবে উপকৃত হওয়া যেত। যখন তিনি কথা বলতেন তখন সাহাবীগণ নীরবে মাথা ঝুকিয়ে এতই মনোযোগ সহকারে তা শুনতেন, মনে হত যেন তাঁদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। যখন তাঁর কথা শেষ হয়ে যেত তখন সাহাবীগণ পরষ্পরের মধ্যে কথা বলতেন। যখন অন্য কেউ কথা বলত তখন তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নীরবে তা শুনতেন। লোকেরা কোন কথার উপর যখন হাসত তিনি তাদের সাথে মুস্কি হাসতেন। বাইরের কোন (অপরিচিত) লোক অমার্জিত ধরনের কোন কথা বললে তিনি তাতে ধৈর্য ধারণ করতেন। অন্যরা তাঁর প্রশংসা করুক তিনি তা পছন্দ করতেন না। তবে কেউ তাঁর কৃপা ও দান-দক্ষিণার শুকরিয়া আদায় করলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। কেউ কোন কথা বললে তিনি মাঝখানে কোন কথা বলতেন না। সে যতক্ষণ কথা বলত তিনি চুপচাপ থাকতেন। তিনি অত্যন্ত বদান্য অত্যন্ত সত্যবাদী ও অত্যন্ত নম্রহৃদয় ছিলেন। তাঁর সুহ্বাত (সংসর্গ) ছিল অত্যন্ত আরামদায়ক। কেউ তাঁকে হঠাৎ দেখলে স্বভাবত:ই ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ত। কিন্তু সে যতই তাঁর কাছে পরিচিত হতে থাকত ততই তাঁকে ভালবাসতে থাকত[১] এবং একথাও নির্বিবাদে স্বীকার করে নিত যে, তাঁর মত একজন মহানব্যক্তিকে সে এর পূর্বে বা পরে আর কখনো দেখে নি।

হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা

হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হিজরত-পূর্বকালীন অর্থাৎ মক্কী জীবনের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) এর মাদানী জীবনে তো তিনি তাঁর জীবন-সঙ্গিনীই হয়ে গিয়েছিলেন। এমন কি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র জীবনের শেষ সপ্তাহটি হযরত আয়েশা (রা) এর ঘরেই অতিবাহিত হয়। হযরত

আয়েশা (রা) তাঁকে ঠেস দিয়ে রেখেছিলেন ঠিক সেই অবস্থায়ই হুযূরে আকরাম (সা)-এর পবিত্র আত্মা দেহ ছেড়ে তাঁর মহান প্রভুর দরবারে গিয়ে পৌছেন। হযরত আয়েশা (রা) এর ঘরকেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীর অন্তিম শয়নাগারে পরিণত করেন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বিভিন্নভাবে দেখার যে সুযোগ হযরত আয়েশা (রা) পেয়েছিলেন তা অন্য কারো ভাগ্যে জুটে নি এবং জুটতে পারেও না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

(১) যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে দু'টি বিষয়ের মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া হত তিনি তার মধ্যে সেটিই গ্রহণ করতেন, যা সরল ও সহজসাধ্য। তবে এই শর্তে যে, তাতে পাপের কোন সম্ভাবনা যেন না থাকে। যদি সেটা পাপের কাজ হত তাহলে তিনি সবার আগেই তা থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতেন।[২]

(২) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ব্যক্তিগত কারণে কখনো কাউকে শাস্তি দেন নি এবং কারো উপর প্রতিশোধও গ্রহণ করেন নি। তবে হ্যাঁ, যারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর প্রতি অবজ্ঞা ও অসম্মান প্রদর্শন করত আল্লাহ্র ওয়াস্তেই তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতেন।[৩]

(৩) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র অভ্যাস এই ছিল যে, কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তিনি কখনো তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন না, বরং তাকে মাফ করে দিতেন।[৪]

(৪) রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো এমনভাবে হাসেন নি যে, তাঁর তালু কারো দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তিনি শুধুমাত্র মুস্কি হাসতেন।

(৫) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তরে সব সময় 'খাশিয়াতুল্লাহ্' তথা আল্লাহভীতির প্রাধান্য থাকত। আকাশে মেঘ দেখলে কিংবা আন্ধি ঝড় এলে তাঁর চেহারায় দুশ্চিন্তার চিহ্ন ফুটে উঠত। আমি (আয়েশা) বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, লোকেরা মেঘ দেখলে সন্তুষ্ট হয় এই আশায় যে, বৃষ্টি হবে, কিন্তু আপনার চেহারায় তখন ব্যথার চিহ্ন ফুটে উঠে। তিনি উত্তরে বললেন, হে 'আইশা, কোন্ জিনিষটি আমাকে নিশ্চিন্ত করতে পারে যে, এর মধ্যে কোন শাস্তি লুক্কায়িত নেই? অতীতে একটি জাতিকে আন্ধি ঝড় দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আর অপর একটি জাতি এই শাস্তি দেখে বলেছিল, এটা তো মেঘ। প্রকৃতপক্ষে মেঘের রূপ ধরেই তাদের শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল।[৫]

(৬) তিনি কখনো নাম ধরে কাউকে অভিশাপ দেন নি এবং নিজ হাতে কোন ভৃত্য, ক্রীতদাসী, ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক কিংবা জীবজন্তুকে প্রহার করেন নি।[৬]

(৭) তিনি কখনো কারো আবেদন অগ্রাহ্য করেন নি, যদি না তা না জায়িয ও অবৈধ হত।

(৮) তিনি হাসতে হাসতে ঘরের মধ্যে প্রবশ করতেন। এমনভাবে থেমে থেমে কথা বলতেন, যেন তা, কেউ স্মরণ রাখতে চাইলে রাখতে পারে।[৭]

(৯) একদা একজন বেদুইন এসে বলল, আপনি শিশুদের চুমু খান, আমরা চুমু খাই না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অন্তর থেকে দয়ামায়া বের করে দিয়েছেন। এতে আমার কী করার থাকতে পারে?[৮]

(১০) আস্ওয়াদ (রা) হযরত 'আইশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে কি করতেন? তিনি উত্তরে বলেন, গৃহবাসীদের খিদমতে নিয়োজিত থাকতেন অর্থাৎ তাদের কাজকর্ম করে দিতেন। যখন সালাতের সময় হত তিনি মসজিদে চলে যেতেন।[৯]

(১১) কারো কোন কাজ পছন্দ না হলে তিনি সে ব্যক্তির নাম নিতেন না বরং সে কাজ করা থেকে সকলকে নিষেধ করে দিতেন।

(১২) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পরিবারবর্গ কোন দিনই এমন দু'গ্রাস খাবার খান নি, যার মধ্যে একগ্রাস খেজুরের ছিল না।[৯]

প্রসঙ্গক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ভৃত্য আনাস বিন মালিক (রা) এর একটি উক্তি এখানে উদ্বৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেন, আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে কাটিয়েছি। এই গোটা সময়কালে তিনি কখনো আমার সম্পর্কে অপসন্দনীয় কোন কথা উচ্চারণ করেন নি। তিনি কখনো এও বলেন নি, তুমি এটা কেন করছ? আবার কখনো এও বলেন নি, তুমি এটা কেন কর নি?[১০]

নবুওয়াতের পূর্ববর্তী জীবন

হযরত আলী ও হযরত 'আইশা (রা) এর যে সব উক্তি পাওয়া যায় তা প্রধানতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নুবুওয়াতী জীবন সম্পর্কে। আর এ জীবন ছিল সর্বমোট তেইশ বছরের। ইতিপূর্বে তিনি তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর কাটিয়েছেন। এটা হচ্ছে তাঁর সেই জীবন, যেটাকে পবিত্র কুরআনের একটি জায়গায় তাঁর নুবুওয়াতের সত্যতার দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন–

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُم عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ .

"আমি (মুহাম্মদ) তো এর (নুবুওয়াতের) পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করেছি; তবুও কি তোমরা (আমি সত্যিকার নবী কিনা তা) বুঝতে পার না?" (১০:১৬)

আরবের মুশরিকরাও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সত্যবাদিতা ও প্রকৃষ্টতার কথা অস্বীকার করত না। এমন কি আবু জাহলও স্বীকার করত যে, মুহাম্মদ (সা) একজন সত্যবাদী লোক। তবে (তার মতে) তিনি এমন সব কথা বলেন, যেগুলোকে মেনে নেওয়া যায় না।

মুরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মতে, উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নুবুওয়াতের সত্যতার একটি অতি স্বাভাবিক ও স্পষ্ট দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে: তোমরা অন্যসব কথা ছেড়ে দাও। শুধু একটি কথা চিন্তা করে দেখ যে, আমি তো তোমাদের মধ্যে কোন নবাগত কিংবা অপরিচিত ব্যক্তি নই যে, তোমরা আমার চরিত্র ও আচার-আচরণের কোন খবর রাখ না। আমি তোমাদেরই লোক এবং নুবুওয়াতের ঘোষণা প্রদানের পূর্বে আমার জীবনের একটি দীর্ঘ সময় (চল্লিশ বছর), যা একজন মানুষের বিবেক বুদ্ধির পরিপক্কতার জন্য যথেষ্ট, তোমাদের মধ্যেই কাটিয়েছি। এই দীর্ঘ সময় আমি যা কিছু করেছি তা তো তোমাদের সামনে রয়েছে। বল এর মধ্যে তোমরা কি আমার মধ্যে এমন কোন ব্যাপার লক্ষ্য করেছ, যা সত্যতা ও বিশ্বস্ততার বরখেলাফ? যদি এই সময়কালে আমি কখনো মানুষের সাথে লেনদেন কিংবা অন্য কোন ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি তাহলে এখন এটা কি করে সম্ভব যে, আমি আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করতে যাব এবং এমনি এমনি একথা বলতে যাব যে, আমার উপর তাঁর বাণী অবতীর্ণ হয়? এ ছোট্ট কথাটি তোমরা কি বুঝতে পারছ না?

সমগ্র চরিত্র বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী এ ব্যাপারে একমত যে, মানবজীবনের প্রাথমিক চল্লিশ বছর হচ্ছে তার চরিত্র ও আচার আচরণের উন্মেষ, বর্ধন ও পরিপক্কতা অর্জনের মূল সময়কাল। এই সময়ে মানব চরিত্রের যে ছাঁচ গড়ে উঠে তা পুরবর্তী জীবনে আর বদলায় না। অতএব এক ব্যক্তি যদি চল্লিশ বছর পর্যন্ত সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত থাকে তাতে এটা কি করে সম্ভব যে, সে এক চল্লিশ বছরে উপনীত হতেই এমন মিথ্যাবাদীতে পরিণত হবে যে, শুধু মানুষের উপর নয় বরং আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তা'আলার উপরও মিথ্যা আরোপ করতে শুরু করবে?

এবার যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য তা হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে সে যেমন সব চাইতে জঘন্য ধরনের লোক তেমনি জঘন্য ধরনের লোক ঐ ব্যক্তিও, যে একজন সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী ঠাওরায়। আর এ ধরনের লোকরা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারে না।...আল্লাহ্‌ই সব সিদ্ধান্তের মালিক এবং তাঁর নীতি এই যে, তিনি কখনো দুষ্কৃতিকারীদের জয়ী করেন না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়। যারা ছিল মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা আরোপকারী তারা দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর যারা সত্যবাদী তারা এখনো টিকে আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে।[১১]

সমগ্র বিশ্ব জানে, যে যুগে সভ্যতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর প্রদীপ নিভে গিয়েছিল ঠিক সেই যুগেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁর পবিত্র ও নিখুঁত চরিত্রগুণে 'আস্‌সাদিক' (সত্যবাদী) 'আল আমীন' (বিশ্বস্ত) উপাধি লাভ করেছিলেন। কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ করতে গিয়ে 'হাজারে আসওয়াদ'কে তার মূল জায়গায় স্থাপন করার ক্ষেত্রে যখন মক্কার সর্দার ও দলপতিদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তখন সর্ব সম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যে ব্যক্তি সবার আগে হরমে আসবে এ ব্যাপারে তাকেই 'সালিস' নিয়োগ করা হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ই সবার আগে সেখানে আসেন। তখন সবাই সমস্বরে ধ্বনি দিয়ে উঠে, "আমীন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) সবার আগে এসেছেন, আমীন সবার আগে এসেছেন। আমরা তাঁর ফয়সালা অবশ্যই মেনে নেব।" এটা ছিল হুযূর (সা) সম্পর্কে এমন একটি সাক্ষ্য, যার গুরুত্ব, যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা অনস্বীকার্য।

হযরত খাদীজা (রা)-এর সাক্ষ্য

এক্ষেত্রে হযরত খাদীজা (রা) এর সাক্ষ্যও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হযরত খাদীজা (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে তাঁর সহধর্মিনী ও জীবন সঙ্গিনী হিসাবে নুবুওয়াত-পরবর্তী সুদীর্ঘ পনরটি বছর কাটান। আরো কাটান অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাথে নবুওয়াত পরবর্তী সেই দশটি বছর, যে সময়টি ছিল সত্য দ্বীন ও তার অনুসারীদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর, বিষাদময় ও ঝুকিপূর্ণ। হযরত খাদীজা (রা)-এর এই সাক্ষ্যও হুযূর (সা) এর নুবুওয়াত-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে নয় বরং নুবুওয়াত-পূর্ববর্তী জীবন সম্পর্কে।

'সূরা আলাক'-এর আয়াতগুলো রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপর নাযিল হয়েছিল। প্রথমতঃ ওহী নাযিলের চাপ সহ্য করা তাঁর জন্য ছিল খুবই কষ্টকর। উপরন্তু এটা ছিল তাঁর প্রথম ওহী। এটা তো জানা কথা যে, এর পরেও যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হত তখন তাঁর চেহারা ঘর্মাক্ত হয়ে উঠত। দ্বিতীয়তঃ যে বিরাট দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন তার গুরুত্ব ও কষ্টসাধ্যতা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি ওয়াকেফহাল ছিলেন। তাই হেরা গুহা থেকে যখন তিনি ঘরে ফিরে আসেন তখন তাঁর অন্তর ছিল ভয়ে কম্পমান। যখন মনের অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসে তখন তিনি তাঁর মানসিক ক্লান্তি ও অস্থিরতার কথা আপন প্রিয় জীবন সঙ্গিনীর কাছে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন- لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ "আমি আমার প্রাণ নিয়ে শংকিত।"

হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর নিখুঁত চরিত্র ও মঙ্গলকামিতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাথে প্রেম-ভালবাসার এমন সত্তাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর জীবন পথে সফলকাম করবেন না এটা ছিল তাঁর কল্পনারও অতীত। আর এ কারণেই তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন-

"কখনো না। আল্লাহ্‌র শপথ আল্লাহ্‌ আপনাকে কখনো উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখবেন না। আপনি আপনার বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সাথে সদয় ব্যবহার করেন; অক্ষম, নিরাশ্রয় ও অভাবীদের বোঝা বহন করেন, যার কাছে কিছু নেই তাকে দান করেন, অতিথিদের সেবা করেন, বিপদের সময় ন্যায় ও সত্যের সাহায্যকারী থাকেন[১২] এবং সব সময় সত্য কথা বলেন।[১৩]

এই সাক্ষ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সেই অনুপম চরিত্র ও মহৎ গুণাবলী সম্পর্কে, যা নুবুওয়াতপূর্ব যুগে তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আর একথা অনস্বীকার্য যে, হুযূর (সা) এর চরিত্র সম্পর্কে হযরত খাদীজা (রা) এর চাইতে অধিক জ্ঞান অন্য কারো ছিল না–থাকতে পারে না।

মুমিনের চরিত্র ও গুণাবলী

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অনুপম চরিত্র সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির এও একটি মাপকাঠি হতে পারে যে, এ বিষয়টি বিবেচনাকালে একজন মুমিনের যে চরিত্র ও গুণাবলী পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তা সামনে রাখা হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যে পবিত্র সত্তার মাধ্যমে কুরআন মজীদের শিক্ষা তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন তিনি সর্বাবস্থায় অবশ্য অবশ্যই ছিলেন সেই শিক্ষার এক পবিত্র সত্তা। সেই সত্তাকে নমুনা হিসাবে ধরেই সাহাবা কিরাম নিজেদের আমল ঠিক করে নিতেন। একমাত্র তাঁরই পবিত্র সত্তার ছায়াতলে তাঁদের সংশোধন ও পবিত্র করণের কর্মধারা অব্যাহত ছিল।

পবিত্র কুরআন থেকে এ জাতীয় সব কয়টি আয়াত একত্রে সন্নিবেশিত করা তো সম্ভব নয়; তাই এখানে এমন কিছু আয়াত উদ্ধৃত করা হচ্ছে যেগুলোর মধ্যে মুমিনের বৈঠকী ও সমষ্টিগত জীবনের সাথে ওতপ্রোত গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে।

"মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তার কাছে পাঠ করা হয়, তখন তা ওদের ঈমান বৃদ্ধি করে (ঈমান দৃঢ় ও মজবুত করে) এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত মুমিন।" (৮ ঃ ২-৪)

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে, যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে, যারা যাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ছাড়া; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না, এবং কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লংঘনকারী এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে।" (২৩ ঃ ১-৯)

"রাহমানের বান্দা তারাই, যারা নম্রভাবে চলাফেরা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম' এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে; এবং তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর; এর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে তা কত নিকৃষ্ট। এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মধ্যে মধ্যমপন্থায়। এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহ্কে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়; তারা নয়, যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দেবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

"যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়, এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে আপন মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে। আর যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না, এবং যারা প্রার্থনা করে,

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।" –(২৫ ঃ ৬৩-৭৪)

"বস্তুত তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী, তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে; যারা গুরুতর পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হলেও ক্ষমা করে দেয়। যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে, এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে আছে। আল্লাহ্ জালিমদের পছন্দ করেন না। তবে অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না; কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি। অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় এটা তো হবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।" –(৪২ ঃ ৩৬-৪৩)

প্রকৃত পুণ্য

পবিত্র কুরআন বলে–

"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্‌র প্রেম, আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীদেরকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করলে, অর্থসংকটে, দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে।" (২ ঃ ১৭৭)

পবিত্র কুরআন আরো বলে–

"যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।" –(৩ ঃ ১৩৪)

এগুলো হলো 'দাওয়াতে হক্ক'-এর কয়েকটি ঝিলিকমাত্র, যা আমলকারীদের (ক্রিয়া সম্পাদনকারীদের) আমলের আকারে এখানে পেশ করা গেল। এ থেকে কি কারো পক্ষে এ ধারণা করা কঠিন হবে যে, যে 'সত্যের দাওয়াত প্রদানকারী'কে এ পবিত্র দাওয়াত প্রদানের জন্য পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল তিনি স্বয়ং আপন পবিত্র দাওয়াত তথা শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা হবেন। ইসলাম যে সব ইবাদত নির্ধারণ করে দিয়েছে সেগুলোর মূল লক্ষ্য তো এ ছাড়া কিছু নয় যে, মানুষের আমল তথা কাজকর্ম সংশোধিত ও মার্জিত হবে, তাদের আচার-আচরণ পবিত্র ও বিশুদ্ধ হবে এবং তাদের চরিত্র হবে সুন্দর ও অনুপম।

টীকা ঃ

(১) বুখারী ঃ কিতাবুল আদাব।

(২) সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুল মানাকিব।

(৩) সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুল মানাকির।

(৪) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

(৫) সহীহ্ বুখারী।

(৬) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড।

(৭) বুখারী ঃ কিতাবুল আদাব।

(৮) বুখারী ঃ কিতাবুল আদাব।

(৯) বুখারী ঃ কিতাবুল সালাত।

(৯) সহীহ বুখারী ঃ কিতাবুর রিকাক।

(১০) বুখারী ঃ কিতাবুল আদাব।

(১১) তরজমানুল কুরআন ঃ দ্বিতীয় খণ্ড।

(১২) বুখারী ঃ কাইফা কানা বাদ্উল ওহী।

(১৩) বুখারী ঃ কিতাবুত তা'বীর।

মহান চরিত্র–২

শ্রেষ্ঠ চরিত্রের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,

১। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সব চাইতে ভাল, যার চরিত্র সবচাইতে শ্রেষ্ঠ।

২। সেই পরিপূর্ণ মুমিন, যে সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী।

৩। কিয়ামতের দিন আমালের পাল্লায় সুন্দর চরিত্রের চাইতে অধিক ভারী কিছু হবে না।

৪। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষকে যে সব জিনিস দান করা হয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম জিনিস হচ্ছে সচ্চরিত্র।

৫। আল্লাহ্‌র কাছে সেই মানুষই সর্বাধিক প্রিয়, যার চরিত্র উত্তম।

৬। পরকালীন জীবনে ঐ ব্যক্তিই আমার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় হবে, যার চরিত্র উত্তম এবং সেই হবে আমার নিকটতর।[১]

৭। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুমিনদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তিনি উত্তর দিলেন, যার চরিত্র সব চাইতে সুন্দর।[২]

৮। মানুষ সুন্দর স্বভাব চরিত্র দ্বারা সেই মর্যাদা লাভ করতে পারে, যা অনবরতঃ রোযা রেখে এবং রাতের পর পর রাত ইবাদত করে তবে লাভ করা যায়।

এই শেষোক্ত বাণী সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য এই যে, এর বর্ণনাভঙ্গি থেকে এটাই প্রকাশ পাচ্ছে যে, সুন্দর চরিত্র মানুষকে সেই মর্যাদার অধিকারী করে, যে মর্যাদা সে প্রচুর নফল সালাত ও সিয়াম দ্বারা লাভ করতে পারে। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি সুন্দর চরিত্রের অধিকারী, উপরন্তু সে নফল সালাত আদায় করে এবং রোযাও রাখে সে নিঃসন্দেহে আরো অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য হবে।

মোটকথা, উপরোক্ত বাণী সমূহ দ্বারা অনায়াসে অনুমান করা যেতে পারে যে, দ্বীনে হক তথা সত্য দ্বীনে সুন্দর চরিত্রের কত বিরাট মর্যাদা রয়েছে। আর থাকাই তো জরুরী। কেননা চরিত্র ঠিক হলে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে মেলামেশা বৃদ্ধি পাবে, তাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি হবে এবং একে অন্যের লাভক্ষতি ও সুখদুঃখ অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবে। ফলে তাদের মধ্যে হিংসাবিদ্বেষের যে কারণগুলো বিদ্যমান ছিল তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত গোটা জনগোষ্ঠী একই পরিবারের সদস্যদের মত পরস্পর মিলেমিশে জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তাদের প্রত্যেকের অন্তরে মানবতার অনুভূতি যথাযথভাবে জাগ্রত হবে। আর এটাই তো হচ্ছে ইসলামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই মহান লক্ষ্যের দিকেই যখন ইসলামের অগ্রযাত্রা শুরু হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে

ঠিক তখনি বাদশাহী তথা রাজতন্ত্রের যুগ শুরু হয়ে যায়, যার গোলক ধাঁধায় পড়ে ইসলামী কাফেলা তাদের অতি মূল্যবান পণ্যদ্রব্যসমূহ হাতছাড়া করে বসে। যার কারণে এখন যে কোন জিনিসের সঠিক সন্ধান বের করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যদি তা করাও যায় তবু রাজতন্ত্রের যুগ থেকে আমাদের ধ্যান-ধারণায় সত্যদ্বীনের যে নকশা অংকিত হয়ে গেছে তাতে সেই হারানো জিনিসের সঠিক স্থানটি বের করা বাহ্যতঃ খুব সহজ ব্যাপার নয়।

বাকি থাকল ইসলাম প্রচারের কথা। এটা তো প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রত্যেক ইসলামী জামা'আতের জন্য দলগত ভাবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। এটা শুধু একারণে নয় যে, ইসলাম সত্য এবং সত্যের প্রচার প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পুণ্যকর্ম; বরং এজন্যও যে, অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্বজাতির মঙ্গলকামনা প্রত্যেক মুসলমানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর সমগ্র স্বজাতিকে ইসলামী নি'মাতের বাহকে পরিণত করার চাইতে উৎকৃষ্ট শুভকামনা তো আর কিছুই হতে পারে না। কেননা এর উপরই দুনিয়া-আখিরাতের উভয় জগতের সাফল্য নির্ভরশীল। আর একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ইসলাম প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র তখনই তৈরী হয় যখন শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বিরাজ করে। যদি পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষের আগুন মানুষের অন্তরে প্রজ্বলিত থাকে তাহলে তারা একে অন্যকে সত্যের পয়গাম শুনাবে কি করে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র জীবনী থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, বদর ও হুনায়ন যুদ্ধের বিজয় নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও হুদাইবিয়া সন্ধিকেই 'ফাতাহ্মমুবীন' তথা সুস্পষ্ট বিষয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেননা এই সন্ধিই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র আরবের অন্তরসমূহের দরজা একেবারেই দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ইসলামের জন্য খুলে ধরেছিল। এর ফলেই মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল– يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا (দলে দলে জনতা, আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ)-এর চিত্তাকর্ষক অনুপম দৃশ্য।

ঈমান কি?

সহীহ্ বুখারীর 'ঈমান' অধ্যায় থেকে এখানে মাত্র কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা গেল, যাতে ঈমান ও ইসলামের হাকীকত (স্বরূপ) সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

১। সেই প্রকৃত মুসলিম যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। আর সেই প্রকৃত মুহাজির যে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করে।

২। ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আপন মুমিন ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে থাকে।

৩। যে ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটি বস্তু (গুণ) আছে সে ঈমানের স্বাদ পেয়ে গেছে।

(ক) আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল তার কাছে সব চাইতে প্রিয়।

(খ) সে শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তে প্রত্যেকটি লোককে ভালবাসে। অর্থাৎ তার এই ভালবাসার মধ্যে কোন পার্থিব স্বার্থ জড়িত নেই।

(গ) কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া তার কাছে সেরূপ যন্ত্রনাদায়ক যেরূপ যন্ত্রণাদায়ক আগুনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

৪। তিনটি গুণের অধিকারী যে হয়েছে সে প্রকৃত ঈমানের অধিকারী হয়েছে।

(ক) নিজের প্রাণের পরওয়া না করেও ন্যায় বিচারের উপর অবিচল থাকা।

(খ) দুনিয়ায় শান্তি ও সত্য প্রচার করা।

(গ) অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন্ ইসলাম (অর্থাৎ ইসলামের কোন্ কাজটি) শ্রেষ্ঠ? তিনি জবাব দেন, (ভুখাকে) পানাহার করানো এবং সবাইকে সালাম করা-চাই সে পরিচিত হোক অথবা না হোক।

৬। স্বয়ং আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি আমার ক্রীতদাসকে তিরস্কার করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা শুনে বললেন, আবূ যর তোমার মধ্যে এখনো জাহিলিয়াত (মূর্খতা) রয়ে গেছে। ক্রীতদাস তোমার ভাই। আল্লাহ্ ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তির ভাই তার অধীনস্থ হয়েছে তার উচিত আপন ভাইকে তাই খাওয়াবে যা সে নিজে খায়, তাই পরাবে যা সে নিজে পরে এবং তার উপর এমন কাজ চাপাবে না, যা তার সাধ্যের অতীত। যদি কোন কঠিন কাজ তাকে করতে দেয় তাহলে সে (মালিক) স্বয়ং তাকে সাহায্য করবে।

৭। দেহের মধ্যে এক খণ্ড গোশ্‌ত আছে; যদি তা ঠিক থাকে তাহলে সমস্ত দেহ ঠিক থাকে; আর যদি তা বিগড়ে যায় তাহলে সমস্ত দেহ বিগড়ে যায়। শোনো, সেটা হচ্ছে হৃদয়।

৮। মুসলমানকে তিরস্কার করা ফিস্‌ক্ এবং তার সাথে লড়াই-ঝগড়া করা কুফ্‌র।

৯। যখন দুইজন মুসলমান তরবারি নিয়ে পরস্পরের মুকাবালা করবে তখন কাতিল (হত্যাকারী) ও মাকতূল (নিহত) উভয়েই আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। তখন (হুযুরের খিদমতে) নিবেদন করা হলো, কাতিল (হত্যাকারী) তার অপরাধের দরুণ শাস্তি পেল, কিন্তু মাকতূলের (নিহতের) অবস্থা অনুরূপ হবে কেন? হুযূর (সা) জবাব দেন, সেও তো তার সঙ্গীকে হত্যা করতে চেয়েছিল (কিন্তু সুযোগ পায় নি বলে নিজে নিহত হয়েছে।)

১০। যার মধ্যে চারটি জিনিস (অভ্যাস) থাকে সে মুনাফিক।

(ক) তার কাছে আমানত রাখলে সে তাতে খিয়ানত করে।

(খ) সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে।

(গ) যখন সে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তা পূরণ করে না।

(ঘ) সে যখন ঝগড়া করে তখন অন্যায়ের দিকে ধাবিত হয়।

যদি কারো মধ্যে উপরোক্ত যে কোন অভ্যাস থাকে তাহলে এটা তার নিফাকের চিহ্ন হিসাবে বিবেচিত হবে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।

১১। আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় আমল হচ্ছে সেটি, যা সব সময় করা হয়, যদিও পরিমাণে তা সামান্য।

১২। 'আদাব' (শিষ্টাচার) অধ্যায়ে আছে। তিনি (সা) তিনবার বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, সে ঈমান আনে নি, আল্লাহ্‌র কসম সে ঈমান আনে নি, আল্লাহ্‌র কসম সে ঈমান আনে নি। নিবেদন করা হয়, কে সে হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি জবাব দেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টকারিতা থেকে নিরাপদ নয়।

উপরোক্ত বাণীগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং চিন্তা করে দেখুন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানবজাতিকে কোন্ পথে চলার আহ্বান জানিয়েছেন? এছাড়া কি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার এবং মানবতার মঙ্গল সাধনের অন্য কোন পথ আছে, না থাকতে পারে? আরো চিন্তা করে দেখুন, দু'জাহানের মুক্তি ও সাফল্যের যে উৎস সত্তা থেকে এ ধরনের হাজার হাজার ঢেউ উঠেছে তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার কত উর্দ্ধস্তরে ছিলেন বা থাকতে পারেন।

সংস্কার ও সংশোধনের বৃত্ত

মরহুম মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী তাঁর 'সীরাতুন্নবী' গ্রন্থে সেই সব চারিত্রিক শিক্ষার একটি তালিকা পেশ করেছেন, যেগুলোর উপর আমল করার অথবা যেগুলো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ পবিত্র কুরআনে রয়েছে।[৩] আমি গণণা করে দেখেছি এই সব শিক্ষার মোট সংখ্যা এক'শ সাতাইশ। অনুরূপভাবে মরহুম মাওলানা নদভী সহীহ্ বুখারী, জামি তিরমিযী এবং সুনানে আবি দাঊদ সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চারিত্রিক শিক্ষাসমূহের শুধুমাত্র শিরোনাম লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সেগুলোর সংখ্যা হয়েছে নিরানব্বই।[৪]

এরপর তিনি বলেছেন, 'কানযুল 'উম্মাল' হরেক রকমের হাদীসের একটি সংকলন। তার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চারিত্রিক শিক্ষাসমূহ একশত সাতাশি পৃষ্ঠা ব্যাপী সংকলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে ছত্রিশটি লাইন। মরহুম মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী-ঐ সম্পর্কিত হাদীসগুলো গণনা করার পর দেখেছেন, সেগুলোর সংখ্যা তিন হাজার ন'শ ছয়।[৫]

এখানে পরিসংখ্যানের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহে আদেশ অথবা নিষেধের আকারে যা কিছু এসেছে, তাতে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় কোন দিকই বাদ পড়ে নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বিদায় হজ্জে বিশেষভাবে তিনটি জিনিসের উল্লেখ করেন। সেগুলো হলো প্রাণ, সম্পদ এবং সম্মান। এরপর তিনি হজ্জের দিন, হজ্জের মাস এবং মক্কা মুকাররমার হুরমাত (পবিত্রতা) রক্ষার ন্যায় প্রাণ, সম্পদ এবং সম্মানের হুরমাত রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে, বিশ্বে যত রকমের বাড়াবাড়ি, জুলুম-অত্যাচার ও অপরাধ সংঘটিত হয় তার মধ্যে অধিকাংশেরই সম্পর্ক কোন না কোন ভাবে এই তিনটি জিনিসের সাথে ওতপ্রোত। কেননা স্বভাবতই এই তিনটি জিনিস সব মানুষের কাছেই প্রিয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, মানব জীবনের এমন কোন জরুরী সমস্যা নেই যার আদেশ অথবা নিষেধ পবিত্র কুরআন অথবা সুন্নাহে আসে নি।

এখন 'সীরাতুন্নবী' ও 'রাহমাতুল লিল আলামীন' শীর্ষক গ্রন্থদ্বয় থেকে হুযূর (সা) এর চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে।

অনুপম চরিত্র

রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত নম্র স্বভাব ও উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পবিত্র চেহারার উপর সব সময় এমন একটা ভাব বিরাজ করত, যার ফলে তাঁর প্রতি যারাই তাকাতেন তাদের উপর তাঁর দয়া ও ভালবাসার প্রভাব পড়ত। তিনি কথা বলতেন স্থৈর্যের সাথে এবং ধীরে স্থিরে। তিনি এক একটি বাক্য পৃথক পৃথকভাবে বলতেন। প্রত্যেককে যে কোন কথা বুঝিয়ে বলতেন। তিনি কখনো কারো অন্তরে আঘাত দিতেন না। আরোহী অবস্থায় রাস্তার মধ্যে কোন সাহাবীর সাথে দেখা হলে তাকে আপন বাহনে উঠিয়ে দিয়ে স্বয়ং নীচে নেমে যেতেন।

জনৈক সাহাবী বলেন, আমি বাল্যাবস্থায় আনসারদের খেজুর বাগানে গিয়ে ঢিল মেরে মেরে গাছ থেকে খেজুর পাড়ছিলাম। লোকেরা আমাকে পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে নিয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেন, গাছের তলায় পড়া খেজুর খেয়ে নাও, ঢিল মেরো না। এরপর তিনি আমার মাথায় তার পবিত্র হাত রাখেন এবং আমার জন্য দু'আ করেন।

একদা দুর্ভিক্ষাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি অন্যের বাগান থেকে খেজুরের ছড়া ভেংগে নিয়ে কিছু খেলেন এবং কিছু আঁচলে বেঁধে নিলেন। এমতাবস্থায় বাগানের মালিক এসে তাকে ধরে প্রহার করেন। এমন কি তার কাপড় চোপড়ও গা থেকে খুলে নিলেন। উপরন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে গিয়ে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ

করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাগানের মালিককে বলেন, "এ লোকটি ছিল মূর্খ, ওকে জ্ঞান দান করা উচিত ছিল। সে ছিল ভূখা, ওকে খাওয়ানো উচিত ছিল।"-একথা বলে তিনি তার কাপড়চোপড় ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং নিজের কাছ থেকে তাকে ষাট সা আহার্যদ্রব্য দান করেন (আমাদের হিসাবে যার পরিমাণ হবে তিন মন তের সের দু'ছটাক)।

মজলিসে নবভীতে বসার জায়গা না থাকলে নবাগতদের বসার জন্য খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন পবিত্র চাদর বিছিয়ে দিতেন। তিনিই সর্বাগ্রে সালাম দিতেন। পথ দিয়ে চলার সময় পুরুষ, স্ত্রীলোক, শিশু-যেই সামনে আসত তাকেই তিনি সালাম দিতেন। তিনি তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে কখনো কোন অশালীন শব্দ উচ্চারণ করেন নি। আনাস বিন মালিক (রা) বলেন, তিনি যখন কাউকে তিরস্কার করতেন তখন শুধু বলতেন- مالہ ترب جبینہ -"এর কি হলো? এর কপাল মাটি যুক্ত হোক।"[৬]

শিশুদের প্রতি স্নেহ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিশুদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি যখন কোন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আসতেন এবং তাঁদের সাথে শিশুরাও থাকতো। শিশুরা স্বভাবতই একে অপরের আগে যাবার চেষ্টা করতো। তাদের মধ্যে যারা সর্বাগ্রে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতো তিনি তাদেরকে আপন বাহনের উপর উঠিয়ে নিতেন। এরপর রাস্তায় যাদের সাথেই দেখা হত তিনি তাদেরকে সালাম দিতেন এবং সোহাগভরে দুচারটি কথাও বলতেন।

একদা খুবই দরিদ্র এক মহিলা হযরত আয়েশা (রা) এর কাছে আসেন। সঙ্গে ছিল তার দুটি মেয়ে। ঘটনাক্রমে হযরত আয়েশা (রা) এর কাছে তখন শুধুমাত্র একটি খেজুর ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। তিনি ঐ খেজুরটিই মহিলার হাতে তুলে দেন। মহিলা খেজুরটিকে দু'টুকরা করে তা তার দুটি মেয়ের হাতে তুলে দেন। হযরত আয়েশা (রা) ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বলেন, যার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান-সন্ততির ভালবাসা ঢেলে দিয়েছেন এবং সে ঐ ভালবাসার হক আদায় করেছে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই ভালবাসা শুধুমাত্র মুসলমান শিশুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। একদা কোন একটি যুদ্ধে মুজাহিদদের অজ্ঞাত সারেই কিছু শিশু মারা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কানে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। তখন কেউ একজন বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, তারা তো ছিল মুশরিকদের শিশু। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, মুশরিকদের শিশুরাও তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। সাবধান! শিশুদের হত্যা করো না। সাবধান! শিশুদের হত্যা করো না। সাবধান! শিশুদের হত্যা করো না। প্রত্যেকটি মানুষ 'ফিতরাত' (ইসলাম) এর উপর জন্ম গ্রহণ করে।

জাবির বিন সামুরাহ (রা) তাঁর বাল্যকালের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনে সালাত আদায় করলাম। এরপর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম। সামনের দিক থেকে আরো কয়েকটি শিশু এল। তিনি সবাইকে আদর করলেন এবং আমাকেও আদর করলেন।

ক্রীতদাসের প্রতি কৃপা প্রদর্শন

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ যর গিফারী (রা) কে একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, তোমাদের ক্রীতদাস তোমাদের ভাই। নিজে যা খাও তাকেও তা খাওয়াও এবং নিজে যা পর তাকেও তা পরাও। তারপর আবূ যর (রা) খাওয়াপরা ইত্যাদিতে নিজের ও নিজের ক্রীতদাসের মধ্যে সব সময় সাম্য বজায় রাখতেন।

ক্রীতদাসকে ক্রীতদাস বলাটাও রাসূলুল্লাহ্ (সা) পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, তোমরা তাদেরকে দাস-দাসী বলে ডেকো না, বরং বলো 'হে আমার ছেলে' অথবা 'হে আমার মেয়ে'। যখনই কোন দাসদাসী তাঁর অধিকারে আসত তিনি তাদেরকে মুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তারা মুক্ত হয়েও তাঁর ভালবাসার শিকলে আবদ্ধ হয়ে পড়তেন। যায়দ বিন হারিছা (রা) এর ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পিতা এবং পিতৃব্য যে কোন মূল্যে তাঁকে মুক্ত করে নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসেছিলেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পূর্বেই যায়দ (রা) কে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাই তিনি যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারটি তাঁর উপরই ছেড়ে দেন। কিন্তু যায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে ছেড়ে যেতে সরাসরি অস্বীকার করে বসেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দয়া, করুণা ও ভালবাসাকে তার পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রেম-ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেন।[৭] কী অপূর্ব আকর্ষণ ছিল তাঁর স্নেহ-ভালবাসার, যার সামনে ফিকে হয়ে গিয়েছিল একজন শিশুর কাছেও তার আপন মা-বাবা ও রক্তসম্পর্কের নিকটাত্মীয়দের ভালবাসা। যায়দ (রা)-এর পুত্র উসামা (রা) কে তিনি যে কী পরিমাণ ভালবাসতেন তা এ থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য অন্যান্য সাহাবীগণ তাঁকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে পাঠাতেন। বিজয়ী বেশে মক্কা প্রবেশের সময় হযরত উসামা (রা) একই বাহনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন।

জনৈক সাহাবী তাঁর দাসকে প্রহার করছিলেন। তখন পেছন দিক থেকে আওয়াজ এলোঃ তোমার উপর আল্লাহ্ তা'আলার এর চাইতেও অধিক ইখতিয়ার রয়েছে। সাহাবী তখন মুখ ঘুরিয়ে দেখেন, সে আওয়াজকারী স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছাড়া আর কেউ নন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি তাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, যদি তুমি এরূপ না করতে তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে ধরে ফেলত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বশেষ ওসীয়তগুলোর মধ্যে একটি ওসীয়ত এই ছিলঃ তোমরা দাসদাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। জনৈক ব্যক্তি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, দাসদাসীদের দোষ-ত্রুটি কতবার মাফ করবো? রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব রইলেন। ঐ ব্যক্তি তৃতীয়বার ঐ একই প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিলেন, রোজ সত্তর বার।

দরিদ্রের প্রতি ভালবাসা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই দু'আ করতেন, হে আল্লাহ্, আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখ, মিসকীনরূপে উঠিয়ে নিও এবং মিসকীনরূপেই পুনরুত্থিত কর। হযরত আয়েশা (রা) একদা জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কেন? তিনি (সা) উত্তর দিলেন– এজন্য যে, মিসকীনরা ধনীদের আগে জান্নাতে যাবে। এরপর তিনি বললেন, হে আয়েশা, কোন মিসকীনকে তোমার দরজা থেকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না। আর কিছু না পার অন্ততঃ এক টুকরা খুরমা অবশ্যই দান কর। হে আয়েশা গরীবদেরকে ভালবাস, তাদেরকে নৈকট্য দান কর। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নৈকট্য দান করবেন।

আবদুল্লাহ্ বিন 'আমর বিন 'আস (রা) বলেন, আমি একদা মসজিদে বসে ছিলাম। আর একদিকে চক্রাকারে বসে ছিল দরিদ্র মুহাজিররা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে প্রবেশ করে মুহাজিরদের মধ্যে বসে গেলেন। তখন আমিও সেখানে গিয়ে বসলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য সুসংবাদ; তারা ধনীদের চাইতে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

যে ব্যক্তি কোন বিধবা এবং মিসকীনের খোঁজ খবর নেয় তার মর্যাদা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর মত কিংবা ঐ ব্যক্তির মত, যে দিনের বেলা রোযা রাখে এবং রাতের বেলা আল্লাহ্‌র ইবাদতে দন্ডায়মান থাকে।[৮]

শহরতলীতে একজন বৃদ্ধা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। তাঁর বাঁচার আর কোন আশা ছিল না। হুযূর (সা) বললেন, যখন এই বৃদ্ধার মৃত্যু হয় তখন তোমরা আমাকে অবশ্যই খবর দেবে। আমি তার জানাযার নামায পড়ার। ঘটনাক্রমে বেশ কিছু রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঐ বিধবার মৃত্যু হয়। সাহাবগিণ তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে ঘুম থেকে জাগানো সঙ্গত মনে করেন নি। তাই নিজেরাই বৃদ্ধাকে দাফন করে ফেলেন। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এই ঘটনার কথা জানতে পারেন তখন বৃদ্ধার কবরে গিয়ে জানাযার নামায আদায় করেন।

একদা এক গোত্রের লোক, খুবই নিঃস্ব অবস্থায় মদীনায় আসেন। তাঁদের কারো গায়ে কাপড় ছিল না। পায়েও জুতা ছিল না। শুধুমাত্র এক একটি চর্ম তাঁরা গাঁয়ে বেঁধে রেখেছিলেন এবং গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিলেন এক একটি তরবারি। তাঁদের এই নিঃস্ব অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র চেহারার রং বদলে যায়। তিনি অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে ঘরের ভিতরে যান। এরপর বেরিয়ে এসে বিলাল (রা) কে আযান দেওয়ার হুকুম দেন। সালাত শেষ হলে পর তিনি একটি ভাষণের মাধ্যমে এই নিঃস্বদেরকে সাহায্য করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষের প্রতি কত স্নেহশীল ছিলেন তা এঘটনা থেকেও অনায়াসে অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি সব সময় নফল সালাত চুপি চুপি আদায় করতেন, যাতে সাধারণ লোকদেরকে তাঁর অনুসরণ করতে গিয়ে বেশী বেশী ইবাদত করার কষ্টে পতিত হতে না হয়।

সাম্য

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র জীবনে সাম্যের যে বাস্তব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেরূপ দৃষ্টান্ত কোথায় পাওয়া যায় যাবে? এর চাইতে বড় সাম্যের দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে যে, তিনি নিজের মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের সাথে আপন ফুফাত বোনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন, যাতে এই বিবাহের মাধ্যমে মানব সমাজে বিরাজমান তথাকথিত শ্রেণী বৈষম্য ও ভেদাভেদনীতির শক্ত ছাচটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের পর তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন তার একটি উক্তি ছিল ঃ হে কুরায়শ সম্প্রদায়, আল্লাহ্ তা'আলা জাহিলিয়াতের দম্ভ এবং বংশভিত্তিক গর্বের মূলোৎপাটন করেছেন। সমগ্র মানুষ আদমের বংশধর এবং আদম মাটির তৈরী।

এটা শুধুমাত্র সাম্যের একটি শিক্ষা, ওয়ায বা নীতিবাক্য ছিল না, বরং ছিল তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রতিরোধ্য দলীল। দুনিয়ার সমগ্র মানুষ আদমের সন্তান। আদমই সবার আদি-পুরুষ। অতএব সবাই একই পরিবারের লোক। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে ছোটবড়, সাধারণ-অসাধারণ, প্রভু-ভৃত্য ইত্যাদি ভেদবৈষম্যের উদ্ভব হয় কি করে? প্রকৃতপক্ষে বর্ণ, বংশ প্রতিপত্তি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে মানুষের মধ্যে ভেদ বৈষম্যের সৃষ্টি তারাই করেছে, যারা মানবজাতির তথা নিজেদের মধ্যকার সম্বন্ধের বাস্তব দিকটি বেমালুম ভুলে বসেছে এবং স্বার্থপরতার ঘেরাজালে অবদ্ধ হয়ে মানবতার সর্বনাশ সাধনে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে মানুষের মর্যাদা নির্ণীত হয় তাদের পুণ্যকর্ম দ্বারা। যার পুণ্যকর্মের পাল্লা যত ভারি তার মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছে তত উচ্চে; চাই তার গায়ের রং কালো হোক কিংবা তার অবস্থা অস্বচ্ছল হোক। এক্ষেত্রে মূল পরিমাপক হচ্ছে পূণ্যকর্ম। যার পুণ্যকর্মের পরিমাণ কম তার গায়ের রং যত উজ্জ্বল হোক কিংবা তার ধনসম্পদ যত বেশী হোক, সে কখনো ঐ ব্যক্তির সমমর্যাদায় উন্নীত হতে পারে না, যার পুণ্যের পাল্লাভারী।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দরবারে যায়দ, উসামা, বিলাল ও অন্যান্য নিঃস্ব ব্যক্তিদের মর্যাদা ধনাঢ্য হযরত আব্বাস (রা)এর চাইতে (যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ আপন পিতৃব্য) মোটেই কম ছিল না। বদর যুদ্ধে আব্বাস

যখন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে মদীনায় আসেন তখন আনসারগণ তার ফিদিয়া মাফ করে দিতে চাচ্ছিলেন এই বলে যে, আব্বাসের পিতা হচ্ছেন আত্মীয়তার সম্বন্ধে আনাসরগণের ভাগ্নে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলে উঠেন, কখনো না, (এ ধরনের সম্বন্ধের অজুহাতে) তোমরা একটি দামও (কানাকড়িও) মাফ করে দিও না।

মসজিদ নির্মাণের কাজে তিনি সাহাবীদের সাথে রাতদিন কাজ করতে থাকেন। পরিখা খননেও তিনি সমানভাবে অংশগ্রহণ করেন। সফরের সময় সাহাবীগণ পরস্পর মিলেমিশে রান্নাবান্নার কাজ করতেন। তখন তিনিও বেকার বসে থাকতেন না। একদা তিনি রান্নার কাঠ সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন সাহাবীগণ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, এ কাজ আমরাই করে নেব। তখন তিনি (সা) উত্তরে বলেন, তোমাদের মধ্যে নিজেকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ভাবাটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বান্দাকে পছন্দ করেন না, যে নিজেকে আপন সঙ্গীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন করে তোলে।

বদর যুদ্ধ উপলক্ষে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা থেকে বের হন তখন সোয়ারীর এতই অভাব ছিল যে, এক একটি উট তিন তিন জন মুজাহিদের ভাগে পড়েছিল। তাঁরা পালাক্রমে একজন করে ঐ উটের উপর আরোহণ করতেন। অনুরূপভাবে হুযূর (সা)-এরও দুজন সঙ্গী ছিলেন। তাঁর সঙ্গীদ্বয় নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি সোয়ার থাকুন আমরা হেঁটেই যাব। তিনি বলেন, হাঁটার ক্ষেত্রে না আমি তোমাদের চাইতে দুর্বল, আর না পুণ্যের জন্য আমি তোমাদের চাইতে কম মুখাপেক্ষী।

এটি একটি বিখ্যাত ঘটনা যে, বনী মাখযূমের জনৈকা মহিলা চুরিতে ধরা পড়ে। কিছু লোক তাকে ছাড়িয়ে নিতে চাচ্ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তারা উসামা বিন যায়দ (রা) কে সুপারিশকারী হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে প্রেরণ করেন। তিনি (সা) উসামার বক্তব্য শুনে বললেন, তুমি কি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা ভঙ্গ করার জন্য সুপারিশ করছ? এরপর তিনি একটি ভাষণ দেন। তাতে বলেন, পূর্ববর্তী যুগের উম্মতরা ধ্বংস হয়েছে শুধু একারণে যে, যখন কোন বড় লোক ধরা পড়ত তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হত। আর যখন কোন সাধারণ লোক ধরা পড়ত তখন তাকে শাস্তি দেওয়া হত। আল্লাহ্র কসম, যদি মুহাম্মদের কন্য ফাতিমাও চুরি করত তাহলে এর শাস্তি স্বরূপ তার হাতও কাটা যেত।

টীকা ঃ

(১) সীরাতুন্নবী ঃ ষষ্ঠ খণ্ড।

(২) সীরাতে ইবনে হিশাম।

(৩) সীরাতুন্নবী ঃ ষষ্ঠ খণ্ড।

(৪) ঐ।

(৫) ঐ।

(৬) বুখারী ঃ কিতাবুল আদব।

(৭) সীরাতুন্নবী ঃ প্রথম খণ্ড।

(৮) সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুল আদাব।

মহান চরিত্র-৩

আত্মোৎসর্গ

উৎকৃষ্ট চরিত্র ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আত্মোৎসর্গের অর্থ আত্ম-স্বার্থ ত্যাগ করা অর্থাৎ প্রত্যেকটি ব্যাপারে নিজের সত্ত্বা তথা নিজের আপনজনের উপরও অন্যকে অগ্রাধিকার দান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ফাতিমা (রা) কে যে কিরূপ ভালবাসতেন তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। ফাতিমা (রা) যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন তখন তিনি আনন্দের আতিশয্যে দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁর কপালে চুমু খেতেন, নিজের আসনে তাঁকে বসাতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, বিশেষ কোন কাজে আসনি তো?

একদা কোন যুদ্ধে কিছু সংখ্যক দাসী মুসলমানদের হস্তা গত হয়। হযরত ফাতিমা (রা) এর তখন একজন দাসীর খুবই প্রয়োজন ছিল। কেননা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তাঁর কোন পরিচারিকা ছিল না। ফলে গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ তাঁকে একাই করতে হত। তিনি স্বয়ং চাক্কিতে আটা পিষতেন, পানির পাত্র ভরে নিয়ে আসতেন। এ কারণে তাঁর হাতে ফোস্কা এবং দেহে নীল বর্ণের দাগ পড়ে গিয়েছিল। যাহোক, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ঐ দাসীগুলো বন্টন করছিলেন তখন হযরত ফাতিমা (রা) সেখানে গিয়ে পৌছেন। হুযূর (সা) স্বভাবতই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কোন কথা আছে? তখন ফাতিমা (রা) নিজের অত্যধিক আত্মসম্মানবোধের কারণে মনের কথাটি বলতে পারেন নি। হযরত আলী (রা) তখন হযরত ফাতিমা (রা) এর পক্ষ থেকে কথাটি বলে ফেলেন। হুযূর (সা) উত্তর দেন, এখনো আসহাবে সুফ্ফার কোন ব্যবস্থা হয় নি। যতক্ষণ না তাদের একটা ব্যবস্থা হয় অন্য কারো সমস্যার দিকে তাকানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অপর বর্ণনায় আছে, হযরত যুবায়র (রা) এর মেয়েও অনুরূপ আবেদন নিয়ে এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলেন, বদরযুদ্ধে যারা য়াতীম হয়েছে তারা তোমার পূর্বেই অনুরূপ আবেদন করে বসেছে।

একদা তুহ্ফা (উপঢৌকন) স্বরূপ একটি চাদর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হস্তগত হয়। তখন এ ধরনের একটি চাদরের প্রয়োজনও তাঁর ছিল। তাই তিনি সেটি নিজের কাছে রেখে দেন। ঠিক সেই মুহূর্তে জনৈক ব্যক্তি তাঁর দরবারে এসে বলেন, আহা! চাদরটি কি সুন্দর! রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গে সঙ্গে চাদরটি গা থেকে খুলে তাকে দিয়ে দেন। সেই ব্যক্তি চাদর নিয়ে চলে যায়। লোকেরা তখন তাকে তিরষ্কার করেন এই মর্মে যে, তুমি জানতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কারো প্রার্থনা না-মঞ্জুর করেন না, এবং তুমি এটাও জানতে যে, তাঁর এই চাদরটির প্রয়োজন ছিল...। সেই ব্যক্তি তখন উত্তর দেন, আমি চাদরটি এজন্য গ্রহণ করেছি যাতে এটি আমার কাফন হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এর মাধ্যমে আমি বরকত ও কল্যাণের অধিকারী হয়।

জনৈক সাহাবীর কাছে তার ওয়ালীমা (বৌভাত) করার মত কোন বস্তু ছিল না। হুযূর (সা) তাকে বলেন, 'আয়েশার কাছে যাও এবং আটার টুকরীটি তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসো। তিনি তাই করলেন। অথচ সেদিন

সন্ধ্যা বেলা হুযূর (সা) এর নিজের খাওয়ার মত কোন জিনিস আর অবশিষ্ট ছিল না। একদা গিফারী গোত্রের কয়েকজন লোক এলে তিনি অবশেষে তাদেরকে বকরীর সেই সামান্য দুধটুকুও খাইয়ে দেন, যা খেয়ে তিনি স্বয়ং রাত কাটাতেন।

আত্মোৎসর্গের দুটি দিক রয়েছে। একঃ আরাম ও স্বস্তির অবস্থা। এই অবস্থায় অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতে হয়। দুইঃ আতংক ও সহনশীলতার অবস্থা। এই অবস্থায় নিজেকে অগ্রে এবং অন্যকে পেছনে রাখতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই দুই প্রকারের আত্মোৎসর্গই পরিদৃষ্ট্য হয়।

ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ঘৃণা

সওয়াল ও ভিক্ষাবৃত্তি মানুষের কার্যক্ষমতার জন্য বিরাট ক্ষতিকারক। এতে ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। মানুষ দৈহিক আরামপ্রিয় হয়ে যায়। পরিশ্রম করে হালাল উপার্জনের পরিবর্তে অসহায়তা ও কাতরতা অবলম্বনে করার মানুষের কাছে যাচ্না করে জীবিকা অর্জন করার ফলশ্রুতি এই দাঁড়ায় যে, এই জাতীয় লোকেরা মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার কোন আগ্রহ-উদ্দীপনা আর বাকী থাকে না। আর যে জাতির লোকের কাজকর্মের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে পড়ে ধরে নিতে হবে যে, তারা সম্মানিত ও অর্থবহ জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে।

যারা অক্ষম এবং প্রকৃত অর্থেই অভাবী তাদের কথা আলাদা; কিন্তু যারা নিজেদের গায়ে শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তিকে নিজেদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করে তারা শুধু নিজেদের জীবনে নয়, বরং সমগ্র জাতির জীবনে অসম্মান ও লাঞ্ছনা ডেকে আনে। এ কারণেই ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

একদা এক আনসারী রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে কিছু সওয়াল করেন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কিছু আছে? আনসারী বললেন একটি বিছানা ও একটি পেয়ালা আছে। তিনি বললেন, ঐ দু'টি জিনিস নিয়ে এসো। তিনি (সা) দুটি জিনিস দুদিরহামে বিক্রি করে দিলেন। এরপর আনসারীকে বললেন, তুমি এক দিরহাম দিয়ে কিছু আহার্য-সামগ্রী কিনে তোমার ঘরে দিয়ে এস এবং অপর দিরহাম দিয়ে রশি ইত্যাদি কিনে জঙ্গলে বের হয়ে পড় এবং সেখান থেকে লাকড়ী নিয়ে এসে বিক্রি কর। পনের দিন পর আনসারী রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে সাক্ষাত করলেন। তখন তাঁর হাতে ছিল দশটি দিরহাম। তিনি তা দিয়ে কিছু কাপড়-চোপড় ও কিছু আহার্য-সামগ্রী কিনেন এবং এভাবে হুযূর (সা) এর পবিত্র পরশে সমাজের একজন বেকার লোক একজন অতি কর্মচঞ্চল মানুষে পরিণত হন। হুযূর (সা) তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, কিয়ামতের দিন মুখে ভিক্ষার কলংক নিয়ে আল্লাহ্র দরবারে হাজির হওয়ার চাইতে এটা কি ভাল নয়?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং তা দিয়ে আঁটি বেঁধে জঙ্গল থেকে কাঠ নিয়ে এসে বিক্রি করে এবং এভাবে আল্লাহ্ তার সম্মান রক্ষা করেন–তাহলে এ অবস্থা নিশ্চয়ই তা থেকে ভাল যে, সে মানুষের কাছে সওয়াল করবে, তারা তাকে কিছু দিক আর না দিক।[১]

হাকীম বিন হাযাম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কিছু চাইলাম, তিনি দিলেন। এরপর চাইলাম, তিনি পুনরায় দিলেন এবং বললেন, এই মাল সবুজ সতেজ এবং মিষ্টিমধুর। যে এটাকে উদার মনে গ্রহণ করবে সে এ থেকে বরকত (কল্যাণ) পাবে এবং যে লোভাতুর মনে গ্রহণ করবে সে এ থেকে বরকত পাবে না। তার অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তির মত যে অনবরতঃ খেতে থাকে কিন্তু তৃপ্ত হয় না। উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাতের (গ্রহীতার হাতের) চাইতে শ্রেষ্ঠ।

হাকীম (রা) এরপর জীবনভর কারো কাছে কিছু চান নি[২]

মিসকীন সে নয়, যে মানুষের পেছনে পেছনে ঘুরে, কারো কাছ থেকে এক গ্রাস দু'গ্রাস কিংবা এক খেজুর দু'খেজুর পাওয়া গেলে তারপর অন্য দরজার দিকে ছুটে; মিসকীন সে-ই, যার কাছে এই পরিমাণ সম্পদ নেই যে, তা দ্বারা অভাবমুক্ত হওয়া যায়। তাছাড়া না কেউ তার অবস্থার কথা জানে যে, তাকে সদকা দেবে, আর না সে এমন যে, উঠে গিয়ে কারো কাছে কিছু চাবে।[৩] একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করেন যে, তিনটি জিনিস আল্লাহ্র কাছে অপছন্দনীয়। আর সেগুলো হলো, অনর্থক কথাবার্তা, সম্পদের অপচয় এবং মানুষের কাছে অত্যধিক যাচ্না করা।

তিনি (সা) এও বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে এই মর্মে প্রার্থনা করে যে, তিনি যেন তাঁকে যাচ্না বা ভিক্ষাবৃত্তির অপমান থেকে বাঁচান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা থেকে বাঁচিয়ে থাকেন। যে আল্লাহ্র কাছে প্রাচুর্য চায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রাচুর্য দান করেন এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দেন। আর মানুষকে যে ধনসম্পদ দেওয়া হয় তার মধ্যে ধৈর্যের চাইতে উৎকৃষ্ট সম্পদ আর কিছুই হতে পারে না।[৪]

বদান্যতা

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন–

كان النبى صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجود مايكون فى رمضان .

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবৎ মানুষের চাইতে অধিক বদান্য ছিলেন। আর তাঁর এ বদান্যতার অধিকতর বহিঃপ্রকাশ ঘটত রমযান মাসে।"[৫]

তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে কোন জিনিস চাওয়া হলে তিনি কখনো 'না' বলতেন না।[৬]

একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে কিছু একটা চাইলে তিনি বলেন, এখন আমার কাছে কিছু নেই। তুমি আমার সাথে চলো। তখন হযরত উমর (রা) সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, যখন আপনার কাছে কিছু নেই তখন ওকে নিয়ে গিয়ে কিছু দেওয়ার দায়িত্বও আপনার উপর বর্তায় না। কিন্তু অন্য আর এক ব্যক্তি সেখানে ছিলেন। তিনি বলে উঠেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি দিতে থাকুন, আরশের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে অভাবগ্রস্ত করবেন না। তাঁর একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) আনন্দের আতিশয্যে হেসে উঠেন।

একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে চার 'আওকিয়া' পরিমাণ রৌপ্য দান করে। তিনি এ থেকে তিনজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিন আওকিয়া দান করেন। চতুর্থ আওকিয়া নেবার মত কোন লোক সেদিন আসে নি।

রাতের বেলা হযরত 'আয়েশা (রা) লক্ষ্য করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ঘুম আসছে না। কখনো তিনি শয্যা ছেড়ে উঠেছেন এবং সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। এরপর পুনরায় কিছু সময় শুয়ে আবার উঠে সালাত শুরু করে দিচ্ছেন। হযরত আয়েশা (রা) তখন জিজ্ঞাসা করেন, আপনি ঘুমুচ্ছেন না কেন? হুযূর (সা) তখন ঐ রৌপ্যখণ্ড বের করে তাঁকে দেখান এবং বলেন, আমার ভয় হচ্ছে, আমার মৃত্যু এসে পড়ে এমতাবস্থায় যে, এটা (আওকিয়া) আমার কাছে রয়েছে।

একদা আবূ যর গিফারী (রা) হুযূর (সা) এর সঙ্গে ছিলেন। তখন হুযূর (সা) বলেন, হে আবূ যর, যদি উহুদ পাহাড়কেও আমার জন্য সোনা বানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমি কখনো পছন্দ করব যে, তিন রাত্রি অতিবাতি হয়ে যাবে এমতাবস্থায় যে, আমার হাতে এ থেকে একটি মাত্র দীনার অবশিষ্ট রয়ে গেছে। হ্যাঁ, যা আমি ঋণ পরিশোধের জন্য রেখে দেব। তা ছাড়া,[৭] উহুদ। একটি বিরাট পাহাড়। যদি তা স্বর্ণে রূপান্তরিত হয় তাহলে সেটাকে একদিনে

বন্টন করা মোটেই সম্ভব নয়। এজন্য কমপক্ষে তিনদিন সময় লাগবে। উপরোক্ত উক্তি দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। উপরোক্ত উক্তি দ্বারা এটাও পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, অত্যধিক বদান্যতার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই ঋণী থাকতেন। হাদীস গ্রন্থ সমূহে এ ধরনের অনেক ঘটনারই উল্লেখ পাওয়া যায়।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন–

ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولاشاةً ولا بعيراً ولا اوصى بشئ ۰

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ কালে না কোন দীনার রেখে গেছেন, না কোন দিরহাম, না কোন বকরী, আর না কোন উট-আর না তিনি ওসীয়ত করে গেছেন কোন জিনিসের জন্য।"

যখন তাঁর কাছে কিছুই অবশিষ্ট থাকে নি তখন কিসের ওসীয়তই বা তিনি করবেন?

সরল ও আড়ম্বরহীন জীবন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সমগ্র জীবন সরল ও আড়ম্বরহীন ভাবে কাটে। কোন প্রকার দামী আসবাব-সামগ্রী তার কাছে জড় করেন নি। তাঁর পোশাক, শয্যা, পানাহার তথা সব জিনিসই ছিল সরল ও সাধারণ। একখানি চাটাই, মামুলী বিছানা কিংবা মাটির উপর বসতেও তিনি সংকোচ বা কষ্টবোধ করতেন না। আদী বিন হাতিব (রা) যখন হুযূর (সা) এর খিদমতে হাযির হন তখন হুযূর (সা) তার দিকে খেজুর পাতায় ভর্তি একটি চামড়ার গদী এগিয়ে দেন এবং স্বয়ং মেঝেতে বসে পড়েন। আদী (রা) হুযূরের সামনে গদির উপর বসাকে শিষ্টাচার বিরোধী মনে করেন। তাই দুজনের মধ্যে কথোপকথন চলাকালে গদিটি মাঝখানে পড়ে থাকে। হুযূর (সা) বলতেন, ঘরে নিজের জন্য একটি, স্ত্রীর জন্য একটি এবং অতিথির জন্য একটি বিছানা থাকাই যথেষ্ট। চতুর্থ আর একটি থাকলে শয়তানই হবে তার অংশীদার।[৮]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন সহধর্মিনীদের জন্য যে সমস্ত ঘর তৈরী করে দিয়েছিলেন সেগুলো ছিল ১০ × ১২ ফুটের এক একটি কাচা দেওয়াল এবং কোন কোনটির ছিল মাটির দেওয়াল এবং খেজুর পাতার বেড়া। সেগুলো ছাদ ছিল খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরী। উচ্চতা এতটুকু ছিল যে, কোন মানুষ উর্ধবাহু হয়ে দাঁড়ালে তার হাত ছাদে গিয়ে ঠেকত। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিকের সময়ে মসজিদে নববীর আয়তন বৃদ্ধির জন্য যখন ঐ ঘরগুলো ভেঙ্গে ফেলার জরুরী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন মদীনাবাসীগণ আঝোরে ক্রন্দন করতে থাকেন। তাঁদের আবেদন ছিল, যেন কক্ষগুলোকে হুবহু সংরক্ষণ করা হয় যাতে বিশ্ববাসী যুগ যুগ ধরে দেখতে পায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দুনিয়ায় কিরূপ নির্লোভ, সহজ, সরল ও আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করতেন।

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফাতিমা (রা) এর ঘরে খাবারের জন্য আমন্ত্রিত হন। দোর গোড়ায় পৌছে দেখেন, দেওয়ালের উপর একটি পর্দা ঝুল্ছে। অতএব ভেতর প্রবেশ না করেই তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। হযরত আলী (রা) এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, কোন সজ্জিত ও জমকালো ঘরে প্রবেশ করা নবীর জন্য শোভা পায় না। হযরত 'অয়েশা (রা) এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন একটি যুদ্ধ উপলক্ষে মদীনার বাইরে গিয়েছিলেন। আর এই অবসরে হযরত আয়েশা (রা) তাঁর কক্ষের ছাদের সাথে একটি কাপড় বেঁধে দিয়েছিলেন। হুযূর (সা) ফিরে এসে ঐ কাপড়টি সেখান থেকে নামিয়ে ফেলেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এজন্য ধনসম্পদ দেন নি যে, আমরা ইট পাথরকেও পোষাক পরাবো।

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে একটি বুটিদার রেশমী ক'বা (লম্বা গাউন) হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুক্ষণ পরিধান করে তা খুলে ফেলেন এবং হযরত উমর (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। হযরত উমর (রা) কাঁদতে কাঁদতে তা নিয়ে আসেন এবং নিবেদন করেন, যে জিনিস আপনি নিজে পছন্দ করেন নি, তা আমাকে পরার জন্য দিয়েছেন? হুযূর (সা) বলেন, পরার জন্য নয়, বিক্রি করার জন্য দিয়েছি। হযরত উমর (রা) তখন তা দুহাজার দিরহামে বিক্রি করে দেন।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমার দিকটি ফুটিয়ে তোলার জন্য কেবল এই কথার উল্লেখই যথেষ্ট যে, তিনি জীবনে কখনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিশোধ নেন নি, বরং সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক য়াহূদীর কাছে ঋণী ছিলেন। য়াহূদীরা সর্বদাই পুঁজিবাদী হিসাবে চলে আসছে। তিন দিন পূর্বেই সে এসে তাঁকে ঋণ-পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করে। এমন কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার সুযোগ নিয়ে সে একথা উচ্চারণ করতেও দ্বিধা করে নি যে, আবদুল মুত্তালিবের গোষ্ঠীর লোকেরা ঋণ পরিশোধ না করার ব্যাপারে খুবই পটু। হযরত উমর (রা) ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি য়াহূদীকে কঠোরভাবে ধমক লাগান। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেসে বলেন, উমর, তোমার উচিত ছিল আমার সাথে এবং ঐ ব্যক্তির সাথে অন্য রকম ব্যবহার করা। আমাকে যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে বলতে এবং ওকে শিক্ষা দিতে কিভাবে সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যের কাছ থেকে ঋণ আদায় করতে হয়। এরপর তিনি হযরত উমর (রা) কে নির্দেশ দেন এই বলে যে-যদিও ঋণ পরিশোধের মেয়াদ এখনো তিন দিন বাকি-তবু তার ঋণ এখনি পরিশোধ করে দাও এবং তাকে বিশা' জিনিষ অতিরিক্ত দিয়ে দাও। আর তা এজন্য যে, তুমি তাকে কঠোরভাবে ধমকিয়েছ।[৭]

তায়েফের গোত্রপতিরা, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশকালে, হুযূর (সা) এর সাথে কিরূপ দুর্ব্যবহার করেছিল তা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তারা দুষ্টপ্রকৃতির যুবক-কিশোরদেরকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হুযূর (সা) এর উপর পাথর বর্ষণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ সম্পর্কে খোদ হুযূর (সা) এর উক্তি হলো, ঐ মুহূর্তে পাহাড় সমূহের ফিরিশতা আমার কাছে এসে বলেন, আপনি নির্দেশ দিলে ওদের উপর উভয় দিকের পাহাড় উল্টিয়ে দেব। হুযূর (সা) বলেন, না, আমি এই আশা পোষণ করি যে, ওদেরই ঘরে ভবিষ্যতে এমন সব লোক জন্মাবে যারা এক আল্লাহ্কেই মান্য করবে।

উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দাঁত মুবারক ভেঙ্গে যায় এবং তিনি আহত হন। এতদসত্ত্বেও তিনি এই মর্মে দু'আ করেনঃ হে আল্লাহ্, আমার জাতিকে সরল পথ দেখাও! তারা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ।

বিদায় হজ্জের খুতবায় রাসুলুল্লাহ্ (সা) জাহিলিয়া যুগের রক্তের দাবী ও সুদী ঋণ মওকুফ করে দেন। সর্বপ্রথম তিনি তার গোত্রের রক্তের দাবী অর্থাৎ রাবীআ ইবনুল হারিছের পুত্রের রক্তের দাবী রহিত ঘোষণা করেন। এবং চাচা আব্বাসের সুদের দাবী রহিত ঘোষণা করেন।

সাধারণ চরিত্র

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের জীবনে সুন্দর ব্যবহার, সাম্য, ন্যায় বিচার এবং অতিথি সেবার অনেক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তিনি ছিলেন লজ্জা, শালীনতা, দৃঢ়তা ও বীরত্বের এক জীবন্ত প্রতীক। তিনি বিশ্ববাসীর সামনে সমাজ জীবনের শ্রেষ্ঠতম নমুনা পেশ করে গেছেন। স্ত্রীদের সাথে সুন্দর ও শালীন ব্যবহার করার জন্য তিনি বার বার তাকীদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, যে তার পরিবারের কাছে শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেকটি প্রাণীর

প্রতিই তিনি ছিলেন দয়াশীল। অন্যের কাজ করে দেওয়ার জন্য তিনি সব সময় উন্মুখ থাকতেন। এক্ষেত্রে ছোট-বড় কোন পার্থক্য তিনি করতেন না। কারো কাছে দায়বদ্ধ থাকাটা তিনি পছন্দ করতেন না। হুযূর (সা) এর জন্য, হযরত আবূ বকর (রা)-এর চাইতে অধিকতর উৎসর্গীকৃত প্রাণ আর কে হতে পারে? খোদ হুযূর (সা) এর উক্তিঃ আমি আবূ বকরের সম্পদ ও সংসর্গ দ্বারা সর্বাধিক উপকৃত হয়েছি–এতদসত্ত্বেও হিজরত উপলক্ষে হযরত আবূ বকর (রা) যে উটটি হুযূর (সা) এর জন্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা তাঁর জন্য উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন–তিনি (সা) তা মূল্যের বিনিময়েই তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করেন। মসজিদে নববী যে জায়গায় নির্মিত হয়েছে সে জায়গার যারা মালিক তাঁদের পৃষ্ঠপোষকরা তা বিনা মূল্যে দান স্বরূপ গ্রহণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বার বার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা মূল্যের বিনিময়েই তাঁদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রেও তিনি জন সাধারনের সুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। যখন তিনি (সা) জানতে পারেন যে, মু'আয বিন জাবাল (রা) ফজরের সালাতে দীর্ঘ সূরাসমূহ তিলাওয়াত করে থাকেন তখন তিনি তাঁকে বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা সালাত পড়াবে তারা যেন কিরাত সংক্ষিপ্ত করে। কেননা মুক্তাদীদের মধ্যে বৃদ্ধ, দুর্বল, কর্মব্যস্ত সব ধরনেরই লোক থাকে।

অধিক প্রশংসা বা প্রশস্তি অপছন্দ করতেন। তিনি যখন ওযূ করতেন তখন তার হাত থেকে ঝরে পড়া পানিটুকু সাহাবীগণ তাঁদের অঞ্জলী পুটে তুলে নিয়ে কল্যাণ কামনার্থে তা নিজ নিজ দেহে মেখে নিতেন। হুযূর (সা) তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেন এরূপ করছ? তাঁরা নিবেদন করলেন, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের ভালবাসার কারণে করছি। তখন তিনি বললেন, যদি কেউ একথার উপর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় যে, সে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি ভালবাসার সম্পর্ক রাখবে তা হলে যেন সত্য কথা বলে, যখন তার কাছে আমানত অর্পণ করা হয় তখন সে যেন তাতে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়, আর যদি তার কোন প্রতিবেশী থাকে তাহলে সে যেন তার হক আদায় করে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাণী

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ বাণী এখানে উদ্ধৃত করা গেল। এ গুলোর মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা ও হুযূর আকরাম (সা) এর কর্মজীবন সম্পর্কে ধারণা হতে পারে।

১। তোমাদের মধ্যে কেউ যখন রূপে ও ঐশ্বর্যে তার চাইতে উৎকৃষ্টতর কারো দিকে তাকায় তখন তার উচিত ঐ ব্যক্তির দিকেও তাকানো, যে তার চাইতে নিকৃষ্টতর।১০

২। মুসলমান পরস্পর দয়া, ভালবাসা ও সহৃদয়তার ক্ষেত্রে একটি দেহ-সদৃশ। যখন দেহের একটি অংগ রোগাক্রান্ত হয় তখন তার জন্য গোটা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।১১

৩। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন ভাল কথা বলে, না হয় চুপ থাকে।১২

৪। পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং একে অন্যের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। হে আল্লাহ্র বান্দারা, পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকো। কোন মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে আপন ভায়ের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকবে।১৩

৫। সত্য ও সরলতা মানুষকে পুণ্যের দিকে পরিচালিত করে আর পুণ্য তাকে পৌছিয়ে দেয় জান্নাতে। মানুষ যখন সর্বদা সত্যকথা বলে তখন সে সিদ্দীকে (সত্যবাদীতে) পরিণত হয়। অনুরূপভাবে মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ তাকে পৌছিয়ে দেয় জাহান্নামে। মানুষ যখন সর্বদা মিথ্যা কথা বলতে থাকে তখন সে আল্লাহ্র কাছে কায্যাব (মিথ্যাবাদী) নামে পরিচিত হয়।১৪

৬। অন্যকে কুস্তিতে পরাজিত করার নাম বাহাদুরী নয়। বরং বাহাদুর হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে রাগের মুহূর্তেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।[১৫]

৭। সরল ও সঠিক পথ ধর, পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি কর এবং মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ পৌঁছিয়ে দাও। (অন্যকে সত্যের প্রতি আহ্বান না জানিয়ে) একা একা আমল করলে সে আমল কাউকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না।[১৬]

৮। যে খ্যাতিলাভের জন্য কাজ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করবেন। যে লোক দেখানোর জন্য কাজ করবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সামনে তার আসল স্বরূপ তুলে ধরবেন।[১৭]

৯। সাবধান! সন্দিগ্ধতাকে আপন ইবাদতে পরিণত করো না। সন্দিগ্ধতা তো মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়। ভিত্তিহীন কথার প্রতি কান দিও না। অন্যের দোষ তালাশ করো না। পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ পোষণ করো না।[১৮]

১০। বন্দীদের মুক্ত করে দাও, ভূখাদের খাবার দাও এবং রোগীদের দেখতে যাও।

১১। মানুষের জন্য (সবকিছু) সহজ করে দাও; তাদেরকে অসুবিধার মধ্যে ফেলো না; তাদেরকে সুসংবাদ দাও, পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি করো না; সবাই মিলে মিশে থাক।

১২। দু'টি নি'মাত (আল্লাহ্‌র দান) এমন আছে, যেঘুলোর মর্যাদা সম্পর্কে অধিকাংশ লোক অবহিত নয়। আর সে নি'মাত দুটি হচ্ছে সুস্থতা ও বদান্যতা।

১৩। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। পুণ্যবান ব্যক্তি করবে না এজন্য যে, (বেঁচে থাকলে) হয়ত সে আরো পুণ্যের কাজ করবে। আর পাপী ব্যক্তি করবে না এজন্য যে, হয়ত এই সুযোগে সে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

পাঁচটি জঘন্য আচরণ

পাঁচটি আচরণ এমনি যে, যদি এগুলো তোমাদের উপর আপতিত হয় তাহলে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি এই মর্মে যে; তোমরা যেন এগুলোতে অভ্যস্থ হয়ে না পড়।

১। কখনো এরূপ হয় নি যে, কোন জাতির মধ্যে অশ্লীল আচরণ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, জনসাধারণ প্রকাশ্যে তা করতে থাকল অথচ তাদের মধ্যে প্লেগ এবং ঐ সব রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হল না, যা তাদের বাপদাদা কোন দিন দেখে নি।

২। কখনো এরূপ হয়নি যে, কোন একটি জাতি মাপে-ওজনে কম দিতে শুরু করল অথচ সে জাতিকে দুর্ভিক্ষ অগ্নিমূল্য, অত্যধিক ক্লান্তি ও হয়রানি এবং শাসকদের জুলুম-অত্যাচার গ্রাস করল না।

৩। কখনো এরূপ হয় নি যে, কোন একটি জাতি তাদের সম্পদের যাকাত দেওয়া বন্ধ করল অথচ সে জাতিকে আকাশের বারিবর্ষণ থেকে বঞ্চিত করা হল না। যদি পশুপাখী না থাকত তাহলে তাদের উপর বারি বর্ষণ চিরতরেই বন্ধ হয়ে যেত।

৪। কখনো এরূপ হয় নি যে, কোন জাতি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল অথচ অন্য জাতিকে শত্রুতে পরিণত করে তাদের উপর জয়ী করা হল না এবং তারা এই জাতির ধন সম্পদের অন্তত একটি অংশও ছিনিয়ে নিল না।

৫। কখনো এরূপ হয় নি যে, কোন জাতির নেতা ও পথপ্রদর্শকরা আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিত্যাগ করে জবরদস্তিমূলক ভাবে আল্লাহ্‌র হুকুমের স্থলে নিজেদের হুকুম চালু করতে শুরু করল অথচ আল্লাহ্ তা'আলা সে জাতির মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ, হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য সমস্যাদির সৃষ্টি করলেন না।[১৯]

'নূরে হক' (সত্যের আলো) এর প্রতি আসক্তি

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ইসলামকে 'নূর' অর্থাৎ সত্যের আলো অ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমনঃ

اَلنُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهُ

"এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে"।

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَه لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّه ط

"আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উম্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার প্রতিপালকের আলোকে আছে"।

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ٠

"যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকে নিয়ে যান"।

পবিত্র কুরআনের কোন কোন জায়গায় 'নূর' শব্দ এমনভাবে এসেছে যে, কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে তাদ্বারা প্রধানতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। যেমনঃ

قَدْجَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ ٠

"আল্লাহ্র নিকট হতে এক জ্যেতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এর দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর আলোকিত অন্তরে 'নূরে হক' এর প্রতি কি পরিমাণ প্রেমাশক্তি ছিল তা নিম্নের দু'আ থেকে অনুমান করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিদিন এ দু'আ করতেন।

اللّٰهم اجعل فى قلبى نورا وفى بصرى نورا وفى سمعى نورا وفى يمينى نورا وعن يسارى نورا وفوقى نورا وامامى نورا وخلفى نورا واجعل لى نورا وفى لسانى نورا وفى دمى نوراً وفى عصبى نوراً وفى شعرى نوراً وفى بشرى نوراً اللّٰهم اعطنى نوراً اللهم اعظم لى نوراً اللهم اجعلنى نوراً ٠

"হে আল্লাহ্! আমার অন্তর আলোকিত কর, আমার চক্ষু আলোকিত কর, আমার কান আলোকিত কর, আমার ডান দিক আলোকিত কর, আমার বাম দিক আলোকিত কর, আমার উর্ধদিক আলোকিত কর, আমার নিম্নদিক আলোকিত কর, আমার সম্মুখ দিক আলোকিত কর, আমার রক্ত আলোকিত কর, আমার মাংসপেশী আলোকিত কর, আমার কেশরাশি আলোকিত কর এবং আমার চেহারা আলোকিত কর। হে আল্লাহ্! আমাকে আলো দান কর। হে আল্লাহ্! আমার আলো বাড়িয়ে দাও, হে আল্লাহ্! আমাকে আলোতে পরিণত কর।"

সুন্নাতে রাসূল (সা)

হযরত আলী (রা) হুযুর (সা) কে তাঁর সুন্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন ঃ

১। المعرفة رائس مالى —মারিফাত (আল্লাহ্র পরিচয় লাভ) হচ্ছে আমার মূল পুঁজি।

২। العقل اصل دينى —সুস্থবুদ্ধি হচ্ছে আমার দ্বীনের মূল।

৩। الحب اساسى —ভালাবাসা আমার ভিত্তি।

৪। الشوق مركبى —আগ্রহ আমার বাহন।

৫। الذكر انيسى —আল্লাহর যিক্‌র আমার আনীস (সাথী)।

৬। الثقة كنزى —আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা আমরা ভান্ডার।

৭। الحزن رفيقى —স্বজাতীদের মুক্তির জন্য মনে কষ্ট ভোগ আমার সাথী।

৮। العلم سلاحى —জ্ঞান আমার হাতিয়ার।

৯। الصبر ردائى —ধৈর্য আমার চাদর।

১০। والرضا غنيمتى —আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আমার জন্য গনীমত।

১১। الهجر فخرى —বিনম্রতা আমার গর্ব।

১২। الزهد حرفتى —সংসার বিমুখতা আমার পেশা।

১৩। اليقين قوتى —বিশ্বাস আমার খোরাক।

১৪। الصدق شفيعى —সত্যপরণয়তা আমার শফী' (সহচর)।

১৫। والطاعة حسبى —আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মধ্যে আমার সম্মান।

১৬। والجهاد خلقى —জিহাদ (সত্যের পথে কঠোর সংগ্রাম) আমার প্রকৃতি।

১৭। وقرة عينى فى الصلوة —সালাতের মধ্যেই আমার চোখের শীতলতা।

বিশ্ব ইতিহাসে কোন ব্যক্তির মধ্যে কি এরূপ সুন্দর স্বভাব ও উত্তম চরিত্রের সমাহার ঘটেছে, যে রূপ রাসূলুল্লাহ্ এর পবিত্র সত্তায় আল্লাহ্ একত্রিত করেছেন? এটাও সুস্পষ্ট যে, অন্য কোন ব্যক্তির প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেকটি আচার-আচরণ, প্রত্যেকটি কাজ এবং প্রত্যেকটি কথা প্রামাণিক পদ্ধতিতে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি, যেভবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে এক এক করে একত্রিত হয়েছে।

কত সত্য আল্লাহ্‌র কথা-

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ .

"যা আবর্জনা তা ফেলে দেওয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়।" (১৩:১৭)

টীকা ঃ

১। বুখারী ঃ কিতাবুয যাকাত।

২। বুখারী ঃ কিতাবুয যাকাত।

৩। বুখারী ঃ কিতাবুয যাকাত।

৪। বুখারী ঃ কিতাবুয যাকাত।

৫। বুখারী ঃ কিতাবুয যাকাত।

৬। ঐ।

৭। সহীহ্ মুসলিম।

৮। আবূ দাউদ।

৯। মরহুম কাযী সুলায়মান বলেন, আমাদের এখানকার ওজন মতে এক সা'= দু'সের সাড়ে তিন ছটাক। শেষ পর্যন্ত এই ঘটনা উক্ত য়াহূদীর ইসলাম গ্রহণের কারণে পরিণত হয়। মূলত: রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে লোকমুখে যা শুনেছিল তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই তাঁর সাথে অনুরূপ আচরণ করেছিল।

১০। বুখারী ঃ কিতাবুর রিকাক।

১১। বুখারী ঃ কিতাবুল আদাব।

১২। বুখারী ঃ কিতাবুল আদাব।

১৩। বুখারী।

১৪। ঐ।

১৫। ঐ।

১৬। বুখারী ঃ কিতাবুর রিকাক।

১৭। বুখারী।

১৮। রাহমাতুল লিল আলামীন ঃ পৃষ্ঠা - ৩৫৩।

১৯। সীরাতে ইবনে হিশাম।

মুহাম্মদী আদর্শের একটি অধ্যায়

ইহ্তিসাব[১]

'ইহতিসাব' এমন একটি সোনালী শিকল, যার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে তামাদ্দুন, সভ্যতা- সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, ধর্ম ও সামাজিকতার সমগ্র খন্ডাংশ তথা শাখা- প্রশাখা। যদি এর বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে তাহলে সংগে সংগে বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এ কারণেই বিশ্ব, ইতিহাসকে বিভিন্নরূপে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে টিকিয়ে রেখেছে। বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন রকমের এমন সব নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করা শুধু তিরষ্কারের কারণ নয়, বরং কোন কোন সময় সেটাকে মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্র এমন সব আইন-কানূন রচনা করেছে, যা মানুষকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাধীন প্রত্যেক প্রকারের জাগতিক, চারিত্রিক ও ধর্মীয় উন্নয়নের সুযোগ দিয়ে থাকে। বিজ্ঞজনেরা চরিত্রের এমনসব দর্শন ও রীতিনীতি আবিষ্কার করেছেন, যা সমগ্র মানুষকে চারিত্রিক নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণে বাধ্য করে।

আমাদের গর্বের পুঁজি

যদি ইউরোপ আপন সভ্যতার উপর এই বলে গর্ব করে যে, তা মানুষকে তার প্রত্যেকটি দোষত্রুটির উপর কঠোরভাবে পাকড়াও করে- অনুরূপভাবে যদি রোমানরা তাদের আইন ও গ্রীকরা তাদের দর্শনের উপর এই বলে গর্ব করে যে, সেগুলো মানুষের চারিত্রিক শক্তিকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করে- তাহলে আমাদের তাতে বিস্মিত হওয়ার বা দমে যাওয়ার কোন কারণ থাকবে না। আমরা তো দেশাচার বা রেওয়াজ-নীতির আজ্ঞাবহ দাস নই যে, ইউরোপের সামাজিক আইন-কানূনের প্রতি পাগলপারা হয়ে উঠব। আমরা কঠোর আইনের কড়াকড়ি সহ্য করে নিতেও অভ্যস্থ নই যে, নিজের হাতকে যে কোন হাতকড়ার কাছে সমর্পণ করব। বুদ্ধিগত কিয়াস ও অনুমান আমাদের আধ্যাত্মিক খোরাক নয় যে, গ্রীকদের গোলক ধাঁ-ধাঁয় ফেঁসে যাব। বরং আমাদের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরা ও মাংসপেশী একটি পবিত্র মাযহাবের শিকলে জড়িয়ে আছে। আমাদের গোশ্‌ত ও রক্তের উপর চামড়ার পরিবর্তে মাযহাবের চাদর লেপটে দেওয়া হয়েছে। আমাদের অন্তরকে একটি সুদৃঢ় ও অনড় ধর্মীয় চেতনা আন্দোলিত করে চলেছে। অতএব আমাদের উচিত মানুষের তৈরি সব রেওয়াজ-পদ্ধতি ও দর্শন-ফিলসফী বাদ দিয়ে নিজেদের লাগামটি শুধু ইসলামের হাতে তুলে দেওয়া এবং এজন্য গর্ববোধ করা।

উত্তম আদর্শ

মাযহারের ইহতেসাবী শক্তি মানব রচিত উপরোক্ত জিনিসসমূহের অনেক ঊর্ধে। একারণেই আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণকে আমাদের উপর ফরয করে দিয়ে আমাদেরকে সমগ্র দুনিয়ার বৈষয়িক ও চারিত্রিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" –(৩৩ ঃ ২১)

আল্লাহ্ তা'আলা একথা বলেন নি যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অনুসরণ করো, কেননা এক ব্যক্তির অনুসরণ করা হলে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের অনুসরণ করা থেকে নিষেধ করা হয় না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা একথা বলেছেন, তোমাদের অনুসরণ শুধুমাত্র এই পবিত্র সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেননা পুণ্যকর্ম সমূহের অনুরূপ ভাণ্ডার তোমরা অন্য কোথাও পাবে না। এই বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণকে অবশ্য কর্তব্য করে দেওয়া হয় নি, বরং সেই সাথে অন্যান্য সব বড় বড় মানুষের অনুসরণ করাকেও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা তিনিই হচ্ছেন একমাত্র সূর্য, যার আলো দুনিয়ার সব রকম অন্ধকারের মধ্যে আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারে।

কুরআন ও হাদীসের উক্তিসমূহ

এই সূর্য থেকে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রও আলো লাভ করে। একারণেই তার অনুসরণ করা আমাদের উপর ওয়াজিব।

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

"আমার যুগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। এরপর তাদের যুগ যারা এর পরে আসবে, তারপর তারা যারা এদের পরে আসবে।"

أَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ—"আমার সাহাবীরা আকাশের তারকারাজির ন্যায়।"

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বার বার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যেমন বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ.

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহী উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজীল, যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা দেয়, যিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করেন ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করেন।" (৭ ঃ ১৫৭)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ–

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।" (৩ ঃ ১১০)

কিন্তু এইসব আয়াতের বাস্তব ব্যাখ্যা আমাদেরকে কেবল হাদীস গ্রন্থাদিতে অনুসন্ধান করতে হবে। আর তা করলে আমরা দেখতে পাব, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ তাঁদের প্রত্যেকটি কাজে ও প্রত্যেকটি কথায় ইহ্‌তিসাবের উপর কী অসাধারণ গুরুত্বই না আরোপ করেছেন। আমরা আরো বুঝতে পারব, আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য যে সূর্য ও তারকাবাজি সৃষ্টি করেছিলেন, সেগুলো সর্বদা আলোক বর্তিকা হয়ে চলছে।

ইহ্‌তিসাবের কার্যক্রম শুরু হয় নিজের নাফস্ বা সত্তা থেকে এবং ক্রমে ক্রমে তা ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠী ও জাতিতে ছড়িয়ে পড়ে। আর এভাবেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ইহ্‌তিসাবের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন।

নাফ্‌স্ বা আত্মার সংশোধন

রাসূলে আকরাম (সা) এর পবিত্র সত্তা ছিল সর্বগুণে গুণান্বিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি এত বেশী পরিমাণ সালাত আদায় করতেন যে, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা মুবারক শুধু ফুলে উঠত না, বরং ফেটেও যেত। তাঁর এই কষ্টসাধ্য সাধনা প্রত্যক্ষ করে সাহাবীগণ নিবেদন করেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার অগ্র-পশ্চাৎ সব গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। অতএব আপনি কেন তাঁর ইবাদতে এভাবে মগ্ন থাকেন?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বলেন–اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا–"আমি কি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দাহ হব না?[২]

সুতরাং যখনি তাঁর সামনে এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হত, যা তাঁর অন্তরকে আল্লাহ্‌র দিক থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে কিংবা তাঁর অন্তরে দাম্ভিকতার সৃষ্টি করতে পারে তখনি তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে সে পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতেন। হযরত আয়েশা (রা) তাঁর ঘরের মধ্যে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, যার মধ্যে প্রাণীর ছবি অংকিত ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল তখন তিনি বলেন উঠলেন,

اميطى عنا قرامك هذا فانه لاتزال تصاويره تعرض فى صلاتى .

"তুমি আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দা সরিয়ে ফেল। কেননা এর ছবিগুলো সালাতরত অবস্থায় আমার সামনে আসতে থাকে।"[৩]

জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে উপঢৌকন স্বরূপ একটি রেশমী চোগা (লম্বা ঢিলা বহির্বাস) দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেটা পরিধান করে সালাত আদায় করেন। সালাত অন্তে অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে সেটা খুলে দূরে ছুড়ে মারেন এবং বলেন– لَايَنْبَغِىْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ . –এটা মুত্তাকীদের জন্য শোভা পায় না।[৪]

গর্ব ও অহংকারের উৎস

গর্ব ও অহংকারের উৎস হচ্ছে প্রশংসা ও প্রশস্তি। এই ব্যাধিটিই রাজা-বাদশাহ ও শাসকদেরকে দুনিয়ার সব কিছু থেকে শ্রেষ্ঠতমে পরিণত করেছে। যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, কিন্তু কেউ তাঁকে পূর্ববর্তী নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করতে চাইলে তিনি তাতে বাধা প্রদান করতেন। এক সাহাবী ও জনৈক য়াহূদীর মধ্যে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। সাহাবী রাগান্বিত হয়ে বলেন, কসম সেই আল্লাহ্‌র, যিনি মুহাম্মদ (সা) কে সমগ্র দুনিয়ার চাইতে শ্রেষ্ঠতর করে সৃষ্টি করেছেন। উত্তরে য়াহূদীও বলে উঠে, কসম সেই আল্লাহ্‌র, যিনি মূসা (আ) কে সমগ্র দুনিয়ার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। সাহাবী একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে য়াহূদীর মুখে একটি থাপ্পড় বসিয়ে দেন। য়াহূদী উক্ত সাহাবীর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট অভিযোগ পেশ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ দেন, তোমরা আমাকে মূসার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না।[৫]

গোত্র ও খান্দানের ক্ষেত্রে ইহতিসাব

ভাল কাজের সূচনা করতে হয় নিজের ঘর থেকেই। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেন— وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ –"আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।" (২৬ ঃ ২১৪)

যখন এই আয়াত নাযিল হয় তখন তিনি আপন বংশ ও গোত্রের সব লোকদের একত্রিত করে রাসূলসুলভ ভঙ্গিতে বলেন–

يامعشر قريش يَامعشر عبد مناف ! يامعشر قصى ! يامعشر بنى عبد المطلب ! .....

"হে কুরায়শ বংশের লোক, হে বনী আবদে মানাফের লোক, হে বনী কুসাইয়ের লোক, হে বণী আব্দুল মুত্তালিবের লোক, হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, তোমরা সবাই নিজেরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। কেননা আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না এবং অপকারও করতে পারব না। হে ফাতিমা, তোমার সাথে আমার শুধুমাত্র জনক-জাতকের সম্বন্ধ আছে। আর এই সম্বন্ধকে আমি শুধুমাত্র দুনিয়ায়ই সজীব সতেজ রাখতে পারব।[৬] এটা ছিল পুণ্যকর্মের প্রতি একটি সাধারণ উৎসাহ দান। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন সহধর্মিণী ও পরিবার পরিজনকে ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতেন।

উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একরাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘুম থেকে জাগ্রত হন এবং বলেন, সুব্হানাল্লাহ্, আসমান থেকে ফিত্না-ফাসাদের বারি বর্ষিত হচ্ছে এবং বরকত ও কল্যাণের ভাণ্ডার খুলে দেওয়া হয়েছে। কক্ষসমূহে নিদ্রিতাদের (রাসূলের সহধর্মিণীদের) জাগিয়ে দাও। কেননা দুনিয়ার অনেক বস্ত্রপরিহিতা স্ত্রীলোক (পুণ্যার্জ্জন না করার কারণে) আখিরাতে বিবস্ত্র অবস্থায় পরিদৃষ্ট হবে।[৭]

সদকা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার ব্যবস্থা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন পবিত্র চিত্ততা ও সংসার বিমুখতার কারণে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন সত্ত্বেও নিজের এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য সদকা গ্রহণ হারাম করে দিয়েছিলেন।

বাল্যকালে ইমাম হুসাইন (রা) একদা সদ্কার একটি খেজুর উঠিয়ে আপন মুখে তুলে নিতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন, 'কাখ, কাখ' (অর্থাৎ ছি, ছি, মুখ পরিষ্কার কর।) তুমি কি জান না আমাদের খান্দানের লোক সদকা খায় না।'[৮]

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতের বেলা হযরত আলী ও হযরত ফাতিমা (রা)-এর কাছে আসেন এবং তাঁদেরকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা কি রাতে উঠে তাহজ্জুদ পড় না? হযরত আলী উত্তর দেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমাদের নিদ্রা ও জাগরণ তো আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। তিনি যদি জাগিয়ে দেন তাহলে আমরা জাগবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন নীরব হয়ে যান। কিন্তু আক্ষেপের সাথে আপন হাত দ্বারা উরুদেশে আঘাত করেন ও নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন– وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً –"মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।"[৯] (১৮:৫৪)

জাতির ইহতিসাব

যদিও ঐ সব বিচ্ছিন্ন অবস্থা ও পরিবেশ, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহ্তিসাবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তা জাতীয় ইহতিসাবেরই অন্তর্ভুক্ত; তবু দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যন্ত বলিষ্ঠ উপমার সাথে তিনি জাতির সামনে তাঁর এই বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। একদা তিনি বলেন–

"আমার এবং আমার শরীআতের উপমা হুবহু ঐ ব্যক্তির মত, যে একটি জাতির কাছে এসে এই আতংকজনক সংবাদ দিল যে, আমি নিজ চোখে একটি শত্রু বাহিনীকে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখেছি। আমি একজন 'নাংগা ভয় প্রদর্শনকারী' (অর্থাৎ আমার এই ভয় প্রদর্শনের মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নেই) অতএব তোমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এরপর একটি দল তাঁর কথা শুনল এবং রাত পোহাবার আগেই সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের রক্ষা করল, কিন্তু অন্যান্যরা তার উপর মিথ্যা আরোপ করল এবং তার কথায় কান দিল না। ফলে শত্রুবাহিনী এসে তাদের উপর হামলা চালাল এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দিল।"

আমার এবং সমগ্র লোকের উপমা ঐ ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালিয়েছে। যখন আগুনের আলো চতুর্দিকে প্রসারিত হল তখন কীটপতঙ্গ ছুটে এসে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। সে কীটপতঙ্গকে আগুন থেকে রুখে রাখতে চাইল। কিন্তু ওদের সবাইকে সে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারল না। ফলে তারা আগুনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অনুরূপভাবে আমি তোমাদের কোমর ধরে টানি যাতে তোমরা আগুনে ঢুকে না পড়। কিন্তু মানুষ তাতে ঢুকেই পড়ে।[১০]

আকায়িদ সংশোধন

আকায়িদ সংশোধনই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নুবুওয়াতের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। আকায়িদের ক্ষেত্রে জঘন্যতম বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু শিরকের মূলোৎপাটনের জন্য সংগ্রাম করেছেন, যা হচ্ছে ইহতিসাবের শেষ পর্যায়। কিন্তু এছাড়া অরো অনেক আকায়িদ আছে, যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। যদি সাধারণ মানুষকে এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে ধর্মীয় আকায়িদের ক্ষেত্রে যে স্বাভাবিক সারল্য রয়েছে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এই সারল্যই হচ্ছে ইসলামের সবচেয়ে বড় অলংকার। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এটিকে মুসলমানদের একটি বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করেছিলেন এইজন্য যে, তারা যেন অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে নিজেদের সময় নষ্ট না করে। তাই দেখা যায়, নুবুওয়াতযুগে যখন এ ধরনের কোন বিষয় সামনে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবা কিরামকে অত্যন্ত কঠোরভাবে তা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

ভাগ্য

একদা সাহাবা কিরাম ভাগ্য সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করছিলেন। এই তর্ক বিতর্কই পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে দু'টি বিরাট (জাবরিয়া ও কাদরিয়া) দলের সৃষ্টি করেছিল। ঐ তর্ক-বিতর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চেহারা রাগে লাল হয়ে যায়। তিনি বলেন–

بهذا امرتم او لهذا خلقتم؟ تضربون القران بعضه ببعض بهذا هلكت الامم قبلكم .

"তোমাদেরকে কি এধরনের তর্ক-বিতর্ক করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, নাকি এজন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরা কুরআন শরীফের এক আয়াতের সাথে অপর আয়াতকে ঘুলিয়ে দিচ্ছো। এ ধরনের অনর্থক বিষয়াদিই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করেছে।"

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ

ইসলাম যদিও আরবের জাহিলিয়া যুগের কুসংকার-মিশ্রিত আকীদাসমূহের মূলোৎপাটন করেছিল তা সত্ত্বেও কিছু কিছু বিষয় বাকী ছিল। কখনো কখনো তা প্রকাশও পেত। আরবদের বিশ্বাস ছিল যে, যখন কোন মহান ব্যক্তির মৃত্যু হয় তখন সূর্যে গ্রহণ লাগে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্তান ইবরাহীম (রা) যেদিন ইন্তিকাল করেন, ঘটনাচক্রে সেদিন সূর্যে গ্রহণও লেগেছিল। লোকেরা ধারণা করে বসল যে, এটা হযরত ইবরাহীম (রা) এর মৃত্যুর কারণেই ঘটেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গে সঙ্গে তাদের এ ধারণাকে ভ্রান্ত আখ্যা দেন এই বলে যে, কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্রে সূর্যে গ্রহণ লাগে না।

ইবাদত

যেহেতু ইবাদত ছিল নিত্যদিনকার ব্যাপার; এজন্যে তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অনিয়ম সৃষ্টি হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। তাই এগুলো সম্পর্কে প্রায়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ইহ্তিসাবের (হিসাব নিকাশ গ্রহণের) প্রয়োজন দেখা দিত। সালাত আদায়ের জন্য ইসলাম, জামাআতকে ওয়াজিব করে দিয়েছিল। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক এক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করতো। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে জামাআতের মধ্যে তালাশ করেন, কিন্তু পান নি। তাই তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলেন, মন বলছে, কোন এক ব্যক্তিকে ইমাম বানিয়ে স্বয়ং ওদের ওখানে চলে যাই এবং কাঠের স্তূপ রচনা করে ওদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিই।[১১]

সালাত সংক্ষিপ্ত করণের উপর গুরুত্ব আরোপ

কিছু লোক যখন সালাতে ইমামতী করতেন তখন সালাতকে দীর্ঘায়িত করতেন। এতে কর্মব্যস্ত ও দুর্বল লোকেরা অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। একদা জনৈক ব্যক্তি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং বলেন, তোমরা ধর্মের ব্যাপারে মানুষকে বিরক্ত করে তুলছ। ইমামের উচিত সালাতকে সংক্ষিপ্ত করা। কেননা এতে রোগাক্রান্ত, দুর্বল, ব্যবসায়ী সব ধরনের লোকই অংশ গ্রহণ করে থাকে।[১২]

সালাতের মধ্যে খুশূ' (বিনয় প্রকাশ)

সালাতের আসল লক্ষ্য হচ্ছে খুশূ' ও খুযূ' (বিনয় প্রকাশ)। তাই কারো কর্মধারায় বা ভাব ভঙ্গিতে এর প্রকাশ না ঘটলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সতর্ক করে দিতেন। একদা জনৈক ব্যক্তি অত্যন্ত তাড়াহুড়ার মধ্যে সালাত আদায় করতে লাগলো। যখন তার সালাত শেষ হল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সম্বোধন করে বললেন, আবার সালাত আদায় কর। তুমি তো সালাত আদায় করই নি। এভাবে সেই ব্যক্তি তিনবার সালাত আদায় করলো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিবারই তাকে টুক্‌লেন। শেষ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি বলেই ফেললো- এর চাইতে ভাল সালাত আমি আদায় করতে পারব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে তাকবীর, কিরাআত, রুকূ, সিজদা, কিয়াম ও কু-উদের সেই সব পদ্ধতি বাতলে দিলেন, যেগুলোর মাধ্যমে স্বস্তি, শান্তি, গাম্ভীর্য ও যথাযথ বিনয়ভাব প্রকাশ পায়।[১৩]

ছোটখাটো বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি

ইবাদাত ও ইবাদাত সম্পর্কিত ছোটখাটো এবং মামূলী বিষয়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে সাবধান করে দিতেন। এক সফরে আসরের সালাতের সময় এসে যায়। সাহাবা কিরাম পা মাসেহ্ করে নেন। তিনি তা দেখে দূর থেকে সজোরে বলেন (بخارى) ويل للاعقاب من النار (পায়ের গোড়ালীর জন্য রয়েছে আগুন)।

ইসলামের সূচনাকালে সালাত আদায়ের পদ্ধতি প্রাথমিক পর্যায়েই ছিল। খুটিনাটি বিষয়গুলো তখনো পরিস্ফুট হয়নি। প্রতিটি শিক্ষায় দীনের এরূপ ক্রমোন্নতি প্রদান করা হত। বর্তমান অবস্থা যুগের পরিবর্তনের পর এসেছে।

সুতরাং ঐ সময়ে বেশীর ভাগ লোক মসজিদের মধ্যেই থুথু ফেলতেন। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদের মধ্যে যখন থুথুর দাগ দেখলেন তখন স্বয়ং উঠে গিয়ে নিজেরই পবিত্র হাত দিয়ে সেগুলো মুছে ফেললেন। এরপর বললেন, সালাতের মধ্যে প্রত্যেক লোক আল্লাহ্র সাথে চুপি চুপি কথা বলে। অতএব কারো জন্য উচিত নয়, কিবলার দিকে থুথু ফেলা। তবে হ্যাঁ, ডানেবামে অথবা নিজের পায়ের নীচে তুথু ফেলতে পারে।[১৪]

এখানে একথা পরিষ্কার হওয়া চাই যে, তখন মসজিদের মেঝে পাকা ছিল না। ভূতল ছিল সাধারণভাবে বালুকাময়। তাই তা সর্বপ্রকারের আদ্রতা সহজেই চুষে নিতে পারত। কিন্তু বর্তমান যুগে মসজিদসমূহের শুধু মেঝে নয় বরং আঙ্গিনাও পাকা। এমতাবস্থায় মসজিদের পরিচ্ছন্নতা ও সালাত আদায়কারীদের সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য না রেখে মসজিদের ভেতরে থুথু ফেলা নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজ।

বিদ'আত

বিদ'আত হচ্ছে ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি ভয়ংকর ব্যাধি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর যুগে মুসলমানগণ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হতেন না। একদসত্ত্বেও জাহিলিয়া যুগের অনেক রীতিনীতির স্ফুলিঙ্গ কখনো কখনো পরিদৃষ্ট হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ধরনের বিদ'আত মিটাতে সদা সতর্ক থাকতেন।

পায়ে চলার শপথ

বিদ'আত বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। এর নিকৃষ্টতম আকার হচ্ছে 'রাহবানিয়াত' বা সন্ন্যাসবাদ যা য়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়ে আছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ .

"আর সন্ন্যাসবাদ-এটা তো ওরা নিজেরাই প্রবর্তন করেছিল, আমি ওদেরকে এর বিধান দেই নি।" (৫৭ : ২৭)

যেহেতু আরবে য়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় প্রভাব ছিল প্রকট তাই সেখানেও এ ধরনের বিদ'আত বিস্তার লাভ করেছিল।

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখলেন, এক বৃদ্ধ তার দুই ছেলের কাঁধের উপর হাত রেখে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি? লোকেরা বলল, "সে পায়ে চলার মানত করেছে এবং দুর্বতার কারণে ছেলেদের কাঁধের উপর ভর করে চলছে"। তিনি বললেন,"সে কেন নিজেকে এই শাস্তিতে নিক্ষেপ করল? আল্লাহ্ তো এ জিনিসের মুখাপেক্ষী নন।"

পায়ে হাটার মানত

উকবা বিন আমিরের বোন কা'বা শরীফ পর্যন্ত খালি পায়ে হেঁটে যাবার মানত করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য উক্বাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, সে সওয়ারীর উপরও যেতে পারে।[১৫]

সব সময় দাড়িয়ে থাকা এবং কারো সাথে কথা না বলার মানত

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং লোকেরা অত্যন্ত স্বস্তির সাথে বসে তা শুনছিলো। কিন্তু একটি লোক দাঁড়িয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা), এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন জানা গেল, সে এই মর্মে মানত করেছে

যে, সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকবে, ছায়ায় বসবে না, কারো সাথে কথা বলবে না এবং সব সময় রোযা রাখবে। রাসূলুল্লাহ্ তখন নির্দেশের সুরে বললেন, এর বসা উচিত, ছায়ায় আসা উচিত, লোকদের সাথে কথা বলা উচিত এবং রোযাও পূর্ণ করা উচিত।[১৬]

নাকা লাগানো

রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখলেন, এক লোক তার নাকে নাকা লাগিয়ে কা'বা শরীফ তাওরাফ করছে। তিনি তখন তার নাকের রশি কেটে দিলেন এবং বললেন, হাত ধরে একে তাওয়াফ করাও।[১৭]

বাড়াবাড়িমূলক ধর্মীয় প্রবণতা

কিন্তু এই বিদ'আতের চাইতেও অধিক জরুরী ছিল ঐ সব রীতিনীতির মূলোচ্ছেদ, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে বিদ'আত সৃষ্টি হয়। আর বিদ'আতের সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে বাড়াবাড়িমূলক ধর্মীয় প্রবণতা। এ কারণেই ইসলাম আপন ইবাদতের নিয়মকানূনকে অত্যন্ত সহজসরল পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠা করেছে। এই দিক দিয়ে যদিও স্বয়ং ইসলামের ভিত্তি প্রস্তর বিদ'আতের উপর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না, তবু সূচনাপর্বে সাহাবীদের একটি উৎসাহী ও একনিষ্ঠ দল অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে ইবাদতে নিমগ্ন থাকতে চাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন একদিন অন্তর অন্তর রোযা রাখতে শুরু করলেন তখন অধিকাংশ সাহাবীও এক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের এই কাজকেও বিদ'আতের ভূমিকা হিসাবে বিবেচনা করলেন। তাই তিনি সাহাবীদেরকে এক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা থেকে বারণ করলেন। এতদসত্ত্বে লোকেরা যখন বিরত হল না তখন তিনি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীত কোন রূপ বিরতি ছাড়া এক নাগাড়ে রোযা রাখতে শুরু করলেন এই ভেবে যে, লোকেরা ভয় পেয়ে গিয়ে আপনা আপনি তা থেকে বিরত থাকবে।[১৮] এরই ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) কে অধিক সিয়াম ও সালাত থেকে বিরত রেখেছিলেন। এরই ভিত্তিতে হযরত সালমান (রা) হযরত আবুদ দারদা (রা) কে অত্যধিক যুহ্দ (সংসার বিমুখতা) থেকে বিরত থাকতে বললে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সে কথাকে সমর্থন করেছিলেন।[১৯]

রসম ও রেওয়াজ

রসম ও রেওয়াজ সমাজে যখন দৃঢ়মূল হয়ে পড়ে তখন বিদ'আতের মত সেগুলোকে পরিত্যাগ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এগুলো বিদ'আতের চাইতে কম ক্ষতিকারক নয়। আর সব চাইতে আশংকার ব্যাপার হলো, কোন কোন সময় এই সব রসম-রেওয়াজও ধর্মীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে যায়।

আরবে এমন অনেক ক্ষতিকারক রসমের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল, যেগুলোর অনুসরণ করাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করা হত। তাই বিদ'আতের সাথে সাথে এগুলোকেও অপনোদন করা হয়।

মৃতের জন্য মাতম

আরবরা সাধারণভাবে ছিল উচ্ছ্বাস-প্রবণ। তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে যারপর নেই প্রভাবিত হত। আর এর বহিঃপ্রকাশ ঘটত নানাভাবে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে সাধারণভাবে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, তারা নিজেদের চেহারায় আঁচড় কেটে, মাথার চুল মুণ্ডিয়ে, জামাকাপড় ছিড়ে, স্বামীর মৃত্যু হলে বছরের পর বছর বিশেষ বিশেষ বাধ্যবাধকতার অধীন ঘরের বাইরে অবস্থান পূর্বক অহোরাত্র মাতম করে শোক প্রকাশ করত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত কঠোরভাবে এই সব রীতিনীতির মূলোৎপাটন করেন। ব্যক্তিগত পরিস্থিতি ছাড়াও সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগতভাবে মাতম করা হত। অর্থাৎ গোষ্ঠীর বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক একত্রে সমবেত হয়ে মৃতব্যক্তির সদ্‌গুণাবলী

বর্ণনা করত এবং একসাথে সুর করে কাঁদত। এই রসমকে বলা হত নায়াহা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর যুগেও এই রসমের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু যখনি তাঁর সামনে অনুরূপ ঘটনা ঘটত তিনি তা থেকে বিরত থাকার জন্য স্ত্রীলোকদেরকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করে দিতেন।

হযরত আবূ সালমা (রা) এর শাহাদত

হযরত উম্মে সালমা (রা) এর কাছে যখন তাঁর স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, হায়! সফরের অবস্থায়ই মুসাফিরের অন্তর্ধান হলো। আমি তাঁর জন্য এমনভাবে কান্নাকাটি করব যে, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি যখন দাঁড়ান তখন আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী আরো একজন স্ত্রীলোক তার সাথে মাতমে শরীক হওয়ায় ইচ্ছা প্রকাশ করে। যখন এই অবস্থা চলছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলে উঠেন, তোমরা কি এই ঘরের মধ্যে সেই শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটাতে চাও, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন।[২০]

হযরত জাফর (রা) এর শাহাদত

যখন হযরত জা'ফর বিন আবু তালিব (রা)-এর শাহাদতের খবর এসে পৌঁছে তখন তার পরিবারের মেয়েরা অনুরূপ পদ্ধতিতে নাওহা (মাতম) করতে শুরু করেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে এই সংবাদ দেন। তিনি তাকে হুকুম দেন, তুমি ওদেরকে বিরত রাখ। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার তাকে পাঠান। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয় নি। অতএব তিনি তৃতীয়বারের মত তাকে পাঠিয়ে বলেন, তুমি এবার গিয়ে ঐ স্ত্রীলোকদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর।[২১]

জানযার বিভিন্ন রসম

সে যুগে জানাযার ক্ষেত্রেও এ ধরনের বিভিন্ন রসমের সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, আরবরা জানাযার সাথে সওয়ারির উপর আরোহণ করে যেত। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখলেন, কিছুলোক একটি জানাযার সাথে সওয়ারির উপর আরোহণ করে যাচ্ছে। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা কি জাহিলিয়া যুগের রীতি অনুসরণ করছ?[২২]

স্ত্রীলোকদের জানাযায় অংশ গ্রহণ

জানাযায় স্ত্রীলোকেরাও সাধারণত: শরীক হত। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোককে বসে থাকতে দেখে বললেন, তোমরা বসে আছ কেন? তারা উত্তর দিল, একটি জানাযার অপেক্ষায় আছি। তিনি বললেন, তোমরা কি তাকে গোসল করাবে? তারা সবাই উত্তর দিল, না। তিনি বললেন, লাশ কি কাঁধে করে নিয়ে যাবে? তারা সবাই উত্তর দিল, না। এরপর তিনি বললেন, তাহলে কি লাশ কবরে রাখবে? তারা উত্তর দিল, না। এবার তিনি বললেন, তা হলে ফিরে যাও।[২৩]

গর্ব ও দাম্ভিকতা নিষিদ্ধ

আরবের আত্মগর্বী লোকেরা প্রকাশ্য জনসমাবেশে নিজেদের বাপ-দাদার কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাদি বর্ণনা করত। এমন কি হজ্জের সময়েও এই রীতি পুনরুজ্জীবিত করা হত। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ط

"এরপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তার চাইতেও অভিনিবেশ সহকারে।" –(২ ঃ ২০০)

অর্থাৎ তোমরা জাহিলিয়া যুগে হজ্জ সমাপানান্তে মিনা প্রান্তরে একত্রিত হয়ে কবিতা, লোকগাথাঁ ইত্যাদির মাধ্যমে তোমাদের পূর্বপুরুষদের শৌর্যবীর্য যেভাবে বর্ণনা করতে তার চাইতেও অধিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কে স্মরণ কর।

চরিত্র সংশোধন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নুবুওয়াত-মিশনের মূল লক্ষ্য ছিল চরিত্র সংশোধন ও আত্মা পবিত্রকরণ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি হলো- إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ -"আমি চরিত্রে পরিপূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপরোক্ত লক্ষ্য সামনে রেখে চলতেন। চরিত্র সংশোধনের যে সব মূলনীতি তিনি রচনা করেছিলেন সেগুলো ছাড়াও ছোটখাট অনেক ব্যাপারে তিনি মানুষের আচার-আচরণ শুধরে দিতেন। হাদীসে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তি

গরীব ও অসহায়দের সাহায্য করার জন্য ইসলাম যাকাত ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল। কেননা কিছু কিছু লোক বিশেষভাবে এই সাহায্যের প্রত্যাশী ছিলেন। তবে ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে একটি জঘন্য পেশা বলে ঘোষণা করেছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সবল সক্ষম লোকদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত রাখতেন।

জনৈক আনসারীর দৃষ্টান্ত

একবার এক আনসারী তাঁর কাছে কিছু চাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ঘরে কি কিছু পুঁজি আছে? তিনি বললেন, একটি চট আছে, যা আমি গায়ে দেই এবং বিছানারূপে ব্যবহার করি-আর একটি পেয়ালা আছে, যা দিয়ে পানি পান করি। হুযূর (সা) বললেন, তা-ই নিয়ে এসো। তিনি নিয়ে এলেন। তিনি সকলের সামনে তা বিক্রির জন্য তুলে ধরলেন। জনৈক সাহাবী এক দিরহামে ক্রয় করতে চাইলেন। অন্য এক সাহাবী দুই দিরহাম দিয়ে বর্ধিত মূল্যে ক্রয় করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) দু দিরহাম আনসারীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এক দিরহাম দিয়ে খাবার কিনে তা তোমার ঘরে দিয়ে এসো এবং অপর দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার কাছে নিয়ে এসো। তিনি তাই করলেন। তিনি আপন পবিত্র হস্ত দিয়ে তাতে একটি কাঠ (হাতল) লাগিয়ে দিয়ে বললেন, জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাট এবং বিক্রি কর। আর আজ থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত আমি যেন তোমার চেহারা না দেখি। আনসারী জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করলেন। এতে দশ দিরহাম তার হাতে এল। এই দিরহামগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাজির হলেন। তিনি বললেন, এই অর্থ দিয়ে কিছু খাবার ও কিছু কাপড় কিনে নাও। এটা ভিক্ষাবৃত্তির চাইতে অনেক ভাল। ভিক্ষাবৃত্তি হচ্ছে মানুষের চেহারার একটি কলংক। এটা শুধুমাত্র পঙ্গু লোকদের জন্য বৈধ হতে পারে।[২৪]

উৎকোচ গ্রহণ

ঘুষখোরী হচ্ছে ন্যায় ও ইনসাফের ধ্বংস এবং কলুষিত আত্মার অত্যাচারের সবচেয়ে বড় কারণ। নুবুওয়াত যুগে যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রত্যক্ষ পরশে সাহাবা কিরামের চরিত্র কাঠামো ছিল অত্যন্ত উন্নত ও সুদৃঢ়। তাই সে যুগে ঘুষখোরীর কোন ঘটনা ঘটে নি। তবে কারো কাজকর্মে ঘুষখোরীর সন্দেহ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেজন্য তাকে সাবধান করে দিতেন। বিচারক ও সরকারী কর্মচারীদেরকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে উপহার-উপঢৌকন রূপে ঘুষ প্রদান করা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর যুগেও এ ধরনের ঘটনা কখনো কখনো ঘটেছে।

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয্দ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে যাকাতের মাল রেখে বললেন, এই পরিমাণ হচ্ছে মুসলমানদের মাল। আর এই পরিমাণ আমাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এ ধরনের উপহার ঘুষের মাধ্যম হতে পারত, আর এটাকে প্রকাশ্যে বন্ধ না করলে এই পদ্ধতিতে অন্যান্য লোকেরাও অন্যায়ভাবে উপকৃত হবার চেষ্টা করতো। তাই এ বিষয়টিকে উপলক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন, এই কর্মচারীকে দেখ, সে বলছে এই মাল মুসলমানদের এবং এই মাল আমার। সে যেন আপন ঘরে একটু বসে দেখে তার কাছে অনুরূপ উপহার আসে কিনা।[২৫]

খিয়ানত

খিয়ানত, প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্যে হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। একদা তিনি বাজারের মধ্য দিয়ে যাবার সময় এক ব্যক্তির খাদ্যস্তূপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দেখতে পান তাতে কিছু ভিজা খাদ্য রয়েছে। যেহেতু খাদ্য ভিজে গেলে তার ওজন বৃদ্ধি পায় তাই তিনি বললেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার মধ্যে নয়।[২৬]

যেহেতু আরবে খাদ্যদ্রব্য খুব কম আমদানী হত, তাই বাইরে থেকে বণিকরা যখন খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসত তখন ব্যবসায়ীরা শহরের বাইরেই অনুমানের উপর ভিত্তি করে (ওজন না করেই) সে খাদ্য কিনে নিত। কিন্তু এর মধ্যে একাধিক পদ্ধতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। প্রথমত: সমগ্র শহরের লোক সরাসরি খাদ্য ক্রয় করা থেকে বঞ্চিত থাকত। দ্বিতীয়ত: এটা ছিল এক অনির্দিষ্ট ও অজ্ঞাত বেচাকেনা। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ধরনের কেনাবেচা থেকে সকলকে বারণ করে দেন। এতদত্ত্বেও কেউ এরূপ করলে তিনি তাকে শাস্তি প্রদান করতেন।[২৭]

হাত ও জিহ্বার হিফাযত

ইসলাম যে সমস্ত চারিত্রিক মূলনীতি প্রণয়ন করেছিল তার মধ্যে একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ছিল–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"মুসলমান সে-ই, যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট হতে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।"

এই আদর্শের বিরুদ্ধে কাজ করলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তবে উভয় পক্ষ যদি শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে সমপর্যায়ের হয় তবে একে অন্যের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। আর যদি কোন পক্ষ দুর্বল হয় তাহলে তো প্রতিশোধ গ্রহণের কোন সুযোগই সে পায় না। সুতরাং যখনই এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটত রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারের চেষ্টা করতেন।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা) বলেন, আমি একবার আমার গোলামকে তার মায়ের প্রসঙ্গ তুলে (যেহেতু তিনি ছিলেন ক্রীতদাসীর সন্তান) গালি দিই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তুমি তাকে গালি দিচ্ছ? তোমার মধ্যে দেখছি এখনো জাহিলিয়া যুগের দোষ রয়ে গেছে। তোমার গোলাম তোমার ভাই, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন। যা তুমি খাবে তাকে খাওয়াবে, যা তুমি পরবে তাকেও পরতে দেবে। তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ তা থেকে নেবে না, আর যদি নাও তাহলে তাকে সাহায্য কর।[২৮]

হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, আমি আমার গোলামকে প্রহার করছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে কে আওয়াজ দিলেন, "হে আবূ মাসউদ, সাবধান! আল্লাহ্ তোমার উপর এর চাইতেও অধিক শক্তিশালী।" আমি পেছন

ফিরে দেখলাম (আওয়াজদাতা) স্বয়ং আঁ হযরত (সা)। হযরত আবূ মাসঊদ (রা)-এর উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্ত আওয়াজের প্রভাব এমনভাবে পড়ল যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে উক্ত গোলামকে মুক্ত করে দিলেন।[২৯]

তোষামদ ও আরামপ্রিয়তা

স্বভাবত: মানুষ তোষামদ পছন্দ করে। আর তোষামদকারী তাদের এই সুপ্ত আগুনকে আরো প্রজ্বলিত করে দেয়। এটাই অতীতের অনেক রাজা-বাদশাহ্ ও আমীর-উমরাকে ধ্বংস করেছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোষামদ পছন্দ করতেন না এবং অন্যকেও এ থেকে নিষেধ করতেন। একদা জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে গিয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা দেখে বললেন, তুমি একে ধ্বংস করে ফেলেছে।[৩০]

আরামপ্রিয়তা বাহ্যত: মানব-সভ্যতার অলংকার; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই মানব সভ্যতাকে কুরে কুরে খায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জীবন ছিল অত্যন্ত সরল ও সাধাসিধে। তিনি মানুষকেও অনুরূপ জীবন যাপনের শিক্ষা দিতেন। তিনি যখন এর বিপরীত কোন আচরণ লক্ষ্য করতেন তখন তার প্রতি নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করতেন।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত দালানকোঠা

একদা তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন; এমন সময় একটি সুউচ্চ দালান তাঁর নজরে পড়ে। তিনি জিজ্ঞাস করেন, এটা কার বাড়ী? লোকেরা জবাব দিল, অমুক আনসারীর বাড়ি। এরপর তিনি আর কিছু বললেন না। কথাটি মনের মধ্যে চেপে রাখলেন। তারপর যখন ঐ আনসারী তাঁর খিদমতে এলেন এবং তাঁকে সালাম করলেন তখন তিনি (সা) তার সালামের উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আনসারী তার বন্ধু বান্ধবের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই অসন্তুষ্টির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি তখন সেখান থেকে চলে গিয়ে অবিলম্বে দালানটি ধ্বংস করে ফেলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় যখন ঐ রাস্তা দিয়ে যান তখন লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, দালানের কি হলো? তাঁরা উত্তর দিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার অসন্তুষ্টির ভয়ে বাড়ীর মালিক সেটাকে ধ্বংস করে ফেলেছে। তিনি তখন বললেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রত্যেকটি ঘর তার মালিকের জন্য বিপদের কারণ।[৩১]

বিলাসী পর্দা

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। সেদিন হযরত 'আয়েশা (রা) রাসূলের ভালবাসা ও ব্যক্তিগত শখের বশবর্তী হয়ে তাঁর ঘরটি একটি অত্যন্ত রঙ্গিন পর্দা দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে ছিলেন। তিনি (সা) ঘরে আসার সাথে সাথে হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে সালাম করেন। কিন্তু হুযূর (সা)-এর চেহারায় তখন অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠল এবং তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর সালামের জবাবও দিলেন না। এরপর নিজের পবিত্র হাত দিয়েই ঐ পর্দাটি দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মাটি ও পাথরকে সজ্জিত করার নির্দেশ দেন নি।[৩২] প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, হযরত ফাতিমা (রা) এর সাথেও একদা এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল।

পবিত্রতা ও পবিত্র চিত্ততা

পবিত্রতা ও পবিত্র চিত্ততা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে মুসলমানদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে – وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ . –"যারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে।" - [২৩ : ৩৫]

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের উপর আঘাত হানতে পারে এমন কোন ঘটনা যখনই ঘটত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা থেকে মানুষকে বিরত রাখতেন।

হযরত ফযল বিন আব্বাস (রা) অত্যন্ত সুশ্রী চেহারার লোক ছিলেন। হজ্জ সম্পাদনকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে আপন সওয়ারীর উপর উঠিয়ে নিয়েছিলেন। তখন একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক ফতওয়া জিজ্ঞাসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দিকে এগিয়ে আসেন। ফযল (রা) আগ্রহ ভরে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকাতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন হাত দিয়ে ফযল (রা)-এর চিবুক ধরে তাঁর মুখটি ঐ স্ত্রীলোকটির দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন।[৩৩]

সত্‌রে আওরাত তথা পর্দা করার উপর গুরুত্ব আরোপ

ইউরোপবাসীরা আজ তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করে, যদিও তাদের চারিত্রিক অবস্থার দৃশ্যপট খুবই ঘৃণ্য। এর কারণ তারা সাধারণভাবে পর্দা বা সত্‌রে আওরাতের প্রতি মনোযোগী নয়, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে এটাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনেই করে না। কিন্তু ইসলাম এর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে।

একদা জনৈক ব্যক্তি উলংগ অবস্থায় উম্মুক্ত প্রান্তরে গোসল করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে গিয়ে মিম্বরের উপর আরোহণ করেন এবং এ সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন। তিনি বলেন–

"আল্লাহ্ তা'আলা লজ্জাশীল ও শালীন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন। তোমাদের মধ্যে যখন কেউ গোসল করে তখন তার উচিত পর্দা করা।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সত্‌রে আওরাতের প্রতি এতই সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন যে, একদা মিসওয়ার বিন মাখরামা একটি ভারী পাথর উঠাতে গেলে তাঁর দেহ থেকে কাপড় খুলে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, কাপড় উঠাও, উলংগ থেকো না।[৩৪]

অথচ ইউরোপে আজ পর্দার এই অবস্থা যে, গোসলখানা, হাম্মাম, সমুদ্রতট, সুইমিংপুল সর্বত্রই সেখানকার লোক একে অন্যের সামনে উলংগ অবস্থায় গোসল করে।

স্ত্রীলোকদের রুচি সংশোধন ও সংস্কার

স্ত্রীলোকদের রুচি সংশোধন ও সংস্কারের উপরও রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন। আরবেও হিজড়াদের একটি দল ছিল। তারা প্রকাশ্যে এর ওর ঘরে যাতায়াত করত। একদা জনৈক হিজড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীদের সামনে হুবহু একজন পুরুষের মতই জনৈকা স্ত্রীলোকের রূপগুণ বর্ণনা করছিল। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দেন, এরা যেন কারো ঘরে প্রবেশ না করে।[৩৫]

আরবের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে সব বদস্বভাব ছড়িয়ে পড়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, কোন কোন স্ত্রীলোক পুরুষদের বেশ ধারণ করত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন কোন স্ত্রীলোকের বেশভূসা পুরুষের মত হয়ে যেত রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাবধান করে দিতেন।

একদা হযরত উম্মে সালমা (রা) মাথার উপর দুপাট্টা জড়িয়ে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা দেখে বলেন, এক ফালি করে উড়, দু'ভাঁজ করো না। কেননা দু'ভাঁজ করলে তা পাগড়ী সদৃশ হয়ে যায় আর তা হচ্ছে পুরুষদের পোষাক বিশেষ।

এ বিষয়টির উপর তিনি (সা) কত বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন তা নিম্নের একটি ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

একদা এক স্ত্রীলোক পর্দার আড়াল থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে একটি পত্র দিতে চান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার হাতটি দেখে বললেন, এটা কি পুরুষের হাত, না স্ত্রীলোকের? সে বললো, আমি স্ত্রীলোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, যদি স্ত্রীলোক হও তাহলে হাতে মেহদী লাগাও।

অসতর্কতামূলক পোষাক পরিধান

তৎকালীন আরবে বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক অত্যন্ত অসতর্কতামূলক পোষাক পরিধান করত। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। যখনই এ ধরনের অসতর্কতামূলক ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নজরে পড়ত তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সে সম্পর্কে সাবধান করে দিতেন।

একদা হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) একটি কাপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে আসলে তিনি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, একজন স্ত্রীলোক প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর শুধুমাত্র তার মুখ ও হাত খোলা রাখতে পারে।[৩৬]

তখনকার দিনে স্ত্রীলোকেরা রাস্তাঘাটে সাধারণত: পুরুষদের সাথে চলাফেরা করতো। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখলেন, পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা পাশাপাশি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রীলোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, রাস্তার মধ্য দিয়ে হাঁটার কোন অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা রাস্তার পার্শ্ব দিয়ে হাঁটবে। এরপর থেকে স্ত্রীলোকেরা রাস্তার পাশ দিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করেন। এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা হাদীসগ্রন্থাদিতে উল্লেখিত আছে।

পরস্পর সম্প্রীতি

ইসলাম মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার যে বিরাট অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তা হলো–

إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ‎.

"তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।" (৩ ঃ ১০৩)

কিন্তু পারস্পারিক মতানৈক্য ও বিবাদ-বিসংবাদে ভ্রাতৃত্বের এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারত।

তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) পারস্পরিক ঝগড়া মীমাংসার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন। যখনই কোন ঝগড়া বিবাদের খবর তাঁর কানে আসত তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে সে ঝগড়ার মীমাংসা করে দিতেন।

একদা তাঁর কাছে এই মর্মে সংবাদ আসে যে, বনী আমর বিন আওফ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি (সা) কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে সেদিকে ছুটে যান এবং ঐ বিষয়টি মীমাংসা করতে এই পরিমাণ বিলম্ব ঘটে যে, সালাতের ওয়াক্ত এসে পড়ে। অতএব সেদিন হযরত বিলাল (রা) এর অনুরোধে হযরত আবু বকর (রা) ইমামতী করেন।[৩৭]

একদা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালূল এমনি অশিষ্ট আচরণ করে যে, তাতে সাহাবা কিরামের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। এমন কি তাঁরা তার সাথে লড়ার জন্য তৈরী হয়ে যান। আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের সমর্থকরাও দাঁড়িয়ে যায় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করেন। তিনি বলেন, ফাসাদ করার চাইতে আপোষ করা অনেক ভাল।[৩৮]

ইফ্কের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের দু'টি সম্প্রদায় আওস ও খাযরাজের মধ্যে ভয়ানক ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। এমন কি তাঁরা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ঠিক সেই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে অনেক বুজিয়ে নিরস্ত করেন।

শিষ্টাচার

বড়দের প্রতি যাতে সম্মান প্রদর্শন ও শিষ্ট আচরণ করা হয় সেদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এজন্য তিনি ছোটদেরকে সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করে দিতেন।

একদা হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা)-এর কনিষ্ঠ পুত্র যখন বড়দেরকে ডিংগিয়ে কথা বলতে চাইলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাবধান করে দিলেন এই বলে যে, الكبر الكبر। –অর্থাৎ বড়কে আগে বলতে দাও।[৩৯]

টীকা ঃ

১। ইহ্তিসাব অর্থ হিসাব করা, হিসাব নিকাশ ও বিচার বিবেচনার পর কোন কাজ করা। পুণ্য লাভের আশায় তথা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন কাজ করাকে ইহ্তিসাব বলা হয়।

২। বুখারী ঃ কিতাবুত্ তাহাজ্জুদ ৩। বুখারী ঃ কিতাবুস সালাত।

৪। বুখারী ঃ কিতাবুস সালাত ৫। বুখারী ঃ কিতাবুল খুসূমাত।

৬। তিরমিযী ঃ কিতাবুত তাফসীর ৭। বুখারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড।

৮। বুখারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ৯। বুখারী ঃ প্রথম খণ্ড।

১০। বুখারী। ১১। মুসলিম ঃ প্রথম খণ্ড।

১২। বুখারী ঃ প্রথম খণ্ড ১৩। বুখারী ঃ প্রথম খণ্ড।

১৪। বুখারী ১৫। মুসলিম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড।

১৬। বুখারী ১৭। ঐ

১৮। বুখারী ১৯। বুখারী

২০। মুসলিম ঃ প্রথম খণ্ড ২১। মুসলিম ঃ প্রথম খণ্ড

২২। ইবনে মাজা ২৩। ঐ।

২৪। ইবনে মাজা ২৫। মুসলিম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড।

২৬। ইবনে মাজা ২৭। বুখারী।

২৮। বুখারী ২৯। আবূ দাঊদ।

৩০। বুখারী ৩১। আবূ দাঊদ।

৩২। আবূ দাঊদ ৩৩। বুখারী।

৩৪। আবূ দাঊদ ৩৫। মুসলিম।

৩৬। আবূ দাঊদ ৩৭। আবূ দাঊদ।

৩৮। আবূ দাঊদ ৩৯। আবূ দাঊদ।

ইসলামের দৃষ্টিতে অঙ্গীকার পালন

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ٠

তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (৩৩ ঃ ২১)

চারিত্রিক নির্দেশ

কেবল শিক্ষাদানের সাথে চারিত্রিক নির্দেশের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তাতে একথা বলা চলে যে, এটা এমন কোন অভূতপূর্ব বিষয় নয়,যা মানুষের সামনে উপস্থাপনের কারণে ইসলাম কোন বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করবে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, চারিত্রিক নির্দেশ আমরা সর্বত্রই পাই। প্রায় সব ধর্মই চারিত্রিক উপদেশ প্রদানকে নিজের প্রধান লক্ষ্য বলে স্থির করেছে। পবিত্র কুরআন যেমন এ শিক্ষা দিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পালন কর; তেমনি মূসা (আ) এর কানূন এবং ঈসা (আ) এর নীতিও একথাই বলেছে যে, তোমরা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করো না। এমন কি আর্য বংশের সেই রূহানী ও আধ্যাত্মিক দর্শন যা হিন্দুস্তান ও ইরানে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তারও প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখা চারিত্রিক শিক্ষা ও নির্দেশাদিতে ভরপুর।

অতএব আসল বিষয় শিক্ষা নয়, বরং শিক্ষার প্রতিফলন ও তার কার্যকারিতা। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, পবিত্র কুরআন যা কিছু বলেছে, বাস্তবক্ষেত্রে তার কিরূপ প্রতিফলন ঘটেছে। মানুষের আত্মা এ জন্য রোগাক্রান্ত নয় যে, শিক্ষাদাতারা তাদের শিক্ষাদানের পরিমাণ হ্রাস করে দিয়েছেন কিংবা কাগজে শিক্ষা দীক্ষার কথা খুব একটা লিখা হয় নি, বরং এর আসল কারণ নিহিত রয়েছে জীবনের আমালী (কার্যত:) অসুবিধাসমূহের মধ্যে। আর শুধুমাত্র সে শিক্ষাই সাফল্যের দাবী করতে পারে, যা একটি সুদৃঢ় আমালী নমুনার অধিকারী।

আমালী সারবত্তার দিক দিয়ে এখানে আমাদের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে কুরআন বহনকারী ও শান্তির দিকে আহ্বানকারী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবন। কেননা পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ٠

"তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ (৩৩ ঃ ২১)।"

যুদ্ধ ও সন্ধির পরস্পর বিরোধী পরিস্থিতি

যুদ্ধ ও সন্ধির পরস্পর বিরোধী অবস্থায় মানুষের চরিত্র কাঠামো অকস্মাৎ বদলে যায়। যে ব্যক্তি সত্তাগত ভাবে অত্যন্ত কোমল হৃদয়, সেও যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত পাষাণ হৃদয়ে পরিণত হয়। যে লোক ব্যক্তিগত বিষয়ে অত্যন্ত ধৈর্যশীল সেও সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর অত্যন্ত ধৈর্যহারা ও ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি শান্তি ও

নিরাপত্তার সময় অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ও অঙ্গীকার রক্ষাকারী, যুদ্ধের সময় সে ততই ধোঁকাবাজ ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীতে রূপান্তরিত হয়। একটি দল, একটি সম্প্রদায় একটি জাতি ও একটি দেশ শান্তি ও নিরাপত্তার সময়ে মনুষ্যত্ব ও মানবতার শ্রেষ্ঠ নমুনা হতে পারে, কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন তাতে যে কোনভাবে বিজয়লাভের উদ্দেশ্যে সেই তারাই হিংস্র জন্তুর চাইতেও অধিক নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসুতে পরিণত হয়। কুরআনে যে বলা হয়েছে–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۔ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۔

"আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে (দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে) সুন্দরতম গঠনে, এরপর আমি ওকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি (এবং তারা কর্মদোষে অবনতির নিম্নস্তরে পৌঁছে) (৯৫:৪-৫)।" – তারই উপর ভিত্তি করে কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন, "রাজনীতির বুকের মধ্যে অন্তর বলে কোন জিনিস থাকে না।"

কিন্তু বিশ্বে শুধুমাত্র ইসলামই হচ্ছে এমন এক জীবন্ত সত্তা, যে আপন বুকের মধ্যে অন্তর এবং সে অন্তরের মধ্যে একটি অপরিবর্তনশীল চারিত্রিক ক্ষমতা রাখে। যার ফলে তার উপর বাইরের কোন বস্তুর প্রভাব পড়ে না। ভিতর বাহির, স্বৈরতন্ত্র-গণতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন-অবিচ্ছিন্ন, যুদ্ধ-সন্ধি সকল অবস্থাই হয় তার জন্য সমান। তার চারিত্রিক পরিমাপ যেমন শান্তি ও নিরাপত্তার সময়ে বহাল থাকে তেমনি বহাল ও সুদৃঢ় থাকে যুদ্ধ কালীন অগ্নিঝটিকা প্রবাহের মুহূর্তেও।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র জীবন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর জীবন মানবীয় কাজকর্মের প্রতিটি শাখার উপর ছিল বিস্তৃত। এর মধ্যে ন্যায় ও সত্যের সূচনাকালীন নিঃস্বতা ও উৎপীড়িত হওয়াও ছিল এবং সমাপ্তিকালীন সাফল্য, পরাক্রমশীলতা এবং আধিপত্যও ছিল। তিনি শান্তি ও আপোষের জীবন যেমন কাটিয়েছেন তেমনি শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করার নির্দেশও প্রদান করেছেন। এ কারণে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি এবং সেগুলোর ফলাফল ও পরিণামের ঘটনাবলী নবুওয়াত যুগের ইতিহাসে প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়- পরিলক্ষিত হয় সমস্ত ঘটনার মধ্যে কুরআনী চরিত্র ও আচার-আচরণের বাস্তব রূপ।

অত্যাচারী শত্রুদের সাথে ব্যবহার

এ প্রসংগে সর্ব প্রথম যে জিনিসটির উল্লেখ করতে হয় তা হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সেই চারিত্রিক আচার-আচরণ, যা তিনি করেছেন বিভিন্ন- গোত্র ও যুদ্ধবাজ শত্রুদের সাথে। তারা প্রায়ই তাঁর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং অত্যন্ত নির্লজ্জ পন্থায় তাঁর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে।

রা'ল, যাক্ওয়ান, উস্যায়্যা ও বনী লিহ্য়ান গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে নিবেদন করেছিল- যেন তিনি ইসলামের শত্রুদের সাথে মুকাবালা করার জন্য তাদেরকে সামরিক সাহায্য প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'কুররা-ই-সাহাবা' (যে সব সাহাবী সর্বক্ষণ কুরআন শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকতেন) এর মধ্যে থেকে সত্তরজন সাহাবীকে তাদের সাথে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা 'বি'-রে মাউনা'(একটি কূয়ার নাম)-এ পৌছার পর উক্ত সাহাবীদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে এবং নির্মমভাবে তাঁদেরকে হত্যা করে।[১]

যখন হযরত 'আসিম (রা) এর বাহিনীকে বনূ লিহ্য়ান গোত্রের দু'শ তীরন্দাজ (ধানুকী) চতুর্দিকে থেকে ঘিরে ফেলে এবং এই মর্মে তাঁদের সাথে অঙ্গীকার করে যে, তাঁরা যদি পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসেন তাহলে তাঁদের সাথে নির্মম আচরণ করা হবে না। তখন এই প্রতিশ্রুতির উপর সাহাবীদের একটি দল পাহাড় থেকে নেমে আসেন এবং সংগে সংগে তাঁদের কয়েকজনকে অকুস্থলেই হত্যা করা হয় এবং কয়েকজনকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়।[২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি পালনের নমুনা

ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেমন আপন প্রতিশ্রুতি পালনে সদাসতর্ক থাকতেন তেমনি সদাসতর্ক থাকতেন সমরক্ষেত্রের প্রতিশ্রুতি পালনেও। ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি যে কিরূপ যত্নবান ছিলেন তা নিম্নের ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়।

عن عبد اللّٰه بن ابى الحمساء قال بايعت النبى صلى الله عليه وسلم ببيع قبل ان يبعث وبقيت له بقية فوعدته ان اتيه بها فى مكانه فنسيت فذكرت بعد ثلاث فجئت فاذا هو فى مكانه فقال يا فتى لقد شققت على انا ههنا منذ ثلاث انتظرك .

"আবদুল্লাহ্ বিন আবু হামসা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে তার রিসালাত প্রাপ্তির পূর্বে আমি একটি জিনিস বিক্রি করেছিলাম। এর কিছু অংশ আমি সংগে সংগে তার কাছে অর্পণ করি নি এবং এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেই যে, আপনি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি অমুক জায়গা থেকে তা নিয়ে আসছি। কিন্তু আমি ঘরে গিয়ে এই প্রতিশ্রুতির কথা একদম ভুলে যাই। এর তিন দিন পর প্রতিশ্রুতির কথা আমার মনে পড়ে। ফিরে এসে দেখি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এখনো সেখানে আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখে শুধু বললেন, তুমি আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছ। আমি তিন দিন ধরে এখানে তোমার আপেক্ষায় বসে আছি। (আবূ দাঊদ)

মুজাহিদের প্রতি উপদেশ

ইসলামী যুদ্ধের ব্যাপকতা তাঁর চারিত্রিক শক্তিকে আরো মজবুত ও সুদৃঢ় করে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এই অভ্যাস ছিল যে, যখন কোন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হত তখন তিনি তাদের সম্বোধন করে এক সাধারণ উপদেশ প্রদান করতেন, যার মধ্যে অনেকগুলো চরিত্রগত পথ-নির্দেশনার সমাহার ঘটত। অঙ্গীকার পালন ছিল ঐ সব পথ-নির্দেশনার অন্যতম–

كان رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم اذا أمر اميراً على جيش او سرية اوصاه خاصة بتقوى اللّٰه عز وجل ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال اغزوا باسم اللّٰه فى سبيل اللّٰه قاتلوا من كفر باللّٰه اغزوا ولاتغلوا ولاتغدروا ولاتمثلوا ولاتقتلوا وليداً (صحيح مسلم : كتاب الجهاد)

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন ব্যক্তিকে কোন বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করতেন তখন তাকে আল্লাহ ভীরুতার এবং মুসলমানদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ওসীয়াত করতেন। এরপর বলতেন, আল্লাহ্র নাম নিয়ে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করো। যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; কিন্তু গনীমতের মালে কোনরূপ খিয়ানত করো না; অঙ্গীকার পালন করো, কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না, কারো হাত, পা, নাক, কান কেটে ফেলো না এবং শিশুদের হত্যা করো না" (সহীহ মুসলিমঃ কিতাবুল জিহাদ)।

মুজাহিদগণ সার্বিক ভাবে এই সব আদেশ নির্দেশ মেনে চলতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এই সব চরিত্রগত পথ-নির্দেশনাই মুসলিম মুজাহিদগণকে সর্বপ্রকার অত্যাচার, অবিচার এবং বাড়াবাড়িমূলক কাজকর্ম থেকে বিরত রাখত।

হযরত খুবায়ব (রা) এর ঘটনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত নির্দেশসমূহের মধ্যে অঙ্গীকার পালন সম্পর্কিত নির্দেশটির উপর সাহাবীগণ যেরূপ গুরুত্ব আরোপ করতেন তা বিশ্বের চারিত্রিক ইতিহাসের বিরল ঘটনাসমূহের অন্যতম। হযরত খুবায়ব ও অন্য একজন সাহাবীকে বনী লিহ্য়ান গোত্র নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাহাড় থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে।[৩] এরপর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাদেরকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করে ফেলে। সাধারণভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গের ক্ষেত্রে যখন এক পক্ষ অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে তখন অপর পক্ষের উপর অঙ্গীকার পালনের কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। তারাও কৃত অঙ্গীকারের শর্তাদি লংঘন করতে পারে। অতএব খুবায়ব (রা) যদি ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর উল্লেখিত হিদায়াতসমূহ মেনে না চলতেন তাহলে তাকে মা'যূর ও নিরূপায় মনে করা যেত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নির্দেশসমূহ কখনো জবরদস্তিমূলক হত না এবং সেগুলোর আত্মিক প্রভাব মুজাহিদগণের রক্ত মাংসকেও প্রভাবিত করে ফেলত। যখন খুবায়ব (রা) কে হারিছ বিন আমির ক্রয় করে নিয়ে হরম শরীফের বাইরে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে তখন তিনি হারিছের মেয়ের কাছে একটি অস্তুরা (ক্ষুর) চান।

মেয়েটি যখন অস্তুরাটি তাঁর হাতে তুলে দিল তখন খুবায়ব (রা) তাকে নিজের কোলে তুলে নেন। ঘটনাক্রমে মেয়েটির মা সেখানে এসে যখন এই দৃশ্যটি দেখল তখন সে এই ভেবে আতংকিত হয়ে উঠল যে, যে ব্যক্তির বেঁচে থাকার আর কোন আশাই নেই, সে অন্যের (বিশেষ করে শত্রু-কন্যার) প্রাণ হরণ করতে তো মোটেই দ্বিধা করবে না। হযরত খুবায়ব (রা)–যদিও বেঁচে থাকার আশা চিরতরে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবঙ একটি হাতিয়ার (অুস্তুরা) ও তার হাতে এসে গিয়েছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'শিশুদের হত্যা করো না'–এই মর্মে যে অঙ্গীকার তাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন সে অঙ্গীকার পালনের সংকল্প ছিল তার কাছে তার প্রাণের চাইতেও প্রিয়। অতএব তিনি মেয়েটির মায়ের ঐ অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বলে উঠেন ঃ তুমি কি আশংকা করছ যে, আমি এই মেয়েটিকে হত্যা করে ফেলব? না, তুমি কখনো এমনটি ভেবো না। আমি একটি শিশু হত্যার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে তুলে নিতে পারি না।[৪]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ঐ সব চারিত্রিক নির্দেশ ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার থেকে সাহাবীগণ অঙ্গীকার পালনের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। খায়বারের য়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর উপর বিষ প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু তিনি তাদের উপর এর কোন প্রতিশোধ নেন নি। য়াহূদীরা জ্ঞাতসারেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে যাদু করেছিল। এতদ্সত্ত্বেও তিনি ইতিপূর্বে সম্পাদিত শান্তিচুক্তির ভিত্তিতে, তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

হুদায়বিয়া পরবর্তী একটি ঘটনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কার কাফিরদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন তখন মুসলমান এবং কাফিরদের মধ্যে পরস্পর মেলামেশার সূত্রপাত হয়। হযরত সালামা (রা) বলেন, আমি এই স্বস্তিকর পরিস্থিতিতে একটি গাছের নীচে শুয়ে পড়ি। ঘটনাচক্রে সেখানে চারজন মুশরিক আসে এবং আমার সামনেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে গালিগালাজ করতে থাকে। আমি এটা সহ্য করতে না পেরে সেখান থেকে উঠে অপর একটি গাছের ছায়া তলে যাই। ওরা সবাই তখন পূর্ববর্তী গাছের ডালে তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রেখে সেখানে শুয়ে পড়ে। এই অবস্থায় হঠাৎ এই শোর উঠে যে, ইবনে যানীমকে হত্যা করা হয়েছে। আমি তখন কোষ থেকে আমার তরবারি টেনে বের করলাম এবং ঘুমন্ত অবস্থায়ই ঐ চারজনের উপর আক্রমণ চালালাম। প্রথমে আমি তাদের অস্ত্রগুলো হস্তগত করে নিলাম। এরপর তাদেরকে বললাম, সেই সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মদ (সা) কে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই মাথা তুলবে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। এরপর আমি ঐ চারজনকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে

নিয়ে আসি। অপর দিকে আমার চাচা আমির, মিকরায নামীয় একজন কাফিরকে টেনে হেঁচড়ে অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে নিয়ে আসেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদের সবাইকে মাফ করে দেন এবং বলেন, ওদেরকে ছেড়ে দাও, অসদাচারের সূচনা আমাদের পক্ষ থেকে নয়, বরং ওদের পক্ষ থেকেই হওয়া উচিত।[৫] যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদেরকে ঐদিন হত্যা করে ফেলতেন তাহলে অঙ্গীকার ভঙ্গের দায়দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে ওদের উপরই বর্তাত। কিন্তু তিনি (সা) অঙ্গীকার ভঙ্গের এই বাহ্যিক সুযোগটি গ্রহণ করতেও রাজী হন নি, যা ওদেরই হত্যাকাণ্ড ঘটাবার অগ্র-সংকল্প থেকে সৃষ্টি হয়েছিল।

আহকামে শরীয়াতের তিনটি স্তর

ইসলাম আহ্কামে শরীয়াত তথা ইসলামী আদেশ-নির্দেশকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছে। যথা ঃ

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ .

"হালাল স্পষ্ট। হারামও স্পষ্ট। আর এগুলোর মধ্যে এমন কিছু পর্যায় আছে, যা হারাম, হালাল উভয়েরই সম্ভাবনা রাখে।"

এই সম্ভাবনাময় পর্যায়ের বস্তু তথা 'মুশতাবাহাত' যুহ্‌দ ও তাকওয়ার পরীক্ষাস্থল। একজন প্রবঞ্চক ব্যক্তি একটি স্পষ্ট পুণ্যের উপর আমল করতে পারে, একজন ধোঁকাবাজ লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে কোন স্পষ্ট পাপকর্ম থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু নিয়ত বা সংকল্পের ব্যাপারটি সেখানে গোপন থাকতে পারে না, যেখানে হালাল ও হারামের অত্যন্ত নাজুক-অবস্থাটি বিদ্যমান। কেননা সমগ্র শরয়ী' হীলাসাযী তথা টানবাহানা এর চতুর্দিকে অবিরাম ঘুরপাক খেতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো ব্যক্তিগত কারণে প্রতিশোধ নেননি

বিষ প্রদানকারী এবং যাদু প্রয়োগকারী য়াহূদীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হত্যা করতে পারতেন। তিনি সেই সব কাফিরদের উপরও প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন, যারা হুদায়বিয়া সন্ধির পর তাঁকে গালিগালাজ করে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। এমন কি তাঁকে হত্যা করার উদ্যোগও নিয়েছিল। এতদ্সত্ত্বেও তিনি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন। কেননা ঐ সব অঙ্গীকার ভঙ্গের উপর 'ইশতিবাহ্' (সন্দেহ সংশয়)-এর অনেকগুলো আবরণ পড়ে রয়েছিল। তাছাড়া এগুলোর মধ্য থেকে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণের গন্ধও আসছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মহান চরিত্রের সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল– لَمْ يَنْتَقِمْ لِنَفْسِهِ (صحيحين)

"তিনি কখনো ব্যক্তিগত কারণে কারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। [সহীহ ও বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

অনুরূপ করলে যদিও এটাকে তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ আখ্যা দেওয়া যেত না, কিন্তু তা থেকে অঙ্গীকার ভঙ্গের সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হত। আর ইসলাম স্বীয় দেহে অনুরূপ ধরনের বাহ্যিক কলংক প্রত্যক্ষ করতেও রাজী নয়।

সাহাবা যুগ

রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর কার্য প্রণালী সাহাবাগণের সামনেও অঙ্গীকার পালনের একটি উচ্চতর কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের যুগে এই কাঠামোকে সর্বদা বহাল রেখেছিলেন।

সাহাবীগণের যুগে যখন কারো কাজে-কর্মে অঙ্গীকার ভঙ্গের বাহ্যিক সম্ভাবনাও দেখা দিত তখন, অন্যান্য সাহাবীগণ তা প্রতিরোধ করতেন। আমীর মু'আভিয়া (রা) রোমানদের সাথে এক দীর্ঘকালের জন্য একটি

সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি এই চুক্তি ভঙ্গ করতে চান নি বটে, তবে চুক্তিকালীন সময়ের মধ্যেই রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। এবং সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হন, যাতে করে চুক্তির মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধ শুরু করতে পারেন। কিন্তু এই অভিযানকালে জনৈক ব্যক্তি দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর কাছে এসে পৌঁছে বলেন, 'আল্লাহু আকবার (আল্লাহ্ মহান) আল্লাহু আকবার। এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কি তোমাদের জন্য সাজে? অবশ্যই তোমাদের অঙ্গীকার পালন করা উচিত। লোকেরা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখল, সেই ব্যক্তি হযরত আমর বিন আনবা (রা)। আমীর মু'আভিয়ার নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করলেন। আমর (রা) তখন বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولايحلها حتى يقضى احدها اوينبذ اليهم سواء .

"যদি কোন ব্যক্তি কোন জাতির সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় তখন সে যেন ঐ অঙ্গীকারের গ্রন্থি না শক্ত করে আর না ঢিলা করে (অর্থাৎ কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে সেটাকে যেন তার আসল অবস্থায় বহাল রাখে) যতক্ষণ না ঐ অঙ্গীকারের মেয়াদ অতিক্রান্ত হয় কিংবা উভয় পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে চুক্তিভঙ্গের ঘোষণা প্রদান করা হয়।"

এরপর আমীর মু'আভিয়া (রা) আমর (রা)-এর সাথে আর কোন কথা না বলে রাস্তা থেকেই রাজধানীতে ফিরে আসেন (আবু দাঊদ)

অঙ্গীকার পালনের চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পরস্পর চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং তা বহাল রাখা হয়। কিন্তু কোন রাষ্ট্রই নিজের সাধারণ লক্ষ্যাদি অর্জনের সাফল্যকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির চারিত্রিক আনুগত্যের উপর বিসর্জন দিতে পারে নি। ইউরোপের বর্তমান চরিত্র একথার সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। ইতালী তার বিশ্ববিশ্রুত প্রতিশ্রুতিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্মৃত হয়ে যায়[৬] এবং জার্মানী প্যারিসের দিকে অগ্রসর হওয়াকে এমনি অপরিহার্য মনে করে বসে যে, তাদের সামনে বেলজিয়ামের জোট-নিরপেক্ষতা কোন ধর্তব্য বিষয়ই ছিল না।[৭] কিন্তু ইসলামের লক্ষ্য ছিল প্যারিসের সুউচ্চ দুর্গচূড়াসমূহের চাইতেও উচ্চতর। কিন্তু সে আপন প্রতিশ্রুতি পালন করতে গিয়ে ঐ বিরাট লক্ষ্যকে (স্বার্থকে) বার বার বিসর্জন দিয়েছে। ইসলামের মূল লক্ষ ছিল 'হক' বা সত্যের প্রচার। এজন্য যুদ্ধ করত, আপোস করত এবং অঙ্গীকারেও আবদ্ধ হত। অবশ্য তার এই উদ্দেশ্য কখনো কখনো কোনরূপ প্রচেষ্টা ছাড়াই অর্জিত হয়ে যেত। অন্যকথায়, তরবারির স্থলে শুধুমাত্র 'দায়ী'য়ে ইসলাম' [ইসলামের দিকে আহ্বানকারী]-এর রূহানী শক্তিই এই যুদ্ধক্ষেত্রে জয় করে নিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমনি উচ্চতর লক্ষ্যকেও–যা অতি সহজে অর্জিত হতে পারত–অঙ্গীকারের চারিত্রিক বাধ্যবাধকতার উপর প্রধান্য দেন নি।

কুরায়শরা জনৈক ব্যক্তিকে দূত হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে প্রেরণ করে। সে মদীনা এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র চেহারা দেখেই ইসলামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং অকপটে বলে উঠে 'আমি কিয়ামত পর্যন্ত আপনার এই দোরগোড়া ছেড়ে অন্য কোথাও যাব না।' কিন্তু যেহেতু দূতদের সাথে কোনরূপ দুর্ব্যবহার করা হত না বরং তাদের ব্যাপারে একটি বিশেষ অঙ্গীকার পালন ছিল জরুরী; তাই তিনি ঐ দূতকে বললেন, আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারব না। তুমি এখন ফিরে যাও। যদি তোমার অন্তরে ইসলামের প্রতি আসক্তি থাকে তাহলে পুনরায় ফিরে আসতে পারবে। তিনি বার্তা নিয়ে ফিরে যান। এরপর পুনরায় মদীনায় ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন (আবূ দাঊদ)।

হুদায়বিয়ার চুক্তি

হুদায়বিয়ার চুক্তিতে মুশরিকরা মুসলমানদের সামনে যে সব শর্ত পেশ করেছিল তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, মক্কার কাফিরদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মদীনায় পালিয়ে যাবে তাকে মুসলমানরা মক্কায় ফেরত পাঠাবে। এই শর্তকে কেন্দ্র করে মুসলিম ও মুশরিক পক্ষের মধ্যে সাংঘাতিক মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। সাহাবীগণ বললেন, একজন মুসলমানকে কী করে কাফিরদের হাতে অর্পণ করা যেতে পারে? তখনো এই শর্ত সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি, এমনি মুহূর্তে আবূ জন্দল (রা) পায়ে বাঁধা শিক্‌ল হেচড়াতে হেচড়াতে মক্কা থেকে সেখানে এসে পৌছেন এবং মুসলমানদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। আবূ জন্দুল (রা) এর পিতার নাম ছিল সুহায়ল। ঐ চুক্তি সম্পাদনে স্বয়ং সুহায়ল মক্কার মুশরিকদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, আমি আমার ছেলেকে ফেরত নিয়ে যাওয়ার শর্তেই চুক্তি সম্পাদন করবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, যেহেতু এখনো আমাদের আপোসচুক্তি সম্পাদিত হয় নি, তাই তোমার এই বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে নেওয়া আমার জন্য জরুরী নয়। কিন্তু সুহায়ল বললেন, এছাড়া অন্য কোন শর্তে চুক্তি সম্পাদন করা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বার বার একথার উপর গুরুত্ব আরোপ করছিলেন। যে, অন্ততঃপক্ষে আবূ জন্দুলকে এ শর্ত থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। কিন্তু সুহায়ল তা মেনে নিতে মোটেই রাজী হননি। তখন আবু জন্দুল সকল মুসলমানকে সম্বোধন করে অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ভঙ্গিতে বললেন, হে মুসলমানগণ, আমি মুসলমান হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। এরপরও কি আমাকে মুশরিকদের কাছে ফেরত পাঠানো হবে? তার এই করুণ সম্বোধন মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে দারুণভাবে আঘাত হানে। হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে অস্থির চিত্তে ছুটে আসেন এবং নিবেদন করেনঃ আপনি কি আল্লাহর নবী নন? আর আপনার এই অনুসারী কি ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তর দেনঃ নিঃসন্দেহে আমরা সত্যের উপর আছি। হযরত উমর (রা) তখন বলেনঃ তাহলে কেন আমরা এভাবে নিজেদের হেয় প্রতিপন্ন করছি এবং লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত হচ্ছি? তিনি (সা) তখন জবাব দেনঃ এটা আল্লাহ্‌র হুকুম।

কিন্তু এই প্রশ্নোত্তরে হযরত উমর (রা) স্বস্তি পান নি। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথেও এ ধরনের কথাবার্তা বলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় নি। বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শদের যাবতীয় শর্ত মেনে নিয়ে একটি চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করিয়ে নেন এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক তা স্বাক্ষরিত হয়।

আবূ বাসীর (রা) এর ঘটনা

এরপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন তখন আবূ বাসীরও মুসলমান হয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে আসেন। কুরায়শরা তাঁর অনুসন্ধানে দুটি লোক পাঠায়। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে এসে তাঁকে হুদাইবিয়া চুক্তির শর্তসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গে সঙ্গে আবূ বাসীর (রা) কে ফেরত পাঠান। তারা আবূ বাসীর (রা) কে নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। যখন তারা 'যুল হুলায়ফা' নামক স্থানে পৌছে তখন নিজেদের থলে থেকে খেজুর বের করে পানাহারে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। আবূ বাসীর (রা) ঐ সুযোগে তাদের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সংকল্প নেন। তারা নিশ্চিন্তে বসে খেজুর খাচ্ছিলো। এমনি সময় আবূ বাসীর (রা) তাদের একজনের তরবারির দিকে তাকিয়ে বলেন, কী সুন্দর এই তরবারিটি। একথা শুনে ঐ লোকটি আত্মগর্বে ফুলে উঠে এবং বলে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমি বহুবার এর প্রমাণ পেয়েছি। আবূ বাসীর (রা) তখন তরবারিটি স্পর্শ করে দেখার বাহানায় স্বাভাবিকভাবে তা হাতে তুলে নেন এবং সর্বপ্রথম ঐ ব্যক্তির দেহ থেকে তার মস্তকটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। অপর ব্যক্তি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে পলায়ন করে এবং দৌড়াতে দৌড়াতে মদীনায় গিয়ে পৌছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তার ললাটের দিকে তাকিয়ে বলে উঠেন, নিশ্চয়ই এর উপর দিয়ে কোন বিপদ ঘটে গেছে। লোকটি বললো, আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমি প্রাণ দিয়ে কোনমতে এখানে পালিয়ে এসেছি।

একটি পৃথক মুসলিম বাহিনী গড়ে উঠলো

আবূ বাসীর (রা) ও মদীনায় এসে পৌঁছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি তো আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলাই আমাকে নাজাত দিয়েছেন। অতএব এখন আমার সম্পর্কে কোন দায়দায়িত্ব আপনার উপর বর্তায় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন, এই লোকটিকে তো যুদ্ধের একটি স্ফুলিঙ্গ বলে মনে হচ্ছে। আবূ বাসীর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কথার যে অর্থ করলেন তা হলো তিনি (সা) পুনরায় আমাকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। অতএব তিনি মদীনা থেকে পালিয়ে গিয়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। আবূ জন্দুল (রা)-এর কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছল তখন তিনিও মক্কা থেকে পালিয়ে গিয়ে আবূ বাসীরের সাথে মিলিত হন। এরপর কুরায়শের যে লোকই মুসলমান হত সেই মক্কা থেকে পালিয়ে গিয়ে সোজা আবূ বাসীর (রা) এর ওখানে আশ্রয় নিত। এভাবে ধীরে ধীরে আবূ বাসীর (রা) বেশ বড় একটি বাহিনী গড়ে তুলেন এবং কুরায়শের যে সব বাণিজ্য-কাফেলা সিরিয়া অভিমুখে যাওয়া আসা করত সাধারণভাবে সেগুলোকেই লুণ্ঠন করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত কুরায়শ এ সব মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি আবূবাসীর (রা)সহ সেখানে অবস্থানকারী সকল নওমুস-লিমকে মদীনায় ডেকে নিয়ে আসেন (বুখারী)।

যুদ্ধের মধ্যেও অঙ্গীকার পালন

যুদ্ধচলাকালীন সময়ে সাধারণত: অঙ্গীকার পালন করা হয় না। আর ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তো শান্তিকালীন সময়েও অঙ্গীকার পালনের উপর খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত-উভয় প্রকারের চুক্তিই একই নৈতিক ও আত্মিক শক্তির অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও ব্যক্তিগত এমন কি জবরদস্তিমূলক পর্যায়ের অঙ্গীকারসমূহের উপরও অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। হুযায়ফা বিন য়ামান বলেন, আমি বদর যুদ্ধে শুধুমাত্র এজন্য অংশগ্রহণ করতে পারি নি যে, আমি এবং আবূ হাসীল যখন একসাথে রওয়ানা হই তখন কুরায়শের কাফিররা আমাদের বন্দী করে ফেলে এবং বলে, তোমরা নিশ্চয় মুহাম্মদের কাছে যাচ্ছ। আমরা উভয়ে বললাম, 'না, আমরা শুধু মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখি। ওরা শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে এই অঙ্গীকারের উপর ছেড়ে দেয় যে, আমরা যেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করি। এতদসত্ত্বেও আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে হাযির হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে চাইলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা মদীনায় ফিরে যাও। আমরা কাফিরদের সাথে কৃত অঙ্গীকার সমূহও পালন করে থাকি এবং তাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই সাহায্য কামনা করি (সহীহ্ মুসলিম ঃ ২য় খণ্ড)।

অঙ্গীকারে ঔদার্য

অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হলো, কার সাথে অঙ্গীকার চুক্তি সম্পাদন করা উচিত এবং কার সাথেই বা এটা বহাল রাখা উচিত? প্রখ্যাত গ্রীক আইনবিদ সূলন এর একটি সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছেন, যা সমগ্র বিশ্বের রাজনীতির আত্মাস্বরূপ। জবাবটি হলো, 'চুক্তি হচ্ছে মাকড়সার জালের মত। যে বস্তু তা থেকে দুর্বল সেটাকে সে নিজের মধ্যে জড়িয়ে নেয়, আর যে বস্তু তা থেকে সবল সেটা তাকেই ছিঁড়ে ফেলে।' কিন্তু ইসলামই হচ্ছে এমন একটি মাযহাব, যার চুক্তিপালনের নৈতিক ও চারিত্রিক দিকটি সূলনের ঐ মাকড়সার জালকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। ইসলাম, দুর্বলদের সাথেও অত্যন্ত ঔদার্যের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তা পালনও করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শের কাফিরদের সাথে হুদাইবিয়া নামক স্থানে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। বাহ্যত: ঐ চুক্তিটি ছিল মুসলমানদের সীমাহীন দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের পরিচায়ক। সাহাবগিণ এটা অনুভব করেছিলেন এবং তিনি (সা) নিজেও পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছিলেন–

لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم .

"আমার সামনে তারা যে শর্তই পেশ করবে আমি তা মেনে নেব–তবে এই শর্তে যে, তাতে যেন আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমুহের অমর্যাদা করা না হয়।"[৯]

অতএব তিনি তাঁর লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ ঐ সব মুসলমান, যারা ঈমানের আলোয় আলোকিত হয়ে তাঁর কাছে আস্‌ছিলেন তাঁদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ঐ চুক্তিপত্রের শিরোভাগে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' শব্দটি লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাফিররা তা মানল না। কিন্তু তিনি, সাহাবীগণের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও কাফিরদের ইচ্ছাই পূরণ করলেন এবং বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর স্থলে 'বিইসমিকা আল্লাহুম্মা' লিখতে সম্মত হয়ে গেলেন।[১০] তিনি (সা) তাঁর নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ্‌' লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাফিররা বল-লো, যদি আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে মেনেই নিতাম তাহলে এই বিরোধই বা হত কেন? অতএব আপনি এতে কেবল মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্‌' লিখুন। ইতিপূর্বে চুক্তিপত্রে 'রাসূলুল্লাহ্‌' শব্দটি লিখা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত আলী (রা) কে– যিনি ঐ চুক্তিপত্র লিখছিলেন নির্দেশ দেন, এই শব্দটি মুছে ফেল। কিন্তু ঈমানী ভাবপ্রবণতার কারণে হযরত আলী (রা) তা মুছতে ইতস্তত: করছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিজ হাতেই তা মুছে ফেলেন।

এর চাইতে দুর্বল আর কী হতে পারে? কিন্তু প্রকৃতই কি তিনি দুর্বল ছিলেন? কুরায়শের বিরাট শক্তি কি তাঁকে একেবারে অসহায় করে দিয়েছিলো?

সন্ধি ও শান্তিকাল

বিশ্বের সমগ্র রাষ্ট্রই চুক্তিভঙ্গের জন্য অপর পক্ষের দুর্বলতার সুযোগ খুঁজে। আর সন্ধি তো সব সময় শক্তিমানের সাথেই করা হয়। কিন্তু ইসলামের শান্তিপ্রিয় মনোবৃত্তি একটি অত্যন্ত দুর্বল পক্ষের মুকাবালায় এই ঔদার্যপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করে এবং এটাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বহালও রাখে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) খোদ বলেছেন–

انا لم نجئ لقتال احد ولكنا جئنا معتمرين وان قريشا قد تهلكتهم
الحرب واخرت بهم فان شاؤا ماورتهم مدة .

"আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসিনি, শুধুমাত্র উমরা করার জন্য এসেছি। ক্রমাগত যুদ্ধ কুরায়শকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে এবং তাদের শক্তির উপর বিরাট আঘাত এসেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা যদি চায় তাহলে আমরা একটি নির্দিষ্টকালের জন্য তাদের সাথে সন্ধি করতে পারি।"

পার্থিব রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে আপনাদের কি মনে হয়? তারা এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার কিভাবে করত? তারা কি সন্ধি করত, না যুদ্ধের অগ্নিস্ফুলিংগ আরো প্রজ্জ্বলিত করে দিত? বিশ্বের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস অতি সহজে এর জবাব দিতে পারে? যদি এই অবস্থায় কোন রাষ্ট্র সন্ধিও করত তাহলে তার ফলাফল হত যুদ্ধের চাইতেও ভয়াবহ।

নজরানবাসীদের সাথে চুক্তি

কিন্তু এই আংশিক কর্মপদ্ধতি শুধুমাত্র একটি অনৈক্যগত মর্যাদা রাখত। আর ইসলামের ব্যাপকতা ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে এই চারিত্রিক কর্মপদ্ধতির সাথে সাথে নিজের মধ্যে একটি

আইনগত শক্তিও ধারণ করত। আর যখন পশ্চাৎবর্তীদের চারিত্রিক শক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অনুপম চরিত্রকে ভুলিয়ে দিত তখন ইসলাম আপন এই আংশিক শক্তি দ্বারাই তাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্যান্য জাতির সাথে যে সব লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেছেন সেগুলো পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও আইনগত মর্যাদা রাখত। ইসলামের কানূন কী পরিমাণ উদার ছিল তা কিন্তু এথেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাজরানের খ্রীষ্টানদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তার শব্দাবলী ছিল নিম্নরূপ–

على اهل نجران الفى حلة النصف فى صفر والنصف فى رجب يردونها الى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين بعيراو ثلاثين من كل صنف من اصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم ان كان باليمن كيد ذات غدر على ان لا تهدم لهم بيعة ولايخرج لهم قس ولايفتنوا عن دينهم (ابو داؤد)

"নাজরানবাসীরা কিস্তিতে দুহাজার জোড়া (পোশাক) প্রদান করবে। এক হাজার জোড়া দেবে সফর মাসে এবং এক হাজার জোড়া দিবে রজব মাসে। আর সাময়িক ব্যবহারের জন্য তাদেরকে ত্রিশটি বর্ম, ত্রিশটি ঘোড়া, ত্রিশটি উট এবং সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রও ঋন হিসাবে দিতে হবে। যদি ইয়ামনে কোন যুদ্ধ বাঁধে তাহলে (যুদ্ধের পর) ঐ সমস্ত লোক উপোরক্ত জিনিসগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেবে। আর এই চুক্তির ভিত্তিতে না তাদের গির্জা ভেংগে ফেলা হবে, না তাদের কোন পাদ্রীকে দেশান্তরিক করা হবে, আর না তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে। (আবূ দাঊদ)

চারিত্রিক উপদেশাবলী

ইসলামের প্রত্যেকটি নীতি নিজের মধ্যে নৈতিক ও চরিত্রগত শক্তিও রাখে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর চারিত্রিক উপদেশাবলী এই শক্তিকে আরো সমৃদ্ধ ও সুদৃঢ় করে তুলেছে। তিনি (সা) বলেন–

الا من ظلم معاهدا ا انتقصه او كلفه فوق طلاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة .

সাবধান! যদি কেউ কোন বিধর্মী প্রজার উপর জুলুম করে কিংবা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে কিংবা তার কাছ থেকে কোন জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে আসে তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে (এবং ঐ বিধর্মীর পক্ষে) আল্লাহ্র সামনে ঝগড়া করবো। [আবূ দাঊদ]

একজন কিবতীর ঘটনা

সাহাবা কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এই ঔদার্যপূর্ণ কর্মধারা তাঁর ওফাতের পরও অত্যন্ত নিরপেক্ষতার সাথে বহাল রাখেন। এ কারণেই দেখা যায়, হিশাম বিন হাকীম (রা) যখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, হিমসের কর্মকর্তা কিবতীদেরকে রোদের মধ্যে বসিয়ে তাদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করছেন তখন তিনি তাকে নির্দ্বিধায় রাসূল-ল্লাহ্ (সা) এর সেই চারিত্রিক নসীহতটি স্মরণ করিয়ে দেন, যাতে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا .

"আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন ঐ সব লোককে শাস্তি দেবেন যারা দুনিয়ায় মানুষকে কষ্ট দেয়।"

হযরত উমর (রা)-এর ওসীয়ত

হযরত উমর (রা) ও তাঁর ওফাতের মুহূর্তে এই চারিত্রিক নীতিটি তাঁর পরবর্তী খলীফাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন–

واوصيت بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ان يوفى لهم لعهدهم ان يقاتل من ورائهم ولايكلفوا الا طاقتهم (بخارى)

"আমার পরে যিনি খলীফা হবেন তাঁকে আমি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের অঙ্গীকার রক্ষার ওসীয়ত করে যাচ্ছি। আর তা এই যে, বিধর্মী প্রজাদের সাথে যে অঙ্গীকার করা হয় তা যেন পূরণ করা হয়, তাদের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষার জন্য যেন যুদ্ধ করা হয় এবং তাঁদের উপর যেন সেই পরিমাণ বোঝা উঠানো হয়, যা তারা বহন করতে সক্ষম।"

একজন দিগ্বিজয়ী বীর ও নবী (সা) এর মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী জিহাদ (যুদ্ধ) যে সব লক্ষ্যকে অন্তর্ভুক্ত রাখে, সে দিকে চিন্তা করলে তা পার্থিব উদ্দেশ্যে সংঘটিত যুদ্ধের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আর এই বিভিন্নতা এতই স্পষ্ট যে, তা এর বাহ্যিক অবয়বের প্রত্যেকটি অংশেই পরিদৃষ্ট হতে পারে।

একজন বীর যখন দিগ্বিজয়ের সংকল্প নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে রওয়ানা হয় তখন বিউগল, সানাই, ঢোল, তবলা, বাঁশী ইত্যাদির সুরে তার যাত্রাকে ভাবাপ্লুত ও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়, তার মাথার উপর পতাকা উড়তে থাকে। তার শাহী শামিয়ানা প্রখর সূর্য কিরণকেও তা থেকে রুখে রাখে। প্রবল পরাক্রমের দেবতারূপী তার এই জ্যাঁকজমকপূর্ণ শামিয়ানাটি যুদ্ধক্ষেত্রে একটি পরম পূজনীয় বস্তু হিসাবে বিরাজ করে। আর সমগ্র বাহিনী এই শামিয়ানার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আবর্তিত- বিবর্তিত হতে থাকে। এই প্রবল পরাক্রম ও ক্ষমতার দাপটের দৃশ্য জনসাধারণকে অতি সহজেই প্রভাবিত ও ভীতিগ্রস্ত করে তোলে। আর এই ভয়ভীতিপূর্ণ অনুভীতি থেকে তার পার্থিব বিজয়ের শির দম্ভ ও আত্মগর্বে অধিক থেকে অধিকতর স্ফীত হয়ে উঠে। এমনকি রক্ত ও মাটির সাথে মিশে গেলেও তার আত্মগরিমার এই নেশা কাটে না।

কবির ভাষায়,

زمین رامنم تاج تارك نشی

مجنبان مراتا نجنبد زمین .

"আমি হলাম যমীনের মুকুট,

আমাকে যদি হেলাতে দোলাতে থাক

তাহলে যমীন ভূমিকম্পের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে।১১

নবী (সা) এর সফর

কিন্তু নবী (সা) এর অবস্থা ছিল এর চাইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি যখন ঘর থেকে বের হতেন তখন যদিও তাঁর সাথে একদল উৎসর্গীকৃত প্রাণ মুমিন থাকতেন তবু তিনি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে নিজের একমাত্র সফরসঙ্গী বলে মনে করতেন। যেমন–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر قال اللهم انت الصاحب فى السفر الخليفة فى الاهل اللهم انى اعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسؤ المنظر فى الاهل والمال اللهم اطون الارض وهون علينا الضر !

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন তখন এই দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ্ তুমিই আমাদের সফরসঙ্গী এবং আমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ্, আমরা তোমার কাছে সফরের বিপদাপদ এবং আমাদের পরিবার-পরিজন ও সম্পদকে বিপন্ন অবস্থায় দেখার বিপদ থেকে আশ্রয় প্রর্থনা করছি। হে আল্লাহ, আমাদের সফরের দূরত্ব সংক্ষিপ্ত কর এবং আমাদের জন্য তা সহজ করে দাও।"

সওয়ারী

নবী (সা) যখন সওয়ারীর উপর আরোহণ করতেন তখন আল্লাহ্র শুক্র আদায় করতেন এই বলে যে–

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ .

"পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে (সওয়ারীকে) আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে (৪৩:১৩)

সফর থেকে প্রত্যাবর্তন

নবী (সা) যখন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন আল্লাহ্র প্রশংসাগীতি গাইতে গাইতে তিনি বলতেন–

ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون .

"আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তাওবাকারী, আমরা আল্লাহ্র ইবাদতকারী এবং তাঁর প্রশংসাকারী[১২]

নবী (সা) যখন পাহাড়ে আরোহণ করতেন তখন 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করতেন এবং যখন পাহাড় থেকে অবতরণ করতেন তখন আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকতেন।

সেনাবহিনীর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন

নবী (সা) যখন তাঁর সেনাবাহিনীকে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করতেন তখন না তিনি তাঁদেরকে তাদের শক্তি ও ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, না তাঁদের ভাবোচ্ছ্বাসকে বর্ধন করতেন, আর না প্রাচীন যুগের বীরত্বগাথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদের অন্তরকে সঞ্জীবিত করার চেষ্টা করতেন– বরং তিনি তাঁদের দ্বীন, তাঁদের আমানত (বিশ্বস্ততা) এবং তাঁদের যাবতীয় কাজের ফলাফল আল্লাহ্র হাতে সমর্পণ করে তাঁদেরকে বিদায় প্রদান করতেন।

استودع الله دينكم واما نتكم وخواتيم اعمالكم .

"আমি তোমাদের ধর্ম, তোমাদের আমানত এবং তোমাদের কাজকর্মের ফলাফল আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করে তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার জন্য প্রেরণ করছি।"

মনযিলে অবতরণ

নবী (সা) যখন কোন মন্‌যিলে অবতরণ করতেন তখন রাজা-বাদশাহ্‌দের মত তাঁর জন্য জাঁকজমকপূর্ণ কোন তাঁবু স্থাপন করা হত না, কিংবা উঁচু নীচু যমীনকে বিশেষভাবে সমতল করে তাঁর জন্য কোন শাহী বিছানা বা গালিচাও বিছানো হত না। তিনি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ভূশয্যায় শয়ন করতেন এবং তাঁরই মাহাত্ম্য ও মহানুভবতার উপর নির্ভর করে যমীনের কাছেই আপন হিফাযত ও নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পণ করতেন। তিনি বলতেন–

يا ارض ربى وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك ومن شر ما يدبّ عليك .

"হে যমীন! আমার এবং তোমার উভয়েরই রব আল্লাহ্‌ । আমি তোমার অনিষ্ট থেকে, তোমার অভ্যন্তরে অবস্থানকারীদের অনিষ্ট থেকে এবং তোমার উপর দিয়ে চলাচলকারীদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র শরণ নিচ্ছি।

জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন

নবী (সা) যখন জিহাদ থেকে ঘরে এসে পৌঁছতেন তখন সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌ তা'আলার ঘরের কথা তাঁর মনে পড়ত এবং তিনি মসজিদে গিয়ে দু রাক'আত সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি বিজয় ও সাফল্যের সংবাদ পেতেন তখন না তার সামনে আনন্দ-উল্লাস করা হত, না কোন শাহী অনুষ্ঠান পালনের প্রস্তুতি নেয়া হত, আর না কোন নাচগানের জলসার আয়োজন করা হত। বিজয়-সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে সিজদাবনত হয়ে পড়তেন। আর আল্লাহ্‌রই ইচ্ছায় যখন তাঁর পরাজয় হত তখন তিনি তাঁর বাহিনীকে নিজের আত্মসম্মানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উত্তেজিত বা অনুপ্রাণিত করতেন না বরং তিনি ঐ মুহূর্তে তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র সম্মান ও ইবাদতের কথাই স্মরণ করিয়ে দিতেন। কেননা তিনি তাঁদেরকে আল্লাহ্‌রই বাহিনী বলে বিশ্বাস করতেন। যেমন–

كان يقول يوم احد : اللهم انك ان تشاء لا تعبد فى الارض .

"তিনি (সা) উহুদযুদ্ধের দিন বল্‌ছিলেন, হে আল্লাহ্‌, তুমি কি চাও যে, এখন ভূপৃষ্ঠে তোমার ইবাদতকারী কেউ না থাকুক।"

যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা

নবী (সা) যখন আপন বাহিনীর স্বল্পতা এবং শত্রুবাহিনীর আধিক্য প্রত্যক্ষ করতেন তখন তিনি শুধুমাত্র পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতেন এবং কোন অবস্থায়ই কোন পার্থিব শক্তির সামনে মাথা নত করতেন না।

لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الى المشركين وهم الف واصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل القبلة ثم مديديه فجعل يهتف بربه اللهم انجزلى ما وعدتنى اللهم اتنى ما وعدتنى اللّهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد فى الارض فما زال يهتف بربه

مادًا يديه مستقبل القبلة حتى سقط ردائهُ عن منكبيه فاتاه ابوبكر فاخذ ردائه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه قال يانبى الله كفاك منا شدتك ربك فانه منجزلك ماوعدك .

"বদর যুদ্ধের দিন যখন রাসুলুল্লাহ্ (সা) মুশরিক বাহিনীর দিকে তাকালেন তখন দেখলেন তাদের সংখ্যা এক হাজার এবং মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা মাত্র তিনশ উনিশ। তখন তিনি কিবলার দিকে মুখ করে উভয় হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই বলে আবেদন করতে থাকেন, "আল্লাহ্, তুমি আমাকে বিজয় ও সাফল্যের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা পূর্ণ কর। "হে আল্লাহ্, যদি মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তোমার ইবাদতকারী কেউ বাকী থাকবে না।" তিনি এভাবে আপন হস্ত প্রসারিত করে অনবরতঃ আল্লাহ্র কাছে আবেদন-নিবেদনে নিমগ্ন থাকেন, এমন কি এই নিমগ্নতার কারণে তাঁর কাঁধ থেকে চাদরটি পিছলে পড়ে যায়। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর এই বিনীত আবেদন-নিবেদন ও আহাজারী প্রত্যক্ষ করে তাঁর কাছে আসেন এবং চাদরটি মাটি থেকে উঠিয়ে তাঁর কাধের উপর রেখে পেছন দিক থেকে তাঁকে ঝাপ্‌টে ধরেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি আপনার মুনাজাত খতম করুন। আল্লাহ্ আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তিনি অতি শীঘ্রই পূরণ করবেন (মুসলিম)।"

যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হলে

নবী (সা) যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণভাবে আহত হতেন তখনো শুধুমাত্র এই বলে নীরব হয়ে যেতেন–

رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ (مسلم)

"হে আল্লাহ্ আমার জাতিকে ক্ষমা করো। কারণ তারা অজ্ঞ (মুসলিম)।"

কিন্তু কখনো যদি কাফিরদের কারণে তাঁর জিহাদের আসল লক্ষ্য হাতছাড়া হয়ে যেত তখন তিনি আপাদমস্তক আল্লাহ্র রোষানল ও অসন্তুষ্টির একটি জীবন্ত সত্তায় পরিণত হতেন। যেমন একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ্, তুমি কাফিরদের কবরসমূহকে আগুন দিয়ে ভরে দাও। কেননা তারা আমার আসরের সালাত কাযা করিয়েছে।

বাদশাহ ও নবীর মধ্যে পার্থক্য

সংক্ষেপে বলতে গেলে, একজন বিজয়ী বাদশাহ্ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকেন দাম্ভিক, কিন্তু একজন নবী সেখানে বিনয়ী ও আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণকারী। যুদ্ধক্ষেত্রে বাদশাহ্র ভাষা থাকে কঠোর ও আত্মম্ভরিতাপূর্ণ, অথচ একজন নবীর ভাষা হয় নম্র ও মিষ্টি মধুর। একজন বাদশাহ্ যুদ্ধক্ষেত্রে হন রাগ রুষ্টতার অগ্নিকুণ্ড, অথচ একজন নবী একত্ববাদের ঘোষণাকারী হন কৃপা করুণার ঝর্ণাধারা। এই দুই বিপরীত অবস্থার পরিণামও হয় ভিন্নমুখী ও অত্যন্ত উপদেশমূলক। বাদশাহ্দের আত্মম্ভরিতাপূর্ণ মস্তক বার বার চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত কোন নবীই লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত হন নি। বাদশাহ্দের বড় বড় বুলিকে বার বার স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী কোন নবীর প্রশস্তি গাঁথা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আওয়াজ কখনো থেমে যায় নি। বাদশাহ্দের রাগ ও রুষ্টতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বার বার নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন নবীর কৃপাবারিকে কেউ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ .

“আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।” (৩৭ : ১৭১-৩)

সাম্য

কানূনী (গতানুগতিক আইন সিদ্ধ) সাম্য পরিত্যাগ করে সাধারণ ও সর্ববাদিসম্মত সাম্যের প্রতি লক্ষ্য প্রদান করা উচিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন সমগ্র সুমলমানদের নেতা ও অধিকারী। এতদ সত্ত্বেও তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারে নিজেকে কখনো সাধারণ মুসলমানদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করেন নি।

কোন এক সফরে সাহাবীগণ তাঁদের রান্না বান্নার কাজ যখন নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিচ্ছিলেন তখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের দায়িত্ব নিজে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

হযরত আনাস (রা) পুরো দশটি বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে কাটান। তিনি বলেন, এই সময়কালে আমি তাঁর যে পরিমাণ খিদমত করেছি, তিনি আমার খিদমত করেছেন তার চাইতে বেশী। সাম্যের অবস্থা এই ছিল যে, مَا قَالَ لِىْ فِىْ شَىْءٍ لِمَا فَعَلْتَ . –“কোন কাজ করার পর তিনি (সা) আমাকে বলেন নি, তুমি এটা কেন করেছ?”

অর্থাৎ জবর দস্তিমূলকভাবে কাজ করানো কিংবা ধমক দেওয়া তো দূরের কথা, তিনি কখনো আমাকে এও বলেন নি, তুমি অমুক কাজ সেরূপ না করে এরূপ করলে কেন?

গোলাম ও প্রভু

জনৈক সাহাবী একদা তাঁর গোলামকে প্রহার করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, এরা হচ্ছে তোমাদের ভাই, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অধীনস্থ্ করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা যা খাও তাদেরকে তা খাওয়াও এবং তোমরা যা পর তাদেরকেও তা পরাও।

ইসলাম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, কোন মানুষ কোন মানুষকে–চাই সে যত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্নই হোক–যেন ‘গোলাম বা ‘বাঁদী’ বলে সম্বোধন না করে। কেননা মানুষ মাত্রেই আল্লাহ্র গোলাম। মানুষ হিসাবে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

একদা জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে এই বলে সম্বোধন করেন, ‘হে আমার প্রভু’। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন উত্তরে বলেন, আমাকে ‘প্রভু’ সম্বোধন করো না। কেননা প্রভুতো একজনই-অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা।

একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত

মাখযূম গোত্রের জনৈক স্ত্রীলোক চুরিতে ধরা পড়ে। কুরায়শ রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট সুপারিশ করার জন্য হযরত উসামা (রা) কে রাজী করান। কেননা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু হযরত উসামা (রা) যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে উক্ত ব্যাপারে সুপারিশ করেন তখন তিনি জন সাধারণকে একত্রিত করে বলেন–

انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحدود ايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (بخارى)

"লোক সকল, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে এজন্য ধ্বংস করা হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন অভিজাত বংশের লোক চুরি করত তখন তারা তাকে (কোনরূপ শাস্তি না দিয়ে) ছেড়ে দিত। কিন্তু যখন কোন সাধারণ লোক চুরি করত তখন তারা তাকে শাস্তি প্রদান করত। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তাহলে তার হাতও অবশ্যই কাটা যেত (বুখারী)।"

ঘটনার বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানে শুধুমাত্র চুরির কথা বলা হলো। অন্যথায় প্রত্যেকটি অপরাধই উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা ঃ

(১) প্রকৃত ঘটনা এই যে, কিলাব গোত্রের দলপতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে নিবেদন করে-আপনি আপনার কিছু সংখ্যক সহচরকে আমার সাথে প্রেরণ করুন, যারা আমার সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দেবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বলেনঃ আমি নাজ্‌দের দিক থেকে নিশ্চিন্ত নই। তখন কিলাবের দলপতি নাজদের দিক থেকে তার যিম্মাদারী প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকজন সাহাবীকে তার সাথে প্রেরণ করেন। এদিকে কিলাবের দলপতি 'বি-রে মাউনায় পৌছার পর বিশ্বাসঘাতকতা করে। সে পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহ-যেমন, রাল, উসিয়া, যাকওয়ানের কাছে দূত প্রেরণ করে এবং তাদেরকে মুসলমানদের মুকাবালা করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়।

(২) এটা 'ওয়াকা-ই-রজী' নামে খ্যাত। প্রকৃত ঘটনা এই যে, 'আযল' ও 'কারা' গোত্র ইসলামের শিক্ষা প্রদানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে কয়েক জন সাহাবী প্রেরণের আবেদন জানিয়েছিল। সে অনুযায়ী তাদের কাছে দশজন সাহাবীর একটি দল প্রেরণ করা হয়। হযরত আসিম বিন ছাবিত (রা) কে ঐ দলের নেতা নিয়োগ করা হয়েছিল। ঐ গোত্রগুলোও মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(৩) এটা হচ্ছে 'ওয়াকা-ই রাজী'-এর একটি অংশ। রাজী নামক স্থানটি আসফান ও মক্কা মুকাররমার মধ্যস্থলে অবস্থিত।

(৪) সহীহ্ বুখারী।

(৫) সহীহ্ মুসলিম ঃ দ্বিতীয় খণ্ড।

(৬) মূল ঘটনা এই যে, জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সাথে ইতালীর একটি চুক্তি ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) সে তার মিত্রদের ছেড়ে বৃটেন ও ফান্সের সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে মোটেই ইতস্তত: করেনি।

(৭) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফান্স আক্রমণের উদ্দেশ্যে জার্মানী বেলজিয়ামের মধ্য দিয়েই তার সেনাবাহিনী নিয়ে ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা করে। সে বেলজিয়ামের জোট নিরপেক্ষতার কানাকাড়ি মূল্যও দেয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও জার্মানী বেলজিয়াম, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ডের জোট নিরপেক্ষতার কোন মূল্য দেয়নি। মিত্রশক্তি যখন ইরানের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় যুদ্ধ সামগ্রী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তখন ইরানের জোট নিরপেক্ষতা তাদের সামনেও কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে নি।

(৮) তার প্রকৃত নাম ছিল উতবা বিন উসাইদ।

(৯) প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কুরায়শরাই ছিল যুদ্ধের জন্য দায়ী। তারা ক্ষমতা বলে ও জবরদস্তি মূলকভাবে ইসলামকে মিটিয়ে ফেলতে চাচ্ছিলো। হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি দ্বারা তারা মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল, অথচ এটা ছিল ইসলামের জন্য একটি স্পষ্ট বিজয়। অতএব এই মৌলিক ও ভিত্তিমূলক বিজয় অর্জন করতে গিয়ে যে কোন শর্তই মেনে নেওয়া যেত। অবশ্য ইসলামের নির্দেশাদির সম্মান রক্ষা করা প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল অপরিহার্য।

(১০) তখন পর্যন্ত আরব দেশে এই প্রথাই প্রচলিত ছিল।

(১১) এই কবিতাটি 'সিকান্দার নামা' থেকে উদ্ধৃত। দারাসূম কায়ানী আপন সভাসদদের হাতে শোচনীয়ভাবে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। ঠিক ঐ মুহূর্তে সিকান্দার পশ্চাদ্ধাবন করে সেখানে এসে পৌঁছেন। তিনি দারার মস্তক কোলে তুলে নেন। কিন্তু দারা তো তার আত্মগরিমার নেশায় তখনো ছিলেন মাতোয়ার। তিনি বলে উঠেন; 'আমি হলাম যমীনের মুকুট। আমাকে যদি হেলাতে দোলাতে থাক তাহলে যমীন ভূমিকম্পের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। অবশ্য একথা এখানে বলে রাখা জরুরী যে, এর সাথে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই। এগুলো মাওলানা নিযামী মরহুমের অন্তর্চক্ষু ও কল্পনা বিলাসের লীলা খেলা মাত্র।

(১২) বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ, হজ্জ কিংবা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ্ মহান) উচ্চারণ করে বলতেন–

لا اله الا اللّه وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير . ائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللّه وعده ونصر عبده وهزم الاخراب وحده .

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সবশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী ও আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন, আপন বান্দাহ্কে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই বাহিনী সমূহকে (বা শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনীকে) পরাস্ত করেছেন।

রাহমাতুল লিল্ 'আ-লামীন

সূরা আম্বিয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'রাহ্মাতুল লিল 'আলামীন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে–

وَمَا أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ .

"আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।" (২১ ঃ ১০৭)

মাওলানা (আবুল কালাম আযাদ) এই বিষয়ের উপর সূরার টীকায় সংক্ষেপে যে কয়েকটি লাইন লিখেছিলেন তা দ্বারা তিনি এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবকে বিশ্বের জন্য রহমত (আশিষ) ঘোষণা করে পবিত্র কুরআন এমন একটি কষ্টিপাথর আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, যার সাহায্যে আমরা তাঁর আবির্ভাবের সমগ্র সত্যতা যাচাই করে নিতে পারি। তিনি (মাওলানা) সাথে সাথে এও বলেছিলেন, এটি হচ্ছে তাফসীরের ভূমিকার এমন একটি বিষয় যার হাকীকত ও সত্যতাকে ধর্মীয় ও ইতিকাদী' (বিশ্বাসগত) ভাবালুতা থেকে পৃথক রেখে, শুধুমাত্র ইতিহাসের পক্ষপাতহীন কঠোর মাপকাঠিতে বিচার-বিবেচনা করে দেখা হয়েছে।

ইং ১৯১৫ সালে তাফসীর 'আল বয়ান' এর মুকাদ্দমা (ভূমিকা) ছাপানোর কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইং ১৯১৫ সালের ১০ ডিসেম্বর 'আল বালাগ'-এর মধ্যে মাওলানা স্বয়ং বলেন, মুকাদ্দমার প্রাথমিক অংশও 'আল বায়ান' এর প্রথম সংস্করণের সাথে সাথে প্রকাশিত হয়ে যাবে। এরপর ইনশাল্লাহ্ মূল তাফসীর মুদ্রিত হতে থাকবে। মুদ্রণের কাজ অব্যাহত ছিল এমনি মুহূর্তে মাওলানাকে হঠাৎ কোলকাতা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি রাঁচী চলে যান এবং সেখানে তাঁকে নজরবন্দী করে রাখা হয়। ইং ১৯১৯ সনের ডিসেম্বরের শেষ দিকে তিনি, তাঁর উপর বৃটিশ সরকার কর্তৃক আরোপিত বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই পান। এরপর তাঁর ওখানে তালাশী শুরু হয় এবং তাঁর হাতে যত খসড়া, নোট এবঙ জড়করা স্লিপ ছিল তার সবটাই সরকার বাজেয়াপ্ত করে ফেলে। ঘটনাস্থলে এমন কেউ ছিল না, যে ঐ সব কাগজপত্রের বিস্তারিত তালিকা তৈরী করে সেটাকে সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা স্বাক্ষর করিয়ে রাখতে পারত। এর পরিণাম দাঁড়াল এই যে, ইং ১৯২০ সালে মালানা যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন তখন দেখতে পান, যে সব জরুরী বিষয়াদি ছাপা হচ্ছিল বা ছাপার জন্য তৈরী হয়ে গিয়েছিল শুধু সেগুলো নয়, বরং সেগুলোর সাথে সাথে তাঁর বহু বছরের সঞ্চিত নোটগুলোর অস্তিত্বও লোপ পেয়েছে। ইতিমধ্যে মাওলানা অসহযোগ আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করে ফেলেছিলেন। এ কারণে ইং ১৯২১ সালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে কেস চলে এবং তাঁকে এক বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়। ইং ১৯২৩ সালে লর্ড সিনহার হস্তক্ষেপের ফলে কাগজাদির কিছু অংশ যা তখনো বাকি ছিল মাওলানাকে ফেরত দেওয়া হয়। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু কাগজ এমন ছিল, যা সরকারী কর্মচারীদের অসতর্কতার কারণে নয়, বরং নির্দয়তার কারণে এমনিভাবে ছিন্ন ভিন্ন ও ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল যে, সেগুলোকে পুনরায় বিন্যস্ত করা মোটেই সম্ভব ছিল না। কিছু কিছু কাগজ এমন ছিল, যা ঘটনাচক্রে আগুন লাগার কারণে পুড়ে গিয়েছিল। 'মুকাদ্দামাই তাফসীর' এবং'আল বায়ান'-এর মুদ্রিত অংশসমুহের খসড়া এবং তরজমানুল কুরআনও ছিল সেই সব কাগজপত্রের অন্তর্ভুক্ত।

এখন মুকাদ্দামার ঐ মুদ্রিত অংশ সমূহের পোকাখাওয়া একটি ফর্মা পাওয়া গেছে, যা পাঠ করে জানা যায় যে, তা ছিল মুকাদ্দামার দ্বাদশ অধ্যায়ের একটি অংশ। তার প্রথম লাইনেই মুকাদ্দামার পঞ্চম অধ্যায়ের হাওয়ালা (রেফারেন্স) রয়েছে। সে অধ্যায়ে পবিত্র কুরআনের অবতরণ পদ্ধতি, সংকলন ও একত্রীকরণ সম্পর্কিত আলোচনা ছিল। এই প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, 'মুকাদ্দামা-ই-কুরআন'-এর দ্বাদশ অধ্যায় নিশ্চয়ই ছাপা হয়ে গিয়েছিল

অথবা কম্পোজ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু উল্লেখিত তল্লাশীর কারণে তার সবটুকুই-যা মুদ্রিত অথবা অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল-নষ্ট হয়ে যায়। এই সব ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, এই মহান ব্যক্তিকে মাতৃভূমির স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য শুধু নিজের সম্পদ-স্বাস্থ্য তথা ধন-প্রাণই উৎসর্গ করতে হয়নি, সেই সাথে উৎসর্গ করতে হয়েছে অনেক দুষ্প্রাপ্য দ্বীনী ও ইল্মী উপাদানও।

মোট কথা, ইং ১৯১৫ সালে মাওলানা যে মুকাদ্দামা প্রণয়ন করেছিলেন তা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং যা এর পরবর্তী সময়ে লেখা হয় তারও কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। আমি সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়েছি যাতে মাওলানার রচনাবলী থেকে এমন কিছু মিলে যায়, যা দ্বারা অন্ততঃ জানা যেতে পারে যে, তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এই বিষয়ের উপর তাঁর চিন্তাভাবনার পদ্ধতি কি ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ মাওলানার এমন একটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়, যাতে ঐ বিষয়ের শুধুমাত্র একটি দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এটাকে মূল আলোচনার শুধুমাত্র মুখবন্ধ মনে করা উচিত। তবে তা থেকে একথা অবশ্যই জানা যায় যে, ইতিহাসের নিরপেক্ষ ও নির্দয় আলোকে 'রাহ্মাতুল লিল্ আলামীন' কে কিভাবে বিচার বিবেচনা করা যেতে পারে।

ঐ প্রবন্ধের উপসংহারে মাওলানা খোদ লিখেছেন, এখন দেখতে হবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র ও কল্যাণময় সত্তা দ্বারা মানব জাতির সৌভাগ্য ও প্রকৃতিগত উন্নতি কিভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। এই বিরাট বিষয়ের পরিপূর্ণ আলোচনা তো সম্ভব নয়। তাই আগামী সংখ্যায় আকার ইঙ্গিতে হলেও এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো।

কিন্তু মাওলানার ঐ পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশের সুযোগ আর আসে নি। আমার বিশ্বাস, ঐ খসড়া ঐ সব কাগজপত্রের মধ্যে ছিল, যা সরকার কব্জা করে নিয়েছিল এবং এই অবস্থায় তা চিরতরে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন এর উপর হাহুতাশ করা ছাড়া তো আমাদের আর করার কিছু নেই।

যাহোক এই প্রবন্ধের সাথে অন্য কিছু জরুরী আলোচনাও আমি এখানে জুড়ে দিয়েছি। (সংকলক)

রাহমাতুল লিল আ-লামীন-১

وَمَا أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ .

"আমি তো তোমাকে বিশ্ব জগতের রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।" (২১ ঃ ১০৭)

মানব জাতির জন্য রহমত

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এমন একটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, যা কুরআনে বর্ণিত যাবতীয় গুণাবলীর মধ্যে সব চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য। বিশ্বজগতের রহমত বা আশিষ রূপে তাঁর এই বহিঃপ্রকাশ কোন দেশ কোন জাতি বা কোন বংশের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য। এই গুণ বর্ণনা করে কুরআন আমাদের হাতে একটি কষ্টিপাথর তুলে দিয়েছে। এর দ্বারা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বহিঃপ্রকাশের (আবির্ভাবের) যাবতীয় সত্যতা যাচাই করে নিতে পারি। যদি সত্যি সত্যি সমগ্র মানবজাতির জন্য, তাঁর আশিষরূপে আবির্ভূত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে তাঁর সত্যতার মধ্যে কোন সন্দেহ থাকে না। যদি এমনটি না হয়ে থাকে তাহলে তো কুরআন সত্যকে সমর্থন করল না (আল্লাহুর পানাহ্)। অতএব আমাদের উচিত সত্যের খাতিরে সত্যকে মেনে নেওয়া।

আর এই পরীক্ষা বা যাচাই ইতিহাসের পক্ষপাতহীন কঠোর মাপকাঠিতে হতে হবে। এটা হতে হবে সবরকমের বিশ্বাসগত উচ্ছ্বাস এবং বেআইনী আত্মস্বার্থপরতা থেকে পবিত্র। কেননা এখানে এটা হচ্ছে ন্যায় ও সত্যের আদালত। অতএব এ বিষয়টি ন্যায় ও সত্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে।

ইতিহাসের সিদ্ধান্ত

মূর্খতা ও পক্ষপাতিত্ব সব সময়ই ন্যায় ও সত্যের ঘোষণাকে রুখে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু পারে নি। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতিহাসও বিলম্ব করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একথা স্বীকার করা জরুরী যে, শেষ সিদ্ধান্ত ইতিহাসের মুখেই আমাদের শুনতে হবে এবং একজন ভক্তের মত নয় বরং একজন ইতিহাসিকের মত মনুষ্যজগতের এক একটি প্রান্ত থেকে এর সাক্ষ্য খুঁজে বের করতে হবে। আক্ষেপের বিষয়, এ পর্যন্ত এমন ধরনের কোন প্রচেষ্টা চালানো হয় নি, যার ভিত্তিতে এই বিষয়টিকে জ্ঞানগত পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা যেতে পারে। আমি তাফসীরের মুকাদ্দামায়ও প্রচেষ্টা চালিয়েছি এবং এ বিষয়টিই তার একটি বিশেষ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়। এখানে সে ব্যাখ্যা উপস্থাপনের সুযোগ নেই এবং সংক্ষেপে বিষয়টি বর্ণনা করলে কোন উপকার হবে বলে মনে হয় না। তাই বাধ্য হয়ে এখানেই আমাকে লেখার ইতি টানতে হল।

রহমতের মেঘ ও সজীব যমীন

যখন যমীন তৃষ্ণার্ত হয় তখন যমীন ও আসমানের প্রতিপালক পানি বর্ষণ করেন। যখন মানুষ খাদ্যের জন্য অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা রবি মওসূম পাঠিয়ে দেন। যখন অনাবৃষ্টি দেখা দেয় এবং যমীন ফেটে চৌচির হয়ে যায় তখন আসমান ঘনঘটায় ছেয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهِ فَاِذَا اَصَابَ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ٠

"আল্লাহ্, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে এটা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; এরপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খণ্ড বিখণ্ড করেন এবং আপনি দেখতে পান এটা হতে নির্গত হয় বারিধারা; তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাদের প্রতি ইচ্ছা এটা দান করেন। ওরা তখন হর্ষোৎফুল্লা হয়।" –(৩০ ঃ ৪৮)

আল্লাহ্-প্রদত্ত দৃষ্টান্তসমূহের হিকমত

আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ, যা তার বান্দাদের জন্য তুলে ধরা হয়েছে, তা সর্বদা প্রতিটি মানুষ ও কুদরাতী (লীলাময়) নিদর্শনাদির সাথে সম্পর্ক রাখে; যাতে করে, প্রতিটি সৃষ্টি তাঁর সত্যতা স্বীকার করে নিতে পারে এবং তা থেকে লাভ করতে পারে জ্ঞান ও বিজ্ঞতা। আল্লাহ্ তা'আলা এমন সব ঠুন্‌কো, পরিবর্তনশীল, কৃত্রিম ও অপ্রাকৃতিক বস্তুর উল্লেখ করেন, যেগুলোকে দেখা ও অনুভব করার জন্য কোন বিশেষ ধরনের জীবন, বিশেষ ধরনের জ্ঞান কিংবা বিশেষ ধরনের চালচলেনর প্রয়োজন রয়েছে। বরং তাঁর প্রত্যেকটি শিক্ষা এমন সাধারণ এবঙ নিখুঁত প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত, যা শুনে একজন জঙ্গলের রাখাল ও একজন শহুরে দার্শনিক সমভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আল্লাহ্‌র সত্যতা অনুভব করতে পারে। অতএব যদি তুমি দর্শন ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন নাও করে থাক, যদি তুমি কোন বৈজ্ঞানিক মানমন্দিরের মহামূল্যবান দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাশূন্যের গ্রহনক্ষত্র দেখার সুযোগ নাও পেয়ে থাক, যদি জড়বস্তুর বৈশিষ্ট্য রাজির কোন জ্ঞান তোমার নাও থাকে, যদি তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের পর বছর অতিবাহিত নাও করে থাক, যদি তুমি মরু অঞ্চলের অধিবাসী নাও হও, যদি তুমি পর্বত শৃঙ্গের বাসিন্দা নাও হও, যদি তুমি গাছের ডালপাতা ও লতাগুল্ম দিয়ে তৈরী কোন কুঁড়ে ঘরে বসবাস নাও করে থাক এবং আকাশের বিস্ময়কর গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে কিভাবে আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষ করা যায় সে জ্ঞান তোমার নাও থাকে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বের আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করা যায় সে অভিজ্ঞতা তোমার নাও থাকে তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি যদি মানুষ হয়ে থাক, যদি তুমি আত্মার অধিকারী হয়ে থাক, যদি তুমি ভূপৃষ্ঠে বসবাস করে থাক তাহলে তুমি অনায়াসে আসমানের প্রতিটি পরিবর্তনে, বাতাসের প্রত্যেকটি প্রবাহে, বৃষ্টির প্রতিটি ফোটায় আপন চিরঞ্জীব ও চিরবিদ্যমান আল্লাহ্‌কে তাঁর হিকমত ও কুদরতকে (লীলাবৈচিত্র), তাঁর রহমত ও দয়া এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর প্রেম ও ভালবাসাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। তখন তুমি তাঁকে পাবে নিকট থেকে নিকটতর। তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে আশা-প্রত্যাশার দৃষ্টিতে কখনো আসমানের দিকে চোখ তুলে তাকায় নি এবং তার বিদ্যুৎচমক এবং ঘন ঘটার মধ্যে আপন হারানো আশা পূরণ হওয়ার ভরসা খুঁজে পায় নি।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا ٠

"এব তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন তিনি তোমাদের দেখান বিদ্যুৎ, যা ভয় ও ভরসার সঞ্চার করে।" (৩০ ঃ ২৪)

মৃত্যুর পর জীবন

এরপর সে কোন্ সত্তা, যিনি-যখন তোমরা ও তোমাদের জমি তৃষ্ণার্থ ও ক্ষুধার্ত হয়ে এক ফোঁটা পানির জন্য হাহাকার করতে থাক, মাটির প্রতিটি কণা-অনুকণা আদ্রতা ও সজীবতার জন্য বেসামাল হয়ে পড়ে, ভূমণ্ডল আপন আবর্তনচক্রে পতিত হয়ে সূর্যরূপী অগ্নিকুণ্ডের নিকটতর হয়ে পড়ে এবং এর যাবতীয় গাছপালা, যাবতীয় গুল্মলতা, যাবতীয় পশুপাখী তথা সমগ্র সৃষ্টি নিজেদের শ্যামলিমা ও সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে; পাখী তার বাসায়, ডালপালা গাছের মধ্যে এবং মানুষ নিজেদের ঘরে পানির জন্য হাহাকার করতে থাকে এবং অনবরত: আকাশের উত্তপ্ত মহাশূন্যের দিকে নৈরাশ্যের দৃষ্টিতে চোখ তুলে তাকায়; তখন তিনি আপন প্রেম-ভালবাসা ও প্রতিপালনগুণের ছত্রছায়ায় নিরাশার পর আশার, নাস্তির পর অস্তির, মৃত্যুর পর জীবনের সুসংবাদ যমীনের প্রত্যেকটি অণু পরমাণুর কাছে পৌছিয়ে দেন।

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ .

"তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন ও তা দিয়ে ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।" (৩০ : ২৪)

আত্মার তৃষ্ণা ও অন্তরের ক্ষুধা

এটা হলো সেই 'ইলাহী ইনতিযাম' [আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যবস্থা] যা মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের দেহের খাদ্যের জন্য করেছেন। অতএব তিনি মানুষের আত্মার খাদ্যের জন্যও নিশ্চয়ই কিছু করে থাকবেন। সেই মহান প্রভু, যিনি যমীনের হাহাকার শুনে তাকে পানি দেন এবং দেহের অস্বস্তিকর অবস্থা দেখে তাকে খাদ্য সরবরাহ করেন; তিনি কি আত্মা ও ভাবজগতের তৃষ্ণা নিবারণের কোন ব্যবস্থা করেন নি? অন্তরের ক্ষুধা নিবারণের জন্য তার ভাণ্ডারে কি কোন নি'মাত থাকবে না?

সেই সত্তা, যিনি মাটিকে শুষ্ক তৃষিত অবস্থায় দেখতে পারেন না, যিনি গাছের ডালপালা ও পত্রপল্লবকে মরতে দেন না-তিনি কি মানুষের আত্মাকে ধ্বংসের মধ্যে ছেড়ে দেবেন? মানব জগতকে কি তিনি শুকিয়ে মারবেন? সেই বিশ্বজগতের প্রতিপালক, যিনি তোমাদের দেহকে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন তার পক্ষে এটা কী করে সম্ভব যে, তিনি তোমাদের আত্মাকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে হিদায়াতের (পথ প্রদর্শনের) আলোকে নিয়ে আসবেন না?

যখন ফিরআউন মূসা (আ) কে বললো, হে মূসা, তোমার প্রতিপালক কে? তখন মূসা (আ) শুধু বিশ্বজগতের প্রতিপালকের অস্তিত্বের জন্য অস্তিত্বের তথ্য সরবরাহ করেন নি, বরং তাঁর প্রভুত্ব ও প্রতিপালকের অপরিহার্য ও প্রকৃতিগত প্রমাণ অল্প কথায় অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

رَبُّنَا الَّذِيْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى .

"আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন ও তার প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন [যাতে সে সঠিক ও স্বাভাবিক পন্থায় আপন সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে]"- (২০ : ৫০)

অতএব তিনি যমীনের মাটির মধ্যে উৎপাদনক্ষমতা রেখে দিয়েছেন। এরপর পানি বর্ষণ করে তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ তার সামনে উৎপাদনের পথ খুলে ধরেছেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতিপালনগুণে অস্তি জগতের

প্রত্যেকটি অণু পরমাণুর জন্য ‘খিলকত’ (সৃষ্টি) ও ‘হিদায়াত’ (পথ প্রদর্শন) এর উপাদান সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মানুষকে তিনি দেহ, আত্মা উভয় জিনিস দিয়েই সৃষ্টি করেছেন এবং এ দুটিকে ’খিলকা’ত’ ও ‘হেদায়াত’-উভয় সামগ্রীই দান করেছেন।

আল্লাহ্ তা‘আলার রহমতের ভাণ্ডার

আল্লাহ্ তা‘আলার ‘রাবূবিয়াত’ (প্রতিপালন গুণ) যেভাবে দেহের জন্য যমীনের মধ্যে হরেক রকমের ভাণ্ডার রেখে দিয়েছে সেভাবে আত্মার খাদ্যের জন্য পরিপূর্ণ করে রেখেছে আসমানসমূহ। যেভাবে দেহের খাদ্য এবং যমীনের জড় জীবন ও উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য আসমান সমূহ ঘনঘটায় ছেয়ে যায়, বিদ্যুৎ চমকায় এবং মুষল ধারে পানি বর্ষিত হয় ঠিক সেভাবে আত্মা ও হৃদয় জগতেও পরিবর্তন হয়ে থাকে। এখানে যমীনের মাটি যেমন পানির জন্য ছটফট করতে থাকে ওখানে তেমনি মনুষ্যত্বের বঞ্চনা হেদায়াতের জন্য হাহাকার করতে থাকে। এখানে যখন পাতা ঝরে পড়ে, ডালপাল শুকাতে থাকে এবং ফুলের চিত্তাকর্ষক রূপ বিগড়ে যায় তখন তোমরা বল, আসমানের উচিত করুণা করা। ওখানেও যখন সত্যতরু ঝিমিয়ে পড়ে, পুণ্যের ক্ষেতসমূহ শুকিয়ে যায়, ন্যায় বিচারের বাগান পুড়ে ছারখার হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা‘আলার কালিমা-ই-হক ও সিদ্‌ক (সত্যবাণী)-এর পবিত্র বৃক্ষ দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে পত্রহীন ফলহীন পরিদৃষ্ট হয় তখন মনুষ্যত্বের আত্মা চীৎকার করে বলে, আমার উপর আল্লাহ্‌র করুণা বারি বর্ষিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এখানে যমীনের উপর যখন মৃত্যু নেমে আসে তখন আল্লাহ্‌র বারিবর্ষণ তাকে পুনরায় জীবন্ত করে তোলে।

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٠

“তিনি আপন অনুগ্রহের (বৃষ্টির) প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহী রূপে প্রেরণ করেন। যখন ওটাকে ঘন মেঘ বহন করে তখন তাকে নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পাঠাই পরে তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, এরপর তা দিয়ে সর্বাধিক ফল উৎপাদন করি। এভাবে মৃতকে জীবিত করি যাতে তোমরা শিক্ষালাভ কর।” (৭ ঃ ৫৭)

আল্লাহ্‌র রহমতের বিশ্বব্যাপী বহিঃপ্রকাশ

বিশ্ব মানবের রূহানী (আধ্যাত্মিক) ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে এমনি ধরনের এক বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হয়। এটা ছিল ‘রাহমতে এলাহী’ (আল্লাহ্‌র আশিষ)- এর একটি বিশ্ববিস্তৃত নূর(আলো), যা অস্তিজগতকে সবুজ শ্যামল জীবনের সুসংবাদ শুনায়। ফলে যমীনের শুষ্কতা এবং বঞ্চিত জনতার চিরন্তন দুরবস্থার দিন চিরতরে কেটে যায়। সেই পবিত্র আল্লাহ্, যিনি সিনাই পর্বতের শীর্ষে বলেছিলেন, হাজার পবিত্র লোকের সাথে আমার জালাল ও পরাক্রমের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।–শেষ পর্যন্ত তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল এবং ফারানের শীর্ষ চূড়ায় তাঁর দয়া ও মহানুভবতার বারি বর্ষিত হতে লাগলো।

এটা ছিল ‘হিদায়াতে ইলাহী’ (আল্লাহ্‌র পথ প্রদর্শন) এর পরিপূর্ণতা। এটা ছিল ‘শরীয়াতে রাব্বানী’ (আল্লাহ্‌র দ্বীন) এর উন্নতির শীর্ষ চূড়া। এটা ছিল রাসূল-প্রেরণর এবং আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হওয়ার পরিসমাপ্তি। এটা ছিল মানব জাতির সৌভাগ্যের সর্বশেষ পয়গাম। এটা ছিল দুনিয়ার উত্তরাধিকারিত্বের শেষ দান। আর এটাই ছিল সর্বশেষ নবী, সমগ্র বিশ্বের রহমত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) এর আবির্ভাব।

এটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জন্মগ্রহণের ঘটনা, যা ছিল ইসলামী দাওয়াতের বহিঃপ্রকাশের প্রথম দিন। আর এটা হচ্ছে রবীউল আউয়ালের মাস, যে মাসে মুসলিম উম্মতের ভিত্তি স্থাপিত হয়- যা থেকে সমগ্র বিশ্বের পথ প্রদর্শন ও সৌভাগ্যের প্রাসাদ গড়ে উঠবে। এটা ছিল হিজায মরু অঞ্চলের বাদশাহীর প্রথম দিন। এটা আরবের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার জন্ম দিন ছিল না, কেবল জাতি-সম্প্রদায়ের ক্ষমতা লাভের ঘোষণা ছিল না, এর মধ্যে শুধু বংশসমূহ বা দেশসমূহের বুযুর্গী বা মাহাত্ম্যের আহ্বান ছিল না- যেমন সর্বদা হয়ে আসছে - সত্যি কথা বলতে গেলে, এটা হচ্ছে বিশ্বের সমগ্র ইতিহাসের চরম পুঁজি- বরং এটা ছিল বিশ্বে 'রাব্বানী সাম্রাজ্য' (আল্লাহ্ তা'আলার শাসন) প্রতিষ্ঠার জন্ম দিন। এটা ছিল বিশ্বের উন্নতি ও উৎকর্ষের প্রতিষ্ঠাতার আবির্ভাব দিবস। এটা ছিল ভূগোলকের সৌভাগ্যের আত্মপ্রকাশ। এটা ছিল মানব জাতির সামগ্রিক সম্মান ও আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার দিন। এটা মানুষের বাদশাহদের কিংবা জাতিসম্প্রদায়ের নেতাদের কোন বিজয় ছিল না, বরং এটা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার একটি মাত্র বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের প্রবল শক্তিপরাক্রমের আরশের (উচ্চাসনের) শেষ ও চিরস্থায়ী বহিঃপ্রকাশ।

অতএব এ দিনটিই সব চাইতে বড়। কেননা এই দিনেই বিশ্বের সর্ববৃহৎ গৌরব-গরিমা প্রকাশিত হয়। এর স্মরণ না কোন জাতি সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত, আর না কোন বংশের সাথে সংযুক্ত; বরং এটা হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের একটি সাধারণ ও সার্বজনীন 'আয্মাত ও মাহাত্ম্য, যা এই বিশ্ববাসী ততক্ষণ পর্যন্ত ভুলতে পারবে না – যতক্ষণ তারা এই বিশ্বের সজীবতা ও চিরন্তনতার জন্য আদালত (ন্যায় বিচার) ও সাদাকাত (সত্যতা) এর মুখাপেক্ষী।

বিশ্ববাসীর আত্মম্ভরিতা ও তার পরিণাম

বিশ্বে অনেক বড় বড় বিপ্লব ঘটে গেছে। এ গুলো বিশেষ বিশেষ মানুষের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত বলে ঐ সব মানুষের জন্ম দিবসকে বিশ্ববাসী অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে স্মরণ রাখতে চায়। এই সব স্মারক দিবসের তালিকাও আবার অনেক লম্বা চওড়া। এই তালিকার মধ্যে রয়েছে বাদাশাহদের মণিমুক্তা খচিত সারি সারি সিংহাসন, বিজয়ীদের অপ্রতিরোধ্য তরবারিসমূহের ঝংকার, সেনাপতিদের বর্মের বিরাটত্ব, হাকীমদের (বিজ্ঞানীদের) হিকমতসমূহ, দার্শনিক ও জ্ঞানীগুণীদের জ্ঞানবিজ্ঞানের ভান্ডারসমূহ, কারিগরদের আবিষ্কারসমূহ, দেশপ্রেমিকদের ভাষণরাজি, জাতীয় নেতা ও দেশের স্বার্থ উদ্ধারের প্রতি আহ্বানকারীদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের কাহিনীসমূহ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্ব যদি আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যের প্রকৃত দিনটিকে স্মরণ রাখতে চায় তাহলে এগুলোর মধ্যে কোন্‌টিকে স্মরণ রাখবে? এদের মধ্যে কে আছেন, যিনি বিশ্বকে সর্ববৃহৎ বস্তুটি দান করেছেন, যাতে করে বিশ্ববাসী স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে সর্বপ্রথমে এবং সর্বাগ্রে তাকেই স্মরণ করে।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শাহানশাহ

আসুন আমরা সর্বপ্রথম বিশ্বের ঐ সব নামকরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শাহানশাহদের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখি, যারা বিশ্বের এক একটি বিরাট ভূখন্ডকে অস্ত্রবলে নিজেদের করতলে রেখেছেন এবং এমন সব দরবার ও শাহী মহলে জীবন যাপন করেছেন, যেগুলোর দেওয়াল এবং ছাদ ছিল সোনারূপা, মণিমুক্তা ও হীরা-জহরতের তৈরি। তারা প্রচুর ধনসম্পদ একত্রিত করেছেন, তাদের কাছে লৌহনির্মিত নানা জাতের ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্র ছিল। ফলে তাদের অধীনে ও মালিকানায় ছিল এক একটি বিরাট সংখ্যক জনতা। অতএব তাদের জন্মগ্রহণের ঘটনাও জাঁকজমকপূর্ণ ও অবিস্মরণীয় হওয়া উচিত।

কিন্তু বিশ্ব যদি তাদের জন্মের কথা স্মরণ করে তাহলে বলুন, তারা বিশ্বের জন্য কি করে গেছেন? তাদের বিজয়ের কাহিনী ছিল অত্যন্ত বিরাট ও ব্যাপক। তাদের ধন-দাওলাত ছিল প্রচুর, যা তাঁরা বিশ্বের জনবসতিসমূহ ধ্বংস করে লুটেপুটে নিয়ে আসতেন এবং বিরাট বিরাট আয়তনের ভান্ডার সমূহে স্তূপীকৃত করে রাখতেন। কিন্তু

তাতে বিশ্বের এমন কি উপকার হয়েছে যে, বিশ্ববাসী তাদের স্মরণে গর্দান ঝুঁকিয়ে দেবে? যদি তারা অনেক বড় দিগ্বিজয়ী হয়ে থাকেন তাহলে বলতে হবে তারা অবশ্যই বিশ্বে সর্বাধিক জনপদ ধ্বংস করেছেন, সর্বাধিক রক্ত-বন্যা বইয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র সর্বাধিক সংখ্যক বান্দার গলায় গোলামীর জিঞ্জীর ঝুলিয়ে দিয়েছেন। এরপর বিশ্ববাসী কি তাদের উপর যে হত্যা, লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছিল এবং তাদেরকে যে অত্যন্ত নির্মমভাবে অভিশপ্ত দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল সেগুলোর কথা ঘটা করে স্মরণ করবে?

আলেকজান্ডার ও অন্যান্য দিগ্বিজয়ী

আলেকজান্ডার ছিলেন প্রাচীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় দিগ্বিজয়ী। তিনি সমগ্র বিশ্বকে জয় করে নিজেকে বিশ্ববাসীর পূজনীয় করে তুলতে চেয়ে ছিলেন। এখন বিশ্ব যদি তার জন্মদিনকে স্মরণ করে তাহলে এর দ্বারা কি ধরণের ঘটনাকে স্মরণ করা হবে? এর একমাত্র উত্তর হলো, এর মাধ্যমে বিশ্বের জনবসতিসমূহ ধ্বংসের এবং স্বাধীন মানবজাতিকে গোলামীর জিঞ্জীরে আবদ্ধ করার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস মানুষের হস্তগত হবে।

বিশ্বে যত রাজা-বাদশাহ্‌র জন্ম হয়েছে তাদের সকলের জীবনের কীর্তিসমূহের সারকথা এছাড়া আর কিছু নয় যে, যিনি যত বড় বাদশাহ্ ছিলেন, স্বাধীন মানুষকে দাসে পরিণত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তত বেশী পারঙ্গম এবং অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত মানুষের মান-সমভ্রম লুটে নেওয়ার ক্ষেত্রে তত বেশী তৎপর। অতএব যে সব ব্যক্তির অস্তিত্বিই ছিল স্বয়ং বিশ্বের জন্য ক্ষতস্বরূপ, সেসব ব্যক্তিকে স্মরণ করলে বিশ্ববাসী কি তাদের সেই দগদগে পুরানো ক্ষতকেই স্মরণ করবে না?

বিজ্ঞানী ও দার্শনিক

বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান, দার্শনিকদের দর্শন এবং আবিস্কারকদের আবিষ্কারাদি নিঃসন্দেহে বিশ্ব ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু তারা যদি বিশ্ববাসীর কাছে নিজেকে স্মরণীয় করে রাখতে চান তাহলে তাদেরকে বলতে হবে, তারা তাদের বিজ্ঞান, দর্শন এবং বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ দ্বারা বিশ্বের প্রকৃত দুঃখ এবং যমীনের বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে কি ভূমিকাটি পালন করেছেন? মহাশূন্যে অগণিত তারকারাজি ছড়িয়ে রয়েছে। নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তি চিন্তা গবেষণার এক বিরাট মস্তিষ্ক এবং দূরদর্শিতার এক বিরাট দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম আমাদের কাছে এ তথ্য প্রকাশ করেছিলেন যে, এগুলো হচ্ছে বিরাট বিরাট গ্রহ নক্ষত্র, যারা আপন আপন নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলছে এবং তাদের আবর্তন-বিবর্তনের নির্দিষ্ট সময় ও দিনক্ষণ রয়েছে। কিন্তু বিশ্ববাসী যখন তারকারাজির এই অতি সত্য তথ্যটি জানত না তখনও তারা ছিল ব্যাধিগ্রস্ত এবং এটা জানার পরও তারা সেই ব্যাধিগ্রস্তই রয়ে গেছে। তাদের প্রকৃত দুঃখ এই ছিল না যে, মানুষ আকাশ সম্পর্কে অতি অল্প জ্ঞান রাখে, বরং সর্বদা তারা এই একটি ব্যাধিতেই ভুগছে যে, মানুষ তার সম্পর্কে তার সুপ্রকৃতি সম্পর্কে সর্বোপরি তার সৌভাগ্যের চাবিকাঠি সম্পর্কে কিছুই জানত না।

স্থাপত্য শিল্পী

যদি আপনারা সেই স্থাপত্য শিল্পীকে মহান মনে করেন, যিনি মানুষের জন্য স্থাপত্য শিল্প আবিষ্কার করেছেন-যাতে তারা মজবুত ঘরবাড়ী ও সুন্দর ছাদের নীচে বসবাস করতে পারেন–তাহলে আপনাদেরকে একটি প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিতে হবে। প্রশ্নটি হলো, মানুষ যখন গাছতলায় বসবাস করত তখন কি তারা পুণ্যবান ও সত্যবাদী ছিল না? তারা কি বড় বড় প্রাসাদে বসবাস করে নিজেদের হারানো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে গেছে? আসল কথা হলো, বিশ্বের মূল ব্যাধি হচ্ছে সত্যিকার মনুষ্যত্বকে হারিয়ে বসা। মানুষের কল্যাণ তথা বিশ্ব শান্তি হচ্ছে

সেই নি'মাত, যার অনুসন্ধান চলছে বিশ্বের সেই সূচনা কাল থেকে প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ বস্তুতে। এরপর বলুন, যদি এই বড় বড় স্থাপত্য শিল্পীরা মানুষের মধ্যে সর্ববৃহৎ মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন তাহলে তাদের আবিষ্কারসমূহ মানুষকে কি পরিমাণ শান্তি দান করেছে? কি পরিমাণ স্বস্তি দিয়েছে? কি পর্যন্ত সৌভাগ্যের রাস্তায় পরিচালনা করেছে? তারা বিস্ময়কর মানব জীবনের কোন্ ভাগ্যবান রহস্যটি উদঘাটন করেছেন? তারা আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের সম্পর্ককে কি পরিমাণ ঘনিষ্ঠ করে দিতে পেরেছেন? যদি না পেরে থাকেন তাহলে বিশ্ববাসী তাদের অধিকারসমূহ নিজেদের ভাণ্ডারে তুলে রাখতে পারে, কিন্তু তাদের (স্থাপত্য শিল্পীদের) স্মরণে তারা আনন্দোল্লাস করতে পারে না। কেননা তারা তাদের (বিশ্ববাসীর) প্রকৃত দুঃখ দূরীকরণে কোন ভূমিকাই রাখতে পারেন নি।

আধুনিক কাল

যা হোক, প্রাচীন বিশ্বের ভাণ্ডারে যা কিছু আছে তার কথা ছেড়ে দিন। তবে মনে রাখুন, ব্যাবিলন, গ্রীস এবং আলেকজান্দ্রিয়ার অতীত কীর্তি এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত নিদর্শনাদির মধ্যে যদি বিশ্ববাসীর জন্য কিছু না-ও থেকে থাকে তবে এটা খুবই সম্ভব যে, আধুনিক যুগের লন্ডন, বার্লিন ও প্যারিসের বিস্ময়কর জনবসতিসমূহ এবং তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির মধ্যে বিশ্ববাসী সেই বস্তুটি পেয়ে যাবে, যার সন্ধানে তারা সেই আদিকাল থেকে ব্যস্তত্রস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে।

বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার সূচনা যে সব বড় বড় দাবীর ভিত্তিতে হয়েছে, সেগুলো অবশ্যই আপনাদের সামনে রয়েছে। তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমাদের বলা হয়েছিল, বর্তমান সভ্যতার সাথে প্রাচীন সভ্যতা সমূহের কোন মিল নেই। কেননা প্রাচীন সভ্যতাসমূহের শাখা-প্রশাখার মধ্যে পরস্পর সমন্বয় ছিল না। সেগুলোর ভিত্তি সঠিক ও সত্যনির্ভর ছিল না। সেগুলো মানবীয় ইল্‌ম ও আমল (জ্ঞান ও কর্ম)-এর সবগুলো শাখাকে একই সময়ে পরিপূর্ণতা প্রদান করতে পারে নি। প্রাচীন সভ্যতা-সমূহের বাহকরা তাদের জ্ঞান ও কর্মকে সঠিকভাবে সমন্বিত ও সুবিন্যস্ত করতে পারেন নি। তারা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রচারে সেই সব মাধ্যম করায়ত্ত্ব করতে পারেন নি, যেগুলোর সাহায্যে আমরা আজ সমগ্র বিশ্বকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতা সংস্কৃতির একক গৃহে পরিণত করেছি। অতএব অতীত সভ্যতা সংস্কৃতির অসাফল্য দ্বারা বর্তমান সভ্যতা সংস্কৃতির অসাফল্য প্রমাণ করা যেতে পারে না। এটা এবং এর সাথে এমন ধরনের আরো অনেক দাবী ছিল, যেগুলো দ্বারা চলতি সভ্যতা সংস্কৃতির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবঙ যেগুলোর ছত্রছায়ায় ঘোষণা করা হত যে, বিশ্বে সব চেয়ে বেশী ক্ষমতা হচ্ছে বর্তমান সভ্যতা-সংস্কৃতির। অথচ একমাত্র আল্লাহ্ই হচ্ছেন সব চাইতে বড়।

لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا ۔

"ওরা ওদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং ওরা সীমা লংঘন করেছে গুরুতররূপে।" (২৫ ঃ ২১)

নিজের হাতে নিজের ঘর ধ্বংসকারী

এবার দেখুন, বিশ্ব যখন সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে তখন সে কি উত্তর পাচ্ছে?

সে যে উত্তর পাচ্ছে তা হলো ঃ

আল্লাহ্ তা'আলার সেই মহাপরাক্রমশালী হাত, যা ইতিপূর্বে সামূদ, 'আদ এবং আরো অনেক বড় বড় জনবসতিকে শাস্তি প্রদান করেছিল পুনরায় আপন ভয়ানক রূপ নিয়ে হাযির হয়েছে। আপনারা ইউরোপের বর্তমান

মহাযুদ্ধ[১] এবং সেখানকার সভ্য জাতিসমূহের পরস্পর হত্যাকাণ্ড ও রক্তারক্তির দিকে চতুষ্পদ জন্তুর মত নয় বরং একজন মানুষের মত তাকান এবং দেখে নিন আপনাদের চোখের সামনে কি ঘটে চলেছে। এটা সভ্যতা ও বর্বরতার সংঘর্ষ নয়, এটা জ্ঞান ও মূর্খতার সংঘর্ষ নয় বরং এটা হচ্ছে সেই সভ্যতা, যে সভ্যতা খোদ সভ্যতাকে ধ্বংস করছে, এটা হচ্ছে সেই জ্ঞান, যে খোদ জ্ঞানকে জবাই করছে, এটা হচ্ছে সেই শিল্প, যে খোদ শিল্পকে পিশে মারছে এবং এটা হচ্ছে আবিষ্কারের সেই দাম্ভিক শয়তান, যে আবিষ্কারেরই অভিশপ্ত শয়তানকে দংশন করছে আর এভাবে সভ্যতার দাম্ভিকতা সভ্যতার দাম্ভিকতাকেই চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ . –"ওরা নিজেদের বাড়ীঘর নিজেরাই ধ্বংস করে ফেলল।" (৫৯ ঃ ২)

অতএব স্মরণ করতে হবে পার্থিব সহায় সম্পদে নিঃস্ব ঐ সব ব্যক্তিকে, যারা ছিলেন সভ্যতা-সংস্কৃতির বাদশাহ্, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকর্তা এবং শিল্প উদ্ভাবনের অগ্রনায়ক। সুতরাং আপনারা তাদেরকে ধরুন এবং নিয়ে দাঁড় করান ইউরোপের ঐ সব ময়দানে, যেখানে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-প্রজ্ঞার মহাপরাক্রমশালী ধ্বজাধারীরা মানুষকে পুড়িয়ে অথবা শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলার জন্য ধোঁয়া ও বিষাক্ত গ্যাস উদ্গিরণকারী উপাদানসমূহ পথে প্রান্তরে, এখানে সেখানে বিছিয়ে রেখেছে। এই সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ীর ধ্বংসস্তূপের উপর, রক্তগঙ্গার উপর এবং মৃত্যুপথযাত্রী ছটফটকারী মানুষের লাশের উপর আপন মাহাত্ম্যের স্তম্ভ রচনা করেছে।

এবার এই সভ্যতা-সংস্কৃতির ধ্বজাধারীদের বলুন, তোমরা কৃতজ্ঞতা ভরে ও পরম সম্মানের সাথে ঐ সব ব্যক্তিদের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নাও, যারা সত্যিকার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। কেননা মহাশূন্যে উড্ডয়ন এবং আরো অনেক কিছু করার জ্ঞান তোমরা অর্জন করলেও এই জ্ঞান তো মানব জীবনের প্রকৃত দুঃখ দূর করার ক্ষেত্রে কোন কাজই দেয় নি।

কাকে স্মরণ করা হবে?

শেষ পর্যন্ত স্মরণ করার জন্য বিশ্ববাসী কাকে নির্বাচন করবে? তারা কি ঐ সর্বোৎকৃষ্ট দার্শনিককে স্মরণ করবে, যিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সেই পথ খুলে দিয়েছেন, যে পথ অনুসরণ করে তার পরবর্তী মানুষেরা জীবন-বিধ্বংসী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করেছে? তারা কি রসায়ন শাস্ত্রের সেই দেবতারূপী অগ্রনায়ককে স্মরণ করবে, যাকে নিয়ে বর্তমান সভ্যতা সংস্কৃতি সবচাইতে বেশী গর্ব বোধ করে এজন্য যে, তিনি এমন সব বিষাক্ত গ্যাস, এমন সব জীবন বিধ্বংসী বোমা, শেল এবং আরো অনেক মারাত্মক উপাদান উদ্ভাবন করে গেছেন, যেগুলোর সামনে আজ মানবজাতি একেবারে অসহায় এবং যা কয়েক মিনিটের মধ্যে বড় বড় মানব বসতিকে মৃত্যুর অভিশাপে সম্পূর্ণ ভরে দিতে পারে? ঠিক আছে, বাষ্পশক্তির আবিষ্কারককেই ডাকুন। কেননা তিনি এত বিস্ময়কর মাহাত্ম্যের অধিকারী ছিলেন যে, বাষ্পের অজ্ঞাত শক্তিকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। কিন্তু এ দুনিয়ার মানুষ তাকে কেন স্মরণ করবে, যে দুনিয়া প্রত্যক্ষ করছে যে, বাষ্পের শয়তানেরই মধ্যে সেই কলুষতা সর্বাধিক পরিমাণে লুকিয়ে রয়েছে, যা আজ যুদ্ধের ময়দানে বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন বেশে মানুষের উপর সবচাইতে মারাত্মক মৃত্যু ছোবল হানে এবং তা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য মানুষের সমস্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বেকার ও নিষ্কর্মা হয়ে পড়েছে।

এরপর দুনিয়া কি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান প্রজ্ঞার ঐ সব দাম্ভিক উদ্ভাবকদের জন্মদিবস ঘটা করে পালন করবে, যারা মানব জাতির মৃত্যু ও ধ্বংসের জন্য তো সব কিছুই করেছেন, কিন্তু তাদের শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার জন্য কিছুই করতে পারেন নি? তারা মহাশূন্যে ওড়ার, সমুদ্রের গভীরে যাবার, বিদ্যুৎকে নিয়ন্ত্রণ করার, বায়ু প্রবাহ ও অণুপরমাণুকে বার্তাবাহক নিযুক্ত করার এবং অতি দ্রুতগামী যানবাহন তৈরী করার সরল সহজ রাস্তা বাত্‌লে

দিয়ে গেছেন, কিন্তু মানুষকে সৎ ও সত্যবাদী বানাবার, বিশ্বে ন্যায় বিচার ও সত্য প্রতিষ্ঠা করার শান্তি ও সুখের সাম্রাজ্য গড়ে তোলার, জুলুম অত্যাচারের আগাছাসমূহ যমীন থেকে উপড়ে ফেলার, সবলের জবরদস্তিমূলক আচার-আচরণ থেকে দুর্বলকে রক্ষা করার এবং সাধারণ মানুষকে বন্য পশু ও সাপ-বিচ্ছুদের মত নয়; বরং মানুষের মত বেঁচে থাকার কোন সঠিক রাস্তা বাতলে দিয়ে যান নি।

টীকা ঃ

(১) এই প্রবন্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে (১৯১৪-১৮) লেখা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) এই প্রবন্ধের বিষয় বস্তুর সত্যতা পুনরায় প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 'আদ ও সামূদের মত অনেক জাতি এবং নমরূদ ও ফির'আউনের মত অনেক রাজা-বাদশাহ্ নিজেদের পথভ্রষ্টতা ও বাড়াবাড়ির কারণে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন পন্থায় দুনিয়া থেকে ধ্বংস হয়ে গেছে। ইউরোপের উপর মৃত্যু ও ধ্বংসের যে ভয়ংকর অবস্থা মহাযুদ্ধের আকারে নেমে আসে তা সর্বাবস্থায় সেই শাস্তি, যা আল্লাহ্র অবাধ্য পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন যুগে নেমে এসেছিল। ইউরোপবাসীরা কি নিজেদের হাতে নিজেদের ঘর ধ্বংস করে নি? হিটলার স্টালিন, চার্চিল এবং আরো অনেক রাষ্ট্রনায়ক কি একে অন্যকে চিরতরে ধ্বংস করে ফেলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে নি?

রাহমাতুল লিল আ'লামীন-২

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

"আমি তো তোমাকে বিশ্ব জগতের রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।" ২১ ঃ ১০৭

পবিত্র কুরআনের হিকমত (যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানার উপায়) শিক্ষাদান

যারা কুকুরের মত ঘুরে ঘুরে কিংবা বাঘের ন্যায় দ্রুত গতিতে সর্বদা ইউরোপের সভ্যতা-সংস্কৃতির পূজা করে থাকেন এবং ধর্মকে নিয়ে হাসাহাসি করেন এই বলে যে, এটা কেবল 'আখিরাত'-এর দোহাই দিয়ে থাকে এবং ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মত বিজ্ঞান ও বিজ্ঞতার কোন কথা বলে না-তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, 'আপনারা আজ সম্ভবত: পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটির মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন, যে আয়াত সম্পর্কে সহীহ্ হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, আয়াতের তিলাওয়াত মানুষকে শেষযুগের ফিতনা থেকে রক্ষা করবে।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ـ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ـ

"বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে ওদের প্রতিপালকের নির্দেশাবলী ও তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে, ওদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়; সুতরাং কিয়ামতের দিন, ওরা দুনিয়ায় পুণ্য মনে করে যে সকল কাজ করেছে সেগুলোর কোন ওজন (গুরুত্ব) থাকবে না।" (১৮ ঃ ১০৩-৫)

অন্যত্র অস্বীকারকারীদের কার্য সম্পর্কে বলা হয়েছে-

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ـ

"ওরা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে ওরা গাফিল।" (৩০ ঃ ৭)

আখিরাতকে স্মরণ করার অর্থ এই নয় যে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্ম ছেড়ে দেওয়া হবে। একথার ব্যাখ্যা আপনারা বর্তমান ইউরোপীয়দের জীবনেই পাবেন, যারা নিজেদেরকে শুধু দুনিয়ার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছে এবং এই 'ফেরেবে' পড়ে তারা আল্লাহ্র কথা চিন্তা করার কিংবা তাঁর সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের কোন সময় ও সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে তারা এই বস্তুটি অবশ্যই অর্জন করে ফেলেছে, যেটাকে তারা সভ্যতা নামে অভিহিত করে, কিন্তু ঐ বস্তুর ধারে কাছেও যেতে পারে নি, যা মানুষকে সত্যিকার শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার দিকে চালিত করে।

আল্লাহ্‌র পবিত্র রাসূল (সা)

আপনারা বলতে পারেন, এটা হচ্ছে ঐ সব মানুষের অবস্থা, যাদের গর্ব ছিল শুধুমাত্র দেহ ও জড় উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এদের জন্ম গ্রহণের স্মরণে দুনিয়াবাসী যদি শান্তি ও সুখ না পায় তাহলে তারা সভ্যতা-সংস্কৃতির যাবতীয় লাইন ডিংগিয়ে বিশ্বের বড় বড় ধর্মের কোন না কোনটির আশ্রয় অবশ্যই নেবে। তারা তখন ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে এবং আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর পয়গামবাহীদের সন্ধানে বের হবে।

হ্যাঁ, বিশ্ববাসী যদি তাই করে তাহলে প্রকৃতই তাদের যাবতীয় বিপদের অবসান ঘটবে। এটা হবে সর্বাংগীন দুঃখ ও অসহায়ত্ব থেকে স্থায়ী সুখ ও আরামের প্রতি তাদের একটি সফল প্রত্যাবর্তন। এবার নিঃসন্দেহে তারা তাদের লক্ষ্য বস্তু অর্জন করতে পারবে। পবিত্র কুরআনও এটাকেই মানুষের দুঃখ ও অশান্তি দূর করার পথ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। মানুষ যখন রাজা-বাদশাহ্, জাতীয় নেতৃবৃন্দ, জ্যোতিষী এবং জ্ঞান ও ধর্মের মিথ্যা দাবীদারদের হুংকার-আস্ফালনের জটজালে আটকা পড়েছিল তখন কুরআন তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিল, যেন তারা সত্যনবী ও আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানকারীদের পথ অনুসরণ করে এবং তাঁদের জীবনকেই গ্রহণ করে আদর্শ জীবন হিসাবে।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ . صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ .

"(হে আল্লাহ্) আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর, তাদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ (অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবানদের পথ)।" –(১ঃ ৫-৬)

কিন্তু এই পথে এসেও দেখতে হবে, কোন্ সেই জীবন, যার দাওয়াত ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে শান্তি ও সৌভাগ্যের পরশ পাওয়া যেতে পারে?

বিশ্বে আজ যে সব বড় বড় ধর্ম বিদ্যমান, জাতি-গোষ্ঠীর জ্ঞান অনুযায়ী সেগুলো মোটামুটি দুধারায় বিভক্ত। এর একটি হচ্ছে সেমেটিক ধারা। বিশ্বের য়াহূদী ও খ্রীস্টান জাতিসমূহ এই ধারার অন্তর্ভুক্ত। অপরটি হচ্ছে আর্য ধারা। গৌতম বুদ্ধ এবং ভারতের অন্যান্য ধর্ম প্রবর্তকরা এই ধারার সাথে সম্পৃক্ত।

হযরত মূসা (আ)

দুনিয়ার জন্য সবচাইতে বড় রসূল যদি য়াহূদী ধর্মের ইতিহাসে থেকে থাকে তবে তারা হযরত মূসা (আ) এর জীবন এবং তার আবির্ভাবের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করবে। যখন তারা এরূপ করবে তখন তাদের একথা উপলব্ধি করা উচিত যে, হযরত মূসা (আ)-এর জীবনের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে তিনি তাদেরকে মিসরের একটি জালিম ও অত্যাচারী সরকারের জুলুম-অত্যাচার ও দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং দান করেছিলেন শান্তি ও নিরাপত্তা।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মূসা (আ) আপন জাতি বনী ইসরাঈলের জন্য একটি অতি পবিত্র ও বিরাট জিহাদ করেছেন। এটি তার এমন একটি স্মরণীয় ঘটনা, যার কথা বিশ্ববাসী কখনো বিস্মৃত হবে না। কিন্তু একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তৎকালীন সময়ে পরাধীনতা ও দাসত্বের শিকলে শুধু বনী ইসরাঈল নয়, বরং সমগ্র ভূলোকের সকল মানুষই বাঁধা ছিল। অতএব বিশ্বের জন্য সেই হাতিয়ারই সর্বাধিক কৃতিত্বের দাবী করতে পারে, যা শুধু একজন ফিরআউনের পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গবে না, বরং বিশ্বের সকল ফিরআউনের প্রভাব- প্রতিপত্তিও ধূলিস্যাৎ করে দেবে।

নিঃসন্দেহে হযরত মূসা (আ) আপন জাতি অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের বংশধদের জন্য বিরাট সংগ্রাম করেছিলেন এবং এটা তাঁর বিশ্বব্যাপী আদর্শ দৃষ্টান্ত, দুনিয়াবাসীকে এর স্বীকৃতি প্রদান করা চাই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্ববাসীর

জন্য তিনি কি করেছেন? দুনিয়া কেবল বনী ইসরাঈলের নাম নয়। গাইরুল্লাহ্‌র পূজার শিকল কেবল বনী ইসরাঈলের পায়ে আবদ্ধ ছিল না; বরং ভূপৃষ্ঠের সব লোকের পা এর ভারী বোঝায় জখ্‌মী ছিল।

সুতরাং দুনিয়াবাসীর জন্য সেই তলোয়ারই প্রিয় হতে পারে; যা কেবল ফেরআউনের স্থাপিত শিকলকেই কাটাবেনা; বরং দুনিয়ার তামাম ফিরআউনদের সিংহাসন উল্টে দেবে।

হযরত ঈসা (আ)

ইসরাঈলী ধর্মীয় ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘটনা হচ্ছে হযরত ঈসা (আ) এর আন্দোলন। কিন্তু হযরত ঈসা (আ) এর দাওয়াতের শিক্ষা তো আমাদের সামনেই রয়েছে। ঈসায়ী ধর্মের সাথে সম্পর্কিত জাতিগুলো এর চাইতে অতিরিক্ত যা কিছু বলবে, আমরা অন্তত: সেটাকে হযরত ঈসা (আ) এর নামে গ্রহণ করতে পারব। হযরত ঈসা (আ) বলেছেন, "আমি শুধু তাওরাতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এসেছি, নতুন কোন দাওয়াত (আহ্বান) নিয়ে আসি নি।" [মথি ঃ ১৭:১৫)। তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন, 'আমার মিশন শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের সংস্কার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।' তিনি তার অনুসারীদেরকে অন্যান্য জাতির কাছে তার পয়গাম নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন।[১] তিনি সব সময় তার শিক্ষাকে বনী ইসরাঈল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে বলেছেন। অতএব তিনি মানবতার জন্য যা কিছু সেবা করেছেন, তা শুধুমাত্র বনী ইসরাঈল নামক একটি বিস্মৃত জাতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। সমগ্র বিশ্বের জন্য কিছু করার মত তার কাছে কোন উপাদান ছিল না।

তাছাড়া হযরত মূসা (আ) এর আবির্ভাব এমন এক সময়ে হয়, যখন রোমের অত্যাচারী সরকার সিরিয়ার পবিত্র ও সবুজ সতেজ মাঠ প্রান্তর গুড়িয়ে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। এছাড়া তখন পৌত্তলিক জাতিসমূহের জালিম ও অত্যাচারী সরকার সমূহ বিশ্বের বেশীর ভাগ অংশকে নিজেদের দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে রেখেছিল। কিন্তু ঈসা (আ) না এই জুলুম অত্যাচার সম্পর্কে কিছু বলেছেন, আর না এটাকে প্রতিরোধ করার কোন চেষ্টা করেছেন।

খ্রীষ্টান জাতিসমূহ ও ঈসায়ী শিক্ষা

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পর বিশ্বে যতগুলো খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ছিল,হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষা ও দাওয়াতের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। বরং তারা আগাগোড়া গ্রীসে শিক্ষাপ্রাপ্ত পল নামীয় জনৈক য়াহূদী প্রবর্তিত ধর্মেরই অনুযারী ছিল। পল, মুসা (আ)-এর সমগ্র হাওয়ারীর (অনুসারীদের) ধর্মের বিপরীত গায়র ইসরাঈলী জনগণকে ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত করতে শুরু করেন এবং এই পদ্ধতিতে রোম ও গ্রীসের বিভিন্ন দ্বীপ ও জনবসতির মধ্যে একটি নতুন বিপ্লবের জন্ম দেন। অতএব বিশ্ববাসী যদি হযরত ঈসা (আ)-এর দিকে ঝুঁকতে চায় তাহলে হযরত ঈসা (আ)-এর জীবনের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাদির জন্য মাত্র এক চতুর্থাংশ শতাব্দী সময়কাল তাদের হস্তগত হবে। কেননা মাত্র এই সময় কালের মধ্যেই হযরত ঈসা (আ)-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাওয়ারীদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিগোচর হবে। আর সামান্য এই সময়টুকুতে হাওয়ারীরা যত সুন্দর ও অনুপম জীবনাদর্শই পেশ করুন না কেন, তাতে সমগ্র বিশ্বাবাসীর শান্তি ও মুক্তির কোন পয়গাম পাওয়া যাবে না।

শেষ পর্যন্ত একথাটি না হয় বাদই দিলাম। কেননা, ফলাফলের আলোচনা পরে আসে। সর্বপ্রথম যা আসে তাহলো দাওয়াত ঘোষণা, দাবী এবং শিক্ষার প্রশ্ন। দুনিয়া হযরত ঈসা (আ)-এর স্মরণকে কিভাবে যথেষ্ট মনে করবে? যখন তিনি দুনিয়ার জন্য কিছু করলেন না– বরং তিনি দুনিয়ায় পদাঘাত করলেন, অভিশপ্ত বললেন এবং এর সাথীদের, এর প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের ও এর সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীদেরকে আল্লাহ্‌র সাম্রাজ্যের করুণা থেকে বঞ্চিত বলে আখ্যায়িত করলেন। এমন কি তিনি শেষ ফতওয়া দিলেন যে, তোমরা খোদা ও দুনিয়া উভয়ের

খিদমত এক সাথে করতে পারবে না (মথি ২৫ঃ৬)। "সুঁইয়ের ভিতর দিয়ে উটের বের হয়ে যাওয়া তা থেকে সহজ যে, একজন বিত্তশালী খোদার সাম্রাজ্যে প্রবেশ করবে"(মথি ২৩ঃ২৯)।

একথা ছেড়ে দিন এবং এর শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর যে ব্যাখ্যা করতে পারেন করুন। পলের দাওয়াতকেই হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াত আখ্যা দিন এবং ঐ সব লোক, যারা ঈসা (আ)-এর নামের উপর খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদেরকে ঈসায়ী দাওয়াতেরই ফলশ্রুতি আখ্যা দিন-- কিন্তু এতকিছু করেও ঈসায়ী আন্দোলনের শেষ ইতিহাসে যে বিকৃতি ঘটেছে, তা কখনো শুধরে নিয়ে মানুষের কাছে সেটাকে গ্রহণীয় করে তুলতে পারবেন না।

খ্রীষ্টীয় ধর্মে রাষ্ট্রক্ষমতা

যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বের উপর খ্রীষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত খ্রীষ্টীয় ধর্মের আধিপত্য মানুষকে তার অধীন করে রাখে এবং তারা খ্রীষ্ট ধর্মীয় নেতাদের দাসত্বও নীরবে সহ্য করে যায়। কিন্তু ইতিহাস এ সাক্ষ্যও দেয় যে, ততক্ষণ পর্যন্ত খ্রীষ্ট ধর্মের অস্তিত্ব বিশ্বের জন্য বিশ্বের সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্য, মানুষের স্বাভাব চরিত্র সংশোধন করে তাদেরকে পবিত্র করার জন্য– সর্বোপরি তাদের জন্মগত স্বাধীনতা, মানমর্যাদা ও মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য একটি জঘন্য অভিশাপ রূপেই বিরাজ করছিল। সে জনবসতি ধ্বংস করেছে, মানুষকে হত্যা করেছে, জেলখানায় পুরেছে, তাদের মুখে তালা লাগিয়েছে এবং তাদের মন--মস্তিস্ককে বেকার ও নিস্কর্মা করে দিয়েছে। সে মানুষ এবং মনুষ্যত্বের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সামান্য সময়ও ব্যয় করেনি।[২] বিখ্যাত ঐতিহাসিক গীযূ, সীদলূ ও লা-মারে এবং ড্রেপার এ বিষয়টির শ্রেষ্ঠতম বর্ণনাকারী হিসাবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

কিন্তু যখন থেকে খ্রীষ্ট ধর্মের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরাজয় ঘটল তখন থেকেই শুরু হল সভ্যতা-সংস্কৃতির ধর্মহীন যুগ। ধর্মীয় দলসমূহ এবং ধর্মীয় খিলাফত (পোপ)-এর দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করল ইউরোপ। ঐ সময়েই স্থাপিত হল ইউরোপের বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি। আর শুরু হল খ্রীষ্ট ধর্মের অনুসারী জাতিসমূহের উন্নতির যুগ।

যদিও আপনারা বলেন, বিশ্ববাসীর সর্বাধিক ও সর্ব বৃহৎ মর্যাদা ও মাহাত্ম্য খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যেই রয়েছে; তাহলে আমরা বলবো, স্বয়ং ঐ প্রতিষ্ঠাতাই হক ও বাতিল (সত্য ও অসত্য) নিরূপণ করেছেন, এই বলে যে, "বৃক্ষের পরিচয় তার ফল থেকেই পাওয়া যায়।" অতএব বিশ্ব যদি খ্রীষ্ট ধর্মের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে আনন্দোল্লাস করে তাহলে তা হবে মানুষের শান্তি, মঙ্গল, জন্মগত স্বাধীনতা ও সৌভাগ্যের পরিবর্তে খুন, হত্যা, ডাকাতি, রাহজানি ও ধ্বংসযজ্ঞের স্মরণে আনন্দোল্লাস। কেননা, খ্রীষ্ট ধর্মরূপী বৃক্ষের এই ফলই আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করে আসছি।

উপরোক্ত কথাগুলো খ্রীষ্টান জাতিসমূহের প্রাচীন ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে। যদি এর সাথে গত দুশতাব্দীর ঐ সব ঘটনাবলীও যোগ করা হয়, যা ইউরোপের জাতিসমূহের সভ্যতা- সংস্কৃতির ধর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত তাহলে বিশ্ববাসীর নৈরাশ্যের মাত্রা হবে আরো বেশী ভয়ানক ও দুঃখজনক।

আর্য বংশ সমূহের দাওয়াতী কর্মকান্ড

এরপর আমাদের সামনে আসে আর্য বংশ সমূহের দাওয়াতী কর্মকান্ডের ব্যাপারটি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বিশ্ববাসীর জন্য এদের কাছে শান্তি ও মঙ্গলের কোন পয়গাম নেই। গৌতম বুদ্ধের মহান শিক্ষার সারকথা এই যে, দুনিয়াকে সাথে রেখে কখনো পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। এবার ভেবে দেখুন, যারা দুনিয়ার উপর লাথি মারল; দুনিয়াবাসী তাদের কাছে গিয়ে কী সুখ পাবে? উপরন্তু গৌতম বুদ্ধ যাই বলুন, আর যাই শিক্ষা দিন, তার শিক্ষা তো

শুধু কয়েকটি জাতি ও দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দুস্তান থেকে যখন বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উৎখাত করা হল তখন তারা জাপান ও চীনে গিয়ে আশ্রয় নিল এবং সেখানেই কেন্দ্রীভূত হয়ে রইল। অতএব বিশ্ববাসী, যাদের বাসভূমি কোন দেশ বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাদ্ধ নয়–বরং বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে যারা ছড়িয়ে রয়েছে তারা তাদের দুঃখ ও বিপদাপদ থেকে পবিত্রাণ লাভের জন্য একটি সীমিত ভূভাগে বন্দী এই বৌদ্ধ ধর্ম থেকে কি কিছু লাভ করতে পারবে?

হিন্দুস্তানের ধর্মীয় শিক্ষার উপাদানরাজি এবং তার প্রাচীনত্বের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করব না; তবে তাদের ধর্মসমূহের সেই প্রতিষ্ঠাতাদের কাছে শান্তি ও সুখের কি বার্তা পাওয়া যেতে পারে, যারা হিমালয় প্রাচীর এবং আরব সাগরের তরঙ্গরাজি ডিংগিয়ে যে বিরাট বিশ্ব রয়েছে সে বিশ্বের অধিবাসীদের কথা মোটেই চিন্তা করেন নি, বরং তাদের ধর্মীয় দাওয়াত শুধুমাত্র হিন্দুস্তানে বসবাসকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

পরিত্রাণ ও শান্তি লাভের একক পয়গাম

অতএব বিশ্ববাসী যদি পরিত্রাণ ও শান্তি লাভের প্রত্যাশী হয় তবে তাদের জন্য একটিমাত্র পয়গাম রয়েছে এবং সে পয়গামের বাস্তব দৃষ্টান্ত রয়েছে একই ব্যক্তির জীবনে। যেহেতু সব মানুষেরই দুঃখের মূল এক, তাই সে দুঃখ থেকে আরোগ্য লাভের ব্যবস্থাপত্রও একের বেশী হতে পারে না। সব মানুষেরই প্রভু সেই এক ও একক সত্তা, যিনি তাঁর একই সূর্যের কিরণ দ্বারা সমগ্র বিশ্বে শুষ্ক ও আদ্র সব জায়গাকেই আলোকিত ও সঞ্জীবিত করে থাকেন। এই সূর্য থেকে আরো অনেক গ্রহ-উপগ্রহ কিরণ লাভ করে থাকে এবং তারাও তা ছড়িয়ে দেয় আপন আপন পরিমন্ডলে। পবিত্র কুরআনে সূর্যকে যেমন 'সিরাজ' (প্রোজ্জ্বল দীপ) আখ্যা দেওয়া হয়েছে–

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۔

"আমি উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল দীপ' (সূর্য) সৃষ্টি করেছি।" -(৭৮ঃ১৩)–তেমনি সেই মহান ব্যক্তির আবির্ভাবকেও 'সিরাজ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যার হেদায়াত ও রহমতের আলো সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় অন্ধকারের জন্য ছিল ভোরের পয়গামবাহী। যেমন–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۔

"হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তার দিকে আহবানকারীরূপে ও উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল দীপ রূপে।" –(৩৩ঃ৪৫-৪৬)

ভূমন্ডলের জন্য হিদায়াতের সূর্য

অতএব সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করার জন্য সেই হিদায়াত-রবিরই প্রয়োজন, যার বিশ্ববিস্তৃত কিরণমালার মধ্যে বিশ্ববাসী আপন যাবতীয় অন্ধকার সমূহের 'নূরে বিশারত'(সুসংবাদের আলো) পেতে পারে। আর এ কারণেই শুধুমাত্র তার উদয়নের প্রথম দিনের কথা বিশ্ববাসী কখনো ভুলতে পারে না। আর যদি ভুলে যায়ও তাহলে সে সময় দূরে নয় যখন পরিপূর্ণ ভালবাসা ও আসক্তির সাথে তাঁর সামনে বিশ্ববাসীকে নত হতে হবে এবং তাকে আপন আত্মীয় হিসাবে গ্রহণও করতে হবে।

এই মহান সত্তা বিশ্বে আবির্ভূত হয়ে একথা বলেননি যে, আমি শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলকে ফিরআউনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য এসেছি। বরং তিনি বলেছেন, সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে, আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী জাতি-

সম্প্রদায়সমূহ থেকে রক্ষা করার জন্য আমার আবির্ভাব ঘটেছে। শুধুমাত্র ইসরাঈল বংশের হারানো মানব গোষ্ঠির মধ্যেই তার প্রেম-ভালবাসা সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি চিন্তিত ছিলেন সমগ্র বিশ্বের আর্তমানবতার জন্য। তিনি নিভে যাওয়া মানবতার আলোকে পুনরায় আলোকিত করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শুধুমাত্র সিনাই পাহাড়ের শীর্ষে বা অন্য কোন নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থানকারী খোদাকে ভালবাসার আহবান জানান নি, বরং আহবান জানিয়েছেন সেই মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আমরা বিশ্বে আলেকজান্ডারের মত দিগ্বিজয়ী বীরের সন্ধান পাই, যিনি সমগ্র বিশ্বকে জয় করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসে আমরা এমন কোন রাসূলের সন্ধান পাই না, যিনি সমগ্র বিশ্বের অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

বিশ্বের জন্য রহমত

সেই মহান সত্তার কেবল একই ঘোষণা, যা সৃষ্টির আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব বলতে যদি শুধুমাত্র কয়েকটি বংশ, জাতি কিংবা ভূখন্ডকে না বুঝায়, বরং বুঝায় সেই সমগ্র সৃষ্টিকে, যারা বিস্তৃত ভূগোলক জুড়ে বসবাস করছে-তাহলে তারা বাধ্য হবে সবদিক থেকে হতাশার দৃষ্টি হটিয়ে শুধুমাত্র সেই সাধারণ ঘোষণার সামনে ঝুঁকে যেতে এবং শুধুমাত্র তারই জন্ম দিবসকে নিজের জীবনের সব চাইতে বড় দিন হিসাবে মেনে নিতে।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۔

"কত মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি 'ফুরকান' (সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী কুরআন) নাযিল করেছেন যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।"-(২৫ঃ১)

বিশ্বে হক ও সত্যের ইতিপূর্বেকার যত ঘোষণা রয়েছে তা যদি দুনিয়াবাসী বিস্মৃত হয়ে যায় তাহলে এটা হবে শুধুমাত্র কয়েকটি জাতি ও কয়েকটি ভূখন্ডের সৌভাগ্যের বিস্মৃতি। কেননা, ঐসব ঘোষণাকারীদের ঘোষণাসমূহ কোন না কোন নির্দিষ্ট জাতি বা ভূখন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিশ্ববাসী যদি রবীউল আউয়ালের দিনটির কথা ভুলে যায় তাহলে তারা সমগ্র বিশ্বের পরিত্রাণের কথাটিই ভুলে যাবে। কেননা, এদিনটিতে সেই মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল, যিনি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের জন্য নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত ও আশিষ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

(এ পর্যন্ত যা লিখা হয়েছে তা শুধুমাত্র একটি ভূমিকা এবং ইসলামের বিশ্ববিস্তৃত রহমতের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ছাড়া কিছু নয়। এরপর মূল প্রশ্নটি আমাদের সামনে আসে। আর তা হলো,ঐ মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব দুনিয়ার প্রকৃত বিপদ এবং পরিপূর্ণভাবে মানবতার সৌভাগ্য ও প্রকৃতিগত উৎকর্ষ সাধনে কি ভূমিকা রেখেছে? এই বিরাট আলোচনাকে সীমিত করা বা শেষ করা তো সম্ভব নয়; তবে আগামী সংখ্যা[৩] গুলোতে এ সম্পর্কে মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হবে।)

টীকা ঃ

(১) তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছেন, তোমরা না অন্যান্য কোন জাতির কাছে যাবে, আর নাসামিরীদের কোন শহরে প্রবেশ করবে; বরং ইসরাঈল সম্প্রদায়ের হারানো মেষগুলোর কাছে যাবে (মথি ঃ ৬ঃ১০)।

(২) ইউরোপ ও আমেরিকা হচ্ছে ঈসায়ী ধর্মের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। সেখানকার সংস্কৃতির রূপ যাই হোক না কেন, সেই সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত তা কি মানব জাতির জন্য- বিশেষ করে দুর্বল জাতি, দেশ ও ধর্মসমূহের জন্য সবচেয়ে বড়

বিপদের কারণ হিসাবে বিরাজ করে নি। আজো কি এই সংস্কৃতি সেই মহা বিপদের উৎসকেন্দ্র নয়, যার কারণে এই বিশ্ব ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে আছে? প্রথম জাতিপুঞ্জ (লীগ অব নেশনস্) এই সংস্কৃতিসেবীদের আত্মস্বার্থপরতার কারণেই ধ্বংস হয়েছিল। আজ ঐ একই কারণে জাতিসংঘও কি বার বার সেই একই অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে না?

(৩) এই বিস্তারিত রচনাটি 'আল বালাগ' এর ১৯১৬ সালের ১৪ ও ২১ জানুয়ারী সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। কিন্তু এর দ্বিতীয় অংশ ছাপা হওয়ার সুযোগ আর আসেনি। কেননা, মার্চ মাসে মাওলানাকে (মাওলানা আবুল কালাম আযাদকে) বাংলা থেকে বহিস্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে কোলকাতা ছেড়ে বিহার প্রদেশের রাঁচীতে চলে যান এবং সেখানে পৌছার সাথে সাথে তাঁকে নযরবন্দী করে রাখা হয়। ১৯১৬ সালের এপ্রিল থেকে ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি নযরবন্দী অবস্থায় কাটান। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছিল যে, 'আল বালাগ' বের হতে থাকবে এবং তিনি তাতে প্রকাশের জন্য রাঁচী থেকে লেখা পাঠাতে থাকবেন। কিন্তু নযরবন্দী হওয়ার পর তাঁর উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যাই হোক, এই প্রবন্ধের মধ্যে সেই মৌলিক মাপকাঠির সন্ধান অবশ্যই পাওয়া গেছে, যার ভিত্তিতে আমরা একথা অনুমান করে নিতে পারি যে, বিশ্বের সার্বিক কল্যাণের জন্য কোন্ ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত ও আশিষরূপে গণ্য হতে পারেন।

রাব্বুল 'আলামীন ও রাহ্মাতুল লিল্ 'আলামীন

তাওহীদ ও হিদায়াতের সূর্য

পবিত্র কুরআন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) কে 'সিরাজ' বা উজ্জ্বল প্রদীপ আখ্যা দিয়েছে এবং তাঁর মহান বৈশিষ্ট্যাদির প্রতি ইংগিত করে বলেছে–

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا.

"আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।" –(৩৩:৪৫-৪৬)

কিন্তু অপর একটি জায়গায় সূর্যকেও 'সিরাজ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন–

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا :

"তিনি (আল্লাহ্) সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে সূর্যকে স্থাপন করেছেন উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।"–(৭১:১৬)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে এভাবে সূর্যের সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইসলামের আহ্বাবনও সূর্য কিরণ তুল্য। তবে তা প্রাকৃতিক সূর্য নয়, বরং রূহানী সূর্য। প্রাকৃতিক সূর্য যখন উদিত হয় তখন তার কিরণ ও উষ্ণতা দুরে-কাছে, উঁচুতে-নিচুতে, কালো-সাদায়, বাগানে-প্রান্তরে সকলের কাছে এবং সর্বত্র সমানভাবে পৌঁছে। তার কিরণ স্থান-মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকটি জিনিসের উপর চমকায় এবং সেগুলোকে উষ্ণতা দান করে। ইলাহী আহবান ও রিসালাত-আকাশের সূর্যেরও ঠিক এই একই অবস্থা। এই সূর্য স্থান-কাল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে এবং সর্বত্র আপন হিদায়ত-কিরণ দান করে। এটা উদিত হয়েছিল ফারানের শীর্ষে, যার কিরণরাজির মধ্যে ডানদিকে ছিল শরীয়তে ইলাহীর 'নূর ও কিতাবে মুবীন' রূপী কিরণ, কিন্তু বামদিকে ছিল ন্যায় বিচারের জাজ্বল্যমান তরবারির ঝলকানি। এটা উদয়নের অর্থ ছিল সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় অন্ধকারের পরাজয় এবং আলোর চিরন্তন সজীবতা। কেননা, ইতিপূর্বে হিদায়াতের আকাশে শরীয়তে ইলাহীর শত শত তারা উদিত হলেও অন্ধকারের অন্তিম পরাজয়ের জন্য রূহানী বিশ্ব এই সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় ছিল।

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى . وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى . وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى .

"শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে (এই পৃথিবীকে), শপথ দিবসের, যখন তা আবির্ভূত হয় এবং শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।"–(৯২:১-৩)

বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব ঐক্য

এই তাওহীদ ও একত্বের সূর্য উদিত হয়ে অনৈক্য ও দলাদলির যাবতীয় অন্ধকার দূর করে দেয়। আলো দান করে সাদা-কালো, আরব অনারব নির্বিশেষে সকল মানুষকে। এক্ষেত্রে সে কোনরূপ বৈষম্যের সৃষ্টি করেনি। আল্লাহ্র প্রতিপালন গুণের ন্যায় তার রহমত এবং কৃপাও ছিল ব্যাপক। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা 'রাব্বুল আলামীন' (জগতসমূহের প্রতিপালক)। অতএব তাঁর পথে এই মহান আহবানকারীরও 'রাহমাতুল্ লিল্ আলামীন' (জগতসমূহের রহমত বা আশিষ) হওয়ার প্রয়োজন ছিল। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ .

"আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত (আশিষ) রূপেই প্রেরণ করেছি।"–(২১:১০৭)

এটা মানুষের সব চাইতে বিরাট পথভ্রষ্টতা ও আল্লাহ্ বিস্মৃতি ছিল যে, তাদের মধ্যে সৃষ্টিগত সম্পর্কের যে ঐক্য ছিল তা তারা ভুলে গিয়ে ভূখন্ডগত ও গোত্রগত বিভেদ ও অনৈক্যের উপর মানবীয় সম্বন্ধের ভিত্ রচনা করে। আল্লাহ্র যে যমীন ছিল পরস্পর ভালবাসা ও ঐক্যের জন্য; সেটাকে তারা জাতিগত ও গোত্রগত বিভেদ-বৈষম্য ও ঝগড়া বিবাদের ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত করে। এমতাবস্থায় ইসলাম হচ্ছে পৃথিবীর সেই প্রথম আওয়াজ,যা ছিল মানুষের তৈরী ভেদ-বৈষম্যের উপর নয়, বরং আল্লাহ্র ইবাদতের ঐক্যের উপর একটি বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের আহবান। ইসলাম বলে-

" হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী।"-(৪৯:১৩)

একটি মাত্র সম্বন্ধ

আসলে ইসলামে দেশ-স্থান, বর্ণ ও ভাষার পার্থক্য কোন বিষয় নয়। তবে বর্ণ ও ভাষার পার্থক্যকে সে অবশ্যই আল্লাহ্র একটি নিদর্শন বলে স্বীকার করে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ .

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য।" –(৩০:২২)

মাকামে মাহমূদ

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا .

"রাতের কিছু অংশে 'তাহাজ্জুদ' কায়েম করবেন, এটা আপনার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমূদে।"–(১৭:৭৯)

'মাকামে মাহমূদ' অর্থ এমন একটি মর্যাদা, যা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। অর্থাৎ এটা আশা করা যায় যে, আপনার প্রতিপালক আপনাকে এমন একটি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবেন, যা অত্যন্ত ব্যাপক ও চিরায়ত প্রশংসিত।

এই আয়াত তখনই অবতীর্ণ হয় যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কী জীবনের শেষ বর্ষ অতিবাহিত হচ্ছিলো। তখন তিনি জুলুম-অত্যাচার ও নিঃস্বতার একেবারে চরমে পৌছে গিয়েছিলেন। এমন কি তাঁর বিরোধীরা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করছিলো। এমতাবস্থায় কী করে এই আশা করা যেতে পারে যে, এই জুলুম-অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পেয়ে তিনি জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবেন? কিন্তু এই অবস্থায়ই আল্লাহ্র ওহী তাঁকে শুধু বিজয় লাভের সুসংবাদ দেয়নি– যেহেতু বিজয় লাভ কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়–বরং তাঁকে এমন একটি মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ দেয়, যা মানব জাতির উন্নতি ও উৎকর্ষের একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়। অর্থাৎ 'মাকামে মাহমূদ' হচ্ছে এমন একটি মাকাম (স্থান), যেখানে পৌছার পর তিনি (সা) সৃষ্টির প্রশংসার বিশ্বজনীনতা ও চিরন্তনতা লাভ করবেন। যে কোন যুগ হোক, যে কোন দেশ হোক বা যে কোন বংশ হোক– তিনি সর্বকালে, সর্বস্থানে এবং সকলের কাছে হবেন উচ্চ প্রশংসিত। অগণিত লোক তাঁর প্রশংসায় হবে পঞ্চমুখ। তিনি হবেন মাহমূদ অর্থাৎ আপাদমস্তক সর্বজনপ্রশংসিত এক সত্তা। একজন আরবী কবি একথাটি কী সুন্দরই না বলেছেন–

ما شئت قل فيه فانت مصدق

فالحب يقضى والمحاسن تشهد .

"তাঁর সম্পর্কে তুমি যে প্রশংসাই কর তা সত্য হবে,
(কেননা) এটা তাঁর ভালবাসার চাহিদা।
এবং এটা তাঁর সৌন্দর্যাবলীর সাক্ষ্য।"

মানবীয় মাহাত্ম্যের চূড়ান্ত পর্যায়

এটা হচ্ছে মানবীয় মাহাত্ম্যের চূড়ান্ত পর্যায়। মানব সন্তান এর চাইতে উঁচু স্থানে উপনীত হতে পারে না। কেননা, এর চাইতে উচ্চতর মানবীয় মর্যাদা চিন্তাই করা যায় না। মানুষকে তার চেষ্টা ও উদ্যম যে কোন ধরণের উচ্চতায় পৌছাতে পারে; কিন্তু সে আত্মাসমূহের প্রশংসা এবং অন্তরসমূহের প্রশস্তির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হতে পারে না। আলেকজান্ডারের যাবতীয় দুঃসাহসিক বিজয়অভিযান শুধুমাত্র তার দেশের ও তার যুগের প্রশংসাও তার জন্য বয়ে আনতে পারেনি। নেপোলিয়নের অতুলনীয় বীরত্ব শুধুমাত্র কার্সিয়া দ্বীপ, যেখানে তার জন্ম হয়েছিল, সেখানকার কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক অধিবাসীর মধ্যেও তাকে প্রশংসনীয় করে তুলতে পারেনি। প্রশংসা ও প্রশস্তি সে-ই লাভ করতে পারে, যার মধ্যে সৌন্দর্য আছে, অনুপমতা আছে। কেননা, আত্মাগুলো সৌন্দর্যের প্রতিই আসক্ত হয়। আর মানুষ অনুপমতারই প্রশংসা করে। কিন্তু সৌন্দর্য ও অনুপমতার সাম্রাজ্য সেটা নয়, যাকে সম্রাট বা দিগ্বিজয়ীরা পদানত করে রাখে।

মানুষের মুখে কার প্রশংসা গীত হয় ও আত্মারা কা-কে সম্মান করে?

যে পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস জানা যায় তা পর্যালোচনা করে দেখুন, মানব জাতির অন্তরের সম্মান এবং তাদের মুখের প্রশংসা কোন্ জাতীয় মানুষের ভাগ্যে জুটেছে? তা কি রাজা-বাদশাহ ও দিগ্বিজয়ীরা পেয়েছে, না কি আল্লাহ্র ঐ রাসূলগণ পেয়েছেন, যারা দেহ বা রাজত্ব নয় বরং আত্মা ও অন্তরকে জয় করেছিলেন? এটাই হচ্ছে মাকামে মাহমূদ, যার সংবাদ আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াতে দেওয়া হয়েছে। আর শুধু সংবাদ দানই নয় বরং সেজন্য প্রার্থনা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। যেমন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

"আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশতারাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযভাবে সালাম জানাও।"-(৩৩:৫৬)

কোন কোন হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, এই 'মাকাম' দ্বারা সেই ঘটনার প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, যা কিয়ামতের দিন ঘটবে- যখন তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও প্রশস্তির পতাকা উড্ডীন করবেন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মাহমূদিয়ত বা প্রশংসিত হওয়ার 'মাকাম' দুনিয়া-আখিরাত উভয় স্থানেই। যে ব্যক্তি বা সত্তা দুনিয়ায় মানবজাতির প্রশংসা লাভ করেছেন তিনি আখিরাতে মাহ্মূদ বা প্রশংসিত হবেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সার্বজনীন প্রকৃষ্টতা

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ এবং

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُم وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পুর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"-(৫:৩)

আরো বলা হয়েছে-

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا .

"যখন প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে [কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মতের সাক্ষী হবেন তাদের নবী। আর হযরত মুহাম্মদ (সা) হবেন সকল নবীর পক্ষে সাক্ষী] উপস্থিত করব তখন কী অবস্থা হবে?"[১] -(৪:৪১)

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর যে প্রকৃষ্টতা প্রমাণিত হলো তা এই যে, তার উম্মত অর্থাৎ উম্মতে মুসলিমা সমগ্র উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ এবং দ্বীন ইসলাম হচ্ছে যাবতীয় দ্বীন ও যাবতীয় নি'মাতের পরিপূর্ণতা দানকারী। এটা স্বাভাবিক কথা যে, অনুসরণ কারীদের প্রকৃষ্টতা অনুসরণীয়ের প্রকৃষ্টতাকে সুপ্রমাণিত করে। আর পূর্ববর্তী নি'মাতসমূহ হতে কোন নি'মাতের পরিপূর্ণতা ও উৎকৃষ্টতা ঐ নি'মাতের বাহক ও প্রচারকারীর উৎকৃষ্টতাকে সুপ্রমাণিত করে। যদি শেষ শরীয়ত পূর্ববর্তী যাবতীয় শরীয়তকে অন্তর্ভুক্ত রাখে তাহলে তা নিঃসন্দেহে সকল শরীয়তের চাইতে সেরা। আর যদি শেষ উম্মত পূর্ববর্তী সকল উম্মতের যাবতীয় কল্যাণ ও নি'মাতের অধিকারী হয়ে থাকে তাহলে তারা নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। আর যদি শেষ শরীয়ত আবির্ভাব স্থান, সময়কাল, শক্তিমত্তা, কাজকর্ম তথা যাবতীয় ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী উম্মত সমূহের ধর্মের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রাখে তাহলে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সর্বশেষ উম্মতের মহান নবীও মর্যাদা ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে অতীতের যাবতীয় নবীদের সকলের উপরে এবং সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের বিভিন্ন জায়গায় একথাটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ -"এই রাসূলগণ. তাদের মধ্যে কাউকেও কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" -(২:২৫৩)

তাফসীর 'আল বায়ানে' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত বিষয়টিকে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে এবং সম্ভবতঃ অতি আধুনিক পদ্ধতিতে দলীল-প্রমাণসহ বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে এক অভিনব পদ্ধতিতে রিসালাতে মুহাম্মদীর সার্বজনীনতা, শরীয়তে ইসলামিয়ার অতুলনীয়তা এবং উম্মতে মুসলিমা ও তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উৎকৃষ্টতা।

বাকী রইল– لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُّسُلِهِ . –"আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না।" –(২ঃ২৮৫)–এটা অন্য বিষয়। এর সাথে উল্লিখিত প্রকৃষ্টতা প্রদানের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে তারতম্য করার অর্থ অন্যান্য নবীকে হেয় জ্ঞান করা নয়। এটা ইসলাম কোন মতেই সমর্থন করে না। সকল নবীই আল্লাহ্‌র মনোনীত এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ। তবে মুহাম্মদ (সা) তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

انا سيد ولد ادم ولا فخر –"আমি সমগ্র আদম সন্তানের নেতা, তবে এজন্য আমি গর্ব করি না।"

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

ادم مادونه تحت لوائى –"আদম এবং অন্যান্য নবীগণ আমার পতাকা তলে থাকবেন।"

কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এ ধরনের আরো অনেক উক্তি আছে, যার দ্বারা অন্যান্য আম্বিয়া কিরামের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا .

"আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হবার পূর্বে কুরআন পাঠে আপনি ত্বরা করবেন না এবং বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন করো।"-(২০ঃ১১৪)

এই আয়াতে একথাই বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ না ওহী অবতীর্ণ হওয়ার ধারা সমাপ্ত হয় ততক্ষণ আপনি এব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না, বরং অপেক্ষা করুন এবং দেখুন কি পর্যন্ত 'গায়বী ফয়েয' (আল্লাহ্‌র অদৃশ্য পরশ)-এর অবদানরাজি আপনার অন্তরকে পরিপূর্ণ করে দেয়। আপনার ভাবভঙ্গির ভাষায় আওয়াজ 'তো রাব্বি যিদ্‌নী ইলমা' (হে আমর প্রতিপালক, আমার জ্ঞানের সাধন করো) হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ আমার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জ্ঞানের এইসব দরিয়া এবং তাকওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য এইসব বারিধারাও যথেষ্ট নয়। হে অপরিসীম জ্ঞান ও অগণিত রহস্যের আধার মহান প্রভু! তুমি তোমার দানকে আমার জন্য আরো বাড়িয়ে দাও।

ইসলামের নবীর জ্ঞান ও বিজ্ঞতার প্রশস্ততা এবং আয্‌মাত ও মাহাত্ম্যের কি অবস্থা ছিল তা উপরোক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তিনি কোন সীমারেখায়ই নেমে যেতে চাচ্ছিলেন না। তাঁর জন্য কোন প্রাচুর্যই ছিল না। তাঁর প্রত্যেকটি প্রাপ্তির মধ্যেই যেন নতুন করে আর একটি প্রাপ্তির ইঙ্গিত ছিল। তাকে প্রদত্ত প্রত্যেকটি দানের মধ্যেই যেন অপর একটি দানের প্রত্যাশা লুক্কায়িত ছিল। তিনি প্রতিনিয়ত জ্ঞান ও বিজ্ঞতা কামনা করে যাচ্ছিলেন। 'রাব্বি যিদ্‌নী ইলমা'- যেন ছিল তাঁর অবিরাম প্রার্থনা। এটা জানা কথা যে, এখানে প্রার্থিত বস্তুর কোন সীমাবদ্ধতা বা পরিসমাপ্তি থাকতে পারে না। কিন্তু এটা কি করে জানা যেতে পারে যে, এটা মহান যাচ্‌নাকারীর যাচনা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছিল।[২]

মানব জগতের প্রতি বিরাট ইহসান

রাহমাতুল লিল্ আ-লামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) মানব-জগতের প্রতি যে ইহসান (অনুগ্রহ) করেছেন তার পরিমাণ বা সীমা নির্ধারণ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর একটি ইহসান এও যে, তিনি মানব জাতির উপর থেকে প্রত্যেক ধরনের অধীনতা, দাসত্ব এবং লজ্জা ও অপমানের শিকল চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছেন এবং সকলের জন্য মুক্তি, স্বাধীনতা, সম্মান,মর্যাদা ও সত্যিকার সাম্যের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন।

তখন বিশ্ব ছিল পরাধীনতা এবং অন্যায়-অবিচারের যাঁতাকলে নিস্পেষিত। দাসত্বের শিকল ছিল তাদের আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা। তখনকার সাম্রাজ্য অধিপতিরা এবং শহর ও গোত্রসমূহের সর্দাররা আপন আপন অধীনস্থ অঞ্চলে 'আরবাবুম্ মিন্ দূনিল্লাহ্' (আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় হুকুমের মালিক) হয়ে বসেছিল। আর সাধারণ মানুষ ছিল তাদের আরাম-আয়েশ যোগানের হাতিয়ার মাত্র। ঐ প্রভুদের মর্জিমত চলাই ছিল তাদের ধর্ম। নিজেদের মতানুযায়ী চলার কোন অধিকারই তাদের ছিল না।

হযরত ঈসা (আ)-এর সতেরো শ বছর পূর্বে শাহান শাহরা ছিলেন সব রকমের পবিত্রতায় পবিত্র, অসাধারণ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং প্রত্যেকটি দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। মিসরের ফিরআউনরা ছিল দেবতাতুল্য। এ কারণেই মিসরের একজন ফিরআউন হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাবের সতেরো শ বছর পূর্বে আপন সভাসদদের বলেছিল, اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى –"আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক" (৭৯:২৪)।

অর্থাৎ মূসার খোদা আবার কে? আমিই তো তোমাদের বড় খোদা।

অপরদিকে বাবিলের বাদশাহ আপন সাম্রাজ্যের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসেছিল, হিন্দুস্তানের রাজারা দেবতাদের অবতা হয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হত, আর রোমের পোপ খোদার সন্তান (হযরত ঈসা)-এর প্রতিনিধি হয়ে বসেছিল এবং তার পবিত্র দরবার ছিল রাজা-বাদশাহদের জন্য একটি পবিত্র আস্তানা।

রোমের কায়সার এবং পারস্যের কিসরা যদিও দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হন নি, কিন্তু তারা ছিলেন মানব প্রকৃতি থেকে পবিত্র এবং মানবীয় মর্যাদা থেকে উর্ধে। ফলে তাদের সামনে বসা ছিল নিষিদ্ধ,তাদের নাম উচ্চারণ ছিল অশিষ্টতা, তাদের সামনে কথার সূচনা করা ছিল পাপ, আর তাদের কোন কাজকর্মে আপত্তি উত্থাপন করা ছিল হত্যাযোগ্য অপরাধ।

যখন বিশ্ব ছিল এরূপ দাসত্ব, লাঞ্চনা ও বঞ্চনার মধ্যে বন্দী, তখন লোহিত সাগরের মরু অঞ্চলে একজন আরবী বাদশাহের আবির্ভাব হয়,যিনি তাঁর মুজিযা শক্তি দিয়ে কায়সার ও কিসরার সিংহাসন উল্টে দেন। তিনি কাঁপিয়ে তুলেন মহান রোম সম্রাটের রাজসিংহাসনের ভিত্তিমূল। তাঁর তরবারির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় রোম সম্রাটের অধীনস্থ জনতার দাসত্ব ও গোলামীর শৃঙ্খল। তাঁর আর্বিভাবের ফলে মানুষের সত্তা, তাদের মন-মানসিকতার দৃঢ়তা, তাদের স্বাধীন চিন্তা-চেতনা, তাদের সত্তাগত ও আর্থিক মর্যাদা এবং তাদের অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, রোমান সাম্রাজ্যের বাতুলতা প্রকাশ পায় এবং সেখানকার মানুষ প্রবেশ করে নতুন এক আশা উদ্দীপনার জগতে। পরিণামে দুনিয়ার সাধারণ মানুষেরাও নিস্কলুষতার মর্যাদা হারিয়ে সাধারণ মানুষের কাতারে এসে শামিল হয়, আর সাধারণ মানুষ দাসত্ব ও পশুত্বের মর্যাদা থেকে উন্নীত হয়ে মিসর ও বাবিলের দেবতা এবং রোম ও ইরানের কায়সার ও কিসরার সাথে চলতে শুরু করে।

টীকা ঃ

(১) এই দুই আয়াতের সারমর্ম তাফসীরে' আল বায়ন' এ বর্ণিত হয়েছে।

(২) ইকবালও তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে তাঁর পায়ামে মাশরিক গ্রন্থের 'পেশকাশ্' কবিতার একটি জায়গায় এই হাকীকতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

দ্বীনে রহমত ও রাসূলে রহমত–১

পূর্বকথা

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত (আশিষ) রূপেই প্রেরণ করেছি (২১ ঃ১০৭)।"– আপনারা এই আয়াত সম্পর্কে মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদের ঐ লেখা সম্ভবতঃ পাঠ করেছেন, যা 'আল বালাগ'- এর জানুযারী ১৯১৬ ইং সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। আর আমার জানা মতে, ঐ বিষয়ের উপর এটাই ছিল আমাদের যুগের প্রথম লেখা। মাওলানা এর বাকি অংশও ছাপাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সময় তাঁকে বেঙ্গল থেকে বহিস্কারের সরকারী নির্দেশ জারী করা হয়। তিনি তখন রাঁচী (বিহার) চলে যান, যা আনুপাতিকভাবে বাংলার নিকটবর্তী ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেখান থেকে তিনি যতদূর সম্ভব 'আল বালাগ' এর কাজ চালিয়ে যাবেন। এরপর তাঁকে রাঁচীতে নযরবন্দী করা হয়। ফলে তিনি ইতিমধ্যে যে সব কাজ শুরু করেছিলেন তা বন্ধ হয়ে যায়। উপরন্তু কোলকাতা এবং রাঁচীতে তাঁর যাবতীয় আসবাবপত্রের উপর তালাশী চালানো হয় এবং পুলিশ তাঁর যাবতীয় কাগজপত্র বাজেয়াফত করে ফেলে, যা ইতিমধ্যে ছাপা হয়ে গিয়েছিল কিংবা ছাপা হচ্ছিলো অথবা গোপনে কোথাও রাখা হয়েছিল। ঐ কাগজপত্রের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে সংগৃহীত ঐ সমস্ত নোটও ছিল, যা ছিল মাওলানার সমগ্র জীবনের গভীর অধ্যয়ন ও কঠোর সাধনার স্বর্ণ ফসল। পরবর্তীকালে যে কোন বিষয়ের উপর কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখতে গেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর তৈরী নোটগুলো দু'একবার দেখে নিলেই চলত। অতএব এই নোটগুলো বাজেয়াফত করার ফলে মাওলানা ক্ষতিগ্রস্ত হন সব চাইতে বেশী। মাওলানা কয়েক বছর পর ঐ সময়কার ঘটনাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন "রাজনৈতিক জীবনের হৈ চৈ ও জ্ঞানগত জীবনের কর্মকান্ড এক জায়গায় থাকতে পারে না। তূলা ও আগুনের একত্রে অবস্থান অসম্ভব। একদিকে চিন্তা গবেষণার স্তূপ রচনা করছিলাম, আর অপরদিকে আহবান করছিলাম অগ্নি উদ্গীরণকারী বিদ্যুৎকে। শেষ পর্যন্ত উরফীর ভাষায়ই আমাকে স্বীকার করতে হলো–"

زان شکستم که به دنبال دل خویش رام

درنشیب شکن زلف پریشان رفتم

অর্থাৎ যার সাথে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করলাম তার পেছনেই আমি লেগে রইলাম। তাই আমি অবনতির নিম্ন ভূমিতে বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।

এভাবে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সংগৃহীত বহু মূল্যবান তথ্য ও উপাদান থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করা হল– বঞ্চিত করা হলো মুকাদ্দাম-ই-তাফসীর (তাফসীরের ভূমিকা)-এর খসড়া এবং এর মুদ্রিত ফর্মাগুলো থেকেও। মাওলানা এ সম্পর্কে এরপর যা লিখেছিলেন তারও কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আর যতক্ষণ না সেগুলো উদ্ধার করা হচ্ছে ততক্ষণ কল্পনার ঘোড়া দৌড়িয়ে তো আর কোন লাভ নেই।

কাযী সুলায়মান ও ডক্টর হামীদুল্লাহ্

মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদের হারানো লেখার পর মরহুম কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান মনসূরপুরী 'রাহমাতুল লীল আলামীন' শীর্ষক গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে এই বিষয়ের উপর লেখনী ধারণ করেন।[১] সে গ্রন্থটি ছাপা হয় ইং ১৯২১ সালে। মরহুম কাযী সাহেব ছিলেন দৃষ্টির ঔদার্য এবং ইসলাম ও রাসূলপ্রেমের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট বিরাট নিদর্শন সমূহের অন্যতম। তিনি তাঁর গ্রন্থে এ বিষয় সম্পর্কিত অনেক প্রামাণিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনাভঙ্গি ছিল মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বর্ণনাভঙ্গির চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । এ কারণে কাযী সাহেবের লেখা মরহুম মাওলানার লেখার পরিশিষ্ট হিসাবে বিবেচিত হতে পারেনি। তবে তা 'রাহ্মাতুল লিল আলামীন' সম্পর্কিত তথ্যাদির একটি ভান্ডার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

আমাদের যুগে ডঃ মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্–যিনি দীর্ঘদিন থেকে প্যারিসে বসবাস করছেন– রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র জীবনী রচনার ক্ষেত্রে এমন এক বাস্তব ও অভিনব ধারা অবলম্বন করেছেন, যা অতীতে কেউ কোনদিন করেননি। এদিক দিয়ে তাঁর এই অবদান নিঃসন্দেহে অনন্য। তাঁর ধারাটি হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব জায়গায় লড়াই করেছেন তিনি তার অধিকাংশ জায়গায়ই গিয়েছেন এবং স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করে নিজস্ব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ঐ সব জায়গায় সংঘটিত যুদ্ধসমূহের অবস্থা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট জায়গার মানচিত্রও দিয়েছেন। এরপর তিনি পুনরায় ঐ সব জায়গায় গিয়েছেন এবং পুনরায় চিন্তাভাবনা করে নিজের লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেছেন। অপর দিকে মরহুম কাযী সুলায়মান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে সংঘটিত যুদ্ধসমূহে প্রাণ সংহারের স্বল্পতার দিকটি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন এবং সমগ্র যুদ্ধে যত লোক নিহত, আহত কিংবা বন্দী হয়েছে তাদের বিস্তারিত পরিসংখ্যান পেশ করে অতি সুন্দরভাবে একথা প্রমাণ করেছেন যে, এত স্বল্প সংখ্যক লোক হত্যা, জখম অথবা বন্দী করে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা বিশ্বে একমাত্র হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। তাঁর এই লেখাটি 'রাহমাতুল লিল আলামীন' শীর্ষক পুস্তকের দ্বিতীয় খন্ডে মুদ্রিত হয়েছে।

নয়া দৃষ্টিকোণ

ডঃ মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্ এক্ষেত্রে আরো এক কদম এগিয়ে গিয়ে তার প্রণীত 'আহদে নববী কে ময়দানহায়ে জঙ্গ' শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন–

"রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগের যুদ্ধ সমূহ মানব-ইতিহাসের অসাধারণভাবে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি দ্বিগুণ, তিনগুণ এবং কোন কোন সময় দশ গুণেরও বেশী শত্রুর সাথে লড়েছেন এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই জয়লাভ করেছেন। মাত্র কয়েকটি গৃহ সম্বলিত একটি ক্ষুদ্র শহরে যে রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছিল তা প্রতিদিন গড়ে দুশ চুয়াত্তরের অধিক বর্গমাইল জুড়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং মাত্র দশ বছর পর, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইনতিকাল করেন, তখন দশ লক্ষ বর্গমাইলেরও অধিক আয়তনের একটি বিরাট ভূখন্ড তাঁর শাসনাধীনে ছিল। আর এক্ষেত্রে সর্বাধিক লক্ষণীয় ব্যাপার হলো,পাকভারত উপমহাদেশের সমপরিমাণ আয়তনের একটি এলাকা, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করত, সেখানে শত্রু পক্ষের মাত্র দেড় শ লোক নিহত হয়। আর এই দশ বছরে গড়ে প্রতিমাসে মাত্র একজন করে মুসলমান শাহাদত বরণ করতে থাকেন। মানব রক্তের এরূপ মর্যাদা দান বিশ্বইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি অতুলনীয় ঘটনা।[২]

এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মানুষের প্রাণ রক্ষার ক্ষেত্রে এমন সব বাস্তব ঘটনা মানবজাতির সামনে রেখে গেছেন যার কোন দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিনীত নিবেদন

আমি আমার সম্পর্কে কী বলবো? না আমার কাছে জ্ঞানের উল্লেখযোগ্য কোন পুঁজি আছে, আর না আমলের। আমার অবস্থা হলো, যখন দায়িত্ব পালনের প্রতি দৃষ্টি দিই তখন আমার যাবতীয় উদ্যোগ ও সাহস ঠিক সেভাবে গলে পানি হয়ে যায় যেভাবে সূর্য কিরণে পানি হয়ে যায় বরফের কঠিন শিলা। আমার আগ্রহের আতিশয্য তো এই চায় যে, যা কিছু মনে আসে তা যেন সংগে সংগে লিপিবদ্ধ করে ফেলি। আর বাহ্যত: কাজটিও এমন ছিল না যে, তা আমার সাধ্যের অতীত। কিন্তু মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মরহুম কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান এবং ডক্টর মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্‌র মত ইল্‌ম্ ও আমলের ঝানু অশ্বরোহীদের সাথে সামনে সামনে চলা আমার কাছে ছিল দুঃসাহসেরই নামান্তর। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিই-

عشق است وصد امید نظیری گناه نیست

توهم بگوی یك سخنار ارزویے خویش .

যা কিছু লিখি তা আকর্ষণীয় হোক কিংবা না হোক-এই যে লেখার আগ্রহ, তা যৎসমান্য হলেও তো আমার একটি পুঁজি, আমার প্রতি আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ অবদান। এ ধরণের সামর্থ্যকেই হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পুত্রেরা নিজেদের 'বিযাআতিন্ মুযজাতিন' (তুচ্ছ পণ্য) বলে আখ্যায়িত করেছিল।

যাহোক, আমি এখানে কিছু লিখছি শুধু এজন্য যে, যেসব সাহসী ব্যক্তি আগামীতে কঠিন ও বন্ধুর ঘাঁটিতে পা রাখবেন তখন হয়ত আমার এ তুচ্ছ জিনিসটিও কোন না কোন সময়ে তাদের একটি পাথেয় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। আমার মূল লক্ষ্য 'খিদমতে হক' (সত্যের সেবা) ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমি মনে মনে শুধু এই আশা পোষণ করছি, যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর 'রাহমাতুল লিল আলামীন' (জগতসমূহের রহমত বা আশিষ) গুণটি আরো শক্ত, আরো সুদৃঢ়, আরো জীবন্ত ও চিরন্তন হওয়ার পক্ষে অধিক থেকে অধিকতর সাক্ষ্য ও উপাদান সংগৃহীত হয়ে যায় এবং তা দ্বারা বিশ্ববাসী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সার্বজনীন রহমত ও করুণা সম্পর্কে আরো বেশী অবহিত হওয়ার সুযোগ পায়। এই খিদমত সবার পক্ষে সমানভাবে করা সম্ভব নয়। যার যে পরিমাণ জ্ঞানবুদ্ধি ও সাহস আছে সে সেই পরিমাণ খিদমতই আনজাম দেবে। কেননা, খোদ কুরআনের ঘোষণা-

لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا .

"আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পন করেন না যা তার সাধ্যাতীত।"-(২:২৮৬)

দ্বীনে রহমত

ইসলাম হচ্ছে 'দ্বীনে রহমত (আশিষ লাভের ধর্ম)। এই দ্বীনের একটি অংশও এমন নয়, যা বংশ-রক্ত-গোত্র-স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সকলের জন্য সমানভাবে রহমত হিসাবে বিবেচিত হয় না।

প্রথমে মূলনীতি হিসাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা যাক। বিশ্বে প্রত্যেকটি পুণ্যবান ও প্রত্যেকটি পাপীর জন্য জীবন ও জীবিকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এই ব্যবস্থা থেকে অল্প অথবা অধিক উপকৃত হওয়ার বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির সাহস, যোগ্যতা এবং কর্মপ্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। কেননা, প্রচেষ্টা ছাড়া মানুষ জীবনে কিছুই লাভ করতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা তার অসংখ্য নি'মাতের অগণিত ভাডার পৃথিবীর এখানে সেখানে রেখে দিয়েছেন। ভাল-মন্দ প্রত্যেক প্রকারের লোকই এ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। মানুষের কাজ কর্মের ফলাফল আখিরাতের জন্য

তুলে রাখা হয়েছে। মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদের ভাষায়–এটাই হচ্ছে সেই হাকীকত (সারবত্তা)-এর ফলশ্রুতি যে, এখানে মানুষ অবাধে রহমতের অধিকারী হচ্ছে।

আল্লাহ্‌র রহমতের চাহিদা এটাই ছিল যে, তাতে যেন কোন ধরনের বৈষম্য করা না হয় এবং জীবনের অবকাশ সকলেই যেন পুরোপরি ভাবে পায়। তাইতো আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। একটি হচ্ছে পার্থিব জীবন। এখানে অবকাশ লাভের ক্ষেত্রে সকলেই সমান। অপরটি হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। মানুষের কর্মফলের ব্যাপারটি এই জীবনের সাথে সম্পর্কিত।

যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهِ مَوْئِلاً.

"আর আপনার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াবান। ওদের কৃতকর্মের জন্য যদি তিনি ওদেরকে পাকড়াও করতে চাইতেন তবে তিনি ওদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু ওদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, যা হতে ওরা কখনো কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।"–(১৮:৫৮)

অবকাশ হচ্ছে স্বয়ং রহমতেরই একটি সনদপত্র। এর দ্বারা পুণ্যবানরা আরো বেশী পুণ্য অর্জন করবে এবং পাপে নিমজ্জিত ব্যক্তিরা পাপাচার থেকে তওবা করার সুযোগ পাবে। কেউ পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে যদি তার উপর শাস্তি নাযিল হয়ে যেত তাহলে তার তো কোন অবকাশই থাকত না। স্মরণ রাখতে হবে, এটাই হচ্ছে সংস্কার ও সংশোধনের সঠিক পন্থা। আর এর মুল লক্ষ্য হচ্ছে সংশোধন করা– শাস্তি দেওয়া নয়। শাস্তি শুধু মাত্র তাদের জন্যই হতে পারে, যারা অনেক বুঝানোর পরও নিজেদেরকে সংশোধন করে না এবং অবকাশ পাওয়া সত্ত্বেও তা থেকে উপকৃত হয় না–বরং চিরদিন ভ্রান্তির মধ্যেই পড়ে থাকে। গুনাহ্-অপরাধের ধরন ও পরিমাণ যাই হোক তাতে কিছু যায় আসে না। যখন মানুষ তাওবা করে, কৃত অপরাধের কারণে তার মনে যখন অনুতাপ আসে তখন তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং তার আমল-নামার পাপসমূহ এমন ভাবে ধুয়ে মুছে যায়, যেন সে জীবনে কোন পাপই করেনি। এটা নিঃসন্দেহে বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নি'মাতের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বান্দার আমল যতই খারাপ বা অপছন্দনীয় হোক, পবিত্র কুরআন তাকে অনবরতঃ আল্লাহ্‌র রহমতেরই সুসংবাদ দিয়ে যাচ্ছে। যেমন–

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

" হে আমার বান্দারা! তোমরা যাবা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ– আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"–(৩৯:৫৩)

ইসলামী কর্মনীতি

ইসলামী কর্মনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের সমষ্টিগত জীবনকে সব ধরণের ভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখা এবং সমাজে এমন কোন প্রকার ফিত্‌না-ফাসাদের সৃষ্টি হতে না দেওয়া, যা মানব জীবনের শান্তি-শৃখলা ভঙ্গ করতে পারে। ইসলামী কর্মনীতি সমূহের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য বিশেষভাবে দু'টি কথা মনে রাখতে হবে। যেমন–

(১) মানুষের সমষ্টিগত জীবনের জন্য কর্মনীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের অধিকারের প্রতি পুরাপুরি দৃষ্টি রাখা হয়েছে কি না। যদি না রাখা হয়ে থাকে তাহলে বৈধ ব্যক্তিগত অধিকার এবং সমষ্টিগত কর্মনীতির মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আর এই অবস্থায় কোন সমাজই বিশৃখলা থেকে বেঁচে থাকতে পারে না।

(২) সমষ্টিগত কর্মনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? এর লক্ষ্য কি এই যে, এর দ্বারা জনসাধরণের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা, দয়া ও সহমর্মিতা অধিক থেকে অধিকতর সৃদৃঢ় হবে, জনসাধারণ সমষ্টিগত কর্মনীতির সমঝদার হবে, তাদের মধ্যে পরস্পরের অধিকার নির্ণয়, নির্ধারণ ও সংরক্ষণের বোধশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং একে অন্যের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখাটা, তাদের দ্বিতীয় মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হবে।

ইসলাম এ ধরনের একটি সমাজ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলো। তার কর্মনীতির (চারিত্রিক শিক্ষাও যার অন্তর্ভুক্ত) মূল লক্ষ্য এটাই ছিল যে, মানুষের দায়িত্বজ্ঞান অধিক থেকে অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করুক, এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি হোক যে, এরপর যেন 'কোন ইহ্‌তিসাবী নিযাম'(পুণ্য লাভের আশায় কোন কাজ করার নীতি)-এর প্রয়োজনও 'কেবল নাম মাত্র' বাকী থাকে। প্রাথমিক যুগের প্রতিপালন মূলক রাষ্ট্রনীতির মধ্যে এই লক্ষ্যের পরিপূর্ণতা অনেকটা নাগালের মধ্যেই এসে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং প্রতিপালন মূলক রাষ্ট্রনীতির স্থান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনীতি দখল করে নেয়। এরপর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা যুগ যুগ ধরে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষের মনে একের পর এক আঘাত হানতে থাকে। আর সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইসলামের শ্লোগান দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু সামনে রাখা হচ্ছিল ঐ মাপকাঠি, যা সাম্রাজ্যবাদী যুগে উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

পরস্পর আচার ব্যবহারের দৃষ্টান্তাবলী

এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তের সংখ্যা অগণিত। তবে আমি শুধুমাত্র দুটি হাদীস পেশ করছি। যেমন,

(১) রাসূল (সা) বলেন-

ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمىّ .

"পরস্পর দয়া, ভালবাসা ও সহৃদয়তায় তুমি মুমিনদেরকে একই দেহ সদৃশ দেখতে পাবে। যখন এর একটি অংগ ব্যাধিগ্রস্ত হয় তখন তার জন্য সমগ্র দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে ভুগে।"[৩]

আপনি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন, পরস্পরের মধ্যে এ ধরনের দয়া, ভালবাসা ও সহৃদয়তার কোন বাস্তব দৃষ্টান্ত কোথাও আপনার নজরে পড়ে কি না। অন্তরাত্মার এমন কোন দৃশ্য আপনার চোখে পড়ে কি না, যা আপনার জন্য আনন্দ ও খুশীর সংবাদ বয়ে আনতে পারে।

(২) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন-

واللّه لايؤمن والله لا يؤمن واللّه لا يؤمن قيل ومن يارسول اللّه؟ قال الذى لايامن جاره بوائقه .

"আল্লাহ্‌র কসম, সে ঈমানদার নয়, আল্লাহ্‌র কসম, সে ঈমানদার নয়, আল্লাহ্‌র কসম, সে ঈমানদার নয়। একজন নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তর দিলেন, "যার প্রতিবেশী তার পাপাচার (অত্যাচার) থেকে নিরাপদ নয়।"[৪]

চিন্তা করে দেখুন, যদি প্রত্যেকটি প্রতিবেশী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাণীর উপর আমল করে এবং প্রতিটি মুহূর্তে এই মর্মে সতর্কতা অবলম্বন করে যে, তার কোন প্রতিবেশী যেন তার কোন কথা বা কাজ দ্বারা কষ্ট না পায় তাহলে সমগ্র জনবসতি সব রকমের অনিষ্টকারিতা থেকেই শুধু রক্ষা পাবে না, সেই সাথে তাদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও সম্পীতির সম্পর্কও আপনা আপনি গড়ে উঠবে।

এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি আংশিক বাণী ছাড়া কিছু নয়। এতদসত্ত্বেও যদি আমরা এর কার্যকারিতা ও ফলশ্রুতি নিয়ে চিন্তা করি তাহলে এর ব্যাপক কল্যাণকামিতা ও শুভ প্রভাব অবশ্যই আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়বে।

এ-ই ছিল ইসলাম, যা বিশ্বের জন্য রহমত, দয়া, মঙ্গল ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছিল। এরপর মুহাম্মদ (সা) যে 'রাহমাতুল লিল আলামীন' ছিলেন সে সম্পর্কে কারো মনে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

সেরা সৃষ্টির দায়িত্ব সমূহ

মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব আখ্যা দেওয়া হয়। এর অর্থ কি এই যে, এর উপর গর্বিত হয়ে সে আপন দায়িত্বের কথা ভুলে যাবে? মানুষ অনায়াসে পাপ-পুণ্য ও আগুন-পানির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। এরপর তার পক্ষে কি এমন কোন আচরণ শোভা পায়, যা মনুষ্যত্বের সৌন্দর্য ও মর্যাদার বিরোধী এবং যা তাকে 'হীনতা গ্রস্তদের হীনতমে' পরিণত করতে পারে না ? না, তা সে করতে পারে না। সে এমন কোন কাজ করতে পারে না, যার কারণে তার সঙ্গী-সাথীদের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়- চাই এটা সম্পর্কিত হোক তাদের প্রাণের সাথে অথবা তাদের সম্পদের সাথে অথবা তাদের সম্মানের সাথে। অনুরূপ প্রত্যেকটি কাজই সমষ্টিগত শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার উপর কোন না কোনভাবে আঘাত হানে। আর এটা জানা কথা যে, এ ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কাজকর্ম ও আচার আচরণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা প্রত্যেকটি মানুষের জন্য একান্ত জরুরী। কেননা, যায়দের কোন আচরণ যদি কখনো বক্র ও তার সঙ্গীদের কোন ক্ষতি করে তাহলে অন্য সময় বকর ও তার সঙ্গীদের এমনি আচরণ স্বয়ং যায়দ ও তার সঙ্গীদের ক্ষতির কারণে পরিণত হবে।

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, এর যাবতীয় আদেশ-নির্দেশের ভিত্তি, সমাজ জীবনে পরস্পর দয়া, ভালবাসা ও সম্প্রীতি স্থাপনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম চায়, মানব সমাজে পরস্পর দয়া ও ভালবাসা সম্প্রসারিত ও ব্যাপকতর করার ক্ষেত্রে যেন কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয় এবং সুদৃঢ় হয় মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, আন্তরিকতা ও সহানুভূতির পরস্পর সম্বন্ধ। আর এগুলো নিঃসন্দেহে রহমত ও আশিষের কার্যকারণ ছাড়া কিছু নয়। (সংকলক)

টীকা ঃ

(১) রাহমাতুল লিল আলামীনঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা-২২৯।

(২) আহদে নববী কে ময়দানহায়ে জঙ্গঃ পৃষ্ঠা-২। এখানে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে, ডঃ হামীদুল্লাহ্ কর্তৃক উপস্থাপিত উল্লেখিত পরিসংখ্যানটি কিছুটা বিতর্কিত। তবে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গিতে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা নিঃসন্দেহে সঠিক ও যথাযথ। এবিষয়ে এর চাইতে অনেক বেশী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছেন, মরহুম কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান (রাহমাতুল লিল আলামীনঃ দ্বিতীয় খন্ড)। এ সম্পর্কিত আলোচনা পরবর্তীতেও আসছে।

(৩) সহীহ্ বুখারীঃ কিতাবুল আদাব।

(৪) সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুল আদাব।

দ্বীনে রহমত ও রাসূলে রহমত-২

মাহ্বূব ও মা'বূদ

ইসলাম 'দ্বীনী আকায়িদ ও আমল' (ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মকর্ম)-এর যে ধারণা পেশ করেছে তার ভিত্তিও সামগ্রিকভাবে দয়া ও ভালবাসার উপর স্থাপিত। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যকার সম্পর্ক মুহাব্বাত ও ভালবসাভিত্তিক। মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন, সত্যিকার 'উবূদিয়াত' (উপাসনা) তাকেই বলে, যে 'উবূদিয়াত' এর মধ্যে মা'বূদ (উপাস্য) শুধু মা'বূদ নন বরং 'মাহবূব' (ভালবাসার পাত্র)-ও বটে। এজন্যই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ۔

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম।"-(২ ঃ ১৬৫)

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

"বলুন! তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"–(৩ ঃ ৩১)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ভালবাসা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মঙ্গলময় সত্তার সাথে ভালবাসাও সমগ্র দুনিয়ার মানুষের উপর এজন্যই অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য যে, তাঁর মধ্যেই আমরা আল্লাহ্কে পাবার সঠিক রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۔

"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, পুত্র এবং সমগ্র মানুষের চাইতে অধিকতর প্রিয় হই।" (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে 'নূরে হিদায়াত' (পথ প্রদর্শনের আলো) নিয়ে এসেছেন সেটা ছাড়া হিদায়াতের আর কোন অস্তিত্ব নেই। আর মানুষের জন্য সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হচ্ছে 'হিদায়াতে হক' বা সত্যের পথ-নির্দেশ। এরপর আসে দুনিয়ার সব রকমের সম্বন্ধের কথা– আসে সেগুলোর দায়িত্ব, কর্তব্য এবং তা যথাযথভাবে পালনের উপায় ও পন্থাসমূহের কথা। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেদায়াতের যে মশাল জ্বেলে দিয়ে গেছেন তার মাধ্যমেই তো আমরা উপরোক্ত দায়িত্ব, কর্তব্য এবং তা যথাযথভাবে পালনের পথনির্দেশ পেয়ে থাকি।

আল্লাহ্‌কে ভালবাসার কার্যকর পন্থা

রাসূলুল্লাহ্ এও বলে দিয়েছেন, মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে পাওয়ার পথ তার বান্দাহ্‌কে ভালবাসার মধ্য দিয়েই অতিক্রান্ত হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চায় তার উচিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে অনুসরণ এবং তাঁর আদেশ নির্দেশের আলোকে আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌কে ভালবাসতে শেখা।

মরহুম ইকবাল, ইসলামের এই পবিত্র লক্ষ্যের নক্সা তাঁর নিম্নোক্ত কবিতায় কী সুন্দর ভাবেই না এঁকেছেন—

"তোমরা– খোদার হাজার হাজার বান্দারা
উদাসীন হয়ে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছ,
আমি তারই বান্দা হব
যে আল্লাহ্‌র বান্দাকে ভালবাসে।"

পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে ভালবাসার ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়েছে তার একটা বিরাট অংশ ইতিমধ্যে বিভিন্ন নিবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে। অতএব এখানে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। এই দুনিয়ায় এমন কোন প্রকারের অভাবী ও পরমুখাপেক্ষী নেই, যাদের জন্য বিভিন্ন ভাবে অর্থব্যয় করার নির্দেশ কুরআন বা হাদীসে নেই। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন, বিধবা, নিঃস্ব ও বন্দীদেরকে সাহায্য করা, দাসদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা, অতিথিদের দেখাশুনা করা, ঋণগ্রস্তদেরকে ঋণমুক্ত করে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে দেওয়া– মোটকথা, এমন কোন্ প্রয়োজনটি আছে, যার কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। জেনে রাখা ভাল যে, এখানে বন্দী বলতে ঐসব লোককে বুঝায় না, যাদেরকে কোন অপরাধ করার কারণে জেল খানায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। এখানে বন্দী বলতে ঐ সব লোককে বুঝায়, যারা কোন যুদ্ধের মধ্যে ধরা পড়েছে, কিংবা প্রাচীন যুগের ন্যায় এখনো কোন অত্যাচারী ব্যক্তি তাকে বন্দী করে জোরপূর্বক তার দ্বারা আপন কাজ করিয়ে নিচ্ছে।

যেখানে সত্যিকার ইসলামী সমাজব্যবস্থা রয়েছে এবং যেখানকার সকল মানুষ কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে সেখানে এমন কোন অভাবী ব্যক্তির অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে আক্ষেপের দৃষ্টিতে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে বা অন্যের দিকে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। একদিকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অভাবীকে দান করা, অপর দিকে তার আত্মসম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা– এ উভয় ধারাই ইসলামী কল্যাণ কামিতার মধ্যে নিহিত রয়েছে। সম্পদশালীর জন্য অভাবীকে সাহায্য করা সেরূপ জরুরী, যেরূপ জরুরী তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করা। প্রকৃতপক্ষে অভাবী সম্পদশালীর কাছ থেকে তার সম্পদ গ্রহণ করে না যে, এজন্য তার কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। বরং আল্লাহ্ তা'আলাই অভাবীর অংশ তার সম্পদের মধ্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন। অভাবী সম্পদশালীর কাছ থেকে যা গ্রহণ করে তা তারই অংশ, যা আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে ইসলাম, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য নিয়ে এসেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কয়েকটি বাণী

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ

১। আল্লাহ্‌র রহমত ও কৃপা ঐ সব বান্দার জন্য, যারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি কৃপা করে।

২। যারা যমীনে রয়েছে তাদের প্রতি দয়া কর, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

৩। যে কারো প্রতি কৃপা করে–যদি তা একটি পাখীর জন্যও হয়–আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি কৃপা করেন।

৪। যে অন্যের প্রতি দয়া করে না তার প্রতিও দয়া করা হয় না।

৫। জনৈক বেদুঈন সালাতের মধ্যে দু'আ করলঃ হে আল্লাহ্! আমার উপর এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উপর দয়া কর এবং আমাদের সাথে অন্য কারো উপর দয়া করো না। যখন তার সালাত শেষ হল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ তুমি একজন অতি বিত্তশালী সত্তার প্রশস্ত দরজাটি সংকীর্ণ করে দিলে।

বেদুঈন এ দু'আটি খারাপ নিয়্যতে করেনি, বরং তার মানসিকতাই ছিল এই প্রকারের। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্র রহমত এতই ব্যাপক ও প্রশস্ত যে, তাঁর কাছে সমগ্র মানুষের মঙ্গল কামনা করলেও তাতে কোন কম্তি দেখা দেবে না।

আল্লাহ্র গুণাবলীর প্রতিবিম্ব

মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা এখানেই যে, আল্লাহ্র গুণাবলীর সাথে নিজের গুণাবলীর অধিক থেকে অধিকতর সাদৃশ্য সৃষ্টি করা। অর্থাৎ ততটুকু সাদৃশ্য স্থাপন করা, যতটুকু একজন মানুষের মধ্যে কুলায়। ঐসব গুণাবলীর প্রতিবিম্ব মানুষের অন্তরের আয়নায় এবং তার চিন্তাধারায় যাতে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় সেজন্য চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করা উচিত নয়। মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদের ভাষায়, পবিত্র কুরআন আমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রহমতের ধারণা সৃষ্টি করতে চায়। আর তা এজন্য যে, যাতে আমরা আপাদ মস্তক রহমতে পরিণত হয়ে যাই। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআন আমাদের মনে 'রাবুবিয়াত' (প্রতিপালন গুণ), ভালবাসা, সহমর্মিতা, মঙ্গলকামিতা এবং অন্যান্য গুণাবলীর নক্সা অংকিত করে, যাতে করে আমাদের মধ্যে, আমাদের সামর্থ্য ও সাহসিকতা অনুযায়ী ঐসব গুণাবলীর কিরণ প্রতিফলিত হয়। পবিত্র কুরআন আমাদের বার বার শুনায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও বদান্যতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

অনুরূপভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যেন আমাদের মধ্যেও তাঁর বন্দাদের জন্য ক্ষমা ও বদান্যতার অপরিসীম আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আমরা যদি তাঁর বান্দাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করতে না পারি তাহলে আমাদের কী অধিকার রয়েছে যে, আমরা তাঁর ক্ষমা ও বদান্যতার প্রত্যাশায় থাকবো? এই শেষ বাক্য এই হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত– مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَيُرْحَمْ –"যে দয়া করে না সে দয়া পায় না।"

আহকাম, শারয়ি' ও তালকীনাত (শিক্ষাসমূহ)

ইসলামের আহকাম ও শারয়ি' 'মন্দের প্রতিফলন অনুরূপ মন্দ'। (৪২ : ৪০) –এই নীতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত। কেননা, সকল মানুষের উদ্যোগ ও আগ্রহ সমান হয় না। আর অপরাধসমূহ এমন নয় যে, তার প্রত্যেকটিকেই ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কেননা, অনুরূপ করা হলে সমাজের উপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এতদ্সত্ত্বেও আল্লাহ্র কিতাবের সেইসব 'তালকীনাত' (শিক্ষা) সর্বদা আমাদের সামনে রাখতে হবে, যা 'আযীমাত' (সংকল্পের দৃঢ়তা) এর প্রত্যাশী। যেমন–

فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ط .

"আর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্র কাছে আছে।"–(৪২ : ৪০)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ .

"অবশ্য যে ধৈর্য্য ধারণ করে ও ক্ষমা করে দেয়, সেটা তো হবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।" –(৪২ :৪৩)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ .

"যারা স্বচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।"-(৩ ঃ ১৩৪)

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ .

"আর যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, এদের জন্য শুভ পরিণাম।"-(১৩ ঃ২২)

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖ ط وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ .

"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে, তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাই তো উত্তম।"-(১৬ ঃ১২৬)

আল্লাহ্র অপরিসীম রহমত

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হচ্ছেন সেই সত্তা, যার মাধ্যমে মানবজাতি মহান আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত ও অপরিসীম রহমতের সুসংবাদ পেয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা ঃ

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ط

"আর আমার দয়া-তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত।" -(৭ ঃ১৫৬)

হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কয়েকজন যুদ্ধবন্দী এল। তাদের মধ্যকার জনৈক স্ত্রীলোক সেখানে তার শিশু সন্তানটিকে পেয়ে গেল। শিশুটিকে দেখার সাথে সাথে স্নেহের আতিশয্যে সে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকের দুধ খাওয়াতে লাগল। শিশুটিকে পেয়ে সে খুশীতে এমনি ব্যাকুল হয়ে পড়ল যে, আশে পাশে কি হচ্ছে, না হচ্ছে সেদিকে তার কোন খেয়ালই ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার এই অবস্থা দেখে বললেন-

اترون هذه طارحة ولدها فى النار قلنا لا وهى تقدر ان لاتطرحه فقال الله ارحم بعباده من هذه بولدها .

"তোমরা কি মনে কর যে, এই স্ত্রীলোকটি তার সন্তানটিকে আগুনে ফেলে দিতে চাইবে? আমরা নিবেদন করলাম, যতক্ষণ তার দেহে বল আছে ততক্ষণ সে কোনমতেই তাকে আগুনে ফেলবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, এই স্ত্রীলোকটি তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়াশীল, আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের প্রতি তার চাইতেও অনেক বেশী দয়াশীল।"

মানুষ, জীবজন্তু, পশুপাখী, হিংস্র জন্তু জানোয়ার যে কোন একটি গোষ্ঠীর দিকে তাকান, দেখবেন সন্তানের প্রতি মাতৃজাতির ভালবাসা কত আন্তরিক, কত বিশুদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের এমনি ভালসাবার দৃশ্য দেখে আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আর এভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা আল্লাহ্র রহমত

সম্পর্কে মানুষের অন্তরে কী অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি করবে তা তো কাউকে আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। প্রকৃতপক্ষে বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্‌র ভালবাসার সঠিক পরিমাপ করার এর চাইতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় পন্থা আর কিছুই হতে পারে না।

আংশিক বিষয়সমূহ

যদি আপনি কোন কোন বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আংশিক বাণীসমূহ সামনে রাখেন তবে অবশ্যই আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। কেননা, আজ পর্যন্ত কোন বিরাট থেকে বিরাটতর জ্ঞানী, দার্শনিক কিংবা অন্য যে কোন পর্যায়ের ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিক্ষিপ্ত বাণী সমূহ সমন্বিত আকারে বর্ণনা করতে সক্ষম হননি। এতদসত্ত্বেও এগুলো বর্ণনা করা হলে আপনার অন্তর থেকে অতর্কিত আওয়াজ উচ্চারিত হবে যে, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ বাণী সমূহের প্রত্যেকটি অংশই হক এবং সত্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একদা তিনি প্রতিবেশীদের 'হক' (অধিকার) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন-

১। যদি প্রতিবেশী অসুস্থ হয় তাহলে তাকে দেখতে যাও এবং তার খোঁজখবর নাও।

২। যদি সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহলে তার জানাযায় শরীক হও। অর্থাৎ তার দাফন কার্যে অংশগ্রহণ কর।

৩। যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় এবং তোমার সামর্থ্য থাকে তাহলে তাকে ঋণ দাও।

৪। যদি সে কোন খারাপ কাজ করে বসে তাহলে তুমি তা গোপন কর।

৫। যদি তার কোন নি'মাত বা সম্পদ মিলে তাহলে সেজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাও।

৬। যদি তার উপর কোন বিপদ পতিত হয় তাহলে তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর।

৭। তোমার দালানগৃহ এরূপ উচু করো না, যাতে তোমার প্রতিবেশীর ঘরে বায়ু চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

৮। যদি তোমার ঘরে কোন ভাল খাবার রান্না করা হয় তাহলে চেষ্টা কর যেন তার সুগন্ধি তোমার প্রতিবেশী কিংবা তার সন্তান-সন্ততির কাছে না পৌঁছে, যা তার মানসিক কষ্টের কারণে পরিণত হয়। অন্যথায় তুমি ঐ খাবারের কিছু অংশ অবশ্যই তোমার প্রতিবেশীর ঘরে পাঠিয়ে দাও।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন প্রকার প্রতিবেশীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-

১। অমুসলিম, যার সাথে তোমার আত্মীয়তা নেই, সে হলো নিম্নস্তরের প্রতিবেশী। অর্থাৎ তোমার উপর তারও অধিকার রয়েছে, তবে অন্যের অনুপাতে কম।

২। মুসলিম প্রতিবেশী, যার সাথে তোমার আত্মীয়তা নেই, তবে তার স্তর প্রথমোক্ত স্তরের উপরে।

৩। আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী। অর্থাৎ প্রতিবেশীও এবং আত্মীয়ও। এরূপ প্রতিবেশীর হক সবার উপরে রয়েছে।

আপনি এই সব আংশিক ও বিচ্ছিন্ন বাণীসমূহ কোথাও পেলে তা অনুগ্রপূর্বক মানুষের সামনে পেশ করুন। প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিচ্ছিন্ন বাণীসমূহ যদি একবার আপনার সামনে এসে যায় তাহলে আপনি অনুমান করতে পারবেন, এগুলো আংশিক ও বিচ্ছিন্ন আকারের হলেও মানব জীবনে তার কী অসাধারণ মূল্য ও গুরুত্বই না রয়েছে।

মৌলিক বিষয়

এটা ছিল সেই পবিত্র দ্বীন, যার দাওয়াত প্রদানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রেরিত হয়েছিলেন। ইসলামের আল্লাহ্ করুণাময় ও দয়ালু। ইসলামের রাসূলও করুণাময় ও দয়ালু। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে অধিক থেকে অধিকতর করুণা, ভালবাসা ও ক্ষমা প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছেন। মানব জগতের সংস্কার ও সংশোধন এই পদ্ধতিতেই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। এতে সন্দেহ নেই যে, ইসলামে প্রতিশোধ গ্রহণেরও সুযোগ রাখা হয়েছে। কেননা, সমগ্র মানুষ

সংকল্পের দৃঢ়তার দিক দিয়ে সমান নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যারা যত অগ্রণী, শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য তত বেশী। সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব যথাশীঘ্র সম্ভব পরিপূর্ণতায় পৌছানো একমাত্র সংকল্পের দৃঢ়তার মাধ্যমেই সম্ভব।

সংশোধনের ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয় এই যে, যারা সংশোধনের দায়িত্ব পালন করবেন তাদের সর্বপ্রথম এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তিনি যাদেরকে সংশোধনের দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের সাথে তার সহানুভূতি ও সহমর্মিতা রয়েছে। আর এটা সংশোধনকারীর উন্নত কর্মধারা থেকেই প্রস্ফুটিত হতে পারে। এরপর তার সংশোধন কার্যের সীমা যতই বিস্তৃত হবে ততই সমাজ থেকে ফিত্নাফাসাদ দূর হতে থাকবে। তারপর নতুন নতুন সংশোধনকারীর উদ্ভব হবে এবং এটা অসম্ভব নয় যে, কোটি কোটি মানুষ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সত্য পথের অনুসারীতে পরিণত হবে। "আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন"(১০০ ঃ২)– এটা ছিল এমন একটি দৃশ্য, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের ফলে পূর্ণতা লাভ করেছে। এর শেষ দৃশ্যটি এখনো পূর্ণতা লাভ করে নি। যখন সমগ্র বিশ্বের প্রান্তে 'রাহমাতুল লিল আলামীন'-এর স্বীকৃতির আওয়াজ বুলন্দ হবে এবং সমগ্র বিশ্ববাসী 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িনা মাওলানা মুহাম্মদিন্ ওয়ালিহি ওসাল্লাম'-এর ধ্বনি সমস্বরে উত্থাপন করবে তখন এই শেষ দৃশ্যটিও পূর্ণতা লাভ করবে।

মনুষ্যত্বের মহান মঙ্গলাকাংখী

রক্ত সম্বন্ধের চাইতেও বিশুদ্ধ, সুদৃঢ় ও আন্তরিক ভালবাসা সৃষ্টির শক্তিশালী উপাদান কি হতে পারে, সে সম্পর্কে আপনি কি কখনো চিন্তা করেছেন? আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কয়েকিটি বাণীর উপর মোটামুটিভাবে একবার চোখ বুলিয়ে নিন, আপনার অন্তরে এই প্রতীতি জন্মাবে যে, মানবতার এই মৌলিক ও চিরন্তন মঙ্গলকামিতার জন্য যে পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুসরণ করেছিলেন তার চাইতে শ্রেষ্ঠতর ও অধিকতর প্রভাব সম্পন্ন পদ্ধতি আর কিছুই হতে পারে না।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ভ্রান্ত ধারণা থেকে দূরে থাক। কেননা, ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে সব চাইতে মিথ্যা বুলি। একে অন্যের পোগনীয় বিষয় সন্ধান করো না, একে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না। একে অপরের সাথে শত্রুতা রেখ না, বরং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকো।[১]

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, পরস্পর শত্রুতা রেখো না, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং পরস্পরিক সম্পর্ক বিছিন্ন করো না। হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাকো। কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে, সে আপন ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখে।[২]

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যখন কারো ঘরে তরকারী পাকানো হয় তখন তাতে বেশী করে ঝোল দাও এবং এ থেকে কিছু পরিমাণ তোমার প্রতিবেশীর ঘরে পাঠিয়ে দাও।[৩]

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, সে আমার উপর ঈমান আনে নি, (অর্থাৎ আমার দলভুক্ত নয়), যে পেট ভরে খেয়ে আরামে শুয়ে পড়ে অথচ তার ধারেকাছে বসবাসকারী প্রতিবেশী ভুখা থাকে এবং ঐ ব্যক্তি জানে যে, তার এই প্রতিবেশী ভুখা রয়েছে।[৪]

আজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য যারা মানুষকে আহবান জানাচ্ছেন তাদের মধ্যে এমন কয়জন আছেন, যারা এই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারবেন? যারা ঘটনাচক্রে মাঝে মধ্যে কিছু সময়ের জন্য দ্বীনী দাওয়াতের কাজে বহির্গত হন তারা তাদের জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট প্রাসাদে পেট ভরে খেয়ে এমনভাবে শুয়ে থাকেন যে, ভুখা ও অভাবী যে কেউ আছে, সে অনুভূতি পর্যন্ত তাদের অন্তরে জাগে না। আর জাগলেও ভুখা নাংগাদের খোঁজে তারা ঘর থেকে কখনো বের হন না। অথচ ইসলামের স্বর্ণযুগের মুসলমানদের অন্তরে আপন দ্বীনী দায়িত্ব

পালনের অনুভূতি এতই তীব্র ছিল যে, তাঁরা সারা রাত জেগে জেগে ছদ্মবেশে এখানে সেখানে ঘুরাফেরা করতেন শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যে যে, কোথাও এমন কোন বিপন্ন ও নির্যাতিত মানুষ পড়ে রয়েছে কি-না, যার খবর তাদের কাছে পৌছে নি। ইসলামের উল্লেখিত নিদর্শন সমূহ থেকে যা বুঝা যায় তার সারকথা এই যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতি এমনভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তাদের সাথে এমন দয়া, করুণা ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, যা সাধারণত: একই রক্তসম্বন্ধের লোকদের ভাগ্যে বড় একটা জোটে না। যদি মনুষ্যত্বের এমন দরদী কোন মানুষ থাকেন তাহলে তাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন। দেখবেন, তিনি 'রাহমাতুল লিল আলামীন' হযরত আহ্মদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) ছাড়া আর কেউ নন। (সংকলক)

টীকা ঃ

(১) সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুন্ নিকাহ্।

(২) সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুল আদাব।

(৩) তাবারানী।

(৪) তাবারানী।

আপন পর নির্বিশেষে রহমত ও করুণার বৃষ্টি-১

"মানুষকে মর্যাদা দানই মনুষ্যত্ব"

মানুষকে পথ-প্রদর্শনের জন্য কী অপরিসীম ব্যাকুলতা

মানুষের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তরে অপরিসীম রহমত ও ভালবাসার যে সমুদ্র তরঙ্গায়িত ছিল তার উল্লেখ এ গ্রন্থে একের পর এক করা হয়েছে। সংগে সংগে দৃষ্টান্তও পেশ করা হয়েছে। বাকী রয়েছে তার রহমত ও করুণার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া। আমি বিবরণ দিতে চাইলেও উপযুক্ত শব্দ ও বর্ণনার ভাষা ও শক্তি কোথায় পাব? কবির ভাষায়–

کتاب فضل ترا اب بحر کافی نیست
که ترکنم سرنگشت وصفحة بشمارم

এক্ষেত্রে আমাদের জন্য আল্লাহ্র কিতাবের সাক্ষ্যের চাইতে অকাট্য, চিত্তাকর্ষক ও চূড়ান্ত সাক্ষ্য আর কিছুই হতে পারে না।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا .

"ওরা এই বাণী বিশ্বাস না করলে সম্ভবতঃ ওদের পেছনে ঘুরে আপনি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন।" –(১৮ : ৬)

আল্লাহ্র বান্দাদের ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গলকামিতার ক্ষেত্রে এর চাইতে চূড়ান্ত ভালবাসা ও আসক্তির উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে? উপরোক্ত তাঁর এই ভালবাসা, সহৃদয়তা ও বেদনাবোধ সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ছিল– কোন নির্দিষ্ট জাতি, বংশ বা ভূভাগের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদের ভাষায়–

"আম্বিয়া কিরাম মানুষকে হেদায়াত ও সংশোধণের শুধু প্রত্যাশীই ছিলেন না, এজন্য তাঁরা ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ। মানুষের পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতা ছিল তাঁদের বুকের ক্ষততুল্য। তাই তাঁরা মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য ছিলেন ব্যাকুল। একজন মানুষ সত্যের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মিথ্যার দিকে চলে গেছে-এর চাইতে বড় দুঃখ ও আক্ষেপের বিষয় তাঁদের কাছে আর কিছুই ছিল না। আর একজন মানুষ গুমরাহী থেকে সরল সঠিক পথে চলে এসেছে-এর চাইতে আনন্দের বিষয় তাঁদের কাছে কিছু ছিল না। পবিত্র কুরআনের সর্বত্রই এ বিষয়ের সাক্ষ্য মওজুদ রয়েছে।"[১]

লক্ষণীয় বিষয়

আপনি এ বিষয়টি কি কখনো ভেবে দেখেছেন? এ ধারণা করা তো নেহাত নির্বুদ্ধিতা হবে যে, সত্যের দিকে আহবানকারী (অর্থাৎ নবী), মানুষরূপী একটি যন্ত্র বিশেষ (রোবট), যা উপর থেকে অবতীর্ণ হেদায়াতসমূহ মানুষের সামনে বার বার আওড়াতে থাকে। না, তা কখনো নয়।

১। আল্লাহ্ তা'আলা যেসব পবিত্র ও মহান ব্যক্তিকে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করে আসছেন তাঁরা প্রকৃতিগত ভাবেই তাঁদের জাতি ও সমসাময়িক লোকদের সংস্কার ও সংশোধনের জন্য রাতদিন চিন্তিত ও উদগ্রীব থাকতেন। যদি এরূপ না হত তাহলে কোন সত্যের আহবানকারী হাজারো রকমের বিপদ ও বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁদের দায়িত্ব পালনে পাষাণ পর্বতের ন্যায় অবিচল থাকতে পারতেন না। যদি এরূপ না হত তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত নিঃস্ব অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একথা বলতে পারতেন, "আল্লাহ্র কসম, যদি তারা (কাফিররা) আমার এক হাতে সূর্য এবং অপর হাতে চন্দ্র এনে দেয় তবু আমি আমার দায়িত্ব পালন থেকে বিরত হব না। হয় আল্লাহ্ তা'আলা আমার এই মিশনকে সফল করবেন, নয়ত আমি এজন্য নিজেকে নিঃশেষ করে দেবো।"

২। পবিত্র কুরআন এই বিষয়ের উপর অনবরত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সত্যের দিকে আহবানকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন আহবানের সূচনা থেকে ইনতিকাল পর্যন্ত এই ঘোষণাই প্রদান করেছিলেনঃ আমি এ কাজের জন্য কারো থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্র কাছে রয়েছে। সত্যের দিকে আহবানকারী প্রত্যেক ব্যক্তির নিষ্কলুষ হৃদয়ে যদি তাঁর সম-জাতীয় ও সমসাময়িক লোকদেরকে সঠিক ও সরল পথে নিয়ে আসার জন্য অপরিসীম মনের টান না থাকত তাহলে তাঁরা কেন সব সময় তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের দাবী থেকে নিস্পৃহ থাকার ঘোষণা বার বার করতেন।

৩। সত্যের দিকে আহবানকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই তার যে কোন কাজ ও যে কোন উদ্যোগের পরিণাম ও ফলাফল যেন নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করতেন। মন্দ কাজের পরিণামের ধারণা এক বস্তু। কিন্তু পরিণামের বিশ্বাস ও তিক্তকর দিকটি প্রত্যক্ষ করা সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু।

৪। যদি কোন ব্যক্তি পথ ভ্রষ্টতার দিকে অগ্রসর হয় তখন সাধারণ লোক মনে করে যে, শরীয়ত অনুযায়ী সে শাস্তির যোগ্য। এখন আল্লাহ্ তা'আলা যদি তার বিশেষ করুণা গুণে তাকে মাফ করে দেন তাহলে অন্য কথা। কিন্তু সত্যের আহবানকারীর কাছে যে কোন কাজের পরিণাম ঠিক সেভাবে প্রতিভাত হয়, যেভাবে প্রতিভাত হয় একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির কাছে দিনের বেলা সূর্যকিরণ। এমতাবস্থায় আপন স্বজাতীয়দের জন্য অনন্ত ভালবাসা ও করুণার ভিত্তিতে, তাদেরকে কষ্টদায়ক ও কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাবার জন্য তাঁর অন্তরে যে অসীম আগ্রহ ও মমত্ববোধ জাগ্রত হয়, তা অনুধাবন করা আমাদের মত সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী স্বার্থান্ধ লোকের পক্ষে কী করে সম্ভব হতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ (সা)-একদা বলেছিলেন, আমি তোমাদের আঁচল ধরে অনবরত টানছি কিন্তু তোমরা আগুনের মধ্যে পতিত হচ্ছ।

৫। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নুবুওয়াতের যাবতীয় সদ্গুণাবলী ও প্রকৃষ্টতার অধিকারী ছিলেন। কেননা, তিনি সমগ্র বিশ্বের মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। এজন্য যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও তিনি ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট।

উপরে বর্ণিত সূরা কাহ্ফে যে দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণিত হয়েছে তাতে তাঁর জীবনের যে দুটি দিক তুলে ধরা হয়েছে তা সত্যের দিকে আহবানকারী মানুষের মধ্যে থাকা উচিত। দিক দুটি হলোঃ

(ক) মানব জাতির সংস্কার ও সংশোধন তথা তাদেরকে সত্যের দিকে আহবান করার প্রতি অন্তরে গভীর আগ্রহ পোষণ করা।

(খ) তাদের প্রত্যেকের উচিত, মানুষের সংস্কার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে 'তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ।' আল্লাহ্ বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই গুণাবলী দ্বারা নিজেদেরকে গুণান্বিত করে তোলা।

তায়িফের ঘটনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তায়িফ সফরের উল্লেখ করতে গিয়ে নিবেদন করা হয়েছে যে, 'দাওয়াতে হক' (সত্যের আহবান)-এর যেসব ঘটনা বিভিন্ন বই পুস্তক ও আসমানী কিতাবসমূহে পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে এমন একটি ঘটনাও দেখানো সম্ভব হবে না, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তায়িফের ঘটনার সসমক্ষ হতে পারে। দেখুন–

১। তায়িফ সফরের উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তায়িফবাসীরা যেন আল্লাহ্র পথে এসে যায়। কেননা এর মধ্যে ঐসব লোকের দুনিয়া-আখিরাতের প্রকৃত শান্তি ও মঙ্গল নিহিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবলীগের প্রতি চরম আসক্তির কারণেই একাজ করতে গিয়ে সব ধরণের দুঃখ যাতনা অকাতরে সহ্য করেছিলেন।

২। তায়িফের পথভ্রষ্ট গোত্রপতিরা ঐ সময় হুযূর (সা)-এর সাথে যে আচরণ করেছিল তা যে কোন দিক দিয়ে, অত্যাচার ও সীমা লংঘনের একটি অতি জঘন্য আচরণ ছাড়া কিছু ছিল না। অবশ্য জাহিলিয়া যুগে আরবের সর্বত্রই এ ধরণের ঘটনা ঘটে যাচ্ছিলো।

৩। ঐসব গোত্রপতিদের ইঙ্গিতে বখাটে ছেলেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে প্রস্তর বর্ষণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছিল–যার কারণে তাঁর ললাটের রক্ত সমস্ত গা ভেসে পা পর্যন্ত সিক্ত করে ফেলেছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি একটি বাগানে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

৪। এই দুঃখজনক অবস্থায়ও তাঁর অপরিসীম ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গেনি। ঐ মুহূর্তে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে যে দু'আ করেছিলেন, তা ইতিহাসে যথাস্থানে উল্লেখিত আছে। তাতে এমন একটি শব্দও পাওয়া যাবে না, যার মধ্যে তিক্ততা ও অসন্তুষ্টির গন্ধ রয়েছে। আল্লাহ্র সাথে সম্বন্ধ ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হৃদয়ে অন্য কোন জিনিস ছিল না– থাকতে পারে না।

৫। এরপর তিনি এও বলেছিলেন, আমি এদের ধ্বংসের জন্য দু'আ করব কেন? এরা ঈমান না আনলেও এদের ভবিষ্যৎ বংশধররা অবশ্যই এক আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে।

৬। সত্যের পয়গামের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস এবং মানব জাতির প্রতি অবারিত রহমত ও করুণার এ ধরণের কোন দৃষ্টান্ত কি আপনি দেখাতে পারবেন? হিদায়াতের অপরিসীম আশার এমন কোন নক্সা কি অন্য কোথাও আপনার নজরে এসেছে বা আসতে পারে?

ইতিহাস সাক্ষী, শুধু তাদের ভবিষ্যৎ বংশধর নয়, বরং ঐসব লোকেরাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হস্তে ঈমান এনেছিল, যারা মাত্র কয়েক বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে প্রস্তর বর্ষণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছিল। বিশ্বাস করুন, তায়িফের ঘটনা আপন সারবত্তার অতুলনীয়তার ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র জীবনের মোড় একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কেননা, এখান থেকেই হিজরতের ঘটনার সূচনা হয়েছিল এবং 'দ্বীনে হক' এর দাওয়াত সেই পর্যায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল যেখানে থেকে কুরআনে বর্ণিত–

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا .

"আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন"–এই দৃশ্যের বাস্তব রূপ মানুষের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।

রাসূল যুগের যুদ্ধ সমূহ

মানবজাতির জন্য অপরিসীম রহমত ও ভালবাসার জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে রাসূল যুগের প্রত্যেকটি যুদ্ধও। এই সমস্ত যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখন পর্যন্ত অতি অল্পই চিন্তাগবেষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জীবনের কোন পর্যায়েই যুদ্ধ চান নি। যে দীনে দুনিয়ার মানুষের জন্য সন্ধি, শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও মংগলের বাণী ছিল সে দীনে সংঘর্ষ সৃষ্টির কোন অবকাশই থাকতে পারে না। কিন্তু মক্কার কুরায়শদের দাম্ভিকতা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা এবং জুলুম-অত্যাচার সৎ ও সত্যানুসারী মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

অথচ মুসলমানদের জন্য পুণ্যকামিতা, সত্যানুরাগ এবং সৎজীবন কারো জন্যই কষ্টের কোন কারণ ছিলনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বাধ্য হয়ে মজলুম মুসলমানদের একটি দলকে আবিসিনিয়ায় চলে যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু মক্কার কুরায়শরা সেখানেও তাঁদের পেছন ছাড়ে নি। এরপর মদীনার দিকে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ নিজেদের ঘরবাড়ী এবং সহায়সম্পদ ছেড়ে সেখানে চলে যান। কিন্তু এই দূরত্ব কুরায়শদের রোষানল নির্বাপিত করতে পারে নি। বরং তাদের আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি ও হিংসার আগুন আরো বেশী করে জ্বলে উঠে। এমতাবস্থায় আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিজেদের ভসিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলম্বন মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠে। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তি ও দলের জন্মগতভাবে এ অধিকার রয়েছে যে, সে বা তারা নিজেকে টিকেয়ে রাখবে। আর প্রকৃতপক্ষে বিশ্বশান্তিও নির্ভর করে এরই উপর।

গায্ওয়া ও সারিয়াহ্

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে যে সব অভিযান পরিচালানা করতে হয়েছিল সেগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং যেসব অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেগুলোকে বলে গাযওয়া (বহু বচন গায্ওয়াত) এবং যেসব অভিযান তিনি তাঁর অনুসারীদের কারো নেতৃত্বে প্রেরণ করেছিলেন সেগুলোকে বলা হয় সারিয়াহ্ (বহুবচনে সারায়া)।

মরহুম কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান মানসূরপুরী তাঁর 'রাহমাতুল লিল আলামীন' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে এক এক করে নামধামসহ বিরাশিটি গাযওয়া ও সারিয়ার উল্লেখ করেছেন।[২] কোন কোন গ্রন্থে এগুলোর সংখ্যা আরো অনেক কম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মূল প্রশ্ন সংখ্যায় নয়, বরং আকারে প্রকারে। এর সব গুলোকেই সাধারণভাবে গায্ওয়া বা সারিয়াহ্ আখ্যা দেওয়া হয়েছে, অথচ এগুলোর বেশীর ভাগ অভিযান এমনি ছিল, যেগুলোকে সত্যিকার অর্থে 'গায্ওয়া' বা 'সারিয়াহ্' -এর পর্যায়ে ফেলা যায় না। যেমন ইবনে হাযাম হুদায়বিয়া অভিযানকেও গায্ওয়া ঘোষণা করেছেন, অথচ ঐ অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) না যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, আর না সেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তিনি শুধুমাত্র উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, যার দরজা সবার জন্যই ছিল উম্মুক্ত। তাছাড়া হুযূর (সা)-এই সফর করেছিলেন যীকাদা মাসে, যা ছিল 'শাহরুল হারাম' (নিষিদ্ধ মাস)-এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব এই প্রতিরোধ বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা কুরায়শদের জন্য তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী বৈধ ছিল না। মরহুম কাযী সুলায়মান এটাকে অভিযান আখ্যা দেন নি, বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের 'গতিবিধি' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর এই আখ্যাদানের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রকৃত ঘটনার আসল রূপটি ফুটে উঠেছে।

অভিযানসমূহের আকার আকৃতি

মরহুম কাযী সুলায়মান বর্ণিত বিরাশিটি অভিযানের অধিকাংশের বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১। এর মধ্যে কোন কোনটিকে যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া প্রকৃত পক্ষে ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। যেমন 'রাজী' ও 'বি'-রে মাঊনা'-এর দিকে যেসব লোকদের পাঠানো হয়েছিল তারা না কোন সামরিক বাহিনী ছিলেন,আর না যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা শুধুমাত্র মুবাল্লিগ (প্রচারক) ও বক্তা ছিলেন। তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছিল এজন্য যে, সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীরা কুরআন ও ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তাঁর কিছু অনুসারীকে পাঠাবার জন্য বার বার অনুরোধ করেছিল। 'বি-রে মাঊনার' দিকে প্রেরিত লোকদের জন্য জনৈক গোত্রপতি ব্যক্তিগতভাবে যামিনও হয়েছিলেন। এরা ছিলেন সর্বসাকুল্যে আশিজন। সত্তর জনকে পাঠানো হয়েছিল বি'-রে মাঊনার দিকে এবং দশজনকে রাজী'-এর দিকে। বিশ্বাসঘাতকতা করে এই দুটি দলের উপরই আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। ফলে তাঁদের আশিজনের মধ্যে মাত্র একজন প্রাণে রক্ষা পান এবং বাকী সবাই শাহাদত বরণ করেন। তাঁদের এই ক্ষতিকে সামরিক ক্ষতি হিসাবেও গণ্য করা যেতে পারে না।

২। এরপর এইসব অভিযানে এত অল্প সংখ্যক লোক পাঠানো হয়েছিল যে, তাঁদেরকে 'সেনাবাহিনী' আখ্যা দেওয়া এবং তাদের অভিযানকে যুদ্ধ বলে অভিহিত করা একটি হাস্যকর ব্যাপার বলেই গণ্য হবে। যেমন ঃ

প্রেরিত মানুষের সংখ্যা	অভিযানের সংখ্যা
মাত্র ১ জন	৫টি
,, ৫ জন	২টি
,, ১০জন	২টি
,, ১২ জন	২ টি
,, ১৫ জন	৩ টি
,, ২০জন	৪টি
,, ২৫ জন	২ টি
,, ৩০ জন	৫টি
,, ৪০ জন	২টি

উল্লেখিত ২৭ টি অভিযানে এত অল্প সংখ্যক লোক পাঠানো হয়েছিল যে, তাঁদের অভিযানকে যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। এরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সামরিক গোয়েন্দা। শুক্রদের গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে সময় সময় বিভিন্ন দিকে পাঠানো হত, যাতে তাঁরা শত্রুদের ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে শক্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়। কোন কোন সময় এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, ফিত্‌নাবাজ কোন ব্যক্তি, হত্যা বা লুটতারাজে অভ্যস্থ এক বা একাধিক সম্প্রদায়কে চকিতে মদীনা আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করছিল, ঠিক ঐ মুহূর্তে একজন দুঃসাহসী মুসলিম সোজা চলে গিয়ে 'ফিত্‌না হত্যা অপেক্ষা গুরুতর' (২ ঃ১৯১)-পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই নীতির ভিত্তিতে ঐ ফিত্‌নাবাজকে হত্যা করে আসেন এবং তার ঐ অভিযানের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

৩। হুদায়বিয়ার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এটা তো যুদ্ধ ছিল না, বরং উমরা পালনই ছিল এর একমাত্র উদ্দেশ্য। শেষ পর্যন্ত কুরায়শদের সাথে দশ বছরের জন্য একটি সন্ধি সম্পাদিত হলো। ঐ চুক্তির একটি ধারা ছিল যে, মুসলামনরা পরবর্তী বছর মক্কায় এসে উমরা পালন করবে এবং তখন কুরায়শের লোকেরা তিন দিনের জন্য মক্কা শহর ছেড়ে আশেপাশের পাহাড়সমূহে অবস্থান করবে।

৪। কোন কোন অভিযান একারণেও হয়েছিল যে, শত্রুদের গুপ্তবাহিনী চকিতে রাতের বেলা মুসলামানদের এলাকায় ঢুকে কয়েকজন শান্তিপ্রিয় নাগরিককে হত্যা করে চম্পট দিল এবং তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য কয়েকজন মুসলমানকে পাঠানো হলো। এ ধরণের অভিযানকেও যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া চলে না।

৫। কোন কোন অভিযান পাঠানো হয়েছিল মদীনার আশপাশের গোত্রসমূহে। অভিযাত্রীরা তাদের সাথে থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তি সম্পাদন করে চলে আসেন। এই সব চুক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর ফিত্‌না-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আওতা সীমায়িত ও সংকুচিত করে ফেলা।

৬। এমনও একটি দৃষ্টান্ত আছে যে, কিছু লোক বাইরে থেকে এল। তাদের সকলেই ছিল অসুস্থ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)দয়াপরশ হয়ে তাদেরকে মদীনার চারণভূমিতে কিছুদিন অবস্থান করার নির্দেশ দেন, যাতে করে তারা সেখানকার উম্মুক্ত আবহাওয়ায় বসবাস করতে পারে এবং মদীনাবাসীদের উটের দুধ পান করে নিজেদের সুস্থ করে তুলতে পারে। কিছু দিনের মধ্যে তারা সুস্থ হয়ে উঠে বটে, কিন্তু জাহিলিয়া যুগের অকৃতজ্ঞদের ন্যায় চারণ ভূমির সকল রাখালকে শহীদ করে ফেলে এবং মুসলমানদের উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। শেষপর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে ধরে আনা হয় এবং সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হয়। এই পশ্চাদ্ধাবম বা ধরে আনাকে তো যুদ্ধ বলা যেতে পারে না।

৭। একদা কয়েকটি অমুসলিম গোত্র অকস্মাৎ মুসলমানদের চারণভূমির উপর হামলা চালায় এবং সেখান থেকে পশ্চাদ্ধাবন করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে উটগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। এটাও কোন যুদ্ধ ছিল না।

প্রাণের ক্ষতি

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনীকাররা এই সব অভিযানকে রীতিমত যুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। ফলে যুদ্ধের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর কোনটিই এমন অভিযান ছিল না, যাকে যুদ্ধ বলা যেতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কোন অভিযান এমন ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এই মর্মে সংবাদ এসে পৌঁছল যে, অমুক জায়গায় কিছু লোক মদীনা আক্রমণের জন্য একত্রিত হচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য প্রথমত: এই যে, তারা মদীনায় লুটপাট চালাবে, দ্বিতীয়ত: এরূপ গতিবিধির মাধ্যমে মক্কার কুরায়শদের চোখে নিজেদেরকে মর্যাদা-সম্পন্ন করে তুলবে; কেননা, তখন কুরায়শরা এমন যে কোন জনদলকে মাথায় তুলে নিতে তৈরী থাকত, যারা কোন না কোনভাবে মুসলমানদের কিছু ক্ষতি সাধন করতে পারত। যাহোক এ ধরনের কোন জনদলের বিরুদ্ধে তড়িৎ অভিযান চালিয়ে তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হত। এধরনের অভিযানে যেমন মুসলমানদের প্রাণের ক্ষতি হত তেমনি অমুসলিমরাও প্রাণ হারাত।

মোটকথা, আমি মরহুম কাযী সুলায়মান প্রণীত তালিকা থেকে মোটামুটিভাবে এধরণের সত্তরটি অভিযান পৃথক করে নিয়ে নিয়েছি, যেগুলোকে কোনমতেই যুদ্ধ বলা চলে না। এগুলোতে প্রাণের যে ক্ষতি হয়েছিল মরহুম কাযী সাহেবের তালিকা অনুযায়ী সে সংখ্যাও আমি এখানে পেশ করছি। যার নক্সা নিম্নরূপ ঃ

বাহিনী	প্রাণের ক্ষতি
মুসলিম	৯৬
অমুসলিম	১০০

কোন কোন অভিযানে অমুসলিমদের নিহতের সংখ্যা কত ছিল তা জানা সম্ভব হয়নি। মরহুম কাযী সাহেও এই সংখ্যার কোন খোঁজ বের করতে পারেন নি। যদি অনুমানের ভিত্তিতে ঐ সংখ্যা নিরূপন করা হয় তাহলে তা পনেরো বিশের অধিক হবে না। এই পরিসংখ্যানের মধ্যে বনি কুরায়যার ঐ সব লোকদের প্রাণের ক্ষতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যাদেরকে সা'দ বিন মু'আয (রা)-এর সালিসী ফয়সালা অনুযায়ী মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল। এই শাস্তি মুসা (আ)-এর শরীয়ত অনুযায়ীই কার্যকর করা হয়েছিল। কেননা, স্বয়ং বনূ কুরায়যাই সা'দ (রা) কে সালিস নিয়োগ করেছিল। এই নিহতদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোকও ছিল। তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এজন্য যে, সে দুর্গের ছাদ থেকে চাক্কির পাট ফেলে দিয়ে এমন একজন মুসলামনকে হত্যা করে ছিল, যিনি শুধুমাত্র বিশ্রাম গ্রহণের জন্য দুর্গপ্রাচীরের ছায়ায় বসেছিলেন। এই সব লোক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়নি। অনুরূপভাবে রাজী' এবং 'বি-রে মাউনা'য় শাহাদাত বরণকারী মুসলমানদের প্রাণের ক্ষতিকেও উল্লেখিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

নিয়মিত যুদ্ধ সমূহ

রাসূল যুগের যেসব অভিযানকে রীতিমত যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে সেগুলোকে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুসলমানরা আগে ভাগে সেগুলোর জন্য কোন ধরনের প্রস্তুতি নেয়নি। যেমন ঃ

১। বদর যুদ্ধ

বদরযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এভাবে-রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যে, কুরায়শের ঐ বাণিজ্য-কাফেলা সিরিয়া থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছে, যার সম্পূর্ণ মুনাফা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি খাতে ব্যয় করা হবে। নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য যেহেতু এধরনের কাফেলাকে প্রতিরোধ করা মুসলমানদের জন্য জরুরী ছিল; তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে বের হন। কিন্তু ঐ বাণিজ্য কাফেলার অধিনায়ক বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে এর পূর্বেই সাধারণ চলাচলের প্রচলিত রাস্তা ছেড়ে যায়, যা মদীনা থেকে দশ বারো মাইল পশ্চিম দিকে ছিল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এই সংবাদও পেয়ে গিয়েছিলেন যে, কুরায়শরা প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে বদর নামক স্থানে পৌঁছে গেছে এবং সেখানে অবস্থান

নিয়ে আনন্দোৎসব করছে। এমতাবস্থায় কুরায়শদের সাথে যুদ্ধ করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল এজন্য যে, যদি তা করা না হয় তাহলে প্রথমত: কুরায়শরা ঐসব গোত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করত, যাদের সাথে ইতিপূর্বে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এমতাবস্থায় ঐসব গোত্রের জন্য পুনরায় মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের কোন সুযোগ থাকত না– দ্বিতীয়ত: কুরায়শ আগে বেড়ে মুসলমানদের উপর হামলা করে বসলে, মুসলমানরা বদর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করলে যে পরিণাম হতে পারত, তার চাইতে এর পরিণাম হত মুসলমানদের জন্য আরো ভয়ংকর। অতএব আল্লাহ্ তা'আলাই বদরকে হক-বাতিলের (সত্য-অসত্যের) যুদ্ধের প্রথম ময়দানে পরিণত করেন।

২। উহুদ যুদ্ধ

এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এজন্য যে, মক্কার কুরায়শরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মদীনা আক্রমণ করেছিল। কুরায়শ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল কমপক্ষে তিন হাজার। আর মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল মাত্র সাড়ে সাত শ। একদল তীরন্দাজের ভ্রান্তির কারণে মুসলমানরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতদস্বত্ত্বেও যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থা শেষ পর্যন্ত তাদের অনুকূলেই চলে আসে।

৩। আহযাব যুদ্ধ

এই যুদ্ধ ছিল মক্কার কুরায়শ এবং খায়বারের য়াহূদীদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি। এতে কুরায়শ ও য়াহূদীরা বিভিন্ন গোত্রকে নানা ধরণের প্রলোভন দেখিয়ে মদীনায় নিয়ে আসে। ফলে এখানে প্রায় দশ হাজার শত্রু সৈন্যের সমাবেশ ঘটে। মুসলমানগণ তখন মদীনাকে রক্ষার জন্য একটি সুদীর্ঘ পরিখা খনন করেন।

৪। খায়বার যুদ্ধ

এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এজন্য যে, খায়বারের য়াহূদীরা আহযাব যুদ্ধে বিফলকাম হওয়ার পর গিতফান এবং অন্য আরো কয়েকটি গোত্রকে মদীনা আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করে। অতএব এই ফিত্নার আগুন চিরদিনের জন্য নির্বাপিত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের আগে বেড়ে এই যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

৫। মূতা অভিযান

মূতার খ্রীষ্টান শাসক শুরাহ্‌বিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূতকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়েছিল। দূতকে হত্যা করা ঐ যুগেও ছিল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি অপরাধ। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এই অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিন হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী মূতা অভিমুখে প্রেরণ করেন। তাঁরা কমপক্ষে এক লক্ষ শত্রু সৈন্যকে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

৬। মক্কা বিজয়

এই অভিযান অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল এজন্য যে, কুরায়শদের সাথে হুদায়বিয়া সন্ধি বহাল থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের একটি মিত্র গোত্রকে মুসলমানদের একটি মিত্র গোত্রের উপর আক্রমণ করতে প্ররোচিত করে এবং তাদেরকে সাহায্য-সহায়তাও প্রদান করে। এতে মুসলমানদের মিত্র গোত্রের যে ক্ষতি হয় তা পূরণের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শদের সামনে দু'টি প্রস্তাব পেশ করেন। যেমন, হয় ঐসব লোকের রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হবে, যারা ঐ হামলার কারণে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে, নয়ত কুরায়শকে আপন মিত্র গোত্রের পক্ষ ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু কুরায়শরা এই দু'টি প্রস্তাবের কোনটিই মেনে নেয়নি। অতএব বাধ্য হয়ে মুসলমানদেরকে মক্কা অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করতে হয়।

৭। হুনায়ন যুদ্ধ

এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এজন্য যে, মক্কা বিজয়ের পর বনূ হাওয়াযিন ও বনূ সাকীফ মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো এবং এই আশংকা দেখা দিয়েছিল যে, মাসজিদুল হারামও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। আর মুসলিম বাহিনী কর্তৃক তায়িফ অবরোধ ছিল হুনায়ন যুদ্ধে, পথিমধ্যকার একটি অভিযান মাত্র।

৮। তাবূক অভিযান

মদীনায় অনবরত: এই সংবাদ পৌঁছতে থাকে যে, রোমের কায়সার আরবের উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাধ্য হয়ে তিন হাজার উৎসর্গীকৃত প্রাণ মুজাহিদ সমভিব্যাহারে অনেকগুলো কঠিন মনযিল অতিক্রম করে আরবের উত্তর সীমান্তের তাবূক নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন, যাতে যুদ্ধ শত্রুদেরই এলাকায় সংঘটিত হয়। সেখানে তিনি বিশ দিন অবস্থান করেন। কিন্তু কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-বিভিন্ন গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে মদীনায় ফিরে আসেন।

নিয়মিত যুদ্ধ সমূহে ক্ষতির পরিমাণ

মরহুম কাযী মুহাম্মদ সুলায়মনের তৈরী পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাসূল যুগের নিয়মিত যুদ্ধসমূহে যেসব ক্ষতি হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপ।[৩]

যুদ্ধ	মুসলমানদের প্রাণের ক্ষতি	বিরুদ্ধ পক্ষের প্রাণের ক্ষতি	মন্তব্য
বদর	২২	৭০	সাধারণ বর্ণনা অনুযায়ী শুধুমাত্র চৌদ্দ জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন।
উহুদ	৭০	৩০	সাধারণ বর্ণনা অনুযায়ী কুরায়শের শুধুমাত্র তেইশ ব্যক্তি নিহত হয়েছিল।
খন্দক বা আহযাব	৬	১০	সাধারণ বর্ণনা অনুযায়ী বিরুদ্ধ পক্ষের শুধুমাত্র চার ব্যক্তি নিহত হয়েছিল।
খায়বার	১৮	৯৩	---
মূতা	১২	অজ্ঞাত	---
হুনায়ন	৬	৭১	ইবনে হাযামের মতে হুনায়নে চারজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছিলেন। (জাওমিউস সিরাহঃ পৃষ্ঠা-২৪১)
তায়িফ অবরোধ	১৩	অজ্ঞাত	---
তাবূক	---	---	---
সর্বমোট	১৪৭	২৭৪	---

বিরুদ্ধ পক্ষের নিহতদের মধ্যে মূতা এবং তায়িফের নিহতের সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। তবে তা খুব বেশী হবে না।

মোটকথা, সমগ্র ক্ষুদ্র বৃহৎ এবং নিয়মিত যুদ্ধ সমূহে মুসলমান এবং তাঁদের বিরোধী পক্ষের প্রাণের সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

মুসলমান ॥ ১৪৭ + ৯৬ = ২৪৩

বিরুদ্ধ পক্ষ ॥ ২৭৪ + ১১৮ = ৪৬২

এই পরিসংখ্যানে রাজী'ও বি'-রে মাউনার শহীদদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। কেননা তাঁদেরকে তাবলীগ (ইসলাম প্রচার) ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয় নি। যদি আপনি তাঁদেরকে প্রাণের ক্ষতির তালিকাভুক্ত করেন তাহলে মোট আরো ঊনআশি সংখ্যা যোগ করলে সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়াবে ৩৩২। অনুরূপভাবে বিরুদ্ধ পক্ষের ক্ষতির তালিকায় মূতা যুদ্ধ ও তায়িফ অবরোধের নিহতদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে বিরুদ্ধপক্ষের সংখ্যাও কিছুটা বেড়ে যাবে। তবে অধিক থেকে অধিকতর সর্বমোট সংখ্যা মাত্র কয়েক শত হতে পারে।

টীকা ঃ

১। তরজমানুল কুরআন ঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ প্রথম মুদ্রণ ঃ পৃষ্ঠা-৩৭৬।

২। রাহমাতুল লিল্ আলামীনঃ দ্বিতীয় খন্ড।

৩। এই মক্সার মধ্যে মক্কা বিজয়ের ক্ষতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। কেননা তা পূর্ববর্তী পসিংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাতে দুজন মুসলমান শহীদ হন ও নিহত হয় এগারো জন কাফির।

আপন পর নির্বিশেষে করুণার বৃষ্টি-২

মানুষকে মর্যাদা দানই মনুষ্যত্ব

মরহুম কাযী সাহেব প্রদত্ত নক্সা

মরহুম কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান প্রথমে গাযওয়া ও সারিয়াহসমূহের একটি বিস্তারিত নক্সা দিয়েছেন। তাতে প্রত্যেকটি অভিযান ও প্রত্যেকটি যুদ্ধ সম্পর্কে পৃথক পৃথক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উভয় পক্ষের সর্বমোট কত লোক অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে কতজন নিহত বা শহীদ হয়েছিল, কতজন আহত হয়েছিল, কতজন বন্দী হয়েছিল তা উক্ত নক্সায় পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে।[১]

এরপর তিনি সমগ্র পরিসংখ্যানের একটি সামগ্রিক নক্সা তৈরি করেছেন যা নিম্নে দেওয়া গেল।[২]

পক্ষ	নিহত অথবা শহীদ	আহত	বন্দী	সর্বমোট সংখ্যা	মন্তব্য
মুসলমান	২৫৯	১২৭	১	৩৮৭	মরহুম কাযী সাহেব অবশ্য পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, উভয় পক্ষের আহতদের সংখ্যা সঠিক নাও হতে পারে, তবে বন্দী ও নিহতদের সংখ্যা
বিরুদ্ধ পক্ষ	৭৫৯	--	৬৫৬৪	৭৩২৩	,,
সর্বমোট	১০১৮	১২৭	৬৫৬৫	৭৭১০	,,

আমি এই পরিসংখ্যানের মধ্যে মোটেই হস্তক্ষেপ করি নি। কাযী সাহেব তাঁর বিস্তারিত নক্সায় যে সব সংখ্যার উল্লেখ করেছেন আমি নিজেও সে গুলোকে বেশ কয়েকবার একত্রে যোগ করে দেখেছি। এ জন্য আমার বন্ধুবান্ধবকেও বার বার কষ্ট দিয়েছি। এতদসত্ত্বেও এই সামগ্রিক নক্সার সংখ্যার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাতে উল্লেখিত কোন কোন সংখ্যা যে আদৌ ভ্রান্ত ছিল তা পরিষ্কার লক্ষ্য করা গেছে। যেমন 'রাহমাতুল লিল্ আলামীন' গ্রন্থের ২৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, খালিদ বিন ওলীদের অভিযানে মুসলিম শহীদের সংখ্যা ছিল ৯৫। অথচ এটি ছিল বিপক্ষ দলের নিহতের সংখ্যা। এ ধরনের বেশ কিছু সংশোধনী সত্ত্বেও আমি সমন্বয়ের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারি নি। জানি না, মরহুম কাযী সাহেব কিভাবে এই হিসাব তৈরী করেছিলেন।

লক্ষণীয় বিষয়

মরহুম কাযী সাহেব কর্তৃক উপস্থাপিত পরিসংখ্যান সঠিক, না বেঠিক তা এখানে লক্ষণীয় বিষয় নয়। বরং এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রথম হিজরীর রমযান (মুতাবিক মার্চ ৬২৩ ইং) থেকে নবম হিজরী (মুতাবিক ৬৩০

ইং) পর্যন্ত যত হামলা, সংঘর্ষ বা যুদ্ধ হয়েছে তাতে মুসলমান এবং তাদের বিরুদ্ধ পক্ষের প্রাণের ক্ষতি হয়েছে সর্বাধিক এক হাজার আঠারো। আর এই ক্ষতির পরিমাণ এতই নগণ্য যে, যখন আমি আমার বন্ধু বান্ধবদের কাছে এ বিষয়টি উল্লেখ করলাম তখন তারা প্রথম পথম বিশ্বাসই করতে চান নি যে, আমি যা বলছি তা সত্য। আচ্ছা, এবার না হয় ধরে নিন, প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ এর চাইতে বেশী। আমি যে সংখ্যার উল্লেখ করেছি সেটাকে দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ করে নিন। তাহলেও ক্ষতির অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে তিন হাজারে। এ সংখ্যাকে তো আর টেনে লম্বা করার সাধ্যি কারো নেই। এখানে একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে গায্ওয়া-সারিয়ার আকার প্রকারের প্রতি লক্ষ্য না করে অমি প্রত্যেক প্রকার সংঘর্ষের ফলাফল এখানে একত্রিত করেছি। এরপর সেটাকে আট বছরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি। তাতে ফিবছর গড়ে চারশ লোকের প্রাণের ক্ষতি হয়েছে। আর এটা হচ্ছে ঐ সব যুদ্ধে ক্ষতি, যে সব যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো আগে বেড়ে অংশ গ্রহণ করেন নি বা করতে চান নি। সত্যের পয়গাম প্রচার করাই ছিল তাঁর আসল কাজ এবং তিনি সব সময়ই সব ধরনের সংঘর্ষ এড়িয়ে শান্তি ও আপোষমূলক পরিবেশে তা করতে চেয়েছেন এবং তার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানা নেই। এক্ষেত্রে একটি কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, অষ্টম হিজরীতে আরবের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং বলতে গেলে, তখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফল্যজনকভাবে তাঁর তাবলীগী তৎপরতার প্রথম ধাপ অতিক্রম করেন। আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকেরা দলে দলে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে এবং দেখতে দেখতে গোত্রের পর গোত্র এবং সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। যে মহান নবী হক ও বাতিলের (ন্যায়-অন্যায়ের) প্রথম পরীক্ষা স্থল বদর যুদ্ধে, বলতে গেলে অনেক কষ্টে তিন শ তের জন লোক নিয়ে হাযির হতে পেরেছিলেন সেই তিনিই যখন তাবূক অভিযানে বের হন তখন তার পতাকাতলে ছিল ত্রিশ হাজার উৎসর্গীকৃত প্রাণ মুজাহিদ। আল্লাহ্র পথে,'দ্বীনে হক' এর পথে ধন-প্রাণ তথা সর্বস্ব উৎসর্গকারী এত বড় বাহিনী ইতিপূর্বে আরব ভূখন্ড আর কখনো দেখে নি।

হাজার সোয়া হাজার কিংবা বড় জোর তিন হাজার প্রাণের ক্ষতির বিনিময়ে এত বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন ও গতিত্বপূর্ণ কাজ আনজাম দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিশ্বের কোথাও কি কেউ কখনো দেখতে পেরেছে, না পারবে? উপরন্তু আরেকটি কথা এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা শুধু একটি ভূভাগকে পদানত করার বিষয় ছিল না- এটা ছিল না কোন সিংহাসন দখলের ব্যাপার। বরং এটা ছিল একটি নতুন জাতির অভ্যুত্থান, যে জাতিকে সম্বোধন করে কুরআন বলছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর ও অসৎকার্যে নিষেধ কর।” (৩:১১০)

কোন একটি মানব গোষ্ঠীর প্রশংসায় যা কিছু বলা যেতে পারে তার সব কিছুই পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত তিনটি বাক্যের মাধ্যমে অতি সুন্দরভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস, সৎকার্যে নির্দেশ ও অসৎকার্যে নিষেধের পর কোন্ গুণটি আর বাকী রয়ে গেল, যার দ্বারা একটি মানব গোষ্ঠীর উচ্চ প্রশংসা করা যেতে পারে– চাই সে মানব গোষ্ঠী বড় হোক অথবা ছোট হোক।

ইসলামের অবির্ভাবের পূর্বে আরবদের অবস্থা কিরূপ ছিল তা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক মাত্রেই এব্যাপারে একমত যে, তারা তখন জঙ্গলের হিংস্র পশু ও হায়েনার মত তাদের জীবন নির্বাহ করছিল। সবগুলো গোত্র এবং বংশের আচরণ ছিল পাশবিক। লুটপাট ছাড়া তাদের অন্য কোন পেশা ছিল না। ঝগড়া-বিবাদের মধ্যেই তাদের জীবন অতিবাহিত হত। দুই ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত একটি সামান্য বিরোধকে কেন্দ্র করে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠত। মরহুম খাজা হালীর ভাষ্য অনুযায়ী–

کھین تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا　　کھین پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا

لب جو کھین آنے جانے جھگڑا　　کھین پانی پینے پلانے پہ جھگڑا

یونھیں روز رھتی تھی تکرار ان میں

یونھیں چلتی رھتی تلوار انمیں!

অর্থাৎ তখনকার আরবদের মধ্যে গৃহপালিত পশু চরানো, অগ্রে ঘোড়া ছোটানো, পশুকে পানি পান করানো ইত্যাদি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া চলতে থাকত।

কুরআন মজীদ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মানবসুলভ আচরণের দিক দিয়ে তখনকার আরবরা ছিল ভূপৃষ্ঠের নিকৃষ্টতম জাতি। দ্বীনে ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং সমগ্র বিশ্বের আমানত (পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব) তাদের হাতে সঁপে দেন। পবিত্র কুরআনে আরবদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে-

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ط

"তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ করঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের প্রন্তে ছিলে, আল্লাহ্ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন।"-(৩ঃ১০৩)

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ط لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ -

"এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও আপনি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন।"(৮ঃ৬৩)

এই সংক্ষিপ্ত সময়কালেই- যাতে একটি সীমিত পরিমাণ ভূখন্ড পদানত করার প্রথম ধাপ অতিক্রান্ত হয়- একটি নতুন জাতির অভ্যুদয় ঘটে এবং এমন একটি শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কার্যকর হয়, যার মধ্যে সমগ্র বিশ্ববাসীর ভাগ্য পাল্টে দেবার মত যোগ্যতা ছিল। যে জাতিটি তখন গড়ে উঠেছিল তাদের আচার আচরণ ও গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে মরহুম খাজা হালী বলেন-

سب اسلام کے حکم بردار نبرے　　سب اسلامیون کے مردگار نبرے

خدا اور نبی کے وفادار نبرے　　یتیمونکے رانڑون کے غمخورار نبرے

وہ کفر وباطل کے بیزار سارے

نشے میں مئے حق کے شرسار سارے

جھالت کی رسمین منادینے والے　　کھانت کی بنیاد ڈھا دینے والے

سر احکام دیں پرجھکا دینے والے   خرا کے لئے گھر مٹا دینے والے

ہر افت میں سینہ سپرکرنے والے

فقط ایك اللّٰہ کے ڈرنے والے

نہ کھانون میں تھی وان تکلف کی کلفت   نہ پوشش کے مقصود تھی زیب وزینت

امیر اورلشکر کی تھی ایك صورت   فقیر اور غنی سب کی تھی ایك حالت

لگایا تھا مالی نے ایك باغ ایسا

نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا

خلیفہ تھے امت کے ایسے نگباں   ہگلےکا حبیے نگھباں چوپاں

سمجھتے تھے امی ومسلم کو یکسان   نہ تھا عبد وحرمین تفاوت نمایاں

کنیز اور بانو تھین أپس مین الیسی

زمانے مین ما جائی بھنیں ہوں جیسی

"ওরা সবাই ছিল ইসলামের আদেশ মান্যকারী, মুসলমানদের সাহায্যকারী, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি বিশ্বস্ত, এবং য়াতীম ও বিধবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ওরা কুফ্র ও বাতিলের প্রতি ছিল নারাজ এবং আল্লাহ্র শরাবের নেশায় ছিল মত্ত।

ওরা ছিল জিহালতের (মূর্খতার) রীতিনীতি ও ভাগ্য গণনার ভিত্তি উৎখাতকারী, দ্বীনের আদেশ-নির্দেশের সামনে মাথা নতকারী, আল্লাহ্র জন্য নিজেদের ঘর উৎসর্গকারী, প্রত্যেকটি বিপদে ঝাপিয়ে পড়ার মত মন-মানসিকতার অধিকারী এবং শুধুমাত্র এক আল্লাহ্কে ভয়কারী।

না তাদের খাবারের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা বা লোকদেখানোর ব্যাপার ছিল, না তাদের পোশাকের লক্ষ্য কোন সৌখিনতা (দাপট) ছিল। সেনাপতি ও সাধারণ সেনার অবস্থা ছিল একই। ধনী ও গরীবের মধ্যে কোন বৈষম্য ছিল না। মালাকার এমন একটি উদ্যান রচনা করেছিল, যাতে ছোট বড় কোন চারা ছিল না (বরং সব চারাই ছিল সমান)।

খলীফা ছিলেন উম্মতের (জনতার) জন্য তেমনি হিফাযতকারী যেমন হিফাযতকারী হয় পশুদলের জন্য তার রাখাল। তিনি উম্মী ও মুসলিমকে এক নজরেই দেখতেন। তাদের গোলাম ও প্রভুদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তাদের বেগম ও দাসী এমনভাবে মিলে মিশে জীবন ধারণ করতেন, যেমন পরস্পর মিলেমিশে জীবন ধারণ করে দুই সহোদরা বোন[৩]।"

বিশ্ব ইতিহাসের কোথাও কি এমন কোন জাতির সন্ধান পাওয়া যাবে, যারা এত সামান্য প্রাণের ক্ষতির বিনিময়ে– যার পরিমাণ সোয়া এক হাজারের চাইতে বেশী ছিল না– মাত্র আট ন বছর সময়ের মধ্যে বিশ্বে এ ধরনের একটি বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল? এর পরও কি হযরত মুহাম্মদ (সা) এর 'রাহমাতুল লিল আলামীন' হওয়ার ব্যাপারে কারো মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকতে পারে? মানুষ তো মুজিযাসমূহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের জিজ্ঞাসাঃ উপরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর যে মু'জিযার কথা বলা হল তার চাইতে নিশ্চিত ও অনস্বীকার্য মু'জিযা আর কী হতে পারে?

ডঃ মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্‌র ভাষ্য

ডঃ মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্ বলেন ঃ

১। রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর জীবনকালে মদীনার নগর-রাষ্ট্র প্রতিদিন গড়ে দু'শ চুয়াত্তর বর্গ মাইল এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে।

২। পাক ভারত ইপমহাদেশের সম পরিমাণ আয়তনের একটি বিরাট এলাকা জয় করতে শত্রুপক্ষের রড়জোর দেড়শ লোক নিহত হয়। আর এই দশ বছরে গড়ে প্রতিমাসে মুসলিম বাহিনীর বড় জোর একজন সিপাহীকে শাহাদত বরণ করতে হয়।

আমি এই সংখ্যাতত্বের ব্যাপারটি বুঝতে পারি নি। কিছু কিছু সংখ্যা আমার জানাও নেই। কিন্তু যে পরিমাণ জানা আছে তা যদি একত্রে যোগ করা হয় তাহলে এই সংখ্যা নিশ্চিতভাবে দেড় শ'য়ের চাইতে বেশী হবে। আর একথা বলাও সম্ভবতঃ ঠিক হবে না যে, দশ বছর সময়কালের মধ্যে গড়ে প্রতিমাসে একজন করে মুসলিম সিপাহী শাহাদত বরণ করতে থাকেন– যার অর্থ, যাবতীয় যুদ্ধে সর্বমোট এক শ বিশ জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন।

সংখ্যাতত্বের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করা সত্ত্বেও শ্রদ্ধেয় ডঃ মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্‌র এ উক্তিটির ব্যাপারে আমার মনে লেশমাত্র সন্দেহ-সংশয় নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানবীয় রক্তের প্রতি যে মর্যাদা দেখিয়েছেন বিশ্ব ইতিহাসে তার কোন নযীর নেই।

ছবির অপর পিঠ

এখানে তুলনামূলক বিচার-বিবেচনা আমার লক্ষ্য নয়। কেননা এটা সব সময়ই কোন না কোন ভাবে দুটি বস্তু বা পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। আর এখানে তো সমন্বয় সৃষ্টির কোন প্রশ্নই উঠে না। হ্যাঁ, তবে উপদেশ গ্রহণের জন্য ঐ সব দেশ ও জাতির কিছু কিছু পরিসংখ্যান এখানে পেশ করা হচ্ছে, যারা নিজেদের ধরণা মতে সভ্যতা–ভব্যতার একেবারে শীর্ষ চূড়ায় বসে আছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম পর্বে যখন বৃটিশ বাহিনী ও ফরাসী বাহিনীকে পশ্চাদপসারণ করতে হয় তখন তারা জনসাধারণকে রক্ষা করার দিকটিকেই প্রাধান্য দেয়। ফলে ভারী সমরাস্ত্রসমূহ শত্রুর হাতে অর্পণ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। তখন চার্চিল পার্লামেন্টে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছিলেন, সমরাস্ত্রসমূহ মেশিনে তৈরি করা যেতে পারে, কিন্তু মানুষকে তো আর মেশিনে তৈরি করা যেতে পারে না। খুব ভালকথা। কিন্তু আপনারা একটু চিন্তা করে দেখুন, এই সভ্য ইউরোপ তাদের পারষ্পরিক যুদ্ধে– বিশেষ করে ঐ সব যুদ্ধে, যা এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন ভূখন্ডে সংঘটিত হয়েছে, মানুষের রক্তকে কি পানির চেয়েও সস্তা মনে করেন নি? তাদের এই কর্মধারা মধ্যপ্রাচ্যে এবং ইন্দোচীনে এখনো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জারী রয়েছে। হাবভাব দেখে মনে হয়, যেন ঐ সব অঞ্চলে যারা বাস করে তারা আদৌ মানুষই নয়। কেননা মানুষ হলে তো তাদের রক্তের প্রতি অন্ততঃ কিছুটা সম্মান দেখানো হত।

শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত

আপনি 'রাহমাতুল লিল আলামীন' হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) এর যুদ্ধ সমূহের দিকে, যা করতে তাকে বাধ্য করা হয়েছিল, একটু লক্ষ্য করুন। দেখবেন, তাঁর এই আট নয় বছরের যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা সর্বাধিক বাড়িয়ে তিন হাজারে পৌঁছানো যেতে পারে। এবার বর্তমান সভ্যতার ধ্বজাধারীদের যুদ্ধ সমূহে কি পরিমাণ লোক নিহত হয়েছিল তার একটি টুকিটাকি হিসাব দেখুন।

১। ইং ১৬১৮ সাল থেকে ১৬৪৮ সাল পর্যন্ত যে যুদ্ধ চলেছিল এবং যাতে জার্মানী, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন, প্রভৃতি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল - তাতে কেবল জার্মানীরই এক কোটি বিশ লক্ষ লোক নিহত হয়েছিল।[৪]

২। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ইং ১৮৬১ সাল থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এর মধ্যে এক পক্ষে ছিল উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ এবং অন্যপক্ষে ছিল দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ। দাসত্বের প্রশ্নই ছিল এই যুদ্ধের কারণ। এতে

উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যসমুহের তিন লাখ মানুষ এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের পাঁচ লাখ মানুষ মারা যায় এবং তাতে খরচ হয় চুয়াত্তর কোটি পাউন্ড। যুদ্ধ না করে এই অর্থ দাসমুক্তির কাজে খরচ করা হলে এক ফোটা রক্ত না ঝরিয়েই সমগ্র বিশ্বের ক্রীতদাসকে এমনিতেই গোলামী থেকে মুক্ত করা সম্ভব হত। আমেরিকা থেকে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ করা হয়েছে সত্য, কিন্তু তার সমগ্র অভিশাপ এখনো সেখানে অত্যন্ত জঘন্য আকারে বিদ্যমান রয়েছে।

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এক কোটি মানুষ নিহত হয় এবং আহত হয় দু'কোটি। এর মধ্যে কত লোক পঙ্গু ও অন্ধ হয় এবং কত লোক হাসপাতালে প্রাণ বিসর্জন দেয় তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এরপর এই যুদ্ধ থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সূত্রপাত হয় এবং তাতে অতিরিক্ত আরো এক কোটি লোক মারা যায়। একজন মানবতাবাদী বিজ্ঞ লোকের অনুমান এই যে, এই যুদ্ধে আশি অর্বুদ পাউন্ড ব্যয়িত হয়। এই অর্থ দ্বারা ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের ভূভাগসহ যাবতীয় স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তি অন্ততঃ পাঁচবার খরিদ করা যেত।[৫]

৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুধুমাত্র নিহতদের তালিকাটি দেখুন।

চীন	১৩,১০,২২৪ জন।
ফ্রান্স	- ২,০০, ০০০জন।
জার্মানী	৬৩,০০,০০০ জন।
শুধুমাত্র বোম ফেলার কারণে	৫,০০,০০০ "।
জাপান	৫,৩৫,৭৯৫ "।
বোমা বাজীর কারণে	২,৪১,৩০৯ "।
গ্রীস	৪,১৫,০০০ "।
বৃটেন	৩,৫৩,৬৫২ "।

এ সংখ্যার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় এক কোটির মত। এর মধ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেক দেশের নিহতের সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। যেমন চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, রাশিয়া, ফিনল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, ইতালী ইত্যাদি। উপরন্তু বিভিন্ন দেশের সব জনসাধারণেরও প্রাণ হানির তথ্য জানা যায় নি, যাদেরকে হিটলারের বাহিনী সমূহ তাদের জরুরী কাজ করবার জন্য বলপূর্বক জার্মানী নিয়ে গিয়েছিল এবং যুদ্ধের পর যারা আর নিজেদের দেশে ফিরে আসতে পারে নি।এই সমস্ত সংখ্যা যদি একত্রিত করা হয় তাহলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রাণের ক্ষতির পরিমাণ দু'কোটির উর্ধে চলে যাবে।

অগ্নি উদ্গীরণকারী বোমা নিক্ষেপ করে শহর, শহরতলী, কারখানা, শস্যক্ষেত্র, জমি, গ্রাম, বন্দরসমূহ এবং বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের কেন্দ্রসমূহ কি পরিমাণ ধ্বংস করা হয়েছে এর হিসাব কে দিতে পারবে? হিরোসীমা ও নাগাসাকীতে আনবিক বোমা নিক্ষেপের পর যে কিয়ামতের দৃশ্য সৃষ্টি হয়েছিল, তার ভয়াবহতা ভাষায় বর্ণনা করা তো অসম্ভব।

রাব্বানী রাজনীতি ও শয়তানী রাজনীতি

রাহমাতুল লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) রাব্বানী রাজনীতি প্রতিষ্ঠা এবং এই রাজনীতিকে মানবজাতির চিরন্তন জীবন ব্যবস্থা হিসাবে কায়েম করার আহবান মানুষের কাছে পৌছিয়ে দিয়ে গেছেন। উপরে আহত, নিহত ও অন্যান্য ধ্বংসলীলার যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে ঐ সব জাতি গোষ্ঠীর কর্মকান্ড,

যাদের সাথে রাব্বানী রাজনীতির দূর-দূরান্তের সম্পর্কও ছিল না। তারা ছিল শয়তানী রাজনীতির প্রবক্তা। রাব্বানী শাসনব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে রাব্বানী গুণাবলীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। আর সেগুলো হচ্ছে দয়া, করুণা, ভালবাসা, প্রেমপ্রীতি ও সহানুভূতি। মানুষের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিপালন সঠিক আদর্শের ভিত্তিতে হওয়া চাই। কিন্তু শয়তানী রাজনীতির কোন আদর্শ নেই। তা মানবজাতির জন্য একটি প্রলয়ংকরী ঝড় ও ভয়ংকর ভূমিকম্প ছাড়া কিছু নয় এবং তার আংশিক প্রদর্শনী এখানে সেখানে অহরহ হয়ে থাকে। এর প্রতিক্রিয়া ও ফলশ্রুতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

চিন্তা করে দেখুন, যদি মানুষের বুদ্ধিচেতনা ঠিক থাকে তাহলে তারা কোন্ রাজনীতিকে তাদের মঙ্গলের জন্য বেছে নেবে? তারা কি সেই রাজনীতি বেছে নেবে, যে রাজনীতি সামান্য সুযোগ সুবিধা পেলে বিশ্বের উৎকৃষ্টতম ভূখন্ডসমূহ জ্বলিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে এবং অসংখ্য মানুষের জীবনকে আগুন ও রক্তবন্যায় ভাসিয়ে দেবে? না, তারা কখনো তা বেছে নিতে পারে না। কেননা এতে মানুষের কোন মঙ্গল নেই। মানুষের মঙ্গল শুধুমাত্র রাব্বানী রাজনীতির মধ্যেই রয়েছে, যেটাকে সাথে নিয়ে আরবের এক একটি ক্ষুদ্র দল ঘর থেকে বেরিয়ে দিগ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যেখানেই পৌঁছেছিল সেখানকার অন্ধকারসমূহ দূর করে দিয়েছিল। তারা সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিল সন্ধি, শান্তি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। প্রতিষ্ঠা করেছিল আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল ও মানুষের মধ্যে ভালবাসা ও প্রেমপ্রীতির সম্বন্ধ। আজ বিশ্বে হুযূর (সাঃ) এর কোটি কোটি ভক্ত-অনুসারী রয়েছে; কিন্তু হায়, কোথাও এমন দৃশ্য দেখা যায় না যে, সেখানকার ভক্তরা তাদের অন্তরাত্মার শান্তির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ও হুযূরে আকরাম (সা)-এর সাথে সম্বন্ধ বহাল রাখার উপর সম্মিলিতভাবে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছেন।

টীকা ঃ

১। রাহ্‌মাতুল লিল্ আলামীনঃ দ্বিতীয় খন্ডঃ পৃষ্ঠা-২৪৪।

২। ঐ।

৩। মুসাদ্দাসঃ খাজা আলতাফ হোসেন হালী।

৪। BOOK OF FACTS ঃপৃষ্ঠা-৬১৪।

৫। BOOK OF FACTS ঃপৃষ্ঠা-৬১৫

পবিত্র কুরআনের কয়েকটি বৈপ্লবিক মূলনীতি–১

বিশ্বে শান্তি স্থাপনের সুদৃঢ় ভিত্তিসমূহ

বিশ্বজনীন ও আন্তজার্তিক দৃষ্টিকোণ

ইসলামের দৃষ্টিকোণ হচ্ছে বিশ্বজনীন ও আন্তর্জাতিক। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র বিশ্ববাসীর হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ইসলামের তাবলীগী দাওয়াতনামা পাঠান তখন তা শুধু আরবের গোত্রপতিদের কাছে নয় বরং ইরানের কিসরা, পূর্ব রোমের কায়সার, মিসরের মাকুকিস এবং আবিসিনিয়ার নাজ্জাশীর কাছেও পাঠিয়েছিলেন। এই সব দেশের অবস্থান ছিল আরবের আশেপাশে। তাই আরবদের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল এবং সে সুবাদে তারা এই সব দেশে যাতায়াত করত। এটা ছিল ইসলামের প্রতি দাওয়াতের প্রথম পদক্ষেপ। মুসলমানদের কর্তব্য ছিল, হুযূরে আকরাম (সা) এর 'উত্তম আদর্শ' অনুসরণের মাধ্যমে সেই দাওয়াত ও তাবলীগের আওতা ক্রমশঃ বিস্তৃত থেকে বিস্তৃতর করা। যার ফলে ইসলাম সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন সে উদ্দেশ্যও পুরোপুরি সফল হত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, অল্প কিছুকাল অতিবাহিত হতে না হতেই মুসলমানরা এমন সব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, যা শুধু আকার-আকৃতিতেই নয়, বরং প্রায় ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পলিসির দিক দিয়েও সে ধরনেরই সাম্রাজ্য ছিল, যা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান ছিল। অবশ্য কখনো কখনো ঐ সমস্ত সাম্রাজ্যেও এমন কিছু শাসনকর্তার আবির্ভাব ঘটেছে, যারা 'রাবূবিয়াত' (প্রতিপালন)- এর ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এর দ্বারা প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তির প্রবল স্রোতধারায় কোন ভাটা পড়ে নি। অবস্থা দিন দিন বিগড়াতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে ঐ সমস্ত সাম্রাজ্যের পরিণাম তাই হয় যা বরাবর হয়ে থাকে। আসল কথা হলো, তাদের সাংগঠনিক কর্মধারায়ই ধ্বংসের বীজ নিহত ছিল। অবশ্য উপরোক্ত পরিবেশেও কোন কোন পুণ্যবান বান্দা এখানে সেখানে ইসলামের তারবিয়াতী (প্রতিপালন) ও তাবলীগী কেন্দ্র স্থাপন করেন, যে গুলোর কল্যাণকামিতা ও সৌন্দর্যাবলী উল্লেখ করার স্থান এটা নয়।

এখানে পবিত্র কুরআনের কিছু সংখ্যক বৈপ্লবিক মূলনীতি পেশ করা হচ্ছে, যা বিশ্বজনীন নিরাপত্তা ও মঙ্গলকামিতার এক একটি বিরাট উপাদান হিসাবে পরিগণিত হবে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, খোদ মুসলমানরাও এই সব মূলনীতি নিজেদের জীবনে পুরোপুরি কার্যকর করতে পারে নি। এমতাবস্থায় অন্যরা এর উপর আমল করবে সে আশা কিভাবে করা যেতে পারে?

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার দাবী

আন্তর্জাতিক সংস্কার সংশোধন ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয় হলো, ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকল জনগোষ্ঠী, জনদল ও জাতি-সম্প্রদায়কে মৌলিক দিক দিয়ে সমান বলে মেনে নেওয়া এবং এই সাম্যকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ইতস্তত: বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করা – যদিও এক একজনের আকীদা বিশ্বাস এক এক রকম হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর উপর যে পবিত্র গ্রন্থ (আল-কুরআন) নাযিল হয়েছিল তাতে মানবিক সাম্যের সন্দেহাতীত ঘোষণা রয়েছে। যেমন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوٓا۟ ط إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ط إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

"হে মানুষ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।" (৪৯ঃ১৩)

সব মানুষ একই পুরুষ ও একই নারী অর্থাৎ আদম ও হাওয়ার সন্তান। যে ভাবে একই পিতামাতার সন্তানের মধ্যে কোন পার্থক্য ও বৈষম্য করা হয় না তেমনি আদমও হাওয়ার সন্তান তথা সমগ্র মানবজাতির মধ্যেও পার্থক্য সৃষ্টির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। বর্ণ ও বংশের পার্থক্য তথা যে কোন ধরণের পার্থক্য একেবারে অসার ও অর্থহীন। মানুষ এগুলোর মধ্যে ডুবে গিয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ায়, অথচ সকলের উচিত এই সব জিনিস পরিহার করা, মূল সাম্য ও ভ্রতৃত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং একথা বিস্মৃত না হওয়া যে, আমরা সবাই মানুষ এবং আমাদের সবার মূল এক।

মক্কা বিজয়ের পর হারাম শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন তাতে সম্বোধিত ছিল ঐ সব লোক, যারা সুদীর্ঘ একুশ বছর পর্যন্ত মুসলমানদের উপর জুলুম-অত্যাচারের তুফান চালাতে কোন প্রকার ত্রুটি করেনি। সেখানে উপস্থিত মুসলমানদের এমন একটি বক্ষ বা চেহারাও ছিল না, যাতে সম্বোধিতদের বর্শা, তরবারি অথবা তীরের আঘাতে ইতিপূর্বে কোন না কোন সময় লাগে না। এতদসত্ত্বেও হুযূর (সা) সম্বোধিতদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। তোমরা সবাই মুক্ত।

উপরন্ত তিনি বলেন, হে কুরায়শ, জাহিলিয়া যুগের ধন ও জনের গর্ব এবং বংশ-গৌরব আল্লাহ্ তা'আলা মুছে ফেলেছেন। সব মানুষ আদমের বংশধর এবং আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর তিনি সূরা হুজুরাতের উল্লিখিত আয়াত তিলাওয়াত করেন। এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই আয়াতটি মানবিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিস্বরূপ।

জেনে রাখা ভাল যে, এই আয়াত শুধু মুখে মুখে তেলাওয়াত করলে চলবে না, এর উপর ঠিক সেভাবে আমল করতে হবে যাতে সাম্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় এবং সমগ্র মানবগোষ্ঠী একই পিতামাতার সন্তান হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে তা যেন দিন দিন সুদৃঢ় হতে থাকে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের পরিবেশই হয় সার্বিকভাবে সত্যপ্রচারের অনুকূল। কামান থেকে অগ্নি উদ্গীরণকারী গোলা বর্ষণ কিংবা বিমান থেকে সর্বনাশী বোমা নিক্ষেপকে কখনো অন্যের কাছে সত্যের পয়গাম পৌঁছানো এবং হুযূর (সা) এর সংশোধন মূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের অনুকূল মনে করা যেতে পারে না।

সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তি

এরপর লক্ষ্য করুন, উপরোক্ত আয়াতে যা বলা হয়েছে তার মর্মকথা হলো, আল্লাহ্র কাছে সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি সম্পদ, বর্ণ, রক্ত, বংশ, জাতি কিংবা বিশেষ কোন ভূখন্ড নয়; বরং শুধুমাত্র তাক্ওয়া ও পুণ্যকর্ম। কোন মানুষকে এই ভিত্তিতে সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য মনে করা যেতে পারে না যে, তিনি কোটিপতি, তার রং সাদা কিংবা তিনি আর্যবংশীয়- যেমন বিশ্বের কোন কোন বুদ্ধিভ্রষ্ট জনগোষ্ঠী মনে করে থাকে- যার ফলে তাদের মধ্যে কোন না কোন আকারে মারাত্মক ভেদবৈষম্য বিরাজ করছে। শুধুমাত্র পুণ্যকর্মই মানবীয় মর্যাদার ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হতে

পারে। এক্ষেত্রে কোন আলেকজান্ডার বা নেপোলিয়ন তার নামের ভিত্তিতে মর্যাদার অধিকারী হন না, এখানে কোন আবিষ্কারক, দার্শনিক, রাজনীতিক, পন্ডিত কিংবা বক্তার পেশা ও কর্মকান্ডের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। এখানে যা লক্ষণীয় তা হলো পুণ্যকর্ম, পুণ্যকামিতা, সততা, মানব প্রেম তথা সমগ্র সৃষ্টিকে ভালোবাসা। যেখানে এই সব গুণাবলী নেই সেখানকার যাবতীয় কর্মতৎপরতা বেকার এবং অসার।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, পুণ্যকর্ম ছাড়া যখনই কোন বস্তুকে মর্যাদার মাপকাঠি মনে করা হবে তখনি দেখা দেবে মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ। যখন সম্পদকে মাপকাঠি করা হবে তখন বৈধ পথে তা অর্জন করতে সক্ষম না হলে মানুষ অবৈধ পথ অবলম্বন করবে এবং তার এই কর্মধারা তার এবং অন্যান্য মানুষের জীবনে অভিশাপ ডেকে আনবে। আর যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে মাপকাঠি করা হবে তখন মানুষ তা কুক্ষিগত করার জন্য একে অন্যের উপর ঝাপিয়ে পড়বে, রক্তবন্যা হবে এবং বিজিতদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করবে। কিন্তু পুণ্যকর্মকে মাপকাঠি করা হলে তাতে পরস্পর শত্রুতা বা হিংসাবিদ্বেষ দেখা দেওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কেননা এগুলো হবে পুণ্যকর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী আচরণ। যখন মানুষ পুণ্যকর্মে ব্রতী হবে তখন তাদের লক্ষ্য হবে অন্যান্যদেরকেও একাজে অংশীদার করে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্বকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করা।

দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি নেই

পবিত্র কুরআনের একটি বৈপ্লবিক নীতি এই যে–

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَا انْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

"দ্বীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই, সত্যপথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে 'তাগূত' (শয়তান, কল্পিত দেবদেবী ও যাবতীয় উপায়-উপকরণ যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে)- কে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্কে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাংবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।- (২ঃ২৫৬)

মানবীয় অত্যাচার-অবিচারের যত ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে তার তিন চতুর্থাংশই হচ্ছে জুলুম-অত্যাচার তথা জোর জবরদস্তির ফলশ্রুতি। এক জনগোষ্ঠী অন্য জনগোষ্ঠীকে নিজেদের স্বমতে আনার জন্য এই জোর জবরদস্তি চালানোকে বৈধ জ্ঞান করে এসেছে। যদিও এ বিষয়টি বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন সকলেরই জানা যে, দ্বীনের পথ হচ্ছে ইতিকাদ ও বিশ্বাসের পথ। আর ইতিকাদ একমাত্র দাওয়াত ও উপদেশের মাধ্যমেই সৃষ্টি হতে পারে। জোরজুলুম ও জবরদস্তি দ্বারা একজন মানুষ অন্যের দেহকে নিজের মর্জিমাফিক চালাতে পারে, কিন্তু তার অন্তরে ইতিকাদ ও ঈমানের প্রদীপ জ্বালাতে পারে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অন্তরে য়াকীন ও বিশ্বাসের প্রদীপ প্রজ্বলিত না হবে ততক্ষণ তা থেকে সেই আমাল বা কাজকর্ম আশা করা যেতে পারে না, যা দ্বীনের দৃষ্টিতে প্রত্যাশিত ও গ্রহণীয়। প্রকৃতপক্ষে জবরদস্তির কারণে মানুষের অন্তরে ঘৃণা ও শত্রুতার আগুণ প্রজ্জলিত হয়, আর যখন অত্যাচারীর বলবিক্রমে ভাটা পড়ে তখন সে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং সেই অবস্থার সম্মুখীন হয় যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا

"ঐ নারীর মত, যে তার সূতা মজবূত করে পাকাবার পর ওটার পাক খুলে নষ্ট করে দেয়।"-(১৬ঃ৯২)

মরহুম মাওলানা শায়খুল হিন্দ তাঁর অনূদিত কুরআনের টীকায় উল্লেখিত আয়াত (২ঃ২৫৬) সম্পর্কে লিখেছেন, যখন তাওহীদের দলীল প্রমাণাদি এমন স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, কাফিরের আর কোন ওজর-আপত্তি বাকি থাকে নি তখন জবরদস্তিমূলক ভাবে অন্যকে মুসলমান করার কি কোন প্রয়োজন আছে, না থাকতে পারে? যারা বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন তাদের একথা বুঝে নেওয়া উচিত যে, শরীয়তে কোথাও এই আদেশ নেই যে, তুমি অন্যকে জোর জবরদস্তি করে মুসলমান বানাও।[১]

উপরন্তু এই আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও স্পষ্টকরে দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে–

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ط أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ .

"আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই ঈমান আনত; তবে কি আপনি মুমিন হবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবেন?" (১০ঃ৯৯).

রাসুলুল্লাহ্ (সা) মানুষকে হিদায়াতের জন্য অন্তরে যে অধীর ও ঐকান্তিক আগ্রহ পোষণ করতেন, এই আয়াতে তার স্বরূপটি যেমন অতি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে তেমনি একথাটিও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, দ্বীনের ব্যাপারে জোর জবরদস্তির কোন অবকাশ নেই। এটাই আল্লাহ্র ইচ্ছা যে, মানুষ বুঝে সুঝেই এদিকে ধাবিত হোক এবং নিজেদের প্রকৃতিদত্ত সামর্থ্য অনুযায়ী সৌভাগ্যের বিভিন্ন সিঁড়ি অতিক্রম করতে থাকুক।

হযরত শায়খুল হিন্দ বলেন,

"তাঁর (রাসূলুল্লাহ্র) এই ক্ষমতা নেই যে, জবরদস্তিমূলকভাবে কারো অন্তরে ঈমান ঢুকিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ চাইলে নিঃসন্দেহে সব মানুষের অন্তরে ঈমান ঢুকিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু এরূপ করা যে তাঁর 'তাকভীনী হিকমাত' (মানুষকে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনার রহস্য) - এর বিরোধী।[২]

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ لا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِينَ نَارًا لا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ط

"বলুন, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত, সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখান করুক। আমি জালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে।" (১৮ঃ২৯)

মোটকথা, ইসলামে সাম্যের ঘোষণা যেমন মানবীয় মর্যাদা স্বীকার করে নেওয়ার একটি অনিবার্য অংশ তেমনি ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে জবরদস্তি থেকে বিরত রাখাও মানবীয় মর্যাদার একটি মাধ্যম। কিন্তু ইসলাম প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যেখানে শ্রেষ্ঠত্বের গভীর থেকে গভীরতর অনুভূতি সৃষ্টি করতে চায় সেখানে এই আশাও রাখে যে, (এবং রাখা উচিতও) মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে পুণ্যকর্মের উৎসে পরিণত হবে এবং আল্লাহ্র উপর তার বিশ্বাস অধিক থেকে অধিকতর সুদৃঢ় হবে। কেননা শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি কোন বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই এপথ ছাড়া অন্য কোন পথে চালিত করে না - করতে পারে না।

ন্যায় বিচারের উপর দৃঢ়তা

পবিত্র কুরআনের আর একটি বৈপ্লবিক নীতি হলো–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ .

"হে মুমিনগণ, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটা 'তাক্ওয়ার' (পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করার) নিকটতর এবং আল্লাহ্কে ভয় করবে, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন।" –(৫:৮)

মরহুম হযরত মাওলানা শায়খুল হিন্দ তাঁর অনূদিত কুরআনে قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ (আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে অবিচল থাকা) দ্বারা 'হুকূকুল্লাহ' (আল্লাহ্র হকসমূহ)-এর দিকে এবং شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ (ন্যায় সাক্ষ্য দান) দ্বারা 'হুকূকুল ইবাদ' (বান্দার হক সমূহ) এর দিকে ইংগিত রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

"আদল বা ন্যায় বিচারের অর্থ কোনরূপ কমবেশী না করে কারো সাথে এমন ব্যবহার করা, যার সে প্রকৃতই যোগ্য। আদল ও ইনসাফের দাড়িপাল্লা এমন সোজা ও সঠিক রাখতে হবে যাতে গভীর থেকে গভীরতর ভালবাসা কিংবা জঘন্য থেকে জঘন্যতর শত্রুতাও এর দুই পাল্লার কোনটিকে ঝুকিয়ে দিতে না পারে। –'আদল ও কিস্ত্' (ন্যায় বিচার) তথা শত্রুমিত্রের সাথে সমান ব্যবহার করা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভালবাসা বা শত্রুতা দ্বারা মোটেই প্রভাবিত না হওয়া প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া অর্জনের সব চাইতে প্রভাবশালী ও নিকটতর কারণ সমূহের অন্যতম।"[৩]

এ থেকে বিবেকবান মানুষ মাত্রেই অনুমান করতে পারেন, ইসলাম কি কি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করতে চায়। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে তার ভালবাসা বা শত্রুতা যত গভীরতরই হোক, যখন সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাকে বিচারকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয় তখন তার মুখ থেকে এমন একটি কথাও বের হয় না, যা ন্যায়বিচার ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিপন্থী।

ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন, খায়বার বিজয়ের পর সেখানকার জমি আধাআধি উৎপাদনের ভিত্তিতে য়াহূদীদের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল। ফসল ভাগবন্টনের জন্য আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহাকে সেখানে পাঠানো হত। তিনি ক্ষেত থেকে সংগৃহীত ফসলসমূহ দুভাগে ভাগ করে পৃথক পৃথক দুটি স্তূপ রচনা করতেন। এরপর য়াহূদীদেরকে বলতেন, তোমরা এ থেকে যে অংশ ইচ্ছা নিয়ে নাও। এই দেখে য়াহূদীরা বলত, "এ ধরনের ন্যায় বিচার দ্বারাই যমীন ও আসমান টিকে আছে।"

ভূপৃষ্ঠে এ-ই ছিল মুসলমানদের জীবনাদর্শ। আর একমাত্র এই জীবনাদর্শই বিশ্বে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সেই সব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কীভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পারে, যাদের মুখ থেকে যখন কথা বের হয় তখন মনে হয় যেন পুষ্প বর্ষিত হচ্ছে, কিন্তু তাদের অন্তর, তাদের আচার আচরণ এবং তাদের মনমানসিকতা এতই নীচ ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত যে, যেন এটা সেই মনোবৃত্তি, যা মদীনার য়াহূদীরা আরবদের সম্পর্কে পোষণ করত। তারা বলত –

لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ج وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ .

"নিরক্ষরদের (আরবদের) প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই; এবং তারা (য়াহূদীরা) জেনেশুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।" –(৩ঃ৭৫)

অর্থাৎ যে গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত তাদের সম্পর্কে য়াহূদীরা এক ধরনের মনোবৃত্তি পোষণ করত। আর যে গোষ্ঠীর সাথে তাদের কোন স্বার্থ জড়িত নেই তাদের সাথে অন্য ধরনের মনোবৃত্তি পোষণ করত। তারা বিশ্বাস করত, আরবরা মূর্খ ও ধর্মহীন, কাজেই তাদের অর্থ আত্মসাৎ করা য়াহূদীদের জন্য বৈধ।

সৎকর্মে সাহযোগিতা ও অসৎকর্মে অসহযোগিতা

পবিত্র কুরআন আর একটি বৈপ্লবিক নীতি ঘোষণা করেছে এই বলে–

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص وَاتَّقُوْا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ .

"তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্মে ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমা লংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহ্কে ভয় করবে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।"– (৫ঃ২)

মক্কার কুরায়শরা হিজরী ৬ সনে মুসলমানদেরকে উমরাহ পালন করতে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু যখন মক্কায় সর্ববয় ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে এল তখন তাদের সামনে এ কথাটা পরিষ্কার করে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যে, কুরায়শদের অতীতের বাড়াবাড়ির কারণে তোমরা যেন আবার তাদের উপর বাড়াবাড়ি করতে শুরু না কর– যদিও তোমাদের ধরণা অনুযায়ী এটা তাদের পূর্বকৃত অপরাধের প্রত্যুত্তর ছাড়া কিছু নয়। মুসলমানদের কর্মপদ্ধতি এই যে, যেখানেই তারা কোন সৎকর্ম সম্পাদন করতে দেখে সেখানেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, যাতে করে তাকওয়া ও সৎকর্মের অধিক থেকে অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। অবশ্য তারা পাপকর্ম থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে, যাতে সেগুলো সংক্রমিত হওয়ার কোন সুযোগ না পায়।

এবার চিন্তা করুন, যদি বিশ্বের সমগ্র জাতি ও সমগ্র জনগোষ্ঠী এই কর্মপদ্ধতিকে আপন করে নেয়, তাক্ওয়া ও সৎকর্মের জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে, অত্যাচার ও পাপাচারকে বাড়তে না দিয়ে সম্মিলিত শক্তি দ্বারা সেগুলোকে প্রতিরোধ করে তাহলে কি দুনিয়া সর্বোতভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি শান্তিধামে পরিণত হবে না? (সংকলক)

টীকা ঃ

(১) অনূদিত কুরআন মজীদ ঃ হযরত শায়খুল হিন্দ ঃ পৃষ্ঠা–৪৫।

(২) ঐ ঃ পৃষ্ঠা– ২৪৮–২৮৫ ঃ টীকা।

(৩) ঐ ঃ পৃষ্ঠা– ১৪০ ঃ টীকা।

পবিত্র কুরআনের কয়েকটি বৈপ্লবিক মূলনীতি–২

বিশ্বে শন্তি স্থাপনের সুদৃঢ় ভিত্তিসমূহ

সততা ও ন্যায়পরায়ণতা

পবিত্র কুরআনের একটি বৈপ্লবিক নীতি হলো–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا قف فَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوُا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرًا .

"হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ, যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক, আল্লাহ্ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে জেনে রেখ যে, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন।"– (৪ঃ১৩৫)

মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এই যে, সে সর্বাবস্থায় সততার উপর কায়েম ও সুদৃঢ় থাকবে এবং সত্য সাক্ষ্য দিতে কখনো ইতস্তত: করবে না। সে সব সময় সত্য কথা বলে যাবে। এতে সে নিজে কিংবা তার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন ক্ষতিগ্রস্থ হলেও দ্বিধা করবে না। সে সম্পদশালীর সম্পদের লোভে কিংবা তার প্রভাব প্রতিপত্তির ভয়ে কখনো মিথ্যাচারিতার আশ্রয় নেবে না। কোন নিঃস্ব ব্যক্তির প্রতি দয়াপরবশ হয়েও সে সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না। মোটকথা, ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির তাড়না কিংবা ব্যক্তিগত খামখেয়ালীপনাকে সে কখনো প্রশ্রয় দেবে না। কথার মধ্যে কোনরূপ হেরফের করবে না, সাক্ষ্যদান থেকেও বিরত থাকবে না। কেননা এ গুলোর মাধ্যমে মানব সমাজে অবস্থা বিশেষে মুখ রক্ষা করা যায় বটে, তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের নিয়্যত তথা অন্তরের অন্তস্থলের খবরও রাখেন।

যারা নিজের বা নিজের নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানে ইতস্তত: করে না, তারা মানুষের মঙ্গল সাধনের ক্ষেত্রে যে মহামূল্যবান খিদমত আনজাম দিতে পারবে, তা কি কখনো ঐ সব লোকের পক্ষে সম্ভব, যারা নিজেদের মুখ থেকে একটি শব্দ বের করার সময় দশ বার চিন্তা করে, এর দ্বারা আমার পক্ষের লোকেরা কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং আমার বিপক্ষের লোকেরা কোনভাবে লাভবান হয়ে যাবে না তো? এটাকে তারা বলে তাদাব্বুর বা দূরদর্শিতা। বিশ্বে শন্তি স্থাপনের দায়িত্ব ঐ সব লোকেরাই গহণ করতে পারে, যারা ন্যায়নিষ্ঠা ও সততার এই চূড়ান্ত পর্যায়ে

মন্দকে উৎকৃষ্ট দ্বারা প্রতিহতকরণ

পবিত্র কুরআনের আর একটি বৈপ্লবিক নীতি হলো,

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ۝

"ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।" (৪১:৩৪)

মরহুম হযরত শায়খুল হিন্দ তাঁর অনূদিত কুরআন মজীদের টীকায় এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা হলো–

খুব ভালভাবে বুঝে নাও যে, পাপ পুণ্যের এবং পুণ্য পাপের সমান হতে পারে না। এ দু'টির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। বরং এক পুণ্য অন্য পুণ্যের চাইতে এবং এক পাপ অন্য পাপের চাইতে বৃহত্তর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। অতএব একজন বিনয়ী মুমিনের-বিশেষ করে একজন 'দায়ী ইলাল্লাহ্' (আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী)-এর নীতি এই হওয়া চাই যে, সে কখনো মন্দের জবাব মন্দের দ্বারা দেবে না, বরং যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দের মোকাবেলা করবে। যদি কেউ তাকে মন্দ বলে কিংবা তার সাথে মন্দ ব্যবহার করে তাহলে এর মোকাবেলায় তার সাথে সেই ব্যবহারই করতে হবে, যা এর চাইতে উৎকৃষ্টতর। যদি এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ কর তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, তার চরম শত্রুতার মধ্যেও শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। যদিও সে তখনই আন্তরিক দিক দিয়ে তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে না তবু এমন একদিন আসবে যখন সে প্রকাশ্যে তোমার সাথে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ব্যবহার করতে থাকবে। বরং এটা পুরোপুরি সম্ভব যে কিছুদিন পর সে সত্যিকার অর্থে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে।[১]

মোটকথা, এটি এমন একটি নীতি, যা প্রত্যেকটি সৎসাহসী ও বিশুদ্ধচিত্ত মানুষ গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া প্রত্যেকটি মুসলমান তো প্রকৃতপক্ষে এক একজন 'দায়ী ইলাল্লাহ্'। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরও এই নীতিই ছিল। আর তার নীতি অনুসরণের চাইতে সৌভাগ্যের বস্তু আর কী হতে পারে?

ন্যায় পরায়ণতা ও সদাচরণ

পবিত্র কুরআনের আর একটি সার্বজনীন ও বৈপ্লবিক আহ্বানের প্রতি লক্ষ্য করুন–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমা লংঘন, তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" –(১৬ : ৯০)

মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ হলো, ন্যায়পরায়ণতাকে তোমরা তোমাদের স্বভাবে পরিণত করো, পুণ্যকর্মে তৎপর থাকো, নিকটাত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করো, অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকো, হরেক রকমের অসৎকর্ম থেকে নিজেকে পবিত্র রাখো এবং জুলুম-অত্যাচার ও সীমালংঘনের সাথে কখনো নিজেকে জড়িয়ে ফেল না।

যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাদের পরীক্ষা তখন আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ছিল না, বরং ছিল আমাল ও কাজকর্মের ক্ষেত্রে। এ কারণেই এই আয়াতের মধ্যে আমালী জীবনের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ কারণেই মুফাস্‌সিরগণ এটাকে 'জা'মি' (বিশ্বজনীন) আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

'আদল' (ন্যায়পরায়ণতা) হচ্ছে যাবতীয় সুকর্মের মূল। যে মানুষের মধ্যে এই মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়েছে যে, আমি যা করব ন্যায়পরায়ণতার সাথেই করব' সে মানব জীবনে যা পাওয়ার তার সবই পেয়ে গেছে। 'ইহসান' (সদাচরণ) এর অর্থ এখানে সুকর্ম। যে কথা বল সুন্দরভাবে বলো, যে কাজ কর সুন্দরভাবে করো। অর্থাৎ পাপ নয় বরং পুণ্যই যেন হয় তোমার কথা ও কাজের ভিত্তি। যারা আমাদের নিকটাত্মীয় তারা আমার ভাল ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক যোগ্য। এ কারণে দান করার সময় আত্মীয়স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখাকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে। এরপর অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে নিষেধাজ্ঞাসমূহের যাবতীয় উদ্দেশ্য পূরণ করে দেওয়া হয়েছে। 'ফুহ্শ্' (অশ্লীলতা) মানে ঐ সব কাজ, যা চূড়ান্ত মন্দ বলে স্বীকৃত। হরেক রকমের ও হরেক ধরনের মন্দ কর্ম 'মুনকার' (অসৎকার্য)-এর অন্তর্ভুক্ত। 'বাগ্য়ি' (সীমালংঘন) বলতে হরেক রকমের বাড়াবাড়িকে বুঝায়-চাই তা যে কোন স্থানে হোক, বা যে কোন আকারে হোক।

যে কিতাব (আসমানী গ্রন্থ) এমনি ছাঁচ নিয়ে এসেছে যে, তাতে উপরোক্ত ধরনের আমাল (কাজকর্ম) ঢালাই করা হয়, আর তাতে গঠিত হয় এমনি ধরনের মহৎ জীবন, তাকে 'হিদায়াত'। (পথ নির্দেশ) 'রাহমাত' (আশিষ) ও 'বিশারাত' (সুসংবাদ) ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

এটা একদম খাটি কথা যে, যে ব্যক্তির অন্তরে ভালমন্দ ও পাপপুণ্যের বিন্দুমাত্র অনুভূতি রয়েছে এবং যে বিশ্বকে প্রকৃত অর্থেই সুন্দর থেকে সুন্দরতর অবস্থায় দেখতে চায়, সে মাওলানার উপরোক্ত কথার সাথে মোটেই দ্বিমত পোষণ করতে পারে না। কেননা সত্যিকার অর্থে এটাই হচ্ছে স্থায়ী সাফল্যের পন্থা, যেদিকে পবিত্র কুরআন আমাদের দাওয়াত দিচ্ছে। এমন প্রত্যেকটি মানুষই এর সঠিক কার্যকারিতা অনুধাবন করতে পারে, যে এ সম্পর্কে চিন্তাগবেষণা করে-চাই সে ইসলামের অনুসারী হোক অথবা না হোক। সাথে সাথে এ বিষয়টিও চিন্তা করে দেখা উচিত যে, যে পবিত্র সত্তাকে এই তা'লীম ও দাওয়াতের (শিক্ষা ও আহ্বানের) পরিপূর্ণ ও জীবন্ত নমুনা করে বিশ্ববাসীর হিদায়াতের জন্য পাঠানো হয়েছিল, তাঁর 'রাহমাতুল লিল আ-লামীন' (জগতসমূহের জন্য আশিষ) হওয়ার ব্যাপারে কি কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে? নিঃসন্দেহে কুরআন হচ্ছে 'যিকরুল লিল্ আলামীন' (জগতসমূহের জন্য উপদেশ), আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) হচ্ছেন 'রাহমাতুল লিল্ আলামীন।'

অতীত যুগের ঝগড়া-বিবাদ

আজ বিশ্বের বৃহত্তর অংশ অতীত যুগের ঝগড়া বিবাদে জড়িত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক সংঘাত-সংঘর্ষ চলছে। যদি আজ এই সব ঝগড়া বিবাদের একটা মীমাংসাও হয়ে যায় তবু অতীতের ঐ সব দুঃখজনক ঘটনার ক্ষতিপূরণের তো কোন ব্যবস্থা নেই। আল্লামা ইকবাল এ বিষয়টির প্রতি ইংগিত করেই বলেছেন "নতুন মাহফিলে পুরাতন গল্পের অবতারণা করো না।" পবিত্র কুরআনের সূরা 'ত্বহা'য় অতি সংক্ষেপে মূসা (আ) ও ফিরআউনের মধ্যকার একটি কথোপকথনের উল্লেখ করা হয়েছে।

"ফেরআউন বললো, হে মূসা, কে তোমাদের প্রতিপালক? মূসা বললো, আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, এরপর পথ নির্দেশ করেছেন। ফিরআউন তখন চিন্তা করলো, এমন অসংখ্য লোক তো দুনিয়া থেকে গত হয়ে গেছে যারা এ ধরনের প্রতিপালককে বিশ্বাসী ছিল না। তাই সে বললো, তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী? মূসা বললো, এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট (সংরক্ষিত ফলকে অথবা আমলনামায়) লিপিবদ্ধ আছে, আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না।" (২০ ঃ ৪৯-৫২)

অর্থাৎ এই ঝগড়াঝাটি ও তর্কবিতর্কের মধ্যে লিপ্ত হয়ে কী লাভ? এটা কি আমাদের জন্য উৎকৃষ্ট নয় যে, আমরা অতীতের লোকদের ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেব এবং আত্মসংশোধনে সর্বশক্তি নিয়োগ করবো? কেননা অতীত যুগের লোকদের পথভ্রষ্টতা যেমন আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না তেমনি তাদের পুণ্যকর্মও

আমাদের কোন কাজে আসবে না। আমাদের ভাল কিংবা মন্দ কর্মের উপর নির্ভরশীল। অতএব আমরা কেন আমাদেরই ভালমন্দ নিয়ে চিন্তা করবো না? পবিত্র কুরআন এই মূলনীতিকে অন্যত্র যেভাবে উপস্থাপন করেছে তা হলো–

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

"সেই উম্মত গত হয়েছে–তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের, তোমরা যা অর্জন কর তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।"– (২ ঃ ১৩৪)

কী পবিত্র ও সুন্দর এই নীতি, যা আনায়াসে আমাদের অগণিত ঝগড়াবিবাদের অবসান ঘটাতে পারে? যখন এটা জানা কথা যে, আমাদের তর্ক বিতর্ক দ্বারা গত হয়ে যাওয়া লোকদের পুণ্যকর্মে কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটবে না এবং তাদের পাপকর্মেও কোনরূপ তারতম্য দেখা দেবে না, তখন এই তর্ক বিতর্কের পরিণতি এছাড়া আর কী হতে পারে যে, আমরা অযথা আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করব এবং আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ভাংগন ধরাব? আমাদের এই বাদ-প্রতিবাদ না আমাদের আমলনামায় কোন পূণ্য বৃদ্ধি করতে পারবে, আর না অতীত যুগের লোকেরা এর দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হতে পারবে। যদি বিশ্ববাসী এই নীতিকে আপন করে নেয় তাহলে শীঘ্রই যাবতীয় অসমীচীন, অনভিপ্রেত ও নিষ্ফল তর্কবিতর্ক ও ঝগড়াঝাটির অবসান ঘটবে এবং গড়ে উঠবে পরস্পর সহযোগিতামূলক এক সুন্দর ও অনুকূল পরিবেশ।

৬) ভাইয়ে ভাইয়ে আপোষ মীমাংসা

পবিত্র কুরআনের আর একটি মূলনীতি হলো–

وَاِنْ طَائِفَتَنِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوْا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْءَاِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ ج فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ . اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ .

"মুমিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে; এরপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন। মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।" (৪৯ ঃ ৯-১০)

চিন্তা করে দেখুন, হত্যা ও রক্তারক্তি প্রতিরোধের জন্য কতই না সুন্দর, সুবিচারমূলক ও মোক্ষম পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে। পরস্পর ভুল বুঝাবুঝির কারণে যদি দুই ভাইয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে এ অবস্থায় অন্যান্য ভাইদের কর্তব্য হবে তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেওয়া। যদি কোন একটি পক্ষ আপোষ মীমাংসায় আসতে অস্বীকার করে কিংবা ক্ষমতা বলে অপর পক্ষকে ধ্বংস করে ফেলতে উদ্যত হয় তাহলে সকলের কর্তব্য হবে মজলুম পক্ষকে রক্ষার জন্য তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো ও জালিম পক্ষকে নিরস্ত হতে বাধ্য করা। এমতাবস্থায় জালিম পক্ষ যদি আপোষ করতে এগিয়ে আসে তাহলে মধ্যস্থত্যকারীদের কর্তব্য হবে দুই পক্ষের মধ্যে

ন্যায়ের ভিত্তিতে বিষয়টি মিট্‌মাট্‌ করে দেওয়া। এটা কোন অবস্থায়ই উচিত নয় যে, সবল পক্ষ প্রভাবশালী বলে তাদের কথাই মেনে নেয়া হবে। কেননা এরূপ করাটা ন্যায় বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

হুযূর (সা) বলেছেন, আপন ভাইকে সাহায্য কর-চাই সে জালিম হোক অথবা মজলূম। নিবেদন করা হলো, মজলূমকে তো সাহায্য করা যেতে পারে, কিন্তু জালিমকে সাহায্য করা হবে কি ভাবে? হুযূর (সা) উত্তরে বলেন, হাত ধরে তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখো।

মুসলমানদের পরস্পর সম্পর্কের ব্যাপারে এই নীতি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এটা বিশ্বের আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রেও একটি মৌলিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমরা যতদূর অনুমান করতে পেরেছি, জাতি সংঘের সম্পূর্ণ গঠনতন্ত্র এ নীতির উপরই গড়ে উঠেছে, যদিও বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের স্বার্থের কারণে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের সাথে এ নীতিটি সঠিকভাবে কার্যকর হতে দেয় নি। এই আত্মস্বার্থপরতাই হচ্ছে এখন পর্যন্ত জাতিসংঘের দুর্বলতা ও প্রভাবহীনতার সবচেয়ে বড় কারণ। পবিত্র কুরআনের এই নীতি থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে রাখা হবে বা এটাকে কার্যকর করার ব্যাপারে যতদিন ইতস্তত: করা হবে, ততদিন বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

পরস্পর বিরোধের কারণসমূহ অপনোদন

পবিত্র কুরআন জাতিসমূহের মধ্যকার সুমধুর সম্পর্ক যাতে বিঘ্নিত না হয় সে ব্যাপারে মোক্ষম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। যেমন–

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ .

"এক জাতি যেন অপর জাতিকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।" (৪৯ : ১১)

وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ .

"তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না।" (৪৯ : ১১)

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ

"তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না।" (৪৯ : ১১)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ .

"হে মুমিনগণ, তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে দূরে থাকো : কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ।"

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ م بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ .

"হে মুমিনগণ, যদি কোন পাপাচারী তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত: তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।" (৪৯ : ৬)

শেষ নিবেদন

এখানে নমুনাস্বরূপ মাত্র কয়েকটি মূলনীতি পেশ করা হয়েছে, যা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে বিশ্বজনীন ও আন্তর্জাতিক। এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংস্থা সমূহের কথাও আপনা-আপনি এসে পড়ে এবং কিভাবে এ ধরনের সংস্থাকে অধিক থেকে অধিকতর কার্যকর ও সফল করে তোলা যায় বা এজন্য কি কি গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন তাও চোখের সামনে ভেসে উঠে। বলা বাহুল্য, ঐ সব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পরিচালিত না হলে কোন সার্বজনীন সংস্থা বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, জনগণের জীবনে কোন সুফলই বয়ে আনতে পারে না। পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ, একদা সমগ্র বিশ্ব ছিল যাদের করায়ত্ত-তারা ১৯২০ সনের জানুয়ারিতে একটি জাতি সংঘ (THE LEAGUE OF NATIONS)-এর ভিত্তি স্থাপন করে–যা ছিল বর্তমান যুগে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা। কিন্তু আত্ম স্বার্থপরতা এর সর্বজনীন উদ্দেশ্যকে এমনভাবে ব্যাহত করে যে, মাত্র পনেরো বছরের মধ্যেই এই সংস্থা তার যাবতীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইং ১৯৪৫ সনের জুন মাসে বর্তমান জাতিসংঘ সংস্থা (U.N.O) গঠিত হয়। কিন্তু একথা তিক্ত হলেও সত্য যে, কোন কোন রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থপরতার কারণে এই সংস্থাও প্রভাবহীন হয়ে পড়েছে। পবিত্র কুরআন থেকে যে কয়টি মূলনীতি উপরে পেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আন্তরিকতার সাথে কার্যকর করা ছাড়া না কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা সাফল্য লাভ করতে পারবে, না বিশ্বশান্তির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে, আর না বিপন্ন বিশ্ব মানবতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে। এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য মাত্র একটি ওসীলা (মাধ্যম)-ই বাকী আছে। আর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই হচ্ছেন সে ওসীলা।

টীকা ঃ

১। মরহুম হযরত শায়খুল হিন্দু কর্তৃক অনূদিত কুরআন মজীদ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৬২৩।

ইফা—২০১৪-২০১৫—প্র/৩০২(উ)—৫২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন